প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬৭, দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০০৯, গ্রন্থস্বত্ব : যাহেদ করিম, প্রচ্ছদ : সুখেন দাস, বিজয় রায় কর্তৃক নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫ প্যারী দাস রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং দিলীপ রায় কর্তৃক অনু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২ জয় চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

গোপনে নির্জনে



তাকে দেখলে আপনার সহজ মনে হত না। সে সহজ মেয়ে ছিল না। এই বলে গগন তার সত্তর বছরের প্রাজ্ঞ চোখদুটোর দৃষ্টি নদীর ওপারে রাখল। এখন সে আকাশ দ্যাখে, নাকি সবুজ পাটক্ষেত, বোঝার উপায় নেই। নদীর জল কূলে কূলে ভরা। সেই হলদে গাঢ় জলের ওপর অনেকক্ষণ থেকে একটা শঙ্খচিল ঘুরঘুর করছে। সওয়ারিবাহী ঘাটের নৌকোর ওপর দিয়ে তার ছায়া বারবার চমক দিয়ে যাচ্ছে। প্রিয়নাথ দেখল, শঙ্খচিলটা ছোঁ দিয়ে ছোট্ট কী একটা মাছ তুলল ঠোঁটে। আর ঠিক সেই সময়েই ওপারের গাছপালা থেকে একজোড়া শিকারি বাজ ছুটে এল। শঙ্খচিলটা উজানের বাঁক লক্ষ করে পালাতে থাকল। তার পালানোর মধ্যে যে অসহায় ভাবটুকু অনুমান করা যায়, প্রিয়নাথকে তা হাসাল।

গগন বলল—হাসির কথা তো বটেই। ধরিত্তি খুব সহজ মেয়ে ছিল না। ওই যে বটতলা দেখছেন, ওখানে তাকে ফেলে দিয়েছিল। শেয়ালশকুনে খায়। তারপর থেকে দিনেদুপুরেও পারতপক্ষে কেউ একলা ওখানে যেতে সাহস করে না। এমন কি, এই যে আমাকে দেখছেন, আমিও না।

প্রিয়নাথ শিকারি বাজদুটোকে অনেকটা ঘুরে ফিরতে দেখছিল। সামনে ওপারে শিমুল গাছটায় হয়ত ওর আস্তানা। মৃগাঙ্কবাবুর কথাটা এ মুহূর্তে মাথায় এসে গেল তার। গাঁয়ে ঢুকেছেন কতক্ষণ হয়ে গেল, ফেরার নাম নেই। মৃগাঙ্কবাবুর পিঠে বন্দুক আছে। কথা আছে, দুজনে ওপারের বিলে পাখি মারতে যাবে। ঘাটের বটতলার নিচে বাঁশের মাচায় বসিয়ে রেখে গেছেন। গেছেন তো গেছেন।

আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? গগন দ্রুত জাল বোনা শুরু করে ফের। তার বিশাল ফ্যাকাসে থাবায় কাঠিটা ছটফট করতে থাকে।—ধরিত্তির মেয়েকে দেখেও ধরিত্তিকে বুঝতে পারলেন না? হাড়ে-হাড়ে মায়ের অভ্যেসগুলো নিয়ে জন্মেছে। বয়স হয়েছে, চোখে ভালো দেখতে পাইনে। রাতবিরেতে নৌকো নিয়ে বেরোই না। তাহলে অনেক খেলা দেখতে পেতাম। কুসমি মাকে পেয়েছে।

কী নাম বললে? ধরিত্তি? প্রিয়নাথ আনমনে শুধোয়।

হুঁ।

তার মানে—ধরিত্রী?

তাই হবে। বঙ্কুবাবু—আপনাদের মিগাঙ্কবাবুর বাবা নাকি ওর নাম দেন। আমরা জানতাম ধরা। কেউ বলত ধরি। আমার বিয়ের বছর ওরা এসেছিল বিহার থেকে।

প্রিয়নাথ একটু কৌতূহলী হয়। বিহার থেকে?

হ্যাঁ। জাতে চাঁইমোড়ল। ওই যে দেখছেন—ওই বাড়িগুলো, ওদেরই। শাকসবজি ফলমূলের চাষ করে। ধরিত্তি তাদেরই একজনা ছিল। কিন্তু হলে কী হবে? রক্তে কী একটা ছিল ওর। স্বামীটা ছিল থুত্থুড়ে বুড়ো। হাঁপানির রুগী। সে আমলে তো এমন পাকা রাস্তাঘাট ছিল না। মোটরগাড়ি তো দূরের কথা, সাইকেলও দেখা যেত না। বঙ্কুবাবুর কথা আলাদা। জোতজমিওলা শিক্ষিত মানুষ। তিনিই যা সাইকেলে চেপে ন'ক্রোশ ভেঙে শহরে যেতেন। আর ছিল ঘোড়া। তো ধরিত্তি তার স্বামী বুধিরামকে টাট্টু চাপিয়ে এনেছিল। বুধিরামের দূরসম্পর্কের ভাই তখন এই কালুখাঁর দিয়াড়ে এসে জুটেছে। বঙ্কুবাবুর মাটি। ধরিত্তি কী মোহিনী লাগাল, দেড়বিঘে মাটি পেয়ে গেল। শুনেছি, একপয়সাও সেলামি লাগেনি। সেলামি তো ধরিত্তির সেই কীরকম চোখজোড়া! বলে গগন চাপা হাসে।

প্রিয়নাথ বাঁদিকে ঘুরে গ্রামের দিকে তাকায়। মৃগাঙ্কবাবুর দেরি হচ্ছে। ঘন সবুজ আম কাঁঠাল আর লিচুর বাগানে ঘেরা সুন্দর ছবির মতো গ্রাম। অবশ্য কিছুদিন আগেই বর্ষায় পচে ভূত হয়েছে। কাদা

থিকথিক করছে এখনও অনেক জায়গায়। তবে এই ধূসব নরম মাটির জল শুষে নেওয়ার ক্ষমতা প্রচণ্ড। ডাইনে মাঠে পাকা আউশ সবে তুলে নিয়েছে। কোথাও কোথাও পাট কাটা হয়ে গেছে। সাদা বকগুলো ঝাঁকে-ঝাঁকে ঘুরছে সেখানে। বাবলাবনের বনচড়ুইদের কিচিব-মিচির শব্দ স্পষ্ট কানে আসছে। এই সকালেই রোদ বড্ড চড়া হয়ে যাচ্ছে। ঘাম ফুটছে। অবশ্য নদীর ধার এবং বটের ছায়া বলে আরামও আছে কিছু। বাতাস খুব শান্তভাবে বইছে। একটু তফাতে চার-পাঁচটা চা পানবিড়ি আর খাবারের দোকান। সেখানে ভিড় নেই বিশেষ। যা জমেছিল, বাস ছেড়ে যাওয়ার পর কমে গেছে। বাসটা ফিরবে সেই দুটোয়। তিনটেয় ফের রওয়ানা হবে। শেষ পাড়ি দিয়ে ফিরবে একেবারে রাত আটটায়। পাশেই একটা তিনদিকঘেরা আটচালায় ওদের আপিস। সেখানে পাটের গাঁইট পাহাড় জমে রয়েছে।

গগন বলে—চোখে দেখে মানুষ চেনা যায়, কী বলেন? আমার মাঝেমাঝে মনে হত, ধরিত্তি মানুষ ছিল না। হ্যাঁ—তা একদিক থেকে ছিল না বলা যায় বৈকি। আপনি ডাইনি দেখেছেন কখনও?

না তো। সে আমলে পাড়াগাঁয়ে ডাইনি জন্মাত। মায়ের কোলে সুন্দর ফুটফুটে ছেলে দেখলে তারা চোখ দিয়ে রক্ত শুষে খেত। ছেলে নীল হয়ে ঝিমোতে-ঝিমোতে মারা পড়ত।

হ্যাঁ, সেসব গল্প অনেক শুনেছি।

কিন্তু সেসব ধরিত্তি যৌবন ফুরোলে শুরু করেছিল। একবাব রক্তের স্বাদ পেলে যা হয়। তার যৌবনে সে উলঙ্গ হয়ে—বিশ্বাস করুন, একেবারে উলঙ্গ হয়ে মাথায় ডালা চাপাত। তাতে থাকত ধুপচি। ধুপচিতে আগুনের আঙার। মুঠোমুঠো ধূপগুঁড়ো ছড়াতে-ছড়াতে রাতদুপুরে বেরিয়ে পড়ত মাঠে বা পথেঘাটে। সেকালে লোকে এত ভীতু ছিল, ভাবতে পারবেন না। ওই দেখে সবাই ঘরে ঢুকে খিলকপাট আঁটত।

প্রিয়নাথ আরও কৌতূহলী হয়।—এমন কেন করত ও?

গগন আনমনে মুখ নামিয়ে বলে—জানি না। হয়তো তন্তর-মন্তরের ব্যাপার, হয়ত ধাপ্পা।

ধাপ্পা কেন?

ধরিত্তি গোড়ারদিকে আসলে ছিল চুন্নি। সেবার গাঁয়ে মড়ক লেগেছে প্রচণ্ড। বমি-পায়খানা আর মরণ। দাহ হয় না, গোর পায় না—সব মড়া নদীর ধারে ওইখানটায় ফেলে দেয় সবাই। রাতদুপুরে ভাবলাম, যা হবার হবে—মাছটাছ গাঁয়ে কেউ খায় না বটে, শহরে গেলে বেচা যাবে। ঘরে অনটন চলছে। জাল নিয়ে বেরোলাম। বেশ জ্যোছনা আছে। চাঁদ টগবগ করছে মাথার ওপর। যেই পথে নেমেছি, কী একটা দৌড়ে আসছে দেখলাম। পাশ দিয়ে অমানুষী চেবা গলায় কীরকম ডাক ডেকে দৌড়ে গেল—উলঙ্গ, মাথায় এলো চুল, জ্যোছনায় স্তনদুটো দুলতেও দেখলাম। আমার গা বাজল। কিন্তু রাগ হল ভীষণ। ধরিত্তিকে চিনতে পেরেছিলাম কি না। অমনি জালফেলে তাড়া কবলাম! সে কী দৌড় ওর! মাঠে গিয়ে ধরে ফেললাম। হুঁ—ধরিত্তি।...গগন চুপ করল। ঠোঁটের কোনায় হাসির ঝিলিক।

প্রিয়নাথ বলে—তারপর?

আপনি ভদ্রলোক মানুষ। শুনতে খারাপ লাগবে। তারপর কী হওয়া উচিত বুঝে নিন। তবে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করতে লাগল ধরিত্তি। আমি শুনিনি। আমার রাগ হয়েছিল প্রচণ্ড।

কেন অমন করে, বলল না?

বলল। বলল, আগের জন্মে কামাখ্যার ডাকিনী ছিল। সেই অভ্যাস। তবে কী সাংঘাতিক মেয়ে দেখুন, কী বিশ্বাসঘাতিনী! বঙ্কুবাবুর বাড়ি গেছে একদিন রাত্রিবেলা। সবে ওনারা খেয়ে শুতে যাবেন। গরমের মাস। উঠোনে বারান্দায় গল্পগুজব করছেন। আচমকা ধরিত্তি উলঙ্গ হয়ে ঢুকে ওর সেই অমানুষী ডাকটা ডাকল। অমনি সবাই ঘরে ঢুকে খিলকপাট আঁটল। বঙ্কুবাবু সে-রাতে ছিলেন না—শহরে মামলা চলছিল। উকিলবাড়ি ছিলেন। তা ধরিত্তি করল কী, যতসব এঁটো থালাবাসন ছিল রান্নাঘরের বারান্দায়, সব নিয়ে পালাল। বঙ্কুবাবু ফিরে এসে কী করেছিলেন, মনে নেই। কী বা করবেন? ওনাকে তো গোড়াতেই গিলে খেয়েছিল।

প্রিয়নাথ একটু আগে খেয়া পেরিয়ে যেতে দেখেছে সেই ধরিত্রীর মেয়ে কুসমি বা কুসমুকে। এখন সেই চেহারা দেখতে পায়। আঁটো, নিটোল গড়ন, একটু হাল্কাও বটে, ছিপছিপে আর মাজাভারি। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। টানা চোখদুটো—ঠিকই বলেছে গগন, কী যেন অমানুষিক দৃষ্টির আলোয় ঈষৎ ধূসর, ঈষৎ নীল। ব্রেসিয়ার ছিল কি? প্রিয়নাথের মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, আশ্চর্য সুন্দর একটি যুবতী সে দেখেছে।

নাই পেতে-পেতে অবশেষে ধরিত্তি যা হবার হল। দুষ্টু সব চেলাও জুটিয়ে ফেলল। ওই যে শ্মশানের বটগাছটা দেখছেন, যে রাতে আমি ওর ডগায় আগুন জ্বলতে দেখেছি—তার সকালেই শুনেছি এলাকায় কারো বাড়ি ডাকাতি হয়েছে। সে অবশ্যি ধরিত্তির পাকাচুলের বয়সের কথা। অবশেষে পুলিশের টনক নড়ল। ফাঁদ পেতে ধরিত্তিকে ধরা হল। জেল খাটল ছ'বছর। ফিরল যখন তখন থুত্থুড়ে বুড়ি, কুঁজী। তাড়া করার সময় ওর কোমর ভেঙে দিয়েছিল পুলিশ।

ওর মেয়ে কোথায় ছিল তখন?

মেয়ে মান্যবর মোড়লের বাড়িতে ছিল। সবাই জানে বঙ্কুবাবু ভরণপোষণ দিতেন গোপনে। ধরিত্তি ফিরলে মেয়েকে গছিয়ে দিল সে। তবে ধরিত্তির চরম লাঞ্ছনার বাকি ছিল। বঙ্কুবাবু নেই—মারা গেছেন। কুঁড়েঘরে ধরিত্তির মড়া পচে ভূট হচ্ছে। কুসমি সবার হাতেপায়ে ধরে কান্নাকাটি করে বেড়াচ্ছে। জাতে ওরা চাঁইমোড়ল। আমাদের কেউ তো ছোঁবে না। ওদিকে ওর জাতও ওকে কবে থেকে পতিত করে বসে আছে। তারাও ছোঁবে না। তখন কী হল জানেন? ধরিত্তির পায়ে বিচুলির দড়ি বেঁধে টানতে-টানতে বের করল কুসমি। বাড়ির নিচে নদী। গরমের খটখটে মাস। দিব্যি ফেলে দিতে পারত চড়ায়। পুঁতেও দিতে পারত। তা সে করল না। টানতে-টানতে গাঁয়ের রাস্তা ঘুরিয়ে এখানে আনল। তারপর এখান থেকে নিয়ে গেল ওই শ্মশানে। কত লোক দেখল হাঁ করে। আমিও দেখছিলাম। ধরিত্তির মুখটা আকাশপানে—খোলা চোখ, সেই অমানুষী দৃষ্টি—আর সাদা চুলগুলো ঘষা খাচ্ছে মাটিতে, প্রায় উলঙ্গ শরীরটা—থুঃ!

থুথু ফেলে গগন হঠাৎ থামে। তারপর ভুরু কুঁচকে দূরের কিছু দেখতে-দেখতে ফের বলে—আমি ধরিত্তির মড়া পোড়ানোর খরচ দিতাম। কুসমি আমাকে তো কিছু বলেনি।

প্রিয়নাথ একটু হাসে।—ও তোমাকে বাবা বলে ডেকে গেল, শুনলাম!

এ্যাঁ! হ্যাঁ। কুসমি আমাকে বাবা বলে। এমনিতে ভারি মিষ্টি মেয়েটা। ভারি ভাল কিন্তু হলে কী হবে? মা-ই ওকে খেয়েছে। মধ্যে-মধ্যে ভর ওঠে। চুল নাড়া দিয়ে মাথা দুলিয়ে খেলতে বসে। কী সব আজগুবি কথা বলে।

প্রিয়নাথ চমকে ওঠে।—সে কী!

তাই তো বলছিলাম এতক্ষণ। সেই হিস্ট্রিই তো শোনালাম। কুসমির চোখদুটো দেখলেন না? আমার তো ভয় হচ্ছিল, যেভাবে আপনার দিকে তাকাচ্ছিল। নতুন মানুষ আপনি।...গগন ফ্যাকফ্যাক করে হেসে ওঠে।

ওর চলে কী ভাবে?

কেন? সেই দেড়বিঘে ক্ষেত ভিটের সঙ্গে। শাকসবজি ফলায়। ছাগল পোষে। সপ্তায় দুদিন হাটে যায়। ভালই চলে।

বিয়েটিয়ে করেনি?

একবার করেছিল। ও তো হাতছাড়া—একঘরে। যাকে বিয়ে করেছিল, সে ওর জাতের নয়। শহর থেকে এনেছিল ছোকরাকে। কদিন পরেই কুসমির কাণ্ডকারখানা দেখে—নাকি কেউ বলে, বেধড়ক পিটুনি খেয়েই পালায়। আর আসেনি। ও ডাকিনী—বাবুমশাই, কামরূপ কামাখ্যা ছাড়া ওর যোগ্য জুড়ি নাই।...গগন জোরে হেসে ওঠে ফের।

প্রিয়নাথ কুসমি বা কুসুমকে স্মরণ করে। কোথায় গেল খেয়া চেপে?

এতক্ষণে মৃগাঙ্ককে দেখা গেল। গ্রাম থেকে বেরিয়ে পাকা সড়কে উঠল। তার পাশে-পাশে একটা কালো সিড়িঙ্গে মতো লোক আসছে। তার দুহাতে দুটো মোরগ। সে মৃগাঙ্ককে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। মৃগাঙ্ক নির্বিকার আসছে।

কাছে এসে মৃগাঙ্ক বলল—প্রিয়বাবু মোরগ খাবেন নাকি?

মোরগ? প্রিয়নাথ একটু হাসল।...কেন? বেরোবেন না তাহলে?

নিশ্চয় বেরোব। মানে বেরিয়ে তো পড়েইছি। তবে এই মোরগদুটোও কাস্টডিতে রেখে দেওয়া যায়। খালি হাতে ফিরলে কাজ দেবে। রাখব?

আপনার ইচ্ছে। কত দাম বলছে?

দশটাকা।

প্রিয়নাথ অবাক হল। অতবড় দুটো মোরগ মাত্র দশটাকায়! অথচ মৃগাঙ্ক যেন দরাদরি করতে চায়।

মোরগওলা প্রিয়নাথের দিকে পড়ল।—রেখে দিন সার, খুব ভাল জাত। এত সস্তায় আর হয় না। নেহাত অভাবে বেচে দিচ্ছি। শহরে নিয়ে যেতে পারলে ডবল দাম হত।

মৃগাঙ্ক বলল—হত। কিন্তু খরচাটা হিসেব করেছিস তো? ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রির শামিল। যা, আমার খামারে নিয়ে গিয়ে রেখে আয়। নবীনকে বলবি, বেঁধে রাখতে।

লোকটা বলল—যাচ্ছি বাবু। টাকাটা?

মৃগাঙ্ক খচে গেল।—টাকা তোর জন্যে পকেটে নিয়ে বেরিয়েছি ব্যাটা! ওবেলা গিয়ে নিয়ে আসিস। উঠুন প্রিয়বাবু।

লোকটা কাঁচুমাচু মুখে বলল—বাবু, টাকাটা এখন পেলে ভালো হত। আপনার দিব্যি, বিশ্বাস করুন—একটা নয়াপয়সাও নাই ঘরে। চাল-ডাল কিনতে হবে। রাতউপোস দিনউপোস চলছে।

মৃগাঙ্ক আরও বিরক্ত হয়ে বলল—তোদের অভাব শালা এ জীবনে আর ঘুচবে না।...তারপর ওপাশে চায়ের দোকানটার দিকে ঘুরে কাকে চেঁচিয়ে বলল—এই ফটিক! একে দশটা টাকা দে তো বাবা। যা—ওর কাছে নি গে। আর সোজা খামারবাড়ি চলে যা। নবীনকে বলবি বেঁধে রাখতে।

লোকটা চলে গেল। প্রিয়নাথ মাচা থেকে নেমে বলল,—আপনার নিজের একটা নৌকো থাকা উচিত ছিল মৃগাঙ্কবাবু।

বাবার ছিল একটা পানসি। আমার দরকার হয় না।...বলে মৃগাঙ্ক হেসে উঠল। ...আমি মশাই স্পিডি মানুষ। আরও দশবিশটে হাত-পা থাকলে বেঁচে যেতুম। আরে, হালদারমশাই যে! এতক্ষণ লক্ষই করিনি!

গগন নমস্কার করে বলল,—বিলপারে চললেন বুঝি? যান—খুব হাঁস নামছে শুনলাম। নতুনবাবুকে দেখিয়ে আসুন আপনার রাজত্ব!

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল মৃগাঙ্ক। প্রিয়নাথ ও গগনকে দিল। নিজে ধরাল। তারপর বলল—হুঁ—কী বলছিলে যেন হালদারমশাই? রাজত্ব না কী?

আজ্ঞে হ্যাঁ। রাজত্ব।

বলেছ বেশ! তবে রাজত্ব রাখা বোধ করি আর সম্ভব হচ্ছে না হে হালদারমশাই! বাইশ বিঘে পাট ছিল ওপারে। প্রায় অদ্ধেকটা ইতিমধ্যে চোরে সাবাড় করেছে। আউশও বিশেষ তুলতে পারিনি। ডগাসুদ্ধ নিকেশ করেছিল। হঠাৎ এত চোরের উপদ্রব বেড়ে গেল কেন বুঝতে পারছি না।

গগন মাথা দুলিয়ে রহস্যময় হাসল।—বছর বিশেক আগে এ তল্লাটে এইরকম হঠাৎ চুরি-ডাকাতি বেড়ে গিয়েছিল। আপনার বাবা তখন বেঁচে। আপনি তখন পেন্টুলপরা ছেলে। মনে নিশ্চয় নাই। তবে কথা হল এই যে সর্ষের মধ্যে ভূত থাকে। তাঁর মতো মানুষও টের পাননি। নাকি—সব জেনেও চুপচাপ ছিলেন।

ধুরন্ধর মৃগাঙ্ক হাসল।—ধরিত্রীঠাকরানের কথা বলছ হালদারমশাই?

হুঁ। এতক্ষণ নতুনবাবুকে সেই গল্পই বলছিলাম। ধরিত্তি খুব সহজ মেয়ে ছিল না—তাই বলছিলাম।

খেয়া নৌকোটা ঘাটে এসে লেগেছে। কয়েকবোঝা ঘাস নিয়ে জনা তিন 'ঘেসেড়া' বা ঘাসকাটা লোক নামল। তিনটি মেয়ে একবোঝা করে পাটকাঠি মাথায় নিয়ে সাবধানে নেমে এল। মৃগাঙ্ক তাদের সবার দিকে সন্দেহাকুল চোখে তাকাচ্ছিল। চলে গেলে সে বলল—হালদারমশাই, মেয়েগুলো কোন পাড়ার চেনো নাকি?

গগন সেদিকে তাকিয়ে বলল,—চোখ-দুটোর মাথা খেয়েছি। পাটকাঠি নিয়ে গেল—ওদের কথা বলছেন?

হ্যাঁ।

তাহলে কুনাইপাড়ার হবে। একবোঝা তো ফেলে রাখবার জো নাই ওদের জ্বালায়। দিনে-দিনে মানুষের অভাব যা বাড়ছে—এরপর দেখবেন নিজের ঠ্যাংদুটো কটমট করে খাচ্ছে।

ঘেটেল ডাকছিল।—বাবু, পারে যাবেন নাকি?

যাব। আসুন প্রিয়বাবু! বলে মৃগাঙ্ক পা বাড়াল।

কূলে-কূলে ভরা ভৈরব। তবে স্রোতের টান অনেকটা বেড়ে গেছে। ওপারে ডাইনে অনেকটা ধ্বস ছেড়েছে। নৌকোয় উঠে প্রিয়নাথ বলল—গগনকে হালদারমশাই বলেন নাকি?

হ্যাঁ। ওকে এখন সবাই তাই বলে। কেন শুনবেন? দুই ছেলেকে বি. এ. পাশ করিয়েছে। ভাবতে পারেন—জেলের ছেলে! বড় মহেন্দ্র এখন দুর্গাপুর প্ল্যান্টে চাকরি করে। ছোট সত্যেন্দ্র ভগীরথপুর হাইস্কুলের টিচার। অবশ্য সবই বাবার উদ্যোগে হয়েছে বলতে পারেন। ওই স্কুলটা ঠাকুর্দা করে যান। তারপর দুই-পুরুষ ধরে আমরা ছেলেধরা হয়ে লড়ে গেছি।

প্রিয়নাথ বলল—সে সব শুনেছি।

কে বলল? গগন?

না। অন্যলোকের কাছে। গগন আমাকে একটা অদ্ভুত গল্প শোনাচ্ছিল।

ধরিত্রীঠাকরানের গল্প?

হ্যাঁ। খুব অদ্ভুত লাগল।

মৃগাঙ্ক সিগারেটটা স্রোতে ফেলে দিয়ে বলল—গগন খানিকটা বাড়াবাড়ি নিশ্চয় করেছে। ও তাই করে। ওসব তন্ত্রমন্ত্র ডাইনিটাইনিতে আমার কোনকালেই বিশ্বাস নেই মশায়। ভাবতে পারেন—একটা মেয়ে স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে এলাকার লোককে ভয়ে চুপ করিয়ে রাখল সারাজীবন? এখনও তার জের মেটেনি। এখনও শুনবেন ধরিত্রীর ভূতটা সমানে জ্বালাচ্ছে। সেদিন বালক মণ্ডলের বউকে ভূতে ধরেছিল। ধরিত্রীর নাম বলেছে নাকি! ..... মৃগাঙ্ক হো হো করে হেসে উঠল।

ধরিত্রীর তো মেয়ে রয়েছে। কুসুম না কী যেন নাম।

এ্যাঁ? হ্যাঁ, কুসমি।

একটু আগে ওপারে গেল দেখলাম, এই নৌকোয়।

মৃগাঙ্ক চমকে উঠল যেন। —তাই বুঝি?

গগন বলল। তা না হলে আমার চেনার কথা নয়। মেয়েটি গগনকে বাবা বলল শুনলাম।

ধরিত্রীর সঙ্গে নাকি গগনের সম্পর্ক ছিল। পুলিশ একসময় গগনকে যখন-তখন ধরে নিয়ে যেত। বাবা না থাকলে গগনেরও জেল হত।

কার্তিকের সকালে নদী আর ওপারের গাছপালা জীবনের কী একটা ব্যাপার নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে—প্রিয়নাথের এরকম লাগে। দূরে বাঁকের দিকে বাবলাবনে তখনও মনে হচ্ছে কুয়াশার আলোয়ান রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। কোথায় ঘুঘু ডাকছিল। প্রিয়নাথের মগজে কুরে-কুরে বসতে থাকল সেই ডাকটা। কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে।

কী ভাবছেন? মৃগাঙ্ক ডাকে।

প্রিয়নাথ তাকায়।

খারাপ লাগছে না তো?

কী?

আমাদের লাইফটা এখনও বেশ প্রিমিটিভ। চাষবাস জল-জঙ্গল নিয়ে থাকি। মাঝে মাঝে ভৈরব ঠেলে চলে যাই পদ্মার দিকে। চরে কাটিয়ে আসি। আপনাকেও নিয়ে যাব'খন। দেখবেন।

মাঝারি গড়নের নদী। কিন্তু স্রোতের টান থাকায় বেশ খানিকটা ভাটিয়ে যায় খেয়ানৌকোটা। তারপর লগির খোঁটা মেরে ধারে-ধারে উজান বেয়ে ঘাটে পৌঁছয়। সাদা দুধের সরের মত মাটি। কাদা হয় না। প্রথমে লাফ দিয়ে নামে মৃগাঙ্ক। তারপর হাত বাড়িয়ে দেয়—ধরুন।

প্রিয়নাথ তার হাত ধরে পাড়ে নামে। ঘেটেল বলে—বাবুদাদা, সিগারেট দিয়ে যান।

মৃগাঙ্ক একটা সিগারেট দিতে থাকে ওকে। ততক্ষণে প্রিয়নাথ সোজা গিয়ে বাঁধে ওঠে। বাঁধ থেকে এত বিস্তৃত ল্যান্ডস্কেপ নজরে পড়ছিল। কোথাও-কোথাও কাচের টুকরোর মতো জলা—বাদবাকি সবুজ—কোথাও কিছু হলুদ নিবিড়তা। পাটক্ষেতের ওপর কুয়াশা লেপটে আছে। কোথাও কিছু মানুষ। এই বিশাল রহস্যময় দুর্গম পৃথিবীতে তাদের তুচ্ছ লাগছিল।

চলুন। মৃগাঙ্ক এসে যায়। তারপর দক্ষিণ দিকে বাঁধ ধরে হাঁটতে থাকে দুজনে—মৃগাঙ্ক আগে, পিছনে প্রিয়নাথ।

বাঁধের ওপাশে গভীর নয়ানজুলি। কালো পাটপচা জলের আঁশটে গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারে। পাটের জাগ দেওয়া হয়েছে সেখানে। ওপরে কচুরিপানা আর ঘাসের চাবড়া। একটা-দুটো বাঁশের খুঁটিতে মালিকানার চিহ্ন। আবার খানিকটা ফাঁকা—সেখানে প্রচণ্ড কালো জল। কীসব পোকামাকড় ভনভন করে উড়ছে। নয়নজুলির পাড়ে রাশীকৃত সাদা পাটের স্তূপ। চলতে-চলতে মৃগাঙ্ক বলে—একবার চাঁদনী রাতে এখানটায় ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। ভুট্টা লাগানো ছিল সাত বিঘে জমিতে। শুওরের উপদ্রব হত। অগত্যা একটা মাচা বেঁধে ওপরে ছাউনি দিয়ে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। রাত আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তাম। একা। সারাটা রাত দড়ি টেনে টিনে ঢনঢন আওয়াজ করা ছিল কাজ। তখনও বন্দুক পাইনি। তা একরাতে নদী পেরিয়ে এখানটা আসতেই আমি হতভম্ব! মুসলমানদের মড়া কবরে দেওয়ার আগে দলবেঁধে নমাজ পড়ে দেখেছেন? হঠাৎ দেখি, চাঁদনি রাতে ওই জমিটায় হাজার-হাজার লোক মাটিতে মাথা গুঁজে নমাজ পড়ছে। কোন শব্দ নেই। আর—ওরা মাটিতে মাথা গুঁজে পড়ে আছে তো আছেই। বয়স ছিল কম। মনে হল, এই লোকগুলো মাথা তুলে আমাকে দেখতে পেলেই একটা কিছু করবে যেন। অযৌক্তিক ভয়!...মৃগাঙ্ক খিকখিক করে হাসল।

তারপর টের পেলাম সাদা-সাদা জিনিসগুলো পাটকাঠি। এমনি করে কতকিছু দেখেটেখে শিখেছিলাম—আসলে অলৌকিক বলতে তেমন কিছু পৃথিবীতে নেই। সবই লৌকিক।

হ্যালুসিনেশন! প্রিয়নাথ মন্তব্য করে।

একজ্যাক্টলি! হ্যালুসিনেশন! এই জঙ্গলে মাঠ আর বিলে কত রাতে যে অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখেছি, ভাবতে পারবেন না। কতসব অদ্ভুত আলো—হাউই। এমনকি নানারকম আজগুবি আওয়াজ। একবার কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছিল। ডেকে-ডেকে একসময় থেমে গেল। একবার একটা লোককে পাটকাটা চোর ভেবে সারা মাঠ পিছনে দৌড়লাম—বিলের জলে গিয়ে সে ডুবে গেল।

ডুবে গেল? সে কী!

তাছাড়া কী বলব? স্বপ্নে আপনি যা দেখেন, তা বর্ণনা করতে পারেন? মানুষের ভাষা নেহাত একটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর বন্দোবস্ত। সব ব্যাপার প্রকাশ করা যায় না। মানুষ নিজের হাতে যা সব বানিয়েছে, তার প্রায় সবটাই সে বর্ণনা করতে পারে। যা বানায়নি, তা পারে না। আপনি ক্লেয়ার ভয়েন্স মানেন?

ভেবে দেখিনি।

আমাদের একটা কুকুর ছিল। সে বাড়ির বাইরে পাঁচিলের আড়ালে কেউ এলেও টের পেত। যাক্, সে একসময় হবে। তবে একবার সত্যি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলাম, বুঝলেন?

ভূত নাকি? প্রিয়নাথ হাসে।

না। ধরিত্রী। ওইখানটায় একটা খাল আছে। সে ডুব দিচ্ছিল আর কী তুলে খাচ্ছিল তলার পাঁক থেকে। পাটবনের ভিতরে লুকিয়ে দেখছিলাম। আমার বয়স তখন এগারো-বারো। মনে হচ্ছিল, ওর কষায় রক্ত দেখতে পাচ্ছি। একটু পরে সে পুরো উলঙ্গ অবস্থায় উঠে এল জল থেকে। ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলুম।

কী খাচ্ছিল?

সেটাই তো বুঝতে পারিনি। এখনও ধাঁধা লাগে ব্যাপারটা। আসুন, এখানে নামতে হবে আমাদের। বাঁধটা বাঁক নিয়ে পশ্চিমে ঘুরল। নদীর সমান্তরাল। নদী ও বাঁধের মধ্যে বড়বড় গাছপালা আছে।

মাঠের দিকে নেমে আলপথে ওরা হাঁটতে থাকে। বুকসমান উঁচু তেজী ধারাল পাতা চিতিয়ে আখখেতগুলো তলোয়ারধারী যোদ্ধাদের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথাও শূন্য আউশের ক্ষেতে হলুদ ভিজে নাড়ার ওপর বক চরছে। শামুকগুলো রোদ পোহাচ্ছে। একটা খেঁকশিয়াল কী খাচ্ছিল। দেখামাত্র পাটবনে গিয়ে ঢুকল। ওরাও এবার পাটবন পেরোতে থাকে। সরু আল ধবধব করছে—তার বুকে ছায়ার কাটাকুটি নক্‌শা কেন্নুইনগুলো বিড়ে পেতে কেউ, কেউ গুটিসুটি হাঁটছে। পাট প্রায় আটফুট উঁচু। কালো-কালো ফল ধরেছে ইতিমধ্যে—কিছু ফল এখনও সবুজ। ততক্ষণ কোন কথা হয় না। শিশিরে জামা ভিজে যায় দুজনেরই।

ফাঁকায় পৌছে মৃগাঙ্ক বলে—ওই ঢিবিমতো জায়গাটা দেখছেন—ওটার পিছনে একটা জলা আছে। দুচারটে হাঁস প্রায়ই দলছুট হয়ে বিল থেকে চলে আসে ওখানে। দেখা যাক্। আর সিগারেট খাবেন নাকি? এরপর কিন্তু কিছুক্ষণ এমার্জেন্সি মশাই—নো স্মোক।

দিন। আমারও আছে অবশ্য।

থাক্। নিন। মৃগাঙ্ক সিগারেট দেয়। লাইটার বের করে জ্বালে। প্রিয়নাথেরটা ধরিয়ে দিয়ে বলে—বলেছিলাম গামবুট নিন। কথা শুনলেন না।

আপনি তো নেননি।

অভ্যেস। এই বুনো মাটিতে অনেক হেঁটেছি খালি পায়ে। তবে মশাই—কিছু যদি মনে না করেন, জুতোদুটো আপনার জিম্মায় রেখে আমি কাজে নামব।

ঠিক আছে।

নাকি আপনিও একটু আধটু থ্রিল নিতে চান? ছোটাছুটি করবেন?

মন্দ কী! ভালো লাগবে। গ্র্যান্ড! তাহলে প্যান্ট গুটিয়ে ফেলুন। জামা খুলুন। দেখুন—আমি যা-যা সব করি। গায়ে কাদা লাগতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে কিংবা বুকে হেঁটে এগুতে হয় অনেক সময়। আর একটা কথা বলে দিই। খুব দেখেশুনে হাঁটবেন। সাপটাপ দেখা দিতে পারে। ঘাবড়াবেন না। পাথরের টুকরো ভাববেন নিজেকে—গায়ের ওপর যেতে দেবেন, যদি যেতে চায়।

প্রিয়নাথ একটু শিউরে উঠল। তবু ভাল লাগার টানে আমল দিল না সেই ত্রাসটুকু। শুধু বলল—একটা লাঠিফাঠি হাতে নেওয়া যায় না?

নিশ্চয়ই যায়। অবশ্যই। থামুন একটা ডাল কেটে আনছি।

কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা ছুরি বের করে এগোল মৃগাঙ্ক। ফাঁকা ঘাসের জমির ওপর ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছিল। প্রিয়নাথ চিনতে পারে গাছগুলো। বেত, নাটাফল, কুঁচ এইসব কাঁটাঝোপ। তাদের ফাঁকে একটা ছড়ালো ভাঁড়ুলে গাছ সবে মাথা তুলেছে। মৃগাঙ্ক হাত বাড়িয়ে একটা মোটা সরল ডাল নুইয়ে ধরে। ছুরির কোপ বসায়। তারপর নিয়ে আসে। পাতাগুলো কেটে ফেলে। বেশ একটা লাঠি হয়ে ওঠে। এগিয়ে দিয়ে বলে—নিন।

তারপর দুজনে প্যান্ট গোটায়। জামা খুলে ফেলে। বন্দুকটা মাটিতে পড়ে থাকে—ঘুমন্ত বাঘের পিঠ দেখলে ওইরকম টানটান লাগে। প্রিয়নাথের হাত নিশপিশ করে। কিন্তু হঠাৎ কেমন শূন্যতা তার মাথার খুলির মধ্যে টের পায়। দুচোখে কুয়াসা আর খাপচা-খাপচা সবুজ রঙ ভাসে।

কয়েকটা কার্তুজ পকেটে ভরে ঝোলা জামাকাপড় জুতো মৃগাঙ্ক নিয়ে যায় সেই ঝোপে। রেখে এসে বলে—চলুন! নেমে পড়া যাক।

প্রিয়নাথ একটু সংশয়ী হয়ে বলে—কেউ নিয়ে পালাবে না তো?

না। চলুন। এদিকে বড় একটা আসে না কেউ।

ফের একটা পাটবন পেরিয়ে ঢিবির কাছে পৌছয় ওরা। তারপর মৃগাঙ্ক বলে—সচরাচর আমি উড়িয়ে দিয়ে গুলি করি। তাতে রিস্ক কম। জলাটা যা জঙ্গুলে। ঠিকমতো বাগে পাওয়া যায় না—এম করা কঠিন। আপনি কিন্তু লক্ষ রাখবেন মশাই। শিকার কুড়োনোরও যথেষ্ট আনন্দ আছে।

ঢিবিটা কাঁটাঝোপে ভর্তি। কাশঝোপও রয়েছে। ফুলেফুলে ভরা। বাঘনখার গাছ আছে কিছু। আকন্দঝাড় ধরে অনেক কষ্টে প্রিয়নাথ ওঠে মৃগাঙ্কের পিছনে। এখনও শিশির শুকোয়নি। ঘাসের ফুলে

দুজোড়া রোমশ পা ভরে যায়। পোকা কুটকুট করে। আর অনবরত মাকড়সার ভিজে জাল মুখে বুকে জড়িয়ে যায়। কোন জালে শিশিরের ফোঁটা টলটল করে। অস্বস্তি কিংবা ত্রাসে গা ঘিনঘিন করে প্রিয়নাথের। টিবিটা যেখানে শেষ হয়েছে, নিচে একটা জলার শুরু। নানারকম দামে তার জল ঢাকা। দামের ওপর শোলার ঝাড় গজিয়েছে। প্রিয়নাথ কিছু দেখতে পায় না। মৃগাঙ্ক তার ঘাড়ে হাত রেখে বসতে ইশারা করে। তারপর উপুড় হয়ে ঘাসের মধ্যে সে সাপের মতো এগোতে থাকে। বন্দুকটা ঘাসে ডুবে থাকে। প্রিয়নাথ দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করে। কিছু দেখতে পায় না সে। একটা জলপিপি পিঁপিঁ করে উড়ে যায় হঠাৎ। অনেকটা দূরে একটা হিজলের গাছে থরে-বিথরে সাদা বকের ঝাঁক দেখতে পায়। মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় প্রিয়নাথ কুসুমের কথা ভাবে। চেহারা ও শরীরটা ভোলা যায় না। কী যেন আছে। ওই চোখে, ওই শরীরে—পৃথিবীর খুব পুরনো ব্যাপার।

হঠাৎ বন্দুকের শব্দ হয়। আচমকা এই শান্ত নির্জন নিসর্গ ছত্রখান হয়ে পড়ে। বারুদের গন্ধে বাতাস কটু হয়। আঁক-আঁক চিৎকার আর ডানার শব্দ খুব কাছেই মাথার ওপর শুনে প্রিয়নাথ মুখ তোলে ফের বন্দুকের শব্দ হয়। একটা ঝড় বইতে থাকে যেন। দূরে হিজল থেকে বকগুলো উড়ে পালায়। জলপিপির ডাক শোনা যায়। কোথায় হট্টিটি পাখি চেঁচিয়ে ওঠে ট্রি ট্রি ট্রি ... ট্রি ট্রি ট্রি। মৃগাঙ্কের গর্জন শোনা যায়—প্রিয়বাবু! দেখুন—দেখুন! লক্ষ রাখুন!

কিছু না ভেবেই প্রিয়নাথ ওঠে। একটা হাঁস বাঁদিকে পাটক্ষেতের ধারে পড়ে ডানা ঝটপট করছে। আরেকটা পাটক্ষেতের ওপরে কোথায় হঠাৎ নেমে গেল। সে প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে টিবি থেকে ঝাঁপ দিয়ে দৌড়তে থাকে। সামনের হাঁসটা ধরে ফেলে। তার ঠোঁটের ফাঁকে রক্ত। হাঁসটা নিয়ে সে মৃগাঙ্কের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। মৃগাঙ্ক ইশারা করে—ওদিকে, ওদিকে!

হ্যাঁ—সেই হাঁসটা। প্রিয়নাথ পাটবনে ঢুকে পড়ে। হাঁফাতে-হাঁফাতে দৌড়বার চেষ্টা করে। বনচড়াইয়ের ঝাঁক ফর-ফর করে উড়ে পালায় মাথার ওপর। একহাতে হাঁস, অন্যহাতে সবুজ পাটগাছ ঠেলে-ঠেলে সে হাঁটে।

কিন্তু পাটবন শেষ হতে চায় না। কতদূর, কতদূর। একটা বেজি দৌড়ে পালাল। একটা ঢ্যামনা সাপ সরসর করে চলে গেল বাঁদিকে। দম আটকে আসছিল প্রিয়নাথের। সামনে একটা শেয়াল নীল জ্বলজ্বলে চোখে তাকে একটুখানি দেখেই সরে গেল। অস্বস্তিতে অস্থির হচ্ছিল সে। ভুল করে ঘুরে মরছে না তো? সে বাঁদিকে ঘুরল।

একটু পরেই ফাঁকা একটা জমিতে গিয়ে পড়ে সে। প্রায় এক একর জায়গার পাট কেটে নেওয়া হয়েছে। একদিকে বাবলাবন, বাকি তিনদিকে পাটক্ষেত। বাবলাবনের দিকেই আন্দাজে এগোয় প্রিয়নাথ। হাঁসটা খুঁজে পাওয়া যাবে না আর। অসম্ভব। এখন সেই টিবিতে ফিরে যাওয়াই এক সমস্যা। নরম মাটিতে নিজের পায়ের দাগ লক্ষ করে ফেরা যায়। কিন্তু অস্বস্তি হচ্ছে ফের পাটবনে ঢুকতে। দম আটকে এবার মরেই যাবে।

বাবলাবনের কাছে এসে সে ভাবল, চেঁচিয়ে মৃগাঙ্ককে ডাকবে। মৃগাঙ্ক এসে তাকে নিয়ে যাক। এ এক বিশ্রী ব্যাপার হল দেখা যাচ্ছে। নাঃ, আর শিকার দেখতে আসবে না সে।

প্রিয়নাথ বুক ভরে দম নিয়ে ডাকতে গিয়েই থেমে যায়। তার হৃৎপিণ্ডে রক্ত আচমকা ছলাৎ করে ওঠে। ডানদিকে পাটবনের ধারে দাঁড়িয়ে আছে ধরিত্রীর মেয়ে কুসুম। তার একহাতে একটা কাটারি, অন্যহাতে সেই হাঁসটা। সে প্রিয়নাথকে দেখছে নিঃশব্দে।

এমন নিষ্পলক চোখ প্রিয়নাথ কখনও দেখেনি। দেখেনি কোনদিন এমন নির্জনে গোপনে সহস্রকোষী প্রাণীর মতো একটি প্রতীক্ষা—যার প্রতিটি শেষে উজ্জ্বল ফসফরাসের ক্রূর অভিসন্ধি।

আর সম্পূর্ণ চবচবে ভিজে শরীরে দাঁড়িয়ে আছে কুসুম। খুব পাতলা স্বচ্ছ কাপড় চামড়া বা মাংসের ভাঁজসমেত শরীরকে ঠেলে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে যেন। হ্যাঁ—ব্রেসিয়ার বা জামা কিছুই গায়ে নেই ওর। দুটো স্তন, ঈষৎ ডিমালো, স্পষ্ট এবং লজ্জাশূন্য। ওর দুই উরু অকপট, সন্ধিস্থলে রক্তাক্ত ধূসর হাঁসটা ঝুলছে; যার ফলে প্রিয়নাথের মনে হয় কিছু আব্রু রক্ষা পেয়েছে। বাহু দুটো রসাল ফুটির মতো। প্রিয়নাথ বাঘ হতে পারলেও এই আদিম বনভূমিতে কিছু ঘটত কিনা বলা যায় না। ফের যখন

চোখে চোখ পড়ল, প্রিয়নাথ নিজের খুলির মধ্যে একটা নীল বিদ্যুৎ ঝলসাতে দেখল। চোখের সামনে ছোপছোপ সবুজ রঙের ওপর কীরকম কালো কালো ধ্যাবড়া দাগ পড়ল। এবং হঠাৎ বালকের মত ভয় পেল প্রিয়নাথ!

সে ঘুরল অন্যদিকে। সারা শরীর ঠাণ্ডা আর ভারি মনে হচ্ছিল তার। সেই সময় কানে এল,—বাবু হাঁসটা নেবেন?

প্রিয়নাথ দাঁড়িয়ে গেল।

ইচ্ছে হলে নিয়ে যান।

প্রিয়নাথ ঘুরে বলে—তাহলে ধরলে কেন?

কুসুম হাসল একটু। —সামনে পড়ল, তাই ধরলাম। মৃগাঙ্কবাবুর হাঁস আমার হজম হবে না। নিয়ে যান।

প্রিয়নাথ ঘামে। আর ইতস্তত করে বলে—থাক। ধরেছ যখন, তুমিই নাও।

বাবু, আপনার কপালটা দেখি!

হঠাৎ তাকে কাছে আসতে দেখে প্রিয়নাথ অবাক হয়। তার বুকের মধ্যে হাজার-হাজার পাথর গড়িয়ে পড়ে। সে অস্থির হয়ে বলে—কী আছে কপালে?

কুসুম ভুরু কুঁচকে ওর দিকে এমনভাবে তাকায় যে প্রিয়নাথের প্রচণ্ড অস্বস্তি লাগে।

কুসুম ঠোঁটের কোণে হেসে বলে—আপনার নাম কী শুনি?

কেন? নাম নিয়ে কী হবে?

আহা, বলুন না!

প্রিয়নাথ।

প্রিয়নাথ?

হ্যাঁ।

বললে রাগ করবেন নাতো?

না। কী বলবে?

আপনার জন্মের সময়টা খুব অপয়া ছিল। (আকাশে আঙুল তুলে) ঠিক ওইখানটায় চাঁদ ছিল—ঈশান কোনায় একটা প্যাঁচা ডেকেছিল, বায়ু কোনায় একটা শিয়াল ডেকেছিল। আপনার মায়ের প্রসব-যন্ত্রণার সময় সাপে ব্যাঙ ধরেছিল। টিকটিকির লেজ খসে পড়েছিল। আর শুকনো ডালে কামিখ্যের ডাকিনী এসে বাতাসের সুরে গান করেছিল। আর শুনবেন বাবু?

এবার সব অস্বস্তি দূর হয়ে হাসি পায়। প্রিয়নাথ হাসি চেপে বলে—হুঁউ। আর কী হয়েছিল?

কুসুম মাথা দোলায়। এখন সব বলা যাবে না। আমার আখড়ায় যাবেন—সব বলব।

বেশ, তাই যাব। পয়সা লাগবে নাকি?

আপনি নতুন মানুষ, লাগবে না।

ভালো। যাব!

বাবু, আপনি এদেশে কেন এলেন?

আসা ঠিক হয়নি বুঝি?

না। আপনি এসেছেন বলে দেশে আকাল লাগবে। ঈশান কোনায় প্যাঁচা ডাকবে—বায়ুকোনায় শেয়াল। টিকটিকির লেজ খসে পড়বে। সাপে ব্যাঙ ধরবে। কামিখ্যের ডাকিনী এসে বাতাসের সুরে কথা বলবে। বাবু, আপনি অপয়া।

হাসতে গিয়ে সামলে নেয় প্রিয়নাথ। গম্ভীর হয়। বলে—তুমি সব দেখতে পাও বুঝি?

হ্যাঁ, পাই। বাবু, আমার চোখের দিকে তাকান।

প্রিয়নাথ তাকানোর চেষ্টা করে।

কী দেখছেন?

দুটো চোখ।

আরেকটা চোখ দেখতে পাচ্ছেন না?

ভ্যাট্! প্রিয়নাথ বিরক্ত হয় এবার।

আপনার মধ্যে আঁধার জমে আছে বাবু। যাবেন আমার ঘরে, দেখিয়ে দেব। আমি ওই চোখে সব দেখতে পাই। আপনার পিছনে—

প্রিয়নাথ চমকে ওঠে।

আপনার পিছনে ছায়া চলছে বাবু, সাবধান। ঐ ছায়া সাপ হয়ে আপনাকে দংশাবে। প্রিয়নাথ পা বাড়ায়। বেশ মজার ব্যাপার করা গেল এতক্ষণ। মৃগাঙ্ক অপেক্ষা করছে। হয়তো ভাবছে তার জন্যে।

বাবু, আপনি কেন এসেছেন এদেশে?

আমার ইচ্ছে। বলে প্রিয়নাথ হাঁটতে থাকে ফাঁকা জমিতে।

আপনার ইচ্ছে মিটবে না, ফিরে যান।

আচ্ছা, যাব।

মৃগাঙ্কবাবু সহজ মানুষ নয় বাবু, সাবধান।

প্রিয়নাথ ফের চমকে উঠে পিছন ফেরে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে সারা শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে তার। মাথার ভিতরে নীল আগুনের হল্কা ছুটে যায়। কিন্তু কুসুম অদৃশ্য। একেবারে মুছে গেছে সে।

অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে প্রিয়নাথ। ভারি আশ্চর্য তো! কাছাকাছি কোন ঝোপঝাড় নেই। দশ-বারো হাত দূরে পাটক্ষেত। ওখানেই ঢুকেছে সম্ভবত। সে পাটক্ষেতটার ডগা লক্ষ করতে থাকে। কেউ চললে ডগা দুলবেই। পাখির ঝাঁক উড়বে। কিন্তু না—তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

প্রিয়নাথ টের পেল, সে প্রচণ্ড ঘেমেছে। এতক্ষণ কী একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল হয়তো। তার মনে হয়, হাতের এই গুলিবিদ্ধ হাঁসটার মতো তার শরীরও অন্য কার বিশাল হাতে ঝুলছে। একটা সবুজ ব্যাপকতা তীব্র চেতনায় জরজর হয়ে তাকে ঘিরেছে এবং কোটিকোটি চোখ দিয়ে তাকে দেখছে। প্রিয়নাথ নিজেকে বোঝাল, এত অকারণ নার্ভাস হয়ে পড়ার কী আছে! বস্তুত এও কতকটা মৃগাঙ্কবাবুর মতো হ্যালুসিনেশন ছাড়া কিছু নয়। সে পিশাচী ডাইনি ইত্যাদির গল্প অনেক শুনেছে এখানে এসে। পিশাচীরা আবার কেউ বউ সেজে থাকে এবং মড়া কচমচিয়ে খায়। ভাগ্যিস, কুসুম হাঁসটা কচমচ করে চিবুচ্ছিল না।

প্রিয়বাবু!

প্রিয়নাথ দ্রুত ঘোরে। মৃগাঙ্ক বন্দুক হাতে পাটবন ঠেলে বেরিয়ে এল।

পেলেন?

না।

ওদিকে কী দেখছিলেন এতক্ষণ?

আপনাদের কুসুমকে।

মৃগাঙ্ক ভুরু কুঁচকে তাকায়। —কুসমি? এখানে কী করছিল মাগী?

হাঁসটা ধরে ফেলেছে। আর..

মৃগাঙ্ক পা বাড়িয়ে বলল—হাঁসটা ধরেছে? চুন্নির সাহস তো কম নয়! কেড়ে নিলেন না কেন?

প্রিয়নাথ পাংশুমুখে হাসল। —কী সব অদ্ভুত কথা বলছিল। কোন মানে হয় না। শেয়াল প্যাঁচা সাপ ব্যাঙ ডাকিনী—আরও কী সব।

আপনিও যেমন! ওতেই তাক লাগিয়ে কেটে পড়ল? আসুন তো দেখি।

মৃগাঙ্ক যেভাবে পা বাড়ায়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিয়নাথ তাকে অনুসরণ করে। মৃগাঙ্ক ফের বলে—কোনদিকে গেল?

দেখিনি। এই যে, এখানে দাঁড়িয়েছিল, তারপর চলে আসছিলাম তখন ডাকল।

ঘাসগুলো জলে চবচব করছে এখানে। কেউ একটু আগে দাঁড়িয়েছিল, তার ছাপ আছে। ঘাসগুলো শুয়ে পড়েছিল—সবে সোজা হতে শুরু করেছে। একটা শীষালো ঘাস তড়াক করে সোজা হতেই প্রিয়নাথ শিউরে উঠল।

ঝুঁকে পড়ে কুসুমের গতিপথ খুঁজছিল তীক্ষ্ণদৃষ্টে মৃগাঙ্ক। মনে হচ্ছে যেন বাঘটাঘের ব্যাপার। তাব মুখটা লাল টকটক করছে। আর কার্তিকের রোদ এবার খর হয়েছে। দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে। প্রিয়নাথ বলে—খুব আশ্চর্য লাগল। চোখের পলকে মুছে গেল মেয়েটি! কোন লজিক খুঁজে পাচ্ছিনে।

হুঁ, লজিক থাকে না ওর বেলা। মৃগাঙ্ক ঘাসের অবস্থা লক্ষ করতে-করতে হাঁটে।

মৃগাঙ্কবাবু!

উঁ?

ছেড়ে দিন।

ছেড়ে দেব কী বলছেন মশাই! একটা ছররার দাম কত হয়েছে জানেন?

প্রিয়নাথের মনে হল, মৃগাঙ্কর অন্য কোন ব্যাপারে গভীর রাগ আছে নির্ঘাত। মৃগাঙ্ক পাটক্ষেতের দিকে এগোচ্ছে তখন। বড্ড বাজে ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে সে।

প্রিয়নাথ বলে—চলে আসুন!

মৃগাঙ্ক অস্ফুটে চেঁচিয়ে ওঠে—এই দেখুন, এই দেখুন!

কী?

পায়ের দাগ।

পাটক্ষেতটা এখানে আচমকা বাঁয়ে ঘুরে গেছে। দু-মিটার জায়গা কোনাকুনি পাট ঠেলে এগিয়ে মৃগাঙ্ক গর্জে উঠল—এ্যাই কুসমি!

প্রিয়নাথ দৌড়ে গেল। ওপাশে ব্যানাকাশের জঙ্গল রয়েছে। পাঠক্ষেতের আলের নিচেই একটা মস্তো গর্ত। সেখান থেকে কুসুম লাফিয়ে উঠেছে। খরগোসের মতো কয়েকটি লাফে ওদিকে আখের খেতে সে ঢুকে গেল।

মৃগাঙ্ক বন্দুক তুলেছিল। হাসতে-হাসতে নামাল! —দেখলেন কাণ্ড? মাগীর সত্যি কোন তুলনা নেই!

প্রিয়নাথও হাসে। —আমি ভাবছিলাম..

গর্তে বসে হাঁসটা কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছে?

সেইরকম কিছু।

হ্যাঁ, তাতেও অবিশ্বাস্য কিছু নেই ওর পক্ষে। মাংসের লোভ ওর প্রচণ্ড।

দুজনে খড়ের জঙ্গলটা পেরিয়ে অনেকটা ঘুরে ঢিবিতে পৌছল। মৃগাঙ্ক জামাজুতোর পুঁটলিটা সবসুদ্ধ ব্যাগে ঢোকাল। প্রিয়নাথ হাত বাড়িয়ে সেটা নিল। কাঁধে ঝোলাল।

মৃগাঙ্ক ভুরু কুঁচকে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। গোঁফটা একবার সযত্নে পাকিয়ে নিয়ে বলল—আসুন, আজ আর হাঁসটাস হবে না। হরিয়াল বা ঘুঘু পাই নাকি দেখা যাক্।

খালের ধারে-ধারে ওরা হাঁটে। পশ্চিম-দক্ষিণে এগিয়ে যায়। একটু পরে মৃগাঙ্ক বলে—ওই গাছপালার জটলা দেখছেন, এখানটা হল আমলাবাগ। আমলাবাগের নাম শোনেন নি?

শুনেছি মনে হচ্ছে।

লালগোলার মহারাজাদের পূর্বপুরুষ ভৈরবের পাড়ে বাহান্ন একর জায়গায় আম কাঁঠাল লিচুর বাগান করেছিলেন। পরে দেখাশোনার অভাবে সব জঙ্গল হয়ে যায়। জন্তু-জানোয়ার এসে জোটে। বাঘ শুওর হায়না—কতরকম। ভালো জাতের আম ফলত একসময়। এখন উচ্ছন্নে গেছে। অনেক কেটে বিক্রি করা হয়েছে যুদ্ধের সময়। আমার ঠাকুর্দার আমলে নাকি একজোড়া হরিণও ছাড়া হয়েছিল। তাছাড়া হাজারটা ভূতের গল্প আছে। এমন এলাকা বাংলাদেশে আর নেই, মশাই। শুধু ভূত, ডাইনি, পিশাচী আর অলৌকিক ব্যাপারের রাজত্ব। আসলে—আমার মনে হয়, এখানকার মানুষ কোন অজ্ঞাত কারণে বড্ড বেশি রোমান্টিক আর কল্পনাপ্রবণ। আমলাবাগের ওদিকে একটা গ্রাম আছে শিমুলিয়া। সে গাঁয়ে সবাই ভূতের ওঝা আর তান্ত্রিক। বেলায়-বেলায় বউঝিদের পটাপট ভূতে ধরে। আবার ছেড়ে দেয়। একদিন নিয়ে যাব—দেখবেন। তাক লেগে যাবে। তবে আমলাবাগে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি টের পেয়েছিলাম। ভাবতে গা শিউরে ওঠে।

কী?

একটা আশ্চর্য গন্ধ। মোটামুটি এলাকার সবরকম ফুলের গন্ধই আমার জানা। গাছপালাও চিনি। কিন্তু কোন-কোন সময় ওখানে একটা সুগন্ধ মাত্র দু-এক মিনিটের জন্যে—হ্যাঁ—এক বা দুমিনিট বড় জোর এসে আবার মিলিয়ে যায়। গন্ধটা খুবই অচেনা। অনেক খুঁজে তেমন কোন গাছ বা ফুল দেখতে পাইনি। আর গন্ধটা পেলে একটা দারুণ রিঅ্যাকশন ঘটে যায়। একরকম অস্থিরতা—উত্তেজনা!

প্রিয়নাথ একটু চুপ করে থাকার পর বলে—আমার পিসেমশাই-এর বাড়ি বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে। বনেদি বড় গ্রাম। পাশে কুনুর নদী আছে। মাইল দুই উত্তরে অজয়ের সঙ্গে মিলেছে। ওখানেই কোগ্রাম—কবি কুমুদরঞ্জনের বাড়ি। তা—ওই কুনুরের পাড়ে একটা বড়ো জঙ্গুলে বাগান দেখেছি—লোকে বলে আতরের বন। কেন জানেন? ওখানে কোন-কোন সময় আতরের গন্ধ পাওয়া যায়।

আপনি পাননি?

হুঁ-উ। তখন আমার বয়েস চৌদ্দ-পনের হবে। ভীষণ রোমান্টিক স্বভাবের ছিলাম।

এখন আপনার বয়েস কত হল?

কী মনে হয় আপনার?

আমার চেয়ে অনেক ছোট আপনি। আমার ছত্রিশ হয়েছে।

আমি আপনার চেয়ে ছ-সাত বছরের ছোট।

মৃগাঙ্ক পিছু হটে ওর কাঁধে হাত রাখে। —মাই ইয়ংগার ব্রাদার! হুঃ—তাহলে তো মুখখিস্তি করতে বাধবে মশাই!

প্রিয়নাথ বলে—না, স্বচ্ছন্দে।

সেই বাঁধে গিয়ে ওঠে ওরা। তারপর মৃগাঙ্ক হঠাৎ বলে—কুসমিকে দেখে তাহলে খুব হকচকিয়ে গিয়েছিলেন?

না তো। কেন?

ইচ্ছে হয়?

কিসের?

ওকে পেতে?

প্রিয়নাথ আচমকা সোজা হয়—বাঘ চলে যাওয়ার পর ব্যানার নুয়ে পড়া শীষ যেমন সাঁৎ করে ওঠে। সে বলে—যান! কী যে বলেন! ভ্যাট্!

গত খরায় এক অফিসার এসেছিলেন আপনার বয়সী। টিউবেল নিয়ে সেচের ব্যাপারে এনকোয়ারি করতে। তিনি কুসমির প্রেমে পড়ে যান।

তারপর?

তার পর কিছু নেই। প্রায়ই ওর বাড়ি গিয়ে বসে থাকতেন। উপলক্ষ বউয়ের দুরারোগ্য ব্যাধির ফয়শালা। যদ্দুর জান, কুসমি ওঁকে একগোছা চুল কাঠিতে জড়িয়ে দিয়েছিল নাকি। জলে চুবিয়ে জলটা বউকে খাওয়াতে বলেছিল।...

মৃগাঙ্ক হো হো করে হেসে উঠল।

প্রিয়নাথের মন বিরূপ হয় মৃগাঙ্কের প্রতি। সে কোন কথা বলে না। তার এতক্ষণে মনে হয়, মৃগাঙ্ক তার প্রতি তুখোড় বসের মতো আচরণ করছে। সে মৃগাঙ্কের কৃষিখামারে নতুন ট্রাকটর আর কিছু হার্ভেস্টার কম্বাইনের সঙ্গে নতুন আমদানি কর্মচারী—নিতান্ত ট্রাকটর চালক। তাকে বন্ধুভাবে নিল, বলেছিল মৃগাঙ্ক। নিয়েছে কি? মনে হচ্ছে—কুকুর-বেড়ালের সঙ্গে মৃগাঙ্ক খেলছে। চোয়াল শক্ত হয়ে যায় প্রিয়নাথের।

অবশ্য আর কী বা প্রত্যাশা জীবনে করার আছে তার? ডাক্তারের ছেলে—ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হবে—হয়নি। হয়েছিল নিতান্ত কারিগর। তবে তার এক্সপার্ট হিসেবে একটা উপাধি জুটেছিল এই যা! মৃগাঙ্ক সেই মর্যাদাটুকুও যেন আর দিচ্ছে না। দুঃখিত প্রিয়নাথ দূরে ও কাছে সবুজগুলো দেখতে থাকে।

সেই সময় আন্দাজ পঞ্চাশ মিটার দূরে একটা বিশাল গাবগাছের (এ এলাকায় প্রচুর গজায়) তলায় কুসুমকে দেখতে পায়। এদিকে তাকিয়ে আছে। পরক্ষণে সে গাছটার ওধারে সরে যায়। মুছে যায়। প্রিয়নাথ মৃগাঙ্ককে সে খবর দিল না।..

ওখানে মা গঙ্গা, এখানে ইনি বাবা ভৈরব। এ নদীর এরকম পরিচয় দিয়েছিল গগন হালদার। মাঝখানে আঠারো মাইলের ছাড়াছাড়ি—সমান্তরাল দুটি প্রবাহ। গ্রীষ্মে দুজনেরই চেহারা এক। খড়িখড়ি ধূসর ছাইমাখা শান্ত সন্ন্যাসীর গড়ন। কালো স্বচ্ছ জলে অনেক শান্তি থাকে। কিন্তু ভৈরব পুরুষ। স্বয়ং রুদ্রদেব। তাই বর্ষায় চেহারা বদলে যায় দ্রুত। প্রচণ্ড গর্জন করে দুধারের মাটি থাবায় টেনে নেয়। গগন বলেছে—বর্ষায় বহরমপুরের ঘাটে গিয়ে দেখে আসুন। মা তখনও শান্ত হয়ে হাসছেন। আর এ ব্যাটার ক্ষ্যাপামি চূড়ান্ত।

কালুখাঁর দিয়াড় ছোট্ট গ্রাম তার পাড়ে। টিকে আছে এতদিন, এই আশ্চর্য। চাঁইমোড়ল, কিছু জেলে-কুনাই-ডোম-বাউরি আর কিছু মুসলমান সুখেদুঃখে বেঁচে আছে। মাটি উর্বর। সবুজে-সবুজে ভরা। তবু দারিদ্রের শেষ নেই। আম কাঁঠাল লিচু আর আউশ পাট রবিখন্দ ফলে প্রচুর। তবু ক্ষিদে মেটে না মানুষের। সপ্তায় একদিন ভাত খেতে পাওয়া ভাগ্যের কথা অনেকে বলে। গগন বলেছে—জোতজমি তো বেশি মানুষের নাই। তাই এ অবস্থা। ভূমিহীন খেটে খাওয়া লোকই শতকরা নব্বুইজন।

মৃগাঙ্ক শতকরা একজনের দলে। কিন্তু সে অনন্যসাধারণ মানুষ। দু'মাইল দূরে ভগীরথপুরে তার বাড়ি। এখানে কালুখাঁর দিয়াড়ের পাকা সড়কের নিচে দক্ষিণের বুড়ো মাঠটা নিয়েসে কৃষিকর্ম করছে গতবছর থেকে। অবশ্য মাঠের সবটাই তার জমি নয়। তার বাবা বঙ্কুবাবু আইন বাঁচিয়ে জমি রাখতে জানতেন। মৃগাঙ্কও কিছুটা জানে। আর সবুজ বিপ্লবের যুগে সে একজন 'কৃষিবীর' মোটামুটি—সরকারি সমর্থন তার দিকে প্রচুর।

মৃগাঙ্কের আরও অনেক ব্যাপার আছে। সে তার ঠাকুর্দার প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুলের সেক্রেটারি। আঞ্চলিক নানা কমিটিতে সে আছে। কিন্তু সেসব ব্যাপারে তার গরজ খুব কমই। খামার আর শিকার এই তার নেশা। নিজেকে সে 'প্রিমিটিভ' মানুষ বলে থাকে। সে গ্রাম্য রাজনীতি বরদাস্ত করে না। এড়িয়ে থাকে। একরোখা, বেপরোয়া মানুষ সে—কিন্তু সবার সঙ্গে সবার মতো হয়ে মিশতে জানে। অকৃপণ হতে খরচ করতেও পটু সে। খামার বাড়িতে প্রায়ই গান দেয়—অর্থাৎ যাত্রা, পাঁচালী, আলকাপ, বাউল। পুজোপার্বণ নানা উপলক্ষে মোটা চাঁদা দেয়। এর ফলে জনপ্রিয়তা সে অঢেল পেয়েছে। কিন্তু জনপ্রিয়তা তার কাম্য বলে মনে হয় না। নালিশ শুনলে রেগে বলে—মরগে যা। আমি কিছু করতে পারব না। এবং এসব সময় তাকে খুব স্বার্থপর মানুষ মনে হয়। মিটিঙে ডাকা হলে সে যায়। চুপচাপ সিগারেট টানে। মত চাইলে বলে—আপনার যা ভালো হয় করুন না। কোন অমত নেই। তারপব বেরিয়ে এসে মোটর সাইকেলে চাপে। সটান চলে আসে খামারে।

মৃগাঙ্ক বিয়ে করেনি। তার মা বউ দেখবার সাধ নিয়ে মারা যান, তাতে তার একটুও খারাপ লাগেনি। আর কোন ভাই নেই তার। শুধু একটি মাত্র বোন—ডাকনাম স্বাধীন, নামটা অদ্ভুতই বলা যায়। আসল নাম স্বাধীনতা। দেশ স্বাধীন হওয়ার রাতে তার জন্ম হয়েছিল—তাই ওই নাম। মেয়েদের জন্যে আলাদা স্কুল করা সম্ভব হয়নি বলে ভগীরথপুরে কো-এডুকেশনের ব্যবস্থা আছে। স্বাধীন সেখানে স্কুল ফাইনাল পাশ করে। বহরমপুরে গার্লস কলেজেও বছর দুই পড়েছিল। বাসে বারো মাইল যাতায়াত করত দৌলতপুর থেকে। দৌলতপুরে তাকে নিয়মিত পৌঁছে দিত এবং নিয়ে আসত মৃগাঙ্ক। ওই কারণেই মোটর সাইকেলটা কেনা হয়। এখন অবশ্য বাকি পাঁচ মাইল অব্দি বাস আসা-যাওয়া করছে। এখন ভগীরথপুরের মেয়েদের কলেজে পড়ার অসুবিধে নেই। তা—স্বাধীন আর পড়তে চায়নি, ভালো ছাত্রী ছিল না—সেটা একটা কারণ হতে পারে, কিংবা সে যেমন বলেছিল, ভালো লাগে না। কী হবে বই-ফই মুখস্থ করে? মৃগাঙ্ক বোনকে জেদ করেনি। সেও তো স্কুল ফাইনালের বেশি এগোয়নি। ষাঁড়ের মতো গোঁ ধরে দাঁড়িয়েছিল। বঙ্কুবাবুর মতো বিদ্যোৎসাহী আর দাপটওয়ালা মানুষও তাকে কাবু করতে পারেনি।

একটু দেরি করেই স্বাধীনের বিয়ে দেয় মৃগাঙ্ক। স্বধীন একেবারে স্বাধীন টাইপের মেয়ে। মৃগাঙ্ক হেসে বলেছিল—ওই নাম রাখাটাই গণ্ডগোল করেছে। তার স্বামী বিহারের ভাগলপুরের বাসিন্দা। পশ্চিমা বামুনদের এই এক মুশকিল। অতদূরে আত্মীয়-কুটুম্ব খুঁজে আনতে হয়। স্বাধীন বার-দুই গিয়ে দিন-চল্লিশ ছিল ভাগলপুরে। তারপর স্বামী বিজয়েন্দুকে নিয়ে সোজা চলে আসে। বিজয়েন্দু সেখানে স্কুলমাস্টারিতে ঢুকেছিল সবে। এখানে ঘর-জামাই হয়ে এসে ফের শ্বশুরের স্কুলে মাস্টারি পেয়ে যায়। এখনও ছেলেপুলে না হলেও দিব্যি কাটাচ্ছে। তবে মৃগাঙ্ক এত হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, বলার নয়। এতবড় বাড়িটা সামলাতে সে হিমসিম খাচ্ছিল। এখন স্বাধীন ও বিজয়েন্দু থাকায় ও সমস্যা নেই। বঙ্কুবাবুর একটা ছোট্ট চিড়িয়াখানার মতো ছিল। একটা হরিণ, ময়ূর, বাঘের বাচ্চা এবং আরও সব জীবজন্তু পাখি নিয়ে তার শুরু। এখন সব মরে একটা বাচ্চা হরিণ, একজোড়া ময়ূর আর কিছু পাখিতে ঠেকেছে। স্বাধীনের নেশা বলতে ওই চিড়িয়াখানাটাই। ছেলেবেলা থেকেই সে ওই নিয়ে থেকেছে বাবার পাশাপাশি। এখনও আছে। মৃগাঙ্ক তার জন্যে একটা গন্ধগোকুল খুঁজছে। পায় না।

বিজয়েন্দু স্কুলমাস্টার। অপূর্ব সুন্দর চেহারা। চেহারায় বাঙালি ছাপ নেই—ভাষাতেও তেমন নেই। খুব নিরীহ শান্ত গোবেচারা মানুষ সে। বইপত্তর নিয়ে কাটায়। বিকেলে কোনদিন হাঁটতে-হাঁটতে শ্যালকের খামারেও আসে। কিছুক্ষণ থাকার পর নদীর ধারে চলে যায়। চুপচাপ একলা বসে থাকে।

প্রিয়নাথের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বিজয়েন্দুর। প্রিয়নাথ সকালের দিকে আজ বিশ-বাইশ বিঘে চষেছে ট্রাকটরে। চৈতালির জন্যে জমি তৈরি করা হচ্ছে। খুব হাল্কা চাষ। মাটি এমনিতেই গুঁড়ো হয়ে যায় সহজে। মিল্ক পাউডারের মতো। মাটি পরীক্ষা করছে হাঁটু দুমড়ে। ডিস্ক হ্যারোগুলো এ মাটির উপযুক্ত হয়। বেশি গভীর হয়ে যায়। বদলানো দরকার ভেবেছে। তারপর আটচালায় গিয়ে কৃষি যন্ত্রগুলোর দিকে শূন্যদৃষ্টে তাকিয়েছে, নিজের ঘরে গেছে। মৃগাঙ্কেরই ঘর। পাশাপাশি দুটো খাটে দুজনে থাকে। মৃগাঙ্ক মোটর সাইকেলে চেপে শহরে গেছে—হয়তো কার্তুজ কিনতে। চাষবাসের কিছু ইংরেজি বই রয়েছে একটা কাঠের তাকে। একটা বই টেনে নিয়ে শুয়ে পড়েছে। তারপর সারা দুপুর ঘুম।

বিকেলে মৃগাঙ্ক তখনও ফেরেনি। দুপুরের ঘুমে কীসব বিদঘুটে স্বপ্ন হচ্ছিল। মনটা কেমন অস্থির হয়ে আছে। প্রিয়নাথ হাঁটতে-হাঁটতে খামারের পূর্বসীমা ঘুরে নদীর ধারে গেল। তারপর সোজা হাঁটল শ্মশানটার দিকে। বাঁধের নিচে পাড়ে একটা চটান জায়গা পাতলা একস্তর দূর্বাঘাসে ঢাকা। তার নিচের অংশে শ্মশান। তার নিচে জল। এদিকটা বেশ উঁচু। বন্যা হলেও জল উঠতে পারে না। বাঁধ থেকে প্রিয়নাথ দেখল, বিজয়েন্দু একা চুপচাপ বসে রয়েছে, তার কোলে একটা লম্বাচওড়া মোটা বই। প্রিয়নাথ দৌড়ে নেমে গেল। ঘরজামাই লোকটিকে তার সেদিন খুব ভালো লেগেছিল। কথায় সামান্য হিন্দি টান আছে। তাই কথা শুনতে এত ভালো লাগে হয়তো।

এই যে স্যার! একা বসে আছেন দেখছি!

বিজয়েন্দু তাকায়। —আরে! প্রিয়বাবু যে! আসুন, আসুন!

প্রিয়বাবু তার পাশে বসে। —কতক্ষণ?

অনেকক্ষণ এসেছি। মৃগাঙ্কদা কী কোরছেন?

নেই। বহরমপুর গেছেন। ফেরেননি। ...বলে প্রিয়নাথ সিগারেট বের করে। এগিয়ে ধরে প্যাকেটটা। করজোড়ে নমস্কার করে বিজয়েন্দু। —মাফ কোরবেন। পিই না—মানে....একটু হেসে সে বলে—খাই না।

বাঃ! বলে প্রিয়নাথ সিগারেট ঠোঁটে রাখে।

বিজয়েন্দু ওর হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে বলে—আমি জ্বেলে দিচ্ছি। তারপর জ্বেলে দেয়। ফের বলে—হয়েছে তো? খুব জোরে-জোরে টান দিন—জ্বলে যাবে।

ধুঁয়ো নদীর উদ্দেশে ছুঁড়ে প্রিয়নাথ বলে—এখানটায় বেশ লাগে বসতে। তাই না? শ্মশানে এলে অনেকের নাকি ভয় করে। আমার তো বেশ লাগে। আপনারও লাগে দেখছি।

বিজয়েন্দু হাসে। —উঁহু। আমি এখানে ভয় পেতে আসি।

বলেন কী!

হাঁ। এটা কীরোকোম ভয় ঠিক ব্যাখ্যা কোরতে পারবো না আপনাকে। মৃত্যু কীরোকোম, আপনার ধারণা?

কখনও ভাবিনি।

ভেবে দেখবেন, ভয় কোরবে। মৃত্যু একটা অ্যানিহিলেশন—বিনাশ। এই যে দেশলাই জ্বালালাম, নিবে গেল—ওইরোকোম। সেজন্যেতে আমার ইচ্ছে কোরে কী, কিছু—সার্টেন থিং, যাকে বোলবো ট্রান্সফরমেশন অফ লাইফ—একটা রূপান্তর কেন থাকবে না? আমার ইচ্ছে —পোকা দেখেছেন তো? মথ যাকে বলে। কীরোকোম ট্রান্সফরমেশন হয়—এভোলিউশন বলাই উচিত।

গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি হয় শুনেছি।

তাই বোলছি আমি। আমার কাছে এই বইটা দেখছেন—থিওসফির বই। প্রেততত্ত্ব। আমি কিছুদিন থেকে খুব পড়ছি এসব বই।

প্রিয়নাথ একটু অবাক হয়ে বলে—কেন? হঠাৎ প্রেততত্ত্ব নিয়ে পড়লেন যে?

আমার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে খেয়ালটা মাথায় আসে। মায়ের সঙ্গে আমার খুবই কম দেখা হয়েছে। ছেলেবেলা থেকে আমি মামার কাছে মানুষ। বাবা রেলে চাকরি করতেন। তাতে আমার পড়াশোনার অসুবিধা হবে—সেজন্যেতে মামার বাড়ি ছিলাম। মা জব্বলপুরে মারা যান। তখন আমি সবেতে বি. এ. পাশ করেছি। পাটনা ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হবার চেষ্টা করছি।

তারপর?

স্বপ্নে দেখলাম, মা কাছে যেতে বলছেন। আমি যাবার চেষ্টা করছি। পারছি না। তারপর মা চলে গেলেন। ঘুম ভেঙে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, জব্বলপুরে যাব। কিন্তু সেদিনই অ্যাডমিশানের লাস্ট ডেট। পাটনা না গেলে চলবে না। গেলাম। ভর্তি হলাম। ফিরে এসে রাত্রে শুনি টেলিগ্রাম এসেছে। গিয়ে পৌঁছলাম পরদিন সন্ধ্যায়। মাকে দেখতে পাইনি।...একটু চুপ করে থাকার পর বিজয়েন্দু ফের বলে—এম. এ-টা আর ইচ্ছে করেই পড়িনি। নিজেকে খুব—খুউব—কী বলব? ব্যর্থ মানুষ মনে হয়েছিল। অফ কোর্স—এসব সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার!

প্রিয়নাথ আড়চোখে দেখতে থাকে ওকে। বিজয়েন্দু নদীর স্রোতে কিছু দেখছে নিষ্পলক। তারপর প্রিয়নাথ বলে—ও নিয়ে ভাববেন না। ভেবে তো কোন লাভ নেই। বিজয়েন্দু একটু হেসে মুখ ফেরায়। —কিছু ভেবে লাভ আছে বলুন তো, যদি মৃত্যুই মানুষের শেষ কথা হয়?

তাই কি?

কেন নয়?

তাহলেও মানুষ তো এত যুগ ধরে বেঁচে থাকছে. পৃথিবী নামে এত বড় একটা কারখানা চলছে।

আপনার কথা আমি বুঝেছি। আমার কথা আলাদা।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে। প্রিয়নাথ মনে মনে হাসে। ভদ্রলোকের মধ্যে একজন সন্ন্যাসীর স্থায়ী মুড আছে। চোখদুটি এত সুন্দর। আর বস্তুত সৌন্দর্য ব্যাপারটা যে খুব অকেজো আর নিরর্থক, তাতে প্রিয়নাথের সন্দেহ নেই। যাই হোক, খাবার মতো যথেষ্ট খাদ্য ইত্যাদি থাকলে এবং পয়সাকড়ি খরচ করার মতো নিরাপত্তা—মৃত্যু বা ভূতটুত নিয়ে গভীরভাবে ভাবা যায়। ঘর-জামাই সম্পর্কে সুপ্রাচীন বাঙালি ধারণা এই ভদ্রলোকের ওপর চাপিয়ে প্রিয়নাথ আরও কৌতুক অনুভব করে। সে ওকে তাতিয়ে দিতে চায়।

প্রিয়নাথ একটু হেসে বলে—তাহলে আপনি পরলোক খুঁজছেন এখানে এসে?

হেমন্তের হলুদ বিকেলে বিজয়েন্দুর মুখটা কেমন পাণ্ডুর মনে হয়। সে বলে, ঠিক তা নয়। ভাবতে কেমন লাগে। অ্যানিহিলেশন! শব্দটা মাথার ভিতর দিয়ে কাঁসরঘণ্টার মতো বাজে। বাজে না?

আপনি কুসুমের নাম শুনেছেন?

হুঁউ। খু-উব। কেন শুনবো না? চিনি তাকে।

তার ক্লেয়ারভয়েন্স না কী রকম শক্তি আছে জানেন তো?

অনেক জানি, অনেক। কুসুম তো প্রায়ই যায় আমাদের ওখানে...ফের সলজ্জ হেসে বিজয়েন্দু জানায়—আমার স্ত্রীর ওসব ভীষণ বিশ্বাস আছে, জানেন? ভীষণ।

বলেন কী!

কুসুম আমাকে কনভিনস করতে চায়। আমি থোড়াই শুনি তার কথা। সে বলে কী জানেন? আমি সাধু হোয়ে যাব।

মন খুলে হাসে বিজয়েন্দু। গোলাপি হয়ে ওঠে মুখটা এতক্ষণে। মাথা পেরিয়ে খুব নিচু দিয়ে একঝাঁক শালিখ উড়ে যায়। বটগাছের ডালে গিয়ে বসে। পাশের বাঁশবন এবং ওই গাছটায় ইতিমধ্যে অজস্র পাখি ভিড় করেছে এবং চ্যাঁচামেচি জুড়েছে, এতক্ষণে কানে আসে প্রিয়নাথের। সে বটগাছটার দিকে দৃষ্টি রেখে বলে—কুসুমের সত্যি কোন অলৌলিক ক্ষমতা আছে, বিশ্বাস করেন আপনি?

কুছ্—কিছুমাত্র নেই। ব্রিফ পয়সা কামানোর ফিকির। ও সেদিন আমার স্ত্রীকে বলেছে, জন্মান্তরে কী ভীষণ পাপ করেছিল, তাই ছেলেপুলে হচ্ছে না!

কথাটা বলেই যেন অপ্রস্তুত হয় বিজয়েন্দু। ফের বলে—ফিকিরবাজ মেয়ে।

হ্যাঁ। আপনার শ্যালকমশাইও তাই বলেন।

কে? মৃগাঙ্কদা? ওকে দেখলে মেয়েটা ভেগে যায় এক-দু মাইল তফাতে। গত মাসে এক সন্ধ্যাবেলা ও গিয়েছে আমাদের বাড়িতে। আমাব স্ত্রী চালটাল সব দিচ্ছিল। সে সময় মৃগাঙ্কদা হঠাৎ করে হাজির হলেন। হয়ে সব দেখতে পেলেন। বোনকে খুব বকলেন। কুসুমকে এ্যাইসা তাড়া করলেন, চালটাল ফেলে ভাগল। সে নিয়ে দাদাবোনে বহুত ঝগড়া আর কতদিন কথাবলা বন্ধ ছিল।

শুনে প্রিয়নাথ হো হো করে হেসে উঠল।

হ্যাঁ। এই রোকোম হয়েছিল গত মাসে।

কিন্তু মেয়েটির চেহারা—মানে চোখদুটো লক্ষ করেছেন? কী আছে মনে হয় না?

করেছি। যৌবনে তো ওরোকোম থাকবেই মেয়েদের। তো অমন খুবসুরত—সুন্দর মেয়ে। ওর জাতের লোকগুলোর চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে পরখ করবেন—কোনো—কোনো মিল নেই।

ওর মা ধরিত্রীর কথা শুনেছেন?

হ্যাঁ, সব জানি আমি। আমি আপনার চেয়ে পুরনো লোক এখানে।...বিজয়েন্দু সকৌতুকে হাসল। —আমার শ্বশুরমশায়ের নামেও অনেক বদনাম—স্ক্যান্ডাল শুনেছি, কিন্তু কুসুম ওঁর মেয়ে নয়। লোকে কত বাজে কথা বলে।

প্রিয়নাথ অবাক হয়ে বলে—তাই নাকি?

হাঁ, শুনেছি।

প্রিয়নাথ ওর সরলতায় খুশি হয় আরও। —আর আপনি মশাই সাক্ষাৎ জামাই হয়ে এসব শোনাচ্ছেন আমাকে? অদ্ভুত জামাই তো আপনি!

আপনাকে আমার ভাল লাগল প্রিয়বাবু। সত্যি কথা বলছি, এখানে মনের কথা বলে খুশি হবার মানুষ একটিও পাইনি। আমাকে জামাই বলছেন—কিন্তু আমি তো আউটসাইডার। এরা আউট-সাইডারই ভাবে। ছাত্ররা আমার আড়ালেতে আমাকে নিয়ে তামাশা করে।

আপনি নিশ্চয় হিন্দি পড়ান?

ঠিক বলেছেন।...

কথা বলতে-বলতে সূর্য ডুবছিল। গাছপালায় পাখিদের চ্যাঁচামেচি আরও তীব্র হল। নদীর ওপারে নীল কুয়াশা জমতে থাকল। সারাদিন প্রচণ্ড গরমের পর এতক্ষণে জল ছুঁয়ে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে এল। জলে ছায়া আরও একটু কালো দেখাল, কোথাও কোথাও যদিও লাল নীল হলুদ চাপ-চাপ রং তলায় খাপচাভাবে জমে রইল। এখনই শিশির জমে ওঠার ঝোঁকে ঘাসে-ঘাসে একটা নমনীয়তা আসতে শুরু করেছে। মাকড়সাগুলো সারাদিন জাল বুনছিল, কাজ সেরে ঘাপটি পেতেছে। তাদের দেখা যাচ্ছে না। একটু তফাতে বিষ পিঁপড়ের সার দেখা যাচ্ছিল। পা পড়লে কামড়ায় ওরা। ভীষণ জ্বালা করে। প্রিয়নাথ দেখল, সারটা বিজয়েন্দুর পাছার খুব কাছ দিয়ে ঘুরে গেছে। সাবধান করবে ভাবল। কিন্তু জামাই—বিশেষ করে ঘরজামাই গোবেচারা মানুষকে একটু উত্ত্যক্ত করার বদমাইসি থাকায় কিছু বলল না।

বিজয়েন্দু পাটনা ভাগলপুর মুঙ্গের আরও নানা জায়গার গল্প করছে। প্রিয়নাথ শোনার ভান করছিল। আলো ফুরিয়ে যাবার আগেই সামনে পুবে ওপারে গাছপালার মাথায় বিশাল কাঁসর ঘণ্টার মতো চাঁদটা চোখে পড়ছিল। মনে হল গভীর ব্যাপক আর নিঃশব্দ ঘণ্টা বাজিয়ে এই ডাকিনী-যোগিনীদের দেশে একটা রাত আসছে। একবার পিছনের শ্যাওড়া গাছে প্যাঁচা ডাকল। তারপর দূরে আখের জমিতে শেয়াল ডেকে উঠল। বেশ কয়েক মিনিট দলটা ডাকাডাকি করে চুপ করে গেল। তারপর নদীর ওপর দিয়ে ফের প্যাঁচাটা ডাকতে ডাকতে চলে গেল। তখনই কুসুমের কথাগুলো মনে পড়ে গা শিউরে উঠল প্রিয়নাথের। নিজের অজান্তে তার কান সতর্ক হল, কোথায় কি সাপ ব্যাঙ ধরেছে?

কোন শব্দ নেই। নদীর ছলছল শব্দটা এবার স্পষ্ট হয়েছে। চাঁদটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফিকে সোনালি রঙ চুঁইয়ে পড়ছে এবার—তা জ্যোৎস্না বলা ভুল। কাঁপাকাঁপা নদীর জলের তলায় তাকে দেখা গেল। মাঝে মাঝে হয়তো মাছ নড়ে ওঠার জন্যেই জায়গায়-জায়গায় গলানো ধাতুর হলুদ আভা ছড়াতে থাকল। সেই বিস্ময়কর প্রাতিভাসিক বিস্ফোরণের দিকে প্রিয়নাথের দৃষ্টি বারবার আটকে যেতে থাকল।

আর, মশা আসতে শুরু করেছে। সূঁই ফোটাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘাড় ও কপালে হাত চালাচ্ছিল প্রিয়নাথ—চুপি চুপি। ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে ছেলেবেলার গল্প করে যাচ্ছে। এ এক ঝামেলায় পড়া গেল। প্রিয়নাথ এতক্ষণে কাশল। —এবার উঠলে হত জামাইবাবু!

বিজয়েন্দুর দাঁত দেখা গেল। চাঁদের দিকে উজ্জ্বল মুখ।—আপনিও জামাইবাবু বললেন?

বারে! আপনি আমাদের জামাইবাবু না?

উঠতে ইচ্ছে করে না। বেশ শান্ত জায়গা। কিন্তু মশা সূঁই দিচ্ছে।

হ্যাঁ, মশা। আর শিশির পড়ছে প্রচণ্ড। মাথায় হাত দিয়ে দেখুন। চবচব করছে।

তাহলে ওঠা উচিত। কিন্তু কী লাভলি, গ্রেট।

প্রিয়নাথ উঠে দাঁড়ায়। —কী? সিনারি?

চাঁদ।

আর চাঁদ! চাঁদে মানুষ যাচ্ছে আজকাল। চলুন। সাবধান—আপনার ওপাশে বিষ পিঁপড়ে দেখেছিলাম। এদিকে আসুন! বিজয়েন্দু তাকে অনুসরণ করে। বাঁধে উঠে দুজনে পাশাপাশি ডাইনে চাঁদ নিয়ে হাঁটে। সোজা খেয়াঘাটের দিকে এগোতে থাকে। খামারের পথে ঘাস আর ঝোপ জঙ্গল পড়বে। সঙ্গে টর্চ নেই কারো। তবে পঞ্চাশ মিটার জঙ্গুলে পথটা পেরোলে আলো মিলবে খামারে—বৈদ্যুতিক আলো। একমাইল পথ ভগীরথপুর থেকে খামার অব্দি লাইন এনেছে মৃগাঙ্ক। অনেক হাঁটাহাঁটি অনেক সাধাসাধি এবং খরচখরচার পর এটা সম্ভব হয়েছে।

সোজা উত্তরে খেয়াঘাটের কাছে গিয়ে ওরা পাকা রাস্তায় ওঠে। বটতলার মাথায় কারা পাটের দর নিয়ে তর্ক করছে। 'সুপারি-গোলার-হাট' কথাটা বারবার শোনা যাচ্ছিল। সে তো পদ্মার ধারে। প্রিয়নাথ শুনছে। মৃগাঙ্ক বলছিল, সেখানে ভীষণ জুয়ার আসর চলে। রাজ্যের জুয়াড়ি গিয়ে স্থায়ী ডেরা পেতে বসেছে। ফি রাতে গানবাজনার আসর বসায় তারা। লোকেরা এসে ভিড় করে এবং জুয়ার টানে ভেসে যায়।

ঘাটে বিদ্যুৎ নেই। পুরনো জ্যোৎস্না আর অন্ধকার ঘুরে-ফিরে আসে। পশ্চিমমুখো পিচের পথের ওপর সটান শুয়েছে তারা—সেই জ্যোৎস্না ও অন্ধকার গলাগলি। তিন-চারটে দোকানমাত্র। টিমটিমে আলো জ্বলছে। আলো ঘিরে অজস্র পোকা থিকথিক করছে—বাসটা গাছের নিচে হাতির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। পথে চলাফেরা করছে অল্পসল্প লোক—চাপা গলায় কথা বলছে তারা। সবই ষড়যন্ত্রসঙ্কুল মনে হয়।

প্রিয়নাথের চা খেতে ইচ্ছে করছিল হাওলাদারের দোকানে। দোকানটা পেরিয়ে গিয়ে সে জানাল কথাটা। বিজয়েন্দু বলল—তা চলুন না আমার সঙ্গে। গিয়ে চা আর গল্পসল্প করা যাবে। এখন তো কাজ নেই আপনার?

নেই।

তাহলে চলুন। একটা রিকশো নেওয়া যাক।

থাক। হাঁটতে-হাঁটতে যাই। ভালো লাগছে।

আমারও ভালো লাগছে।

সামনে একটা আলো দুলতে দুলতে আসছিল। কাছে এসে লোকটা হ্যারিকেন তুলল মুখের কাছে।—নতুনবাবু!

গগন হালদার। প্রিয়নাথ বলে—হালদারমশাই কোত্থেকে?

সত্যেন্দ্র গিয়েছিল ভগীরথপুর। ভাবলাম, আলো নিয়ে যাই—এগিয়ে আনি। তা শুনলাম, ও কখন আগেই চলে এসেছে। ঘাটের দিকে দেখলেন নাকি?

না তো!

তাহলে হয়তো আপনাদের খামারেই গেল?

হয়তো। যাও, দেখে এস।

বিজয়েন্দু সরে এসে বলল—কী হালদারমশাই, আমাকে দেখতেই পাচ্ছ না!

গগন অমনি হ্যারিকেনসুদ্ধ ডান হাত কপালে ঠেকাতে চেষ্টা করে।—জামাইবাবু যে! ইস্কুলের মিটিঙে যাননি? সত্যেন্দ্র গিয়েছে।

বিজয়েন্দু মাথা দোলায়। তারপর প্রিয়নাথকে ডাকে—আসুন। গগন বলে—এগিয়ে দিই জামাইবাবু?

না, না। জ্যোৎস্না আছে। তুমি সত্যেনকে দেখো হালদারমশাই।

উঁহু। পথে আজকাল ইনি সাপগুলো ওঠে বড্ড। তিন-চারটে দেখলাম।...গগন আগু বা[illegible] ওদের আলো দেখিয়ে হাঁটতে শুরু করে, যেদিক থেকে এসেছে ফের সেদিকেই।—তবে ইনি সাপের বিষ নাই। একপাশের নয়ানজুলি থেকে অন্যপাশের নয়ানজুলিতে যাবেই ব্যাটারা। পিচে উঠলে তখন যদি আকুলি-বিকুলি দশাটা দেখেন, হেসে বাঁচবেন না। এক সুতো এগোতে একশোবার ছটফট করবে। ...গগন খুব হাসে।

পচা জলের দুর্গন্ধ আর মশার একটানা আওয়াজের মধ্যে তিনজনে হাঁটে। গগনের খালি গা, হাঁটু অব্দি ধুতি পেঁচিয়ে পরা, খালি পা—হাঁসের মতো থ্যাবড়া আর ফ্যাকাসে। গগন বকবক করে সমানে। ইস্কুল, পাটের দর, তেজারত মোড়লের সঙ্গে ইনু পাইকারের মামলা, ইসলামপুরে তাঁতিরা রেশম পাচ্ছে না, ব্লক অপিস ঘেরাও করেছিল ইত্যাদি। তারপর গগন প্রিয়নাথকে জিজ্ঞেস করে—আপনি তো বাবু, রাঢ়ের লোক—না কী?

হ্যাঁ। কেন?

কোন জায়গার?

সিউড়ি।

সাঁইথে একবার গিয়েছিলাম আকালের বছরে। পঞ্চাশ সনে। তখন আমি বয়েসে কাঁচা।

মাছ বেচতে নাকি?

মাথা খারাপ! তিরিশ কোশ রাস্তা পায়ে হেঁটে মাছ বেচতে! গিয়েছিলাম এক সাধুর সঙ্গে। তখন পয়সার দাম ছিল নতুনবাবু। মোটর বাসে চাপিনি। তখন সাধুরাও চাপত না—পায়ে হাঁটত।

বল কী হালদারমশাই! সাধুর সঙ্গে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ। খেয়াল হল, চলে গেলাম। সাধু পদ্মাপার থেকে এসেছিল। এসে শ্মশান বটতলায় আখড়া করেছিল। খুব গাঁজা খেত। আমিও খেতাম। তখন ধরিত্তি বেঁচে। সবে মুখিয়ে উঠেছে। ডাঁটালো ছিপছিপে গড়ন। হ্যাঁ—আগের বছর টাট্টু চেপে ওর পুরুষকে নিয়ে কালুখাঁর দিয়াড়ে এসে জুটেছিল। ভেবেছিল, খেয়ে-পরে বাঁচবে। নদীর ধারের ভরাট মাটি—সুফলা।

ফের ধরিত্রীর কথা! প্রিয়নাথের খারাপ লাগে। বুড়ো জেলে আর কোন কথা জানে না—শুধু ওই ধুয়ো নিয়ে বেঁচে আছে যেন।

বিজয়েন্দু আনমনে ছিল। সে বলে—ধরিত্রী?

গগন বলে—হ্যাঁ, ধরিত্তি। তা সাধু বলেছিল, ধরিত্তি একজন ভৈরবীই বটে; তবে ওর জাত গিয়েছে। ওকে কাম জয় করেছে। না—ওর মাথার ঘিলুতে গোঁজ পুঁতেছে। ওর উদ্ধার নাই।

প্রিয়নাথ সকৌতুকে বলে—আর তুমি কি ওর উদ্ধারের জন্যে সাধুর সঙ্গে গেলে?

কে কাকে উদ্ধার করে নতুনবাবু! আমি গেলাম একটা কাজে। এখন হাসি লাগে। যৌবনে মানুষ কী করে, কী মাথায় ঢোকে! এখন বলতে লজ্জা নাই। আমি গিয়েছিলাম বশীকরণলতা আনতে।

ওরে বাবা! বশীকরণলতা! এরা দুজনে একসঙ্গে হাসে।

হ্যাঁ। সাঁইথে থেকে আরও পশ্চিমে কী এক পাহাড় আছে। সেখানে অমাবস্যার রাতে লতায় ফুলটি ফোটে। ফুলসুদ্ধ লতা উপড়ে আনতে হয় এক নিঃশ্বাসে—সাধু বলেছিল।

তারপর, তারপর?

সাধু বলেছিল, পাহাড়ে বিস্তর গাছপালা, জঙ্গল, জন্তু-জানোয়ার থাকে। কিন্তু অমাবস্যার রাতে লতায় যখন ফুলটি ফোটে, গন্ধে মউ-মউ করে সারা পাহাড়। অচল হয়ে পড়ে থাকে জন্তু-জানোয়ার। তখন শুঁকে-শুঁকে লতাটি খুঁজে বের করতে হবে। তা, সাঁইথের বাজারে ঢুকেই সাধু বললে—তাহলে এবারে আমার মূল্যটি ধরে দে। আমার খটকা লাগল। কথা ছিল, সাধু লতা এনে দিলে তখন ওকে সাত টাকা সাত আনা সাত পয়সা দক্ষিণা দিতে হবে—আগে নয়। আমি ওই টাকা চুরি করেছিলাম সেই আকালের বছরে। তখন এই সারা বাগড়ী এলাকায় না খেয়ে পটাপট মানুষ মরছে। রাঢ়ে পালাচ্ছে সবাই ফ্যান চাইতে। বাবার নৌকোখানা দশ টাকায় বন্ধক রেখেছিল বঙ্কুবাবু—মানে এই জামাইবাবুর শ্বশুরমশায়ের কাছে। পেটের জ্বালায়। আর আমি শালা—হুঁ! ওই যে বলে, ভাত কুরকুরায় না যৌবন কুরকুরায়? আমার যৌবন শালা! ...গগন থুথু ফেলে।

সে ফের বলতে থাকে—সাধু বাজারে ঢুকেই টাকা চাইলে। আমার খটকা লাগল। বললাম, সে হবে। আগে পাহাড় কোথায়, নিয়ে চলুন। সাধু বললে, ঠিক আছে। খিদে পেয়েছে। আয়, খেয়ে নিই। দুজনে একটা সন্দেশের দোকানে ঢুকলাম। সাধুই রসগোল্লা লুচি নানারকম খাবার দিতে বললে। তখন অতটা ঠাওর করিনি। জীবনে কখনও খাইনি বললেও চলে, আর খিদের মুখে ওইসব খাবার—খুব খেলাম। তারপর সাধু বললে, ব্যাটা, দাম দে। আমি তখন তো আকাশ থেকে পড়েছি। মোটে আটটা টাকা চুরি করেছিলাম। ...গগন করুণ হাসল।

প্রিয়নাথ বলল—তারপর?

তারপর বেজায় গণ্ডগোল হল। সবাই সাধুর পক্ষে। সাধুরা পয়সা কোথায় পাবে? এই ছোঁড়াটাই ওনাকে খাওয়াতে এনেছে। এনে এখন হিসেব দেখে বদমাইসি করছে। আমাকে মেরেধরে ময়রা টাকাগুলো সব কেড়ে নিলে। আমি তো রক্তটক্ত নিয়ে হাঁটতে লাগলাম। তিরিশ কোশ! মরে যেতাম! বরাতের জোরে বাগড়ী এলাকার অনেক গাড়ি রাঢ়ে খন্দ ফিরি করতে যায়। তাদের সঙ্গে গাড়িতে শুয়ে আকাশ দেখতে দেখতে তিনদিন তিনরাত পরে বাড়ি ফিরলাম। বাবা আমার খুব ভালমানুষ ছিল। টাকার জন্যে কিছু বলল না। বরঞ্চ প্রাণে বেঁচে ফিরেছি, এই নিয়ে কান্নাকাটি করল। বললে—সাধুটা ছিল নির্ঘাত নরখাদক—বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছিল। ওরা বশীকরণ জানে কিনা! ...গগন আবার ফ্যাকফ্যাক করে হাসতে থাকে।

প্রিয়নাথ বলে—পরে তো ধরিত্রীর সঙ্গে ভাবটাব হয়েছিল হালদারমশাই?

হুঁউ হয়েছিল। খুব—খুব।

বিনা বশীকরণে তো?

হুঁউ। বশীকরণ লাগে না ওতে।

কী লাগে হালদারমশাই?

গগন আনমনে বলে—উঁ?

কী লেগেছিল ধরিত্রীকে জয় করতে?

গল্পটা তো আপনাকে সেদিন বলেছি। ওর কারচুপি তুকতাক একমাত্র আমিই জানতাম, সব ধাপ্পা।

আমার কাছে চাবিকাঠিটি ছিল। তাই আমার বশ হয়েছিল। তবে সে খুব সহজ মেয়ে ছিল না। অমন মেয়ে দুটো-একটা জন্মায়। ধরিত্তি হয়তো মানুষই ছিল না, নতুনবাবু।

প্রিয়বাবু বিজয়েন্দুকে বলে—বুঝতে পারছেন তো? হালদারমশাই ওকে আসলে ব্ল্যাকমেইল করত।

বিজয়েন্দু মৃদু হেসে চাপাগলায় বলে—আরেকজনও করতেন।

কে?

শ্বশুরমশাই।

রাস্তার ধারেই বিশাল এলাকা পাকা পাঁচিলে ঘেরা—'রায়ভবন।' গেটের মস্ত কপাট প্রায় ভাঙাচোরা—নির্জন ও নিঃশব্দ। ভিতরের প্রাঙ্গণে অজস্র গাছপালা—আম, লিচু, কাঁঠাল আর কিছু শিরীষ-আমলকী-কৃষ্ণচূড়া-দেবদারু। ফুলবাগান একটা ছিল। এখন অযত্নে ঝোপঝাড় হয়েছে, তবু ফুল ফোটে। মিঠে গন্ধ ভাসে হাস্নুহানা আর শিউলির। বিদ্যুতের আলো আছে। একতলা বাড়ি। সামনেই ঠাকুরঘর ও ছোট্ট উঠোন। ধাপ আছে উঠোনের চারদিকে। মধ্যে একটা পুরনো হাড়িকাঠ পোঁতা আছে। সিঁদুরের ছোপে ভয়ঙ্কর লাগে। একসময় একশো পাঁঠা বলি হত।

গগন ঠাকুরবাড়ির দরজায় গিয়ে বলে—তাহলে যাই?

আসুন। বলে বিজয়েন্দু পা বাড়ায়। কলিগের বাবাকে সে মর্যাদা দেয় যথেষ্ট।

তারপর প্রিয়নাথের হাত ধরে টানে—আসুন প্রিয়বাবু।

ঠাকুরঘরের বারান্দা দিয়ে অন্দরে ঢোকে ওরা। ফের একটা উঠোন। চারদিকে অনেকগুলো ঘর। দুটো ঘরে আলো জ্বলছে। বারান্দার একদিকে আলো আছে।

বিজয়েন্দু ডাকে—নিবারণ!

স্বাধীন বেরিয়ে বলে—নিবারণকে বাইরে পাঠিয়েছি।...পরক্ষণে ঘোমটাটা একটু তোলে। তারপর একটু হাসে।—ও, প্রিয়বাবু! আসুন, আসুন। মৃগাঙ্কের সঙ্গে দুদিন এবাড়ি এসেছিলেন প্রিয়নাথ। স্বাধীন খুব আলাপি মেয়ে। সঙ্কোচের ধার ধারে না দেখেছে। আর সহজেই অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠাও হয়তো তার কাছে।

বিজয়েন্দু বলে—তুমি চাটা নিয়ে এসো। আমার ঘরেই বসছি আমরা।

ঘরটা সুন্দর সাজানো-গোছানো। অজস্র বই রয়েছে কয়েকটা সেলফে। হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা। কোণের টুলে খবরের কাগজের গাদা। জানলার ধারে একটা সেক্রেটারির টেবিল। ল্যাম্প আছে সুদৃশ্য। কলমদানি আছে। ফাইল, পেপারওয়েট, লিলিপুট ভাস্কর্য ইত্যাদিও আছে যথারীতি। দেওয়ালে কিছু পেন্টিং, ক্যালেন্ডার, ফোটো। এককোনায় উঁচু সেকেলে ছপ্পরখাট মেহগিনি রঙ, পুরু গদি, তাঁতের বিশাল রঙিন বেডকভারে ঢাকা। নেটের ধবধবে মশারি আছে ওপরে চন্দ্রাতপের মতো। একটা আয়নালাগা স্টিলের আলমারি আছে। প্রিয়নাথ দেখল, খাটে শুলে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখা যায় ওতে। উত্তম ব্যবস্থা। প্রিয়নাথ খুঁটিয়ে দেখে মনে মনে হাসে। কিন্তু ঈর্ষায় কাতরও হতে থাকে। কত লোক এই দেশে কতরকম সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কাটাচ্ছে। প্রেততত্ত্ব ও মাতৃস্নেহ ইত্যাদি নিয়ে ভেবে অস্থির হচ্ছে। আর আমি শালা মিস্তিরি, ঘরপালানো, স্নেহভালবাসাবিহীন পরিবার থেকে এক ছন্নছাড়া হাভাতে মস্তান মাত্র। প্রিয়নাথ নিজের দিকে কড়া চোখে তাকাল।

ঘরটা বেশ বড়। লেখার টেবিলটার ওপাশে হাল্কা একটা সোফাসেট রয়েছে। প্রিয়নাথ ঢুকেই সেখানে গিয়ে বসে পড়েছিল। একটা ইজিচেয়ার আছে ডোরাকাটা—সেখানে বিজয়েন্দুর হাত-পা ছড়িয়ে আরামে বসল। বলল—এদেশে সব ভাল। শুধু মশাটাই যা খারাপ। ফ্যানটা বাড়িয়ে দেব? মশা কামড়াবে।

থাক। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে যাচ্ছে! তবু এত মশা কেন, কে জানে!

ওই দেখুন না, জানলায় সব নেট লাগানো হয়েছে। তাও রেহাই নেই। গান শুনবেন?

কে গাইবে? আপনি গাইলে শুনব।

না। রেকর্ড। আমি ওই নিয়েই আছি। দেশি বিলাইতি সবরকম গান অর্কেস্ট্রা আছে।

প্রিয়নাথ মনে মনে বলে—তুমি সব নিয়েই আছ আজ জামাইবাবু! সে সিগারেট ধরায় এবং

অ্যাসট্রে খোঁজে। বিজয়েন্দু একটা কৌটোর ঢাকনা এগিয়ে দেয়, টেবিল থেকে। তারপর বলে—শেষ অব্দি ভেবে দেখেছি, সঙ্গীতই শাশ্বত—সঙ্গীতই হয়তো ঈশ্বর।

প্রিয়নাথ মনে মনে বলে—সুখে আছ জামাইবাবু, ঈশ্বর-টিশ্বর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ। সে প্রকাশ্যে বলে—আপনাদের চিড়িয়াখানাটা আমার দেখা হচ্ছে না! কোথায় সেটা?

পিছনে! যাবেন এখন?

চলুন না!

ট্রেতে দুটো প্লেট নিয়ে ঢুকছিল স্বাধীন। বলে—এখন কি দেখবেন? দিনে আসবেন। তেমন কিছু নেই। মন দিতে পারিনে। হরিণের বাচ্চাটা আনালাম এত খরচা করে—বাঁচবে না হয়তো।

প্লেট দুটো রাখবার সময় তার হাতকাটা ব্লাউজের অনেকটা পাশ থেকে দেখতে পায় প্রিয়নাথ। সে চোখ ফেরাতে পারে না। বিজয়েন্দু বলে—নিন, খাওয়া যাক্। স্বাধীন চমৎকার পায়েস করে।

প্রিয়নাথ আনমনে প্লেট তুলে নিয়ে খায়। স্বাধীনকে এত সুন্দরী তো মনে হয়নি আগের—আগের বার। দিনে দেখেছিল বলে? রাত্রি একটা মায়া আনে নিঃসন্দেহে। এখন স্বাধীন সেজেগুজে আছে। কপালে লাল টিপ, চোখে কাজলের রেখা, চুলগুলো অবশ্য এলোখোঁপা। সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে। যেন লাল রঙের ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার কামড়ে বসে আছে, মরণকামড়। ক্রমশ সুন্দরতর হল স্বাধীন। দুধসাদা রডলাইটের আভায় ধবধবে পরীমূর্তি। সরু-সরু সবুজ পোকাগুলো আলোর গায়ে থিকথিক করছে আর কিছু সাদা পোকা উড়ে এসে গায়ে বসছে, মুখে বসছে এবং স্বাধীন হাত দিয়ে তাড়াচ্ছে।

বসুন, চা আনি। বলে সে চলে যেতেই ঘরটা শ্মশান হয়ে গেল যেন। আসবাবপত্রগুলো খসখসে পোড়াপোড়া দেখাল এবং ছত্রখান।

প্রিয়নাথ একবার ঘুরে আলমারির আয়নায় নিজেকে দেখতে চেষ্টা করে। তার শরীরটা মোটামুটি বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্য প্রবল। সাদা হাতের ওপর নীলচে রোমগুলোয় সবুজ পোকা ঢুকেছিল, ছাড়িয়ে ফেলে। হঠাৎ তার মনে হয়, সে খুব অযোগ্য মানুষ নয় পৃথিবীতে। হাত বাড়ালে কিছু না কিছু তুলে আনতেই পারে। এতকাল হাত বাড়ায়নি, ভুল হয়েছে।

বাইরে কার সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছিল স্বাধীন। বিজয়েন্দু হঠাৎ মুচকি হেসে চোখ টিপল প্রিয়নাথের দিকে। তারপর উঠল। পা টিপে-টিপে জানলার কাছে গেল—ভিতর দিকের জানলায়। এখান থেকে পর্দা ফাঁক করে কিছু দেখে ফের মুখ ঘুরিয়ে চোখ টিপল। তারপর ফিরে এল ইজিচেয়ারে। চাপা গলায় বলল—কুসুম।

প্রিয়নাথ সোজা হয়ে বসে—কুসুম!

হ্যাঁ। প্রায়ই আসে তো। রাত্রেই আসে।

কেন?

বলছিলাম তো। আমার স্ত্রী সুপারস্টিশনের ডিপো। ভূতপ্রেত, মন্ত্রতন্ত্রের খুব ভক্ত।

ও! বলে চুপ করে যায় প্রিয়নাথ।

একটু পরেই চা নিয়ে আসে স্বাধীন। মুখটা এবার গম্ভীর। চা রেখে সে বাইরের দিকে কাকে গলা চড়িয়ে বলে—রসুর মা, বাইরে বস। আমি যাচ্ছি। তারপর একটা মোড়া টেনে নিয়ে একটু তফাতে বসে। এবার তার মুখে হাসি ফোটে। স্বাভাবিক লাগে তাকে।

বিজয়েন্দু বলে—কী খোবোর কুসুমের?

এ্যাঁ! স্বাধীন চমকায় যেন। তারপর প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বলে—এসেছিল। নতুন কাপড় চাইতে। নতুন কাপড় এখন কোথায় পাব? কাল আসতে বললাম।

কী হবে নতুন কাপড়?

সে তোমার শুনে কাজ নেই।

প্রিয়নাথ বলে—আপনি ওসব বিশ্বাস করেন বুঝি?

কী?

মন্তরতন্তর?

স্বাধীন মুখ টিপে হাসে। —আপনি বুঝি করেন না?

কীভাবে করব? তেমন দেখাশোনার সুযোগ হয়নি। দরকারও পড়ে না।

স্বাধীনের চোখদুটো মুহূর্তে চকচক করে উঠেছিল। সামলে নিল। —না জেনে কিছু বলা ঠিক নয়। আপনাদের মাস্টারমশায়কে জিজ্ঞেস করতে পারেন, কী হয় বা না হয়।

আপনি কি রাগ করলেন আমার কথায়?

স্বাধীন ফের নির্মল হাসল। —না।

বিজয়েন্দু বলল—কুসুম একটা ম্যাজিক দেখিয়েছিল।

প্রিয়নাথ শুধোয়—কী ম্যাজিক?

স্বাধীন তেড়েমেড়ে বলে—ম্যাজিক? ওটা ম্যাজিক? বুঝলেন প্রিয়বাবু? তখন বলছিল, সারাটা দিন শরীর খারাপ করেছে। আমি কত বললাম কুসুম এলে। তখন ও সব ঠিকঠাক করে দিল।

কী ব্যাপারটা শুনি?

বিজয়েন্দু বলে—ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভাববার মত। আমার দুই ভ্রূর মধ্যিতে আঙুল ছুঁইয়ে জিজ্ঞেস করল, কিছু টের পাচ্ছেন? তখন সত্যি তাজ্জব হোয়েছিলাম কিন্তু। আমার সারা শরীর অবশ লাগছিল। জাস্ট ইলেকট্রিক শক!

বলেন কী?

হ্যাঁ। তারপর আঙুল তুলে নিল। কিন্তু রাত্রে ভাল ঘুম হল না। খুব খারাপ সব স্বপ্ন দেখলাম। পরের দিনটা ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। স্কুলে যেতে পারলাম না। জ্বর ছেড়ে গেলে যেমন লাগে! মুখ বিস্বাদ। কিছু খেতে ভাল লাগল না। রাত্রে আবার কুসুম এল। ও বকাবাকি করল। তখন ফের আঙুল রাখল আমার সেই জায়গায়। সেরাত্রে ঘুম ভাল হল। শরীরও ঠিক হয়ে গেল পরদিন।

আশ্চর্য তো!

পরে ভেবেছি ব্যাপরটা স্পষ্ট সাইকোলজিক্যাল। নিজেরই সাবকনশাস মাইন্ডে উইকনেস ছিল কিছু। তাছাড়া এর ব্যাখ্যা হয় না। আমি আপনাকে একটা বই দেখাতে পারি। দা ফেনোসেনোলজি অফ পারসেপশন। মার্লো পন্টির লেখা। চমৎকার ব্যাখ্যা আছে এইসব ব্যাপারে। তাছাড়া হ্যালুসিনেশনের ব্যাখ্যা আছে। উইচডকটর বা ওঝা তন্ত্রমন্ত্র সম্পর্কেও ধারণা হবে। একে বলা হয় উইচ-কাল্ট। এদিকে সাইকোলোজিস্ট যুং বলেছেন—

স্বাধীন বলে—পণ্ডিতিটা রাখো। ওঁকে চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আনি। রাত বাড়ছে।

বিজয়েন্দু ছাদের দিকে তাকিয়ে বলে—হ্যাঁ যান প্রিয়বাবু, দেখে আসুন।

আপনি চলুন?

ভয় নেই। মালিক নিজে যাচ্ছেন সঙ্গে। আর চিড়িয়াখানায় বাঘটাঘ পোষা তো হয় না! ...হো হো করে হেসে ওঠে বিজয়েন্দু।

স্বাধীন বিছানার তলা থেকে একটা লম্বা টর্চ বের করে বেরিয়ে যায়। প্রিয়নাথ একটু ইতস্তত করে তাকে অনুসরণ করে। যাবার সময় বিজয়েন্দুর মুখটা দেখে যায়। সে চোখ বুজেছে। হাসিটা তখনও ধরা আছে ঠোঁটে।

বারান্দা ঘুরে খিড়কির দরজা খোলে স্বাধীন। নেমে যায় ওদিকে। টর্চ জ্বেলে বলে—আসুন।

ওদিকে কোন আলো নেই। বাগানবাড়ি মত। কিন্তু গাছপালা নেই বিশেষ। ঘাসের ওপর শিশির এবং জ্যোৎস্না। এদিকে-ওদিকে দূরে গাছপালার ছায়া দুলছে অল্প হাওয়ায়। স্বাধীন হঠাৎ ঘুরে বলে—ও এল না?

না।

আসুন।

সে শিশিরের ভয়ে একটু কাপড় তুলে হাঁটে এবং টর্চের আলো প্রিয়নাথের উদ্দেশে নিজের পা থেকে প্রিয়নাথের পা অব্দি গোলাকার করে রাখে। প্রিয়নাথ তার গোলাপি সুন্দর পা, আলতার দাগ, হাঁটুর নিচেকার সুদৃশ্য ডিমালো মাংসে কিছু রোমশ ভ্রূকুটি লক্ষ করে। কী ঘটে যায় তার মধ্যে। ওই

পাদুটো বুকে নিতে ইচ্ছে করে। এই দুর্দান্ত ইচ্ছে তার ভব্যতা ও যুক্তিকে অনবরত উত্ত্যক্ত করে মারে। সে বড় নিশ্বাস ফেলে চাঁদের দিকে তাকায়।

তারের জালে ঘেরা একটা মস্ত আটচালার সামনে দাঁড়িয়ে স্বাধীন বলে—এই দেখুন! এখন ডিসটার্ব করতে চাই না বেচারাদের। ওই দেখুন হরিণটা। দেখতে পাচ্ছেন? আমার বড্ড নেওটা। ওই ময়ূরদুটো। বাঁদর দেখবেন? বেজায় দুষ্টু। বাবার আমলে বাঘও ছিল। কেষ্ট, ও কেষ্ট। ঘুমোল নাকি? ওপাশে একটা ছোট্ট টালির ঘর থেকে সাড়া আসে—যাই মা! তারপর হেরিকেন হাতে এক কালকুট্টে বুড়ো বেরিয়ে আসে।

স্বাধীন বলে—আমাদের মালী! বাবার আমলের লোক! আসলে দেখাশোনা ওই বেশি করে। কেষ্ট, ভারতীকে দুধটা খাইয়েছিলে? খেল?

কেষ্ট মাথা দোলায়। প্রিয়নাথ বলে—ভারতী কে?

স্বাধীন হাসে। —হরিণটার নাম। মাদী। বাবার আমলের সব তো মরে গিয়েছিল। কমাস আগে দাদা কলকাতা থেকে এনে দিয়েছে। এখন ওর একটা জোড়া আনতে হবে। শুধু ওর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আনছি না। আর দাদাও যা হয়েছে আজকাল!

চাপা কিচিরমিচির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। প্রিয়নাথ বলে—পাখি নাকি?

হ্যাঁ, মুনিয়াই বেশি।

সাপ নেই?

স্বাধীন ঘুরে দাঁড়ায়।—সাপ!

হ্যাঁ। সব আছে, সাপ নেই?

স্বাধীন হেসে ওঠে। —বলেছেন ঠিকই। সে ট্রেনিং তো বাবা দিয়ে যাননি। হ্যান্ডল করতে পারব না যে। তখন বেদে পুষতে হবে। কেষ্টদা, তুমি শোও গিয়ে।

কেষ্ট সম্ভবত গাঁজা খায়, প্রিয়নাথের মনে হল। লাল চোখে ঢুলতে ঢুলতে চলে গেল।

স্বাধীন তার চিড়িয়াখানার সামনে আর একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলে—রাত্রে কী দেখবেন! অবশ্য দেখবারও কিছু নেই। বরং দিনে এলে বাঁদরটার দুষ্টুমি দেখে আনন্দ পাবেন! ওরে বাবা, কী বিচ্ছু কী বিচ্ছু! আমার কাঁধে উঠে একদিন পটাপট চুল ছিঁড়তে শুরু করল। কিছুতে নামানো যায় না...খিলখিল করে হেসে ঝুঁকে পড়ছিল সে।

প্রিয়নাথের নাকে একটা সুগন্ধ আসছিল কতক্ষণ থেকে। সেটা কোন ফুলের কিংবা স্বাধীনের ব্যবহৃত সেন্টের, ঠিক করতে পারল না।—চলুন। বলে সে পা বাড়ায়। তারপর ফের বলে—ভারি সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি! কিসের?

ফুলটুল হবে! আচ্ছা প্রিয়বাবু!

বলুন?

আপনার ফ্যামিলি আনবেন না?

প্রিয়নাথ অবাক হয়।—কেন?

ওই খামার বাড়িতে মাঠের মধ্যে থাকতে ভাল লাগে আপনার?

লাগে বইকি। আপনার দাদাও তো থাকেন!

দাদার কথা ছেড়ে দিন, ও ছন্নছাড়া মানুষ।

আমিও ছন্নছাড়া।

যান!

হ্যাঁ। আমার কোন ফ্যামিলিট্যামিলি নেই!

টর্চ নিভিয়ে জ্যোৎস্নায় স্থির দাঁড়ায় স্বাধীন।—সত্যি?

মিথ্যে বলে কী লাভ?

বাবা-মা?

নেই।

ভাইবোন?

ভাইটাই নেই। এক বোন আছে। রামপুরহাটে বিয়ে হয়েছে।

দাদারই মত! উপযুক্ত দোসর জুটেছেন তাহলে! স্বাধীন হেসে ওঠে। তারপর ফের বলে—বিয়ে করছেন না কেন? বিয়ে করে ফেলুন। তাহলে দুঃখ-দুঃখ ভাবগুলো আর থাকবে না।

আমার দুঃখ-দুঃখ ভাব আছে নাকি? বলেন কী?

ওই রকম লেগেছিল প্রথম দিন। এখনও লাগে।

আপনার চোখের ভুল। আমি সুখী মানুষ।

কী বললেন? আরেকবার বলুন, আরেকবার বলুন শুনি?

সুখী মানুষ।

সুখী মানুষ, তাই অত আস্তে কথা বলেন—অমন নির্জীব! চুপচাপ! চালাকির জায়গা পাননি!

হঠাৎ প্রিয়নাথের মনে হয়, তার সামনে এই নির্জন বাগানের জ্যোৎস্নায় এক অলৌকিক ঘটনা ঘটছে। রহস্যময় এক স্বাধীনতার নদী—তার পাশে সে, খুবই কাছে দাঁড়িয়েছে সে। নদীটি খরস্রোতা। বিপুল টান।

স্বাধীন একটা নিশ্বাস ফেলে। শোনা যায় তার শব্দটুকু। আর প্রিয়নাথ টের পায়, সে শুধু নাকের ফুটোদুটো দিয়েই শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলছে। দম আটকানো ভাব। সে হাঁ করে নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করে।

কী হল হঠাৎ প্রিয়বাবু?

কিছু না। চলুন, উনি একা বসে আছেন।

দুজনে যখন ঘরে ঢুকল, দুজনেরই মুখটা গম্ভীর। বিজয়েন্দু টেবিলে বসে কী সব লিখছিল। ঘুরে বলে—দেখা হল?

প্রিয়নাথ বলে—হ্যাঁ। এবার আমি চলি জামাইবাবু। রাত বেড়ে যাচ্ছে। স্বাধীন বলে—আপনিও জামাইবাবু বলছেন? বাঃ, বেশ!

প্রিয়নাথ একটু হাসে।—আসি তাহলে।

যাবেন? কিন্তু আলোফালো তো আনেননি দেখছি! টর্চটা নিয়ে যান বরং।

থাক্। জ্যোৎস্না আছে।

বিজয়েন্দু বলে—আচ্ছা, আসুন। স্বাধীন, প্লীজ—আমি এগিয়ে দিতে যাচ্ছিনে। ভীষণ মুড এসে গিয়েছে। কেটে যাবে। প্লীজ!

প্রিয়নাথ বলে—থাক, এগোনোর কী দরকার?

স্বাধীন পা বাড়িয়ে বলে—না। গোলকধাঁধার ব্যাপার। বেরোতে পারবেন না। সে আমলে চোর-ডাকাতের ভয়ে অদ্ভুত গোলমেলে বাড়ি করেছিলেন ঠাকুর্দা। ঢোকা সহজ, বেরুনো কঠিন।

ঠাকুরবাড়ি পেরিয়ে প্রাঙ্গণে নামে ওরা। গেট অব্দি নিঃশব্দে এসে টর্চটা হাতে গুঁজে দেয় স্বাধীন। বলে—এখান থেকে ফ্ল্যাশ করুন, আমি যেতে পারব।

আলোটা ধরে থাকে প্রিয়নাথ। সেই উজ্জ্বলতার মধ্যে পরীমূর্তি চলে যায়। তারপরও কতক্ষণ কেটে যায়। হঠাৎ হুঁশ ফেরে তার। তখন আলো নিভিয়ে গেট খুলে রাস্তায় নামে। হনহন করে হাঁটে।

একটু পরে পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে সে ঘোরে। আলো ফেলেই স্তম্ভিত হয়।

কুসুম দুহাতে মুখ ঢেকে বলে—আঃ! কী করছেন নতুনবাবু?

প্রিয়নাথ বলে—তুমি! এখনও কী করছিলে? কোথায় ছিলে?

আপনাদের কাছেই ছিলাম। আঃ, আলো নিভিয়ে ফেলুন না!

প্রিয়নাথ আলো নেভায়। কুয়াশা মাখা জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে মনে হয়, যা কিছু দেখছে—কোনটাই বাস্তব নয়।

দাঁড়ালেন কেন?

তুমি চলে যাও, তারপর আমি যাব।

পিছনে গেলে ভয় লাগবে বুঝি? কুসুম অস্ফুট হাসে।

তোমাকে আমার ভয় লাগে না। বলে প্রিয়নাথ পা বাড়ায়

বাগানে দুজনে কী করছিলেন বাবু?

তুমি তো দেখেছ। চিড়িয়াখানা দেখছিলাম।

আপনি চিড়িয়াখানা দেখেননি? বলুন তো কী কী দেখলেন? পারবেন না।

কুসুম, তুমি আমার পিছনে লেগেছ কেন?

আপনার পিছনে ছায়া পড়েছে বাবু, তাই পিঠরকে করছি।

ফাজলেমি রাখো!

নতুনবাবু!

কী?

স্বাধীনদিকে কেমন লাগল?

ভাল। কেন?

জামাইবাবুকে?

খুব ভাল। কেন একথা জিজ্ঞেস করছ?

আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, স্বাধীনদি উঠোনে দাঁড়িয়ে আপনার কথা ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে চাঁদের গায়ে আপনার চেহারা দেখছেন।

বাঃ, চমৎকার। আর জামাইবাবু?

তিনি লেখাপড়া করছেন, কিন্তু মন বসছে না। তিনিও আপনার কথা ভাবছেন। কাগজে আপনার নাম লিখছেন আর ঢ্যারা কেটে দিচ্ছেন। তাতে মানুষের ক্ষতি করা হয়।

শুনে খুশি হলাম, কুসুম।

আপনারা যখন বাগানে ছিলেন, একটা গন্ধ পাননি? খুব মিষ্টি গন্ধ!

হুঁউ, পাচ্ছিলাম।

গন্ধটি আমি দিয়েছিলাম।

তাই বুঝি? তুমি গন্ধ দিতে পার?

পারি। ওই গন্ধ শুঁকে আপনি স্বাধীনদিকে, স্বাধীনদি আপনাকে মনে মনে সব সময় খুঁজবেন। দুজনের চোখে ঘুম হবে না। একটু-আধটু হলে স্বপ্ন দেখবেন দুজনে দুজনকে। কোন কাজে মন বসবে না। সব খারাপ লাগবে। একদণ্ড কেউ কাউকে না দেখলে, কথা না বললে থাকতে পারবেন না। খুব কষ্ট হবে মনে।

ভেলকি লাগিয়ে দিয়েছ তাহলে?

প্রিয়নাথ কিছু ব্যঙ্গ ও কৌতুকে একথা বলেই পিছন ফেরে এবং কুসুমের জ্বলজ্বলে চোখদুটো দেখতে পেয়ে ভড়কে যায়। আশ্চর্য, আশ্চর্য, আশ্চর্য! এমন চোখ তো জন্তুদের দেখা যায়। সে আর তাকাতে পারে না। ঘোরে পূর্ববৎ। জামাইবাবুর ভুরুর মধ্যে আঙুল ছুঁইয়ে অবশ করার কথাটা তার মনে পড়ে যায়।

ঠাট্টা নয়। আমি দুজনকার মধ্যে ভাব জন্মে দিয়েছি। আর তার সঙ্গে একটা কাজও করেছি বাবু। জামাইবাবুর মধ্যে ধোঁকা ঢুকিয়ে দিয়েছি। একটা গন্ধ পোকাকে বলেছিলাম, গন্ধ হ—হল। একটা কুচট পোকাকে বললাম, জামাইবাবু হাই তুললে মুখে ঢোক—ঢুকে গেল। আপনাদের ভাব হল আর জামাইবাবুর মনে কু ঢুকল।

তুমি অনেক কিছু পার তাহলে।

পারি।

বলত মৃগাঙ্কবাবু এখন কোথায়, কী করছেন?

বহরমপুর থেকে বেরিয়েছেন। পাকা রাস্তায় ওনার গাড়ির আলো দেখতে পাচ্ছি। খুব জোরে আসছেন।

তোমাকে সরকারের লাখ টাকা মাইনে দিয়ে রাখা উচিত।

বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা। দেখবেন পরে।

প্রিয়নাথ হঠাৎ দাঁড়ায়। ঘুরে বলে—তুমি জামাইবাবুকে আঙুল ছুঁয়ে অবশ করেছিলে শুনলাম। পার আমাকে অবশ করতে?

পরখ করবেন?

হ্যাঁ।

কষ্ট পাবেন।

আমি পাবো। এস, দেখাও তোমার শক্তি।

কুসুম এগিয়ে এসে খুব কাছে মুখোমুখি দাঁড়ায়। ডান হাতটা ম্যাজিশিয়ানের মতো তোলে। তারপর তর্জনীটা চাঁদের ওপর দিয়ে এনে তার ভুরুর মধ্যে রাখতেই প্রিয়নাথ তার শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ পায়। মুহূর্তে সে দিশাহারা হয়ে তাকে দুহাতে বুকে চেপে ধরে। কুসুম ব্রেসিয়ার পরেনি, টের পায় এবং তার কঠিন দুটি স্তন বুকে অনুভব করতে করতে সে তীব্র আবেগে ওর মুখের দিকে মুখ নিয়ে যায়। কুসুম এত জোরে তার নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে যে অস্ফুট আর্তনাদ করে ছেড়ে দেয় প্রিয়নাথ। কুসুম সরে যায় না। জ্যোৎস্নায় তার চোখদুটো আরও জ্বলজ্বলে নীল দেখায় এবং দাঁতগুলো ঝকঝক করে ওঠে। সে ফের কামড়াতে আসছে ভেবে প্রিয়নাথ সাবধান হয়। কুসুম কি হাঁফাচ্ছে? সে বলে—আসুন। কী হল নতুনবাবু? পারবেন না? ঠোঁটে হয়ত রক্ত। মুছে প্রিয়নাথও হাঁফাতে-হাঁফাতে বলে—তুমি কি কাঁচা মাংস খাও? রাক্ষসী কোথাকার।

কুসুম নিঃশব্দে হাসছে। তার দাঁতগুলো আরও ঝকমক করছে। চোখের নীল আলো আরও জ্বলছে। চুলগুলো খুলে এলিয়ে কিছু বুকের দিকে কিছু পিঠে গিয়ে পড়েছে। প্রিয়নাথের এবার সেই পাটক্ষেতে যেমন হয়েছিল, একটা চাপা আতঙ্ক গুরগুর করে ওঠে মনে। সে দেখে, কুসুম ওইভাবে দাঁড়িয়ে এবার একটু-একটু দুলছে—শরীরের উপর দিকটা শুধু। তারপর মাথাটাও দুলতে লাগল। তারপর আরও জোরে শুরু হল দোলা। চুলগুলো এদিক ওদিক জ্যোৎস্নায় ছলকে পড়তে থাকল। প্রিয়নাথ ভয়ে এদিকে-ওদিক তাকায়। কোথাও কোন মানুষ নেই। রাস্তার ওপর গাছের ছায়াগুলো দুলছে। দূরে কোথায় গরুর গাড়ির চাকার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। আবছা শোনা যাচ্ছে গাড়োয়ানের গান।

হঠাৎ কুসুম পড়ে গেল ঠাণ্ডা ভিজে পিচের ওপর। হাতেপায়ে খেঁচুনি হল একটুখানি। এইসময় তার কোলের কাছ থেকে একটা পুঁটুলি ছিটকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর টানটান শরীর ধনুকের মত বেঁকে চিৎ হয়ে গেল। কিন্তু জ্বলজ্বলে নীল চোখ আর শব্দহীন হাসি রয়ে গেল, যেমন ছিল! তারপর প্রিয়নাথের মনে হল, সে বলছে—চাপা, বিড়বিড়, অস্পষ্ট কী সব কথা। পালাতে পারল না প্রিয়নাথ। ভয় পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু তার জেদ তাকে নড়তে দিল না। সে ঝুঁকে পড়ল। ডাকল— কুসুম, কুসুম। এই কুসুম।

কুসুম অস্ফুট বলতে থাকে—'তুই অপেয়ে, লক্ষ্মীছাড়া, হাভেতে। তোকে গন্ধ পোকার গন্ধ দিলাম। তুই আমাকে চিনলি না। তুই চলে যা দেশ ছেড়ে। তোর জন্যে আকাল লাগবে দেশে। বিষ্টি হবে না; নদীর জল শুকিয়ে যাবে। মড়ক লাগবে। পেঁচা ডাকবে। শেয়াল শকুন মানুষের মাংস ছিঁড়ে খাবে। কামিখ্যের ডাকিনী এসে বাতাসের সুরে গান গাইবে। তুই যা, চলে যা। দূর দূর দূর। যা—যা।

কী একটা কষ্টের ঢেউ বুক থেকে ঠেলে ওঠে প্রিয়নাথের। সে ডাকে—কুসুম, কুসুম, এই কুসুম।

সেই সময়ে বাঁকের মুখ থেকে তীব্র আলো আসতে থাকে। মোটর সাইকেলের শব্দ শোনা যায়। প্রিয়নাথ সাঁত করে উঠে দাঁড়ায়। মৃগাঙ্ক নয় তো? ভাবতেই কুসুমের কথাটা মনে পড়ে যায়। সে নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ যে অসম্ভব ব্যাপার।

মোটর সাইকেলটা কাছে এসেই দাঁড়ায়। —প্রিয়বাবু। ও কি? কুসমি না? কী ব্যাপার।

জামাইবাবুর সঙ্গে এসেছিলাম। ফেরার পথে দেখি এভাবে পড়ে আছে।

মাগীর মৃগীটিগী আছে। চলে আসুন। ব্যাকে বসুন। ফিরতে দেরি হল—যা ঝামেলা লেগেছে।

প্রিয়নাথ ইতস্তত করে। কিন্তু ও এমন ভাবে...

হারামজাদির ঢং। কী মতলব আছে। চলে আসুন তো মশাই।

সেরাতে ভাল ঘুম হয়নি প্রিয়নাথের। শুধু মনে হচ্ছিল, ওভাবে কুসুমকে ফেলে চলে আসা ঠিক হয়নি। রাস্তার ওপর, রাত্রিবেলা এবং শিশিরের মধ্যে মেয়েটি পড়ে থাকবে, একথা ভাবতে অনুশোচনায় দুঃখে সে অস্থির হচ্ছিল। বিশেষ করে মৃগাঙ্ক একটা গল্প বলেছে আসার পথে, সেটা

সাংঘাতিক। কোথায় নাকি—কোন গাঁয়ের পাশে এক রাস্তায় কয়েকটি বাউরি ডোম মানুষ শুঁড়িখানা থেকে আসতে আসতে মাতাল হয়ে শুয়ে পড়ে এবং অঘোর ঘুমে কাঠ হয়। রাতটা ছিল অন্ধকার। একদল গাড়োয়ান আসছিল গরু-মোষের গাড়ি নিয়ে। গাড়িতে খন্দের বোঝা ছিল। তলায় লণ্ঠন ছিল শুধু সামনের গাড়িটার এবং তাই-ই থাকে। বাকিগুলো আলো ঝোলায় না। আর সে আলোও অস্পষ্ট, দুলন্ত কাঁপা-কাঁপা। প্রথম লোকটির পেটের ওপর চাকা উঠতে সে ককিয়ে ওঠে। এতে ভয় পেয়ে গরু বা মোষ দুটো দৌড় দেয়। পিছনের ঘুমকাতর গাড়োয়ানগুলোও কিছু বুঝতে না পেরে জন্তুগুলোকে তাড়া লাগায়। এর ফলাফল খুব সাংঘাতিকই হল। তিনজন মাতাল মারা গেল, বাকি দুজনের হাত-পা ভেঙে নুলো হয়ে পড়ল বাকি জীবনের মত। আর, এই ভয়ঙ্কর গল্প বলার পর উদ্দাম হেসেছিল মৃগাঙ্ক। সারারাত এই গল্পটা তাড়িয়ে মেরেছে প্রিয়নাথকে। একবার দেখেছে, চোখ ঠেলেওঠা কুসুমের বীভৎস মড়া একহাত জিভ বের করে রাস্তায় পড়ে আছে। আবার দেখেছে, নুলো পা-কাটা কুসুমের দেহ ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে হাসতে হাসতে তার দিকে এগোচ্ছে। প্রিয়নাথ স্বাধীনের কথা ভেবেছে এবং সেই অচেনা মিষ্টি গন্ধটা হাতড়েছে, কিন্তু পলকে কুসুমের প্রবাহ সব নষ্ট করেছে। তবে বেশি করে মনে আটকেছে, কুসুমের সেই পুঁটলিটা। ছিটকে পড়ে যা একপাশে অবহেলায় চুপ করে রইল। কী ছিল ওতে? একটা নতুন কাপড় কি দিয়েছিল স্বাধীন? কিছু চাল বা ছোলামুসুর গমও নিশ্চয় দিয়ে থাকবে। কুসুম আসলে গরিব মেয়ে। ভিক্ষে করতে বাধে বলেই হয়ত ওভাবে বেঁচে থাকে। প্রিয়নাথ দারিদ্রের কষ্ট জানে...

আর, সম্ভবত কুসুমের হিস্টিরিয়া বা মৃগী রোগ আছে—মৃগাঙ্ক ঠিকই বলেছে। প্রিয়নাথের বাবা নামকরা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন। তাঁর কাছে এসব অসুখের অনেক গল্প ছেলেবেলায় সে শুনেছে। দেখেছেও অনেক। স্মৃতি হাতড়ে দুটো নাম মনে অসছিল : বেলেডোনা, ইগ্নেসিয়া। হ্যাঁ, বাবা এই দুই নিদানের কথা বাতলাতেন বটে। এবং এইসব মনে আসায় প্রিয়নাথ প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল। তারপর টের পেল, সে কে এবং কোথায় কী করছে। সে ট্রাকটার চালায়। চাষবাস মোটামুটি বোঝে। বর্ধমানের একটা এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ফার্মিং সোসাইটিতে বছর দুই চাকরি করেছিল। ডিরেক্টরদের কো-অপারেটিভ ফার্ম শেষঅব্দি লিকুইডেশনে যায়। কী কাণ্ড! সেখানেও তাকে কে যেন বলেছিল—আপনিই মশায় বড্ড অপয়া! এত ভাল চলছিল সব—এলেন আর উচ্ছন্নে গেল! হ্যাঁ—তাই গিয়েছিল বটে। সেবার ভাল ফলনই হল না। ক্যানেল জল দিল না। খরা ছিল। পাম্পিং সেটগুলো বিগড়ে রইল। অদ্ভুত ব্যাপাব, তদন্ত বসল। গাজিয়াবাদের কোম্পানির নামে মামলা করা ঠিক হল—তারাই পাঠিয়েছিল সব যন্ত্রপাতি। আর ট্রাকটারের পিছনে হ্যারোর তলায় কীভাবে অরুণ নামে তার সহকারী ছেলেটি...আঃ, সে সব বড় ভয়ঙ্কর ঘটনা।

তারও আগে প্রিয়নাথ যেখানে যেখানে ছিল, যা যা করেছে, খুঁটিয়ে দেখছিল। কুসুম ঠিক বলেছে—তার পয় নেই। তার পিছনে প্রকৃতই একটা মারাত্মক ছায়া আছে। রাহু আছে। এবং ফের উঠে বসতে চেয়েছে প্রিয়নাথ। তার জন্মকোষ্ঠিতে তো এখন রাহুর দশা চলেছে! কোষ্ঠিটা বাকসে আছে। কাল একবার কোন জ্যোতিষীর কাছে যাবে নাকি?

পরক্ষণে ফের কুসুম এসে তার বিশ্বাস-অবিশ্বাস-কৌতূহলকে ঝেঁটিয়ে শুকনো পাতার মত উড়িয়ে দিচ্ছিল। তার কানে ভেসে এল : আপনার জন্মের সময় ঈশান কোনায় প্যাঁচা ডেকেছিল। বায়ু-কোনায় শেয়াল ডেকেছিল। আপনার মায়ের প্রসব যন্ত্রণার সময় সাপে ব্যাঙ ধরেছিল। টিকটিকির লেজ খসে পড়েছিল। আর কামাখ্যার ডাকিনী এসে শুকনো ডালে বসে বাতাসের সুরে গাইছিল।...

ফার্মের নৈঋতকোণে যে গাব গাছটা আছে, শেষরাতে ঘুম ও জেগে থাকার কুয়াশাময় আচ্ছন্নতার মধ্যে প্রিয়নাথ গান শুনছিল। ডাকিনীটা চেরা গলায় কী বলতে চেষ্টা করছে—কাঁপা-কাঁপা সুর, পোকামাকড়ের ডাকের মত গভীর।

সকালে প্রিয়নাথ মৃগাঙ্ককে শুধিয়েছিল—কাল কিসের শব্দ হচ্ছিল বলুন তো কেমন যেন অদ্ভুত আওয়াজটা...

মৃগাঙ্ক জবাব দিয়েছিল—পাখিটাখি হবে।

কিন্তু কুসুমের তেমন কিছু ঘটেনি, তা পরে জানতে পারল। ঘাটের মাচায় বসে গগন হালদারের মুখে শুনল, কুসুম রেজলাপাড়ার হাটে গেছে। মাথায় শাকসবজির ঝাঁকা ছিল। পরনে নতুন কোরা শাড়ি—তার পাড় ডগমগে লাল। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা ছিল বড়। সকালে ভৈরবে চান করেছিল। ভিজে চুল এলিয়ে দুমাইল দূরের হাটে বসতে গেছে সে।

কয়েকটা দিন চৈতালীর জন্য ফার্মে ব্যস্ততা চলেছে। বিকেলেও মৃগাঙ্কের সঙ্গে জমিতে নামে প্রিয়নাথ। ধনচে বোনা হয়েছিল সারের জন্যে। সব উল্টে দেওয়া হয়েছিল। পচধরা ভুটভুটে মাটি শুকিয়ে এসেছে। মাটি পরখ করা হচ্ছে প্রতিদিন। মজুর-মজুরনীরা মাষকলাই তুলছে। ভুট্টার গাছগুলো সাদা হয়ে রয়েছে। একট্রাক ভুট্টা চালান গেছে কদিন আগে। শুকনো গাছগুলো কাটা হচ্ছে। কাতকে-লঘু নামক ধান হার্ভেস্টার কম্বাইনে কেটে মাড়াই করা হল। এসব নিয়ে প্রিয়নাথ ব্যস্ত থাকে। কিন্তু মনে সেই গন্ধপোকার গন্ধ। মন মউ-মউ করে।

এক সন্ধ্যায় আর পারে না সে। সোজা চাঁইপাড়া চলে যায়। চাঁদ উঠতে দেরি আছে অনেক। ধোঁওয়া আর কুয়াশায় পাড়ার আকাশ ঘন নীল হয়ে রয়েছে। দাঁত বের করা ছোট ছোট কুঁড়েঘর সব। হতশ্রী। খড়, তালপাতা বা কোঙাপাতার চাল। দেয়াল পাটকাঠির—ওপরে মাটির চাবড়া আছে। ঝগড়াঝাঁটি বেলায়-বেলায় ভীষণ হয় এ পাড়ায়, গগন বলেছিল। বলেছিল, একহাজার শাকচুন্নী আর ডাকিনীর বাসা। চিল শকুন ওড়ে সবসময়। সেটা ঠিক। সুর ধরে গাল দিচ্ছে কে কাকে, নেচে-নেচে খোট্টাই ভাষায় খিস্তি করছে। পুরুষগুলোর পাত্তা নেই। হয়ত এখনও গাঁওয়াল সেরে আসেনি।

প্রিয়নাথকে কেউ গ্রাহ্যও করে না। আজকাল এমন মানুষ সবখানে দেখে দেখে চোখ ভোঁতা হয়ে গেছে। একটা কমবয়সী মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল—ঘাটকা পাশ। হুই গাছকা তলাসে—হুই ঘরঠো।

গেল না সঙ্গে। কুসুম একঘরে, প্রিয়নাথ শুনেছে। তার আগুন জল বন্ধ। কিন্তু আজকাল এ দিয়ে কেউ জব্দ হয় না, সবাই জানে। প্রিয়নাথ একটা পোড়ো জমি, ঝোপঝাড় আর একটা সবজি ক্ষেতের আল দিয়ে পাটকাঠির বেড়ায় ঘেরা বাড়িটিতে পৌঁছোয়। এ দেশে এত গাব গাছ কেন জন্মায়, কে জানে! গাব গাছটা উঠোনের কোনায়। বিশাল আর অন্ধকার। নির্জন খাঁ-খাঁ চারদিক। আলো কমে গেছে দিনের। বেগুন ক্ষেতে একটা মড়ার খুলি লাঠিতে লটকানো দেখছিল। বেড়ার একখানে আগড়। কাঁটার আগড়। এবং চমকে উঠে প্রিয়নাথ দেখল, আগড়ের মাথাতেও একটা মড়ার খুলি। উঠোনটা ঝকমক করছে। দুধারে লঙ্কাগাছে লঙ্কায় লাল টুকটুকে রঙ এখনও মোছেনি অন্ধকার। শশা লাউ ইত্যাদির মাচান এবং মড়ার খুলি। আর অনেক ফুলের গাছ। জবা, জুঁই, টগর, কাঠমল্লিকা—নানারকম। তারপর উঁচু ছোট্ট দাওয়া—দাওয়ার পিছনে পরিচ্ছন্ন ঘরের দেওয়ালে কী সব আঁকা রয়েছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। প্রিয়নাথ ইতস্তত করে ডাকতে। ঘরে কোন আলো নেই, বাইরেও নেই। কুসুম আছে তো? সে ভাবল, গগনকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল। কে কী ভাববে হয়ত।

হঠাৎ কানে এল গুনগুন করে কে গেয়ে উঠেছে—

সাঁঝ দে লো সনঝেমণি
সাঁঝ বইয়া যায় গে...
সাঁঝ দে লো।

সুরটা অদ্ভুত—খুব পাড়াগেঁয়ে, খুবই পুরনো, রহস্যময়। কারণ, এ যেন অন্ধকারের গান, অন্ধকার ছাড়া এ মানায় না, অর্থবহ এ হয় না। আর গাব গাছের ওপরে প্যাঁচা ডেকে উঠল। ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও। কতকগুলো জোনাকি জ্বলে উঠল ঝোপঝাড়ে। পোকামাকড়ের ডাক বেড়ে গেল। তারপর ফস করে দেশলাই জ্বলল গাবতলায়। হ্যাঁ, কুসুম। হেঁটে হয়ে একটা পিদিম জ্বালছে।

জ্বেলে করজোড়ে প্রণাম করে এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল। তারপর 'এই মা গে, মা!' বলে খিলখিল করে হাসতে হাসতে প্রায় লাফ দিয়ে ফাঁকা উঠোনে চলে এল।

প্রিয়নাথ তখনও চুপ। সে ভাবছিল, কুসুমের ব্যাপারগুলো কি সত্যি লোকদেখানো, ধোঁকাবাজি, রোজগারের ধান্দা? আর বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিছু একটা নিয়ে ও আছে, এটা ঠিকই। সে কাশবে ভাবল, পারল না। কুসুমকে চমকে দিতে ইচ্ছে করছিল না তার।

তারপর সে দেখে, কুসুম হনহন করে আগড়ের দিকে এগিয়ে আসছে। সামনে এসেই সে থমকে দাঁড়াল। তখন প্রিয়নাথ দেখল, তার হাতে একটা বাঁকামত কী রয়েছে, কাটারি।

ওঃ! নতুনবাবু! আমি ভাবলাম...আসুন। বলে সে কাঁটার জটিল আগড়টা সরাল।

প্রিয়নাথ ঢুকলে সে আগড়টা বন্ধ করল। প্রিয়নাথ বলল—থাকতে পারলাম না। চলে এলাম। সেরাতে তোমাকে অমনভাবে রাস্তায় ফেলে চলে আসতে হল। তুমি কি রাগ করেছিলে?

কুসুম কিছু জবাব না দিয়ে দাওয়ায় একটা চটের আসন বিছিয়ে দিল।—বসুন নতুনবাবু।

কুসুম, আলো জ্বালবে না?

আলো আমার ভাল্লাগে না।

কুসুম!

কুসুম দরজার কাছে সরু ধাপটায় বসল।—উঁ?

সে রাতে...

তাই বলতে এসেছেন নাকি? অমন হয়। ছোটলোকের মেয়েরা সব পারে, তা জানেন না? কুসুম একটু হাসে।

এখন তো চমৎকার কথা বলছ দেখি। মাঝে মাঝে অমন পাগলামি কেন কর কুসুম?

কুসুম তারও জবাব দেয় না। তারপর হাত বাড়িয়ে বলে—একটা সিগ্রেট দিন না, টানি।

খাও তুমি?

মাঝে মাঝে।

প্রিয়নাথ সিগারেট দেয় ওকে। কুসুম তার বুকের কাছ থেকে দেশলাই বের করে বলে—আপনি খাবেন না? থামুন, দেশলাই আছে—জ্বেলে দিই।

প্রিয়নাথেরটা জ্বেলে দেয়। তখন প্রিয়নাথ তার মুখের দিকে তাকায়। চোখে চোখ পড়তেই কুসুম হাসে। এত সুন্দর লাগে ওকে। এ কি ভালবাসা, না নিতান্ত কাম? প্রিয়নাথ আনমনা হয়ে পড়ে।

কুসুম সিগারেট টেনে বলে—সিগ্রেট আমি ভালবাসি।

কুসুম, তোমার সেই গন্ধপোকা তো কোন কাজ দিল না। আমি স্বাধীনকে বা স্বাধীন আমাকে পাবার জন্যে মোটেও ছটফট করছে না।...প্রিয়নাথ সকৌতুকে বলে কথাটা।

সে জন্যেই এলেন নাকি?

ধরো, তাই।

কাজ হল না বলছেন?

উঁ হুঁ।

তাহলে আমার আর কিছু করার নাই, নতুনবাবু।

এমনভাবে কুসুম একথা বলে যে প্রিয়নাথ চমকে তার দিকে তাকায়। অন্ধকার দাওয়া। মশা কামড়াচ্ছে। শুধু সিগারেটের আগুন ছাড়া আলো নেই। কিন্তু কোথায় গেল ওর সেই জ্বলজ্বল নীল তীব্র চোখদুটো। সেই অমানুষী ডাকিনী হাবভাব একটুও নেই কেন।

প্রিয়নাথ বলে—বোঝা গেল তোমার ক্ষমতার দৌড়!

কদিন থেকে আমার মন ভাল নাই, ওকথা ছেড়ে দিন।

কেন মন ভাল নয়। কী হয়েছে শুনি।

বাণ মারা কি জানেন?

শুনেছি।

কেউ আমাকে বগাবাণ মেরেছে। বগাবাণ।

সে আবার কী!

দুরকম বাণ আছে : বগাবাণ, বগীবাণ। বগাবাণ মারলে পালটা বগীবাণ মারতে হয়। আচ্ছা নতুনবাবু, সেরাতে রাস্তায় যখন আমাকে ধরলেন, মাথার ওপর কী ধারে কাছে সাদা বক দেখেছিলেন?

লক্ষ করিনি।

আমার পরে মনে হয়েছে, আপনি যখন আমাকে চেপে ধরলেন, মাথার ওপর বক উড়ে গেল।

আবার তুমি হেঁয়ালি করছ কুসুম?

না নতুনবাবু। আমি...কদিন থেকে অবশ হয়ে আছি। মাথা ঘোরে, বমিবমি লাগে, কিছু ভাল্লাগে না।

তোমাকে কি কেউ কোনদিন ধরে ফেলেনি কুসুম—আমার মত। মিথ্যে বল না।

হুঁউ মিথ্যে কেন বলব। গরিবগুরবো মেয়ে—পেটের দায়ে, বনবাদাড়ে যাই, হাটে-মাটে যাই। বাগে পেয়ে অনেকে ধরতে এসেছে—ধরেছেও। পারেনি। আমার জোর আছে। কিন্তু কেউ আমাকে চুমো খায়নি। আমাকে আপনি এঁটো করে দিয়েছেন যে! আমার এঁটো হওয়া বারণ...কুসুম অস্পষ্ট শব্দে হাসে।

কুসুম, আমি হয়ত তোমাকে..

হুঁ, বলুন।

আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

ও কথা অনেক বাবু অনেকবার বলেছে আমাকে। আমার শরীরটা ওদের শুধু পছন্দ—তা বুঝতে পারি। আমি লেখাপড়া জানি না, ছোটলোক জাত। তবু বুঝি সব। আমার আরেকটা চোখ আছে। ফাঁকি দিতে পারবে না। খিদে পেলে সবাই যা পায়, খায়। কিন্তু বাবুরা সখ করে বনের ফল পেড়ে খেতে চায়। বন ফল দেখতে সুন্দর, বনে ফলে—কিন্তু বিষের কোয়ায় ভরা।

বাঃ, তুমি এখন কত ভাল কথা বলছ কুসুম। কিন্তু মাঝে মাঝে ওসব এলোমেলো বকো কেন?

কী বকি?

আমি অপয়া। আমার জন্মের সময় কী সব ডেকেছিল...

আমি বলি?

হ্যাঁ, মনে পড়ছে না বুঝি?

কে জানে। শিকারে বেরিয়ে সাপ সামনে ছায়া পড়লেও দংশায়।

তুমি তখন শিকারে বেরিয়েছিলে তাহলে?

কী শিকার? সেদিন পাটক্ষেতে—

তারপর রাতে রাস্তার ওপর...

মাঝে মাঝে আমার কেমন হয়! আর কী বলব?

কুসুম?

উঁ?

তুমি এখানে একা থাক! এমনি করে চিরকাল একা থেকে যাবে? ভাল লাগে?

বাঁজা ডাঙায় কাঁকর ছাড়া কিছু কি ফলে নতুনবাবু?

ভ্যাট! তুমি অত ভাল মেয়ে!

পাথরে জল শোষে না, তা জানেন তো? আমি পাথর।

কেন?

আমাকে জ্বালাবেন না। অন্য কথা বলুন। চা খান তো বলুন, করে দিই। দুধ চিনি চা সব আছে ঘরে। আমি চা না খেয়ে থাকতে পারি না! আমি গেলেই স্বাধীনদি বড় গেলাসের এক গেলাস চা করে খাওয়ায়। ওই একজনই আমাকে সত্যি করে ভালবাসে। ...বলে কুসুম ওঠে।

থাক। চা খাব না। তুমি বস।

কুসুম বসে পড়ে।

তোমার মায়ের কথা বল।

হঠাৎ ও কথা কেন শুনি?

তোমার মায়ের সম্পর্কে অনেক অদ্ভুত গল্প শুনেছি।

হুঁ, শুনবেন। মা ডাকাতের দল করেছিল। জেল খেটেছিল—সে সব তো মিথ্যে নয়। মা বহুরূপী সাজত। মা ডাইনী ছিল—কচি ছেলের রক্ত চুষে খেত। সেও মিথ্যে নয়। মায়ের কাছে কী সব ছিল। আমাকে কিছু কিছু দিয়ে গেছে মা।

কী সেগুলো?

অত বুঝিয়ে বলতে পারিনে। ওই গাব গাছটার তলায় সেজন্যেই তো সাঁঝ জ্বালি।

আচ্ছা কুসুম, তোমার মায়ের মড়া কেউ ফেলেনি। তুমি নাকি পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে...

হঠাৎ কুসুম দু-হাঁটুর ফাঁকে মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে উঠল। প্রিয়নাথ অপ্রস্তুত। কী বলবে, ভেবে পায় না।

একটু পরে সে হাত বাড়িয়ে ওর কাঁধ ছোঁয়।—কুসুম, কুসুম!

কুসুম মুখ তোলে। আঁচলে চোখ ও নাক মোছে। তারপর বলে—আপনি আর কতক্ষণ থাকবেন?

চলে যাব বলছ?

হ্যাঁ। লোকে দুষবে আপনাকে।

আমি পরোয়া করিনে, কুসুম। আমি এক ছন্নছাড়া মানুষ। সংসার করিনে যে ভয় পাব। তুমি ঠিকই বলেছিলে—আমি অপয়া, লক্ষ্মীছাড়া, হাভেতে। সেজন্যেই তো মরিয়া হতে পারি। তুমি ভেবো না।

একদমে কথাগুলো বলে প্রিয়নাথ টের পায়, সেদিনের মত শুধু নাকেই শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে তার। তখন সে একটু হাঁ করে বাতাস ভরে নিতে থাকে।

কুসুম বলে—একটা ছোটলোকের মেয়ের মধ্যে এত কী পেলেন নতুনবাবু? মনটা বেঁধে রাখতে এত সাধ কেন তার কাছে?

জানি কিংবা জানি না।

আপনাকে স্বাধীনদি খুব ভালবাসে। বিশ্বাস করুন। সবসময় আপনার কথা বলে। আমি বুঝতে পারি। আপনি তার সঙ্গে ভাব করুন না। খুব সুখ পাবেন। ...একটু হাসে সে।

সুখ। কী আছে সুখে? ...বলে ফের সিগারেট বের করে প্রিয়নাথ। —তুমি আর খাবে?

না। আপনি খান। আমি জ্বেলে দেব?

দাও।

সিগারেটটা জ্বেলে দিয়ে কাঠিটা মেঝেয় ঘষে নেবায় কুসুম। তারপর বলে— আপনি মদ খান না?

একটু-আধটু। কেন?

খাবেন?

প্রিয়নাথ অবাক হয়।—তুমি কোথায় পাবে মদ? খাও নাকি তুমি?

আপনার মতই একটু-আধটু খাই।

বল কী!

ছোটলোকের মেয়ে তাড়ি-মদ খাবে না! এদেশে সবাই খায়। খরার সময় তো তাড়িই আমাদের খাবার। তবে মদ আমি নিজে তৈরি করি। চাল কলা গুড় লাগে। এক বোতল হলেই আমার মাস চলে যায়। বেশি তো খাইনে। আমাদের খেতে হয়—নিয়ম আছে। মা শিখিয়েছিল। খাবেন? দেব?

দাও।

কুসুম উঠে ঘরে ঢোকে। দেশলাই জ্বালে। একটা লম্ফ জ্বলে ওঠে। ঘরের ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পায় না প্রিয়নাথ। একটু পরে কুসুম ফুঁ দিয়ে লম্ফ নিবিয়ে বেরিয়ে আসে। একটা বোতল তার হাতে আবছা দেখা যায়। একটা কাচের গেলাস সামনে রাখে সে। তারপর কিছু ঢেলে দিয়ে বলে—খান। সুপুরি আছে, দেব? আমি সুপুরি মুখে না দিলে পারিনে।

প্রিয়নাথ গেলাসটা তুলে গন্ধ শোঁকে আগে। দিশি মদ। উৎকট ঝাঁঝ। খুব জোরাল জিনিস, তা সে বুঝতে পারে। একটু ইতস্তত করে গলায় ঢেলে দেয়।

কেমন বলুন তো? ভাল জিনিস না?

তোমার হাতের জিনিস। অমৃত ছাড়া কি হবে?

সুপুরি নিন।

হাত বাড়িয়ে সুপুরি নিতে গিয়ে কুসুমের হাতটা সে ধরে।—কুসুম, আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

কুসুম খিলখিল করে হাসে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—ভালবাসার চেষ্টা করলেই আমার ভর উঠবে। ভয় পেয়ে যাবেন—নতুন মানুষ। ও কথা থাক নতুনবাবু।

প্রিয়নাথ বলে—আরও খেতে ইচ্ছে করছে।

খান। কিন্তু মানী মানুষ—নতুন মানুষ। নিজের মান রেখে চলবেন, সাবধান।

হ্যাঁ। সে তুমি ভেবো না। এতটুকুতে কিছু হয় না আমার। কুসুম আরও খানিকটা ঢেলে দিয়ে বলে—কিন্তু এ জিনিস খুব সহজ নয়। সামলাতে পারবেন না। এর বেশি আপনাকে দেবও না। নিন।

প্রিয়নাথ খায়, সিগারেটটা জোরে-জোরে টানে। এত অল্পে এত শিগগির নেশা ধরে গেল। কী—আছে ওতে? সাংঘাতিক কিছু নেই তো? সে একটু অস্বস্তিতে পড়ল। হ্যাঁ, নেশাটা বেশ তেজী মনে হচ্ছে। আফসোস হল, ঝোঁকের মাথায় না খেলেও পারত।

বাবু, ও নতুনবাবু? কী ভাবছেন গো?

তোমার কথা।

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এই কুসুম খালি? যার কথা ভাববার, তাকে ভাবুন।

কুসুম, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

কোথায়?

যেখানে খুশি। আমি তোমাকে ভালবাসি কুসুম।

আপনার নেশা হয়েছে! চলে যান।

কুসুম।...ওর দিকে হাত বাড়ায় প্রিয়নাথ।

কুসুম দ্রুত সরে বসে। ওর কণ্ঠস্বরে একটা আতঙ্ক আছে মনে হয়। ও বলে—বাবু, নতুনবাবু! দোহাই আপনার—আপনি ওসব কথা বলবেন না! সে আসছে। গাব গাছের পাতায় শব্দ হচ্ছে, ওই শুনুন। না—না, ছোঁবেন না আমাকে, ছোঁবেন না।

প্রিয়নাথ চাপা গর্জায়।—ওসব আমি মানিনে!

আর সেই মুহূর্তে গাছের পাতার সর-সর আওয়াজ হতে থাকে। প্যাঁচাটা ফের ডেকে ওঠে—ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও। হঠাৎ কী হয়, গাবতলার পিদিমটাও নিভে যায় দপ করে। নদীর ধারে খুবই কাছে শেয়াল কিংবা কোন জানোয়ার চেঁচায়—আ-উ-উ-উ। জোনাকিগুলো ছোটাছুটি শুরু করে ঝোপঝাড়ে।

কুসুম হাঁসফাঁস করে বলে—পালান, আপনি পালান!

সেই সময় বেড়ার বাইরে একটা লম্ফ হাতে কে এসে ডাকতে থাকে—কুসমি, ও কুসমি গে। তেরা ছাগলঠো ছুট গেইলা গে, সব বিনাশ কারলে। দেখ্‌গে বেটিয়া!

প্রিয়নাথ অবশ হয়ে খুঁটিটা জড়িয়ে ধরে। সোজা হয়ে বসে। কুসুম লাফ দিয়ে নেমে যায়।—কৌন গে? সরলা মাসি?

হাঁ বেটিয়া, দেখ্‌না ইধার।

মেরা ছাগল নেহী মাসি। বাঁধকে রাখা গোহিলমে।

সাচ?

তেরা কিরিয়া মাসি।

তো ফির দেখ্‌ গে, ভাগ্‌সে গিয়া মালুম...

আ রী নেহি মাসি। তেরা চোখ অন্ধা। যা যা, ঘর চলা যা। উও শোন্‌ না, চিল্লাইসে।

চিল্লাইসে? কাঁহা রী?

তু কানমে ভি কালা। যা, যা, ঘর যা, ভাগ্‌।

বুড়ি হাড়গিলের মত লম্ফ হাতে চলে যায়। কাকে গাল দিতে দিতে যায়। কুসুম উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকে, মুখ তুলে নক্ষত্র দেখে হয়ত। প্রিয়নাথ টলতে টলতে নামে দাওয়া থেকে। সত্যি, প্রচণ্ড নেশা হয়েছে। এতটুকু মদে এমন অবস্থা হয়ে গেল? সে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ভারী গলায় বলে—তুমি কী খাওয়ালে কুসুম? মনে হচ্ছে, শুধু মদ নয়—আরও কিছু ছিল ওতে। মদে তো এমন লাগে না।

আপনার শরীর খারাপ করছে?

গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। দম আটকে আসছে!

জল খাবেন?

তোমার হাতে জল খেতে ইচ্ছে করছে না আর। তুমি কী খাওয়ালে আমাকে?

বিষ! বলে চাপা হাসে কুসুম।

বিষ! আঁতকে ওঠে প্রিয়নাথ!

বিশ্বাস করতে পারছেন না তো কী বলব?

প্রিয়নাথ অন্ধকারে ওর মুখ দেখার চেষ্টা করে। মাথা ঘুরছে, অজস্র স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে যেন, সব কালো মনে হচ্ছে। তাকে কী খাওয়াল কুসুম? সে স্থির থাকবার চেষ্টা করে।

যেতে পারবেন না মনে হচ্ছে? তাহলে খানিক শুয়ে থাকুন, ঠিক হয়ে যাবে।

কথাটা প্রিয়নাথের সঙ্গত মনে হয়। সে টলতে টলতে ফের দাওয়ায় চলে যায়। মেঝেতেই শুয়ে পড়ে। চোখ বুজে থাকে।

একটু পরে কুসুমের সাড়া পায়।—কই, জল খান। হাঁ করুন, ঢেলে দিচ্ছি।

শিশুর মত হাঁ করে প্রিয়নাথ। জল খেতে গিয়ে উঠে বসে। কাশে। তারপর 'থাক, আর না' বলে গড়িয়ে পড়ে।

এইবার প্রিয়নাথের মনে হয়, সে শূন্যে ভাসছে। তার চারপাশে নক্ষত্র। পালে পালে রঙিন মেঘ—লাল নীল হলুদ সবুজ, এসে তাকে ঘেরে। মেঘ কখনও সবুজ হয়? মেঘগুলো সরে যায়। একটা লম্বা ছড়ানো ডালপালাওলা শুকনো মরা গাছ শূন্যে দাঁড়ানো দেখতে পায়। তার ডালে বসেছে কুসুম, হাসছে, এলোমেলো চুল, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আতঙ্কে বোবাধরা গলায় চেঁচায় সে। পালাতে পারে না। আবার লাল নীল হলুদ সবুজ মেঘগুলো এসে পড়ে। না, মেঘ নয়। গগন হালদারের জাল। গগন ভয়ঙ্কর চেহারায় কিছু বলছে। হালদারমশাই, হালদারমশাই, আমি এখানে! প্রিয়নাথ চেঁচায়। জিভ জড়িয়ে যায়। হাড়গিলে লম্ফহাতে বুড়ি, ধরিত্রী। ধরিত্রী এসে বলতে থাকে চেরা গলায়—এই নে বাদুড়ের নখ, আর প্যাঁচার ঠোঁট আর ভালুকের রোঁয়া। এই নে টিকটিকির লেজ আর সাপের চোখ আর কাঁকলাশের ঠ্যাঙ। তোকে আমার সব দিলাম, তুই কি দিবি শুনি বাছা? ধরিত্রী এক পা করে এগোয় আর বলে—দিবি না? দিবি না? তোর চোখ গেলে দেব। তোর রক্ত শুষে খাব। তোর নাড়িভুঁড়ি খামচে বের করব। দক্ষিণমাঠের বাজপড়া গাছটার ডালে রোদ্দুরে শুকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব। প্রিয়নাথ গোঁ গোঁ করে।...

কখন একবার প্রিয়নাথ শোনে, মিহিগলায় চাপা স্বরে কে কাছে গান করছে। কী মিষ্টি সুর।

পুব থেক্যে ডাকিনী এসে
বসল গাছের ডালে
অবেলাতে ডাকে কাগা (কাক)
কী আছে কপালে।।
উখুসুখু (রুক্ষ শুষ্ক) মাটি কাটে
মাঠে নাইকো ধান
নদীমে জল নাইকো মাগে
কোথায় করব চান।।
সাঁঝ দে লো সনঝেমণি...

প্রিয়নাথ হাত বাড়ায়—হাতড়ায়। —কুসুম, কুসুম। শিয়রে নরম কিসে হাত পড়ে। হাতটা সরিয়ে নেয় না। বোলায় সেই নরম জিনিসটার ওপরে। ওরা কেউ সরিয়ে দেয় না। গানটা কানে আসে একটানা।...সাঁঝ দে লো সনঝেমণি সাঁঝ বইয়া যায় গে..

আবার শূন্যে ভেসে যায় প্রিয়নাথ। লাল নীল হলুদ সবুজ মেঘ। শুকনো গাছটা।...

মধ্যে আর একবার টের পেয়েছিল, তাকে কে বা কারা ধরাধরি করে শূন্যে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আতঙ্কে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করেছিল। বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছে মনে হয়েছিল। কারা সব কথা বলছিল। একবার কী একটা শব্দ হয়েছিল প্রচণ্ড— বন্দুকের আওয়াজ? মৃগাঙ্ক বলছিল—ছেনাল, কুত্তীন, খানকী।

মৃগাঙ্কই কি? এবার প্রিয়নাথ সব ছেড়ে রঙিন মেঘের মধ্যে চলে গিয়েছিল ছেঁড়া শুকনো পাতার মত।

অনেক বেলায় ঘুম ভেঙে প্রিয়নাথ দেখে, সে তার বিছানায় শুয়ে আছে। পাশের বিছানায় মৃগাঙ্ক বসে গেলাসে চা খাচ্ছে। তাকে তাকাতে দেখে সে হেসে বলে—উঠে পড়ুন। আবার কী?

ঘড়ি খোঁজে সময় দেখবার জন্যে—হাতে বেঁধেই শোয় প্রিয়নাথ। না দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করে। কিন্তু কী অবশ শরীর। মগজ নেই মনে হয়। সে হেলান দেয়। বাইরে তাকায়। কার্তিকের উজ্জ্বল রোদে কজন মেয়ে মাষকলাই ঝাড়ছে কুলো দিয়ে।

মৃগাঙ্ক বলে—ঘড়ি খুলে রেখেছি। উঠতে পারবেন না? কী মনে হচ্ছে?

পারব। বলে প্রিয়নাথ সাবধানে পা দুটো বিছানা থেকে নিচে নামায়। চটি খোঁজে।

নাড়ু ডাক্তারকে খবর দিয়েছি। এসে যাবে'খন।

প্রিয়নাথ সপ্রশ্ন তাকায়।

মৃগাঙ্ক ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে এবং হেসে বলে—আর মেয়ে পেলেন না দেশে, ওই হারামজাদির বাড়ি গেলেন? ভ্যাট্! দেশঘোরা এক্সপিরিয়েন্সড মানুষ মশাই আপনি! এমনি করে যার-তার কাছে মালফাল খায়? আজকাল কত মাতাল মারা পড়ছে, কাগজে পড়েন না? ভ্যাট্, ভ্যাট্! আপনাকে অত করে বললুম সেদিন, মেয়েটা ভাল নয়। ওর মধ্যে মার্ডার ম্যানিয়া আছে। ওর চোখ দেখেই টের পাওয়া যায় তা। কী? পারবেন—না কি ডাকব কাকেও?

প্রিয়নাথ টলতে-টলতে বেরোয়। মৃগাঙ্ক ওঠে না। ডাকে—নবীন, নবীন! তোদের বাবুকে ধর্। বাইরে জল রেখেছিস তো? পেস্টফেস্ট নিয়ে যাস।

নবীন দৌড়ে এসে প্রিয়নাথকে সাহায্য করতে হাত বাড়ায়। প্রিয়নাথ বলে—থাক।

ল্যাট্রিনটা সামান্য দূরে। সেদিকে যেতে যেতে সে একটা হরগৌরীর গাছের কাছে একবার দাঁড়ায়। দিগন্ত অব্দি মাঠের পারে কুয়াশা তখনও জমে রয়েছে। আকাশ শূন্য ঘন নীল। কিছু শকুন উড়ছে অনেকটা উঁচুতে। একটা প্লেন যাচ্ছে—আবছা আওয়াজ কানে আসে। অড়হরের ক্ষেতের পাশে কয়েকটা গরু চরছে। শনের ক্ষেতে হলুদ ফুল ধরেছে থরে-থরে। এতদূর থেকেও প্রজাপতি ওড়া দেখা যায়। একটি বাচ্চা মেয়ে শনফুল তুলছে। শনফুল খায় লোকে। প্রিয়নাথও খেয়েছে সেদিন। একটু পরে সে টের পেল, মনের ব্যালান্সটা নেই।

ল্যাট্রিনে অনেক্ষণ অকারণ থাকার পর সে বেরিয়ে এল। উঁচু বারান্দায় বসে দাঁতে ব্রাশ করতে থাকল। তখন গগন হালদারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিজয়েন্দু এল। গগন নিচে সামনে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথকে দেখতে থাকল। বিজয়েন্দু উঠে গেল বারান্দায়। ঘর থেকে মৃগাঙ্ক বলল—এস মাস্টাব।

বিজয়েন্দু শ্যালকের দিকে মিষ্টি হেসে প্রিয়নাথের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে বলে—কী ব্যাপার মশাই? চাদ্দিকে তো টি-টি পড়ে গিয়েছে। আমি—

প্রিয়নাথ ঘুরে বলে—কিসের?

গগন বলে—এ পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার, বুঝতেই পারছেন। একটুতেই তিলটি তাল হয়। কুসমি নতুনবাবুকে তুক করতে গিয়ে মেরে ফেলার দাখিল করেছে নাকি!

...গগন ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসতে থাকে। ...আর বলবেন না। সেই রাতদুপুরে মিগাংবাবু গিয়ে আমাকে বিছানা থেকে ওঠাল। তা পরে তো কুসমির বাড়ি গেলাম। টর্চের আলো পড়তেই দেখি, কুসমি আপনার মাথার কাছে বসে শকুন-টকুনের ডানা বুলোচ্ছে আপনার কপালে। মিগাংবাবু যেই ডেকেছে আপনার নাম ধরে, মেয়েটা লাফিয়ে ঘরের পিছন দিয়ে বেড়া টপকে পালাল। আমরা গিয়ে দেখি, আপনি অজ্ঞান। চোখের তারা থির। গোঁ-গোঁ করছেন, কশায় ফেনা জমেছে। তা, মিগাংবাবু থানায় খবর দিতে যাচ্ছিলেন। বলে-কয়ে থামালাম। ও লাইন আমার তো ভাল জানা আছে। মদে একরকম

শেকড়বাটা দেয়। খুব বড় মাতাল ছাড়া তা সামলানোর সাধ্যি কারো নাই। ধরিত্রীর আমলে আমিও তো খেয়েছি মশাই—বিষফিষ না। তুকতাকও নয়। তবে বেভ্যম (বিভ্রম) লেগে যায় বটে। কতরকম আজগুবি ওলট-পালট দেখা যায়। ও কিছু না। সরষের তেল মেখে কষে চান করুন, তারপর খেয়েদেয়ে ঘুমোন। ওবেলায় ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

বিজয়েন্দুর দিকে মুখ তুলে গগন বলে—মেয়েটা মিগাংবাবুকে যমের মত ডরায়। হয়ত এখন একটা-দুটো দিন বাড়িই ঢুকবে না ভয়ে। ওপারে বনজঙ্গলে কাটাবে।

মৃগাঙ্ক বলে—হালদারমশাই থাকতে ওর ভাবনা? খানিক পরেই দেখা যাবে, হালদারমশাই গিয়ে ছুঁড়ির ছাগল-টাগল বের করছে। নদীর ধারে খুঁটি পুঁতে চরতে দিচ্ছে।

গগন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে—করতে হয় বাবা, করতে হয় ওটা। আপনারা একালের ছেলেছোকরা মানুষ, অনেক জিনিস বোঝেন না। আর কটা দিনই বা বাঁচব—করে যাই।

কিন্তু হালদারমশাই, ধরিত্রী যখন জেলে গেল—বাবা তার মেয়েকে নিতে বলেছিল, তুমি নাওনি। ...মৃগাঙ্ক সকৌতুকেই বলে কথাটা। —তখন সত্যেনের মা বেঁচে ছিল তো। জালের খেঁটো দিয়ে পেটাত। হাড়গোড় ভেঙ্গে দিত।

না, না। অসুবিধে ছিল অন্যরকম। মান্যবর মণ্ডল বেঁচে থাকলে বলত, আমিও কুসমিকে খোরাক-পত্তর দিয়েছি কি না। পুজোয় জামাকাপড় দিয়েছি কিনা।

মুখ ধুয়ে প্রিয়নাথ উঠে যায়। বিজয়েন্দু তার বিছানায় গিয়ে বসে। গগন একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায়—মুখটা গম্ভীর।

মৃগাঙ্ক বলে—বুড়ো খচে গেছে। মরুক গে। তা ওহে মাস্টার, স্কুল নেই আজ? বিজয়েন্দু বলে —আছে। ছুটি নেব। একবার বহরমপুর যাব ভাবছি। সাড়ে দশটায় বাসটা ঘাট থেকে ছাড়ে না? তুমি নবীনকে একবার পাঠাও। সামনের দিকে সিট বলে আসুক।

মৃগাঙ্ক নবীনকে ডেকে ভগ্নীপতির সিটের ব্যবস্থা করতে পাঠায়। যাবার আগে নবীন এক জগ চা রেখে যায় টেবিলে। মৃগাঙ্ক দুটো কাপে চা ঢেলে বলে—প্রিয়বাবু, আসুন। মাস্টার, নাও। বিস্কুট বের করি। প্রিয়বাবু, খালি পেটে চা খাবেন না কিন্তু। এক মিনিট।

ড্রয়ার থেকে বিস্কুটের প্যাকেট বার করে সে প্রিয়নাথের বিছানায় ছুঁড়ে দেয়। তারপর বলে—নাডু ডাক্তার দেরি করছে কেন? আমাকেও একবার বেরোতে হবে। চকইসলামপুর যাব।

বিজয়েন্দু চা খেতে খেতে বলে—প্রিয়বাবু, একেবারে নীরব!

প্রিয়নাথ হাসি মুখে বলে—কী বলব?

হোয়েছিল কী বলুন তো? স্বাধীন কোন মেছো না মেছুনীর কাছে ভোরে শুনেছে। শুনেই বলে, তুমি একবার খোবোব নাও দিখি। প্রিয়বাবুকে কুসুম না কে বিষ খাইয়েছে নাকি—

প্রিয়নাথ আড়চোখে দেখল, মৃগাঙ্ক বিজয়েন্দুর দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে আছে। স্বাধীনের ধারণা, কুসুম নয়, অন্য কেউ। আসল ব্যাপার তো বুঝতে পারছি, কুসুম নিরপরাধ কিনা জেনে এস, এই হচ্ছে ওর মোটিভ।

মৃগাঙ্ক বলে—স্বাধীনকে নিয়ে আর পারলাম না। এবার দেখছি বোনের জন্যই আমাকে জেলে যেতে হবে।

বিজয়েন্দু আঁতকে ওঠে। —কেন, কেন মৃগাঙ্কদা?

ডাইনী মাগীটাকে দেশছাড়া না করলেই নয়। তুমি তো সদাশিব ভোলানাথ হে মাস্টার। কবে মাগী স্বাধীনকে পটিয়ে-পাটিয়ে তোমাকে কিছু খাওয়াতে না বলে।

সর্বনাশ। কেন? আমাকে কী খাওয়ানোর দরকার হবে?

মৃগাঙ্ক জবাব দেয় না। কিন্তু প্রিয়নাথ বুঝতে পারে, সেটা কী। স্বাধীন ছেলেপুলে চায়। এবং বিজয়েন্দু টের পায় নিশ্চয়। তাই শুধু হাসে—হাসিটার তলায় কী করুণতা ছিল। প্রিয়নাথ টের পায়।

মৃগাঙ্ক বাইরে যায়। কার সঙ্গে কথা বলছে শোনা যায়। প্রিয়নাথ কাপটা রেখে বিজয়েন্দুর দিকে ঘোরে। —তাহলে আমার খবর নিতেই এলেন?

হ্যাঁ। যাবার পথে বাস থামিয়ে গেটে বলে যাব। নিবারণ দাঁড়িয়ে থাকবে। বলব, প্রিয়বাবু অসম্ভব সুস্থ আছেন। বিষ যে-ই খাওয়াক, হজম করেছেন। প্রিয়বাবু নীলকণ্ঠ! ...তারপর একটু ঝুঁকে আসে বিজয়েন্দু। সত্যি কী হয়েছিল বলুন তো?

কিছু না। মদ খেয়েছিলাম খানিকটা। অভ্যেস নেই, তাই একটু ইয়ে হয়ে পড়েছিলাম।

কুসুমের কাছে?

হ্যাঁ।

আপনি গিয়েছিলেন ওর বাড়ি?

হ্যাঁ।

একটু পরে বিজয়েন্দু বলে—না, যাওয়াটা তেমন কিছু নয়। মেয়েটি রিয়্যালি ইন্টারেস্টিং টাইপ! আমারই তো ওকে প্রশ্ন করে জানতে ইচ্ছে হয় কতকিছু। কিন্তু বুঝতেই পারছেন—আমার ঘরে স্বয়ং স্বাধীনতা, অথচ আমার কোন স্বাধীনতা নেই! জামাই রায় বাড়ির। টি-টি পড়ে যাবে। তো—আমি একটা বই লিখছি। ডাইনী, প্রেততত্ত্ব, ক্লেয়ারভয়েন্স, বাংলাদেশের রুরাল উইচ কাল্ট ইত্যাদি নিয়ে। কিছু ওঝাকে ইন্টারভিউ করেছি ইতিমধ্যে। ইন্টারেস্টিং নিশ্চয়—অনেক ভাববার ব্যাপার আছে। শিমুলিয়া নামে ওদিকে একটা গ্রাম আছে—এই ভৈরব নদেরই পাড়ে। ছোট গ্রাম। প্রতি পরিবারে একজন করে ওঝা। একজন ওদের সর্দার। সে প্রেত নামাতে পারে নাকি। না—প্ল্যানচেট নয়। এ অন্য জিনিস। অন্ধকার ঘরে প্রেত বা 'চ্যাড়া' আসে। নাকি স্বরে কথা বলে। আমার মনে হয়েছে, ভেন্ট্রিলকুইজম! স্বরযাদু যাকে বলে! তো কুসুমের ব্যাপারে আমার একটা ইন্টারভিউ করার ইচ্ছে আছে।

সে তো আপনাদের ওখানে যায়!

যায়। কিন্তু ওকে একলা না পেলে তো চলে না। দেয়ার আর সাইকোলজিকাল থিংস টু অবজার্ভ! স্বাধীন ইন্টারফিয়ার করে—এগোয় না।

নাডু ডাক্তর এলেন সাইকেল চেপে। বারান্দায় সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে উঠে আসেন। —কই রে মিগাং, কোথা গেলি তোর পেশেন্ট কোথা?

মৃগাঙ্কের সাড়া আসে বাইরে থেকে। —সিধে ঢুকে যান। পেয়ে যাবেন। আমি যাচ্ছি। ঘরে ঢুকে ডাক্তার বলেন—আরে, আরে! জামাই যে!

আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু। বসুন।

কার কী হয়েছে?

এই যে, আমাদের প্রিয়নাথবাবুর।

ডাক্তার তড়াক করে এগিয়ে প্রিয়নাথের কপালটা ধরে ঠেলে শুইয়ে দেন। তারপর চোখ, জিভ, নাড়ী, পেট এবং স্টেথিসকোপ। প্রিয়নাথ হাসি মুখে টেপাটিপি সয়। একসময় মৃগাঙ্ক এসে বলে—মলো ছাই। টেপাটেপি না করে আগে শুনুন, কী হয়েছে?

নাডু ডাক্তার কানে স্টেথিসকোপ রেখেই চশমার ওপর দিয়ে তাকান।—কী হয়েছে?

বিষাক্ত মদ খেয়েছিল রাত্রে। অজ্ঞান—মরার দশা একেবারে।

এখন তো দিব্যি আছে।

তা তো আছে। ফার্দার কোন রিঅ্যাকশন যাতে না হয়, ওষুধ বা ইনজেকশন যা লাগে দিন।

কী বললে? বিষাক্ত মদ খেয়েছিল? কোথায়?

খেয়েছিল এক জায়গায়। সে শুনে কাজ নেই আপনার।

বিকৃত মুখে নাডু ডাক্তার বলেন—কেন যে ছাইপাঁশ যেখানে-সেখানে গেলেন মশাই?

চোলাই নিশ্চয়?

মৃগাঙ্ক বলে—হ্যাঁ।

তাহলে তো বমি করাতে হবে!

রাত্রে বমি অনেক হয়েছে।

হয়েছে বলছ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে।

মিগাং তোর একরোখা স্বভাবটা সিধে করদিকি। বয়স বাড়ছে। না কী?

কী করলাম?

এত ধমকাচ্ছিস কেন? ও মশাই, ইঞ্জেকশন নিতে পারবেন?

প্রিয়নাথ শশব্যস্তে বলে—না। খাবার ওষুধ দিন।

পায়খানা হয়েছে?

হয়েছে।

মিগাং, পাঁচটা টাকা আর শিশি নিয়ে কাকেও আমার ডিসপেন্সারিতে পাঠিয়ে দে। একটু দেরি করে পাঠাবি। আমি একবার চাঁইপাড়ার কলটা সেরে যাব।

নাড়ুবাবু চলে গেলেন তখুনি। তিনজনে খুব হাসাহাসি করল। তারপর মৃগাঙ্ক বলে—এখন অবশ্য হাসছি। আমার ছেলেবেলায় তল্লাটে এই একটিমাত্র ডাক্তার। বাবা ওকে এনেছিলেন। বাস্তুজমি শুধু নয়, ঘরবাড়ি, মায় ডিসপেন্সারিও করে দিয়েছিলেন। পাশকরা ডাক্তার নন—ছিলেন ডিসট্রিক বোর্ডের এক দাতব্য হাসপাতালের কম্পাউন্ডার। তখন লোকে অসুখ-বিসুখে ওঝা-বদ্যিই ডাকত। বেশিদিন আগের কথা বলছিনে—মাত্র পনের-কুড়ি বছর আগে। দেশের সবচেয়ে নেগলেক্টেড এরিয়া তো! বনবাদাড়-ভূত-প্রেত-ওঝা-ডাইনী শালা সমানে রাজত্ব করে এসেছে। এতদিনে না হয় অনেক চেষ্টার পর একটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার হল। তো শালা, সেও এক নাবালক ব্যবস্থা। না আছে ওষুধ, না ভাল ডাক্তার! তার চেয়ে আমাদের নাড়ুবাবুই ধন্বন্তরী! নবীন এলি রে! ও নবীন!

এসেছি।

সীট বলেছিস?

হ্যাঁ।

একটু পরে টাকা আর শিশি নিয়ে ভগীরথপুরে যাবি বাবা। প্রিয়বাবুর ওষুধ আনবি।

প্রিয়নাথ বলে—না, না। ওষুধ কী হবে?

পাগল! খান না খান, ফেলে দেবেন। কিন্তু ওষুধ না আনলে নাড়ু ডাক্তার ক্ষেপে যাবে। নবীন, যাস বাবা—কেমন? সাইকেলটা নিয়ে যাস। পেছনের টায়ারে হাওয়া নেই মনে হচ্ছে। ঘাটে হাওয়া ভরে নিস মোটর অফিসে। কিচেনে একটা শিশি খুঁজে সাফ করে নে। কী হে মাস্টার উঠবে না কী?

বিজয়েন্দু ঘড়ি দেখে বলে—দশটা। এখনও আধঘণ্টা।

তাহলে তুমি গল্প কর। আমি বেরোই। ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে প্রিয়বাবু, বুঝলেন? খাবার বারণ করেছি। আপনি খেয়ে নেবেন। বড়-বড় সরপুঁটি মাছ দিয়ে গেছে হেমন্ত জেলে। মাংস হলে ভাল হত আপনার। ঠিক আছে, ওবেলা এসে দেখব।

প্যান্ট-জামা বদলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নেয় মৃগাঙ্ক। বন্দুকটাও পিঠে নেয়। বেরিয়ে যায়। একটু পরে তার মোটর সাইকেলের আওয়াজ পাওয়া যায়।

বিজয়েন্দু বলে—আজ আর হাঁটাহাঁটি করবেন না। চুপচাপ শুয়ে থাকুন।

প্রিয়নাথ হাই তুলে বলে—হ্যাঁ!

আরও কিছুক্ষণ প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার পর বিজয়েন্দু উঠে যায়।...

দুপুর থেকে বিকেলে গভীর ঘুম হল প্রিয়নাথের। স্বপ্নবিহীন ঘুম। সূর্য ডুবতে যাচ্ছে, তখনও মৃগাঙ্ক ফিরল না। তখন সে খামারের পুবদিকের বেড়া গলিয়ে ভৈরবের ধারে চলে গেল। সেই শ্মশানের কাছে দূর্বাঘাসের ওপর বিষ পিঁপড়ের সার থেকে তফাতে বসল। মাথার ভিতর শূন্যতা। শরীর দুর্বল হয়ে রয়েছে এখনও। সে রাতের ঘটনাটা ভাবতে চেষ্টা করল। একটু পরে সূর্য ডুবে গেলে ঠাণ্ডা ধূসর একটা অন্যরকম আলো কালুখাঁর দিয়াড়ের মাঠে এসে দাঁড়াল। মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে জলহাঁস উড়ে গেল। প্রিয়নাথ ওপারের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, গাছপালার ফাঁক দিয়ে কে এগিয়ে আসছে। পাড় ধসে রয়েছে ওদিকে। শেকড় উঁচিয়ে কিছু ঝোপ জলে পড়ছে, স্রোতে

তাদের কাঁপন এতদূর থেকেও দেখা যাচ্ছে। সেখানে এসে সে সড়াৎ করে কুমিরের মতো পিছলে জলে পড়তেই প্রিয়নাথ চিনল—কুসুম!

নদীর জলের তলায় চোখ পড়ল এবার। আশ্চর্য, আশ্চর্য, আশ্চর্য! লাল নীল হলুদ সবুজ রঙ-বেরঙের মেঘ চাপ-চাপ জমে আছে। তাকে ছত্রখান ভাঙচুর করে ভেসে আসছে কুসুম। ব্যাপারটা আকাশে ঘটছে এবং জলের তলায় তার প্রতিবিম্ব পড়ছে কিনা দেখতে—নাকি প্রিয়নাথ নিজেই তার পৃথিবীসুদ্ধ উল্টে রয়েছে, টের পাবার জন্যে সে আকাশে তাকায়। কিছু বুঝতে পারে না। গতরাতের ঘটনাগুলো স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করে ঘণ্টায়, একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে আনাগোনা করে। কুসুম যত কাছে আসে, তত সে বিচলিত হয়ে পড়ে। মাঝামাঝি এসে কুসুম একবার মুখ তোলে। চুল বেঁধে নেয় তারপর। এবার কিছু ভাঁটিতে সরে যায় সে। দক্ষিণে দহর কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে আকন্দ গাছটা টেনে ধরে। তারপর সাপের মত বুক পেড়ে ওঠে। বাঁধের নিচে একবার বসে। হয়ত দম নেয়। তারপর উঠে দাঁড়ায়। এবং প্রিয়নাথের দিকে এগোতে থাকে।

পাটবনে যেমন দেখেছিল, সেইরকম ভিজে শরীর কুসুমের! স্তনদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে, কাঁপছে, দুলছে। কাপড় কাচের মত স্বচ্ছ এবং আব্রু বিনষ্ট। তার মতই যেন শুধু নাক দিয়েই শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলছে কুসুম।

প্রিয়নাথ নিষ্পলক তাকায়। কুসুম ধুপ করে সামনা-সামনি একহাত দূরে বসে পড়ে। দূর্বাগুলো ভিজে প্যাচপেচে হয়ে যায়। সে এখনও হাঁফাচ্ছে। —আর কোন কষ্ট হয়নি তো? ভাঙা গলায় এই প্রশ্নটা করে সে বুকটা ডবল কাপড়ে ঢেকে ফেলে।

নতুনবাবু! প্রিয়নাথ কথা বলে না দেখে সে ফের ডাকে।

উঁ?

শরীর কেমন?

ভাল।

কুসুম এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বলে—কাল রাত থেকে বাড়ি ঢুকিনি। ওপারে একটা গাঁ আছে, মকুনপুর—সেখানে আমার পাতানো মা আছে। তার বাড়িতে ছিলাম। ছাড়লে না, দুপুরে খেয়েদেয়ে ভাতঘুমটা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমলাবাগে সন্ধে কাটিয়ে বাড়ি যাব ভাবলাম। তা হঠাৎ চোখ গেল এখানে—দেখি, আপনি বসে আছেন একা। মিগাংবাবু আসবে না তো?

ওকে এত ভয় কেন তোমার?

এমনি। সত্যি বলুন না—আসবে নাকি মিগাংবাবু?

জানি না। সে সকালে চকইসলামপুর গেছে। বিকেলে ফেরার কথা—এখন ফিরেছে কিনা জানি না।

কুসুম হাসিমুখে ওর দিকে তাকায়। —আমার ওপর রাগ করেছেন, নতুনবাবু?

উঁহু।

না, আপনি রাগ করেছেন। ভালো করে কথা বলছেন না। আপনার দিব্যি, আমি জেনেশুনে কোন ক্ষতি তো আপনার করিনি। কতক্ষণ মাথায় মুখে জলের ঝাপটা দিয়েছি, বাতাস করেছি...

করেছ, জানি।

তাহলে কেন রাগ করছেন, বলবেন?

আমার রাগ নিজের ওপর, কুসুম।

হুঁ, আমারও কি নিজের ওপর রাগ কম হয়? আমি মাথা ঠুকি নতুনবাবু, চৌকাঠে মাথা ঠুকে শাপশাপান্ত করি। জ্বালা তো আমার কম নয়। কিন্তু আমি যে অন্যের হাতে ধরা আছি, উপায় কী? যদ্দিন না মরব, তদ্দিন এই ছটফটানি। কুরে-কুরে খাবে শত্তুর পোকা।

প্রিয়নাথ তাকায়। কুসুম কি কাঁদছে? মুখ নামিয়ে কাপড়ের পাড় খুঁটছে সে। একটুখানি চুপচাপ থাকার পর প্রিয়নাথ বলে—কার হাতে ধরা আছ তুমি? কুসুম মাথা দোলায়। —জানি না। মা মরার

সময় বলে গেল, তোকে তার হাতে জিম্মা দিয়ে রেখেছি জন্মের সময় থেকে। খবর্দার, তুই কোন পুরুষ নিসনে কুসুম, অপঘাত হবে।

তুমি তো বিয়ে করেছিলে?

হ্যাঁ। মায়ের কথা অমান্যি করেছিলাম। মাকে বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম, দেখি না কী হয়। আর—আমিও তো মেয়ে বটে, আমার সাধআহ্লাদ ঘর-সংসার ছেলেপুলে...দম টেনে সামলে নিয়ে সে ফের বলতে থাকে—তা পুরুষ আমার সইল না।

কেন, কী হল?

বিশ্বাস করবেন বললে?

করব।

প্রথম রাতেই শুতে গিয়ে দেখি ঘরে সাপ ঢুকেছে। শোওয়া হল না। সাপটা খুঁজে বের করতে পারলাম না। দরজা বন্ধ করে দাওয়ায় শোব, আমি মাদুর পাতছি, আমার পুরুষ গেল পেচ্ছাপ করতে উঠোনের গাব গাছের কাছে—হঠাৎ কী দেখলে সেখানে, ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। সারারাত ওকে নিয়ে কেটে গেল—জ্ঞান হল না। তখন শিমুলিয়ার ওঝা ডেকে আনলাম। ওঝা বললে, অমানুষের ছটা লেগেছে। আর আমাকে বকাবকি করে বললে, তুমি গুনিনের বেটি গুনিন হয়েও অসুখ চিনতে পারছ না? এ বাঁচবে না। এর গায়ের রক্ত হলদে হয়েছে। আর সাতদিন মেয়াদ। বিকেলে একবার পেটের ধান্দায় স্বাধীনদির বাড়িতে গেলাম—ফিরে এসে দেখি পুরুষ পালিয়েছে।

আর সাপটা?

সাপটা? ঘরের কপাট খুলে চৌকাঠে লম্ফ জেলে রেখেছি। উঠোনে রান্না চাপিয়েছি। বসে থাকতে থাকতে আড়চোখে দেখি, সাপটা লম্ফর সামনে ফণা তুলল। ফণাটা অনেকক্ষণ দোলাল। তারপর মুখ নামিয়ে সরসর করে চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে বেরিয়ে এল। দাওয়া থেকে নেমে গাবতলায় গিয়ে ঝোপে ঢুকল।

তুমি তোমার পুরুষের সঙ্গে চলে গেলেই পারতে? কোথাকার লোক সে?

বহরমপুরের। সেখানে রিকশা চালাত। ভেবেছিলাম, এখানেও রিকশাটিকসা চালাবে। আমি যা করে খাচ্ছি তাই করব। চলে যাবে হেসেখেলে।

আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি?

না। শুনেছিলাম, রোগে ভুগেভুগে নাকি মারা পড়েছিল।

কতদিন আগের কথা?

তা দেড়-দুবছর হল।

কুসুম!

উঁ?

আমি একবার দেখতে পারি, তুমি যদি রাজি হও!

তোমাকে বিয়ে করি।

কুসুম মুখ নামিয়ে বলে—ছিঃ! আমি কি আপনার যুগ্যি মেয়ে? আপনি উঁচু জাত—ভদ্রলোক, শিক্ষিত মানুষ। আমি ছোট জাত—লেখাপড়া জানিনে...

ওসব কিছু নয়। কথা বলি শোন। এখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাব। এমন জায়গায় নিয়ে যাব...

কোথায়?

অনেক দূরে। ধরো—কলকাতা।

হুঁ, তারপর সাধ মিটে গেলে গলাধাক্কা দিয়ে পথে বের করে দেব। ...কেমন হাসে কুসুম। —এদেশে অনেক এমন হয়েছে, নতুনবাবু—অনেক। চণ্ডী চৌকিদারের মেয়েকে এক শহুরে বাবু এসে নিয়ে গেল। এখন শুনি, সে মেয়ে বাজারের গলিতে সেজেগুজে সাঁঝ-সকালে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমাকে কি তুমি তাই ভাবছ?

আমি মানুষকে বিশ্বাস করি না, নতুনবাবু। মায়ের শিক্ষা। মা পইপই করে বলে গিয়েছে—অমানুষকে বিশ্বাস করিস কুসুম, মানুষকে নয়।

প্রিয়নাথ ক্ষুব্ধ হয়ে বলে—ঠিক আছে। বিশ্বাস কর না। করবে না। তাহলে কেন আমাকে জ্বালাতে এলে এখন? বেশ তো বসে ছিলাম চুপচাপ।

সন্ধ্যা নেমে গেছে। অন্ধকার হয়েছে কিছুটা। কুসুমের চেহারা অস্পষ্ট হয়ে পড়ছে।

হঠাৎ ওর দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে প্রিয়নাথ। সেই জ্বলেজ্বলে নীল চোখ! তার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে কুসুম। প্রিয়নাথ মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলে—সিগ্রেট খাবে?

কুসুম বলে—বাসায় যান নতুনবাবু। স্বাধীনদি আপনাকে দেখতে এসেছে।

কুসুম! ধমক দেবার চেষ্টা করে প্রিয়নাথ।

স্বাধীনদি লোক পাঠাচ্ছে, আপনাকে খুঁজতে। এক্ষুনি এসে পড়বে—চলে যান।

তুমি কী করবে?

নতুনবাবু, পালান।

বিরক্ত হয়ে প্রিয়নাথ বলে—ভ্যাট্! তুমি মাঝে-মাঝে পাগলামি কর কেন কুসুম? বেশ বুঝতে পারছি, আমার সঙ্গে ধোঁকাবাজি করছ। সব তোমার বদমাইসী মিথ্যে!

কুসুম হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। তারপর শ্মশানবটের দিকে দৌড়ে চলে যায়। প্রায় শূন্যে ভেসে যাওয়ার মত—এবং অন্ধকারে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই সময় জোরাল টর্চের আলো পড়ল বাঁধের ওপর কিছুটা দূর থেকে।

প্রিয়নাথ উঠে দাঁড়ায়।—কে?

প্রিয়বাবু, আসুন। অন্ধকারে একা কী করছেন ওখানে?

মৃগাঙ্ক। বাঁধে উঠে প্রিয়নাথ বলে—কখন ফিরলেন?

এইমাত্র। স্বাধীন এসেছে। কে ওকে বলেছে—প্রিয়বাবুর অসুখ বেড়ে গেছে।

ওর আবার ওইরকম স্বভাব। আমার লোকজনের কার অসুখ, কার কী সমস্যা—সব খোঁজ ওর পাওয়া চাই। ভাবখানা এমন—যেন আমি কোন কর্তব্যই করিনে!...

প্রিয়নাথ চুপচাপ হাঁটে।

প্রিয়বাবু!

বলুন?

কে ছিল আপনার কাছে? কুসুম না?

হ্যাঁ।

বিপদে পড়বেন, এখনও বলছি—ওকে অ্যাভেয়েড করুন। ও ভীষণ ডেঞ্জারাস মেয়ে! যদি সত্যিসত্যি প্রেমালাপ করতে চান—বলুন না খুলে, মেয়ে জোগাড় করে দিচ্ছি। ...মৃগাঙ্ক অমানুষের মত হাসতে থাকে। ফের বলে—আশ্চর্য সাহস ওর! রাতে এত কাণ্ডের পর ফের আপনার কাছে চলে এসেছে! আমার তো ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে—ও কেন আপনাকে সবসময় ফলো করবে? গতবছর এখানে এক গ্রামসেবক এলেন—ইয়ং ম্যান। তারপর বেচারা কুসমিকে সবজিচাষের সায়েন্টিফিক প্রসিডিওর বাতলাতে গেলেন। কদিন পরে শুনি রিকশো করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে—সোজা বহরমপুর। কুসমির হাতে এক গ্লাস জল খেয়েছিলেন নাকি। যাই হোক, ভদ্রলোক কেসফেস করেন নি। রাতারাতি চাকরি ছেড়ে পালালেন। নাকি বদলি হয়েছিলেন। আমি ব্লকটকের ধার ধারিনে। স্বাধীনভাবে চাষবাস করি। যা শুনেছি, বললাম।

মৃগাঙ্ক বাড়াবাড়ি করে বলছে, তা প্রিয়নাথ বুঝতে পারে। একরকম কী ঘটেছিল, তা বিকৃত করে বর্ণনা করছে—তাতে কোন ভুল নেই। কিন্তু কুসুমের কাছে কোন অলৌকিক শক্তি আছে, তা এবার টের পেয়েছে প্রিয়নাথ! আশ্চর্য, সেরাতের মত ঠিকঠাক বলে দিল স্বাধীন তাকে দেখতে এসেছে! আর

ওই নীল রঙটা চোখে কোত্থেকে আসে ওর? গতরাতে তো একটুও ছিল না। এখন এল হঠাৎ। এ রহস্যের কী সূত্র আছে?

যত একথা ভাবল, গা শিউরে উঠতে লাগল প্রিয়নাথের। সেইসঙ্গে এক অজানা বিপদের আতঙ্কে সে ক্রমশ কুঁকড়ে গেল। মৃগাঙ্ক ঠিকই বলেছে, ওকে এড়িয়ে চলাই ভাল।

কিন্তু ওই দুর্লভ মায়ায় ভরা সুন্দর শরীর! তার ঠোঁট, নাক, শ্বাসপ্রশ্বাসের কীরকম মিষ্টি গন্ধ, তার স্তনদুটি—

গগন ঠিকই বলেছে—ও মেয়ে পৃথিবীর নয়, আকাশের।...

সেরাতে স্বাধীন বেশিক্ষণ বসেনি খামারে। প্রিয়নাথকে শরীরসংক্রান্ত দুচারটে প্রশ্ন করে সব জেনে রিকশোয় বাড়ি ফিরে যায়। স্বাধীনের ঠোঁটে একটা বিশেষ ধরনের হাসি ছিল তা লক্ষ করেছিল প্রিয়নাথ। অর্থাৎ—কী, এখন টের পেলেন তো কুসুমের সত্যিসত্যি অলৌকিক শক্তি আছে না নেই? অবশ্য মদ খাওয়াটা চেপে জল খাওয়ার কথাটাই মৃগাঙ্কের বুদ্ধিমত চালাতে হয়েছিল। স্বাধীন মদের ব্যাপারে ভীষণ চটা নাকি, মৃগাঙ্কের হুঁশিয়ারি ছিল।

পরদিন দুপুরে প্রিয়নাথের নেমন্তন্ন ওবাড়ি। মৃগাঙ্ককেও পইপই করে বলে যায় স্বাধীন। মৃগাঙ্ক বলেছিল, সময় পেলে যাব। মাষকলাই পাঠাব একট্রাক। সঙ্গে হয়ত আমাকেই যেতে হবে।

তাই দাঁড়ায় শেষ অব্দি। সোনারপুর মার্কেটিং কোঅপারেটিভের দিকে ট্রাকের সঙ্গে রওনা দেয় মৃগাঙ্ক। প্রিয়নাথ একটা রিকশো করে ভগীরথপুর গেল নেমন্তন্ন রাখতে।

ভেবেছিল, বিজয়েন্দু নিশ্চয় থাকবে—বাড়িতে অতিথি আসছে যখন। কিন্তু সে স্কুলে গেছে। এটা ভাল মনে নিল না প্রিয়নাথ। ঠাকুরবাড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল স্বাধীন—অপেক্ষা করছিল তার? একটু বিস্মিত হল প্রিয়নাথ। সে তো 'অমানুষ' নয়—নিতান্ত মানুষ। কুসুমের অলৌকিক তার কাছে নেই—চোখে নেই উজ্জ্বল নীল কোন বাতি! তার দৃষ্টি শূন্য—খসখসে, শুকনো গাছের মত নিরর্থ। স্বাধীন কি সত্যিসত্যি কিছু পেল তার মধ্যে?

নাকি কুসুমের গন্ধপোকার মউ-মউ করা সৌরভে আপ্লুত স্বাধীন অনুরাগিণী? মনে মনে হাসে প্রিয়নাথ।

আসুন, আসুন! দাদা এল না? স্বাধীন আজ আর ঘোমটাটা তোলে না মাথায়। এলোচুল পিঠে একটা প্রগলভতার মত ঝাঁকাল। —হুঁউ, জানতুম আসবে না। এদিকে আমার কর্তাবাবুও ছেলে ঠ্যাঙানো ছাড়া থাকতে পারেন না। কাল একটা কামাই করেছে, মাস্টারি চলে যাবে না?

শ্বশুরের স্কুলে জামাইয়ের মাস্টারি চলে যাবে কী?

স্বাধীন দারুণ হাসে।

সে-ই নিয়ে যায় তাকে। বিছানার দিকে আঙুল নির্দেশ করে সে। —আরামে হাত-পা ছড়িয়ে বসুন। চানটান তো করেছেন মনে হচ্ছে।

প্রিয়নাথ একটু ভদ্রবেশে এসেছে। নতুনকাচা প্যান্টশার্ট পরনে, পালিশকরা কুয়োভেডিস জুতো। সে একটু ভেবে নিয়ে বিছানাতেই বসে —তাকিয়া টেনে নেয় কোলে। মিষ্টি হাসে। —একা একা যাব! কী কাণ্ড দেখুন তো! মৃগাঙ্কদা অদ্ভুত মানুষ—

বাধা দিয়ে স্বাধীন বলে—অদ্ভুত তো আপনাদের মাস্টার ভদ্রলোকটিও। জেনেশুনে—মরুক গে। আপনি এসেছেন তো—তাহলেই হবে।

একটা অ্যাসট্রে চাই।

দিচ্ছি। বলে স্বাধীন কোনার শোকেস খুলে পুতুলের রাজ্য থেকে একটা শামুকের অ্যাসট্রে এনে দেয়। তারপর সামনে মোড়ায় বসে। পায়ের ওপর পা তুলে দেয়। রান্নাটান্না একঘণ্টা আগে শেষ। এখনই খাবেন—না একটু দেরি করব?

খাচ্ছি। বলে প্রিয়নাথ সিগারেট ধরায়।

স্বাধীন ঠোঁট টিপে হাসছিল। যতক্ষণ প্রিয়নাথ প্রথম ধুঁয়ো নিজের ডানদিকে সাবধানে ছড়িয়ে দিতে

থাকল, কিছু বলল না। প্রিয়নাথ ঘুরলে তখন বলে সে—কুসুম কী খাইয়েছিল? স্রেফ জল? আরেকবার বলুন তো, শুনি?

প্রিয়নাথ মিটিমিটি হাসে শুধু।

আপনি মদ খান কেন?

না, তেমন কিছু নয়। একটু আধটু। সেও কেউ অফার করলে। আমার হ্যাবিট নেই।

কুসুম ডেকেছিল, নাকি নিজে থেকে গিয়েছিলেন ওর বাড়ি?

ডাকেনি। নিজেই গিয়েছিলাম—নিছক কিউরিসিটি।

স্বাধীন হাসতে হাসতে বলে—হুঁউ, কিউরিসিটি! ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন?

এ্যাঁ! প্রিয়নাথ চমকে ওঠে এবং হতবাক হয়ে পড়ে।

লজ্জার কিছু নেই। আপনি সত্যি কথাটা বলুন না মশাই, তারপর আমি যা বলার, বলছি। বিয়ে করবেন বলেছিলেন ওকে?

কে বলল আপনাকে? কুসুম?

আমিও কুসুমের মত ডাকিনীবিদ্যা জানি। আপনি স্বীকার করুন আগে।

হ্যাঁ। বলে থাকতে পারি। মদের নেশায়।

মদের নেশায়? সজ্ঞানে নয়—তাই না?

তাছাড়া কী বলব?

আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। কুসুমের কোন উপায় নেই। ওর এই বয়স—ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, ভোগ-আহ্লাদের বয়স। কিন্তু ওর মা হারামজাদি ওর সর্বনাশ করে গেছে। আপনারা তো সুপার নেচারাল পাওয়ারে বিশ্বাস করেন না—আমি করি। ওর জন্মের পরই কোন প্রেতশক্তিই বলুন কিংবা অন্যকিছু, তার কাছে জিম্মা দিয়ে রেখেছে ওকে। কুসুমকে সে কিছুতেই অন্যপুরুষের ছায়া লাগতে দেবে না। আপনি—পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।...স্বাধীন কণ্ঠস্বরটা চাপা করে এবার। —দুষ্ট-বদমাসের তো অভাব নেই দেশে। অজস্র লম্পট ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ওই বুনো মেয়ে মাঠেজঙ্গলে ঘোরে। অনেকে অ্যাটেম্পট নিয়েছিল, কুসুমই বলেছে—তারা কী ভীষণ শাস্তি পেয়েছে, ভাবতে পারবেন না। আগে নদীর ওপারে জঙ্গলে বাউরিদের একটা লোককে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। গায়ের রঙ কেমন কালো—বাজ পড়লে বা সাপে কাটলে যেমন হয়। সবাই তো সাপে কাটা ভেবে আর উচ্চবাচ্য করলে না। পরে কুসুম আমাকে যা বলল, শুনে আমি তো ভয়ে কাঠ। হতভাগিনী কুসুম! কী সর্বনাশের সঙ্গে ওকে ঘর করতে হচ্ছে!

প্রিয়নাথ চুপচাপ সিগারেট টানে।

ওকে রেপ করতে গিয়েছিল লোকটা। আর—রেজলাপাড়ার সেই মুসলমান ছেলেটি? বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। বন্দুক আছে ওদের। বিলে গেল পাখি মারতে। ফিরল। বোবা একেবারে। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, কথা বলতে পারে না। জড়ভরত হয়ে গেল দিনে দিনে। এখন তো চলাফেরাও করতে পারে না। হাত-পা প্যারালেসিসে অবশ। কত খরচা করল চিকিৎসায়—কলকাতায় গিয়ে থাকল কতদিন। কিছু হল না।

প্রিয়নাথ মুখ তোলে।

আবার কী? কুসুমের কীর্তি। কুসুমকে ধরেছিল! পরে কুসুম ডিটেলস ঘটনাটা বলে আমাকে। এগুলো কিন্তু কেউ জানে না। জানলে হতভাগিনী মেয়েটাকে খুন করে ফেলবে। আরও ইনসিডেন্ট আছে এরকম। সাবধান. আপনি কিন্তু ভুলেও এসব বলবেন না কাকেও।

মৃগাঙ্কদাকে ও কেন অত ভয় করে?

স্বাধীন কেন কে জানে, মুখটা নামায়। তাবপর আস্তে বলে—আমি জানিনে। দাদাকেই জিজ্ঞেস করবেন।

করেছিলাম। স্পষ্ট জবাব পাইনি।

আপনার খাবার ব্যবস্থা করি। ...বলে হঠাৎ ওঠে স্বাধীন। বেরিয়ে যায়।

একটু পরে ডেকে নিয়ে যায় নিবারণ নামে চাকরটা। পাশের ঘরে ডাইনিং টেবিল রয়েছে। সম্ভবত বিজয়েন্দুর জীবনযাপন প্রণালী শহুরে এবং 'মডার্ন' যাকে বলে। প্রিয়নাথ বসে পড়ে।

একা খাব? আপনি বসবেন না?

নিশ্চয় বসব। আমারও খিদে পেয়েছে।...বলে স্বাধীন মৃদু হেসে সামনাসামনি বসে।

রান্না আপনি করলেন, না ঠাকুর?

কিছু আমি, কিছু ঠাকুর। নকড়ি! ও ঠাকুরমশায়! স্বাধীন ডাকে। —একবার বাবুকে শ্রীমুখটা দেখাও।

পনের-ষোল বছরের একটি সুন্দর চেহারার ছেলে, খালি গা, পৈতে রয়েছে, কোমরে গামছা জড়ানো, হাসিমুখে এগিয়ে আসে।

ইনিই আমার নকড়িচন্দ্র। আপনাদের বীরভূমেরই ছেলে।

প্রিয়নাথ বলে—তাই বুঝি? বীরভূমের কোথায় ভাই?

নকড়ি বলে—লাভপুরের দিকে।

স্বাধীন বলে—ওর সামনে প্রশংসা করতে চাইনে। ওকে পেয়ে কী বাঁচা যে বেঁচেছি, ভাবতে পারবেন না। রান্নাটান্না আমি পারিনে—শিখিওনি। গেছো মেয়ের মত কাটিয়েছি। তবে হ্যাঁ, পিকনিকের রান্নায় আমি এক্সপার্ট। মাঝেমাঝে বহরমপুর থেকে আমার বন্ধুরা আসে ভৈরবের ওপারে পিকনিক করতে। সে এক থ্রিল! শীত পড়ুক—তখন দেখবেন।

কেষ্ট মালী এসে দাঁড়ায় বারান্দায়। হাতে একটা বাটি। —ভারতী খাচ্ছে না গো। এ এক সমিস্যেতে পড়া গেল। ব্লকের পশুডাক্তোরবাবুকে খবর দেবেন নাকি একবার?

স্বাধীন এঁটো হাতে ওঠে। —আর পারা যায় না বাবা! ব্লকের পশুটশুর কর্ম নয়। তারা হরিণের কী বোঝে? চল তো—দেখি। অত অধৈর্য হলে তো চলে না। প্রিয়বাবু, এক মিনিট।

স্বাধীন বেরিয়ে যায়। ততক্ষণ নকড়ির জীবনী সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন করে সময় কাটায় প্রিয়নাথ। মাঝে মাঝে দু-এককুচি স্যালাড কামড়ায়।

স্বাধীন ফিরে আসে দু-মিনিট পরে। এসে ভাত মাখতে-মাখতে বলে—কেষ্টকেও ভূতে ধরেছে। খায় না ভারতী! খাবে না কেন? আসলে কি হয় বুঝলেন? জন্তুরাও বুঝতে পারে ভালবাসার সত্যি-মিথ্যে। আজ সকালে কতক্ষণ আমার সঙ্গে ছোটাছুটি করে গেল। যেই কেষ্ট সামনে এল, অমনি ব্যাজার হয়ে কোলে ঢুকল। মাইনে করা লোক দিয়ে তো এসব হয় না। বুঝলেন প্রিয়বাবু, ছেলেবেলা থেকে আমিও কিন্তু কুসুমের মত একটা বিদ্যে রপ্ত করেছি। আমি ওদের কথা বুঝতে পারি। ব্যাপারটা কমিউনিকেশন মিডিয়ামের। বাবা এটা দারুণ জানতেন। আমি অতটা নয়—অল্পস্বল্প।

দেয়ালের একটা টিকটিকি দেখিয়ে প্রিয়নাথ বলে—বলুন তো, ওই টিকটিকিটা কী বলছে এখন?

স্বাধীন মুখ ঘুরিয়ে প্রাণীটা দেখে নিয়ে শুধু চোখে হাসে। ও কী হাসি! প্রিয়নাথের বুকের ভিতরটা কেমন করে। ঠোঁটে আলগোছে একটু ভাত নিয়ে আস্তে ঠেলে দিতে দিতে স্বাধীন উজ্জ্বল চোখে হাসি রেখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। চিবুনো ও গেলা শেষ হলে আস্তে বলে—পারি বলতে। নকড়ি, হাঁ করে কী দেখছিস? আর কীসব আছে নিয়ে আয়।

নকড়ি বেরিয়ে গেলে সে বলে—টিকটিকিটা বলছে, আহা, কী হাস্যকর দুর্ঘটনা। প্রিয়বাবু নামক ভদ্রলোকটির দুর্দশা দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত।...হাসতে হাসতে চেয়ারে চিতিয়ে বসে স্বাধীন। মাথাটা ঘষা খায়। চুলগুলো দুপাশে প্রচণ্ড দোলে।—কী? আর শুনবেন?

তাই বলছে বুঝি?

বলছে। ...হাসির চোটে চোখে জল এসে গেছে স্বাধীনের।

প্রিয়নাথ অন্যমনস্কভাবে জানলার দিকে তাকিয়ে বলে—কিন্তু প্রিয়বাবু তো অস্বাভাবিক কাজ করেনি। যা স্বাভাবিক, যা মানুষের পক্ষে সঙ্গত—তাই করেছে! ফুল ফুটলে সবাই আকৃষ্ট হয়।

নিশ্চয় তো। ফুল বাগানেও ফোটে, বনেও ফোটে। বনজ কুসুম!

হ্যাঁ, বনজ কুসুম। ঠিক বলেছেন।

কিন্তু স্যার প্রিয়বাবু, বনজ কুসুম দেখতে চমৎকার হলেও তা থেকে বিষফল হয়।

এ প্রগলভতা বাড়াবাড়ি মনে হয় প্রিয়নাথের। সে বলে—দেখুন, মানুষ—একমাত্র মানুষই বোধ হয় এটা পারে। ইচ্ছে করেই—ডেলিবারেটলি অমৃতের বদলে বিষ খেয়ে জ্বলে মরতে চায়।

আমি আপনাকে বারণ করছি নে। জ্বলুন, পুড়ুন, আপনার ইচ্ছে।

রাগ করলেন?

না। হিংসে।

প্রিয়নাথ চমকে তার দিকে তাকায়। স্বাধীন কিন্তু হাসছে। —কী বললেন?

হিংসে।

কিসের?

কুসুমের প্রতি হিংসে হচ্ছে বললে কি ভাল লাগবে আপনার?

কে জানে ভেবে দেখিনি।

আপনি অত আস্তে নির্জীব মানুষের মত কথা বলেন কেন?

হয়ত আমি দুঃখবাদী মানুষ, তাই। হয়ত বেশি দম নিয়ে পৃথিবীতে আসিনি, তাই অল্পেই হাঁপিয়ে পড়ি।

নকড়ি এসে প্লেটগুলো রাখে টেবিলে। স্বাধীন নিঃশব্দে সেগুলো বিলিবন্টন করতে থাকে। কিছুক্ষণ কোন কথা বলে না। প্রিয়নাথও চুপচাপ আলগোছে খায়। নকড়ি সরে গেলে সে কৌতুকের ছলে বলে—আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, আপনি ফ্র্যাঙ্কলি আলোচনা করছেন যখন, কুসুমকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। এ আমার অকপট স্বীকারোক্তি। কী করব? আপনার কুসুমের মত আমিও আমার ভালবাসার ইচ্ছের কাছে ধরা আছি। আমারও হয়ত কোন উদ্ধার নেই।

বেচাবি কুসুম! যে ওকে দেখে, সেই ওকে ভালবেসে ফেলে।

সেটা তাদের অপরাধ নিশ্চয় নয়।

নয়ই তো। নেচার'স্ কল্।

কী বললেন?

নেচার'স্ কল। স্বাভাবিক কথায় মানুষ যে জন্যে ল্যাট্রিনে যায়, খায়, ঘুমোয়।

আপনি আমাকে নিয়ে হয়ত জোক করছেন। আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি। স্বাধীন হাসতে হাসতে ফের চেয়ারে চিতিয়ে বসে। মাথা এদিকে-ওদিকে দোলে। তারপর সে উঠে দাঁড়ায়। বলে—ওখানে বেসিন রয়েছে। তোয়ালে সাবান আছে। হাতমুখ ধুয়ে ওঘরে চলে আসুন। পান খাওয়া অভ্যেস আছে?

একটু-আধটু।

সবই আপনার একটু-আধটু? পুরোটা নয়? তাহলে ভালবাসাটাও নিশ্চয় ওইরকম একটু-আধটু! ...বলে স্বাধীন বেরিয়ে যায়।...

খানিক পরে আগের মত সেই বিছানায় হেলান দিয়ে বসেছে প্রিয়নাথ। স্বাধীনও ইজিচেয়ারটা টেনে হেলান দিয়েছে! দুজনেই পান চিবোচ্ছে। স্বাধীনের ঠোঁট শিগগির লাল হয়ে উঠেছে। মাঝে-মাঝে সে জিভ বের করে রঙ দেখে নিচ্ছে। এ অভ্যাস অনেকের থাকে। প্রিয়নাথ পায়ের দিকে জানলার পর্দা টেনে দিয়ে এল। সূর্য ঢলেছে—রোদ আসছিল। —মাস্টারমশাই কখন ফেরেন?

পাঁচটা হয়ে যায়। বসুন, এসে পড়বেন এক্ষুণি।

এক্ষুণি কী? মোটে তো তিনটে বাজে!

ভাতঘুমের অভ্যেস নিশ্চয় আছে? একটু-আধটু। আপনার ভাষায়!

অবশ্যই।

শুয়ে পড়ুন।

আপনি?

আমি একবার আমার চিড়িয়াখানায় যাব।

ঠিক আছে। উইথ ইওর পারমিশন—গড়িয়ে নিই।

হ্যাঁ, একটু-আধটু।

হাসতে হাসতে বালিশে মাথা রাখে প্রিয়নাথ। চোখ বুজে বলে—প্লীজ, বেশি ঘুমিয়ে পড়লে জাগিয়ে দেবেন কিন্তু। আপনার কর্তাবাবু এসে নিজের বিছানায় অন্য লোককে শুয়ে ঘুমোতে দেখলে ঘাবড়ে যাবেন। তাছাড়া মাস্টারমশাইদের আমি ভীষণ ভয় করি।

মনে হয় না। হয়ত আপনাকে দেখতেই পাবেন না।

প্রিয়নাথ চোখ বুজে থেকে টের পায় স্বাধীন বেরিয়ে গেল। বাইরে নানারকম পাখির ডাক, গ্রামীণ শব্দপুঞ্জ—ধীর, সুদূর ও গভীর, গাভীর হাম্বা, ফের পাখির ডাক...প্রিয়নাথ ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর স্বপ্ন আসে। ভৈরবের জলে সে ভেসে চলেছে। মৃগাঙ্ক পদ্মার সঙ্গমে চরে পাখি মারতে যাচ্ছে, প্রিয়নাথকে নিল না সঙ্গে। স্বাধীন তাকে বলছে, কী মশাই, কুসুমকে বিয়ে করবেন? কুসুম কোথাও পালিয়ে গেছে। প্রিয়নাথ পাগল হয়ে খুঁজছে। কী যে কষ্ট..

প্রিয়বাবু, প্রিয়বাবু?

লাল চোখে তাকায় প্রিয়নাথ। স্বাধীনের আঙুল এইমাত্র তার বুক থেকে সরে গেল বুঝতে পারে। কিছু কি তুলে নিল? একটুখানি খালি লাগে, দেহের ভিতরে কোথাও একটা ছোট্ট গর্ত হল।

উঠুন। সন্ধ্যা হয়ে এল যে! আর কতক্ষণ ঘুমোবেন?

প্রিয়নাথ ধুড়মুড় করে উঠে বসে। —উনি ফিরেছেন?

না। হয়ত স্কুল থেকেই কোথায় বেড়াতে বেরিয়েছেন। খেয়ালী মানুষ।

প্রিয়নাথ অপ্রস্তুত মুখে বলে—ইস্, কী বিচ্ছিরি ঘুম! চলি।

যাবেন 'খন। চা-ফা খান তো।

চায়ের কাপ স্বাধীনের হাতে। বিছানায় রেখে সে বেরিয়ে যায়। একটু পরে এসে বলে—চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে! জল দেবেন মুখে-চোখে?

থাক। বলে চাটা কয়েক চুমুক শেষ করে ফেলে প্রিয়নাথ। নেমে আসে বিছানা থেকে। সিগারেট জ্বেলে সোজা দাঁড়ায়। স্বাধীন তার চেয়ে কত ইঞ্চি ছোট আন্দাজ করে!

চলুন বাগানে যাই।...স্বাধীনের চোখে ইচ্ছেটা ঝলমল করে ওঠে।

দেরি হয়ে গেল বড্ড। আজ আর বাগানে নয়।

কাজ, কাজ কীই বা আছে এমন! চলুন, গল্পসল্প করি। তারপর বেরোবেন।

না গিয়ে পারে না প্রিয়নাথ! কিন্তু ক্রমশ তার মনে একটা সংশয় খচখচ করতে থাকে—তাকে নিয়ে কী যেন নিষ্ঠুর খেলা খেলছে মৃগাঙ্কবাবুর বোন। স্বাধীনের নির্বিকার আচরণ বা ভদ্রতা বা অতিথি সৎকারের মধ্যে একটা খেলা-খেলা ভাব মাথা নাড়া দিচ্ছে যেন। কুসুমকে ভালোটালো বাসার সরল স্বীকারোক্তি কি সত্যিসত্যি কোনরকম অদ্ভুত হিংসে ঈর্ষা জাগিয়ে দিয়েছে মহিলার মনে? এ যেন লেজে খেলানোর ব্যাপার। এ যেন খর অভিসন্ধি নিয়ে বোঝাবুঝির চক্রান্ত। আরও গভীরতর স্বীকারোক্তি চাই কি আপনার, স্বাধীন প্রিয়নাথ মনে-মনে উদ্বেগ নিয়ে বলে। আপনি কি মারাত্মক আঘাত দেবার চূড়ান্ত সময়ের অপেক্ষা করছেন, পাচ্ছেন না—তাই এবার নির্জন বাগানে জন্তুজানোয়ারদের খাঁচার কাছে নিয়ে এলেন আমাকে?

বাঁদরের খাঁচা খুলতেই বাঁদরটা একলাফে এসে কোলে চাপে স্বাধীনের। পিটপিট করে তাকায় সে প্রিয়নাথের দিকে। স্বাধীন হাসতে হাসতে বলে—কী মটরবাবু, ভদ্রলোককে দেখে কী মনে হচ্ছে? উঁ?

সে বাঁদরটা মুখের কাছে কান রেখে তারপর ফের বলে—হুঁ, কী বলছে জানেন? বলছে—ভদ্রলোকটি অতিশয় গোবেচারা লাজুক মানুষ। সে কী মটরবাবু? ও কী বলছিস? মোটেও না—মোটেও না। উনি কী করেছেন জানিস?...স্বাধীন প্রিয়নাথের দিকে একবার চটুল তাকিয়ে ফের শুরু করে—উনি এদেশে এসেই কেউটে সাপ ধরতে হাত বাড়িয়েছেন। না রে বাবা, না—তুই জানিস নে, বিষাক্ত সাপ ধরা অভ্যাস ওঁর আছে। তাই ধরতেই তো এসেছেন!

প্রিয়নাথ এইসব কথা কানে না নিয়ে ময়ূরদুটো দেখতে থাকে। অনর্গল ওইধরনের চটুল রসিকতার পর বাঁদরটা আচমকা প্রিয়নাথের গায়ে ফেলে দেয় স্বাধীন।

প্রিয়নাথ শশব্যস্তে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে পারে না। বাঁদর তার কাঁধে চড়ে বসে। অস্বস্তিতে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রিয়নাথ—আর স্বাধীন হাসিতে লুটোপুটি খায়।

হঠাৎ প্রিয়নাথ লক্ষ করে বাঁদর তার কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। সে রোমশ ছোট্ট হাতটা সরিয়ে দেয়। কিন্তু দুপায়ে কাঁধ আঁকড়ে দুটো হাত চালিয়ে ব্যাটা তার গলায় নাকে মুখে হালকা খামচা-খামচি শুরু করে। প্রিয়নাথ বিরক্ত হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, কিন্তু মুখে হাসি রাখতে হয়। স্বাধীন হেসে ভাঙে। তার শাড়ি পিছলে যায়, ফুটে ওঠে গলার নিচের উজ্জ্বল মাংস আর সবুজ ঢাকনা ঠেলে ওঠা স্তনদ্বয়, বগল আর সরল বাহু জোরাল অনুরাগ ছড়াতে থাকে—মনে হয় নারীত্বের নোনা স্রাবে ভিজে উঠছে ঘাস। তারের মরচেধরা খাঁচা, দিনশেষের বাগান, আর নির্জনতা স্যাঁতসেতে হয়ে উঠছে সেই তীব্র নারীত্বের ক্ষরণে।

চকিত বিহ্বলতায় প্রিয়নাথ তখন করে কী, সে দুহাতে বাঁদরটা ধরে শরীর থেকে ছাড়িয়ে, গাছ থেকে ডালপালা ছাড়ানোর টানে ঝুঁকে যায় স্বাধীনের দিকে—কড়া গলায় বলে, আপনার মটরবাবুকে নিন তো!

এর ফলে তার ও স্বাধীনের একটা অনিবার্য শারীরিক সংযোগ ঘটে যায়। স্বাধীন বাঁদরটা নিতে গিয়ে একবার প্রিয়নাথের চোখদুটো দেখে, মুখ নামায়। বাঁদর তার বুকে যায় ফের।

একটু সরে যায় প্রিয়নাথ। জামা ঝাড়পোছ করে রুমালে। চুল ঠিকঠাক করে। যা বলেছিলেন! ভীষণ দুষ্টু তো আপনার মটরবাবু!

আপনার লাঞ্ছনার এখনও বাকি রইল।

বুঝতে পেরেছি।

আরেকদিন হবে।

পাগল! আর আমি ওর ত্রিসীমানায় আসছিনে।

না এসে পার আছে ভাবছেন? জন্তুজানোয়ারের সংস্পর্শে একবার গেলে বারবার না গিয়ে উপায় থাকে না। একটা কিছু চরম ঘটে না যাওয়া অব্দি রেহাই নেই।

কে জানে!

খাঁচায় বাঁদরটা ভরে দিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে স্বাধীন বলে—ওদের বেলাতেও তাই। বাবা বলতেন, বুনো জন্তু একবার কোনভাবে মানুষের টাচে এসে পড়লে তাকে অনবরত আসতে হয়, যতক্ষণ না মারা পড়ে। বাবা বড় শিকারি ছিলেন—দাদার চেয়ে। আমলাবাগে অনেক বাঘ শুওর হায়না থাকত সে আমলে। হায়নার দাঁতের বিষেই বাবার ঘা পচে গিয়েছিল। তিনচার মাস ভুগে কলকাতার হাসপাতালে মারা যান।

শুনেছি।

আপনি জানেন, বুনো হিংস্র জন্তুরা অসুখবিসুখ হলেও অনেক সময় মানুষের কাছে চলে আসে? রোগা বাঘ একটা নাকি এসেছিল, ঠাকুর্দার আমলে। ঠাকুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে মেরে ফেলেন বাবা। পরে পস্তেছিলেন। তখন বয়স কম, অভিজ্ঞতা কম। ঠাকুর্দা ক্ষেপে গিয়েছিলেন। আর—আমি নিজেও অনেকবার দেখেছি রোগা খরিশ সাপ ঘরে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। ভৈরবে ফ্লাড হলেও এমন ব্যাপার হয়। নদীর এলাকায় যারা থাকে, তারা জানে।...

প্রিয়নাথ এ সময়ে আড়চোখে দেখতে পায়, উত্তরের জানলায় পর্দার ফাঁকে কে মুখ রেখেছে। কুসুম নাকি? কুসুম ভেবে সে চকিতে দৃষ্টি পুরো ফেলল সেখানে।

না—বিজয়েন্দু। তার ধবধবে সাদা চিবুক, লাল ঠোঁট ও কুচকুচে কালো গোঁফ দেখা গেছে। পর্দা সরে ঠিকঠিক হল ফের। সরে গেল বিজয়েন্দু।

স্বাধীন উল্টোদিকে তাকিয়ে ছিল। সে দেখল না। প্রিয়নাথের মাথার ভিতরটা আবার খালি লাগে। শরীরে ক্লান্তি নামে। কিন্তু সে স্বাধীনকে বলতে পারে না—আপনার স্বামী এসে আড়ি পেতেছেন। সে শুধু বলে—বিজয়েন্দুবাবু এতক্ষণ এসে গেছেন নিশ্চয়।

কে? ও—হ্যাঁ। বলা যায় না।

এবার চলি তাহলে?

কেন? সন্ধ্যাবেলায় চাষে নামবেন নাকি? ..স্বাধীন বাগানের অন্যদিকে পা বাড়ায়। —এই চাষাভুষো মানুষ নিয়ে আর পারা যায় না। শুনুন, এবার কাজের কথা। আপনি তো শুনেছি সয়েল টেস্ট করতে এক্সপার্ট। মাটি হাতে নিয়েই নাকি ধ্বন্বন্তরীর মত সব বাতলাতে পারেন?

একটু-আধটু!

সেই একটু-আধটু! বাবারে বাবা! পুরোটা কিছুই পারেন না! চলুন, আমার কিছু মাটিতে পোঁতা গোলাপ কাটিং দেখবেন। টবে চমৎকার বাড়ে। কিন্তু মাটিতে কীরকম মিইয়ে যায় কেন বলুন তো? মাটিটা দেখবেন, চলুন। আর এবার অজস্র ডালিয়ার কলম করেছি। শীত আসতে আসতে আমার বাগান আলো হয়ে যাবে। দেখবেন, চলুন।...একটু পরে বলে—চন্দ্রমল্লিকাও আছে।

আলো কমে গেছে। এখন সঙ্গে সঙ্গে টেস্ট করা কঠিন। বরং খানিকটা মাটি নিয়ে যাব।

আপনার ল্যাবরেটরি নেই ফার্মে? না থাকলে, দাদাকে বলুন—করে দেবে। যা-যা দরকার আনিয়ে নেবেন। দাদা ওই নিয়েই তো পাগল। দেখবেন আস্ত গন্ধমাদন বয়ে আনবে।

বলব।

তাহলে একটা কাগজ-টাগজ এনে দিই। এক মিনিট।

স্বাধীন চলে যায়। প্রিয়নাথ দাঁড়িয়ে থাকে—চোখ উত্তরের জানলার দিকে। কেউ নেই আড়ি পেতে—নাকি আছে? বিজয়েন্দু বড় অদ্ভুত তো! সুশিক্ষিত পণ্ডিত মানুষ—অথচ...

স্বাধীন কাগজ নিয়ে এসে চাপা স্বরে বলে—আপনাদের মাস্টারমশাই এসেই লিখতে বসেছেন চুপচাপ। দারুণ মুড এসেছে নিশ্চয়। তাই আর ডাকলাম না।

অন্ধকার একটু তাড়াতাড়ি নামল কি? পাঁচিলের বাইরে বড় সব গাছপালা সহস্রচক্ষু প্রাণীর মত তাকাচ্ছিল। শিশির জমছিল ঘাসে। মাটির প্যাকেটটা হাতে নিয়ে প্রিয়নাথ বলে—কাল সকালের দিকে খবর দেব।

প্রিয়বাবু?

বলুন।

না বলেও থাকা যায় না। অথচ নতুন মানুষ আপনি, সব এখনও বুঝে ওঠা সম্ভব নয় এত শিগগির।

নির্দ্বিধায় বলুন না!

বেচারা কুসুমকে আপনি আর তাতাবেন না। ও কষ্ট পাবে।

প্রিয়নাথ হাসে একটু।—কী মুশকিল!

ওকে রেহাই দিন।

প্রিয়নাথ গুম হয়ে যায়।

আজ সকালে এসেছিল কুসুম। আপনার ব্যাপারটা খুলে বলেছে ও। আমাকে কিছু লুকোয় না। মনে হল, ওর মনে চাঞ্চল্য এসে গেছে। সে তো স্বাভাবিক। ও আমার পরামর্শ চাইছিল।

কিসের?

আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন ওকে!

সে কী!

চালাকি করবেন না প্রিয়বাবু। আপনি বলেন নি ওকে, কলকাতা নিয়ে যাবেন?

ও, হ্যাঁ।

কেন এ লোভ দেখালেন ওকে? পারবেন ওই অশিক্ষিতা গ্রাম্য জংলী মেয়েটাকে স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিতে সমাজে? পারবেন ওর সঙ্গে মন মিলিয়ে ঘরসংসার করতে? একটা সাংঘাতিক ফারাক কী দিয়ে ভরাবেন বলুন তো? শুধু প্রেমভালবাসা দিয়ে? তা হয় না। আর—তাছাড়া, ও তো মোটেই সুস্থ ব্রেনের মেয়ে নয়, অস্বাভাবিক ওর সবকিছু! মেজাজ রুচি চালচলন—কোনটাই মিলবে না আমাদের চেনাজানা জীবনের সঙ্গে। বারবার তাল কাটবে। তখন নিজেই সমস্যায় পড়বেন—লজ্জা পাবেন। ওকে ঘৃণা করবেন।

একথা বলার জন্যেই কি এতক্ষণ সময় নিলেন?

সে কথার জবাব না দিয়ে স্বাধীন বলে—এদিকে যা বুঝতে পেরেছি, কলকাতা নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা মেয়েটার মনে জোর লেগেছে। অস্থির হয়ে পড়েছে। সত্যি তো, ও যেভাবে বেঁচে থাকে—তা কি কেউ পছন্দ করবে? ও উদ্ধার পেতে চায়! আফটার অল, ও মানুষ—মেয়ে। আর আপনি ওর চোখে একজন জোরাল—কী বলব? সুন্দর পুরুষ! আপনাকে অনেক মেয়ে মনে মনে চাইলে তাদের দোষ দেব না।

হ্যাঁ, হয়ত আমি কন্দর্প।

দুজনেই একটুখানি চাপা হাসে এখন। তারপর স্বাধীন পা বাড়িয়ে বলে—কী? যা বললাম মনে থাকবে?

দিব্যি করাতে চান নাকি?

অত জোর কোথায় আমার?

আপনি কি কুমুমের মরাল গার্জেন? আপনার বাবার মত?

শেষ বাক্যটা বলা হয় তো উচিত হল না—প্রিয়নাথ বলার পর বিব্রত হয়ে ভাবে। কিন্তু স্বাধীন ওটা বিশেষ গায়ে মাখল না যেন। সে বলে—হ্যাঁ। বাবা আমাকে বলে যান, ওকে যতটা পারি সাহায্য করতে—সব ব্যাপারেই। দাদাকেও বলে যান। মরার সময় আমি পাশে ছিলাম না—দাদা গিয়েছিল কলকাতা। ওকে বাবা কী সব বলেছিলেন। কিন্তু দাদা অদ্ভুত ভোলানাথ মানুষ। অগত্যা, আমি যা পারি, করে যাই। তবে কুসুম আমার তত ধার ধারে না—ও নিজের খুশিতেই চলে। নাকি ওর মায়ের দেওয়া প্রেতশক্তির ইচ্ছে মত ওকে চলতে হয়।

প্রেতশক্তি! চমৎকার বলেছেন। বলে জোরে হাসতে হাসতে প্রিয়নাথ সিঁড়ি বেয়ে খিড়কিতে ওঠে।

বারান্দায় আলোতে পায়চারি করছিল বিজয়েন্দু। ঘুরে দাঁড়ায় সে। হাসিমুখে বলে—শুনেছি, আপনি রয়েছেন। কিন্তু ভীষণ মুড এসে গিয়েছিল। প্রেতশক্তি নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা হচ্ছিল নাকি?

স্বাধীন পাশ কাটিয়ে কিচেনের দিকে যায়। —নকড়ি, কী সব হচ্ছে-টচ্ছে রে?

প্রিয়নাথ বলে—হ্যাঁ। ভূতপ্রেতের দেশে এ ছাড়া আর কী আলোচনার আছে বলুন! গতকাল বহরমপুর গিয়েছিলাম তো। একটা বইয়ের অর্ডার দেওয়া ছিল। অদ্ভুত সাবজেক্ট। প্যারা-সাইকলজির কথা আজকাল খুব ছড়াচ্ছে দেশেবিদেশে। খুব ইন্টারেস্টিং। প্যারা-সাইকলজি মানুষের অতিরিক্ত একটা শক্তি—আই মিন, সুপারস্টিশন ব্যাপার নিয়ে গড়ে উঠেছে। অতীন্দ্রিয় বলতে পারেন। টেলিপ্যাথির কথা নিশ্চয় শুনেছেন? চাঁইপাড়ার মেয়েটি মাঝে মাঝে অদ্ভুত টেলিপ্যাথির নমুনা দেখায়। আমি তো তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। প্যারাসাইকলজি বলছে—আসলে আমাদের ভাবনাগুলো একরকম ব্রেনওয়েভ। বুঝলেন? জাস্ট আলো যেমন একধরনের ওয়েভ। শব্দ যেমন আরেক ধরনের ওয়েভ। ব্রেনওয়েভেরও মাপ আছে। রেডিওর মত স্পেসে ছড়িয়ে যেতে পারে।

প্রিয়নাথ ফিকে হেসে বলে—চলি?

সে কী? আর বসবেন না? ও স্বাধীন, প্রিয়বাবু চলে যাচ্ছেন!

স্বাধীন বেরোয় না। এক মিনিট অপেক্ষা করে দুজনে। তারপর প্রিয়নাথ পা বাড়ায়। বিজয়েন্দু ঘরে ঢুকে টর্চ নিয়ে দ্রুত হেঁটে তাকে ধরে ফেলে ঠাকুরবাড়িতে—চলুন, একটু এগিয়ে দিই।

থাক। বলে প্রিয়নাথ চলে যায়।

বিজয়েন্দু দাঁড়িয়ে থাকে সদর দরজার সিঁড়িতে। আলো ফেলে রাখে গেট অব্দি। খুব লম্বা পা ফেলে প্রিয়নাথ আলোটা এক নিশ্বাসে পেরিয়ে যায়।...

মৃগাঙ্ক ফিরেছে। দাবা খেলছে গগন হালদারের ছেলে সেই মাস্টারমশায় সত্যেনের সঙ্গে। দাবার ছকে চোখ রেখেই বলে—কেমন হল খাওয়া-দাওয়া? আমি তো ভাবছিলাম, আবার নাড়ু ডাক্তারকে না ডাকতে হয়। ওরে নবীন, তোর বাবু এসেছে। সুস্থ না অসুস্থ দেখে যা।

রাতে খেল না প্রিয়নাথ। মৃগাঙ্ক আর সত্যেন পাশের বিছানায় দাবা খেলল একটানা রাত বারোটা অব্দি। চোখ বুজে প্রিয়নাথ ততক্ষণ এলোমেলো ভেবেছে, স্বাধীনের ওটা আদেশ না অনুনয়। ভেবেছে

কুসুম আর রঙিন সব হ্যালুসিনেশনের মেঘগুলোর কথা। বিজয়েন্দুর চোখদুটো পর্দার ফাঁকে কেন দেখছিল তাদের?...তারপর কখন ওদের খেলা শেষ হয়েছে। মৃগাঙ্কের মাথার কাছের টেবিলে ঢাকা বাতিটা জ্বলছে, ঘরময় ধূসর আলো। মৃগাঙ্ক হয়ত সত্যেনকে এগিয়ে দিতে বেরিয়েছে। প্রিয়নাথ ভাবছিল, যথেষ্ট ভাবা হল—এবার না ঘুমোলে তার কষ্ট হবে। সে তখন কাত হল।

সেই সময় বাইরে মৃগাঙ্কর চাপা হাসির শব্দ শোনে সে। সত্যেনের গলা শোনা যায়। এখনও ফার্মেই আছে ওরা? তারপর মৃগাঙ্ক বাইরে থেকে ডাকে—ও প্রিয়বাবু, ঘুমোলেন নাকি মশাই?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিয়নাথ সাড়া দেয়।

আরে, আসুন, আসুন! ভূত দেখে যান—শিগগিব! ও মশাই—প্রিয়বাবু!

প্রিয়নাথ ওঠে।

কুইক! মৃগাঙ্ক ডাকে ফের। চাপা হাসির শব্দ হয়।

অগত্যা প্রিয়নাথ বেরোয়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলে—কী ব্যাপার?

মলো ছাই! এখানে আসুন। দেখে যান।

প্রিয়নাথ নিচে নামে। মৃগাঙ্ক ও সত্যেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাঁদিকে নদীর ওপর আধখানা চাঁদ সবে উঠেছে। ঘন কুয়াশা জমে আছে দূরে। প্রিয়নাথ বলে—কই ভূত?

মৃগাঙ্ক দেখায়। —ওই শ্মশানের দিকটা দেখুন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন না?

কী?

আলোর চালচিত্তির! আমাদের দেশের ভূতগুলোর কী আইডিয়া! ভাবা যায় না। প্রিয়নাথ এতক্ষণে দেখতে পায়। তার মাথার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে একটা বিদ্যুৎ—তারপর বুক থেকে নেমে পা অব্দি ছড়িয়ে পড়ে। শিরশির করে সারা শরীর। শ্মশানবটের কাছে—হয়ত বাঁধের ওপর কী একটা অর্ধবৃত্তাকার ছোট্ট চালচিত্রের মত আলোর স্ফুলিঙ্গ এদিকে-ওদিকে আনাগোনা করছে। হঠাৎ সেটা চোখে পড়া কঠিন। কারণ এখনও জোনাকি জ্বলার মরশুম শেষ হয়নি নিসর্গে। আলোর চালচিত্রটা স্থির হল একটুখানি। তারপর দ্রুত চলতে থাকল দক্ষিণে। কিছুদূর গিয়ে থামল। আবার ফিরল উত্তরে। মিনিট পাঁচেক চুপচাপ তিনজনে সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখল।

তারপর সত্যেন বলে—চলি মিগাংদা। খুব দেখা হল ভূতের খেলা।

যাবে? এগিয়ে দেব?

না, না। রাত হয়েছে, শুয়ে পড়ুন।

সত্যেন টর্চ জ্বালতে জ্বালতে চলে যায়। প্রিয়নাথ বলে—আপনার টর্চটা জ্বালুন না!

কী ওটা?

ভূত মশাই, সেন্টপারসেন্ট ভূত। কখনও দেখেন নি, ভৈরবের পাড়ে দেখলেন। সারাজীবন গল্প করবেন।

ওটা ভূত নয়।

চলুন না, দেখে অসি।

পাগল হয়েছেন? আমার আর কাজ নেই. দুপুর রাতে ভূতের পিছনে দৌড়াদৌড়ি করে মরি। আসুন, শুয়ে পড়া যাক্।

প্রিয়নাথ গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। মৃগাঙ্ক হাসতে হাসতে ওকে ফের ডাকলেও নড়ে না। তখন মৃগাঙ্ক বলে—মজা দেখবেন? ভূতটাকে ভয় পাইয়ে দেব?

সে দ্রুত ঘরে যায় এবং বন্দুক নিয়ে আসে। প্রিয়নাথ কিছু বলার আগেই সেদিকে নল তুলে গুলি ছোড়ে। প্রচণ্ড আওয়াজে রাতের কুয়াশা জ্যোৎস্না ও স্তব্ধতা ভাঙচুর হয় কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর আর আলোটা দেখা যায় না। অনেক খুঁজেও কিছু দেখতে পায় না প্রিয়নাথ।

খামারবাড়ির লেকেরা অবশ্য নির্বিবাদে ঘুমোতে থাকে। ফসল-চোরদের সতর্ক করতে প্রায় রাতে মৃগাঙ্ক বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করে। কালুখাঁর দিয়াড় এতে অভ্যস্ত। প্রিয়নাথও।

মৃগাঙ্ক বন্দুক নামিয়ে চাপা গলায় বলে—দেখলেন তো? ভূতও ভয় পেতে জানে। এতক্ষণ ধরে যে

সংশয় খোঁচা দিচ্ছিল প্রিয়নাথকে, এবার তা তীব্রভাবে নাড়া দেয়। সে বলে—মৃগাঙ্কবাবু! ব্যাপারটা কী, বুঝেছি মনে হচ্ছে।

বুঝেছেন তাহলে?

হুঁউ।

খুব দেরি হল বুঝতে।

কিন্তু ও কেন এসব করে?

মৃগাঙ্ক তার হাত ধরে টানে। —আসুন, ভীষণ শিশির পড়ছে। তারপর ঘরে ঢুকে বিছানায় বসে বলে—কেন করে, তা বলা মুশকিল। হয়ত আমাকে ভয় দেখাতে চায়, কিংবা নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে মজা পায়। পার্ভার্সান একধরনের। হয়ত সেক্সুয়াল পার্ভার্সান।

এর আগে কখনও দেখেছেন?

হ্যাঁ। অনেকবার। আরও অনেকে দেখেছে। তারা অবশ্য ভূতপ্রেত বলেই মনে করে।

হালদারমশাই কী বলে?

সেটা কাল ওকে জিজ্ঞেস করবেন। ও একবার ধরিত্রীঠাকরানকে ধরে ফেলেছিল নাকি। ওই শ্মশানের ওখানটাতেও।

আলোটা কিসের?

বুঝলেন না? স্রেফ জোনাকি! একগাদা জোনাকি ধরেছে। একটা মুকুটের গড়ন হাল্কা শোলাটোলা দিয়ে ফ্রেম বানিয়েছে। তাতে আঠা দিয়েছে। তারপর জোনাকিগুলি বসিয়ে দিয়েছে সার-সার। এবার ওই আলোর মুকুট মাথায় পরে মাঠেঘাটে বেরিয়ে পড়লেই দারুণ একটা অলৌকিক ব্যাপার হয়। যতসব! শুয়ে পড়ুন।

প্রিয়নাথ শুয়ে আস্তে বলে—এসময় ও সুস্থ বা স্বাভাবিক থাকে কী না, কে জানে! হাতেনাতে তো ধরেননি কখনও। ধরেছেন?

না। ধরতে পারিনি। আমি এগোলেই লুকিয়ে পড়ে, কীভাবে টের পায়, এটাই আশ্চর্য। মাগীর আরেকটা ইলেকট্রনিক চোখ আছে যেন। অন্ধকারেও দেখতে পায়। আর সুস্থ বা স্বাভাবিক থাকে কি না বলছেন—আমার তো মনে হয় ও সজ্ঞানে ডেলিবারেটলি ওসব করে।

আচ্ছা মৃগাঙ্কবাবু, এমন তো হতে পারে যে ওটা ওর কোন অনুষ্ঠান? কোনরকম আচারও হতে পারে?

ভুট্, ভুট্! কিসের আচার মশাই? আমের—না, কুলের?

না, বিজয়েন্দুবাবু উইচ-কাল্ট বলে একটা কথা বলছিলেন সেদিন।

মাস্টারের কথা ধরবেন না। ও একটা পাগল, পাগল।

মৃগাঙ্কবাবু!

উঁ? শুতে শুতে জবাব দেয় মৃগাঙ্ক। চোখ বোজে। পা দোলায়।

এমন তো হতে পারে, যা করছে, ও টের পায় না—অবসেশনে থাকে।

আপনাকে খেয়েছে মেয়েটা। ঘুমোন। শরীর ভাল থাকলে সকাল সকাল উঠবেন। একবার মই-ফই দিয়ে গমটা ছড়াতে হবে। ক্যালিফোর্নিয়ার সীড বলে তো দিলে। জাগও ধরেছে ভাল। সামার কাল্টের গম। আপনাদের উইচ কাল্ট, আর আমার সামার কাল্ট। বাই দা বাই...হঠাৎ মৃগাঙ্ক কনুই ভর করে মাথা তোলে। —প্রিয়বাবু, গমের ব্যাপারে বর্ধমানে কী এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন—শুনেছি। আমি কি আপনার শত্তুর মশাই?

হ্যাঁ। মাথায় আছে।

মাথা থেকে নামাবেন তো? কালই আমাকে একটা লিস্ট্‌টিস্ট্ বা স্কিম করে দিন। কলকাতা যাব ভাবছি শিগগির—তখন সব এনে ফেলবো। গোডাউনের লাগোয়া একটা শেড করে দেব। ওখানে আপনি এসব কাজ করবেন। ব্লকওয়ালাদের মগজে ঘুণ ধরিয়ে দেব শালা!

দেব।

আর ও মশাই, পোল্ট্রির স্কিম কী হল! দেরি হয়ে যাচ্ছে যে। ব্যাঙ্ককে আগেভাগে বলেকয়ে রাখতে হবে তো!

দেব।

প্রিয়বাবু!

উঁ?

আপনি কেমন যেন মিইয়ে পড়েছেন। যখন এলেন, টগবগে তেজী ছেলে—ভাবলাম, আর আমাকে পায় কে। শালা, এয়ার কনডিশনড ঘরে বসে সবুজ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা আর মাঠের মাটিতে নাক ঠেকিয়ে সবুজ বিপ্লবের গন্ধ শুঁকে-শুঁকে মা বসুমতীর ভাঁড়ার ঘরে ঢোকা অন্য জিনিস। আমি লাস্ট একজিবিশনে তো বলে এসেছিলাম ওদের, যাবেন ভৈরবের পাড়ে—চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে! তা গতিক বড় ভাল ঠেকছে না প্রিয়বাবু। কী হয়েছে আপনার, বলুন তো? থাকতে চান না এখানে? ভাল লাগে না?

প্রিয়নাথ ব্যস্ত হয়ে বলে—না, না।

দেখুন প্রিয়বাবু, আমার ভগ্নীপতি পণ্ডিত মানুষ—ঠাট্টা করে বলে, আমি জোতদার—আমার ক্ষেতে ভাল ফসল হলে এলাকার গরিবদের কী আসে যায়? আমি কিন্তু ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনে, সমাজ-পৃথিবী-দেশ গোল্লায় গেলেও আমার মাথাব্যথা নেই। অন্যদিকে—আমি মানি-মেকারও নই। মুনাফাবাজ নই। আমি বেশি টাকা নিয়ে কী করব? বড়লোক হবার জন্যে আমি ফার্ম খুলিনি। লোকসানে-লোকসানে তো ফতুর হয়ে গেলাম মশাই! মেকানাইজড চাষে একপয়সা পড়তা হয় না, আমি ছাড়া হাড়ে-হাড়ে কে বুঝেছে বলুন? ইনডিভিজুয়াল ফার্মে তো লাভ হবেই না এদেশে। ভুলির কড়ি জোগাতে বউ বিকিয়ে যাবে। তবু আমি তাই করছি। কেন করছি? এ আমার নেশা বলুন—নেশা। জেদ বলুন—জেদ। এই নিয়ে আমি আছি, থাকতে ভালবাসি—এই হল আমার কথা। আমি খুব প্রিমিটিভ মানুষ প্রিয়বাবু। মাঠঘাট বনবাদাড় চাষবাস ফসল নিয়ে আমার জগৎ। এর বাইরে কোথাও গেলে আমি দম ফেটে মরে যাব। খুব ছেলেবেলা থেকে এই পরিবেশ আমার ভাল লেগে গেছে। এর মধ্যে জন্মেছি, এর মধ্যেই মরতে চাই। যখন মরব, ফসলের ক্ষেত থেকে আমার মড়া তুলে নিয়ে ভৈরবের জলে ফেলে দেবেন।

প্রিয়নাথ চোখ বুজে শোনে। মৃগাঙ্ক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

আপনাকে পেয়ে আমি কী যে সাহস অনুভব করছি, বোঝাতে পারব না। আমি মানুষ চিনি। শালা, দুনিয়া ভরে গেছে যতসব বাটপাড় জোচ্চোর মানি-মেকারে। টাকার জন্যে টাকা! তার জন্যে কসাই হও। আমি সব শালাকে ঘেন্না করি। আমি—বুঝলেন প্রিয়বাবু, শেকলবাঁধা বাঁদরদের মধ্যে আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম। রিয়েলি! কেউ আগুপিছু ধরার নেই—স্বাধীন, যেখানে খুশি ঝাঁপ দিতে পারে বিনি প্রফিটে। অতএব এই আমার নিজের মানুষ—আমার রাইটহ্যান্ড। দুই ভাই মিলে শালা ভৈরবের পাড়ে সবুজ পতাকা উড়িয়ে বসে থাকব—ব্যোম ভোলা! খাবদাব, শিকার করব, হাঁটু দুমড়ে কাদায় নামব—থোড়াই কেয়ার দুনিয়াটাকে। যে-যেখানে পারিস তোরা ধস্তাধস্তি মারামারি কর, জাহান্নামে যা—আমরা দু-ভাই এখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মজা দেখছি। তাই তো?

ব্রিলিয়ান্ট! প্রিয়নাথ আস্তে বলে।

আমি কি ভুল বলছি?

না।

এক চুমুক খাবেন?

প্রিয়নাথ চোখ খুলে বলে—নাঃ, থাক।

তাহলে আমি খাই!...বলে মৃগাঙ্ক হাত বাড়িয়ে দেয় তক্তাপোষের তলায়। একটা বোতল বের করে চিত হয়। ঢকঢক করে কিছুটা খেয়ে বোতলটায় ছিপি আঁটে। বুকে বসিয়ে রাখে।

মৃগাঙ্কদা!

তাও ভাল। এ্যাদ্দিনে দাদা বললেন। হাতে হাত দিন। ...হাত বাড়ায় মৃগাঙ্ক। প্রিয়নাথ হাতটা কিছুক্ষণ

ধরে থেকে বলে—আপনার যা কথা, আমারও তাই। জীবনে খুব ছেলেবেলা থেকে যে তেতো অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, মানুষকে আমারও খুব বিশ্বাসযোগ্য প্রাণী মনে হয় না। তবে কী—পৃথিবীটা তো এভাবেই চলছে, চলবে।

নাঃ, ওই দুঃখু-দুঃখু ঢঙটি আমার বরদাস্ত হয় না। কিসের দুঃখ?

মৃগাঙ্কদা, আপনি কখনও প্রেম করেননি?

ভ্যাট, ভ্যাট! ও তো শালা মাগীমুখোদের কারবার। বেড়ালের কলজে যাদের।

আপনার সেক্সইনস্টিংক্ট তো আছে।

আলবাৎ আছে। আমি কি পুরুষ নই?

তাহলে?

মাইরি, বিলিভ মি। দেখিয়ে নিয়ে আসব—শিমুলিয়ায় আছে। নাখু ওঝার মেয়ে।

সাত-আটটা স্বামীর ঘর করেছে। বেশি খায় বলে লোকেরা ওকে ডিভোর্স করে। খাবে না? স্বাস্থ্য ভাল, একা তিনজনের আহার তো গিলবেই। লোকে বলে, নাখু ওষুধ খাইয়ে মেয়ের পেটটা নষ্ট করছে। উদ্দেশ্য? না—যতবার বিয়ে দেবে, কনে-পণ পাবে। ওদের আবার কনে-পণের কারবার কিনা। এদিকে ছেলেপুলে না হলেই মঙ্গল।

নাখু টের পায় না?

কী? আমার ব্যাপার? ও শালা ভাগাড়ের শকুন। মাঝে মাঝে দু-এক বস্তা ধান-খন্দ দিই। মাথায় বয়ে নিয়ে যায়। এতো কোন লুকোছাপার ঘটনা নয়। এলাকার সবাই জানে।

আপনার দেখছি, সবই প্রিমিটিভ কারবার।

নিশ্চয়। তবে ব্রাদার, তুমিও লাইনে এসেছ। ভাল—আই কনগ্রাচুলেট। কিন্তু বিষাক্ত বুনো ফলে হাত বাড়িয়েছ। দেখতে সুন্দর, কিন্তু কোয়ায়-কোয়ায় বিষপোকা গিজগিজ করছে।

কেন? ঘুম আসছিল প্রিয়নাথের। জড়ানো স্বরে প্রশ্নটা করে সে।

একরাতে কিছু টের পেয়েছ নিশ্চয়। পাওনি?

নাঃ!

ব্রাদার!

উঁ?

কাজকম্ম কিছু কি হয়েছিল সে রাতে? নাকি খামোকা হয়রানি হল?

কিচ্ছু না।...প্রিয়নাথ সুখী প্রেমিকের গলায় মিটিমিটি হেসে জবাব দেয়।

বেঁচে গেছো। ব্লাডটা একবার চেক করিয়ে এস কাল বহরমপুরে। ...মৃগাঙ্ক ফের খানিকটা গেলে। তারপর ছিপি এঁটে তক্তাপোষের তলায় চালান করে দেয়। চোখ বুজে পা দোলায়।

কতক্ষণ পরে প্রিয়নাথ ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে, শোনে, মৃগাঙ্ক কী সব বিড়বিড় করছে। কাকে গাল দিচ্ছে। মাতাল হয়ে গেছে নির্ঘাত।...

কয়েকটা দিন চৈতালি খন্দ বোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকল প্রিয়নাথ। মৃগাঙ্কও গায়ে ঘাম নিয়ে সমান খেটেছে। মাঝে মাঝে ট্রাকটরে বসে বিকেলের দিকে প্রিয়নাথ দেখেছে, বিজয়েন্দু শ্মশানের দিকে যাচ্ছে। ফার্মে আসে না আর। স্বাধীনেরও খবর নেই। কুসুমেরও না। গগন এসে দূরে দাঁড়িয়ে জাল বুনতে-বুনতে চাষবাস দেখে। খামারে ফিরলে কিছু রাত অব্দি গল্প-গুজব করে বাড়ি ফেরে গগন। সত্যেন আসে। দাবায় বসে মৃগাঙ্কের সঙ্গে। প্রিয়নাথ চুপচাপ শুয়ে থাকে।

একটা ল্যাবরেটরি না বানিয়ে মৃগাঙ্ক থামবে না। যা একবার মাথায় ঢোকে, তার করা চাই। প্রিয়নাথকে নিয়ে একদিন কলকাতা যায় সে। পরদিন ফেরে জিনিসপত্র কিছু রেলে বুক করে দিয়ে।

সেই সন্ধ্যায় প্রিয়নাথ দেখল, গগন হালদার নবীনের সঙ্গে গল্প করছে। তাকে দেখে গগন এগিয়ে আসে। —কোথায় গিয়েছিলেন নতুনবাবু?

তারপর, খবর কী? প্রিয়নাথ এমনি কথার কথা বলে একটা। —কলকাতা গিয়েছিলুম।

গগন চাপা গলায় বলে—কুসমি আপনার খোঁজ করছিল।

তাই নাকি?

হুঁ বিশেষ দরকার বলছিল। খুলে কিছু বলল না।

আমার সঙ্গে কী দরকার?

আছে হয়ত কিছু। সময় মত একবার দেখা করবেন। এখানে তো আসতে পারবে না।

আমার সময় হবে না, বলবেন।

গগন একটু দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। তারপর বলে—আমাকে বলতে বলেছিল, বললাম। এখন আপনার ইচ্ছে। তবে কী—মেয়েটাকে কেউ বুঝতে পারল না। ওর কপাল!

গগন চলে যায়। মৃগাঙ্ক মুখ তোলে প্রিয়নাথকে দেখে। —কী বলছিল হালদার মশাই?

কিছু না।

সে রাতে আর ঘুম আসে না প্রিয়নাথের। শ্মশানের দিকে কারা মড়া পোড়াচ্ছে। হরিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। একবার ভাবল, কুসুমের বাড়ি যাবে—টানটা তীব্র হচ্ছিল, পরে আলস্য এল। মৃগাঙ্ক অকশ্য অঘোরে ঘুমোচ্ছে মশারির মধ্যে।

প্রিয়নাথ শিশিরে দাঁড়িয়ে রইল। শিগগির শীত এসে যাবে মনে হচ্ছে! কুয়াশা বেড়েছে। অন্ধকার রাত চলেছে এখন। হয়ত আজ কিংবা কাল অমাবস্যা। শেয়াল ডাকল কিছুক্ষণ। পেঁচাও ডাকল দু'চারবার। নবীন শুতে যাবার আগে ল্যাট্রিন থেকে ফেরার সময় বলে যায়—উঠে আসুন স্যার, খুব হিম পড়ছে।

প্রিয়নাথ শ্মশানের দিকে তাকিয়ে ছিল।

হঠাৎ একটা কিছু চোখে পড়ে তার। সে-রাতের মত একটা ছোট্ট আলোর চালি কিংবা ওইরকম কিছু—যা নড়াচড়া করছে।

কাঠের বেড়ার কাছে গিয়ে সে দেখতে পায়, আলোটা ফার্মের দিকেই আসছে। ক্রমশ স্পষ্ট হয়। মৃগাঙ্ক ঠিকই বলেছিল। জোনাকি গাঁথা রয়েছে বড়ো মুকুটের ফ্রেমে। প্রিয়নাথ দাঁতে দাঁত চেপে দেখতে থাকে।

বেশ কিছুটা কাছে এসে আলো দাঁড়ায়। অন্তত তিন-চার মিনিট। তারপর ফের এগোয়। তখন প্রিয়নাথ বেড়ায় ওঠে। ওপাশে খাল আর ঝোপঝাড়ে ভরা জমি খানিকটা। খালটা পরিখাবিশেষ। ফার্মে ভৈরব থেকে জলও আনা হয়। এককোমর জল থাকা স্বাভাবিক। তবে ডাইনে দক্ষিণে জমি ঘুরে গেলে একটা ছোট্ট গেট মত আছে। ওখানে একটা তক্তা পাতা রয়েছে। ওই পথে বাঁধে বা শ্মশানের দিকে যাওয়া যায়।

কিন্তু ঝোঁকের বশে খালেই নামল প্রিয়নাথ। প্যান্ট উরু অব্দি ভিজল। সাবধানে পেরিয়ে পাড়ে ভর দিয়ে ওপারে উঠল। ঝোপের ওপাশে সেই অলৌকিক তখনও স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে মনে প্রিয়নাথ বলে—কী, টের পাচ্ছ না কিছু? আমি এত কাছে চলে এসেছি, তাও বুঝতে পারছ না? হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতেই সে দেখে, অলৌকিক দ্রুত সরে যাচ্ছে। তখন উঠে দাঁড়ায় প্রিয়নাথ। দৌড়ে তাকে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু আর দেখতে পায় না। বাঁধে গিয়ে চারপাশে খোঁজে। আশ্চর্য তো! এবার প্রিয়নাথ একটু ভয় পায়। মৃগাঙ্ক যা বলেছিল, তা কি সত্যি? মৃগাঙ্ক নিশ্চয় ভুল বলেছে। সে গোঁয়ার—কিছু বিশ্বাস করে না।

গতকাল শ্মশানে মড়া পোড়ান হয়েছে। কে জানে, আজ রাতটা অমাবস্যার কিনা। ভূতের ভয়ে সত্যি আচ্ছন্ন হয় সে।

কিন্তু না—ফের সেই আলোটা দেখা যাচ্ছে। নদীর একেবারে ধারে চলেছে। প্রিয়নাথ নিশি পাওয়া মানুষের মত দৌড়ে যায়। তারপর চাপা গলায় ডাকে—কুসুম, কুসুম!

অলৌকিক থামে না। সেই দূর্বাঘাসে ঢাকা চটান পেরিয়ে দক্ষিণে বাঁকের দিকে এগোয়। প্রিয়নাথ বাঁধ থেকে নামে। আছাড় খায় মাঝে মাঝে, হাঁচড়-পাঁচড় করে ওঠে, তারপর দৌড়ায়। কিন্তু আশ্চর্য, নাগাল পায় না। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে। সবটাই চোখের ভুল নয় তো?

আলোটা থেমেছে। যেন তাকে যেতে বলছে। প্রিয়নাথ ফের দৌড়ে যায়।—কুসুম, কুসুম!

আলো স্থির। একেবারে কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরতে যায় প্রিয়নাথ। অমনি জলে ঝাঁপ দেবার শব্দ হয়। অন্ধকার জলে আলোর চালিটা ডুবে যায়। ফের ভেসে ওঠে।

রাগে-দুঃখে প্রিয়নাথ ছটফট করে। এখানটায় দহ। বারোমাস গভীর জল থাকে নাকি। ইচ্ছে করে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক্ষুণি। বুজরুকি ভেঙ্গে দেয় মেয়েটার। এসবের মানে কী? ওই আলোর মুকুটপরা, ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপ!

সে ফের ডাকে—কুসুম, কুসুম!

স্রোতে একটা কিছু ধস্তাধস্তি করছে টের পাওয়া যায়। নক্ষত্রের আলো তিরতির করে কাঁপছে। মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কালো কিছু নড়ে উঠছে। কিন্তু তার বেশি কিছু বোঝা যায় না।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ একটা আতঙ্ক প্রিয়নাথের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ কার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে সে? মানুষ নয়—নিশ্চয়ই মানুষ নয়। ভৈরবের পাড়ে এক অন্ধকার রাতে দাঁড়িয়ে জীবজগতের পুরনো—অনেক পিছনের একটা আদিম সত্তার সঙ্গে মোকাবিলা করা সহজ নয় তার পক্ষে। সে ভাষা তার জানা নেই। সে নতুন পৃথিবীর বাসিন্দা। পুরনো পৃথিবীতে পা বাড়ানোই তার ভুল হচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলতে পারে ওরা।

আচমকা প্রচণ্ড ভয় আর দুঃখ নিয়ে প্রিয়নাথ দৌড়ে পালিয়ে যায়। তার সারা শরীরে কাঁপুনি থামে না। আছাড় খেতে খেতে সে প্রাণ হাতে করে পালাতে থাকে...

মৃগাঙ্ককে ঘটনাটা বলেনি প্রিয়নাথ। কিন্তু মাথার ভিতর কুরে-কুরে মগজ খেতে থাকে কী একটা বিষপোকা। একদিন ঘাটের মাচায় দুপুরবেলা গগনের সঙ্গে দেখা হয় তার। গগন জাল বুনছিল অভ্যাস মত। ঘাটটা তখন প্রায় নির্জন বলা যায়। গগন তাকে দেখে একটু হাসে। —কী বাবা, আর দেখি না যে আজকাল? খুব চৈতেলি করা হচ্ছে বুঝি?

প্রিয়নাথ পা ঝুলিয়ে বসে। --কী জাল এগুলো?

বেসাল। দেখেন নি? দুদিকে দুখানা বাঁকা হালকা বাঁশ, মধ্যিখানে জাল?

দেখেছি।

এ আমার নেশা। মরার সময় হাতে দেখবেন সুতোর তকলি ধরা আছে।

হালদার মশায়ের বাড়িতে তো এ পাট নেই। তবে জাল বুনে কী হয়?

গগন আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে—হুঁ, অভ্যাস। তবে বেচি—যা দুপয়সা হয়।

তোমার আবার পয়সার অভাব হালদার মশাই? ছেলেরা চাকরি-বাকরি করছে!

আমি ছেলেদের পয়সা নিইনে। আপনার মিগাংবাবু জানে—শুধোবেন। থাকি সাবেক পাটকাঠির ঘরে। সত্যেন্দ্ররা ইটের একতালা বানিয়েছে। মহেন্দ্র তো দুগ্‌গাপুরে থাকে। সত্যেন বউ-ছেলেপুলে নিয়ে দালানে থাকে। আমি নিজের জায়গায়। হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাই।

প্রিয়নাথ অবাক হয়। —সে কী! তাহলে বলব—বউমার সঙ্গে শ্বশুরের ভাবটাব নেই।

গগন ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসে। ...নাঃ। কথাটা তা নয়। সত্যেন্দ্র খুব সাধাসাধি করে। আমি বাবা পারিনে। চিরকাল যা খেয়েছি, তা ছাড়া ভাল খাবার পরার দ্রব্য আমার সয় না। আমি তো জলের জীব, ডাঙার নই। জল আমাকে টানে। তাই এখানটায় এসে তাকিয়ে বসে থাকি।

তাহলে নৌকোয় থাকলেই তো ভাল হত হালদাবমশাই!

সে আর বলতে? সারাজীবন প্রায় নৌকাতেই কেটেছে। তখন তো পুবপাড়ে বাঁধটাধ ছিল না। বেবাক ছিল জলা আর জঙ্গল। মনের সুখে রাজত্ব করেছি বাবা!...দীর্ঘশ্বাস ফেলে গগন। —তবে কী, লোভ মানুষকে খেলে। আর মানুষও ক্রমে-ক্রমে বেশি জন্মাতে লাগল। এরপর কী হবে. ভেবে ভয় পাই! আমি বুঝিনে গো, সত্যি বুঝিনে—মানুষের এত বৃদ্ধিই বা ক্যানে, ক্যানেই বা এত লটবহর! এতসব মোটরগাড়ি বিদ্যেবুদ্ধি—হুঁ! কিসে লাগে?

হঠাৎ প্রিয়নাথ বলে—আচ্ছা হালদারমশাই, তুমি তো ডাইনীর কারবার অনেক দেখেছ। মাথায় জোনাকির টোপরপরা কাকেও দেখেছ?

হুঁউ। ধরিত্তি পরত। অমাবস্যার কদিন আগে থেকে ওদের একটা ব্রত-ট্রত আছে। অমাবস্যার রাতে তা শেষ হত। তখন ওরা চানটান করে চুল এলিয়ে উলঙ্গ শরীরে বাড়ি ফিরত। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিত মস্ত। অনেক দেখেছি। এসময় ধরিত্তির কুচুটে ভাবটা থাকত না। আহা, মাটির মানুষ তখন। যে যা চায়, দিতে দেরি করবে না।

তার মানে?

মানে? ...গগন মুখ নামিয়ে বলতে থাকে। —সে একটা গুহ্যকথাও বটে। ধরিত্তি বলত। অমাবস্যার নিশিপালনে ওদের পরপুরুষের সঙ্গ করতেই হবে। না হলে ভষ্টো (ভ্রষ্ট) হবে। তাই মনের মত পুরুষটিকে ডাক দিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বলবেন—পাবে কোথায় অত রাত্তিরে? তাই না?

হ্যাঁ।

পায়। পেয়ে যায়। যাকে পছন্দ থাকে, তার বাড়ির আনাচে-কানাচে গিয়ে আলোর মটুক পরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর কিছু একটা হয়—আজও বলতে পারব না, বশীকরণের টান না কী মন্তর-তন্তরের কাজ, পুরুষটি সুড়সুড় করে চলে আসে। ঘোর লাগে চোখে। নিশির ডাক, নতুনবাবু।

নিজে দেখেছ, নাকি সব শোনা কথা বলছ?

গগন রহস্যময় হেসে ভুরু কুঁচকে তাকায় তার দিকে। তারপর বলে—আমার নিজের কাণ্ড শুনতে চান?

নিশ্চয়!

হুই দহে নৌকো বেঁধে আছি। ফি'রেতে দেখি এদিক-ওদিক আলোর মুটুক মাঠে নেচে বেড়াচ্ছে। সেরাতটা ছিল অমাবস্যার—জানতাম না। নৌকোর খুব কাছে এল যখন, লাফ দিয়ে ডাঙায় নামলাম। দেখি তো মাগীর দৌড়!

ধরিত্তি তা জানতে পেরেছিল?

গগন রাতবিরেতের মানুষ, বাবা। আজ না হয় চোখের সেই আগুন নিভে রাতকানা হয়েছে।

তারপর?

কিছুদূর দৌড়ে জলে ঝাঁপ দিল। আমিও দিলাম। ধরলাম। দেখি, শালীবেটি উলঙ্গ একেবারে।

তারপর, তারপর?

বললাম, ডাঙায় ওঠ। ও যাবে না। বলে—জলেই। মাটি ছোঁবে না—ওই অবস্থাতেই ধরিত্তি পুরুষকে ভোগ করবে। ওই নাকি নিয়ম।

ব্রিলিয়ান্ট! তারপর?

হল। তারপর হঠাৎ দেখি ধরিত্তি অন্যমূর্তি। পিশাচী একেবারে। আমার গলা টিপে ডুবিয়ে মারতে চেষ্টা করল। প্রথমে ভেবেছিলাম, খেলা—পরে বুঝলাম, না, অন্য সাংঘাতিক মতলব মাগীর মাথায়। ভয়ে শিউরে উঠলাম। কিন্তু তখন আমি জোয়ান মানুষ, গায়ে আট-ন'টা হাতির জোর ছিল। বেকায়দা দেখে ও স্রোতে ভেসে পালাল। আমি হাঁফাতে হাঁফাতে পাড়ে উঠলাম। অন্য কেউ হলে ঠিক মেরে ফেলত ধরিত্তি।

কেন, কেন?

সেটা আজও সমিস্যে, নতুনবাবু। বলতে পারব না ক্যান।

প্রিয়নাথের হৃদপিণ্ডে খিল ধরে গেল যেন। গলা শুকিয়ে গেল। সেরাতে কুসুম কি তাহলে তাকে ভোগ করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল?

পরে কথাটা একশোবার শুধিয়েছি ওকে। বলেছে—ছি, ছি! ও কী কথা! পায়ে হাত দিয়ে কেঁদেও ফেলেছে। আসলে—হয়ত তখন মানুষ থাকে না ওরা। জানতেও পারে না যে কী ভালোমন্দ করছে।

অবসেশন? প্রিয়নাথের মনে পড়ে বিজয়েন্দুর কথা। 'অবসেশন' 'নির্জ্ঞান মনে হত্যার বাসনা',

এইসব কী আলোচনা করছিল একদিন ওই শ্মশানের ধারে। কিছু কান করেছিল—কিছু করেনি প্রিয়নাথ। কিন্তু সেক্সের সঙ্গে হত্যার কী সম্পর্ক?

সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

নতুনবাবু, কী ভাবছেন?

ভাবছি, তাহলে ধরিত্রী তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল?

তাছাড়া কী?

পারল না বলে নিশ্চয় ভ্রষ্ট হল? ডাকিনীবিদ্যা কী বলে?

গগন হাসে আবার। —ধরিত্তি তো ডাকিনীকুলে ভষ্টো মেয়ে ছিল! ও না হল খাঁটি ডাকিনী হতে—না পারল মানুষ হতে! ওর মধ্যে মানুষের লোভটাই ওজনে বেশি ছিল। তাই শেষ অব্দি ডাকাতদলের সর্দারনী হল। কিন্তু কোথায় সোনাদানা? এক পয়সাও তো রেখে যায়নি! কুসুম মেঝে খুঁড়েছিল—মাটিতে কিছু পোঁতা আছে নাকি দেখতে। বেচারি একটা কানাকড়িও পায়নি। আমার ধারণা, ধরিত্তি ডাকাতদের শুধু খোঁজখবরই যোগাত। বুঝলেন? হিস্যে হয়ত পেত সামান্য কিছু। পোড়া পেট মানুষের। ওকে ঠকিয়ে ভুট করেছে ডাকাতব্যাটারা!

কুসুম আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে, বলেছিলে। কেন? আর দেখা হয়নি ওর সঙ্গে?

হয়েছে।

বলেছিলে, আমি দেখা করতে চাইনি?

হুঁউ।

শুনে কী বলল?

হাসল!

হাসল?

হুঁউ। তারপর চলে গেল। ওর ছাগলটার অসুখ হয়েছে। বাঁচবে না।

হালদার মশাই, ডাকিনীরা—মানে ধরিত্রী, গায়ে এত জোর পায় কোথায় যে পুরুষ মানুষকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করে?

গগন একটু ভেবে বলে—সেটা সমিস্যে। তবে দেখেছি, ভূতে ধরা রোগা লিকলিকে মেয়ে দাঁতে জলভরা পেতলের কলসি কামড়ে দৌড়ে যায়। মলিন্দ মণ্ডলের বউকে একবার ভূতে ধরল। শিমুলিয়ার নাখু ওঝাকে ডাকা হল। ওদের বাড়ির সামনে পাড় বাঁধানো কুয়ো আছে। ভূতটা ছেড়ে যাবার সময় নাখু হুকুম দিলে—কুয়ো পেরিয়ে যা! বউটা অমনি একলাফে কুয়ো পেরিয়ে গেল। সবাই দেখেছে। কোত্থেকে অত জোর আসে গায়ে বলতে পারব না। ভূতের ব্যারাম উঠলে চার-পাঁচজন বলবান পুরুষ আটকে রাখতে পারে না রুগীকে! এও কত দেখেছি।

প্রিয়নাথের মনে পড়ে যায়, তার বাবার চিকিৎসার কথা। হিস্টিরিয়ার কথা। বাবা বলতেন—হিস্টিরিয়া নীলবর্ণা সুন্দরী, সরল ছিমছাম হিলহিলে গড়ন, পাতলা ঠোঁট। ইগ্নেশিয়া প্রথম আক্রমণের মোক্ষম ওষুধ। ইগ্নেশিয়া মাত্র ছয় শক্তির। বাবা চড়া ডায়ালুশনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে চোখের তারা বড়, ভুল বকছে, এসব লক্ষণে বেলেডোনা-৬ কাজ দেয় অব্যর্থ। বেলেডোনা আবার হ্যালুসিনেশন দিতে ওস্তাদ। প্রাচীনকালে মিশরের পুরহিতরা গায়ে বেলেডোনা মাখিয়ে দিলে লোকে মেঘরাজ্য পেরিয়ে স্বর্গ দেখতে পেত! আজকাল এল এস ডি তাই করে নাকি! ভাং গাঁজা আফিম চরসও ওই জিনিস। মধ্যপ্রাচ্যের হেকিমরা একরকম সুর্মা চোখে পরালে লোকে বাঁদরকে দৈত্যের মত বিশাল দেখতে পেত। ...ছেলেবেলায় শোনা কথা বরাবর মনে থাকে। বিজয়েন্দুর সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু সেখানে যেতেও ইচ্ছে করে না আর। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হঠাৎ কেন যেন এড়িয়ে চলছে প্রিয়নাথকে। কুসুম বলেছিল গন্ধপোকার গন্ধ আর কুচট পোকার কু'য়ের কথা। অবিশ্বাস্যভাবে সেই কারবার! কিন্তু স্বাধীন তাহলে কেন এড়িয়ে থাকবে?

গগন কথকের ঢঙে বলে ওঠে—এ হল ভূতিনী-প্রেতিনী-ডাকিনী-যোগিনীর দেশ, নতুনবাবু। এই নদীটা দেখছেন, ভৈরব। বাবা ভৈবব। মা গঙ্গা ওখানে শুলেন উত্তব শিয়রে, তো বাবাও এসে একটু

ফারাকে মজা করে উত্তর শিয়রে শুয়ে পড়লেন। বাবার সাঙ্গপাঙ্গ—ওইসব ভূতিনী-ডাকিনী-যোগিনী বাবার সঙ্গে এসে জুটল। বাবা এলেন, ওরা না এসে পারে? আপনি ভৈরবের যদ্দুর যাবেন, ওঝা তন্তরমন্তর ডাক-ডাকিনীর বাসা দেখবেন দুই পাড়ে। তবে কী, আজকাল উচটান হয়ে গেল। লোকে মানে না, বিশ্বাস করে না। বিশ্বাসই তো মূল কথা! বিশ্বাস পালালে সব ছেড়ে পালায় মানুষকে। মানুষ তখন শূন্যি গোয়ালে লেজকাটা এঁড়ে হয়ে গাঁক-গাঁক করে।

তুমিও তো বিশ্বাস কর না কিছু, হালদারমশাই!

আগে ভৈরবের ওপারে বিলখালজঙ্গলে বিস্তর আগুনের খেলা দেখতাম নিশিরেতে। হাউই উড়ত। আগুনের ডেলা ঘুরে বেড়াত। লোকে বলত, ভুলো। মুসলমানরা বলত, জিনের রাজার বিয়েসাদি হচ্ছে। আজকাল কিছু দেখি না। বুনো জন্তুজানোয়ারও কোথায় পালাল কে জানে! বাঘগুলো আর ডাকতেও শুনিনে। আগে সাঁঝ-সকালে ওপারে আমলাবাগের দিকে বাঘ ডাকত। আর কিছু রইল না নতুনবাবু। মানুষ শ্মশানে বাস করছে। ন্যাড়া হয়ে গেল ভগবানের রাজত্বটা। আমি কিন্তু কিছু বুঝি না—ক্যানে এত সব, ক্যানে?

গগন চুপ করে যায়। প্রিয়নাথ ওর ঘোলাটে চোখের দিকে তাকায়। বুঝতে পারে, গগন জেলের চোখের সামনে ছত্রখান মায়া-জগতটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে, ধ্বংসাবশের মধ্যে ও খুঁজছে কাকেও—ধরিত্রীকেই হয়ত।

প্রিয়নাথ একটু পরে বলে—কুসুমের সঙ্গে আমি দেখা করব, হালদারমশাই।

উঁ? ক্যানে?

দেখা করতে চেয়েছিল, বলছিলে যে?

ও।

এখন কি বাড়িতে আছে সে?

গগন মাথা দোলায়। জানে না। তারপর জাল বুনতে শুরু করে সে। গম্ভীর হয়ে গেছে হঠাৎ।

প্রিয়নাথ উঠে পড়ে। ঘাটে পাটবোঝাই নৌকো ভিড়েছে। লোকেরা উদোম ভিজে গায়ে ওপারে পাট কেচেছে সকাল থেকে। হাতে কাঠের বৈঠা। এখন বাড়ি ফিরছে। ঝলসানো মুখ।

প্রিয়নাথ নদীর ধারে-ধারে ঝোপ-জঙ্গলে ঢুকে এগিয়ে যায়। সেরাতের ঘটনাটা ওকে এতক্ষণে খুবই উত্তেজিত করে তোলে। কুসুম কি তাহলে ওদের প্রথামত উলঙ্গ ছিল? জলে নামতে পারেনি প্রিয়নাথ—সে গগন নয়। এতখানি বন্য আবেগ তার রক্তে নেই। জলে ঝাঁপ দিলে কি কুসুম তাকে আমন্ত্রণ জানাত এবং তারপর মেরে ফেলত? অবিশ্বাস্য লাগে। আবার বিশ্বাস করতেও সাধ যায়। স্বাধীন বলেছে কুসুমকে রেহাই দিন—লোভ দেখাবেন না। কিন্তু লোভ তো কুসুমই দেখাচ্ছে তাকে। পাল্টা নালিশ করে এলে কী হয় স্বাধীনের কাছে?

সবজিক্ষেতের বেড়া ঘুরে গাবগাছটার কাছে পৌঁছয় প্রিয়নাথ। দিনদুপুরে গাছটা এবং কুসুমের কুঁড়েঘরের সব রহস্য মুছে গেছে। একটা প্রচলিত দারিদ্র ঘিরে আছে ওখানটা। একটু সঙ্কোচ লাগে।

সেরাতে ঘর বা পরিবেশ স্পষ্ট ছিল না। এখন স্পষ্ট। প্রিয়নাথ কোন মায়া দেখে না সেখানে। ওই পাটকাঠির বেড়ার ঘর—কাদার ছিটে দেওয়া দেয়াল, কোঙাপাতা আর খড়ের চাল, হতশ্রী, তার মধ্যে কুসুম থাকে! একটা আশ্চর্য সৌন্দর্য এখানে বনের অন্ধকারে পচে শেষ হয়ে যাবে, নির্জ্ঞান বাসনার আগুনে জ্বলতে-জ্বলতে ছারখার হবে! চোয়াল আঁটো হয় প্রিয়নাথের। মনে মনে বলে—কার হাতে ধরা আছো কুসুম? তাকে আমি দেখতে চাই মুখোমুখি। তার সঙ্গে লড়তে চাই!

আর, সেই সময় ঘর থেকে দাওয়ায় বেরিয়ে কুসুম এদিকে তাকাতেই চোখে চোখ পড়ে যায়।

প্রিয়নাথ বেড়ার ওপারে থেকে একটু কেশে বলে—ডেকেছিলে?

কুসুম বেশ দেরি করে জবাব দিতে। সে লঙ্কাঝাড়ের মধ্যে পা পেলে এগিয়ে আসে ওর দিকে। তারপর একটু হাসে। —আসবেন না বলেছিলেন। কেন এলেন?

কথা আছে।

আমার কথা ছিল, শোনেননি। আমি কেন শুনব নতুনবাবু?

তুমি আমাকে ভেতরে ডাকছ না, কুসুম!

আপনি কি আর আসবেন ভেতরে? জাত যাবে না? মিগাংবাবু বন্দুক নিয়ে হামলা করতে আসবে না?

না।

একটু চুপ করে থাকার পর কুসুম চাপা হেসে বলে—পারেন তো বেড়া টপকে আসুন! সদর দরজায় আস্টেপিস্টে কাঁটা দিয়ে রেখেছি। ওদিকে এলে আমি কথা বলব না আপনার সঙ্গে।

প্রিয়নাথ বেড়ার দিকে তাকায়। কাঁটায় ভর্তি। প্রায় বুকসমান উঁচু। হাইজাম্প অভ্যাস ছিল কিশোর বয়সে। এখন আর সে দম হয়ত নেই।

কী? পারবেন না?

এখানেও তো কাঁটা তোমার।

একটু কাঁটার চোট লাগবে না কুসুমের কাছে আসতে? কুসুম কি কাঁটা ছাড়া গাছের ফল?

প্রিয়নাথ তার হাত আর ঠোঁট দেখায়। —এই তো লেগেছে। এই চেরাদাগগুলো কিসের চিনতে পারছ না?

কিসের?

যেরাতে পাকারাস্তায় ধস্তাধস্তি করলাম তোমার সঙ্গে! কটা চুড়ি ভেঙেছিল কুসুম?

দাম দেবেন নাকি?

চাইলে দেব।

দেরি হয়ে গেছে। কই, চলে আসুন! লাফ দিন না!

প্রিয়নাথ সদর দরজা অর্থাৎ আগড়টা খোঁজে। সেরাতে ওই কাঁটার আগড় পেরিয়ে ঢুকেছিল। ডাইনে অনেকটা ঘুরে যেতে হবে। চারদিকে শুধু ঝোপঝাড় গাছপালা আর মাঝে মাঝে সবজিক্ষেত। সে ঘুরে যেতে পারে—সেটা কোন কথা নয়। কিন্তু কুসুম তার সঙ্গে কাঁটার বেড়া নিয়ে খেলা করতে চাচ্ছে জেনেই সে পিছিয়ে যায় এবং দৌড়ে এসে লাভ দেয়। প্যান্ট জুতো কাঁটার আঁচড় থেকে বাঁচাল তাকে। কিন্তু কিছু লঙ্কা গাছ তার শরীরের তলায় চাপা পড়ে দুমড়ে গেল। অমানুষিক ধরনের খেলা যেন।

কুসুম খিলখিল করে হাসে। —বাঃ! পারলেন! আপনি অনেক কিছু পারবেন।

অপয়া মানুষ সবই পারে। বলে ধুলোমাটি খড়কুটো আর কাঁটা ঝেড়ে ফেলে প্রিয়নাথ।

কুসুম লঙ্কাগাছগুলো সযত্নে সোজা করে দেয়। —দিলেন তো সব নষ্ট করে।

দুজনে দাওয়ায় ওঠে। তারপর কুসুম বলে—ভেবেছিলাম, রাগ করে চলে যাবেন।

কাঁটার বেড়া টপকে কি ভদ্রলোক আসে? কিন্তু এলেন।

আমি ছোটলোক, তাই।

ছিঃ, আমি তা বলিনি। ...বলে মাদুর পাতে কুসুম! —বসুন।

প্রিয়নাথ বলল। —তুমি সেরাতে জোনাকির টোপর পরে কী করছিলে?

মুহূর্তে কুসুমের মুখটা ছাই হয়ে গেল। সে চোখ রাখল নিজের পায়ের দিকে।

তুমি যেন আমাকে ডাকছিলে। আমি গেলাম। দৌড়ে ধরতে পারলাম না। তুমি ঝাঁপ দিলে তখন আমি ফিরে এলাম। যদি ঝাঁপ দিতাম, কী করতে কুসুম?

সে মুখ তুলল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চোখের পাতা দ্রুত কাঁপল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

প্রিয়নাথ জেদের স্বরে বলে—তোমার রাতের খেলার সঙ্গী হতে পারিনি আমি। হয়ত সে সাহস আমার ছিল না। কিন্তু ও কী খেলা কুসুম? কেন তুমি অমন কর? কেন তুমি মানুষের মত আমার সঙ্গে মিশতে পারছ না?

একটু চুপ করে জবাব শোনাব চেষ্টা করে সে। কুসুমের চুলগুলো হঠাৎ বুকের ওপর ডান কাঁধ

পেরিয়ে খুলে পড়ে—কুণ্ডুলী ছাড়িয়ে সাপের সোজা হবার মত। কিন্তু সে মুখ ফেরায় না: বাঁ-কাঁধে চিবুক রেখে মুখটা ঘুরিয়ে চুপ করে থাকে।

প্রিয়নাথ ফের বলে—তোমার স্বাধীনদি আমাকে নিষেধ করেছেন তোমাকে যেন এড়িয়ে চলি। তোমাকে রেহাই দিতে বলেছেন উনি। আমি কোন জবাব দিইনি তাঁকে। কী জবাব দেব? আমি তোমাকে মানুষের মত পেতে চেয়েছি। এ চাওয়া থেকে আমাকে কেউ ফেরাতে পারবে না। ...বেশ। ধরে নিলাম, আমি তোমার অযোগ্য। তাহলে বল, কীভাবে তোমার যোগ্য হব?

কুসুম কাঁপাকাঁপা স্বরে বলে—আপনি শিগগির চলে যান নতুনবাবু।

কেন? তোমার ভূতটার ভয়ে? আমি আজ মরিয়া হয়ে এসেছি, কুসুম।

কেন এলেন?

কেন তুমি সেরাতে অমন করে আমাকে ডাকলে?

আমি ডাকিনি।

মিথ্যে বল না। দেখ, কুসুম—একটা মনগড়া মিথ্যের ফাঁদে পড়ে থেকে অমন তাজা জীবনটাকে কেন তুমি নষ্ট করবে?

কুসুম পলকে ঘোরে। চোখে জল, তীব্র চাহনি—কিন্তু ডাকিনীর নীল উজ্জ্বলতা অবশ্য নেই এখন। ফোঁস করে ওঠে সে। —মিথ্যে।

হ্যাঁ মিথ্যে। ভীষণ মিথ্যে।

কুসুম তীব্রভাবে মাথা দুলিয়ে বলে—না, মিথ্যে নয়। আপনি জানেন না, কে আমার কাছে আছে। এসব কথা বললে আপনার বিপদ হতে পারে নতুনবাবু, বলবেন না।

প্রিয়নাথ হাসে। —এই তো আমি বসে আছি, হোক না বিপদ।

কুসুম কী করবে ভেবে না পেয়েই যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। মুখটা ফের ঘুরিয়ে নেয়। ভাঙ্গা গলায় বলে—আমারও সাধ যায়, ভাল কাপড় পরি, সেজেগুজে থাকি, শহরে যাই, সিনেমা দেখি, স্বামীর ঘরসংসার করি। পেটে-কোলে দুটো আসুক। আমাকে মা বলুক। কিন্তু আমার সে পথে মা কাঁটা দিয়ে গেছে, নতুনবাবু। আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না। কী দিয়ে বোঝাব? আপনি যান, আমাকে আর লোভ দেখাবেন না।

প্রিয়নাথ নিষ্পলক চোখে তাকে দেখতে থাকে।

কুসুম ফের বলে—আমারও কত সাধ ইচ্ছে আছে, আপনার যেমন আছে। যখন থেকে আপনাকে দেখেছি, কী যেন মনে হয়েছে—বুকটা কেঁপেছে, বিশ্বাস করুন। বলতে লাজ নেই আমার। —কুসুম বেহায়া মেয়ে, সবাই জানে। হ্যাঁ, আমারও লোভ হয়েছে আপনাকে দেখে। কিন্তু তার জন্যে সাজা তো কম পাচ্ছিনে সেদিন থেকে। আমার রক্ত কালি করে দিলে। যখনই আপনার কথা ভাবি, অমনি কী সব হয়। কী যেন...

কী কুসুম? কী হয়?

মাথার ভিতর ঠাণ্ডা বরফের হাত পড়ে। যেন মগজটা তুলে ফেলবে মনে লাগে।

আমাকে থির থাকতে দেয় না।

কে সে?

তাকে কি চিনি, না দেখেছি? তবু সে আছে। তার চোখ থেকে একদণ্ড তো বাইরে যাবার যো নেই। মা আমার কী সর্বনাশ করে গেছে, জানেন না!

প্রিয়নাথের হঠাৎ মনে হল, গাবগাছটায় কোত্থেকে এতক্ষণে বাতাস এল! হলুদ কিছু পাতা ঘুরতে ঘুরতে নেমে গেল ঝরঝর সরসর খরখর। কোথায় টানা সুরে চিল ডেকে উঠল। কী যেন ধূসরতা বাড়িটাকে ঘিরে ফেলল আস্তে-আস্তে। রোদ ফিকে হলুদ হয়ে পড়ল। প্রিয়নাথ একটা অশরীরী অস্তিত্বকে ঝেড়ে ফেলতে সোজা হয়ে বসল। কিন্তু কিছুতেই এই বিদঘুটে ভাবটা এড়ানো গেল না। নিজের সঙ্গে এক তুমুল সংঘর্ষ চলতে থাকে তার।

পরক্ষণে প্রিয়নাথ আরও চমকে ওঠে। ওকি! কুসুমের ভিজে চোখদুটো আবার এখন সেই রকম

নীল হয়ে উঠেছে যে! তার ঠোঁটে এখন কেমন হাসি। নিষ্পলক নীল চোখে সে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এ হাসি সহজ নয়। মানুষেরও নয়। মুহূর্তে হৃদপিণ্ডে রক্ত শিসিয়ে উঠেছিল। তক্ষুণি সামলে নেয় প্রিয়নাথ। দ্রুত চারদিকটা দেখে নেয়। কেউ কোথাও নেই।

সে কুসুমকে দুহাতে ধরে ফেলতেই কুসুম কাঁপতে-কাঁপতে সেরাতের মত পড়ে যায়। তখন তাকে এক হাঁচকা টানে শূন্যে তুলে ঘরে নিয়ে যায় সে। ছোট্ট ঘর। সুন্দর নিকানো মেঝে। একটা বেদী রয়েছে কোণে। মাটির পিদিম আছে। সিঁদুরের ছোপ। একটা মড়ার মাথা। ধরিত্রীরই মাথার খুলি সম্ভবত।

ওকে শুইয়ে দরজাটা এঁটে দেয় প্রিয়নাথ। হাঁফাতে-হাঁফাতে নিজেকে তৈরি করে নেয়। অলৌকিকের সঙ্গে একটা চরম নিষ্পত্তি তাকে করতেই হবে। কুসুমের চোখদুটো খোলা রয়েছে—তেমনি উজ্জ্বল নীল। আশ্চর্য সুন্দর লাগে মেয়েটাকে। বুকের কাপড় সরে ফিকে লাল জামা আঁটো দেখা যায়। হয়ত স্বাধীনেরই জামা।

তারপর সে কুসুমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তারপর সত্যি-সত্যি কী এক অমানুষিক শক্তির সঙ্গে তার অনিবার্য লড়াইটা শুরু হয়ে যায়। কুসুমের নখের আঁচড়ে তার মুখ গলা বুক ফালাফালা হয়ে যেতে থাকে। প্রচণ্ড ধাক্কায় তাকে ছিটকে পড়তে হয়। ফের সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফের ধস্তাধস্তি চলতে থাকে। শব্দহীন দুটি ঠোঁটই—কিন্তু বিকৃতি ফোটে মুহুর্মুহু। শ্বাস-প্রশ্বাসের চরম শব্দে ঘরটা যেন বেলুনের মত টানটান ফুলে ওঠে। তাপে তেতে ওঠে। জানালাবিহীন এসব ঘর। তাই ভিতরে এখন আবছা অন্ধকার দিনদুপুরেই। তার মধ্যে মরাবাঁচার বীভৎস-ধরনের লড়াইটা দুপক্ষ সমানে চালিয়ে যায়। একসময় প্রিয়নাথ কুসুমের দুটো বাহু চেপে মাটির সঙ্গে প্রাণপণে ধরে থাকে এবং পেটের ওপর হাঁটুর চাপ দিলে কুসুম হাত-পা ছড়িয়ে এলিয়ে যায়। নাকিস্বরে কী সব বলতে থাকে অস্ফুট উচ্চারণে—নাকি ওদের খোট্টাই চাঁই বোলিতে—কিছু বোঝা যায় না। তখন প্রিয়নাথ আদর করে জাগাতে চায় তাকে।...

একটু পরে প্রিয়নাথ বেরিয়ে আসে।

দরজা ফাঁক করে আগে দেখে নিয়েছে, কেউ কোথাও আছে কি না। কেউ নেই। এদিকটা গাঁয়ের প্রান্ত। নদী অব্দি ঝোপঝাপ রয়েছে।

নদীতে নেমে সে হাতমুখ ভাল করে ধোয়। প্রচণ্ড জ্বালা করতে থাকে, নাক, গাল আর গলার কাছটা। বিষিয়ে যাবে কি না কে জানে। বাসায় ফিরেই এ্যান্টিসেপটিক কিছু লাগাতে হবে। ফার্স্টএডের বাক্সো একটা আছে ফার্মে। ওরা শুধোলে কী বলবে?

হ্যাঁ, ওপারে বেড়াতে গিয়েছিল আমলাবাগে। হায়েনার পাল্লায় পড়েছিল। সম্প্রতি শিমুলিয়ায় হায়েনার উৎপাত হয়েছে। মৃগাঙ্ক বলেছিল। তার হায়েনাটা মারতে যাবার কথা আছে। একটা জাঁকালো গল্প বলা যাবে।

অনেক ঘুরে ফার্মের দক্ষিণ গেট হয়ে ঢোকে প্রিয়নাথ। সোজা কেউ দেখার আগে প্রায় দৌড়ে নিজের ঘরে ঢোকে। ভাগ্যিস, মৃগাঙ্ক নেই। নাটকটা থেকে আপাতত রেহাই পাওয়া গেল। এখন ওষুধ লাগিয়ে চুপচাপ শোবে। চাদর মুড়িও দেওয়া যায়। মৃগাঙ্ক এলে তখন দেখা যাবে বরং।

যথাসময়ে প্রিয়নাথ শোয়।

কিন্তু জ্বালা, ডাকিনীর নখের বিষ, মৃত্যুভয়, অনুশোচনা—যা এতক্ষণ নদীর ধারে তাকে অনুসরণ করেছিল সব ক্রমশ মুছে যায়। এবং অতি ধীরে জেগে ওঠে একটা গভীর তৃপ্তির ভাব। মনে হয়, জীবনে এই এক আশ্চর্য পাওয়া মিলে গেল! গাঢ় তৃপ্তিতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে প্রিয়নাথের। প্লাস্টার করা মুখ নিয়ে সে যেন হিস্টিরিয়ার ফিটে তলিয়ে যায়—নির্জ্ঞান দেশে।

এবং যাবার শেষ মুহূর্ত অব্দি একটি ভাব তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হয় : কুসুমকে তার ভাল লেগেছিল।

তাই ঘাসের ফুলের মত একটা খুবই ছোট্ট হাসি তার বিক্ষত নিচের ঠোঁটের কোনায় লেগে থাকে কতক্ষণ।..

নবীন এসে জাগায় তাকে। তখন কালুখাঁর দিয়াড়ের মাঠে সন্ধ্যা নেমেছে।—

স্যার, নতুনবাবু! উঠুন, চা খান।

প্রিয়নাথ তাকায়। প্রথম কয়েক মুহূর্ত বুঝতে পারে না, কোথায় শুয়ে আছে। তারপর সব মনে পড়ে। সে বলে—রাখো। মৃগাঙ্কদা কোথায়?

পাটের সঙ্গে বহরমপুর গেছেন, সেই দুপুরবেলা। আপনাকে খুঁজলেন, পেলেন না। ট্রাক-ড্রাইভার তাড়া লাগায়। অমনি চলে গেলেন। কোথায় ছিলেন?

ওপারে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ নবীনের চোখে পড়ে প্লাস্টারের ফালিআঁটা ক্ষতচিহ্নগুলো। সে চমকে ওঠে। —আরে, ও কী? অত কাটাকুটি করলেন কিসে?

প্রিয়নাথ একটু পরে জবাব দেয়—দাড়ি কাটতে কেটে গেছে।

হায়েনার চেয়ে এটাই স্বাভাবিক—অন্তত আঁচড়ের দাগ যেভাবে রয়েছে। নবীন চলে যায়। উঠতে গিয়ে শরীর কেমন আড়ষ্ট লাগে প্রিয়নাথের। একটু শীতশীতও করছে। কার্তিকের শেষ সপ্তাহের দিকে সন্ধ্যাবেলা হিমেল হয়ে পড়ছে ক্রমশ। বাইরে পাখিদের প্রচণ্ড হল্লা হচ্ছে গাছপালায়। বছরের এ সময়টা ওরা সন্ধ্যাবেলায় এত চেঁচামেচি করে কেন, ভাবতে ভাবতে প্রিয়নাথ হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নেয়। হাতটারও ওজন হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে।

দরজার বাইরে ফার্মের বিশাল ক্ষেতখামার এখন ধূসর। মজুর-মজুরনীদের ছায়া ক্রমশ সরে যায় একে-একে। তারপর আলো জ্বলে ওঠে কিছু অংশে। ধবধবে সাদা মাটির কিছু, কিছু মাষকলাইয়ের স্তূপে ঢাকা—তার ওপর একটা কুকুর দৌড়ে পালায়। নবীনের আওয়াজ শোনা যায়—ভাগ্, ভাগ্, পালা! তারপর থলথলে গরিলার মত প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে গগন হালদারকে দেখা যায় আসতে।

প্রিয়নাথ হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালে। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠে বসতে ইচ্ছে করে না। অবসাদ আর আড়ষ্টতা শরীরকে ভারী করেছে এতক্ষণে। ক্ষতগুলো টনটন করছে। গগন দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে দেখতে বলে—এখনও শুয়ে আছেন?

এস হালদারমশাই।

গগন ঢুকে দুই বিছানার মাঝখানে একটা টুলে বসে পড়ে। প্রিয়নাথের দিকে কেমন চোখে তাকায়।

প্রিয়নাথ হেসে বলে—কী দেখছ?

গগন সে কথার জবাব দেয় না অবশ্য। গম্ভীর হয়ে ঘরের দেয়ালগুলো মুখ ঘুরিয়ে দেখার পর বলে—জ্বরটর নাকি?

নাঃ। কেন?

চাদর গায়ে চড়িয়েছেন!

একটু শীতশীত করছিল। তোমার শীত করে না? দিব্যি খালি গায়ে রয়েছ দেখছি।

শীতবর্ষা আমার নাই, নতুনবাবু। আমি জলমানুষ।

প্রিয়নাথ একটা আড়মোড়া দেয়। তারপর মনে মনে অবাক হয় যে গগন তার ক্ষতচিহ্ন নিয়ে কোন প্রশ্ন করছে না। তাই সে মুখে হাত বুলিয়ে বলে—কী সব বাজে ব্লেড বেরিয়েছে। দাড়ি কাটতে গিয়ে আজ সাংঘাতিক কাটাকুটি করে ফেলেছি।

ওষুধ দিয়েছেন দেখছি।

হ্যাঁ। বলা যায় না, সেপটিক হতে পারে।

পারে বই কি। ...গগন দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে—ওটা বঙ্কুবাবুর ছবি না?

হ্যাঁ।

উঠে গিয়ে মৃগাঙ্কের বিছানার পিছনের দেয়ালে জানালার ওপর বঙ্কুবাবুর বড় ছবিটার দিকে ঝুঁকে পড়ে। থ্যাবড়া আঙুল বুলিয়ে কিছু পরখ করে। তারপর সরে এসে বলে—কাচে ঢাকা।

প্রিয়নাথ শুধু হাসে।

বঙ্কুবাবু মারা গিয়েছিল ঘা বিষিয়ে। অমনি—আপনার মত সারা মুখ গলা ফালাফালা হয়েছিল। নাড়ু ডাক্তার ওষুধও দিয়েছিল। কিন্তু কিছু হয়নি। রাতারাতি মুখ হাঁড়ির মত ফুলে গেল। জ্বর হল

প্রচণ্ড। ভুল বকতে লাগল সারাটা রাত। তারপর সকালে শহরে নিয়ে গেল। আর দেখা হয়নি আমার সঙ্গে।

সেখানে কিছু হল না বলে কলকাতার বড় বড় হাসপাতালে তুলল মিগাং। কদিন পরে মারা গেল।

প্রিয়নাথের বুকটা টিপটিপ করতে থাকে। আড়ষ্ট হেসে সে বলে—বাঁদর আঁচড়ে না কামড়ে দিয়েছিল শুনেছি।

বাঁদর? বলে একটু চুপ করে থাকে গগন। ফের বলে—তাই রটানো হয়েছিল বটে।

প্রিয়নাথ একটু অবাক হয়। —রটানো হয়েছিল মানে?

হ্যাঁ। মানী লোক। মানের দাম লাখ টাকা তার।

বাঁদর নয় তাহলে?

গগন মাথা দুলিয়ে নিষ্ঠুর আর চাপা হাসে। —নাঃ, বাঁদর নয়।

তাহলে কী?

মানুষ।

মানুষ! সে কী?

মানুষ বলতে পারেন, আবার অমানুষও বলতে পারেন। একই কথা।

প্রিয়নাথ আধখানা উঠে বসে। —হালদারমশাই, খুলে বলো তো কী হয়েছিল বঙ্কুবাবুর?

আপনি ডরাবেন নতুনবাবু।

কেন? আমি ডর পাব কেন হালদারমশাই?

পাবেন না তো?

না।

ধরিত্তি তখন জেলে আছে। কুসমি মান্যবর মোড়লের বাড়ি থাকে খায়, বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে মায়ের কুঁড়েঘরেও আসে। ঘরের মধ্যে থান আছে, তন্তরমন্তর পালন করতে হয় তাকে মায়ের হুকুম। তা এক খরার নিঃঝুম দুপুরবেলা তাক বুঝে বঙ্কুবাবু সেখানে হাজির হল। কুসমি তখন বেশ ডাগর। বুক উঠেছে। শাড়ি ধরেছে। দেখলে মানুষের চোখ সরে না। ধরিত্তির গাছের ফল—যেন মায়ের চেয়েও ঝলমল করে। বাঘের নোলায় টসটস করে জল ঝরে। বঙ্কুবাবুর কুবুদ্ধি— মাথায় কামের পোকা কটকট করছিল। তাকে বাগে পেয়ে ধরল। আমি সেই সময় নতুন জালে গাবের কষ মাখাবো বলে ওদের গাবগাছে চড়ে আছি ঘন ডালপালার মধ্যে। গাব পাড়ছি ঠুসি (একরকম আঁকসির মাথায় ছোট্ট জালে থলি) নিয়ে। সব দেখছিলাম। হায় রে কাম! তোর আপনপর নাই—সব সমান! কুসমি তো তোমারই জম্মো দেওয়া মেয়ে হতে পারে বঙ্কুবাবু, তুমি তা ভুলে গেলে। মনে মনে গাছ থেকে সেই কথাটি বললাম বঙ্কুবাবুকে।

প্রিয়নাথ আস্তে বলে—তোমারও মেয়ে হতে পারে! বলার পর সে ভেবে পেল না, কেন একথা হঠাৎ মাথায় এল তার।

গগন বলে—হ্যাঁ, তাও হতে পারে। সে ধাঁধা আমার এখনও ঘোচেনি। ধরিত্তির পুরুষ ছিল হেঁপো রুগী। অক্ষম অথপ্প।

তারপর?

তারপর আর কী? বঙ্কুবাবুকে দেখলাম মুখখানা ফালা-ফালা লাল করে বেরিয়ে আসতে। নদীর দিকে দৌড়লেন। গিয়ে ধরে ফেললাম। এ কী হল বাবুদাদা, সুন্দর মুখখানা অমন হল কিসে গো? বঙ্কুবাবু দুহাত চেপে ধরল। গগন, তোর কত উপকার করেছি, এখন করছি—ঠিক কিনা বল। আমার মান তুই বাঁচা ভাই।

হ্যাঁ, উপকার করেছিল বটে। ছেলেদুটোকে লেখাপড়া শেখানোর সব ভার নিয়েছিল সে। আমি কথা রাখলাম। আজ অব্দি কাকেও বলিনি।

আমাকে বললে যে?

ক্যানে বললাম জেনেও কি জানেন না নতুনবাবু? আমি সব দেখেছি আজ।

প্রিয়নাথ তার দিকে তাকিয়ে মুখ নামায়।

তো সেকথা থাক। আপনার কপাল আপনার নিজের। বঙ্কুবাবুর কথা শুনুন। সে তো কলকাতার হাসপাতালে মারা গেল। সেখানে মরার সময় বুদ্ধির ভুলে কী বলতে কী বলে বসল ছেলে মিগাংকে। মিগাং ফিরে এসে একদিন ওপারের বিলে কুসমিকে বন্দুক নিয়ে তাড়া করল। গুলিও ছুড়েছিল—লাগেনি। কুসমি পালিয়ে এসে আমার পা ধরে ভেঙে পড়ল। তো কী করতে পারি আমি? সামান্য মানুষ। মিগাং বড়লোক জোতদার। তাকে একলা পেয়ে হতভাগী মেয়েটার হয়ে ক্ষমাভিক্ষে করলাম। মিগাং শুনবেই না। তখন আমি বললাম—মিগাং, তাহলে পস্টাপস্টি কথা শোন বাবা। যদি কুসমির কিছু ভালোমন্দ হয়, আমি ইসলামপুর থানায় দারোগাবাবুর কাছে ডাইরি এপোট (রিপোর্ট) করে আসব।

প্রিয়নাথ অস্ফুট স্বরে বলে—ব্ল্যাকমেল!

গগন কান করে না। —মিগাং জব্দ হল। বলল—ঠিক আছে। তোমার কথা রাখলাম। কিন্তু কেউ যেন আর শোনে না। বাবার নাম আছে তল্লাটে। সে নাম যেন নষ্ট হয় না হালদার খুড়ো। কথা আমি রেখেছি, নতুনবাবু।

আমাকে কেন বললে?

বললাম। আপনি সাবধান হোন। এক্ষুণি বড় ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করিয়ে আসুন। কুসমির নখে সাংঘাতিক বিষ আছে।

প্রিয়নাথ কী বলবে, বুঝতে পারে না।

ব্যথা আছে নাকি? জ্বরটর লাগছে?

প্রিয়নাথ রুষ্টভাবে বলে—কিছু নেই। বাজে কথা বলো না হালদারমশাই। আমার কিছু হয়নি, তোমাকে অত ভাবতে বলিনি তো আমি।

গগন উঠে দাঁড়ায়। দবজার দিকে এগিয়ে ফিরে আসে। তারপর বলে—একটা গরিব-গুরবো ছোট জাতের মেয়ে। আপনারা শিক্ষিত ভদ্রলোক। আপনারা কত ভাল-ভাল কথা বোঝেন নতুনবাবু, শুধু বুঝতে পারেন না—ভগবান কিছু কিছু জিনিস নিজের জন্যে রেখেছেন। তাতে কারো দখল চলে না।

গগন তার কালো বিরাট শরীরটা নিয়ে হাঁসের মত থ্যাবড়া পা ফেলে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। প্রিয়নাথ কাঠ হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর ক্রমশ তার অস্বস্তি হতে থাকে। অস্বস্তি বেড়ে চলে। বঙ্কুবাবু মারা গিয়েছিলেন কুসুমের নখের আঁচড়ে? এই জোরালো কথাটা তার ওপর আছড়ে পড়ে। সে ছটফট করে—হয়ত ভয়ে, হয়ত দুর্ভাবনায়। আর নিয়তির মতো কী যেন তাকে একটা গভীরতর যন্ত্রণার দিকে ক্রমাগত টেনে নিয়ে চলে।...

মৃগাঙ্ক ফিরে এল, তখন রাত দুটো প্রায়।

সে এসেই চমকে ওঠে। নবীন গণেশ আর আতাহার প্রিয়নাথের হাত-পা শক্ত করে ধরে বসে রয়েছে। প্রিয়নাথ বিছানায় ছটফট করছে। তার চোখদুটো অস্বাভাবিক লাল। গোঁ-গোঁ করছে। কী সব ভুল বকছে। আর তার ঠোঁট, গাল, গলা—সবখানে ছত্রখান ওল্টানো প্লাস্টারের ফালি, রক্ত চোঁয়াচ্ছে টানা সব ক্ষতচিহ্ন থেকে। বীভৎস! মুখ ফুলে ঢোল হয়ে গেছে প্রিয়নাথের।

নবীন রুদ্ধশ্বাসে বলে—সাংঘাতিক কাণ্ড দাদাবাবু। নতুনবাবুর গোঙানি শুনে এঘরে এসে দেখি, দরজা হাট করে খোলা—ঘরে আলো জ্বলছে। আর উনি দুহাতের নখে মুখখানা আঁচড়াচ্ছেন। গায়ে আগুন জ্বলছে একেবারে। এ কী কাণ্ড হল হঠাৎ?

মৃগাঙ্ক প্রিয়নাথের ক্ষতচিহ্নগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে। কপালে হাত রেখে ডাকে—প্রিয়, প্রিয়নাথ! প্রিয়নাথ!

তো অনেক ডেকেও সাড়া পায় না সে। তখন নবীনকে তেড়ে যায়। —হতচ্ছাড়া! এতক্ষণ নাড়ু বাবুকে খবর দিসনি কেন?

আপনার অপেক্ষা ছিলাম দাদাবাবু!

মৃগাঙ্ক চেঁচিয়ে ওঠে—যত শালা অমানুষ বুদ্ধু জুটেছে আমার চারপাশে! আতাহার! শিগগির আমার গাড়ি বের করে দে! শালারা আর মানুষ হল না!

মৃগাঙ্ক অমন ক্ষেপে গেল কেন, এরা বুঝতে পারে না। আতাহার দৌড়ে বেরিয়ে যায়। নবীন কাঁচুমাচু মুখে বলে—বিকেলে না—বিকেলে না তে—সন্ধ্যায় চা দিতে এসে ঘা দেখলাম। বাবু বললেন, ব্লেডে কেটেছে!

থাম্ শালা।

মৃগাঙ্ক লাফ দিয়ে বেরিয়ে যায়। গাড়ি উঠোনে বের করেছে আতাহার। মৃগাঙ্ক বেগে মোটরসাইকেলটা নিয়ে গেটের কাছে যায়। —আরে উল্লুক! ফটক খুলবি না কী?

আতাহার ফটক খুলে দিয়ে ভয়ে ভয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়।

পাকা রাস্তায় একটা হেরিকেনের আলো। মৃগাঙ্ক কাছে গিয়ে দেখে গগন হালদার।

কী? মাথায় টনক নড়েছে বুড়ো ঘাগীর? মহাকালের চেলা যেন!

বলেই সে বোঁও করে চলে যায়। স্তব্ধ হেমন্তেব রাত মোটরসাইকেলের শব্দে গুরু-গুরু কাঁপে। আলোর ফালিতে কুয়াশা দুলতে দেখা যায়। গগন একটুখানি দাঁড়িয়ে থেমে ফার্মের দিকে হেঁটে আসে।

কে? হালদারমশাই নাকি?

আতাহার? কী হয়েছে রে? মিগাং কোথায় গেল এত রেতে?

নতুনবাবুর প্রচণ্ড অসুখ।

হুঁ।

গগন দ্রুত হেঁটে বারান্দায় গিয়ে ওঠে। দরজার কাছে, বাইরে হেরিকেন রেখে ভিতরে ঢোকে। প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে গভীর দুঃখে মাথাটা দোলায় সে। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে ফের মাথা দোলায় আপনমনে।

প্রিয়নাথ বিড়বিড় করছে তখন।...তুই অপয়া। তুই চলে যা—পালা এদেশ ছেড়ে। তুই থাকলে নদীর জল শুকোবে। মাঠে ফসল ফলবে না। মাটি ফাটবে। শেয়াল শকুন মানুষের মড়া খাবে কচমচিয়ে। আর কামিখ্যের ডাকিনী এসে শুকনো ডালে বসে বাতাসের সুরে কথা বলবে।...

কার কথা এসব? গগন কান করে শোনে। এ নতুনবাবুর কথা নয়। কুসমির বুলি!

প্রিয়নাথ হিহি করে হাসে। হাসতে হাসতে হাত তুলে মুখের কাছে আনবার চেষ্টা করে। নবীন আর গণেশ শক্ত করে ধরে রাখে হাতদুটো।

আমি তার হাতে ধরা আছি গো! মা আমার কী সর্বনাশ করে গেছে, জান না তোমরা? নয়ত—আমারও তো কত সাধ-আহ্লাদ ছিল। ভাল কাপড় পরি, সেজেগুজে থাকি, পেটে-কোলে একটা এসে মা বলে ডাকে! আমার কিছু হল না মা গে (গো), কুছ নেহী হুয়া—সাঁঝ দেতে দেতে দাঁঝ চালি গেইলা মা গে! উঃ...ককিয়ে কেঁদে ওঠে প্রিয়নাথ। ফুঁপিয়ে কাঁদে।

আর গগনের দুচোখ ছাপিয়ে জল নামে কেন। সে লম্বা নিশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে।

নবীনের চোখদুটো বড়ো হয়ে উঠেছিল। সে গণেশ আর গগনের দিকে পালাক্রমে তাকাচ্ছিল। এবার চাপা গলায় বলে ওঠে—হালদারমশাই!

উঁ?

বুঝতে পারলে কিছু?

হুঃ!

কুসমি বাণ মেরেছে নতুনবাবুকে। ডাক্তারটাক্তারের কাজ নয় হালদাবমশাই, শিমুলিয়া থেকে নাখুকে ডেকে আনতে হবে।

গণেশ রাগে ফুঁসে ওঠে। —মা তল্লাটকে জ্বালিয়ে খেয়েছিল। মেয়েও যে জ্বালাতে শুরু করলে রে বাবা! এর একটা প্রিতিবিধান করা উচিত।

নবীন বলে—একালটা অন্যরকম। সে আমলে এমন হলে হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে সবাই পুঁতে ফেলত। আজকাল সবাই হেসে উড়িয়ে দেবে। আইনের ভয় দেখাবে। তবে আমাদের বাবুর হাতে এবার আর নিস্তার নাই মাগীর। বাবু খুব ক্ষেপে গিয়েছেন।

গগন শুধু বলে—কে? মিগাং?

হ্যাঁ। আরে, আরে! ধর্ ধর্, গণশা! শক্ত করে ধর্!

প্রিয়নাথ উঠে বসতে চেষ্টা করছিল। তারপর শরীরটা ধনুকের মত বেঁকে যায় বারবার। গোঙানি বাড়ে। দুজনে সামলাতে পারে না।...

কতক্ষণ পরে নাড়ু ডাক্তারকে ব্যাকে বসিয়ে মৃগাঙ্ক ফিরল। ডাক্তার এসেই থমকে দাঁড়ায়। —সর্বনাশ! এ যে টিটেনাস! খেয়েছে! ও মিগাং, শিগগির ব্যাগপত্তর দে! এই ছোঁড়া, জল গরম করতে পারবি? এক্ষুনি!

নবীন বলে—হ্যাঁ। হিটার আছে।

যা, শিগগির নিয়ে আয়।

মৃগাঙ্ক গগনকে বলে—কেমন দেখছ হালদারমশাই? বাঁচবে না—না?

গগন মাথাটা দোলায় শুধু। কী তার কথা ঘোলাটে চোখ দেখে বোঝা কঠিন।

গণেশ চাপা গলায় মৃগাঙ্ককে বলে—দাদাবাবু, নতুনবাবুকে কুসমি বাণ মেরেছে।

মৃগাঙ্ক তার দিকে লাল চোখে তাকায়।

একটু আগে চাঁইবুলিতে কথা বলছিল নতুনবাবু।

কী বুলিতে?

কুসমিদের জাতের বুলিতে।

মৃগাঙ্ক চুপচাপ দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথকে দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে তার সারা মুখে আগুন আর ধোঁয়া নাচানাচি করে। সে হঠাৎ তার বিছানার মাথার দিক থেকে হ্যাঁচকা টানে বন্দুকটা বের করে। তারপর প্রায় লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তখন গগনও থপ-থপ করে বেরোয়। বারান্দায় রাখা তার হেরিকেনটা তুলে দম বাড়িয়ে দেয়। তারপর উঠোনে নেমে ডাকে—মিগাং, মিগাংবাবু।

মৃগাঙ্ক হনহন করে গেট পেরিয়ে চলেছে। গগন দৌড়তে থাকে। —মিগাং, মিগাংবাবু, কোথা যাও? হেই মিগাংবাবু!

বুড়ো গলার হাঁকডাকে অন্ধকার নিঝুম রাতটা কেঁপে ওঠে, কালো ড্রামের মধ্যে যেন প্রতিধ্বনিত আওয়াজ গমগম করে। মৃগাঙ্ক এবার ঘুরে দাঁড়ায়। চোপ শুয়োরের বাচ্চা। তোকে সুদ্ধ গুলি করে মারব!

তা মারো। মারবে বৈকি মিগাং! তোমার হাতে বন্দুক, বাবা। তবে কথাটা তো শোন!...গগন হাঁফায়। সত্তর বছরের ফুসফুস হাপরের মত ফোঁস-ফোঁস করে।—কাকে মারতে যাচ্ছ মিগাং? কুসমিকে? হুঁ—তার ওপর তোমার অনেক রাগ। তোমার বাবাকে খেয়েছিল। এবারে তোমার প্রিয়বাবুকে খেলে। আর কুসমিকে ছাড়া যায় না। কেমন কি না? তো বাবা মিগাং, এ্যাদ্দিন কোন অমানুষী (অলৌকিক) মানিনি—তুমিও মানো না। আজ এই শেষ রেতে আমি তাকে মেনেছি—তুমিও তাকে মানো। সে আছে বাবা, তাকে আমি আজ এ্যাদ্দিনে দেখেছি। দেখেই তোমার খামারে আবার গিয়েছিলাম। সেই কথাটাই বলতে গিয়েছিলাম, বাবা।

মৃগাঙ্ক কোন কথা না বলে হনহন করে এগোয়। তার পায়ের চাপে শুকনো পাটকাঠি মচমচ করে ভাঙে। ঝোপে ঘাসে শিশির চবচব করে আর ছপছপ শব্দ হয়। গগন হেরিকেন হাতে তার পিছনে পিছনে দৌড়ায়। থ্যাবড়া পায়ে ভিজে খড়, পাটের ফেঁসো আর ঘাস জড়িয়ে যায়।

গগন কথা বলতে বলতে যায়।—কুসমির মা ধরিত্তি আমাকে বলেছিল, কামিখ্যে থেকে এক ডাকিনী গাছের ডালে বসে গাছ উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল ভৈরবের পাড়ে। নিশিরেতে তার নাম ধরে বাতাসের সুরে ডেকেছিল। সেই ডাক শুনে ধরিত্তি নাকি গেল। আর ডাকিনী এলোচুলে উলঙ্গ শরীরে

তার ওপর ঝাঁপ দিলে। ধরিত্তি সেই থেকে দেয়াশিনী হল। আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। আর মিগাং, এখানেই কোথায় সেই অচেনা গাছটা নাকি আছে বলে সবাই বিশ্বাস করে। ধরিত্তি আমাকে চিনিয়ে দেয়নি। কিন্তু আজ আমি চিনলাম বাবা!

ভাঙা গলায় কেঁদে ওঠে গগন। মৃগাঙ্ক একবার ঘুরে তাকায়। হঠাৎ দাঁড়ায়।

মিগাং, তোমাকেও সেই গাছটা চিনিয়ে দেব। এস, আমার সঙ্গ ধর। এদিকে এস—না, না! এদিকে!

বুড়ো মৃগাঙ্কের একটা হাত ধরে ফেলে। —তবে কথা কী, ভয় পেয়ো না। মিগাং, তুমি আমার গানের সখা বঙ্কুবাবুর ছেলে। তোমার সাহস আছে। তুমি বন্দুকবাজ। বাঘ মেরেছ, শুয়োর মেরেছ, হায়না মেরেছ। আমলাবাগের জঙ্গল খালি করে দিয়েছ। তুমি বড় বীর। তবে কথা কী, ভয় পেয়ো না।

বাঁদিকে ঘোরে গগন। মৃগাঙ্ক চিনতে পারে। কুসমির বাড়িই বটে। কুসমির বাড়ির চারপাশে পুরু কাঁটার বেড়া দিয়ে রেখেছে বরাবর। ওই কাঁটা আনতেই সে প্রতিদিন নদীর ওপারে যেত। মৃগাঙ্ক হেরিকেনের আবছা আলোয় ঘন জমাট কাঁটার বেড়া দেখতে পায়। এই কাঁটার দুর্গে লুকিয়ে থাকত ডাইনীটা! কেন? কার ভয়ে? মৃগাঙ্কের? মনে হয় না তা।

বাবা মিগাং! এবারে তাকাও। এই সেই গাছ। এর তলায় সাঁঝবাতি দিত কুসমি। এ্যাদ্দিন বুঝিনি, আজ বুঝলাম এই গাব গাছটাই ডাকিনী এনেছিল কামিখ্যে থেকে। মিগাং, বুকে বল বাঁধো। এবারে মুখ তুলে তাকাও। হুঁ, ভয় পেয়ো না বাবা। তুমি সেই উলঙ্গ ডাকিনীকে দেখতে পাবে—এলোচুলে ডাল থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে মনে হবে। কিন্তু ভয় পেয়ো না। তাকাও, তাকাও!

হেরিকেনটা তোলে গগন। মুহূর্তে মৃগাঙ্কের শরীর শক্ত হয়ে যায়। তার মাথা ঘুরে ওঠে। হৃদপিণ্ডে খিল ধরে যায়। সে চোখ বুজে আতঙ্কে অস্ফুট চেঁচিয়ে ওঠে। তার মনে হয়, সত্যি-সত্যি এইমাত্র উলঙ্গ এক ডাকিনী এলোচুলে ডাল থেকে ঝাঁপ দিল তার দিকে। সে চেঁচিয়ে উঠল—ও কে? কে ও?

গগন ভাঙাস্বরে বলে—দেখলে মিগাং? দেখলে? কুসমিকে দেখবে?

মৃগাঙ্ক চোখ খোলে। ওপরের দিকে তাকায়। না—ডাকিনী ঝাঁপ দিতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেছে। ঝুলছে। মৃগাঙ্ক বন্দুকের নল দুহাতের মুঠোয় ধরে মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। চোখ বুজে থাকে!

গগন ডাকে—আর কী! চলে এস মিগাংবাবু।...

জানমারি



একটি পাতা খসে পড়লেই বজ্রপাত মনে হয়, সেখানে তখন এমনই অভিমানী স্তব্ধতা ছিল। চারপাশে পাতসিদে বন্য ঘৃতকুমারী ঘন ফণিমনসার গাম্ভীর্য। ঢালু খটখটে শুকনো একফালি কোনওক্রমে পা ফেলে জলকে নামার রাস্তা। সেও মেয়েদের শৌচকর্মের গোপনীয়তাবশে বহুকাল যাতায়াতে নৈসর্গিক একটি নির্মাণ ভ্রম হয়, চুনি সেই ছদ্মভাবে নামছিল। তার বুকের কাপড়ের ভেতর একটি ছোট্ট চটের থলে ছিল। সে জানত কী নিয়ে যাচ্ছে এবং এও জানত, জিনিসগুলিন যে-কোনও মুহূর্তে তাকে 'ফিনিস' করে দেবে—'ফিনিস' তার ভাই পান্না যে-ভাবে বলে ও করে, ঠিক সে-ভাবেই। তবু সেই দুপুরবেলায় চুনি ভূতগ্রস্তা হয়েছিল অনেক দুঃখে ও জ্বালায়। তার নিজের ঠোঁটের বাঁকোনা বারবার ওপরপাটির দাঁতের তলায় ঢুকে যাচ্ছিল। তার ব্রোঞ্জ-যক্ষিণী মুখে সচরাচর ভাব খেলে না, তখন কয়েকরকম ভাব খেলছিল। মানুষ-উঁচু পাতসিদে গাছের ছায়ার গাঢ়তা ভাবগুলিনকে শ্রেণীবদ্ধতায় সাজাতে দিচ্ছিল না, অথচ ভাবগুলিন ছিল দুঃখ, ক্রোধ, অভিমান, প্রতিহিংসা, প্রত্যাশা, শান্তি, নিরাপত্তাসূচক। সে যথেষ্ট সতর্ক ছিল। কারণ সে নিজে 'ফিনিস' হতে চায়নি। তার এই শব্দটাতেই বিষাক্ত গোখরের সংকেত আছে, পান্না যেভাবে উচ্চারণ করে। সতর্ক চুনি সেই ঢালু গোপন রাস্তায় মাথা কোটার মত করে মনে মনে 'আজ তোদেরই ফিনিস করে দিব' বলতে বলতে জলকে যাচ্ছিল। স্বাভাবিকতায় নির্মিত সরু চিকন ও নিম্নগামী রাস্তাটির দুধারে কাঁটাগুল্ম থেকে শাড়ি ও চুল মুহূর্তে-মুহূর্তে রক্ষা করতে করতে যখন হলদেটে জলের সীমানা চোখে পড়ল, চুনি তখন একটি শ্বাস ছাড়ল। স্তব্ধতা এতই টানটান তানপুরা যে, সেই শ্বাস তাকে, নিজেকেই, ভীষণ চমকে দিল এবং বিপজ্জনক ঝনৎকারী আবেগ হয়ে তার চোখের কোনাকে জলসিক্ত করল। চোখ দুটি পিটপিট করে সে জলের দিকে তাকাল। হলদেটে জল স্থির। শান্তিও ওইরকম স্থির, চুনি বুঝল। তার একটি হাত বুকের কাপড়ের তলায় চটের থলেটির মুখে, পাথর হয়ে এঁটে গিয়েছিল। অপর হাত জন্ম থেকে প্রায় অপটু—নিরন্তর চেষ্টা ও অভ্যাসে যেটুকু পটুত্ব সৃজন করা যায়, সেইটুকু মাত্র এবং শরীরের সেইদিকের নিচে একটি পায়ের দশাও তাই। সে লাঠি ধরে কবিতারূপিনী হাঁটে। কিন্তু লাঠিটি এখন এই ঢালু রাস্তাটুকুর চড়াইয়ে বন্য ঘৃতকুমারীর বুকে মুখ গুঁজে ছিল। সে পাছা ঘষটে নেমে এসেছিল। সেই মুহূর্তে শুধু একবার ভেবে দুঃখ হয়েছিল, যদি সে ফিনিস করা জিনিসগুলিনকে ফিনিস করতে যাওয়ার পথে নিজেই ফিনিস হয়ে যায়, লাঠিটার সঙ্গে তার চির-ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। এতকালের লাঠিটা। তার শিথিল শরীরকে ঋজুকারী একটি ঋজুতা, যা তার প্রয়াত নানা গরিবুদ্দিন এনে দিয়েছিলেন মুম্বাই থেকে। আর, লোকে গরিবুদ্দিনকে ঠাট্টা করে বলত 'আধা-হাজি'। কারণ মুম্বাইয়ে পৌঁছে দিয়ে প্রতারক ট্রাভেল এজেন্ট একদল হজযাত্রীর টাকাকড়ি নিয়ে নিপাত্তা হয় এবং তাঁরা হন্যে হয়ে ফিরে আসেন। তবে গরিবুদ্দিন তাঁর নাতনিকে যে ফরেন মুলুকের ক্রাচের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান, তার বদলে ফেরেন এই লাঠি নিয়ে। সম্বলহারা বৃদ্ধের চোখের জলের স্পর্শ আছে ওই লাঠিতে। তাছাড়া লাঠিটি কাঠের এবং নকশাদার। আরবি ভাষায় পবিত্র কেতাবের দুলাইন বাক্য খোদাই করা আছে মুঠোর দিকে। সেখানে চুনির ন্যালা হাতটি অজস্রবার সক্ষমতা প্রার্থনা করে। পরবর্তীকালে লাঠিটি তাকে সধবার মত শক্তিমতিও করেছে—সে এরকম ভাবে। কারণ কুঁদুলি কাজিরুন্নবিবি তাকে পরিহাসছলে বলেছিল, 'মনে হয় কী, উটা তুর ভাতার রি ছুঁড়ি।' আর চুনি, তেজি ধারাল মেয়ে, কী আশ্চর্য কথা, লজ্জায় গোলাপখসা খসেছিল।

ঢালের মাথায় উঁচু পাড়ে অর্ধাঙ্গ শুকনো, চুনিরই প্রতীকবৎ, একটি পাকুড়গাছ। তার পাশে একটি রঙিন ছবির ধ্বংসপুরী এমন পোড়া কালো ও আরক্তিম চারটি দেওয়াল। উর্ধ্বাংশ অর্ধবৃত্তাকার ছিল। এখনও সেগুলিন স্পষ্ট চক্ষুগোচর হয়। আঞ্চলিক মাটির কঠিন শক্তির পরিচয় এটি। কয়েকটি বছরের বৃষ্টিও তাদের মাথা নুইয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কতবার কত পাখি ঘাস বা ফলের বীজ নেদেছে তাদের শীর্ষে, তারাও ব্যর্থ। লোকে অবাক হয়, এই মাটি পুড়িয়েই ইট এবং ইট গেঁথে দালানবাড়ি তৈরি হয়। সেই দালানের মাথা ফুঁড়ে মানুষের ঔদ্ধত্য-খর্বকারি প্রকৃতি মাটি পোড়ানোর প্রতিশোধ নেয় বৃক্ষলতার নখ ও ফাঁসে ক্ষতবিক্ষত শ্বাসরুদ্ধ করে মারার হিংস্রতায়। অথচ দেখ, গহুর আলির পোড়া ঘরের মাথা পাষাণ পাথর। গহুর আলি তাই ছিল অবশ্য। কিন্তু ভণ্ড ও নিমুনমুখো ষণ্ঠীও সে কম ছিল না। পোড়া খেয়ে ভয়ে না হোক, ধূর্তামিতে উপর্যুপরি ব্যাঙ্ক এবং পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তর থেকে এত লোন ও গ্রান্ট জোটাল যে, এখন সে হাইওয়ের ধারে খন্দ ও পাটব্যবসায়ী ; উপরন্তু উপর্যুপরি হজ করে সউদি ঐশ্বর্য ও কালার টিভি, টেপরেকর্ডার দূরস্থান, গুজব—ভিডিও-ভি সি আর-এর মালিক, নিশিরাতে মাথাপিছু দশটাকা রেটে ব্লুফিল্মও দেখায়। এসব কারণে ছবির রঙিন চারটি দেওয়ালের সঙ্গে পোড় খাওয়া গহুর আলির স্মৃতিকে মেলানো যায় না। মনেও হয় না, সংলগ্ন একলা পাকুড়টিও জ্বলেছিল একদা। শরৎকালে অর্ধাঙ্গ তীব্র সবুজতার তোড়ে ঝাঁপালো হয়ে আছে। শারদীয় সবুজ তোড়টিকে সে বাকি শরীরের বাঁধে রুখেছে এবং তোড়টি ফুঁসছে, ঘুরপাক খাচ্ছে এমত মনে হয়।

তখন সেইখানে, পাকুড় গাছটির ছায়ায় কাজিরুন বিবি দুরমুষ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। পারিপার্শ্বিক জন-মানুষহীন, এবং এমন দুপুরে এমন পারিপার্শ্বিকে বিধবার নৈঃসঙ্গ স্ত্রী-চেতনাকে কেবলই ছ্যাঁকা দিয়ে ভাজা-ভাজা করে, সেজন্যই গহুর আলি পোড়ো পোড়া। ঘরের সামনে বিতর্কিত একটুকরো ঘাসজমিতে বুড়ি ছাগলের সঙ্গে কাজিরুন কথা বলবে ভাবছিল। 'ইঃ...বারভাতারি...মুখ না ই রি...থাকত আগের দিনকার শিয়ালগুলিন...দেখছ মাগীর চপটখান...' সে এইভাবে শুরু করতেই অনতিদূরে, পেছনে কোথাও বৃক্ষলতাগুল্মের আড়ালে পাতালে আচমকা কলজেছোঁয়া অদ্ভুত ও ঠাণ্ডা 'কুব' শব্দ। ভাবল, কানের ভুল। তবে ওইদিকে নিচে একখানি মাঠপুকুর আছে। আবার 'কুব' শব্দ নিজস্ব সত্যতা সাব্যস্ত করলে কাজিরুন, পাড়াকুঁদুলি যত, তত পাড়াবেড়ানিও, আধুনিক গ্রামজীবনের সংঘর্ষ ও কোন্দওয়ারে যে সতত ডাবল এজেন্ট, পাকুড় গাছটির পেছনে গেল। তৃতীয় 'কুব' শব্দে সে গুঁড়ি মেরে ঘন গুল্মের নিচের দিকে হাপরটানা বুকে তাকাল। পুকুরটি নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে। একপক্ষ মাঠের পোনা ছাড়লে অপরপক্ষ যথাসময়ে লুঠে নেয়। কোনও-কোনওবার দু-একজন 'ফিনিস' হয়। পুলিশ আসে ও চলে যায়। মসজিদে মাইনে করে রাখা মৌলবিসায়েব প্রতি জুম্মাবার দরদর ধারায় কেঁদে বলেন, 'মোসলমান মোসলমানের ভাই। কাজিয়া করলে খোদা নারাজ হন।' তবু কাজিয়া চলতে থাকে। ভাই ভাইকে 'ফিনিস' করে। শেষে মৌলবিসায়েব সুর ধরে 'শহিদে কারবালা' পুঁথি পড়তে থাকেন। পুঁথির গৃহযুদ্ধজনিত ট্রাজেডির শোক বাস্তবতাকে ছুঁতে পারে না। বাস্তবতা শয়তানের কণ্ঠলগ্ন এবং শোলে-খ্যাত গব্বর সিং-এর গলায় বলে 'বহুৎ মজা।' আর বাস্তবতা যত শেষদিবস 'রোজকেয়ামতের' দিকে যাচ্ছে, তত বহুৎ মজার কমেডি হয়ে উঠছে, শাস্ত্রবিদ বোঝেন না।

চুনি, বেদেনি ঠিক যে ভঙ্গিতে সাপের ডালা খোলে, সেই ভঙ্গিতে চটের থলেটি ফাঁক করেছিল। থলেটি ছিল পান্নার তক্তাপোষের তলায় কোনার দিকে আঁধারে এবং তখনও এইরকম সাপধরা হাতের কৃৎকৌশল ছিল চুনির। এই জিনিসগুলিনের সঙ্গে তার মোটামুটি জানাশোনা আছে, যেহেতু পান্না তার বড় ভাই। পাটের আঁশজড়ানো গোলাকার গোটাগুলিন সে গোনার চেষ্টা না করে বেদেনির সাবধানতায় একদিকে জলে ছুঁড়ল। আশ্চর্য ঠাণ্ডা ও কলজেছোঁয়া শব্দের পর সে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল হলদেটে জলের দিকে। ওই জলকে তার বিশাল আকাশের চেয়েও মহান ও বৃহৎ শান্তি মনে হল। সে ঠিকই বুঝেছিল। হলদেরঙের গাঢ় ও গভীর শান্তি একটি নিদ্রিত সাক্ষাৎ মৃত্যুর গোটাকে সামান্য শব্দে গ্রাস করলে তার চোখ আবার ভিজে গেল। বুঝি ওই বৃহৎ শান্তি ক্ষুদ্র দুই চোখের পাতায় নরম হাত বুলিয়ে বলল, 'আঃ বিটি...তোর মুনে কী বেথা রি...।' তবে চুনি এখন বেহুলার পালার নেত্য ধোপানি, যে মন-পবনের ঘাটে কাপড় কাচে আর কলার মান্দাসে ভেসে আসে লখিন্দরের শব, শিয়রে বেহুলা,

'ইঃ...ই রি কন্যে, তু ই বয়েসে রাঁড়ি...আয়, আয় রি কাছে মরা পতিরে জাগাই'—সেই যেতা। চুনির অবচেতনায় এই কণ্ঠস্বর আর আশ্বাস ছিল। সে ওই ধোপানির জিওনমন্ত্র উচ্চারণের শব্দ দিল জলকে এবং জল ঘুমঘুম স্বরে বলল, 'আঃ'—শান্তিতে। তারপর শান্তির বুকভরা দরদের মত উৎসারিত ঢেউ পুকুরটিকে চারদিকে, সমস্ত বিন্দু ছড়িয়ে শব্দহীন ছুঁল। শান্তি এইভাবে স্বাধীনতা হয়ে আছে, মানুষেরা বোঝে না। বেদনায় ক্ষোভে চুনি ঢোক গিলছিল মুহুর্মুহু।

দ্বিতীয়টি, তৃতীয়টি, চতুর্থটি, পঞ্চমটির পর পিছনে ঢালের শীর্ষে বৃক্ষলতার ফাঁকে একটি মুখ, তারপর সন্ত্রস্ত চাপা ও আর্ত চিৎকার হঠাৎ চিলের মত, 'চুনি রি, উ কী...' চুনি ষষ্ঠটি গোপনে গড়িয়ে দিল জলের ভেতর। এবার বুজকুড়ি কাটতে লাগল মৃত্যুর গোটাটি। মৃত্যুরই মৃত্যুকালীন শ্বাসকষ্টজনিত বুজকুড়িগুলিন মোটা। দ্রুত ভেঙে যাচ্ছিল, ফুলে উঠছিল। জল যেন এতক্ষণে ঘুম থেকে সম্পূর্ণ জেগে এবং চুনির চালাকি ধরতে পেরে ড্যাবডেবে অনেক চোখে তাকাচ্ছে। তাকাতে-তাকাতে আবার দূরের হয়ে গেল। তখন চুনি আবার একটা ভারি শ্বাস ছাড়ল।

'হেই মা! ই কী রি...তু উটা কী কল্লি? ও চুনি!' ধাড়ি মুরগির মত ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আছাড় ভেঙে পা-কতক নেমে এল কাজিরুন এবং কাঁটায় আটকে মুখখানা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর করে 'ইঃ...হিঁ...উঃ' এইসব শব্দ তুলতে থাকল মৃত্যুকালীন হেঁচকির মত।

চুনি ভিজে চোখে শান্ত হাসছিল। আঠার বছরের দুর্লভ এই হাসি। চুনি, নিষ্ঠুর পান্নার বোন, হাসে না।

কাজিরুন কাঁটামুক্ত হতে পঞ্চায়েতের ক্ষয়রাতি চুলপেড়ে শাড়িটা কোথাও-কোথাও ফালাফালা। ইত্যবসরে চুনি চটের থলেটা গুটিয়ে জলের দামের তলায় পটু পাখানি দেবে অস্তিত্বহীন করে দিল। সে প্রার্থনার জন্য প্রক্ষালনের ভঙ্গিতে মুখ ধুল। হাত-পা ধুল। আঁচলে মুছল। তারপর ঘুরে মাটি ও গুল্মের শেকড় ধরে গুঁড়ি মেরে উঠতে থাকল। সে নির্ভার।

কাজিরুন ফের পাকুড়তলায় দাঁড়িয়ে ছিল। পায়ের কাছে ছোট্ট দুরমুষটি ঘাসে পরিত্যক্ত আতুর। কাজিরুনের নাসারন্ধ্র স্ফুরিত, মুখের ভাবে বেদনাকীর্ণ নিষ্ঠুরতা। জুলজুলে চোখে দেখছিল অতীতের খেঁকশেয়ালির স্মৃতিচিত্রের বিভ্রম। এই লেংড়িভেংড়ি ছুঁড়িটা পান্নার বহিন না হলে ওর কয়েক পূর্ববর্তী প্রজন্মের তাবৎ মানুষের হাড়গুলিন কবব থেকে বের করে কাঠটি বাজাত। কারণ ওর জন্যই নতুন কাপড়খানা জেরবার। কিন্তু সে যা হবার হত, সেই বিস্ময়কর কলজেছোঁয়া ঠাণ্ডা শব্দগুলিন? সেগুলিনই রহস্যে তাকে বাকরহিত টেরাকোটা করেছে। পেছনেই গহুর আলির পোড়া ও পোড়ো ঘরের দেওয়াল।

চুনি, তাকে ভারমুক্ত ও সদ্যস্নাতা কোমল দেখাচ্ছিল, বন্য ঘৃতকুমারীর কাছ থেকে লাঠিটি ফেরত নিয়ে পা বাড়াল, কাজিরুনকে দেখেও না-দেখা! বহুদিন যাবৎ কোল্ডওয়ারকালে গ্রামীণ ডাবল এজেন্ট এজন্য ক্ষুব্ধ, চিরদিন মমতাবশে লেংড়িভেংড়ি মেয়েটির নিরাপত্তা তার কাম্য ছিল, কিন্তু এই উপেক্ষার নির্মমতা অসহ্য। তার কুতকুতে চোখ দুটির সামনে চুনি ক্রমে নড়বড় করতে করতে পিচরাস্তায় ওঠার পর চোখ দুটি কুটিল হল।

আর চুনি যখন পিচ রাস্তায় জল থেকে পাওয়া বুনো হাঁস-পাখির শান্তি বুকে নিয়ে ওড়ার ভঙ্গিতে হাঁটছে, জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে, সে তখনও জানত না পেছনে একটি ক্রূর কুটিলতা রেখে এল। বন্দুকবাজ দুটি লক্ষ্যভেদী ছোঁট হতে থাকা গুলিগুলি চক্ষু।...

অতীতে পিচরাস্তার দুধারে এই খণ্ডভূমি ছিল বস্তুত ঐতিহ্যসম্মত একটি নোম্যানসল্যান্ড। এদিকে মুসলমানপল্লী, অন্যদিকে হিন্দুপল্লী। নোম্যানসল্যান্ডের পশ্চিমে ঈষৎ গড়ানে বাঁজা কাঁকুরে ডাঙ্গা ছিল। সেখানে ছিল উল্লম্ব চিত্রার্পিত কয়েকটি তালগাছ। শেষপ্রান্তে দাঁড়ালে দেখা যেত ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া ধু ধু মাঠ, তারপর নাবাল নৈসর্গিক জলাধারের ওপারে সরু যেন বা বৃত্তাকার একটি রেখা এবং সেই ব্যাপক শূন্যতা গ্রীষ্মে লু হাওয়ায় মারমূর্তি ছিল, যদিও এমন শরতে সবুজরঙের পূর্ণতা একদা কাজিরুনের মরদ ন্যাকাবোকা মৈনুলকে বলিয়ে নিয়েছিল, 'লাগে কী, চলেই যাই চোলহেই যাই উ

বাগে...' বাকি জীবনের মত। আর বাংলার কৃষকদের কাছে এও এক সন্ন্যাসব্রতের তুল্য যে, চিরকালীন শস্যশ্যামলিমার গভীরে যাত্রা, যেন বাড়ি না ফিরলেও চলে। সেইরকম ক্ষেত্রে চল্ ধাতুনিষ্পন্ন শব্দটি গুরুত্বহেতু 'চোল্‌হে'-তে পরিণত হয়।

নোম্যানসল্যান্ডের অপরদিকে গড়ানে মাটিতে ছিল যথেচ্ছ বৃক্ষগুল্মলতা, একটি জলনিকাশি প্রকৃতিসৃষ্ট নালা, ফের মাঠ, একটি ব্যাপকতা। আঠার বছরের প্রতিবন্ধী মেয়েটি, এই চুনি, সেইসব কিছুই দেখেনি। শুনেছে তার মরা বাপের কালে জেলাবোর্ডের হাতে ছিল এই সড়ক। যদি বা পাথরকুচি ও পিচ পড়ত, একটি ছোট্ট সাঁকোও ছিল এবং এস ডি ও বাহাদুর ছিলেন ইংরেজ সায়েব, বর্ষায় অনেকটা গলে পচে যেত এবং একবার তাঁর ফোর্ড গাড়ি উদ্ধারে হিন্দুমুসলমান ঐক্য তাঁকে এমনই অভিভূত করে, তিনি ডায়েরিতে এই ওরাকল্ লিপিবদ্ধ করেন : 'Lo and behold! he glorious sun of the British Empire will never set in India...' কিন্তু অল্পবুদ্ধি বেচারার ওরাকল্ ব্যর্থ হয়ে আজাদি আসে এবং এই সড়কেই চুনির দাদু ইউসুফ ও প্রাণনাথকে কংগ্রেসি রাজবন্দি হিসেবে বিচারার্থ মহকুমা আদালতে চালান দেওয়ার সময় একই হিন্দু-মুসলমান একই ঐক্যবদ্ধ মুহুর্মুহু নির্ঘোষে 'বন্দেমাতরম! আল্লাহ আকবর!' উচ্চারণ করেছিল! তারপর আজাদি এলে ইউসুফ ও প্রাণনাথ এই নোম্যানসল্যান্ড অতিক্রম করে মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়! ভুলো মাৎ! ভুলো মাৎ!' গর্জন করতে করতে উভয়ে কুঁজো হয়ে যেতেন, এও একটি ঘটনা। আরও ঘটনাপরম্পরায় খণ্ড ভূমিটির বাঁজা অংশে চিত্রার্পিত তালগাছগুলিন দিনু গোমস্তা আটটাকা রেটে বেচে দেন। সেখানে বহু পরে বিদ্যুতের সাবস্টেশন স্থাপিত হয়। উল্টোদিকের বৃক্ষলতাগুল্মের একাংশে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদল 'জবরদখল' করে। স্থানীয় হিন্দুদের অনভিপ্রেত এটি, সেকারণে মারদাঙ্গার উপক্রম হয়। কিন্তু দলটি ছিল মরিয়া এবং তাদের নারী ও শিশুরাও হাতে অস্ত্র নিয়েছিল। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, তারা নেপথ্যে কোনও-কোনও মুসলমান লোকের সমর্থন পায়। শেষে পুলিশ এসে তাদের পৃষ্ঠরক্ষা করে। খণ্ডভূমিটির সারফেস দখলস্বত্ব জমিদারবাবু হরি সিং-এর হলেও ভেস্টেড ল্যান্ড গণ্য হয় সেটলমেন্ট রিচেকিং-এ। উদ্বাস্তুদের মধ্যে মৌখিক বণ্টিত আটকাঠা পরিবার পিছু মাটির পাট্টা পেতে তিরিশ বছর কেটে গেছে এবং এও অদ্ভুত, 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' শ্লোগান যিনি দিয়েছিলেন, সেই প্রাণনাথ, বৃদ্ধ কিন্তু তখনও প্রাণবন্ত, আজাদিটি ক্রমে ক্রমে সত্য সাব্যস্ত করেন, কারণ চোখের সামনে নেপোরা দই মেরে দিচ্ছিল, তিনি ভোটে যেতেন এবং তাঁর পার্টি সরকার গড়লে স্বহস্তে উদ্বাস্তুদের পাট্টা বিলি করেন। দুঃখের কথা, সাত বছর আগে এই বিপ্লবী পুরুষের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরই পপুলারিটির নির্ব্যূঢ় স্বত্ব দখল করেছেন সবেধন নীলমণি পুত্র আইনজীবী বীরেন্দ্র, 'বিরেং বাবু'। আরও আশ্চর্য ঘটনাপরম্পরায় এঁর পুত্র শুভ্রাংশু ওরফে ছোটন বিপ্লবের দশকে কলেজ ছেড়ে নকশাল হয়ে কয়েক বছর এবং আশির দশকে এলাকার 'মাফিয়ালিডার' গণ্য, পান্না যার দক্ষিণহস্ত। সেই পান্নার বোন চুনি।

প্রকৃতির সৃষ্ট নালাটি পাঁচসালা যোজনার প্রযুক্তিস্পর্শে সুচারু হয়েছে। সেই ছিমছাম ঋজুতার একপারে সাধুর আশ্রম ভ্রম হয়, এমন সব দারিদ্র-গোপন-করা সুন্দর কুটির, ফুলফলের জাঁকাল তরুলতা, মঙ্গলকাব্যের পারিপাট্য। 'রাঢ়ের ঘটিরা অকর্মণ্য, গোঁফখেজুরে, খালি মামলা জানে হে!' প্রমথ মাস্টার মশাই বলেছিলেন। 'দেখে এসগা বাঙালরা কী রূপকার! যি ঠেঞে নাটাকাঁটা কুঁচ বৈঁচির আদাড় ছিল, মাগীরা নাকে কাপড় ঢেকিন হাগত, সিঠেঞে মুলোও ফলালে হে, কলাঝাড় পর্যন্ত। অবিশ্বাস্য!' তিনি মুগ্ধ দৃষ্টে সাঁকোর কালভার্টে বসে নেতাজি কলোনির পটচিত্র নিরীক্ষণ করতেন নিত্য বিকেলে। এখন শরতে পশ্চিমের উঁচু ভূমিতে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র থেকে তাবৎ জল এবং আশেপাশের আরও জল এসে নালাটিকে জলবতী করেছে। জলটি ঘোলাটে। এখন স্রোত নেই। ইতস্তত দাম। চ্যাং, পুঁটি, ট্যাংরা ধরতে ছিপ দিনমান শ্রেণীবদ্ধ হয়। সেখানে, কালভার্টের হাতপাঁচেক দূরে একটি অর্জুন গাছের ছায়ায় থেমে চুনি মাছ ধরা দেখার মধ্যে শান্তিজনিত সুখ এবং উত্তেজনার পর অবসাদ, ক্রমে এত উজ্জ্বল রোদে হেঁটে আসার কষ্ট দূর করতে চাইল। মসৃণ গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দুই পায়ের ফাঁকে বুকছোঁয়া লাঠিটি, সে চুল বাঁধতে থাকল। কারণ খোঁপাটি শিথিল হয়ে আসছিল।

'কী বিটি, ইখানে তু...ইটো কি লুটুন বাঁধার জায়গা গো?' কালভার্টের নিচে ছায়াঢাকা একটু গভীর কংক্রিট খোঁদল থেকে সহাস্য মুখটি দেখা গেল মাত্র। মুখে জংলা কালো গোঁফ দাড়ি, মাথায় সাধুদের লম্বা চুল, লোকটি সোনারু, সোনারুদ্দিনের অপভ্রংশ। সেও মাছধর, দেখছিল অনেকের মত, অথবা অবকাশভোগী। তবে তার অবকাশ আকাশের মত প্রসারিত বলে চুনির ধারণ। অথচ সোনারু ভিখিরি নয়। প্রকৃতিচর সে এবং প্রকৃতির মতই যেন বা উদ্দেশ্যহীন। তার চোখে আভাসিত মুগ্ধতা, সে কিছু খারাপ দেখতে জানে না এমন এক মানুষ। চুনি মুখ ঘুরিয়ে খোঁপা আরও আঁটো করতে থাকলে সে ফের একমুখ হেসে বলল, 'হঁ গো! বিটি যেন জগা মেকদারের দুগ্নি...রঙটি পড়েছে, তবে ত্যালঘামটুকুন না পল্লে হ্যাঁ-চাঁ করবে না লাগে। ই ভররোদে কতি যাবি মা? ...কষ্ট।' বলে চুপ করল।

চুনি পান্নার বোন, সে হাসে না। কিন্তু এ মুহূর্তে হাসি তার প্রয়োজন ছিল। আর 'চোইত-পাগলা' বলে খ্যাত—চৈত্র মাস বাৎসরিক সন্ধিকাল, সেকারণে সুস্থতা ও পাগলামির সন্ধিকালে উপনীত যে-মানুষ, সে, সোনারু—তার ভাষ্যে চুনির রূপের প্রশংসাসূচক আভাস ও মমতা মেয়েকে পুনর্বার গোলাপখসা করেছিল। বলল, 'বসে আছ চাচা...খালি-খালি। বঁড়সি নাই গো হাতে!'

'নাই।' সোনারু গর্ত থেকে বের করা শেয়ালমুখে বলল। 'থাকে? ই পুরুষ পাপকাজ করে? দেখেছ কখনও?' সন্ধিকালের চোইত-পাগলার খিটখিট শিশুহাসিতে সরু সাদা দুপাটি দাঁত, হাওয়ায় ফুলন্ত ভাঁটঝোড়টি দুলছিল।

'পাপকাজ ক্যানে?' জানতে ইচ্ছে করল চুনির। এ কথা মনে পড়ল ঠিকই চকিত আবিষ্কারের মত, কখনও সোনারুকে বঁড়সিহাতে বা কোনও প্রক্রিয়ায় মাছ ধরতে দেখেনি। তার 'পাপকাজ' কথাটিও তাকে দরদ দিয়েছিল।

সোনারু গুম হয়ে বলল, 'আমি গরমেন হলে...' সে শূন্যতায় কাঠি-কাঠি আঙুলে লিখতে থাকল, 'আইন লেখে দিতাম জানমারি বন্ধ। ...কী জলথল কী আসমানে।' সে মুখ তুলে আকাশও দেখাল। 'তু তখুন ছোট। ইপুরুষ এক পাখমারা মুসহর খ্যাদায়ে ছিল। হুঁ, শালোর হাতে সাতললা আঠাকাঠি ছিল।' বলে সে সুরে গাইতে লাগল, 'পালারে, পালারে পাখি/দ্যাশে এল পাখমারা...

তার গান শুনে নালার দুধারে ভিন্ন-ভিন্ন বয়সী লোকগুলিন বিরক্ত হয়েছিল। একজন ভেংচি কেটে বলল, 'অ্যাই চোইত-পাগলা! চেঁচালে গলায় (অশ্লীল শব্দ) ঢুকিন দুবো শালো!'

চুনি, পান্নার বোন সে, ফোঁস করল। 'গাহুক। গাহিবে। গাহো চাচা!' বলে সে পটু হাতখানি নাড়ল। হাতের লাল প্লাস্টিক বালাটি সেই কখন থেকে আঁটো ছিল। এতক্ষণে মুক্ত হল। দুলতে লাগল। সোনারু দ্বিগুণ জোরে পাখমারাকে সুরে টেনে ছড়িয়ে দিতে থাকল। রৌদ্রপূর্ণ আকাশে পাখমারা পাখির মত পালিয়ে যাচ্ছিল। 'জানমারি বন্ধ' ভাল লেগেছিল চুনির।

লোকগুলিন চুপ। চুনি, পান্নার বোন। সেই খিস্তিকারি ঈষৎ সাহসে গলার ভেতর শুধু বলল, 'চ্যাচালে মাছ থাকে? তাদেরও তো কান...হুঁ! কী বলব? বুলার কিছু নাই গো!' এগুলিন অসহায় আক্ষেপ। এসবের একটি পরিপ্রেক্ষিত আছে।

এই প্রাক্তন নোম্যানসল্যান্ডে দাঁড়ালে দক্ষিণে মুসলিমপল্লী চক্ষুগোচর হয়। তার প্রান্ত ছুঁয়ে ধনুকবাঁকা হয়েছে আধুনিক হাইওয়ে, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ফুঁড়ে মহকুমা শহরমুখী। ওই পল্লীটির এদিকাংশে ডাঙ্গাপাড়া, ওদিকাংশে নামুপাড়া, এভাবে প্রলম্বিত। কোন অতীতকাল থেকে দুই পাড়ার দুই তালেবর ব্যক্তির মধ্যে পুরুষানুক্রমে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের মূল মাটি নয়। এটাই আশ্চর্য, নারীও নয়। সে কি প্রভুত্ব। এও হয়ত অর্ধসত্য। বহু রাজপুরুষ, পুলিশ, জনপ্রতিনিধি, সংবাদপত্রের ভাষ্যকার কেউই এই হেঁয়ালির জট ছাড়াতে না পেরে Hegemony ইংরেজি শব্দটির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেন ফোঁস ধ্বনিসহযোগে। সেই কবে ও'মালি সায়েব জেলা গেজেটিয়ারের ভূমিকায় অগত্যা লেখেন, 'The tribal Pattern of the local Moslem community as well as the Psychic make-up of its individual members appear to be foreign, yet have added an extra-ordinary demension in the traditional violence errupted by a simple factor, either land or woman...' ডাঙ্গাপাড়া-নামুপাড়ার এক্সট্রা-অর্ডিনারি মাত্রাপ্রাপ্ত ঐতিহ্যগত দ্বন্দ্ব কখনও মাঝে মাঝে

বিষাক্ত সাপেদের মত টানা হাইবারনেশনে মগ্ন থাকে এবং সুপ্তিকাল কখনও তিন বা চার বছরও দেখা গেছে, অন্তত বড় আকারে 'ফিনিস' ঘটার পর। গত দু'বছরের আগের প্রায় চার বছর রাজনীতির চতুরালিতে দুই পাড়ার শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত-ড্রপআউট তরুণেরা একটি মিলনীসংঘও গঠন করে। সেজন্য ঘরও পাওয়া যায়। স্পোর্টস, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জন্মজয়ন্তী, একটি যাত্রাদল পর্যন্ত এবং 'সিরাজদ্দৌলা' পালায় শহর থেকে লুৎফা আলেয়া ঘসেটি অভিনয়ে পেশাদার অভিনেত্রীদেরও আনা হয়। পান্না হোসেন জিন্স ছাইরঙা স্পোর্টিং গেঞ্জি, কাউবয় জুতো পরে আমোদগেঁড়ে শ্রোতৃবৃন্দকে চুপ করিয়ে রেখেছিল এবং এক প্রান্তে চেয়ারে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে টুঁ শব্দটি হলেই জড়ানো গলায় বলেছিল, 'জিভা ছিঁড়ে লুবো', সে ক্লাস এইটের ড্রপআউট। আরও বিশেষ কথা, সে-রাত্রে সে প্রচুর হুইস্কি টেনেছিল। তখন কালসর্পটির নিদ্রাহেতু শান্তিকাল। নইলে তার চেয়ারের পেছনে তারই কাঁধ আঁকড়ে নামুপাড়ার হারুন খিখি হাসছিল, যে এক দুর্দান্ত কিলার। সেই রাত্রে কত সরলতায় ফিনিস করে দিতে পারত ডাঙ্গাপাড়ার মূল শক্তিটিকে! নিরপেক্ষ ও ভিতুরা সেই ঘটনা স্মরণ করে বলে, 'কী আশ্চর্য বটে! মৌলবিসায়েবরা যা পারেন নি, ই কেলাব যাত্রা সিটাই পেরেছিল, হে! ...উশ! পান্না আর হারুন গলাগলি হাঁটে দেখে পেত্যয় না হয়...স্বপন, নাকি মুনের ভরম?' তৎকালে এসকল কথা কারুরই মনে হয়নি। স্বাভাবিকতার এমন জিনিস, ইদানিং চেনা যায় না। দু'বছর আগে এক বিকেলে পান্নার ছোট এবং চুনির বড় মতিউর ওরফে মতিকে হারুনরা তাড়ি খেতে ডেকে নিয়ে যায় এবং মতি যথেষ্ট মাতাল হলে ঝাঁকঝকি সাঁঝে ফেরার পথে সজোরে চাকু মারে। মতি হারুন ও পান্নার চেয়েও নির্দয় কিলার ছিল। সেই ঘটনা জানিয়ে দেয়, কালসর্পটির নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। তৈরি হও। সাজোসাজো রব পড়ে এবং যথার্থই রণসজ্জা। বহু নিরপেক্ষ লোকে জেনেছিল। মৌজা দক্ষিণডিহির দক্ষিণাংশে নৈসর্গিক স্বাধীনতা—যেখানে রাষ্ট্র নেই, সরকার নেই, পুলিশ ও সেনাবাহিনী নেই। এমন কী, কোনও-কোনও বাবু ওই প্রলম্বিত পল্লীটিকে সকৌতুকে 'মিনি পাকিস্তান' বলে বর্ণনা করতেন, যদিও তার রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না, এবং একই সুরে থানার দারোগা বেল্ট ঢিলে করতে করতে বলেছিলেন, 'মরুক শালারা মারামারি করে। কারণ গীতায় আছে: যদাযদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতিভারতঃ...।' আর সেই থেকে নামুপাড়ায় দলীয় ও নির্দল সমস্ত লোকের সমস্যা, বাজার-হাট-থানা-স্কুল-ব্লক অফিস—সবই উত্তরাংশে হিন্দুপল্লীতে, তারা এদিকে আসতে পারছে না। তবে গহুর আলি প্রমুখ কিছু ধূর্ত ব্যক্তি বাজারে বসত করায় সমস্যাহীন। প্রাচীন নোম্যানসল্যান্ড-প্রথা কবে লুপ্ত। উত্তরাংশে হাইওয়ের দুধারে বাজারে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস অধুনা, যেমত লালন ফকিরের গানে আজব আর্শিনগরের কথা আছে, যেখানে দুই পড়শি বসত করার কথা আছে, অ-বি-ক-ল সেইমত। বরং তারা সংঘর্ষ ও রক্তপাতগুলিন, ঘরপোড়া ছাইগুলিন এনজয় করে। লুঠের ধন কেনেও গোপনে। মানুষের শঠতার চেয়ে কেনাকাটার অন্ধকার রাতগুলিনকেই তখন অধিকতর শঠ মনে হয়।

কিন্তু নৈসর্গিক অবস্থানগত আনুকূল্যে ডাঙ্গাপাড়ার এ একটা প্রান্তিক জয় যে, তারা নির্ভয়ে উত্তরগামী! তারা বাজারে ও হিন্দুপল্লীতে উঁচু মাথায় প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে ঘোরাফেরা করতে পাবে। আরও একটি জয় পান্নার উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ। তার তিনপুরুষ ছোটন—শুভ্রাংশুশেখরের ('মাফিয়ালিডার' বলা হয় যাকে চুপিসাড়ে) তিনপুরুষের দোস্ত। লোকেরা সন্দেহ করে, 'মিনি পাকিস্তানের' ঘরোয়া দ্বন্দ্বের কলকাঠি দুটি উত্তরাংশে দুই পরিবারের হাতে। একটি ছোটনদের বাড়িতে, সেটা স্পষ্ট হয় পান্নার সঙ্গে ক্রমবাড়ন্ত বন্ধুতায়। অপরটি প্রাক্তন হরি সিং জমিদারবাবুর ক্ষয়াটে দালানবাড়িতে। তাঁর নাতি নেই, নাতনি আছেন আমেরিকার নিউইয়র্কে। এই নাতনির বাবা, তাঁর পুত্র অরিজিৎ সিং এখন ভোটে হারেন, তবু দাঁড়ান এবং নির্ভয়ে নামুপাড়ায় যাতায়াত করতে পারেন। পান্না হোসেন বোঝে, এই একটি ক্ষেত্রেই সে অসহায় এবং বিপজ্জনকভাবে মুসলমান। ফলে অরু সিং তাঁকে 'কী বাপ পান্না' সম্ভাষণ করলে পান্নাকে সহাস্যে বলতে হয়, 'ভাল তো বাবুজ্যাঠা?'

রগড়! পান্নার দাদু ইউসুফ এবং ছোটনের দাদু প্রাণনাথ যখন 'কংগ্রেস কী জয়' হাঁকতে হাঁকতে কুঁজো হয়ে পড়তেন, হরি সিং-এর পাঠানো লোকেরা ঢাকঢোল বাজিয়ে ঢিল ছুঁড়ে মিছিল ও সভা ছত্রভঙ্গ করত। আজাদির পর পরিলক্ষিত হয়, ধুতিপরা জেলাশাসক সদলবলে হরি সিং-এর পুকুরে

ছিপ ফেলতে এসেছেন। অনুরূপ আরও কিছু ঘটনার পরই বিশেষ করে প্রাণনাথ স্লোগান হাঁকতে শুরু করেন, 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়!' পরবর্তী প্রায় দুটি কি তিনটি ভোটে অরু সিং নাকি তাঁর নির্বাচনকেন্দ্রের ভোটারদের স্রেফ 'রাজভক্তিহেতু' জয়লাভ করেন। তারপর প্রাণনাথের পাশার দান। অরু সিং-এর পতন ঘটে। তবু আশা ছাড়েননি, কারণ কবি লিখে গেছেন, 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা...' পুনশ্চ রগড়।...

পান্না বাড়ির সামনে খলিয়ান চত্বরে সাইকেলবাজি শিখছিল। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ক্ষমতা মানুষকে খেয়ালি করে।

খলিয়ানটি চৌকো, সদ্য পিটিয়ে কঠিন এবং গোবরলিপ্ত। কাতকে ধান ঠেঙানোর জন্য প্রস্তুত। পেছনে একতলা পুরনো দালানবাড়ির ফটকটি আঞ্চলিক আশবাফি স্থাপত্যরীতিমূলক। দেওয়ালের শীর্ষে সাইনবোর্ডতুল্য উলম্ব আয়তক্ষেত্রের সাদা পটে গাঢ় নীল চাঁদ তারা এবং বিসম ছাঁদের বাংলা হরফে লেখা আছে : 'স্থাপিত বাং ১৩৪৫, মাং চৈত্র', এইটুকু। মুক্তির দশকে নীলবর্ণ চাঁদটির ডাইনে ছোটনের গোপনসংসর্গহেতু পান্না একটি বাঁট যুক্ত করায় সেটি কাস্তে হয়, যেমত কলকাতার কবি লেখেন : 'এ যুগের চাঁদ কাস্তে।' তার বাপ ইসমাইল হুসেন রাজনীতিবোধশূন্য নিছক ধার্মিক এবং নিজের মরা বাপকে 'কমিউনিস্টরা নাস্তিক', বলে গালমন্দ করতেন, ফলে ইসমাইল এমার্জেন্সিকালে বাঁটটি ধেবড়ে দেন—বেজায় রগচটা মানুষ। পান্না ও মতিকে তিনি পূর্বপুরুষের একটি তলোয়ার নিয়ে প্রায়ই তাড়া করতেন। তলোয়ারটি প্রাচীন সময়ে মোহরম পরবে ব্যবহৃত হ'ত এবং এই পরিবারের প্রাক্তন পুরুষদের পরগনা জুড়ে লড়াকু খ্যাতি ছিল। এও দাবি করা হয়, তাঁরা পাঠান যোদ্ধাদের বংশধর, পরগনায় আউটসাইডার। নামুপাড়ার হাজি সইদুরের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে এই আউটসাইডারদের বংশপরম্পরা বিরোধের শেকড় কি এখানেই? এ একটি অবচেতন প্রশ্ন, যা চেতনে উত্থিত হয়নি, হয় না। সম্ভবত মুসলমান লোকেদের মধ্যে জাতপাত প্রশ্ন অবাস্তব ভেবে।

খলিয়ানের নিচে রাস্তা। চারদিকে ঠাসাঠাসি ঘরবাড়ি। দক্ষিণে পাঁচবাড়ির পর একটি চটান, চটানে একটি দরগা, পাশে দরগাপুকুর—এও একটি নোম্যানসল্যান্ড, কারণ তারপর নামুপাড়া শুরু। প্রতিটি সংঘর্ষ ওই নোম্যানসল্যান্ডে হয়, তাই সেটি বস্তুত একটি ট্রাডিশনাল রণক্ষেত্র। অথচ কী আশ্চর্য, সেইখানেই মিলনী ক্লাব ছিল এবং সিরাজদ্দৌলা অভিনীত হয়। ক্লাবঘরটি বোমায় বিপর্যস্ত হওয়ার পর সবল ভাইদের তাড়া খেয়ে অবশেষে এক দুর্বল ভাই, খুদু, রিকশচালক সে, বউকাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সেই ঘরে সংসার পেতেছে। সে নির্দল।

পান্না আজ রঙে ছিল।

বিরেংবাবু, আইনজীবী ও জনপ্রতিনিধি, সদর শহরেই সস্ত্রীক থাকেন, পেশার কারণে। মেয়ে গৌরী কলেজের ছাত্রী, তাকে তিনি সিংহ-বাড়ির অনিন্দিতার মতই আমেরিকায় পাঠাবেনই, এটা প্রতিজ্ঞা। কখনও আসেন মাসান্তে, অবসরে, ভোটারদের সংসর্গ ও পার্টি সংগঠনের ব্যাপারটাও মাথায় রেখে। ফলে বাড়িটির, অত্যন্ত মডার্ন গ্যাজেট ও বর্ণসুষমায় সাজানো 'সরোজিনী ভবনের' একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছোটনবাবুর, যে বাপকে সত্তরের দশকে বিপাকে ফেলেছিল। আজ সকালে বাগানের দিকের প্রমোদকক্ষে ছোটন তার ভি সি আর-এ গহুর আলির সংগৃহীত যে ভিডিও ক্যাসেটটি তলব করে এনে দেখায়, সেটি ছিল শতাধিক মৈথুনরীতির ডেমনস্ট্রেশন এবং পান্না একসময়ে রেগে গিয়ে বলেছিল, 'সায়েবমেমরা পাঁঠা বে শালা! ই কী! দুনিয়াতে আর কিছু...হুঃ, খালি...।' বলে সে রেগে বেরিয়ে আসে, গেলাস শেষ করেই। ছোটন গম্ভীর ছিল ইজিচেয়ারে। সে আবাল্য বোঝে, পান্না মেয়েমানুষ বিষয়ে কেন যেন বড্ড নীতিবাগীশ।

অথচ বেলা দশটায় পান্না তোড়ে বেরিয়ে আসার পর সাইকেলে চেপে বাড়ি ফেরার পথে নালার জলে একটি স্তনবতী মেয়েকে জালি ডুবিয়ে-ডুবিয়ে মাছ ধরতে দেখে এবং সেই সিক্ত সুঠাম মেয়েশরীর তাকে তাতায়। ভাবে, তাহলে শরীর এমনই অনাবিষ্কৃত অনন্ত সুখখনি! শরীরকে যা-যা দেওয়া হয়েছে, আমরা তা-তা দেখতে বা নিতে জানি না। 'হুঁ, শালা সায়েবমেমরা মাথাওয়ালা...তা না

হলে উয়ারাই পেলেন উড়ায়, চাঁদে যেয়ে হাঁটে? কত্তো জানে!' তপ্ত পান্না বাড়ি ঢুকে সাইকেল উঠোনে ফেলে, রান্নাশালে বউ জরিনাকে দেখতে পায়, সে নুন চাখছিল। কী সৌন্দর্য! এতদিন এই চোখে নজর হয়নি। পান্না চঞ্চল চাহনিতে তাকাচ্ছিল। মা খাদেমুন্নিসাকে দেখা যায়নি। বড় ঘরের বারান্দায় দোলনায় তার প্রথম পয়দাটি ঘুমন্ত। লেংড়িভেংড়ি বোন চুনিরও দেখা নেই। কামার্ত পান্না রান্নাশালে গিয়ে জরিনাকে টেনে ওঠালে জরিনার স্ত্রী-চেতনা নিমেষে সম্ভাবনাটি আঁচ করে এবং ঝিলিক হেসে বাধা দিতে দিতে সাংকেতিকে বলে, 'রাস্তা বন্ধ। যো নাইকো।' আর পান্না, গোঁয়ার ও অবুঝ, বলে, 'তা হোক। আমি শালা আঘাটায় হাঁটি...মরে যাব লাগে...আঃ...কথা কহিস না...।'

সেই বিমোহন টানাটানিকালে সহসা বড়ঘরের দোলনা ও থামের আড়াল থেকে খটখট শব্দ। এবং লেংড়িভেংড়ির রুষ্ট আবির্ভাব, আবার? 'আবার তু হাত উঠিন ভাবিকে...তু পাপিস্টি দুসাদ চশমখোর...' এভাবে সে শাসাতে থাকে। সে ভিন্ন ভেবেছিল।

ফলে খ্যাপা-খ্যাপ্ত, রতি-প্রতিহত পান্না বউকে নিমেষে ছেড়ে ছুটে যায় এবং বহিনকে চড় মারে। আঘাতটি প্রথম, নতুবা পান্না বহিনের প্রতি কোমলতাপূর্ণ উদাসীন আজীবন। তার চড় প্রতিবন্ধী তরুণীকে ভূমিশায়িনী করে। আর্ত চিৎকার ছড়ায়, 'গজব গড়বে হাতে। খসে যাবে। জানমারি নিদয়া হাত...সেই হাত বাপজিকে খেল্লে মাঠে ময়দানে গো! মউতের গোটা হাতে না পড়ে ভালমানুষকে ফাটালে...খুদা কানা গো, কানা কানা কানা...' এইসব বিলাপ। এর মধ্যে একটি জানমারি এপিসোড ছিল। গত শরৎকালে মাঠে ইসমাইল গোঁ ধরে ধান দেখতে যান এবং অগত্যা পৃষ্ঠরক্ষার জন্য পান্না অনুগমন করে। এত আশ্চর্য যে হারুণরা ক্যানেলের স্লুইসগেটের আড়ালে অ্যামবুশের মুহূর্ত গুনছিল। কিন্তু তাদের লক্ষ্য ছিল পান্না। বোমাটি দুই হাতে প্রসারিত করে মুসল্লি ধর্মভীরু ইসমাইল পুত্রকে আড়াল করে বুকে ধারণ করেন। পান্নার পিঠে স্প্লিন্টার ঘা করেছিল, এও আশ্চর্য। সে কি বাপকে ফেলে পিঠ ঘুরিয়েছিল? নিজেও জানে না, এসব সংকটমুহূর্তে কী প্রতিক্রিয়া ঘটে। তার কাঁধের ব্যাগেও তিনটি বোমা ছিল। কিন্তু ধানক্ষেতে জলে পড়ে যায় সেগুলিনসহ এবং জলে মৃতের কাফনবৎ থলেটি রেখে সে পালাতে বাধ্য হয়। পরে নামুপাড়ার দুজনকে জানমারি করে এসে পান্না বিধবা মাকে কৈফিয়ত দেয় "বাপজিকে ফেলে পালাবার খোঁটা দাও। দেখ, যদি লিজের যান না বাঁচাতাম, কুন শালো তার শোধ নিত, মা তুমি বুলো গো!...আজ মা তুমি দেখ, দুই শালোর লোহুতে তুমার পা ধুয়াতে...পা দাও মা গো!' তার দুহাতে সত্যিই চবচবে রক্ত ছিল। কিন্তু অভিমান ও আতঙ্কে খাদেমুন্নিসা দ্রুত ঘরে আত্মগোপন করেন।

চুনির বিলাপ, অথবা খোদা কানা গণ্য হওয়ার কারণে পান্না 'চো-ও-প্ ছুঁড়ি' বলে হাত তুলেছিল ফের, যদিও সে খোদাবিষয়ে ভাবে না। সে ফের সাইকেল তুলে নিয়ে বেরিয়েছিল। খলিয়ানে সমুজ্জ্বল শরৎকালীন রৌদ্রে সাইকেলবাজি খেলছিল। সম্প্রতি বাজারে এক সাইকেলবাজ খেলাড়ি ৪৮ ঘণ্টা সাইকেলে কাটায়, খুব ভিড় সৃষ্টি করেছিল। খেয়ালি পান্না তারপর থেকে প্রায়ই তাকে অনুকরণ করছে। সে ঘোষণা করেছিল, 'আমি পান্না...শালোর রেকর্ড ভেঙ্গে দুবো হে দেখি নিও।' এ এক পণ।

তখন রান্নাশালে, যেটি একটি টালির চালাঘর, পান্নার বউ জরিনা, ভিন্নজেলার এক গরিব দর্জির কন্যা, অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও শরমেন্দা—চুনি গোপনতাটি জেনে গেছে ভেবেই। সে প্রতিবন্ধী ননদকে ওঠাতে আসবে এবং দরদ দেখাবে কী, লজ্জাবশে ঘরে উনুনের পাশে গিয়ে বসেছিল। চুনির দিকে পিঠ।

আর চুনি ভাবিকে ভুল বুঝেছিল। তারপর সে যা কিছু করেছিল, সবই দুঃখ, অভিমান, প্রতিহিংসাবশে, এমন কী তার মাথায় 'শান্তি' ঢুকেছিল অথবা পান্নাকে নিষ্ক্রিয় করতে চেয়েছিল, যেভাবে অর্ডন্যান্স বিশেষজ্ঞরা বিস্ফোরক বস্তু 'নিউট্রাল' করেন এবং শান্তি অনুভূত হয়, আপাতনিশ্চয়তা আসে।...

ঘণ্টা দুই পরে খাদেমুন্নিসা খিড়কি দরজা দিয়ে পাশের বাড়ি থেকে আড্ডা দিয়ে ফেরেন। বউবিবিকে 'গোসল' করে আসতে বলেন। খিড়কির নিচেই ভরা পুকুর, নীলচে অগাধ জল। বউবিবি সাবান তোয়াল হাতে ঘাটকে গেলে শাশুড়ি দোলনায় ঘুমন্ত নাতিকে আদর করতে থাকেন। 'ওরে ই

মুখে ফেরেশতার রোশনি...তু জানমারিদের ব্যাটা, ও ভাই...বড় ছুরত তুর মুখে...যেন জানমারি না হোস মানিক রে! ...নেঘাবান বান্দা হবি, ভাই...দেখ, দেখ গো, নিদের ঘোরে বাছা হাসে!' খাদেমুন্নিসা বলছিলেন আবেগে। 'ধন্দ লাগে কী'-এর মধ্যে কী থাকে...'কে বুলবে ই লোহুর গোটা চামড়ার পুঁটুলির মধ্যে কে আছে...জজ বেরিস্টার মিনিস্টার লিডার, না এক জানমারি? খুদার কুদরত বুঝা যায় না গো!' আর ঠিক এই বাক্যশেষে বাইরে বিকট ভয়ঙ্কর 'হুডড়ুম' আওয়াজ হয়। শরৎকালীন আকাশ আজ দুপুরে একেবারে গনগনে নীল, নির্মেঘ। অথচ আচম্বিতে বজ্রপাত। আওয়াজটি সত্যই ভয়াবহ ও বিদীর্ণকারী ছিল।

খলিয়ানের নিচে রাস্তার ওধারে একটি সুচারু মাটির বাড়ি ছিল। বাড়িটি নিজামের। ডাঙ্গাপাড়াবাসী সত্ত্বেও নামুপাড়ার এজেন্ট সন্দেহে ক'মাস আগে তাকে সপরিবারে শুধু শরীরগুলিন নিয়েই পালাতে হয়। তার গেরস্থালি লুণ্ঠিত ও বণ্টিত হয়। বাড়িটি তারপর থেকে জনহীন। দরজা জানালার স্মৃতিরূপী মৃৎ-ক্ষতগুলিন কুরুচিপূর্ণ দৃশ্য, বীভৎস ঠেকে পান্নারও চোখে এবং বাড়িটিকে সেকারণে ধূলিসাৎ করার কথাও ভেবেছিল, অথচ করগেটশিটের সুদৃঢ় চাল ও আদালত সম্ভাব্য বাধা। পেছনে ঘনসংবদ্ধ সংক্ষিপ্ত বাঁশবন নিয়ে এই জনহীন কদর্য বাড়ি তার অতি সন্নিকটে পাতা ফাঁদ, নৃশংস জানমারি বোঝেনি। তার দৃষ্টি ছিল সাইকেলের হ্যান্ডেলের কেন্দ্রে। এই সময় মৃৎ-ক্ষতাকীর্ণ ফোকর গলিয়ে কয়েকটি দ্বিপদ জীব নির্গত হয় এবং ভয়ংকর শব্দটি তার কানের পর্দা ফাটায়।

প্রথম বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল, যার আওয়াজ খাদেমুন্নিসাকে বাৎসল্য থেকে নিমেষে ধাক্কায় ভিন্ন ঘটনামুখিনী করে। তিনি পান্নাকে গতিশীল বস্তু দেখলেন। বাইরের খলিয়ানে তখন অনাথ ও আনুভূতিক দশায় দুটি চকচকে চাকা ধীরে ঘুরছিল, রোদে চিকচিকে দুষ্টহাস্য নির্মম ঝিলিক দিচ্ছিল এবং ওই ঘূর্ণনের সঙ্গে পান্নার প্রাণের সম্পর্ক ততক্ষণে স্থাপিত হয়ে গেছে। পান্না তার ঘরে ঢুকে তক্তাপোষের তলায় ছোট চটের থলেটি খুঁজছিল। বারান্দায় দোলনার কাছে থামের গায়ে স্তব্ধ মাতৃমূর্তি। তখন জানমারিদের ছোট্ট দলটি, এটাই আশ্চর্য, নির্ভীক পরাক্রমে বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। তক্তাপোষের তলা থেকে ব্যর্থ ও অবাক পান্নার শেষতম গর্জন-মিশ্রিত হাহাকার শোনা যায়, 'কে সরালে?' তারপর তাকে শেষবারের মত সজীব শরীর রূপে বারান্দা থেকে লাফ দিতে দেখা গেল। এটাই সম্ভব যে, সে প্রয়াত মুসল্লি পিতার ঘরের ভেতর পূর্বপুরুষের তলোয়ারটির দিকে খড়কুটো-আশায় ধাবিত হচ্ছিল। প্রথম আঘাতটি সুর্তি অর্থাৎ ভল্লের। দ্বিতীয়টি ভোজালির। তৃতীয় ও মোক্ষমটি পূর্ববঙ্গীয় সংযোজন 'দাও'-এর। পান্না নির্জীব রক্ত-মাংসে পরিণত হল। তবে রক্তের উচ্ছ্বাস ও প্রগলভ ব্যাপ্তি চোখে পড়ার মত ছিল।

সেই দুপুরে শরৎকালের গ্রামীণ অবকাশ-ঐতিহ্যও একটি কারণ, ডাঙ্গাপাড়া অপ্রস্তুত ছিল এবং কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে পান্না একটি লোহার বাসরঘর, তাই এ সম্ভাবনা অকল্পনীয় ছিল। আওয়াজটিরও প্রচলিত অর্থ হয়। পান্না মাঝেমাঝে তার কৃৎকৌশল নিয়ে খলিয়ানে কি রাস্তায় এক্সপেরিমেন্ট করে। তাই আওয়াজটি গুরুত্বহীন গণ্য হয়েছিল।

খলিয়ানে সাইকেলের চাকার ঘূর্ণি যে-মুহূর্তে কমে, সেই মুহূর্তে পান্নারও শ্বাসক্রিয়া থেমে যায়।

কিন্তু ঘাতক দলটি এমন এক চূড়ান্ত সাফল্যেও এমনই আতঙ্কিত যে তারা নিজামের পোড়োবাড়ির ফোকর গলিয়ে পালানোর আগে এবং পরে সেই শূন্য বাড়িটির ভেতর, এমন কী, বাঁশবনেও বোমা ফাটাতে ফাটাতে যায়। তখন পাড়াটি অবকাশের পাছায় লাথি মারে।

একটু পরে সশস্ত্র ভিড়টির সামনে খাদেমুন্নিসা সজ্ঞান কি নির্জ্ঞানে ভাঙ্গা গলায় শুধু এই প্রতিধ্বনি করলেন, 'কে সরালে...'

সম্ভবত ভীরুতারই গর্জন বেশি এবং শরৎকালীন সুচিক্কন সবুজতা ছ্যারাভ্যারা হয়েছিল যূথবদ্ধ বাঁশবনে, যেখানে ডাবল এজেন্টের সেই ছাগলটি খুঁটি উপড়ে পালিয়ে এসে মারা পড়ে। প্রাণীটি ছিল আসন্নপ্রসবা। তার উল্লাসিত স্বভাব এবং চাঞ্চল্যে বিব্রত কাজিরুন তাকে খুঁটিবদ্ধ করত। অনর্গল বকাবকি করত, 'দুনিয়ার ঘাসপাতা মুখে রুচে না রি...বেহেশতে যেঞে এত খুদার মাঠে ঘাসপাতা খাবে

বারভাতারি...বেশ্যামাগী...থাকত শেয়ালগুলিন...।' এ নিয়ে চোইতপাগলা সোনারুর সঙ্গে কাজিরুনের একদা দেখার মত কাজিয়া বাধে। পাড়াকুঁদুলিটিকে শুধু সোনারুই জব্দ করতে পেরেছিল, জিভ বের করে এবং ক্রমাগত দুই হাতের আঙুলে মৈথুনমুদ্রা প্রয়োগে—ফলে কাজিরুন বেওয়া বুকফাটা হাহাকার করেছিল। আহা, সে যৌবন-পরিত্যক্তা!

এই ঘটনা পরে সোনারুকে স্বভাব-খোকামিবশে সুযোগ পেলেই ছাগলটির খুঁটি ওপড়াতে প্ররোচিত করত। নালার সাঁকো থেকে সেদিন দুপুরে চুনি উদ্দেশ্যহীন চলে গেলে সোনারুও চির উদ্দেশ্যহীন পা বাড়ায়, ভিন্নমুখে। গম্ভুর আলির পোড়া বাড়ির পাশে কাজিরুনের ছাগলটি দেখামাত্র কনডিশনড রিফ্লেকস ঘটে। সে গুঁড়ি মেরে আদাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে খুঁটি উপড়ে দেয়। কিন্তু ছাগলটি ঘাসে মন দিয়েছিল। তখন সোনারু চার ঠেঙে জন্তু হয়ে তাকে ভয় দেখাতে থাকে, অতীতের শেয়ালের প্রতিভাস। নির্বোধ ছাগল অগত্যা পালাতে থাকে এবং বাঁশবনে তার গলার দড়ি আটকে গিয়েছিল।

ডাবল এজেন্ট যখন দরগাতলার নোম্যানসল্যান্ডের যুদ্ধদৃশ্য উপভোগ করছিল নিরাপদ দূরত্বে, তখনও ঘটনাটি জানত না। দুদিক থেকে নিক্ষিপ্ত বোমা যুদ্ধক্ষেত্রটি ধোঁয়ায় ধূসর করেছিল। পাইপগান ও পিস্তলের গুলি, ইটপাটকেল, তীর প্রতিবারই লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিল। তবে একটি তীর অতর্কিতে নামুপাড়ার এক কৌতূহলী নববধূর দক্ষিণ স্তন আড়াআড়ি ভেদ করে, এইমাত্র।

কিন্তু গ্রামীণ ঐতিহ্যগত সম্মুখ যুদ্ধগুলিন এরকমই, ক্রমশ দুপক্ষই ক্লান্ত হয়। ধীরে কমে আসে ক্ষেপণাস্ত্রগুলিন। প্রকৃত যুদ্ধ গেরিলা-আমবুশ এবং সুফলদায়ী। থানার চারজন লাঠিবাজ, দুজন বন্দুকবাজ সেপাই নিয়ে জমাদারবাবু বলেন্দ্রনাথ অকুস্থলে পৌঁছে শুধু একটি বিরক্ত নেড়ি কুকুরের ধমক খান। অ্যাবাউটটার্ন করে আইনরক্ষক দলটি পান্নার লাস দেখতে ফেরেন।

এদিকে ছাগলেব দড়ি যথেষ্ট লম্বা থাকায় কাজিরুন সূর্যাস্তের একটু আগে ঘাস-জমিটিতে যায়। তাকে দেখতে পায় না। সে প্রথমে চিলচেঁচানিতে বলতে থাকে, 'বেহেশতে খুদারমাঠে গেলি রি হারামজাদি...তোর মুখে একশ দুরমুস না মারি তো...হাতির জোর...মাগীর মুখে...' এবং শেষে সোনারুকে মনে পড়ায় দুরমুসটি নাড়তে থাকে, সে সোনারুর কবরবাসী স্বজনবর্গের আত্মাগুলিনকে প্রহার করছিল। দুরমুসটিকে দিনের শেষে গোলাপি আলোয় সত্যিই রক্তাক্ত দেখাচ্ছিল। ঠিক এই সময় কাজিরুনের দেবরকন্যা ফুলকুঁড়িব মুখে আর্ত খবর হয়, 'নিজুর বাঁশের ঝাড়ে তুমার ছাগল চাচি, ছ্যারাভ্যারা!' সে 'ছিন্নভিন্ন' বলতেও পারত, কারণ সে চাষী পরিবারে একটি প্রতিভা, ক্লাস নাইনের ছাত্রী এবং ফার্স্ট হয়। কিন্তু কাজিরুন তাকে 'পঢ়াউলি পুণ্ডিত' বলে বিদ্রূপ করেছিল একদা, স্মরণে ছিল।

বাঁশবনে অন্ধকার পর্যন্ত বিলাপশেষে কাজিরুন কবরঠেলে বেরুনো মৃতের ভঙ্গিতে ধীরে বাড়ি ফেরে। তাকে পরিস্থিতির দরুন সান্ত্বনা দিতে কেউ ছিল না। অথচ সে সান্ত্বনা চাইছিল। কারণ সে ততক্ষণে অনুতপ্ত, খোদার প্রতি ভয় পাওয়া এক মানবাত্মা। ছাগলটি ছিল রোজগেরে প্রাণী। মহাকাশে খোদার রাগী চেহারা কাজিরুনবিবি অনুমান করছিল। অথচ সে ডাবল এজেন্ট, নামুপাড়ার হাজিবাড়ি থেকে কিছু পুরস্কারের প্রত্যাশাও ছিল, যার পরিমাণ ছাগলটির অপ্রসবিত ছানাগুলিনের দাম সহ কত হওয়া উচিত, এ প্রশ্নও ছিল। অথচ ডাবল এজেন্টের স্বভাববশে সে পান্নাদের বাড়ি গেল। আর পান্নার শেষতম কাতব চিৎকার 'কে সরালে', যা বিলাপ-বিকারে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল খাদেমুন্নিসার জননীমুখে, রোদনভরা ধূর্ততায় কাজিরুন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যাসহ সদুত্তর দিল।

তখন খাদেমুন্নিসা ফ্যাঁসফেঁসে গলায় প্রার্থনার সুরে বলে উঠলেন, 'তলোয়ারখান এনে হাতে দ্যাও কেউ, হারামজাদিকে কাটি।' হারামজাদিটি ধারে-কাছে ছিল না।

সে তৎকালে ছোটনের প্রমোদকালের বারান্দায় পাথর-প্রতিমা বসে ছিল। সেদিকে সুরম্য উদ্যান। সবে ঝলমলে চাঁদটি উঠল, অথচ উদ্যানে বিদ্যুতের আলো। সৌন্দর্যবোধ অথবা গোপনতাহেতু এক মুহূর্তে চুনির ধারণা হয়, চাঁদটি দু'হাত ভরে জ্যোৎস্না দিতে ব্যগ্র, কিন্তু এ বাড়ি নেবে না। কদর্যতা এমন চোখে চুনি দেখেনি কখনও। সে বোঝে, এ বাড়ির এতকিছু আছে, সে কারুর কিছু নেবে না, বরং

দেবে। কদর্যতা ছাড়া কী দেবে? সে ভাবছিল। তাহলে কি এ বাড়িই পান্নাকে মৃত্যু দিল? মৃত্যু দিয়েছিল মতিকে? মৃত্যু দিয়েছিল তাদের বাপজিকেও? এতগুলিন কদর্যতা!

ছোটনের বউ স্মিতা এসে অবাক হয়ে বলল, 'এ কী! তুমি একা এখানে বসে আছ? অমন করে নিচে বসে আছ কেন?...কী? বাড়ি যাবে? রবিকে সঙ্গে দেব? বরং রিকশ করে..'

চুনি আস্তে বলল, 'ছোটনদাদা আসুক।' ছোটনকে শাস্তির একটি নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা দিতে প্রতীক্ষা করছিল সে।...

দুই

পান্নার দোমড়ানো চাপ চাপ রক্ত-সজ্জা দেখে সোনারু স্ত্রীলোকদের কান্না কেঁদেছিল। প্রতিটি জানমারি তাকে এভাবে কাঁদায়। কিন্তু পুরুষ লোকের অশোভন স্ত্রীলোক-ক্রন্দন শোককে অশালীন করায় প্রতিবারই সে ঘাড় ধাক্কা খায়।

সে মহকুমা শহরের দিকে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি ও পুলিশের জিপ অনুসরণেরও ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। এবারকার শোকটি তার কাছে 'কারবালার লোহু গো...ফোরাত নদী (ইউফ্রেটিস) লাল হঞে যেল...হায় হোসেন হায় হোসেন' বিলাপে ব্যক্ত হয়। কারণ সে সৌন্দর্য বোঝে। পান্নার দেহে হেলেনীয় ভাস্কর্য ছিল—নিরক্ষর বাঙালি চৌইত-পাগলার মানবচৈতন্যে এই বৈদেশিক ক্লাসিক বোধ না থাকার কথা। অথচ তার নির্জ্ঞানে প্রকৃতিচারিতার এই অবদান, কিংবা ঠাকুরগড়া জগামেকদারের রূপ-নির্মাণগুলিন নিরন্তর খুঁটিয়ে দেখার ফল। সে সৌন্দর্যের সঙ্গে শক্তির সম্পর্কও বুঝে থাকবে। একদা সে পান্নাকে বলে, 'তু যদি ইচ্ছা করিস বাপ, জানমারি বন্ধ হয়। শুধু হাওয়ার গায়ে এককলম লেখে দে, জানমারি বন্ধ।' পান্না শুনে কেমন হাসে। মনে পড়েছিল, হাসিখানি অসহায়। তাই তার এত অবুঝ ক্রন্দন দিনশেষে, মানুষজন বোঝেনি।

দিনশেষে দরগাতলার নোম্যানসল্যান্ডে জনহীন সুনসান রণক্ষেত্রে সোনারু কারবালা যুদ্ধের মর্সিয়া (শোকসঙ্গীত) গাইতে গেল। অমনি কতিপয় আইনরক্ষকের টর্চের আলো তাকে ঝলসে দিল এবং আইনের হুংকার তাকে তাড়া করল। দিশেহারা সোনারু অন্ধকার ধানক্ষেত ভেঙ্গে জলকাদায় ভূতটি হয়ে হাইওয়েতে পৌঁছুল। তখন তার স্মরণ হল আইন-রুটিনটির কথা। বরাবর এই রুটিন। অথচ আজ এত কারবালা-শোক কিছু মনে পড়তে দেয়নি।

হাইওয়েতে উত্তরমুখী হাঁটতে হাঁটতে সে অবাক হচ্ছিল, অন্য সময়ে জগা মেকদারের তৈরি খড়বাঁশের কায়াগুলিনের দশাপ্রাপ্ত আইন রক্ষকেরা এই সকল সময়ে মাটি-রঙ-ত্যালঘাম (পালিশ) প্রাপ্ত হয়, 'ইটো বিষম গুহ্যকথা'। কিন্তু সেও নয়, তারা ঘটনার পরে মারমূর্তি হয়ে ওঠে—কেন? বহু বছর আগে নবীন চৌকিদার অন্ধকার রাতে তাকে দেখে হুংকার দেয়, 'এখন ডিবটিতে আছি।' ডিবটির সঙ্গে আইনের হুংকার জড়িত। তাহলে কি 'ডিবটি' যখন থাকে না, তখন আইনও থাকে না? বিদ্যুৎ বিভাসিত দিকে যেতে যেতে সোনারু বুঝল, আইন যখন থাকে না, সেই সব সময়ে জানমারি প্রাকৃতিক স্বাধীনতারই পরিণাম, বৃক্ষলতা প্রাণীসকল যে-স্বাধীনতা পায়।

নালার সাঁকোয় দাঁড়িয়ে সোনারু পূর্বমুখী হওয়া মাত্র ঈষৎ তোবড়ানো চাঁদটি দেখল এবং তাকেই অবুঝ মর্সিয়া শোনাতে থাকল ক্ষীণ সুরে। 'ও কী হায় গো/খালি পিঠে আইলো দুলদুল/সওয়ারি কুথাঞ গো...' চৌইত-পাগলার এই শোকগীতিতে মানবাত্মার হাহাকার ছিল। কিন্তু ডিউটিরত আইন রক্ষকদের হুংকারের অনুরূপ হুংকার ও টর্চ ঝলসানি তাকে থামিয়ে দিল। সাঁকোর ওপর কয়েকটি ছায়ামূর্তি 'অ্যাই চৌইত পাগলা! চুনিলেংড়িকে দেখেছিস' বলতে বলতে তাকে বৃত্তাকারে ঘিরল।

প্রশ্নটি ভাকার, প্রকৃত নাম আবু বাক্কার, সে পান্নার প্রধান চেলা। সোনারুর কাছে শোক ও আমোদের কোনও সীমান্ত না থাকায় সে খি খি করে হেসে উচ্চারণ করল, 'ভালা মজা।' অর্থাৎ ভাল মজা।

কিন্তু দলটি চুনিকে টুঁড়ে বেড়াচ্ছিল। ফলে রাগী। 'থাপুড়ে হাগিয়ে দুবো...শালা ভালা মজা...মজার আল মেরে...' বলার পর অন্বেষণের ইচ্ছায় কথাবার্তা নিরপেক্ষ হল। 'সবঠেঞে ঘুরিস। দেখেছিস ছুঁড়িকে?'

সোনারু অনুচ্চস্বরে ফের 'ভালা মজা' বলে, যেহেতু কথাটি তার কাছে মুহূর্তে বিরাট কথার দরজা খুলে দিয়েছিল। কিন্তু এবার কথাটির অর্থ ছিল 'কী আশ্চর্য, সে কেমন করে জানবে', তৃতীয় পুরুষ বাচ্যে গাঢ় স্বরে বলল, 'দুফোরবেলাতে ওই ঠেঞে ছিল। ক্যানে বাবাসকল?' সে অর্জুন গাছটির দিকে তর্জনী রেখে উত্তর প্রার্থনা করছিল।

দলটির ভেতর হিংসায় বেহুঁশ, কনিষ্ঠ, বারু বলল, 'শালী লেংড়ি আজ বেদেনি হএঞছিল...তাই তাতে ধরিন খরিস মারা কল্লে...ছাতি ফেটেঞে যায় হে! বিষদাঁত ভাঙ্গা খরিস ফিনিস হল হে...সহা যায় না।'

তারা চলে গেলে প্রকৃতিচর দুই চোখ তাদের সশস্ত্র বুঝল এবং বারুর কথাগুলিনের বাস্তবতাও তন্নতন্ন বুঝতে চাইল। তার নিমেষে, তৎক্ষণে বহুল প্রচারিত পান্নার শেষ আর্ত নিষ্ঠুর চিৎকার 'কে সরালে', অর্থপূর্ণ হল চোইত পাগলার কাছে। সে কৃষ্ণপক্ষের দেরি-করে-আসা চাঁদটির দিকে ঘুরে চাপা স্বরে বলে উঠল, 'আবার জানমারি!' সে আজীবন দুঃখকষ্টে জেনেছে, খোদা তাঁর তৈরি জিনিসগুলিনের এত আড়ালে ক্রমে ক্রমে সরে গেছেন যে, অতীতের কুমোরবুড়ি শৈলবালা যেভাবে হাঁড়িকুড়ির আড়ালে কোণঠাসা বসে থাকত, সেই অবস্থা তার। ফলে সৃষ্ট জিনিসগুলিন না ভাঙচুর করে বেরুতে পারছেন না। ভুমস্‌ডে বা রোজকেয়ামতের এই ব্যাখ্যাই একদা সোনারু মৌলবিসায়েবকে দিতে গিয়ে পয়জার খাওয়ার উপক্রম। এ মুহূর্তে চাঁদটির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে তার মনে হল, চাঁদটি খোদার তৈরি জিনিস এবং কোনও জিনিস ও তার নির্মাতা এক নয়। মাটির হাঁড়িগুলিনের সঙ্গে কথা বললে শৈলবালার সঙ্গে কথা বলা হয় না। সে চাঁদটির উদ্দেশে থু থু ছুড়ল। এবং কী তিড়িং-বিড়িং লাফালাফি করে এবং কাজিরুনের সঙ্গে ঝগড়ার ভঙ্গিতেই অনবরত দুই হাতের আঙুলের সাহায্যে মৈথুনমুদ্রা প্রয়োগ করে চাঁদটিকে প্রচণ্ড হেনস্তা করল। শেষে ক্লান্ত হয়ে বলল, 'শালা...কাগজপড়া বাবুদের ঠেঞে শুনেছিলাম ঠিকই...পেত্যয় হয়নি গো! এখুন পেত্যয় হয়। ...এ জন্যেই সাহেবরা শালার গায়ে যেঞে মুতেছিল গো! হরিপদ বোষ্টম সেও এক শালার ব্যাটা শালা...বুলেছিল, সে-চাঁদ কি ই-চাঁদ? ...বোষ্টম কানা গো! দুসরা চাঁদ কি তোর (অশ্লীল শব্দ)-এর ভিতরে?' সোনারু শরৎকালীন রঙচঙে বাবু-চাঁদটির দিকে তাক করে খ্যাপা-খ্যাপ্ত মূত্রত্যাগ করতে থাকল।

চাঁদটি বুঝি হাসছিল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণহেতু সে গ্রাম-ভারতে এখনও নিরাপদ বলেও নয়, জীবনে সোনারুর নিল আর্মস্ট্রং হওয়া সম্ভব নয় বলেই। এমত সময়ে মানিক হাওলাদারের বাড়ির দাওয়ায় বসে চুনিও চাঁদটিকে দেখছিল, চন্দ্রাহতা বলা চলে। ইংরেজিতে 'লুনাটিক' বিস্তর দুঃখকর অভিজ্ঞতাজাত, সে এক মিথ ও তত্ত্বকথা। কিন্তু বাস্তবিকই চুনি তৎকালে নিজেকে পাগল ভাবছিল। নেতাজি কলোনির রিকশা চালকটি তখনও বাজারে এবং তার বউ সন্ধ্যারানী চুনিকে মুড়ি-নাড়ু খাওয়ানোর জন্য সাধাসাধি করেছিল। বাড়িটি বিদ্যুৎহীন। হেরিকেনের আলোয় মঙ্গলকাব্যের চিত্রপট ওই বাড়িতে দারিদ্র্যকে দারিদ্র্য মনে হয় না, জ্যোৎস্না বরং চিত্রপটটিকে বহুমাত্রিক গ্রামীণ সনাতন সৌন্দর্য দিয়েছিল। সন্ধ্যারানীর ছানাগুলিন বৃত্তাকারে বসে লেখাপড়া করছিল। সন্ধ্যারানী বলছিল, 'আর ভাবিয়্যা কী হইব বোনটি? ভাবনেই কষ্ট। ...ফেরান যাইব না...' তারপর জননীহাস্যে, 'কী দ্যাখস খালি অমন করিয়্যা?' চুনি ভাবছিল, সে নিজেকে পাগল করতে পারছে না কেন? সে নিষ্পলক চাঁদ দেখছিল। একটু পরে রিকশ চালিয়ে মানিক ফিরল এবং রিকশাটি অনর্গল বাড়ির ঝকঝকে উঠোনে থামিয়ে চুনিকে দেখতে পেল। তার প্রথম বাক্যটিই 'পলাও! পলাইয়া যাও!' তার বউকে চমকে দিয়েছিল। আচম্বিত আক্রোশে সে আগুনচোখে স্বামীর কাছে দাবি করল, 'ক্যান?'

রিকশ চালক তার বউয়ের প্রশ্নের জবাব দিল ঈষৎ ঘুরে-থাকা চুনিকে, জ্যোৎস্নাপূর্ণ দুটি চোখকেই, 'তুমারে কাটিয়্যা ফ্যালাইব...টুঁড়ে...অগো হাতে কীসব দ্যাখলাম য্যান, ভাকা বাবলু বারু...' শ্বাস-প্রশ্বাসময় বাক্য শেষ করল সে, 'তুমি পান্নারে ফিনিস করতে দিছ অগো।' চুনি নিঃশব্দ ও কবিতাহাঁটা হেঁটে যেতে থাকলে কিছু পরে মানিক তার পরকে আপন করা বউকে বলেছিল, 'পারতাম। কলোনিতে মোছলমানগো কী ক্ষ্যামতা...কিন্তু ছুটনবাবু অগো লিডার। ব্যাবাক কলোনি ছুটনবাবুর সাপোর্টার,

ভাবিয়্যা দ্যাখো...' তখন সন্ধ্যারানী চন্দ্রালোকে যামিনী রায়ের অঙ্কিত পটলচক্ষু বাংলার বধূ, যদিও সঙ্কুচিত ঠোঁটে কাতর স্নেহ ছটফট করছিল। সে অবশেষে 'রিকশা' বলেই থেমে যায়।

সাঁকোর নিশাচরটির চোখে চুনি ধরা পড়ামাত্র আর্তস্বর ছুটে গেল, 'বিটি রি! তোর জানমারি হবে!'

সেখানে খাবলা-খাবলা স্তূপাকার জ্যোৎস্না ও আঁধার ছিল। প্রথমে চুনির ধারণা হয়, হরিণ ও বাঘ মুখোমুখি, কিন্তু মুহূর্তে স্মরণ হয়েছিল 'বিটি রি' এবং নিজের জানমারির সম্ভাবনা। ফলে সে পাথরফাটা কাঁদল। এই কান্না যথাযথ। সোনারু দুপুরে আবহমণ্ডলে ইস্তাহার লিখেছিল 'জানমারি বন্ধ', চুনিও তাই চেয়েছিল। সুতরাং তারা চুক্তিবদ্ধ। আর চুক্তিবদ্ধতাহেতু সোনারু চুনিকে পিঠ দিল, চুনি নিল। এমন কী, সোনারুর ঘাড়ের এধারে দুই হাত আঁকড়ানোর সময় তার মনে হল, শান্তির উৎসটিকে, লোমেঢাকা একটি শীর্ণ বুক যা, স্পর্শ করেছে সে।

পবিত্র কারুকার্যখোদিত লাঠিটি সোনারুর হাতে। ঝোপঝাড়গুলিন ততক্ষণে শিশিরভেজা। ধানক্ষেতের আলে পৌঁছে বাহক একবার বলল, 'শালা লিওর।' লিওর নীহার, আলকে পিচ্ছিল করেছিল। তাই লাঠিটি কাজের জিনিস, কিন্তু কতটা কাজের জিনিস এই প্রথম সোনারুর জানা হল। তারা কোথায় যাচ্ছিল এভাবে, দু'জনেরই খেয়াল হয়নি। ডাঙ্গাপাড়ার পুবের মাঠে খোলা ব্যাপকতায় চাঁদ অঝোরে স্নান করছিল। শুধু একবার মুখ তুলে চুনির মনে হয়েছিল বিদ্যুতের মধ্যে চাঁদটি তারগুলিনে জড়িয়ে গেছে, পরে মুক্ত দেখল। চাঁদটির গা ধোয়া ধারায় দুটি মানুষ ক্রমশ কোমলতর হচ্ছিল। কিছু দূর গিয়ে সোনারুর সন্দেহ হল, তার চুড়োবাঁধা চুলের নিচে অতিরিক্ত কোমলতা, বিটিটির থুতনির চাপ, সে ভারবাহী শ্রমের মধ্যে উচ্চারণ করল, 'ভালা মজা!—ওরি, তু কাঁদছিস!'

তখন চুনি বলল, 'আমি বাড়ি যাব না, চাচা! এমন করে কুথাঞে লিয়ে যাও, ভাবি গো!'

সোনারু একদা শ্রেষ্ঠ মোটবাহক ছিল। সে প্রাক-যোজনাকালে নামুপাড়ার শ্রেষ্ঠ ওজনদার পুরুষ হাজি সুইদুরকেও পাঁক পার করেছিল এবং এখনও ছোটখাট মোটঘাট হাটেবাজারে মওকা পেলে ছাড়ে না, রোজগেরে ধান্দা। তার কাছে এই বিটিছেলেটি মোটেও দুর্বহ নয়, বস্তুত একটি বাছুর (সোনারু বাছুর বহনও করেছে কোনও-কোনও কালে)। অথচ ঘাড়ের অতিরিক্ত কোমলতা ও ওই বাক্যগুলিন কুইন্টাল-ভার বোধ হল। সে থমকে দাঁড়াল এমন ভঙ্গিতে, যেন সে মুক্ত হবে। কিন্তু বলল, 'ভালা মজা!'

চুনি হিঁপিয়ে সুরে বলল, 'জানমারিদের বাড়ি আমি যাব না গো! উয়ারা সব্বাই জানমারি গো! ...জানমারিদের ঘরে গেলে সব্বাই জানমাবি হয়।' সে এবার মুসহরদের সাতনলবিদ্ধ বিহঙ্গিনীবৎ বৃক্ষচ্যুত হওয়ার উপক্রম করলে পিঠে লাঠির বাঁধন পড়ল, সোনারু তার লাঠি পিছিয়ে কোমর বরাবর রেখে পতন রুখেছিল।

সোনারু হাসছিল। 'তাইলে তোকে কুথাঞে থুই বিটি রি? পিঠে থুঞি, তো বাণ বিঁধে। মাথায় থুঞি তো উকুনে বিঁধে, চোইত পাগলার চুল যিগো! ...আর বিটি, তোকে মাঠে থুঞি তো লিওরে পচায়। কুথাঞে থুই তু বোল মা-জননী?' সে আসমানে মুখ তুলে ঘোষণা করল, 'সকলঠেঞে জানমারি গো! খুদা দ্যাখে না...দেখার রাস্তা বন্ধ। না হলে তোকে খুদার ঠেঞে থুঞিন...'

সে থেমে গেল। কারণ এই কথার অনুষঙ্গে মসজিদ ঘরটি স্মরণ হয়েছিল। সকল মুসলমান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র কানে খোদা-ও তাঁর মর্ত্য-প্রতিনিধির বীজমন্ত্র নাম শোনে, এবং ক্রমাগত যত বাঁচে, তত তার মানবচৈতন্যে প্রথমশ্রুত বীজমন্ত্র তারবাদ্যের দূরপ্রসারী অনুরণনবৎ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আর মৃত্যুর মুহূর্তে বিস্ময়করভাবে সেই বীজমন্ত্র ফিরে আসে, ফের কানে তা প্রবেশ করে, যেন সেটি মর্মে মুদ্রিত নিঃশব্দ হরফগুলিনের আকার হয়ে কবরে যাবে, মহাপ্রলয়ের দিনে পুনরুজ্জীবনের কালে সেটিই তার আইডেন্টিটিকার্ড। সোনারুর মধ্যে এই চৈতন্য আছে, সে যদিও সম্যক টের পায় না। সে তৎক্ষণাৎ উল্লাসে 'ইঃ' শব্দ করেছিল। তার মুসলমান-চৈতন্যের ঝিলিক শব্দটিতে ছিল। মুসলমান লোকের কাছে মসজিদ ঘর স্যাংচুয়ারি। আর চুনিও তার আধা-হাজি নানার মুখে শুনেছিল, 'পাক কাবাশরিফের চৌহদ্দিতে লোহু মানা...একটুকুন লোহু সেঠেঞে দেখলে খুদা গোঁসা হন। চুনি, ইও জানবি দুনিয়ার তাবৎ মসজিদ কীরকম কীঃ কাবা আসল, বাকিগুলিন তার নকল।' উপমা দিয়ে

গরিবুদ্দিন বুঝিয়েছিলেন, 'কায়া আর ছেঁএ্রা যেমুন।' তত শিক্ষিত হলে গরিবুদ্দিন 'প্রতীক' শব্দটি বলতেন। এই মুহূর্তে মসজিদের স্যাংচুয়ারি গুণটি চোইত পাগলা এবং লেংড়ি-ভেংড়ি ছুঁড়ি উভয়ে মুসলমান চৈতন্যক্রমে আবিষ্কার করল। বিপদসঙ্কুল এই রাত্রে একটি মসজিদ দুর্ভেদ্য ব্যূহ গণ্য হয়েছিল।

বিবদমান দুটি পাড়ায় স্বাভাবিকভাবেই দুটি মসজিদ। দু'দল মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঈশ্বরের দুটি ঘরের স্থাপত্যাদি কৃৎকর্ম ও শৈলীতে প্রতিফলিত। একটিতে মিনার নির্মিত হলে অপরটিতেও হয় এবং চারটি করে মাইক স্থাপিত হয়, যাতে বাজারের 'জয় মাকালী ইলেকট্রনিক স্টোর্স' লাভবান হয়েছিল। ক'মাস আগে নামু পাড়ার মসজিদের মিনারে সউদি আরব থেকে আমদানিকৃত 'আজান'-এর টেপ ব্যবহার করায় মৌলবি নাসিরুদ্দিন শাস্ত্র খুলে প্রমাণ করেন, এ কাজ অশাস্ত্রীয়, তা ওই প্রার্থনার আহ্বান যতই সুললিত ও মধুর হোক না কেন। তবে তাঁর কণ্ঠস্বর ও গীতধ্বনিময় এবং তিনি টেপের আজানধ্বনিকে দক্ষতায় পরাজিত করতে পারেন। এ তো ঠিকই, মুসলমান মানুষ মুসলমান মানুষ সকলকে প্রার্থনায় ডাকবে, যন্ত্রের সেই অধিকার নেই। আরও বিশেষ কথা, এসব যন্ত্র 'ওই ফেরেববাজ, নাফরমান ইসলামের চির দুশমন ইহুদি-নাছারা (খ্রিস্টান)-দের তৈয়ারি', মৌলবি নাসিরুদ্দিন বলেছিলেন, তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি, 'ওরা মুসলমান-মুসলমানে কাজিয়া-দাঙ্গা বাধাচ্ছে, ইরান-ইরাকে লড়াই...হারামজাদ ইসরায়েল ফিলিস্তানি মুসলমান ভাইদের আউস্ট্ করল', এবং তিনি চাঁদা তুলে কলকাতা থেকে আসা এক পি এল ও প্রতিনিধির হাতে টাকা দেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশে ডাঙ্গাপাড়াও কিছু দিত-থুত, কিন্তু পান্না বাধা দেয়। আরব্যপোশাক পরা প্রতিনিধি এবং তাঁর সহকারী ভারতীয় দলটিকে ভাগিয়ে ছাড়ে। পান্না, নিষ্ঠুর জানমারি সে, বলেছিল ছড়া কেটে, 'শালা! লঙ্কাধামে রাবণ মলো/বেইলো কেঁদে রাঁড়ি হল! ...গরিব মানুষগুলিনকে দেখতে পাস না...' এই উক্তি বা মনোভাবে প্রাক্তন নকশালপন্থী ছোটনের প্রভাব ছিল। এলাকার গরিবগুলিনের প্রতি ছোটনের এই ভাবধারা ও প্রক্রিয়া এখনও বহাল, ফলে অবশ্য তার বাবা বিপুল ভোটে জেতেন এবং অরু সিংয়ের জামানত জব্দ হয়।

এ রাত্রের নামাজে জনাদুই নির্দল এবং জরোদ্গব বুড়ো ছাড়া কেউ আসেনি। ডাঙ্গাপাড়া জুড়ে ছমছম করছিল কারবালা-স্তব্ধতা। মৌলবি আলিমুদ্দিন একা এবং হৃষ্টচিত্ত, শয়তানকবলিত যুবকটিকে খোদা তাঁর কৌশল অনুসারে ভিন্ন হাতে সাজা দিয়েছেন ভেবে। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে শাস্ত্র পাঠ করছিলেন মসজিদ-সংলগ্ন তাঁর ঘরে, তক্তাপোষে। চল্লিশ ওয়াটের বালব থেকে বিদ্যুৎ আলো দিচ্ছিল। তাঁর শাস্ত্র বাক্য-ধ্বনিতে হৃষ্টতা ছিল, অথচ পরিস্থিতি সেটা 'মর্সিয়া'-গাথা প্রতিপন্ন করছিল। ফলে সোনারু চোখে জল নিয়ে খুব আস্তে বলেছিল, 'আহা।'

নিচু পাঁচিলঘেরা মসজিদ প্রাঙ্গণে খট খট মৃদু শব্দ শুনে মৌলবি সাহেবের মনের প্রহরী ভাবে, গোয়ালছুট গরু ঢুকেছে। ফটকটি ঘড়ি, মাইক যন্ত্রাদি চুরি যাওয়ার ভয়ে বন্ধই রাখা হয়, এমন কী মসজিদের দরজাও তালাবদ্ধ থাকে—যা শাস্ত্রীয়র নীতিবিরোধী, কারণ 'প্রার্থনাগৃহ সদা খোলা থাকবে' এটাই পবিত্র নির্দেশ। কিন্তু পয়গম্বর-কথিত 'আখেরি জমানা' পৃথিবীর শেষ যুগে সকল সিধে উল্টো হয়ে যাওয়ার লক্ষণ প্রকট, সুতরাং পয়গম্বর নিজেই বলে গেছেন, পবিত্র কেতাব এবং তাঁর অনুসৃত নীতির আওতা বহির্ভূত জিনিসগুলিনে মানব বিবেকের নির্দেশই পালনীয় এবং সেই বিবেকবশে প্রার্থনাকক্ষে তালা। ফটকও বন্ধ থাকে। আলিমুদ্দিনের মনে হল, ফটক বন্ধ করতে ভুলেই গেছেন। অথচ তা ঠিক নয়। ফটকে আগড় ছিল। সোনারু নিচু পাঁচিল ডিঙিয়ে খুলে দিয়েছিল, শব্দহীন চতুরালিতে।

আলিমুদ্দিন বর্গাকৃতি প্রাঙ্গণে লেংড়ি মেয়েটিকে দেখেই বুঝেছিলেন, তিনি বিপন্ন। কেন না চুনি স্যাংচুয়ারিতে এসেছে। কিন্তু, মনে মনে তিনি বললেন, 'ওরে নাদান লেড়কি! আখেরি জমানায় সিধেগুলিন উল্টো হয়েছে। মক্কার পাক মসজিদ কাবাশরিফেই এই জমানায় লোহু গিরল, বন্দুকবাজি হল, তো এই ডাঙ্গাপাড়ার মসজিদ!' তাঁর মুখে কথা আসছিল না। বিদ্যুতের ছড়াছড়ি প্রাঙ্গণে। চুনি থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। এত উজ্জ্বল আলোয় স্যাংচুয়ারিতে ঢুকে পড়া অশাস্ত্রীয় অতর্কিত নারীলাবণ্য, শাস্ত্রবিদও মূক। আদমকন্যাকে রক্ষার ক্ষমতা তাঁর যে নেই, ও কি জানে না? তারপর তিনি সোনারুর

দিকে তাকালেন। ওই দ্বিপদ প্রাণীটিকে তিনি মানুষ গণ্য করেন না। সে কাফের, কারণ খোদার সামনে তাকে নত হতে এই তিন বছর চাকরিকালে বেতনভোগী আলিমুদ্দিন দেখেননি, এমন কী ঈদে বা কোরবানির দিনেও না। তিনি প্রথমে ঝাঁপ দিলেন তার দিকে। 'অ্যাই বেহুদা উল্লুক! বেরো...শয়তান...খোদার ঘর না-পাক করলি' ইত্যাদি শুনেও সোনারু নড়ল না। সে মৌন, কাঁদছিল। আলিমুদ্দিন ভড়কে গেলেন। শাস্ত্র এবং মানুষতার সীমান্ত রেখায় দাঁড়িয়ে আলিমুদ্দিন এখন আরও বিব্রত। স্বয়ং পয়গম্বর অনুরূপ অবস্থায় কখনও পড়েছিলেন কি না, নজির ঢুঁড়বেন কী, তাঁর মগজের শাস্ত্রীয় জ্ঞান-কোষগুলিন নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। বুঝলেন, তাঁর মৌলবিত্ব সহসা তাঁকে পরিত্যাগ করেছে এবং এখন তিনি অন্যান্য মুসলমান লোকের মত একজন নিছক মুসলমান লোক কি না তাও সন্দেহসঙ্কুল। তারপর তিনি চুনির দিকে তাকালেন। মুখখানি অমর্ত্য পরি-মুখের প্রতিভাস, কলকাতার চিৎপুরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুঁথির হলুদ পাতা থেকে এভাবে উঠে এসেছে। আর আলিমুদ্দিন বিপত্নীক পুরুষ। সিদ্ধান্ত আছে যে, ধানকাটার মরশুমে বেতনের উপরি কয়েক বস্তা ধান সিধেস্বরূপ পেলেই এবার নিকাহ্ করবেনই ইনশাল্লাহ্, যদিও সিদ্ধান্তটি গত দুটি মরশুম ফেল করেছে, যেহেতু নিজের গ্রামে-ঘরে তাঁর পুষ্যির সংখ্যা ছোট বড় মিলিয়ে তের! কাঁচাপাকা দাড়ি আঁকড়ে ধরে বুঝি আবর্ত-স্রোতে ভাসমান নিজেকেই রক্ষা করতে করতে অর্ধস্বরে শুধু বললেন, 'নাহ্' এবং বার বার মাথা নাড়ছিলেন।

তখন সোনারু সিকনি ঝেড়ে বলল, 'ক্যানে হুজুর?'

তার এই বলায় শাস্ত্রীয় স্যাংচুয়ারি-দাবিটির ওভারটোন ছিল। ফলে শাস্ত্রবিদের পূর্বোক্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানকোষগুলি সক্রিয় হল। তিনি মানুষতার সীমান্ত থেকে পলকে শাস্ত্রে সরে এসে বললেন, 'মসজিদে আওরতলোকের পা দেওয়া হারাম! তুই খবিস, বুঝিবি না...তুই বেশরা...ওরে শয়তান, তুই হিঁদু সাদুর মতন...শুনেছিলাম, 'হিদুর দুগ্গিচালির ছামুতেও নাচ নেচেছিলি!'

চোইত-পাগলাও পলকে স্বভাবে সরলো। 'ইঃ! লেচেছিলাম তো লেচেছিলাম...' বলে সে নিজের বুক দেখাল। 'আমি। বিটিটো লাচেনি। ...মৈলবিসাহেব গো! আপনি বেবুঝ...খুদার ঘরে লোহু হারাম লয়? ই বিটিটোর জান খুদার দেওয়া লয়? ...ইটোর জানমারি হবে, লয়?'

এভাবে জেরায় জেরবার শাস্ত্রবিদকে শুধু কোণঠাসা নয়, সে কাঁদিয়ে ছাড়ল। তিনি কষ্টে বলেছিলেন, 'দেল ফেটে যায়! দেল ফেটে যায়!' দুহাতে মুখ ঢেকে তিনি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন।

বিদ্যুৎবিভাসিত বর্গক্ষেত্রে দুটি মানুষ তখনও স্থির। কিন্তু বন্ধ দরজা ফের খুলে গেল, ফাঁকে শাস্ত্রবিদের শুধু দাড়িমুখ টুপিমাথা দৃশ্যমান এবং চতুরাল পরামর্শে শনশন শব্দে বললেন, 'থানায় যাও।'

দরজা পুনঃ বন্ধ হলে চোইত-পাগল চুনির সামনে গুঁড়িমেরে পিঠ দিল। 'ইঃ! শা—' বলেই স্মরণ হল এখানে খোদার ঘর, সে শালীনতা ও পাপবোধে তখনই দুঃখিত, কিন্তু আচ্ছন্ন স্বরে বলল, 'ভুলামুন আমার! খ্যাল থাকেনি গো...থানা! হুঁঃ...থানা!...কিন্তুক ভালা মজা...' সে হাসছিল, 'ই কী দুনিয়ার দশা রি বিটি! খুদার ঘরও ডরায়। থানা দ্যাখায়! ভালা মজা!...' চড়ো জনুনী, চড়ো!...খোয়ার...দুজনকারই।'

চুনি নড়ল না। বলল, 'নাহ্ চাচা!' তার কথায় তীক্ষ্ণ ভয় ও বেদনা ছিল।

সোনারু মুখ ঘুরিয়ে ঊর্ধ্বে রেখে বলল, 'ক্যানে রি? ...বড় ঢঙ তোর...বুদ্ধির ছটাকও নাই...' তার চোখ ঝলমল করছিল সন্ধিকালের পাগল ক্রোধ, অভিমানমিশ্রিত।

তা কাঁদাল চুনিকে। ফুঁপিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসে বলল, 'থানা উয়াদের হাতে। চাচা গো! তুমি থানা জান না, আমি জানি। . .পান্না মতির বহিনকে থানা দ্যাখাও তুমরা গো!' সে আঁচলে নাক মুছে পুনঃ বলল, 'বউদিদি না ধল্লে ছোটনদাদা আমাকে ফিনিস করত। বললে, গর্ততে লুকিয়ে বাঁচবি না। ...ভাকা বুলেছে, চুনি বেদেনী হএছিল তো আম্মো বেদে হবো...ছোটনদাদা বললে।'

আলিমুদ্দিন বন্ধ ঘরে শুনছিলেন। ফের দরজা ফাঁক করে কথা পাঠালেন, 'নইমমাস্টার।' পবিত্র বাক্যবৎ এই উচ্চারণ।

অমনি সোনারু তার লাঠি টানল এক হাতে, অন্য হাতে পা। অবশ লেংড়ি তরুণী পিঠে ঝুঁকে

পড়লে সোনারু বলল, 'খবর হয়েছে...নইমমাস্টার...চড়ো!' এবং পিঠে সওয়ার পেল সে। বিড়বিড় করছিল ঠোঁটে পবিত্র বাক্য, 'নইমমাস্টার...'

দয়ালু শাস্ত্রজ্ঞ নইমমাস্টার—বার্তায় বিকল্প এক স্যাংচুয়ারি বুঝিয়েছিলেন। সে নির্দল, প্রাইমারি স্কুলশিক্ষক, বিশেষ কথা তার বাড়িটির অবস্থান বিচ্ছিন্ন। বাড়িটির বিচ্ছিন্নতা এবং নইমের নির্দলীয়তাহেতু কোন-কোনও সময়ে বিপন্নও হয়, যখন সংঘর্ষ আসন্ন আভাস পেয়ে দুই-পাড়ার সীমান্তবর্তী কিছু গরিব মানুষ গেরস্থালির শ্রেষ্ঠ কিছু সম্বল, হয়ত কিছু ধান, বাসনকোসন, কোদালকাস্তে লুকিয়ে রাখতে আসে। কারণ প্রথম আঘাত পড়ে তাদেরই ওপর। দু'পক্ষের যোদ্ধারা জয়প্রমাণে কিংবা একপক্ষ অন্যপক্ষকে সন্ত্রস্ত করে ফেলতে অগ্রবর্তী এইসব গেরস্থালিই লুণ্ঠন করে এবং ঘরে আগুন জ্বালায়, হোক না কেউ নির্দল। তাছাড়া রণকালে কিছু বাছাবাছির সময় থাকে না। আর নইম কাগজে পড়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি সেনাদের শেখানো হয়, শত্রুদের মানবেতর প্রাণী গণ্য করবে এবং এই বোধই জয় সুনিশ্চিত করে তুলবে। ঈদের দিনে মুর্গি জবাই করার সময় বোধটির উদ্রেক হয়েছিল নইমের মাথায়। সে জীবনে সেই প্রথম বোঝে, এই মুর্গিটি সে যেভাবে জবাই করছে, সেইভাবে কোনও মানুষকে মুর্গি ভেবে নিয়ে জবাই করলে, কিংবা কাঠুরিয়া যেভাবে বৃক্ষে কুঠার হানে, তবেই পান্না-মতি-বারুন-ভাকা-বারু প্রমুখ কিলার হওয়া কী সহজ! সার্জন মহাশয়রা কি এভাবেই ছুরি চালান পেটে? নইমের বাবার পেটে জমা জল বের করার সময় এই বোধ কাজ করেছিল কি? কিন্তু একই বোধ, একই ছুরি কী বিস্ময়করভাবে মৃত্যু বা জীবন নির্মাণ করে! নইমের বাবা জীবন ফেরত পান এবং বহু বছর সেই জীবন কত কাজে প্রয়োগ করেন, কাজগুলিন দেখার মত। তিনি সাইনবোর্ড লিখতেন বাজারে। এখনও কয়েকটি টিকে আছে, কোনায় ছ্যাৎরানো ক্ষুদ্রাক্ষরে 'শিল্পী করিম খান।' বাবার প্রতিভা পুত্রের হাতের লেখায় সঞ্চারিত হেরিডিটি। উভয় পাড়ারই, শান্তিকালীন, দরখাস্তগুলিন সে লিখে দেয়। মিলনী ক্লাবের সাইনবোর্ড সে লিখেছিল, শান্তিকালে। সে গ্রাজুয়েট। প্রাইমারি শিক্ষকতাকালে প্রাইভেটে বাংলায় এম এ পাশও করেছে, কিন্তু সরকারি দফতরে সেটি গ্রাহ্য নয় কী কারণে, ফলে পাঁচ কিলোমিটার দূরের গ্রামে হেডমাস্টারিতে পৌঁছতে তাকে বি এড পাশ করতে হয়। আর এমত কৌলীন্যে সে উভয়পাড়ার জঙ্গিদেরও শ্রদ্ধাভাজন, 'মাস্টারমশাই' সম্বোধিত হয়। বিশেষত, শান্তিকাল মানবতাময়।

চোইত-পাগলা এবার প্রকৃত স্যাংচুয়ারি আবিষ্কারের গর্বে হাঁটছিল। এইসময় তার মনে ঈশ্বরভক্তি গাঢ়। কারণ ঈশ্বরের ঘরেই নইমের অস্তিত্ব ঝিলিক দিয়েছিল মৌলবির মনে। এটাই খাঁটি সংকেত বটে! সে বিড়বিড় করে বলছিল, 'সে আছে...সে আছে...সে আছে।' এই 'সে' ঈশ্বর। অধ্যাত্মচেতনা তাকে ভূতগ্রস্ত করেছিল। মাঝে মাঝে চুনির ওজনে তার জিভ বেরিয়ে পড়ছিল, তাঁতে কামড়ানো জিভ, ফোঁস ফোঁস শ্বাসপ্রশ্বাস, টের পেয়ে চুনি একবার বলেছিল, 'জিরেন লাও, চাচা!' জবাব পায়নি। নইমের বাড়ির কাছাকাছি বলেছিল, 'ইবারে লামিযে দ্যাও গো, হাঁটি।' সোনারু নিরুত্তর ছিল। কারণ সে ঈশ্বরের সংকেতক্রমে ঈশ্বরেরই মুনিশ খাটছে।

বিচ্ছিন্নতা নইমের বাড়িকে বিদ্যুৎ-বঞ্চিত করেছে। নিম নিশিন্দা কালকাসুন্দে আকন্দ কেয়া ও কোঙ্গা ঝাড়ের ভেতর ঈষৎ উঁচু মাটির বাড়িটির চাল টালির, সেই টালিতে জ্যোৎস্নাগুঁড়ির ঝিলিমিলি, শিশিরের জন্যই। খিড়কির দিকে ডোবা। ডোবার তলায় কেন চাঁদ শুতে গেল ভেবে সোনারু অস্ফুট বলল, 'ভাল মজা!' সেদিকে একটি জানালা খোলা ছিল। ভেতরে তক্তাপোষে এদিকে পিঠ ঘুরিয়ে কারা লেখাপড়া করছিল। সামনে লণ্ঠন এবং পাশে চেয়ারে মাস্টারমশাই, রোগাটে গড়ন, পাতলা একটু গোঁফ, একমাথা এলোমেলো উজোন চুল, গায়ে শাদা ছেঁড়া গেঞ্জি, মুখে স্নেহের হাসি, বলছিল, 'স্কোয়ার রুট মানে বর্গমূল...!' সোনারু 'মাস্টারমশাই' ডাকতেই ঘুরল। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় উচ্চহাস্য। 'সোনারু?' বলে সে ভুল ভেবে বউকে ডাকছিল। 'রিনি! তোমার গেস্ট...খিড়কির দোরে...রিনি!' রিনা বেগম সোনারুকে মাঝে মাঝে খেতে দেয়। ভূতপ্রেত জিন পরীর গল্প অথবা সর্বচর মানুষটির মুখে পাড়াদুটি ও মানুসজনের বহু রহস্য জানা যায়—সে সন্তানহীনা, এও কারণ যে সে মানুষটির মধ্যে সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ আবিষ্কার করে থাকবে। সোনারুকে তার ভাত দেওয়া হাতে প্রার্থনার মুদ্রা থাকে।

রিনা উঠোনে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখছিল। গ্রামীণ নারীদের এই স্বভাব, উপরন্তু তাদের শিশুদের সূত্রে বস্তুত আকাশে চোখ-সওয়া দর্শনধারী জিনিসটির সঙ্গে ভাই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু রিনার শিশু নেই। সে প্রাইভেটে বি এ পাশ করেছে স্বামীর তাগিদে। বি এড পড়ার দরখাস্তও জমা দিয়েছে। এখন সে চরকা-কাটা-বুড়ির গল্পের সঙ্গে মানুষের চন্দ্রাভিযান, মহাকাশযুগের ঘটনাবলী জড়িয়ে-মড়িয়ে বাস্তবতা টুঁড়ছিল। ভাবছিল, সত্যিই কি...সত্যি সত্যি...ওই চাঁদে? অথচ মাতৃ-আকাঙ্ক্ষাও তার চৈতন্যে ছটফট করছিল। এসব সময়ে ট্রানজিস্টর তাকে ত্রাণ করে। কিন্তু প্রাইভেট পড়ানোর সময় স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতাহেতু সে ট্রানজিস্টর বাজায় না। নয়ত সেটিই তার বিষাদময় নৈঃসঙ্গের চরম একটি সম্বল। এমন সময়ে তো বটেই। একটু পরে পড়ুয়ারা চলে গেলে সে আত্মীয়তার অনিচ্ছুক চাঁদটিকে নিমেষে ত্যাগ করে ট্রানজিস্টরের নব ঘোরাবে। স্বামীর ডাক শুনে সে কান পেতেছিল এবং সোনারুর আসার খবরে চঞ্চল হয়েছিল। সোনারু পার্থিবকে অপার্থিব এবং অপার্থিবকে পার্থিব করায় রাত্রিটি মধুর হবে ভেবেছিল। কিন্তু খিড়কির দরজা খোলামাত্র সে আতঙ্কে পিছিয়ে এল। সিল্যুট দুটি মাথা, একাঙ্গ চলনশীল, যেন আজব প্রাণী। আর, চুনি মাথা নিচু না করলে জখম হত, এমন বেগে সোনারু ঢুকল। উঠোনে চুনিকে নামিয়ে সে ধপাস করে বসে পড়ল। বারান্দার কোনায় একটি মিটমিটে লম্প জ্বলছিল। আলো পৌঁছয় না সেখান থেকে। ঝুঁকে পড়া বৃক্ষলতার ছায়া উঠোনের অনেকটা ঢেকেছে। চুনি সোনারুর হাত থেকে লাঠিটা নিলে তবে রিনা তাকে চিনল এবং সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল। কেননা আজ চুনি একটি ভয়াবহ মিথ দক্ষিণডিহিতে।

সোনারু হাঁফাচ্ছিল। 'লাও গো...আঁচল দিয়ের ঢেকিন রাখ গো...হায় হায়, বিটিটোর জানমারি হয়-হয় দশা গো...খুদার ঠেঞে যেলাম তো হুকুম হল, ই ঠেঙে লিয়ে যা...'

ফুলকুঁড়ি ও তার ছোটচাচার ছেলে কাদির লেখাপড়া করছিল। এমন সংঘর্ষের দিনের পর রাতে বেরুনো ফুলকুঁড়ির লেখাপড়া-নেশার বাড়াবাড়িই। তার মা বিছানাব রুগি। বাবা ও ছোট চাচা দুজনই নির্দল বেচারা ভালমানুষ। তাছাড়া তাদের বাড়িটা একটা পোড়ো খোলামেলা ভিটের ওধারে, দূরত্ব পনের কাঠা নিষ্ফলা মাটিমাত্র। ফুলকুঁড়ি ডানাফোলানো মুর্গি হয়ে বেরিয়েছিল। সে প্রতিভাশালিনী বলে ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ত সজাগ, প্রখর। চুনির উদ্দেশে চাপাস্বরে বলে উঠল, 'পালাও! পালিয়ে যাও গাঁ ছেড়ে। আমাদের বাড়ি টুঁড়তে এসেছিল ভাকারা।' দম নিয়ে সে উঠোনে নেমে এল। 'তুমার মা তলোয়ার হাতে বসে আছে। আর তুমার ভাবিজিও মাতম করছে, তার হাতেও হেঁসা...খুদার কসম বুবু...কাদিরকে শুধাও,...কাদির!' তার ডাকে ক্লাস ফাইভের ছেলেটি সাড়া দিল না। তখন সে মাস্টারমশাইয়ের বউকে সাধাসাধি করতে লাগল, এখন স্ট্যান্ডার্ড বাংলায়, 'চাচিজি! খবর্দার চুনিবুবুকে জায়গা দেবেন না! বাড়ি জ্বলে যাবে।' সে ফিসফিসিয়ে উঠল পুনশ্চ, 'আমার মেজচাচি বড্ড কান খাড়া! দেয়াল ফুঁড়ে চোখ যায় কাজিরুনচাচির। ...চাচিজি, বেশি বলব কী, মেজচাচি মাকু গো। দুই পাড়ায় মাকু চালাচালি...তাঁতবোনা মেয়ে গো! ওর কিছু ক্ষতি হবে না।'

নইম বেরিয়ে এসে দেখছিল ও শুনছিল। আস্তে বলল, 'কুঁড়ি, পড়তে বস গে। দেখছি।' ফুলকুঁড়ি মান্যতাবশে ফিরে গেল ঘরের ভেতর। নইম নেমে এল উঠোনে।

সোনারু প্রচণ্ড ক্লান্ত, ক্ষুধার্তও। নইলে কাজিরুনের সঙ্গে কাজিয়ার মতই সে কাজিরুনের মেজ জা-এর এই 'পড়াউলি পুণ্ডিত' মেয়েকে হেনস্তা করত মোক্ষম অস্ত্র মৈথুনমুদ্রা-প্রয়োগে। কোমরে ও কাঁধে ব্যথা, দুটি হাতও অবশ। তাই সে মূক ছিল। নইম নামলে সে প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাতজোড় করল। 'পরে কথা হবে বাপ, আগে দুটি খেতে দাও বিটিকে...আমাকে দিলে দিও, না দিলে না...ও বাপ! একটো জানের জিম্মা দিতে এলাম গো...তুমি পুণ্ডিত বাপ মাস্টারমশাই...একটা জান কি দুনিয়ায় সহজে আসে গো? ...জনুনীমা দশ মাস দশ দিন ওদরে থুলেন...পেসবযন্তনা...ভাব, বাপ, লালং-পালং, ...কত কষ্ট...তাপরেতে তুমি বড় হও...বাপ রে! কত কষ্ট কত নাচ্ছনা...তবে...' সে রিনির দিকে ঘুরল, হাতদুটি একইভাবে জোড়করা। 'মা রে! একটা জান কী করে দুনিয়ায় আসে, তুরাই জানিস মা...পুরুষে কী জানবে...আগে দুটি খেতে দে বিটিটোকে...'

সোনারু একটি মধুর রাত্রি সৃষ্টি করে যাবে এহেন সম্ভাবনা বদলে সোনারু রাত্রিটিকে জানমারি-সন্ত্রাসে ভরে দিতে এল, এতে রোমান্টিক বধূটি ক্ষুব্ধ। সে স্বামীকে বছর ধরে প্ররোচিত করে আসছে, 'বাজার এরিয়ায় অগত্যা এক কাঠাও জায়গা কেনো। কুঁড়েঘর তো কুঁড়েঘরই হোক। আমি কি নবাবজাদী না মিনিস্টারের বিটি?' আসলে তার পুরুষটি আঁক কষিয়ে, জ্যামিতি আঁকিয়েও, ছাপাখানায় ছাপানো যা কিছু, তার বাইবে সবই অজানা এবং ওই যে চালে টালি চেপেছে, তাও রিনার অবদান। এ মুহূর্তে তার মনে বাজার এরিয়ায় স্থানান্তরের আকাঙ্ক্ষাটি আরও যুক্তিযুক্ততার গোঁজ পুঁতছিল। সে ভয় ও যন্ত্রণায় দীর্ণ। স্বীকার করতে প্রস্তুত, এই গেরস্থালির নির্মাণ তার হলেও এসব ক্ষেত্রে সে মেয়েমানুষ, এবং শুধু মেয়েমানুষও নয়, মুসলমান আউরত। মুসলমান স্ত্রীলোকে পরিণত সে তার পুরুষের দিকে চন্দ্রালোকে দৃষ্টিপাত করল। এ সময় চাঁদটিকেও নিষ্ঠুর দেখাচ্ছিল।

আর বিস্ময়করভাবে পুরুষটি ছাপাখানা-জগত থেকে বেরিয়ে পড়ে ফিসফিস হুঁশিয়ারি দিল, 'সদরদরজা বন্ধ?' প্রশ্নের কারণ সে ফুলকুঁড়ির 'মাকুচালাচালি' এবং কাজিরুনের উল্লেখ শুনেছিল। সদরদরজা বন্ধ ছিল না। দ্রুত বন্ধ হল। মুসলমান স্ত্রীলোকটি বেপথু, হাত কাঁপছিল বলে সামান্য শব্দই বাড়ি-কাঁপানো। প্রাথমিক শিক্ষক আরও বিস্ময়করভাবে হাতদুটি জোড় করল। 'সোনারু!' বিনম্র ও ক্লিষ্ট এই সম্বোধন, এবং যেন সে শুধু সোনারুকেই দেখছে, যে কালো হয়ে চন্দ্রাচ্ছন্ন সাদা মাটিতে বসে আছে। 'আমি নিরীহ মানুষ গো, বড়ই দুর্বল। ...স্কুলে থাকি', ঢোক গিলে বলল সে, 'তোমার বিটিটো একা থাকে, জান! চাচা ডাকি তোমাকে, সোনারু...তুমি মহৎ মানুষ...' বলে স্ত্রীর দিকে তাকাল। 'রিনি, মুড়ির টিন ঢেলে দাও। আর গুড়ও দাও, শিগগির!'

সোনারু খি খি হাসতে লাগল। 'ভালা মজা!'

নইম বলল, 'মাঠে ইদগায় গিয়ে খেও। সেইফ প্লেস। পুকুরের পানিও কতজনকে খেতে দেখেছি...ক্লিয়ার ওয়াটার।' সে প্রলাপ বকছিল, এমনই সন্ত্রাস পরিকীর্ণ এই সময় এই শরৎ-রাত্রি এই জ্যোৎস্না। স্ত্রীকে মুড়ির টিন ও একবাটি গুড় আনতে দেখে সে, শান্ত-সজ্জন প্রাইভেটে বাংলায় এম এ এবং বি এড প্রাইমারি হেডটিচার পুতুল নৃত্যে বলতে থাকল, 'কিসে নেবে গো...কিসে নেবে গো', কারণ সোনারুর পরনে কৌপিনাকার ছেঁড়া লুঙ্গি মাত্র এবং সে পান্নার বোনকে দেখছিল না, জানমারির বাড়ির সকলকার প্রতি পুরুষপরম্পরা এত ভয় কিংবা ঘৃণা, যদিও এখন সে কিঞ্চিৎ মানবতাগ্রস্ত।

সোনারু পুনঃ 'ভালা মজা' বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল। নইমমাস্টারেরও এই ভীরুতা তার চোইত-পাগল মনের হিসেবে কল্পনাতীত, বুঝতে পারছিল এটিও স্যাংচুয়ারি নয়। সে চুনির আঁচল টানতে গেল। অমনি চুনি জানমারি-উচিত হিংস্র হুঙ্কার দিয়ে পা বাড়াল খিড়কির দিকে, খিড়কিটি খোলা থাকায় ডোবার জলের তলায় কোণ ঠেসে শুয়ে থাকা চাঁদটিকে দেখা যায়, এবং লাঠির শব্দ বাড়িকে আতঙ্কে তোলপাড় করছিল। সোনারু 'ওই...ওই...ই কী রি...' আর্তরবে ছুটে গেল।

তার পিছনে হেডটিচারের দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে যায় নি সোনারুর। কালকাসুন্দে জঙ্গলের ভেতর মুহুর্মুহু উঁচু ও নিচু হওয়া ছায়ার গোটাটিকে সে 'খেপি...খেপি গো...' আখ্যা দিয়ে মুড়ি গুড় যত দ্রুত সম্ভব হাতিয়ে আনার জন্য ঘুরতেই দরজা বন্ধ দেখল এবং চেরা গলায় শাপ দিল, মৈথুন মুদ্রাসহযোগে, 'সে গুড়ে বালি...যতই...!' চির-বন্ধ্যাত্বের শাপ ও রুষ্ট ওরাকলের পর ধাবিত চোইত-পাগল ছায়ার গোটাটিকে সহসা অদৃশ্য দেখল। সে 'হায় হায়' করছিল।

চুনি আছাড় খেয়েছিল। তাই জানমারিবংশের হিংস্রতা তার বিপন্ন শালীনতা গুঁড়িয়ে ফেলল। সে লাঠি দিয়ে প্রহার করতে লাগল পতনের কারণজনিত বস্তুটিকে, যেটি একটি উইঢিবি মাত্র। সোনারু সেই শব্দ শুনেছিল। হাহাকার স্বরে বলল, 'ডংশালে?' সে সাপ ভেবেছিল। কাছে এসে হেঁপো রুগির শ্বাসে অসহায় সান্ত্বনাও দিল, 'ঢোঁড়া-লয়তো ইনি!' এই শরৎকালের রাত্রিতে ঢোঁড়াগুলিন নাকি শিশির খেতে আসে জল থেকে এবং 'ইনি' সাপগুলিনের স্বভাব নাচ করা। নিশাচর মানুষ সেই নাচকরা অসংখ্য শরতে রাত্রিকালে দেখেছে! আব চুনি তখন লাঠি ভর করে উঠে হিংস্রতায় বলল, 'তুমি খালি ঘুরিয়ে মাল্লে। তুমি চাচা, খ্যাপাই বটে।'

সোনারু নতমস্তকে স্বীকার কবল, 'হঁ গো, খ্যাপা.. আমি শালা খ্যাপাই গো!...মানুষ বুঝি না। খ্যাপা

মানুষ বুঝে না, দুনিয়া বুঝে না...বিটি, তু আমার মাথা ফাটিঞে দে! দে খ্যাপার খুলি ফাটিঞে...দে...তাই দে!' সে ফোঁস ফোঁস শব্দে কাঁদছিল মাথা পেতে দিয়ে এবং চুড়োবাঁধা চুল ভেঙে গেল।

চুনি বলল, 'ঢঙ!' সে পা বাড়াল। এই গমনে হিংসার সংকেতগুলিন স্পষ্ট।

সোনারু, কাঁদছিল যে, সহসা সেই সঙ্কেতগুলিনের দ্বারা সংক্রামিত হয়ে দাবি করল, 'কতি যাবি?' দাবিতে হুমকি ছিল। 'কতি?' সে লাফ দিয়ে সামনে গেল।

চুনি বলল, 'মরতে'। এই কথার সারবত্তা ছিল না, কারণ এটি সতত স্ত্রীলোকদের অভিমানী বচনমাত্র।

কিন্তু সোনারুকে কথাটি আঘাত করেছিল। প্রথমে সে বাঁকা হেসে বলল, 'ওরে! লেংড়িভেংড়ি তু-তু...মরবি কী করে দেখি! দ্যাখ আমাকে। ...ইঃ! একখান হাত একখান পা দিয়ে লিজেকে মারবি রি! ভারি খ্যামতা তোর!' সে চাঁদটি, নিঝুম বৃক্ষলতা, আকাশ ও মাটিকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোরা দ্যাখ...দ্যাখ রে! ভালা মজা! ই বিটি লিজেকে জানমারি করবে বুলছে! সক্কলে হাসো গো! জানমারি হবে...' শেষে পুনঃ হুমকির ভঙ্গিতে বলল, 'তু যতি গাছে চড়তে পারতিস, তু মরণঝাঁপ দিতিস! পারবি না। তু যতি ছামুতে লধি পেতিস, তু মরণঝাঁপ দিতিস! ...ইঃ গো, ক্যারাচত্যাল পেলে তু হরি মড়োলের ব্যাটার বো-পোড়া হতিস!...হুঁ, পুস্তন্নিপুখোর আছে বটে। হুঁ রি বিটি, আচলে ইঁট বেঁধে লরার মাগ ডুব দিয়েছিল...তু ইঁট কতি পাবি রি? পেলেও লেংড়ি তু...দিনমান প্যাটটো খালি, ইঁদুরের জোর নাই তোর ছরতে...' আরও আত্মহত্যার প্রক্রিয়া সে ঢুঁড়তে হন্যে হচ্ছিল। কিন্তু কীটনাশকের সুলভতা মাথায় আসামাত্র সতর্কতায় জিভ কেটে চুপ করে গেল। সে সকাতর হাসতে লাগল।

আর চুনি এইসব কথায় উত্তরোত্তর হিংস্র হতে হতে নিজের অসহায় দশা যথাযথ বুঝে নিতে নিতে ভীষণ বাঁকা হাসল। পূর্বমুখী হওয়ায় তার দাঁতে জ্যোৎস্না ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'ভাকার ছামুতে যাব।' ঘোষণা করে এক্ষেত্রে গত্যন্তর ছিল না। সে অর্ধচিৎকারে বলল ফের, 'ভাকা...বারু...মারুক তারা আমাকে! ...মারুক...ফিনিস করুক...'

চোইত-পাগল মুহূর্তে দার্শনিকতার ধাক্কা খেয়েছিল। বলল, 'হ্যাঁ রি বিটি, ই কী বুলিশ তু?'

চুনি ফুঁপিয়ে বলল, 'ঠিকই বুলি!'

'তু ছান্তি চেহেঞ্চিলি!' সোনারু দার্শনিকতাভারাক্রান্ত চিত্তে শান্ত মন্তব্য করল। 'বিটি, তু জানমারি বন্ধ চেহেঞ্চিলি!'

চুনি বলল, 'ছান্তি হবে না। ...আমার শ্যাষ ভাইটাও...ও চাচা, আমি লিজের হাতে জানমারি করলাম...লিজেই জানমারি হলাম...' সে হু হু কান্নায় ধনুকবাঁকা হচ্ছিল। পারিপার্শ্বিকে সেই কান্না প্রবাহের সৃষ্টি করায় ছ্যাঁকা খাওয়া অনুভূতিতে সোনারু তাকে দুকাঁধে ধরল। তারপর ঘুরেই পিঠ দিল। 'চড়ো জনুনী। ই খ্যাপা যতি একটো জানমারি বন্ধ করতে পারে, তাই করুক। যিটো তার হাতের ছামুতে আছে, সেইটেই তার সম্বল...সোনারু সেইটোকে রুখবে...পিতিজ্ঞে।' দুর্বলতাবশে সে চুপ করল। কিন্তু প্রতিজ্ঞাটি তাকে পালন করতেই হবে, এই নিষ্ঠায় মৃদু হুঙ্কারও দিল, 'তোর জিম্মা লিলাম।'

তখন কৃতজ্ঞতাবশে চুনি আবার সওয়ার হল। উপায় ছিল না। শরৎরাত্রিতে কারবালাক্ষেত্রের দিগ্‌ভ্রান্ত দুলদুল অশ্ব আবার কোন মক্কার স্যাংচুয়ারিতে নিয়ে যাচ্ছে, প্রশ্ন বৃথা মনে হয়।...

তিন

সে এক দিনকাল ছিল, যখন পরগনা দক্ষিণডিহি মহালের মালিক এই জমিদারবাড়িই ছিল রাজবাড়ি। আঞ্চলিক উচ্চারণে যা 'আজবাড়ি' এবং হরি সিং পর্যন্ত এসে 'আজাবাবু' খেতাব প্রকৃতিপুঞ্জের মুখ থেকে অ্যাডাল্ট ভোটের যুগে চিরতরে লুপ্ত হয়। আর এই বংশকে নেপথ্যে 'কায়েত' বলা হত বলে হরি সিং এক শিক্ষককে দিয়ে 'দক্ষিণদিহির ক্ষত্রিয় রাজবংশচরিত' লেখান, তা সদরের ছাপাখানায় ছাপা হয়েছিল। বইটিতে প্রচুর ফুটনোট ছিল, পুনঃ পুনঃ সায়েবলোকসকলের বইয়ের নাম এবং ইংরেজ কালেক্টর বাহাদুর লিখিত ভূমিকাও ছিল। গত ভোটে এক বেবুজ রিপোর্টার মফঃস্বলের কাগজে অরু সিং এবং বীরেন্দ্র রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে লোকমুখসূত্রে 'বামুন-কায়েতে লড়াই' লেখায়

মানহানির মামলা উঠেছিল। কিন্তু কেঁচে যায় কী কারণে। বস্তুত জমিদারকে রাজা বলাই কৃষকস্বভাব, প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারী প্রথা। কিন্তু শিক্ষকটি, ভাড়াটে ইতিহাসকার, 'সিংহ'-এর বেচারা 'সিং'-পরিণতির বৈয়াকরণিক যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেন এবং ক্ষত্রিয়ত্ব সাব্যস্ত করেন, তাতে বিরেংবাবুর কলকাতার অধ্যাপক মামা বক্রহাস্যে বলেন, 'সবই মিথলজি। কাদের ক্ষাত্রিয় বলা হত, অপ্রমাণিত। সম্ভবত তারা পশ্চিম এশিয়ার ক্যাসাইট নৃগোষ্ঠী। যুদ্ধ-কাটাকাটি যদি ক্ষত্রিয় প্রমাণ হয়, বাগদিপ্রমুখ এথনিক গ্রুপও ক্ষত্রিয়।' এই প্রত্ন-সিদ্ধান্তের বার্তা বয়ে এনে জমিদারবাড়ির প্রাক্তন লাঠিয়াল পাইকদের 'কী রে, তুই জানিস তোরা ক্ষত্রিয়?' এ হেন ব্যঙ্গাত্মক উদ্ভাসন রায়-সিংহ ট্রাডিশনাল দ্বন্দ্বে অতিরিক্ত একটি মাত্রা যুক্ত করেছিল। লড়াই ক্রমশ মরণপণ হতে থাকে। মফস্বলী পত্রিকায় বিতর্ক চিরাচরিত জমে ওঠে। জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদের পর অরু সিং ক্রমে সরকারি সংজ্ঞায় 'বড় কৃষক' এবং বাম রাজনৈতিক সংজ্ঞায় 'জোতদার'। তাঁকে সঠিকভাবে কী বলা হবে, জটিল প্রশ্ন—কারণ প্রথম যোজনায় টেস্টরিলিফের গমের ডিলারশিপ, পরে বিদ্যুৎ-যুগে ধানপেষা-গমপেষা কল, চিমনি ইটভাটা, ঠিকাদারি, শেষে পেট্রলপাম্প, গ্যারেজ, এমন কী তৎসংলগ্ন অ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিজ গুদামঘরটিও উল্লেখ্য তাঁর ক্রিয়াকর্মে। আবার তিনি পলিটিসিয়ানও, অনধিক তিনটি দফায় জনপ্রতিনিধি ছিলেন বিধানসভায়। আরও বিস্ময়কর তথ্য : ঘোর শাক্তবংশ, কালীবাড়িতে ১০৮ পাঁঠার প্রাণ যেত, পরে তা থামিয়ে দিয়ে অরু সিং বৈষ্ণব হন। কালীপূজা কমিটি গড়ে দেন, বলি বন্ধ, পূজা চলে, মাইক্রোফোন বাজে। কিন্তু অন্তঃপুরে রাধাবল্লভ বিগ্রহ স্থাপিত হয়। তাঁর বন্ধু পরিতোষ বলেছিলেন, 'তুমি বউরূপী হে অরু! লাও, টানো, ইথে দোষ দেখি না...প্রেমরস ভাবো হে!' পবিতোষ আড়তদার, রাম ছাড়া সব সদা মিথ্যা তাঁর কাছে, বলেছিলেন, 'ইটা রাম হে! যেথা রাম সেথা কৃষ্ণ...তুমি হিঁদুর কচুও বোঝ না, কবে দেখব সইদুরের সঙ্গে টুপি পরে মক্কা যাচ্ছ...লাও, ঢঙ কর্তে হবে না, টানো।' অরু সিং জিভ কেটে 'ইডিয়ট...মাতাল হলে লোকে মুখেই প্রস্রাব করে—' বলে রাগ করে চলে আসেন। কিন্তু রাগ রাজনৈতিক কারণে টেঁকেনি। পরিতোষ পার্টির ব্লক-ভিত্তিক শাখার প্রেসিডেন্ট। তাঁরও পোষ্য মস্তান ও বোমাভাণ্ডার বিদিত।

পরিতোষ এসেছিলেন একটু আগে। আগে মুসলমানপাড়ায় প্রচণ্ড সংঘর্ষ, রায়দের একটি হাত কাটা গেছে, মাথা ঠাণ্ডা রাখা দবকাব বোধে রাম টানার আগেই আসেন তিনি। মুসলমানপ্রধান নির্বাচনকেন্দ্রে এসব ঘটনাকে গুরুত্ব দিতেই হয়, বরাবর হয়েছে। পান্নার পতনের প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। সে বড় বৃক্ষ ছিল, ফলে বহু ছোট বৃক্ষগুল্মেব অবস্থা চিন্তায় আনতে হয়। ছোটনের নেটওয়ার্কটি মজবুত। গ্রামে গ্রামে ভূমিহীন বর্তমান প্রজন্ম মুক্তির দশক থেকে জানমারি চরিত্রে অর্গানাইজড। স্বপ্নভঙ্গের ফল তাদেরই বর্তেছে। তারা কখনও ছিনতাইবাজ, কখনও রাহাজানিকারী, কখনও ডাকাত। কিন্তু ছোটন এখনও তাদের লিডার। পরিতোষ বলেছিলেন, 'টপলেবেলে মেসেজ দাও হে! আম্মো কাল ডিস্ট্রিক্টে যেঞে ফোনে কনট্যাক্ট করব, ...ইঃ! এস পি লোকটা ননবেঙ্গলি। বুঝালে বুঝতে পারে না। বলে, ইয়েস, ইয়েস, আই নো, আই নো...হুঁ, সইদুরের সঙ্গে উঠেঞে দ্যাখা হবে, খবর দিয়েছে।' বলে অশান্ত পরিতোষ রাম গিলতেই ছুটে যাচ্ছেন, মনে হয়েছিল অরু সিং-এর। আর আশ্চর্য কথা, আজ রাতে তাঁরও চিত্তবৈকল্য। ভাবছিলেন, পরিতোষ রাতটা ভালই কাটাবে, শুধু তাঁরই সামনে নির্মম অনিদ্রা। রাঢ়ের শাক্তধর্ম বাঙাল নেতাজি কলোনির বৈষ্ণব ভক্তিধর্মে তাঁকে বদলি করে, রাজনৈতিক স্বার্থই যার গোপন কারণ, ভুল...বৃহৎ ভুল। কেননা সারা নেতাজি কলোনি দেখতে দেখতে ছোটনের করায়ত্ত হয়ে গেছে। শুওরের বাচ্চা নন-এমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম! দিল্লি-কলকাতার ছিন্নমূল রাজনীতি এই বাস্তবতা বোঝে না। ইডিয়টবক্স এয়ারকন্ডিশনড কলের কম্পিউটার গুলিন! একুশ শতকের মুখে লাথি মার হে! সংগঠন নেই, দলের গঠনতন্ত্রের ওপর দিয়ে অ্যাডহক ব্যবস্থা স্টিম রোলার চালায়, দিল্লি দিল্লি দিল্লি...রোবোট! রোবোট কথা বলে, গম গম করে কণ্ঠস্বর, বাঙালি জুতো চাটে রোবোটে...বাঙালি বেগডবাঁই করলেই উড়ে এসে তুরুপের তাস পড়ে বুকে—ব্যস! তুমি ফিনিস!...

পরিতোষকে ফটকে সি-অফ করতে গিয়ে চিন্তাজ্বরোজ্বরো অরু সিং থমকে তাকালেন। কী একটা আসছে বাঁদিকের গাছপালার ছায়ায়। আতঙ্কে পিছিয়ে ফটকে ঢুকতেই শুনলেন, 'বাবুমশাই গো, ই ব্যাটা সোনারু।' অমনি তেড়ে গেলেন, 'ক্কী ক্কী' রবে। তাঁব হাতে একটি ছড়ি ছিল। এহেন সময়ে চোইত-

পাগলা তাঁকে পূর্ণ পাগল করতে আসে কোন চক্রান্তে? তিনি ছড়ি তুলে অনবরত 'গেটআউট' বলতে থাকেন। ইত্যবসরে সোনারুর পিঠে পান্নার প্রতিবন্ধী বোন বিদ্যুৎ-প্রতিভাত হল এবং নিমেষে জননেতা নিশ্চল। তাঁর মণি-চোখে ভীরু কৃতজ্ঞতা ঝিলিক দিচ্ছিল।...

এমন এক এস্পার-ওস্পার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত-মুহূর্তে অরু সিং-এর পরিতোষকে দরকার ছিল। কিন্তু ততক্ষণে পরিতোষের সাইকেল হাইওয়েতে এবং পেছনকার চাকার লাল ভাঁটাটি জুগজুগ করতে করতে উধাও হয়ে গেল। তখন অরু সিং-এর মনে পড়ল, পরিতোষ মোটরসাইকেলে আসেননি, সেটি গর্জনকারী। এ থেকে বোঝা যায়, দক্ষিণডিহিতে আজ রাত্রিটি গোপনীয়তায় পরিকীর্ণ। 'মিনি পাকিস্তানে' হিন্দুপাড়া কদাচ হস্তক্ষেপ করে না এমন ধারণার সারফেস রিয়্যালিটি বহাল এবং উল্টোটিও সমানে বহাল, যেহেতু ধর্ম একটি প্রচণ্ড স্পর্শকাতর জিনিস। তবু আজ রাতের এমনতর গোপনীয়তা ট্রাডিশন ভেঙেছে। চর এবং উভচর লোকেরা বিবিধ ছলে উত্তর-দক্ষিণ দক্ষিণ-উত্তর পরিক্রমারত। এও বিশেষ কথা, বাজার এলাকাটি সেকুলার। কারণ শাসক দল ও বিরোধী দলের সংঘর্ষ সেকুলার এবং অরাজনৈতিক মস্তানি যুদ্ধগুলিনও সেকুলার, যেগুলিন বাজার এলাকাতেই ঘটে থাকে। স্বাধীনতাযুগে শুধু একবার হোলির দিন ঈষৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপক্রম হয়, কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থের দুগ্ধবতী ছাগল সেটি আঁতুরে মুড়িয়ে খায়। সৌভাগ্যবশত ছাগলটি ছিল। অরু সিং এবং বীরেন্দ্র রায় একই মঞ্চে যৌথ ঘোষণা করেন, 'আমরা ওয়েস্টবেঙ্গলে কমিউন্যাল রায়ট বরদাস্ত করব না, ক-র-ব-না-আ-আ', দীর্ঘায়িত ধ্বনিটি নামুপাড়া মসজিদের মৌলবাদী মৌলবি নাজিরুদ্দিনের জেহাদি প্ল্যানিংকে ভড়কে দিয়েছিল। অন্যদিকে মৌলবাদী, কথায়-কথায় আর্য-আর্য উচ্চারণকারী স্কুলশিক্ষক হৃদয়নাথ কিছুকাল স্তব্ধ হন, যেহেতু শাসকদলের রাজনীতি যে-কোনও মুহূর্তে তাঁর মাস্টারি খেলে সপরিবারে না খেয়ে মরবেন। আরও বিশেষ কথা, এই হৃদয়নাথই ফুলকুঁড়ি ফার্স্ট হয়ে তাঁর পা ছুঁলে সিক্ত চক্ষে আশীর্বাদ করেন, 'দেশের দশের মুখ উজ্জ্বল করিস মা, তুই পূর্বজন্মে মৈত্রেয়ী ছিলিস...ওরে, তুই আমাদের বিদ্যালয়ের গর্ব।'

'মানুষ কী গো, বুঝি না', সোনারু বলছিল, 'ছোট আজাবাবু মশাই গো, ই পাগলার মুখ, দুষ লিবেন না. ই রেতে দেখি সক্কল মানুষ গুয়ের ইপিঠ-উপিঠ'...সে সম্মান প্রদর্শনে জিভ কাটল, এই কুবাক্য সে দুঃখেই উচ্চারণ করেছে।

সম্বিৎ ফেরামাত্র অরু সিং আস্তে বললেন, 'এখানে না, এখানে না।' তিনি দয়াপরবশে একথা বলেই গৃহাভিমুখী হননি, বরং গোপনীয়তামূলে এবং আদ্যোপান্ত জানার তীব্র আগ্রহেই ধাবমান হয়েছিলেন, যে গোপনীয় প্রকৃত জানা পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি প্রস্তুতের জন্য জরুরি ছিল। সাক্ষাৎ মূল সোর্স এভাবে তাঁর সামনে এসে পড়বে. কল্পনাতীত ছিল।

উঁচু পাঁচিলঘেরা প্রাক্তন জমিদার বাড়িটির শরীর ও পারিপার্শ্বিকের বিকট পরস্পরবিরোধিতা। দুটি যুগ আলিঙ্গনাবদ্ধ এভাবে যে, দ্রষ্টার সৌন্দর্যবোধ বিস্ময় দ্বারা লাঞ্ছিত হয়। সোনারু, এখন ভারমুক্ত সে এবং চুনিকে ছাগলখেদা করে নিয়ে চলেছে, অট্টালিকাটি ঠাহর করতে করতে বলছিল, 'চিন্‌হা যায় না, সে গৈরবি আজবাড়ি কতি যেল গো ছোট আজাবাবু?' বাক্যটি নিছক স্থাপত্যশিল্পবোধসূচক। নতুন অংশের বারান্দার বাতিটি তখন অরি সিং নিভিয়ে দিচ্ছিলেন। ঢাকা বারান্দার মেঝের গাঢ় ছায়ায় দাঁড়িয়ে গোপনীয়তায় বললেন, 'এখানে বস্ তোরা। বল্, শুনি।'

অমনি চুনি, এতক্ষণে, আবিষ্কার করল সে সোনারু নামক বস্তুত একটি জিনের পাল্লায় পড়েছে এবং জিনটির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। সে নিজে কিছু ঠিক করতে পারছে না. জিনটিই সব ঠিক করে দিচ্ছে ক্রমাগত পর্যায়ে। আসলে সে জানমারি বাড়ির মেয়ে, জানের ভয় শোভা পায় না। অথচ এই যে ধারাবাহিক ঢেউয়ের মত জানের ভয় তাকে অকূলে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা সোনারুরই তৈরি। সোনারু তাকে ফাঁদে ফেলেছে। ভ্রান্তিজনিত অনুশোচনায় দিশেহারা চুনিকে এই পাগলা জিন কবজা করেছে। আর অরু সিং-এর প্রশ্নের পর সোনারু যখন বলল, 'ই বিটি ছান্তি চেহেএছিল, ছোটআজাবাবু গো', তখন চুনি বলে উঠল, 'বাড়ি যাব...বাবু গো, আমাকে একটো রিকশ ডেকিন দেন, পায়ে পড়ি...ছরত চলে না...চোইত-পাগলা আমাকে আঘাটায় ঘুরিন মাল্লে।'

তার ওই বলায় পাষাণশক্তির আওয়াজ ছিল। চকিত সোনারু এতই তাজ্জব, ব্যথিত স্বরে 'মরণপাখা...' বলেই চুপ করে গেল।

অরু সিং নিরপেক্ষতা এবং কপট বিষাদে বললেন, 'শুনলাম, পান্নার বোন বোমাগুলিন জলে ফেলে দিয়েছিল, নইলে নাকি পান্না খুন হত না। তবে পান্না ভালছেলে, তাও একশোবার বলব। দেখা হলেই ভাল তো জ্যাঠামশাই বলত। ওকে ছোটন নষ্ট করেছিল। ...কষ্ট হয় রে, খারাপ লাগে। পান্নার মত ছেলেকে গঠনমূলক কাজে যদি...ডেসট্রাকটিভ ফোর্সগুলিন অ্যাকটিভ...জাতীয় সংহতি সাম্প্রদায়িক মৈত্রী...' বলার পর নিজেই টের পেলেন উত্তেজনাবশে লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রলাপ বকছেন।

চুনি ছটফট করে বলল, 'আমি বাড়ি যাব, বাড়ি যাব।'

ক্রুদ্ধ সোনারু গর্জন করল সঙ্গে সঙ্গে। 'যা। তাই যা! ...নিমুখারাম জানমারিবংশ...আমার কোমরে ঘাড়ে, দরদ ধরিন দিলে...খালি প্যাটে তুকে আদাড় পানি কাদা...যাঃ, তাই যাঃ!'

'চুপ, চুপ!' অরু সিং বললেন। 'ওরে মেয়ে! খবর শুনলাম, ভাকারা তোকে ফিনিস করবে বলে ঘুরছে।'

চুনি পাষাণশব্দে বলল, 'করুক।'

অরু সিং হাসলেন শুধু। সোনারু ভেংচি কেটে বলল, 'কঁরুঁক!...যা দেখি...লেংড়ি পায়ে কদ্দূর যাবি, দেখি। আর ছোটআজাবাবুকে রিকশর কথা বুললি...' সে ক্রূর হাসল, 'ই রেতে ডাঙ্গাপাড়ায় কুনো রিকশ ঢুকবে না। হাজার টাকা দে, ঢুকবেই না। রাস্তাতেই ফিনিস হঞে যাবি। ভাব ইবারে বাড়ি যাবি কি না।'

চুনি বাস্তবতাটি বুঝে দমে গেল। প্রকৃতই সে বেঘোরে মরতে চায় না। সে জানমারি বংশ, লড়ে মরবে। আর অরু সিং বললেন, 'ঠিক বলেছিস সোনারু! ঠিক। কেন যে তোকে লোকে পাগলা বলে, বুঝিনে।'

একথায় উদ্দীপিত সোনারু ঘোষণা করল, 'আমি বাদে দুনিয়ার সব্বাই পাগলা, সব্বাই পাগলা, সব্বাই। বুঝে না গো? পাগলা যুদি বুঝে সে পাগলা, সে আর পাগলা থাকে না গো!'

'তুই যা বললি, সেটা জ্ঞানীর কথা।' অরু সিং তার প্রশংসা করলেন। 'আর তুই যা করেছিস, সেও মহাপুরুষের কর্ম। এই মেয়েটাকে নিয়ে তুই আমার কাছে কেন এসেছিস, বুঝি রে, বুঝি। কিন্তু বুঝলে কী হবে? আমি যদি একে শেল্টার দিই, ছোটনরা ভাববে, আমিই একে হাত করে...সর্বনাশ! থানাপুলিশ ছোটনের বাবার হাতে রে! ...কোণঠাসা হয়ে আছি, বাপ! ...আমার পার্টির অবস্থা তুই বুঝবি না' বলে আঞ্চলিক শব্দটি ব্যবহার করলেন, 'ছ্যারাভ্যারা রে!'

শেল্টার ইংরেজি শব্দটি 'ছেল্টার' রূপে চালু এবং সোনারু কেন, দক্ষিণডিহির তাবৎ ছাগলও এর অর্থ বোঝে। ফলে সোনারু আকুলিবিকুলি বলল, 'এতবড় বাড়ি গো! ছোটআজাবাবু, পায়ে পড়ি, শুদু ই রাত আর কাল দিনটুকুন লুকিন থোন খেপি বিটিটোকে। ...ই সোনারু উয়াকে পিঠে চড়িন ভিনগাঁয়ে থুয়ে আসবে...পিতিজ্ঞা।'

'পাগল রে, পাগল!' অরু সিং হাঁসফাঁস কবে বললেন। 'বুঝিসনে, কমিউন্যাল টার্ন নেবে। ছোটনরা রটাবে আমি মুসলমানমারা মেসিন রেখেছি ঘরে। পান্নার মাকে দিয়ে পুলিশ পাঠাবে।...'

সোনারু ধূর্তামির যোগান দিল, 'জানছে কে? ...জানবে কে গো? কাকপক্ষীটিও না।'

অরু সিং রেগে গেলেন। 'ধুর পাগল! আজকাল বাতাসে খবর হয়।' বলে টেনশন-নাশে সিগারেট ধরালেন এবং চোইত-পাগলকেও না চাইতেই দিলেন। কিন্তু সে কানে গুঁজল। সে বিড়ি সিগারেট খায় না। অরু সিং সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, 'বরং এক কাজ কর। তুই পান্নার মাকে খবর দে। মেয়ে ভুলে হোক, যে করে হোক, একটা কাজ করেই ফেলেছে, উপায় কী? সে মরলে তো পান্না বাঁচবে না আর। তাকে বুঝিয়ে বলে আয়।'

সোনারু আগ্রহে শুনছিল। বলল, 'হুঁ হুঁ। ভালা মজা!'

অরু সিং বললেন, 'তারপর এসে চুপিচুপি একে বাড়ি পৌঁছে দিবি! পিঠে চাপিয়ে...ঠিক যেভাবে এখানে এনেছিস।' বাক্যে দৃঢ়তা ছিল। শেষে অন্যমনস্ক বললেন, 'বখশিস পাবি, যা শিগগির।'

সোনারু নিজে বুঝল না, বখশিস অথবা সম্ভাবনাপূর্ণ প্রস্তাবটি, ঠিক কোনটি তাকে নাড়া দিয়েছিল। এখন সে ভারমুক্ত, কিন্তু ফটকটি বেশি দূরে সরে গেছে দেখে তার ধাবণা হল, রাজবাড়ির এটাই নিয়ম। একদা রাজোচিত গম্ভীর উদ্যান, ফোয়ারার উচ্ছ্বাস-কেন্দ্রে মৈথিলী বৈষ্ণবকবিতার পৌত্তলিকতায় পানিয়ভরণে গাগরী হাতে নতমুখী শ্রীরাধার অপ্সরামূর্তি, দারোয়ান, কাছারি খাজাঞ্চিখানা, হাজতঘর পর্যন্ত ছিল। পয়লা আষাঢ় পুণ্যাহ পরবে বাপের সঙ্গে খাজনা দিতে এসে সোনারুর শৈশব সেগুলিন সংগ্রহ করে। এ রাতে সেই শিল্পিত সংগ্রহশালা দুধারে তাকাতে গিয়ে ছ্যারাভ্যারা। তার হাসি পেল। সে পুনঃ পুনঃ 'ভালা মজা' বলতে বলতে হাঁটছিল। ভেজানো ফটক ফাঁক করে সে শালীনতায় লুঙ্গির কাছাটি খুলে দিল। লুঙ্গিটি হাঁটুর তলায় টেনে নামিয়ে সে, যেহেতু রাজবাড়ির দূত, নিজেকে সম্মানিত করছিল। আর হাইওয়েতে পৌঁছেই মনে পড়ে যায়, তার একফালি গামছা থাকার কথা। কোথায় গেল সেখানি, ভাবতে ভাবতে আকুল সে, ট্রাকড্রাইভারের গাল খেল, মাঝপথে হাঁটছিল। ডাইনে ইট ও টালিখোলা, বাঁয়ে পেট্রলপাম্প, গ্যারেজ, অ্যাগ্রোইন্ডাস্ট্রিজ কোং (লিঃ), শিবমন্দির, ক্রমশ দুধারে দোকানঘর, নিশ্চল ট্রাক-বাস-টেম্পো-সাইকেল রিকশর ঝাঁক, এত আলো, কিন্তু এখনই প্রায় জনহীন। সোনারুর চোইত পাগল চোখে একটা অস্বাভাবিক গা ছমছম ব্যাপকতা ঠাহর হতে থাকে। কেউ তাকে অনুচ্চস্বরে 'অ্যাই চোইতপাগলা' ডেকেই কেন চুপ করে যায়। বড় চুপচাপ লাগে প্রলম্বিত সেকুলার স্থানটিকে নৈঃশব্দের তলায় সন্ত্রাস ধরা পড়ল বাজার শেষে, যেখানে একটি টহলদার পুলিশভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল। লক্ষ্মণের চায়ের দোকানের সামনে বন্দুকধারী দঙ্গলটি দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল দেখে সে সভয়ে পাশ কাটিয়ে গেল এবং নালার সাঁকোয় নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে পুলিশগুলিনকে যথেচ্ছ গাল দেবে ভাবল। কিন্তু তন্মুহূর্তে তার স্মরণ হয়, সাঁকোর কালভার্টের নিচে কংক্রিট চত্বরে ভিজে গামছাটি দুপুরে মেলে রেখেছিল। ত্বরিতে সেটি উদ্ধার করে সে। অভ্যাসবশে উত্তরীয় করে দুই কাঁধে চাপিয়ে পিঠ ঢাকে। ডাঙ্গাপাড়ায় ঢোকার মুখে সে 'পালারে পালারে পাখি' প্রিয় গানটি গাইতে গিয়ে চুপ করল। চাঁদটি তখন মধ্যাকাশে। বিদ্যুতে ও জ্যোৎস্নায় থরে বিথরে যা কিছু দেখে এসেছে এবং সামনে দেখছে, তাসের ঘর—ছ্যারাভ্যারা হওয়ার চরম মুহূর্তটি আসতে যা দেরি, এরকম মনে হল। দুঃখিত সোনারু রাস্তা এড়িয়ে আগাছা জঙ্গল, পুকুরপাড়, যতটা সম্ভব নির্দল লোকসকলের বাড়ির কানাচ ঘেঁষে, ঘনসংবদ্ধ পাড়ার সরু গলি হয়ে পান্নাদের বাড়ির পেছনকার পুকুরের কাছে পৌঁছুল। আগের দিনকার শেয়ালগুলিন এভাবেই মুর্গিশিকারে পাড়ায় ঢুকত। এই পুকুরটি পান্নাদের এবং এপাড়ে টানা মাটির বাড়ি, বাঁশবন। এ শরতে পুকুরটিও ভরা। সে পাড়ের সমান্তরালে হাঁটুজলে খুব সতর্কতায় পা ফেলছিল। সন্ত্রাসের রাতে মৃদু শব্দই বিভীষিকা। জলও চিৎকাব করে, জানমারি এতই সাংঘাতিক ঘটনা। তবে সোনারু চোইত-পাগল, সে সদর রাস্তায় যেতে পারত। কিন্তু এই শেয়াল-গমনের কারণ সে নইমমাস্টারের বাড়িতে 'মাকুচালাচালি' কথাটি বুঝেছিল। কে বলতে পারে, কাজিরুন কিছু টের পায়নি? ফুলকুঁড়ি বলেছিল, 'দেওয়াল ফুঁড়ে চোখ যায়...!' পান্নাদের খিড়কির ঘাটে অতর্কিত গভীরতা। ঘাটটি পাকা। লুঙ্গির আদ্ধেক ভিজে গিয়েছিল। ঘাট আঁকড়ে সে আঁকুপাকু উঠল। খিড়কির দরজা বন্ধ। পাশে বিশাল শিরীষগাছ। গাঢ় ছায়ায় ঘাপটি পেতে সোনারু বাড়ির ভেতরকার ঘটনাবলী আগে জেনে নিতে চেয়েছিল।...

জানমারিদের বাড়িতে জানমারি আর পান্নার লাস মর্গ থেকে কখন আসবে, সকাল হতেও পারে, দুপুর হতেও পারে, ছোটনবাবুদের ট্রাক চলে গেছে, সশস্ত্র একটি দলও গেছে, স্ট্র্যাটেজিহেতু তারা মুসলমান লোক। খাদেমুন্নিসা বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে থামে হেলান দিয়েছিলেন। পান্নার ঘরে জরিনার ফোঁপানিটি সবে থেমেছিল। ঝকঝকে ফ্যানের ঘরঘর আওয়াজ এখন কানে বাজে। বাইরের দলিজঘরে একদল প্রহরী জানমারি তাস খেলছে বিদ্যুতের আলোয়, তক্তাপোষে। ভাকা বলেছিল 'চাচিজি! আপনার একপান্না গেল, একশ পান্না মজুত।' নিজের বুকে দমাদ্দম থাপ্পড় মেরে সে বলেছিল, 'আজ থেকে এই ভাকা আপনার পান্না আপনার মতি।' দুর্দান্ত জানমারি গর্জনমিশ্রিত হাহাকার করে শেষ কথা বলেছিল, 'তবে চাচিজি, আপনার বিটির কথা ভুলে যান। মনে করুন, আপনার বিটি নাই।' ওইসময় খাদেমুন্নিসা শোকে ও হিংসায় হুকুম দেন, 'লেংড়িকে তুরা ফিনিস কর বাপ! আমার দেলে রহম নাই।

হুকুম দিলাম, উয়াকে ফিনিস কর।' এই 'ফিনিসেও' জানমারিদের গোখবো আওয়াজটি ছিল। অনেক বেশি ছিল। এদিকে ডাঙ্গাপাড়ার যূথবদ্ধ শোকাকুলাদের কান্না নিজ-নিজ গেরস্থালি এবং ক্লান্তিবশে থেমে যায়। তারা চলে যায়, ফের আসে। ফের চলে যায়। পান্নার বউকে তার শিশুর মাতৃস্তনের দোহাই দিয়ে দুমুঠো গেলাতে পারে তারা। কিন্তু খাদেমুন্নিসাকে পারেনি। কিছুক্ষণ আগে শেষ দলটির সাধাসাধিতে আস্তে বলেন, 'ব্যাটার লাসের কবর হলে গোসল করে তবে খাব গো! জ্বালাতন আর কোর না আমাকে, কসম লাগে।'

এখন তিনি একা। এতক্ষণে ক্রমশ লেংড়িভেংড়ি বিটিটির কথা স্মরণ হয়। কোথায় আছে সে? কেন সে এমন কাজ করল? করল, করল—কিন্তু কাজিরুন দেখল কী করে? কাজিরুন যদি দেখল, নামুপাড়ার খবর হল কী করে? কাজিরুন বুক চাপড়ে কাঁদছিল। পান্না তার ভাঙ্গা ঘরের চাল ছেয়ে দিয়েছিল চাঁদা তুলে। পান্না তাকে ঈদে কাপড় কিনে দিয়েছিল। আর সেই কাজিরুন খবর দেবে, পান্না এখন নিরস্ত্র অপ্রস্তুত! কাজিরুনের কথা ভাবতে চুনি, চুনিব কথায় কাজিরুন, প্রৌঢ়া বিধবা, রাত যত নিশুতি হয়, তত ওজন করতে থাকেন। ক্রমশ চুনির শৈশব দৃষ্টিগোচর হয়, ক্রমশ বাৎসল্য তাঁকে কাতর করে। ভাবেন, রাগের বশে চুনি বোমাগুলিন পুকুরে ফেলে দিলেও পান্না আবার বোমা বানাতে পারত। ঠিক তখনই সন্দেহের পালাটিতে কাজিরুন ঝুঁকে পড়ে। দলিজঘরের কথাটি পাঠালেই কাজিরুন ফিনিস হবে, পুলিশ কোনওদিন কিছু ঠেকাতে পারে না, পারে নি, পারবে না, বিশদ জানেন। কিন্তু এ রাতে ফের জানমারির জন্য যতটা হিংসা দরকার, খাদেমুন্নিসার নেই, চুনি তাঁকে কাতর করছিল। চুনিকে যদি এতক্ষণ ভাকারা ফিনিশ করে থাকে? কোথায় কোন ধানক্ষেতে, বিলের জলে, কি কাদার তলায় পোঁতা রইল তাঁর লেংড়িভেংড়ি মেয়েটা। অমন সুন্দর বিটি, কী তার মুখের ছুরত! ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময় মৌলবির কথায় বাপ লজ্জা পেয়ে ধর্ম ভয়ে বিটিকে আটকালেন। এদিকে আজ চাষার ঘরের বিটিরা বড-বড পাস দিচ্ছে। ইসমাইলের মাথায় ধর্মের বাতিক ঢুকেছিল। বিটিকে আটকালেন, পর্দাবন্দি করলেন, কিন্তু কতদিন? সেই বিটি লেংচে-লেংচে পাড়া বেড়াল। বাপের জানমারির পর লাঠি হাতে বাজার-কলোনি-ছোটনবাবু—কত কত বাবুর বাড়ি-খাদেমুন্নিসার ভেতর থেকে কান্নার ফের একটি গোটা গলা ঠেলে এল, 'আহ্' শব্দে শ্বাসের সঙ্গে বের করে দিলেন এবং তৎকালে কেউ ক্ষীণ সুরে ডাকল, 'জনুনী গো!' খাদেমুন্নিসা সোজা হয়ে বসলেন। অন্তর্মুখিনতার ছেঁড়া জালখানি উড়ে গেল। কান খাড়া করলেন।

সোনারু ডাকছিল দুঃসাহসে, বেগতিক দেখলেই ধীরে জলগামী হবে, এমত ফিকির মাথায় রেখে। বিশেষ কোনও সাড়া না পেয়ে সে মরিয়া এবং নিজেই সাড়া দিল, 'আমি সোনারু গো, বিবিজি! ...লোকে চোইত-পাগলা বোলে গো, জনুনী...'

খিদে পেলে সোনারু এ বাড়ি এসে এভাবেই নিজেকে ঘোষণা করে। অথচ খাদেমুন্নিসা জানেন, যাকে ফিকিরি বলা হয়, সোনারু তা নয়। সে মুনিশও খাটে। খাদেমুন্নিসা ভাঙা গলায় খবর দিলেন, 'শোকের দিন সোনারু, রাঁধাবাড়া হয়নি।' তিনি বুঝেছিলেন, সদরদরজায় জানমারিদের নিরাপত্তা-বলয়টি দেখেই পাগলা খিড়কিতে।

এবার সোনারু বলল, 'খবর আছে মা...জলদি গো।' তার নেপথ্য কণ্ঠস্বরে লালসংকেত ছিল।

ফলে খাদেমুন্নিসা চমকে উঠেছিলেন। কোনওরকমে থান কাপড়ে মাথা ঢেকে টলতে টলতে উঠে খিড়কির দরজা খুললেন। গাঢ় ছায়ায় সোনারুকে কপালে হাত ঠেকাতে দেখলেন। 'কী খবর?' বলে চৌকাঠ আঁকড়ে ধরেছিলেন, খবরটি জানা এই বোধে। তিনি কাঁপছিলেন আচম্বিতে হিমে, যেভাবে তার ক্ষতবিক্ষত মুমূর্ষু স্বামী বলেছিলেন, 'এত হিম ক্যানে?'

'চুনিবিটি...'

সোনারুর শব্দটির ওপর খাদেমুন্নিসা চূড়ান্ত একটি হিম শব্দ চাপিয়ে দিলেন, 'ফিনিস...'

সোনারুর ছায়ামূর্তি খুব হাত নাড়া দিয়ে শিরীষপাতার শব্দে বলতে লাগল, 'দিত...দিবে...তাইগে উয়াকে পিঠে চাপিন ই ঠেঞে উঠেঞে ঘুরি গো...কেহু থল দ্যায় না...মানুষ কী, বুঝি না...খুদার ঘরও থল দিলে না গো...শ্যাষে ছোটআজাবাবুর বাড়ি...সেখানে থেকিন আসছি।' সে কথা শেষ করল,

'ছোটআজাবাবুও থল দিবে না। উনি বুললে কী, থল আপনি দেন, আপনার বিটি গো. .দশ মাস দশ দিন...' এই মৌল বিষয়ে তার আর বলার মত বাড়তি কথা ছিল না সে সাংকেতিক মূলনির্দেশ করল মাত্র।

খাদেমুন্নিসারও আর কান্না ছিল না কাঁদবার মত। চুনি ফিনিস হয়নি খবরে কান্নার দরকার থাকে না। বাৎসল্য মাথা তুলেছিল যেটুকু, নামিয়ে নেয়। তাতে চিরদুশমন অরু সিং-এর বাড়িতে আছে সে। আর যদি পেটের বিটি বলে মাফ করে দেন, ভাকা-ছোটনরা দেবে না, ওরা জানমারি, ওরা সব পারে, সুতরাং তাঁরই চোখের সামনে চুনিকে ফিনিস করবে। .. 'হা খুদা।' দুহাতে মুখ ঢাকলেন চুনির মা। জেনেছিলেন, তাঁর ছেলে ফিনিস হয়নি, প্রকৃত পক্ষে ছোটন-ভাকাদেরই লোহার বর্গা ধসে গেছে। পান্না আর তাঁর ছেলে ছিল না। তবে বড় দেরিতে বুঝলেন। বেবুঝ সোনারু বলল, 'তাহলে লিয়ে আসি...লুকিয়ে থুবেন গো দিনকতক...তাপরে আগুন লিভে যাবে।' সে উৎসাহে ঘুরেছিল জলের দিকে।

কিন্তু জননীআসনচ্যুত এক নারীর ত্রস্ত, বিপন্ন স্বর তাকে থমকে দিল। 'আম্মো থল দিতে পারব না...অরা জানমারি রে! চোখের ছামুতে বিটির জানমারি দেখতে বুলিস, তু পাগলা রে!...যা, যা! অরা দলিজে আছে, শুনতে পাবে।'

সোনারু ফের 'দশমাস দশদিন' ..বলেই দেখল দরজা বন্ধ হচ্ছে। সিধে, কিন্তু মুণ্ডুটি বাঁকা করে ক্রুদ্ধ চক্ষু চোইতপাগলা দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়া দেখছিল। এ মুহূর্তে তারও জানমারি হতে সাধ যায়, এত জ্বালা। আর, জ্বালা জাগলেই সে অর্ধাংশে পাগল হয়। বাড়িটিকে তাক করে পুনঃ পুনঃ দুহাতের আঙুলে মৈথুনমুদ্রা প্রয়োগে ধর্ষিত হতে দেখল তার অ-পাগল অর্ধাংশ। তারপর শব্দহীন জলগামী হল সে।...

এমনি বিভীষিকাময় ফ্রন্টে পরিণত এই রাত্রি, পরিখায় মাথাগুলিন নিচু, হেলমেট থাকলেও মাথা তুলে উঁকি মারতে ভয় করে। তাই পাড়াটি নিঃসাড় এবং লোকসকল নিশ্চুপ, কিন্তু হাতে-হাতে অস্ত্র সমুদ্যত। তারা জানে, পুলিশগুলিন ঘটনাকালে কাষ্ঠপুত্তলিকা থাকে। নামুপাড়ার মৌলবাদী মৌলবি নাসিরুদ্দিন এক জুম্মাবারে ভাষণে বলেছিলেন, 'ওরা বলে, মোসলমান ফ্যামিলি প্ল্যানিং করে না, কারণ নাকি মুসলিমিস্তানের খোয়াব...ওরা চায়, মোসলমান হাজার-হাজার কারবালায় কাটাকাটি করে খতম হয়ে যাক, ওদের পুলিশ এই কারবালাগুলিন থামায় না.. বেরাদানে ইসলাম! ভেবে দেখুন, নিজেদের মধ্যে কারবালা করবেন, না এককাট্টা হবেন? আমার কথা শুনুন, দুই পাড়ার মোসলমান একত্র করে হাতে হাত, দেলে দেল...ইসলামের দুর্দিনে ইউনিটি ফ্রেটাবনিটি...' এই জলদগর্ভ ভাষণের পর প্রবীণেরা ধর্মহেতু নমনীয় হলেও জনান্তিকে হারুন জানমারি বলে, 'শালো মোসলমান দ্যাখায় হে! ভিতরকার কথা বুঝে না...। ওবে, তোর বাপ-ভাই যতি লোহু মেখে পড়ে থাকত; তু কী করতিস দেখতাম!' উক্তিটি কানে গেলে শাস্ত্রবিদ বড়ই ভয় পান এবং আর কদাচ ভুলেও স্থানীয় ইস্যু তোলেন না, তিনি আন্তর্জাতিক ইস্যু ইরান-ইরাক লড়াই, পি এল ও, থেকে দৈনন্দিন তাত্ত্বিক ক্রিয়াকর্ম রিচুয়ালসে আনাগোনা করতে থাকেন। এদিকে ক্লিশেতে পরিণত সরকারি অর্থনৈতিক সমীক্ষায় পরিলক্ষিত তত্ত্ব 'খণ্ডীকৃত কৃষিজমি'র বাস্তবতা সাব্যস্ত হওয়া অন্তর্বর্তী শান্তিকালগুলিনের, এমন কী 'মিলনী ক্লাব' স্থাপনেরও মৌলিক হেতু। হারুনের জমির পাশে পান্নার জমি, কিংবা একপাড়ার সন্নিহিত মাঠে অন্যপাড়ার লোকসকলের জমি পতিত থাকলে অথবা চাষবাসের পর শস্যবতী হলে, যদি সেই শস্য ঘরে না আসে, মানব-অস্তিত্ব বিপন্ন হয় এবং চোইতপাগলা এক ম্যাজিসিয়ানের প্রতিধ্বনি করেছিল, 'ভাইরে! সব মিথ্যে পেট সত্য।' কথাটি মনে ধরছিল সকলের। তবে বিশেষ কথা, 'মিলনী ক্লাব' স্থাপনের পিছনে বিরেংবাবু এম এল এ, সরকারি গ্র্যান্ট, অরু সিংহের পার্টির হাত থেকে নামাপাড়াকে উদ্ধার এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছোটনের অ্যাম্বিশমুন। সে এলাকার মাফিয়ামনোপলি চেয়েছিল। হারুন প্রমুখ জানমারিদের হুইস্কি খাইয়েছিল। ব্লু-ফিল্ম দেখিয়েছিল। একটি কালার টিভিও সেই সইদুর হাজিকে পরোক্ষ চাপ দিয়ে মিলনী ক্লাবে বসিয়েছিল, সেটিও দুপক্ষের একত্র উপভোগের মিডিয়া হয়ে ওঠে। দুঃখের বিষয়, পরে সেটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ধ্বংসতালিকায় চলে যায়।

চোইত-পাগল যখন হতাশ হয়ে হাইওয়েতে ফিরে আসছে, তখন থানার মেজবাবু বিক্রমজিৎ জননেতা পরিতোষকে তাঁর প্রিয় অ্যান্টিসোস্যাল-তত্ত্ব খাওয়াচ্ছিলেন রামসহযোগে, তবে রামটি পরিতোষেরই। 'প্রবলেম হইল গিয়া রুরাল আনএমপ্লয়মেন্ট...করবেনটা কী আপনে...কন মশায়! পোলা অ্যান্টিসোস্যাল হইলে ফাদাব ভাবে, আর তারে পায় কেডা...পোলা তার অ্যাসেট। অ্যাম আই রাইট?' একথায় পরিতোষ সহাস্যে বলেন, 'অপোজিশানের লোক আমি, যদি বলি রুলিং পার্টি রুল করতে অপারগ, দুষবেন। বলুন, মানুষ হাতে আইন তুলে নিচ্ছে ক্যানে, বলুন আপনি? ...ইয়ার পর দেখবেন, ক্রেমে ক্রেমে...' রামের সাহসে সাহসী পরিতোষ পুনশ্চ খ্যা খ্যা করে বলেন, 'যখন পুলিশের গায়ে হাত পড়ে, তখন পুলিশ অ্যাকটিভ হয়...নকশাল আমলে দেখেছি, ওরে বাপ রে! ...বলুন?' বিক্রমজিৎও খি খি হেসে বলেন, 'দাদা! আপনারাই পুলিশেরে এমন করছেন। ...সাপোজ, ছুটনবাবুরে অ্যারেস্ট করলাম...সঙ্গে সঙ্গে গেম শুরু. .শ্যাষে দিল পাঠাইয়া কোন বাদাবনে...দাদা, পুলিশের পলিটিক্স যদি এক্সপ্লয়েট করে, পুলিশও করবে...কন, অ্যান্টিসোস্যাল পুষছে কারা?' এই জটিল প্রশ্নে কাত পরিতোষ গেলাসে চুমুক দিয়ে হাসতে থাকেন, খালি হাসেন। তিনি জানেন না, মেজদারোগা হারুনদের ক্লু টুঁড়ে বেড়াচ্ছেন। কিয়ৎক্ষণ আগে সদর থেকে রেডিও মেসেজ এসেছে, কড়া হুমকি। কিন্তু পরিতোষের আহ্লাদেপনার কারণ বোঝেন। পান্না, অ্যাটিলা দা হুন মর্গে শুয়ে আছে।

সতত নজরদার চোইত-পাগল মেজবাবুকে সবে পরিতোষের ঘর থেকে বেরুতে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল, লেংড়িভেংড়ি বিটিটির কথা বলবে নাকি, কিন্তু বরাবর সে পুলিশ দেখলে দুর্জ্ঞেয় আতঙ্কে সিঁটিয়ে যায়। আর তাকে দেখামাত্র মেজবাবু বেটন নেড়ে ডাকলেন। সোনারুকে তিনি চেনেন, যে সর্বচর, অতএব পান্নার ঘাতক আসামিদের গতিবিধির ক্লু মিলতেও পারে, আশা ছিল। কিন্তু ওই বিভীষিকা-সংকেত সোনারুকে শেয়ালদৌড়ে বাধ্য করল। পরিতোষ মেজবাবুর হাস্যধ্বনি শুনে বেরিয়ে বললেন, 'ক্কী ক্কী?' মেজবাবু আস্তে বললেন, 'পাগলটা।' তারপর সাইকেলে চাপলেন, গতি সোনারুর উল্টোদিকে। তিনি রাম-দশায় খালি শালা শালা জপছিলেন।

ভয়ার্ত সোনারু ইটখোলার আদাড়ে ঢুকেছিল। জুলজুলে চোখের দৃষ্টি হাইওয়েতে নিবদ্ধ, বাজার এলাকাব ল্যাম্পপোস্টের আলোর কমজোর, তবু আত্মপ্রসারী তরঙ্গগুলিন যেখানে নিঃশেষিত, সেখানে জ্যোৎস্নাসীমান্ত এবং মেজবাবুকে সেখানে দেখা যায়নি, ফলে সে সাহস ফিরে পেল। এইসময় নিচে গর্তগুলিনের দিকে 'কঁক্ কঁক্' গভীরতর আর্তনাদে সাপের মুখে ব্যাঙের ছটফটানি ডাকে বরাবরকার মত ব্যথিত করল এবং সে একইস্বভাবে দুকানে আঙুল গুঁজে উঠে দাঁড়াল। 'জানমারি গো' স্বগতোক্তি করে সে দ্রুত পালিয়ে এল হাইওয়েতে। বহু বছর আগে এই কষ্ট তাকে 'পরোজি' (নিরামিশাষী) করেছিল। ফলে মুসলমানলোকের ভোজকাজে সে শুধু ডাল-কুমড়োর ঘ্যাঁট খায়। সকলে জানে, এই নামে মুসলমানলোক ডাকে-কাফের চোইত-পাগলাটি 'পরোজি'। এমন পরোজি একদা প্রচুর ছিল এতদঞ্চলে, বিজ্ঞ ইতিহাসকার এদের বৌদ্ধবংশোদ্ভূত মুসলমানলোক প্রমাণের লোভ সম্বরণে অসমর্থ। কিন্তু তারা যথার্থই বলে, 'জানোয়ারের গন্ধলাগা জিনিস সইতে পান্নে হে,' আর মাছও জানোয়ার তাদের বিচারে। 'বস্তুত এর ফিজিওলজিক্যাল-সাইকোলজিক্যাল ব্যক্তিগত বিশেষ কন্সটিটিউশনঘটিত ব্যাখ্যা হয়', প্রাক্তন নকশাল অধুনা বিজ্ঞান-শিক্ষক হাফিজুল হক একদা টিচার্সরুমে এবম্বিধ তর্কের অবতারণা করেন। 'ব্যক্তিগত খাদ্যাভ্যাস', তাঁর সিদ্ধান্ত, কাউকে 'কনভিনস্‌ড্' করতে ব্যর্থ হয়।

সোনারু হাইওয়ের ধারে গাছের ছায়ায় গুপ্তভাবে ব্যথিত হাঁটছিল। আজ রাতে সবখানে খালি কুলক্ষণ, 'কঁক কঁক' আতুস কান্নাটি তাকে আরও কোমল করেছিল। এমত সময়ে দূরে হলুদ উজ্জ্বল আলো আসছিল দেখে সে প্রকাণ্ড অর্জুনের আড়ালে সেঁটে গেল। একটি জিপগাড়ি আসছিল সদরশহর থেকে। অরু সিং-এর বাড়ির সামনে গতি কমানোর মধ্যে হুমকি ছিল, যা সোনারু বুঝল, যেহেতু জিপে ছোটনকে আবিষ্কার করেছিল। সোনারুর নিশাচর দৃষ্টি এমনই তীক্ষ্ণ যে, তাকে মানুষ ও নিশাচর বন্য প্রাণীব সীমান্তে দাঁড়ানো ধারণা হয়, তাকে কেউ কেউ বলেও বটে, 'ই শালো এক জন্তুমানুষ!' জিপগাড়িটির সহসা গতিহ্রাসে যে পেশীপ্রদর্শন ছিল, ইলেকট্রিক হর্নের তীক্ষ্ণতা তাকে রণং দেহি বিশেষণে ভূষিত করল। চোইত-পাগলের মত মানুষও এতে বিপজ্জনক ভাবিষ্যতের ঘ্রাণ পেল। এমন

কী, তার মিশ্রচৈতন্যে এমত বোধ সঞ্চারিত যে, যুদ্ধটি সেকুলারই হবে। তার মন 'হায় হোসেন হায় হোসেন' মর্সিয়া গাইছিল। জিপগাড়িটি ঝড়বৃষ্টিকারী প্রবাহ, পুনঃ গতিবান হলে জ্যোৎস্নারাত্রিকে নেতিয়ে পড়া ভিজে ন্যাকড়াকানি মনে হয়। ক্রমশ নৈঃশব্দ ফিরে এলে পোকামাকড়গুলিনের ডাক ফের শোনা যায়, সকলেই মর্সিয়া গাইছিল।...

সন্ধ্যারাত্রি সাতটা পঁচিশে বীরেন্দ্রনাথ ছোটনের সঙ্গে নজর আলি, আসগার, ভানু, সাট্টাকে দেখেই বুঝতে পারেন ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু ঘটনাটি ঘটবারই কথা, ঘটে থাকে, ভেবে গম্ভীর উদাসীন হন, বলেন, 'খালি তোদের...যখনতখন...ডোবাবি ভরাডুবি', এবং তখন চেম্বারে কতিপয় মক্কেল ছিল। ছোটন মৃদুস্বরে বলে, 'পান্না।' তিনি ভুল বুঝে হাত নাড়তে থাকেন, 'তোদের ওতে আমি নেই, তোদের ওতে আমি নেই...' তখন আসগার ডুকরে কাঁদে, 'পান্না ফিনিস গো...উয়ার হারামজাদি বুনটো...' সতর্ক রাজনীতিক দ্রুত বলেন, 'ছোটন, তোরা ভেতরঘরে গিয়ে বস। যাচ্ছি।'

বীরেন্দ্রনাথ কাঁপছিলেন। ভারতীয় গণতন্ত্র ভীষণ জটিল। সেই জটিলতা এভাবে অনুভূত হয়, মুসলিমভোট থাকলে লজিক্যালি হিন্দুভোটও থাকতে বাধ্য, ভোটগুলিনকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়,...হুঁ, অধুনা গ্রামীণ জনগণ রাজনীতিসচেতন বটে, কিন্তু সেই রাজনৈতিক চৈতন্য এবং ব্যালটবক্স সম্পর্কহীন, স্থানীয় ইস্যুগুলিন আছে, আর ব্যক্তি তো যন্ত্র নয়—পক্ষান্তরে ব্যক্তি এমন দ্বিপদ প্রাণী, সে কী করছে অনেকসময় নিজেও বোঝে না, এবং পান্নাবা আছে, ভানুরা আছে, প্রতিদ্বন্দ্বীশিবিরেও সেই ফোর্সগুলিন আছে, ...এইসকল বাস্তবতাবিকীর্ণ চিন্তা তাঁকে মক্কেলগণের প্রতি বিনয়ে বলায়, 'সকালে, সকালে! ...বুঝলেন, নিজের কন্সটিট্যুয়েন্সিতে ঝামেলা! ...পুলিশকে কাজ করানো, বুঝলেন, ...কলোনিয়াল ট্র্যাডিশান...ওদিকে ব্যুরোক্রেটিক সেট-আপ, সেও কলোনিয়াল হ্যাং-ওভারে ভুগছে...' তিনিও বরাবর এভাবে আঞ্চলিক প্রথাসিদ্ধ সাংকেতিকে কথাবার্তা বলেন, আদালতকক্ষেও। তিনি তাঁর বাবার মত বলিয়ে-কইয়ে মানুষ নন, রেটরিক আসে না, বড়বেশি বস্তুবাদী এবং ইটকে ইট-ই বলেন।

ছোটনের মা দোতলায় টিভি দেখছিলেন। বোন গৌরীর নাটকের মহড়া ছিল, ফিরতে দেরি হবে। টিভিতে 'রজনী' ছেড়ে জনপ্রতিনিধির স্ত্রী, খবর পেলেও বাৎসল্য কিছুক্ষণ ধামাচাপা রাখেন, তিনি স্বগতোক্তি করছিলেন মুহুর্মুহু, 'উঁ...দ্যাখো, দ্যাখো, দেখে শেখো...জব্দ জব্দ...' প্রৌঢ়া খিলখিল হাসছিলেন, বালিকাহাসি। ওই ক্ষণে আসমুদ্রহিমালয় ভারতও বালক-বালিকাতে পরিণত হয়েছিল, 'রজনী' এমনই এল এস ডি।

নিচে দক্ষিণডিহির রিপ্রেজেন্টেশনের মুখমুখি গুরুভার জনপ্রতিনিধি-শরীর পাহাড় থেকে পাথর খসা, এইভাবে গদি-আঁটা চেয়ারে বসেন। অমনি ছোটন বলে ওঠেন, 'বলতে এলাম, অ্যাকশন শুরু হবে। আমার হাত কাটা গেল...'

বীরেন্দ্রনাথ প্রথমে আস্তে লালসংকেতে বলেন, 'মার্চে ইলেকশন'। পরে আসগারকে বলেন, 'বল্ বাপ, শুনি।'

আসগারের রক্তচক্ষু সিক্ত, নাসারন্ধ্র স্ফীত, সে বাকপটুও নয়। চিরশীতল ভানু, যার বাবা রত্নাকর কামার সিংহ-বাড়ির কালীপুজোয় একা ১০৮ পাঁঠা কেটে একবছর রেকর্ড করেছিল, বি কম ফেল যুবক, নকশাল আমলে পুলিশের ইনফরমার সন্দেহে বাল্যবন্ধু অনিলের চোখে চোখ রেখে ক্ষুরে শ্বাসনালী কেটেছিল, সে শীতল কণ্ঠস্বরে ঘটনা বিবৃত করতে থাকে এবং একথাও উল্লেখ করে, ডিপটিউবেল সেন্টারে ডিউটিকালীন, দুপুরে, সে পান্নার বোনকে দূর থেকে মাঠপুকুরের জলের ধারে আবিষ্কার করেছিল, শালীনতাবশে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিল। সেটি শৌচকর্মের জলাশয় মাত্র।

নজরআলি বলে, 'উয়ার বিহা হয় না, লেংড়িভেংড়ি...তাতে ভিনগাঁয়ে উয়াদের জানমারির বাড়ি বুলে গো! মুনে হয় কী, হারুণরা কেহু উয়াকে বিহার ফাঁদে ফেলেছিল।'

ছোটন শ্বাস ফেলে বলে, 'পান্না সেদিন বলছিল, বোনটার বিয়ে হচ্ছে না...।'

'কিন্তু চেহারা তো সুন্দর।' তার চিন্তিত পিতা আঙুল মুচড়ে বলেন। মুট মুট শব্দ হচ্ছিল। 'ডাউরি দেবার ক্ষমতাও ছিল। বংশ ভাল, মিয়া-ভদ্র ঘর।'

আসগার ফুঁসেছিল। 'উ কারুর ভাত খেত, ভাবেন গো? খাবে? জিদি, কথায়-কথায় বিজলি তেজী...কাঁকড়া বিছা গো...বিছুটিঝাড়...' সে উপমার জঙ্গলে ঢুকছিল।

ছোটন সহসা সোজা হয়ে বলে, 'বলতে এলাম, তুমি তোমার কাজ কর, আমি আমার কাজ করি।'

বীরেন্দ্রনাথ পুত্রের এই আল্টিমেটামে অপমানিত বোধ করেন। 'মর্। আমি দক্ষিণডিহি যাব না। তোরা মর কাটাকাটি করে। কমিউন্যাল রায়ট বাধুক, ফাণ্ডামেন্টালিস্টরা ওত পেতে আছে। আর, ...দরকার হলে আমি রাজনীতিই না হয় ছেড়ে দেব। পার্টিতে আমার ইমেজের শ্রাদ্ধ...' তাঁর নিচের পার্টির শূন্য দাঁতটি বেরিয়ে পড়েছিল, যেন সদ্য খসে পড়ল। এমন কদর্যতা ভ্রূভঙ্গিতেও ছিল।

ছোটন উঠে দাঁড়িয়েছিল, ভানু তাকে টেনে বসায়। 'বাবার দিকটাও দেখা কর্তব্য হে! সব জিনিসের লাইন আছে। লাইন ধর।' বলে সে আইনজীবী-জনপ্রতিনিধির দিকে ঘোরে। 'জেঠু, আপনি ছোটনের ওই কথাটা মেনে নেন। আপনার কাজ আপনি করুন।' সে একটু শীতল হাসেও। 'পিসমিটিং পিসকমিটি, যা সব করার করুন দক্ষিণডিহিতে—কালই। শুধু এটুকু জানাবার কথা, কী—আমরা অ্যাকশনে নামছি। ...না জেঠু, অপারেশন ব্লুস্টার না, ...সম্বচ্ছব টুক টুক করে, ধরুন, একখানা, দুখানা, তিনখানা, এভাবে। তবে আপনি ডিস্ট্রিক্টের সেন্টারে আছেন, একটু দেখবেন। দেখলে পরে নামুপাড়া আপনার হাতে আসবে।'

নামুপাড়া হাতে আসার সম্ভাবনা বাজিয়ে দেখতে দেখতে বীরেন্দ্রনাথ মনোযোগে শুনেছিলেন। কথা শেষ হলে তিনি উত্তেজনায় প্রচণ্ড নড়বড় করে বলেন, 'তাই বলে পান্নার ডেডবডিতে পার্টির লেবেল...না বাপ, এসব সিঙ্গিরা করে-টরে। আমরা অ্যান্টিসোশ্যালদের বডি ক্লেইম করি না।'

নজর আলি দাবি তোলে, 'ই কী কথা মশাই? পান্না আপনার পাট্টির সাপোট্টার ছিল না? খাটেনি ভোটে? আসছে-ভোটে খাটত না বেঁচে থাকলে?' সে হুংকৃতস্বরে ফের বলে, 'পান্নার দাদো ইসুফমিয়া আর আপনার বাবা পলিটিক্স করেনি একপাট্টিতে? পান্নার বাপ পলিটিক্স না করুক, সাপোট্টার ছিল না আপনার পাট্টির?'

ভানু বলে, 'দক্ষিণডিহিকে শুনেছি রেড এরিয়া বলা হত।' দৃঢ় পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টিকারী এই বাক্যে শীতলতা কমে গিয়েছিল।

আসগার বলে, 'বাপদাদোর মুখে শুনেছি, পান্নার দাদি লালঝাণ্ডাল হাতে মিছিল করে কত গাঁয়ে ঘুরত...' বলার পর সে বাঘের হুংকার ছাড়ল, 'মশাই! এখুন রাজনীতি বেক্তিগত।' কথাটি পান্নার প্রতিধ্বনি।

বেকায়দায় পড়ে জননেতা বলেন, 'হ্যাঁঃ।'

জোরে শ্বাস ছাড়েন। 'বডি মর্গে গেছে? ..ঠিক আছে। ...লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া হবে। ছোটন, ওপরে যা। এদের চা-ফা...' বলে তিনি টেলিফোন করতে উঠে যান। দরজায় গিয়ে ফের বলেন, 'বড় ভাল ছেলে ছিল রে!'

সোনারু রাস্তা ফাঁকা দেখে ত্বরিতে ওপারে গেল। ফটকের গায়ে চাপ দিয়েই বুঝল অর্গলবদ্ধ। মোটা লোহার গরাদের ভেতর নাক ঢুকিয়ে সে স্বভাবমত নিজেকে ঘোষণা করার আদ্য-ধ্বনিতে একটু আগে শোনা সাপের মুখে ব্যাঙের করুণ কাঁদন 'কঁক' টের পেল এবং গলা ঝাড়ল। আজ রাতে এই মৃত্যুযন্ত্রণা সকল জীবে প্রতিধ্বনিত অনুভব করেছিল চোইত-পাগল, অথবা খিদে ও ক্লান্তি এমন অনুভূতি সৃষ্টি করে মানবচৈতন্যে। আর এ সময় ডানপাশের গাছগুলিনের প্রগাঢ় ছায়ার ভেতর থেকে গোপনীয় আতুর ডাক ভেসে এল, 'ইখানে গো!' নিমেষে সোনারু ছুটে গেল। 'ই কীরি...বিটি তু ইখানে...হায় হায়, শালোর বিচের দ্যাখো হে!' মেহগিনি গাছের গুঁড়ির আড়ালে পুঁটুলির মত চুনিকে সে আবিষ্কার করল।

চুনি অনুচ্চস্বরে বলল, 'আমি বানভাসা গো...থল পাব না।' আশ্চর্য ঘটনা, সে হাসছিল। 'অরুবাবু বুললে, বাহিরে যেঞ্জি অপিক্ষে করো ..কহা যায় না, যতি নামুপাড়ার লোক আসে, তুমাকে দেখবে। আমি বুলি, বাবুজ্যাঠা! তাথে কী? ...অরুবাবু বুললে. মোসলমানের মুন বুঝা দায়. .তুরা আজ আলাদা

আছিস, কাল মৌলবি বুলবে, মোসলমান এক হও, পরশু বিরেংবাবু এসে বুলবে, তুমরা এক হও, তুরা এক হঞে যাবি। তখন আমার দোষ হবে। নামুপাড়া ডাঙ্গাপাড়া এক গলায় বুলবে, সিংবাবুরাই লটঘট বাধায় খালি, ...আর চাচা, শুনো গো, শুনো। বুললে কী, মোসলমানকে বুঝা কঠিন, ...মিরজাফর বুলে দুষলে। কেলাবের কথা তুললে পজ্জন্ত...'

সোনারু কোমরে জড়ানো গামছাখানি খুলে মাথায় জড়াল। 'ডর!' বলে সে জ্যোৎস্না দিয়ে দাঁত-ধোয়া ভঙ্গি করল। 'ডর, বিটি রি! ই রেতে দেখি, সবঠেঞে সক্কল লোকে মেলোয়ারি জ্বরে হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করছে। ভুল বকছে খালি। শালো-শালীদের কপালে পানি-পট্টি দে।'

চুনি বলল, 'অরুবাবু বুলছিল, রুটি আনি, খা। আমি বুললাম, নাহ্।' জ্বলাপেটেও একথা বলতে পারার অহঙ্কার তার 'নাহ্' পুনরাবৃত্তিতে হুঙ্কৃত হল।

চোইত-পাগল বলল, 'জান বড় না মান বড়? বিটি, তোর আহিংকেরে ই পাগলারও আহিংকের...ই মানুষ বুঝে রি।' সে আনমনে ফের বানভাসিতে থল টুঁড়ছিল। দৃষ্টি চাঁদটির দিকে। চাঁদটিকে ঢুলুঢুলু দেখাচ্ছিল।

'চাচা, মা কী বুললে কহো, আগে শুনি।' চুনির কথায় চ্যালেঞ্জ ছিল।

আনমনা সোনারু বিড়বিড় করল, 'বানভাসা গো বানভাসা! ...বিবিজিরও মেলেয়াবি জ্বর হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ...থল দিবে না...ডর! বুললে, চোখের ছামুতে বিটির জানমারি সহ্য যাবে না। তবে কথাটো ঠিক। মেয়েমানুষ!'

'মা বুললে?' চুনি পোকামাকড়ের গলায় বলল। 'আর?' তার প্রশ্নে পুনশ্চ চ্যালেঞ্জ ছিল।

চোইতপাগল বুঝেছিল বাস্তবটিকে। বলল, 'মাজনুনী লোহুর গোটা গব্‌ভে ধরে...দশমাস দশদিন পরে পেসব করে। তন খাওয়ায়...ক্রিমেক্রিমে বাড়ে...তখুন সে আর মায়েরও না, বাপেরও না,...পরহাতি।' দুঃখিত দার্শনিক সমস্যাটি বোঝাতে চাইছিল, 'পান্না বড় হঞে আর মায়ের ব্যাটা ছিল না। তোর ভাই ছিল না। পান্না লিজেরও কেহু ছিল না। ...পরহাতি।' সে হাঁসফাঁস করে পুনশ্চ বলল, 'তোর মায়ের কুনো দোষ নাই, দোষ দেখি না। ইবারে ভাব্ কথাটো। মুনের ভিতরে ভনভনা তু!' সোনারুর মনের ভেতর যে-মাছিটি ভনভন করছিল, সেটি চুনির মনের ভেতর পাঠানোর চেষ্টা ছিল এই বাক্যে। সে সাপের মুখে ব্যাঙটির আর্তরবে, চুনিকে চুপ দেখার পর, বলে উঠল, 'আমরা মুনিশখাটা গো! মুনিশখাটা মরি।'

চুনি ডাকল, 'চাচা!' সে চোইতপাগলের জ্ঞানগর্ভ মুনিশখাটা কথাটি বোঝার চেষ্টা করেনি, সে রাস্তা টুঁড়ছিল।

'বিটি!' সোনারু তখনও দার্শনিকতা-ভারাক্রান্ত। ফলে আনমনা তার দৃষ্টি, চন্দ্রদর্শী।

'এতই কষ্ট কল্লে, বাপেও করত না...আরেকটুন কষ্ট খালি...' চুনি কষ্টকর বলছিল। সোনারু আনমনা 'হুঁ' দিচ্ছিল। চুনি প্রার্থনাবাক্যে বলল, 'পাকুড়িতে আমার মামুর বাড়ি থল মিলবে মনে হয়...খালি ছিরুটি রেলের ইস্টিশনে ট্রেনে তুলে দিলেই...দুকোরোশ রাস্তা, চাচা...ট্রেনের চেকারবাবুকে হাত খান দ্যাখাব, পাখান দ্যাখাব, লেংড়িভেংড়ি, টিকিট মাফ দেন সার, বুলব...ও চাচা, এইটুকুন কষ্ট।'

সোনারু ধপাস করে বসে পড়ল, পায়ের তলায় খচ করে কাঁটা ফুটলে মেঠোলোক এই ভঙ্গিতে সহসা বসে। চুনির বাক্যেই কাঁটাটি ছিল। কাঁটা ওপড়ানো যন্ত্রণা ও প্রতিহিংসা চোইত-পাগলের মুখে জ্যোৎস্নায় প্রকট হওয়ায় তাবৎকালের ঐতিহাসিক জ্যোৎস্নাস্তুতি প্রকৃতই কদর্যস্রাব দেখাচ্ছিল। বিশেষ করে একদা এই সন্ধি-খ্যাপাই জ্যোৎস্না ও চাঁদ দেখিয়ে বলেছিল, 'শালো হাগে হে! গুয়েমুতে দুনিয়াটো ভেসে গেল।' মাঝে মাঝে প্রকৃতি আর মনুষ্যনির্মিত বস্তুসকলকে পরিহাস-ব্যঙ্গ বিদ্রূপে সে ন্যক্কারজনক করে ফেলে। আবার সে কোনও-কোনও সুখকালে সমস্ত কিছুর প্রতি আবিষ্ট হয় এবং 'অলো ম্যাথ্‌রানি/আমার একটুনখানি/পা টিপেঞে দে' এই রঙ্গগীতি গায়। কিন্তু এখন মেহগনিতলায় বসার পর তার সন্ন্যাসী-মুখের সমস্তটা জ্যোৎস্নামাখা, তাই যন্ত্রণা ও প্রতিহিংসায় বিকট ভাঁজগুলিন চুনিকে চমকে দিয়েছিল। সে প্রশ্ন করতে গিয়ে থামল। সোনারু এবার তার দিকে তর্জনী বাণবৎ স্থির রেখে বলল, 'তু জানমারিবংশ.. তোর বুকে রহম নাই...ই প্যাট-জ্বলাকে তু ঘুড়া ভাবিস! ঘুড়ারও দানাপানি

লাগে!' সে ফ্যাঁচ করে নাক ঝাড়ল। 'তোর লিজের ছুরতের কথা ভাবিস...ইঃ, ছুরত তোর একলা আছে রি? আমার নাই? ...ছুরত নাই, আমি হাওয়া-বাতাস রি! ...তু কুটা খ্যাড়, তোকে ভাসিঞে লিয়ে যাব! ...হঁ, আমি হাওয়া-বাতাস—তাই-ই! কিন্তু ই রেতে আমি বহি না...আমি বন্দ হঞে আছি, পাতাটিও লড়ে না। ক্যানে, কী...হাওয়া-বাতাসেরও দানাপানি লাগে।'

চুনি, জানমারিবংশ, রেগে গেল। 'আমি তুমাকে ঘুড়া করেঞেছিলাম, না তুমি লিজে ঘুড়া হয়েঞেছিলা? ...তুম্মো বেরহম...তুমিই আমাকে বিরিজের কাছে ছিনাঞি লিলে...ঘুরিন মাল্লে। এখুন আমাকে দুষো।' সে ভাঙ্গা খোঁপা বাঁধতে লাগল, একটা কিছু করবে এমত উদ্দীপনায়।

সোনারু যুক্তিতে পরাস্ত, সে তর্জনীবাণটি নিজের বুকের দিকে ঘোবাল। 'ইখানে কুন শালো বসেঞ আছে, আমাকে দিঞে করায়, আমি কিছু করি না।' এই ক্লিশেতে পরিণত ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্বটি হরিপদ বাউলের প্রতিধ্বনি, তবু এ মুহূর্তে সোনারুর ঘোড়া-হওয়ার পক্ষে মোটামুটি একটি যুক্তি। সে এই তত্ত্বে আরও একটি মাত্রা যুক্ত করল, 'বিটি, তু পাগলার পাল্লায় পড়েছিলি। ই সোনারু চোইত-পাগলা নয়, গুটা পাগলা—এট্টুকুন বাকি নাই।' নিজের উদ্দেশে নির্দয় শব্দহীন হাসল এবং জ্যোৎস্না হাসিটি এবার মড়ার খুলির দাঁতে রূপ দিল।

ফলে আবার চুনি ভয় পেয়েছিল। আবার তার ধারণা হল, লোকটি সোনারু নয়, প্রকৃত একটি জিন। সে জিনের পাল্লায় পড়েছে। মানুষের মধ্যে ভালমানুষ মন্দমানুষ থাকার মত জিনেদেরও ভাল জিন মন্দ জিন আছে। এটি একটি মন্দ জিন সুনিশ্চিত। জানমারিবংশের মেয়েকে শাস্তির প্ররোচনা দিয়েছিল মনের ভেতর ঢুকে, যা জিনেরা পারে এবং দেখা গেল, সেই শাস্তিক্রিয়াটি কত সাংঘাতিক অশান্তির ছিদ্র ছিল, তার ভাই পান্না ফিনিস হল, সে নিজেও ফিনিস হওয়ার মুখে পড়েছে, আর এই মন্দজিনটি তার ফিনিস হওয়ার আগে যথেচ্ছ কষ্ট অপমান লাঞ্ছনা ভোগাচ্ছে, দগ্ধে দগ্ধে তবে 'ফিনিস'-এর মুখে ফেলে দেবে! চক্রান্তকারী মন্দজিনটিকে সে পবিত্র বাক্যখোদিত লাঠিটি দিয়ে আঘাত করবে, এভাবে লাঠিটির মুঠো ধরেছিল। খুলি ফেটে মগজ ছিটকে পড়ার উপযোগী আঘাত তার সংকল্পে ছিল।

কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াটি দ্রুত ছিল না, যে-দ্রুত প্রতিক্রিয়া বিষাক্ত সাপের বেলায় ইনটুইশানহিসেবে গণ্য হয়। তাই সেটি কার্যকর হতে বিলম্ব ঘটেছিল। ততক্ষণ চোইত-পাগল উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, 'বিটি! মটরগাড়িতে পেঠরুল না দিলিন গাড়িখান চলে না...আর দুদণ্ড অপিক্ষে কর, পেঠরুল ভরিন লিঞে আসি...হেবজুল মাস্টার গো!' সে বাঁকা নিঃশব্দ হাসছিল। 'ই রেতে উয়ার পরীক্ষে। ক্যানে কী, বড় পঢ়নবাজ...নকশাল কুমরেড হঞেছিল, বিটি, ই রেতে উয়ার রহম মাপবে সোনারু।...'

একথায় শিথিল, মুহূর্তে কোমল, হালছাড়া এবং আত্মধিক্কারে কাতর লেংড়িভেংড়ি মেয়েটি আটকে রাখা শ্বাস ছাড়ল। আস্তে শুধু বলল, 'থুতু-চাটা!' কথাটি পান্নার, হাফিজুল মাস্টার সম্পর্কে। তবে হাফিজুল-ছোটনের প্রাক্তন সম্পর্কের কথা ভেবে পান্না প্রকাশ্যে তাকে খাতির দেখাত, যদিও সম্পর্কটি ক্রমশ শীতল ও বিচ্ছিন্ন হয় এবং ছাপোষা গেরস্থ জীবে মেটামরফসিস ঘটে হাফিজুলের।

'থুতু-চাটা' পেট-জ্বলা মানুষের কাছে পৌঁছয় নি। চোইত-পাগল তো বটেই। সে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বলল, 'পালাবি না, যতি একবাপের বিটি হোস,...কিরে লাগে, লড়বি না ই-ঠিঞে থেকিন। ...ই একবাপের ব্যাটা পেঠরুল ভরতে চলল। যে ঠিঞে পাবে সেঠিঞে ভরবে, তোকে লিয়ে যাবে ইস্টিশানে...' বলে বুকে তিনবার থাপ্পড় মারল। তারপর ঘুরে পা ফেলতে গিয়ে গামছায় চূড়োবাঁধা মাথাটি ঘুরিয়ে ঘোষণা করে গেল, 'একটো জানমারি বন্ধ কতে পাল্লে আহিংকের।' শেষ শব্দটিতে হিমালয়-বিশালতা ছিল! সেটি চুনিকে বাকহীনা করল। তার দুই কানে মানুষটিব অহঙ্কার কথাটি সুললিত আজানধ্বনি বাজছিল। সে পূর্বসংস্কারবশে একটি স্বাভাবিক এবং একটি ন্যালা হাত জোড় করে ঈশ্বরের উদ্দেশে কিছু প্রার্থনাবাক্য বলবে ভাবল। কিন্তু পরক্ষণে কাজিরুন্ন যেমত কথায় কথায় বলে, 'খুদা নাই গো, খুদা থাকলে এমুন হত না, আর যতি বা থাকে, সে কানা কানা কানা...' সেমত ঈশ্বরদ্রোহিনীতে পরিণত হল।

চার

'পঢ়নবাজ' স্কুলশিক্ষক হাফিজুলকে পান্না একদা পরিহাসচ্ছলে বলে, 'থুতু চাটলেন হেবজুলদা!' পান্না ছোটনের দেখাদেখি তাঁকে দা-যোগে সম্ভাষণ করত, যেটি মুসলমানি রীতি নয়। আরও কারণ, যে-সকল লক্ষণ একজন মুসলমানলোককে শনাক্ত করায়, তাঁর মধ্যে সেগুলিন ছিল না বা এখনও নেই এবং বিশেষ কথা, তাঁর স্ত্রী হিন্দুকন্যা, যাঁকে কলমা পড়ানো হয়নি, আরও বিশেষ কথা, ঘটনাটি ছিল পার্টিম্যারেজ। কিন্তু হাফিজুল দক্ষিণডিহিতে অন্যতম আউটসাইডার। মুক্তির দশকে মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পান, ছোটনের বাবারই তৎপরতায় এবং এটাই লোকসকলের কাছে যুক্তিযুক্ত সাব্যস্ত হয় যে, ছোটনের মেটামরফসিসে দোষ না ঘটলে হাফিজুলের মেটামরফসিসে দোষ বর্তায় না। হরি সিং-এর বাবা চণ্ডী সিং-এর প্রতিষ্ঠিত স্কুল গিরিবালা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ওই দশকের শেষাশেষি বাতিল হয় এবং অ্যাড-হক কমিটির টুপি পরানো হয়। বীরেন্দ্র টুপিতে বসেন, বসে রয়েছেন, মামলা ঝুলছে হাইকোর্টে, ইত্যবসরে হাফিজুলকে বীরেন্দ্র বিজ্ঞানশিক্ষক করে ফেলেন। এইটি মনঃপূত হয়নি পান্নার, কেননা মুক্তির দশকে স্কুলটিতে হামলা হয়, যার নেতৃত্বে ছিল ছোটন, অতএব পান্নাও ছিল। আর ছিলেন এলাকায় আউটসাইডার এবং কৃষক অ্যাকশনসেলের তাত্ত্বিক নেতা হাফিজুল। পরে পান্না টের পায়, ছোটনের বাবা সেই হামলায় কী খুশি, কী খুশি! পান্না জেনেছিল, এ সেই 'বামুন-কায়েত লড়াই'-এর একটি অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু ছোটনকে কিছু বলেনি। বলার দরকারই ছিল না, দক্ষিণডিহি অঞ্চলের সকলেই জেনেছিল, এটি বস্তুত 'লকশালি কাণ্ড' নয়। অঞ্চলে যতগুলিন 'ফিনিস' ঘটে, তার নব্বুই শতাংশ ছদ্মক্রিয়া—তাত্ত্বিক হাফিজুলও ক্রমে ক্রমে বুঝেছিলেন, যখন তিনি ও ছোটন জেলবন্দী। তিনি অবাক হতেন, পুলিশ অফিসারগণ তাঁরই সামনে অন্যান্য কমরেডদের থার্ড ডিগ্রি ধোলাইয়ে উন্মাদ, মুখগুলিনে আহত গোখরোর হিংস্রতা ছিল, অথচ তিনি এবং ছোটন মাছের ঝোল ভাত পান, রোচেনা, আত্মধিক্কারে ছটফট করেন, শেষে অসহায় আত্মসমর্পণ। পান্না এই অসহায়তা বোঝেনি। অবশ্য তার গায়ে হাত পড়েনি, যদিও ঈষৎকাল আন্ডারগ্রাউন্ডে কাটিয়েছিল মামুর বাড়ি পাকুড়িতে গিয়ে। পরবর্তীকালে ঘটনাটি পান্নাকে নিজের প্রতি ক্রুদ্ধ করেছিল। এতই ক্রুদ্ধ, যে, সে একরাতে বাড়ির সামনে রাস্তায় পর-পর আটটি বোমা ফাটায়। এভাবে অস্তিত্বগত বারুদের বিস্ফোরণকে সে প্রতীকে সাজাত।

পান্না বলেছিল, 'থুতু চাটলেন হেবজুলদা!' এত বছর পরে, আজ পান্নার রক্তাক্ত পতনের পর বিদ্রূপটি বারবার মনে পড়লেও হাফিজুল ব্যথিত। কারণ মিনিট, ঘণ্টা, প্রহর নিয়ে সময় যত রাত্রিমুখী হচ্ছিল, তত 'থুতু চাটলেন' তিরস্কারটির গূঢ়তর তাৎপর্য উদ্ভাসিত হচ্ছিল, ভাবছিলেন, পান্না তাঁকে 'একটি অকারণ এবং নিরর্থ অস্তিত্ব' সাব্যস্ত করে গেছে। কবিতায় পড়েছিলেন 'সত্য শুধু পশুর মতো বাঁচা', সেই কবি বেঁচে থাকলে তাঁকে খতম করা উচিত ভাবতেন হাফিজুল, আর এই চল্লিশবছর বয়সে দেখছেন, পশুর মতই বেঁচে থাকা সত্য হল অবশেষে। বিট্টুকে কোলে নিয়ে চন্দ্রালোকিত উঠোনে শান্ত করতে করতে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে এসকল চিন্তার ঝাঁকে বিপন্ন হাফিজুল সহসা ডাকলেন, 'গিতু!'

সঙ্গীতা রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে কন্যা বুবাইকে চোখ কটমটিয়ে 'দশটার আগেই হাই তোলা...' বলে স্বামীর ডাক শুনলেন। 'ঘুমুল?...নিচ্ছি', সঙ্গীতা বললেন, এবং এতক্ষণে আবিষ্কার করলেন শিশির, হিম এইসকল নৈসর্গিক উপদ্রব শরৎকালে সূচিত হয়। 'তুমি উঠোনে ঘুরছ...ওকে নিয়ে...তুমিঃ...' জননীদাপটে তিনি নেমে আসছিলেন।

কোল পাতলে হাফিজুল শিশুটিকে দিয়ে এক নিঃশ্বাসে বললেন, 'এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।' বাক্যটি কোমল কিন্তু মৃদু ধিক্কারপূর্ণ ছিল। 'বড্ড নোংরা লাগে ক্রমশ।' হাফিজুল পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট বের করছিলেন।

সঙ্গীতা আস্তে বললেন, 'আমি তো কবে থেকে ভাবছি। ...কিন্তু...' শিশুটিকে নিয়ে তিনি দ্রুত ঘরে ঢুকলেন।

শিশুটির বিনিময়ে তাঁর রেখে-যাওয়া 'কিস্তুটি' হাফিজুলকে দমিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গীতা মেয়েদের নতুন স্কুলটির শিক্ষিকা। এখনও এই স্কুলটি অনুমোদন পায়নি। আশা আছে, মার্চে ভোটের আগেই পেয়ে যাবে। এই বাড়িটি বাজার এলাকার সেকুলার ভূমিতে। এটি জনৈক নবীনচন্দ্রের বাড়ি। দোকানের জন্য ভাড়া দিতেই তৈরি হয়েছিল, এবং সেই নবীনচন্দ্র হাফিজুলকে ভাড়া দিতে বাধ্য হন ছোটনের কথায়। হাফিজুল আবাসন ঋণে বাড়ি করার স্বপ্ন দেখেন এবং জমি খোঁজেন। সেকুলার ভূমির দর কাঠাপিছু ক্রমে পাঁচ হাজারে পৌঁছেছে। স্বামী-স্ত্রী হাসাহাসি করতেন, 'এরা ভেবেছে কী? এটা সত্যি টাউন হবে?' এখন আর হাসেন না। ওয়াটারট্যাংকও হয়ে গেছে। অস্থায়ী সিনেমাহল হয়েছে, মারোয়াড়ি ভদ্রলোকের সঙ্গে ছোটনের একটা রফা। তবে দুকাঠা বা অগত্যা এককাঠা মাটি কেনার জন্য ছোটনকে বলতে নীতিবোধ এবং আত্মসম্মানে লাগে হাফিজুলের। ওপর-ওপর সখ্যতা আছে, থাক, তার বেশি না। লেখাপড়া জানলেও তার চিন্তাভাবনার স্তর এমন যে, হাফিজুল জানেন, কমিউনিকেশন একটা জায়গায় গিয়ে থেমে যায়, ফলে তার পক্ষে মাফিয়ালিডার হওয়াই নিয়তি ছিল। হাফিজুল এমত ভাবেন ছোটন সম্পর্কে। কিন্তু এও ঠিক, ছোটন তাঁকে শ্রদ্ধা করে। কেন করে, বুঝতে পারেন না। মফস্বলের পত্রিকার প্রচ্ছন্ন সূত্রে বিগত নির্বাচনে কলকাতার রিপোর্টার পরোক্ষে ছোটন সম্পর্কে 'রবিনহুড' খেতাব ঘোষণা করেছিলেন, এতে বিরেংবাবুর সঙ্গে অরু সিং-এর ভোটের ব্যবধানে কিছু হেরফের ঘটেছিল, যার ব্যাখ্যা পার্টিকে দিতে বিরেংবাবু হিমসিম খান। দক্ষিণডিহি কন্সটিট্যুয়েন্সিতে মৌলবাদী তৎপরতা তাঁর সহায় হয়েছিল শেষপর্যন্ত। কিন্তু কলকাতার রিপোর্টারের 'রহিনহুড' খেতাব সারা জেলা লুফে নেয়, দক্ষিণডিহি এলাকা দূরস্থান! গ্রামে-গ্রামে সংখ্যাতিসংখ্য ডিগ্রিধারী নবীন প্রজন্মের নর-নারী ইংলন্ডীয় রবিনহুড মিথ বোঝেন। তবে নিরক্ষর মুসলমান লোকসকল মুসলমানি মিথসূত্রে হুদ পালোয়ানের নামটি জানে, তারাও হুদ-মিথটি ছোটনের ওপর আরোপ করায় ছোটন লাভবান হয়েছিল। রবিনহুড এবং হুদ এই দুই বৈদেশিক ফোকলোরের মধ্যযুগীয় অর্কিড-বীজ যৌগিক বিক্রিয়ায় দক্ষিণডিহি-মানসবৃক্ষে যে দুর্ধর্ষ লতা-পুষ্প ঝুলিয়ে দিয়েছিল, সেটিই ছোটন-মিথ। হাফিজুল কদাচিৎ অন্যমনস্কতায় থিসিস গড়তেন ; মধ্যযুগে এইসব চরিত্রই মার্সেনারি লিডার হয়ে নানা উপাদানপরম্পরা রাজা, এমন কী সম্রাটে পরিণত হননি কি? এইসকল চরিত্রের মধ্যে বিস্ময়কভাবে অতর্কিতে কিছু উচ্চ মানবিক মূল্যবোধও দেখা যায় বটে! এরা আবেগপ্রবণ, স্বপ্নদর্শী, রোমান্টিক এবং মুক্তির দশকের বিপ্লবী বাঙালি নেতাও সাচ্চা বিপ্লবীর এই মডেলটি খাড়া করেন, এও লক্ষণীয়। অথচ কোথাও একটি চতুরাল গাড্ডার ফাঁদ পাতা থাকে, সাচ্চা সম্ভাব্য বিপ্লবী সেই ফাঁদে পড়ে ছোটন, পান্না অথবা নিরর্থ একটি অস্তিত্ব হাফিজুলে রূপান্তরিত হন।

উট যেভাবে মরুঝঞ্ঝার কালে বালিতে মুখ গুঁজে রাখে, হাফিজুল সেভাবে 'পঢ়নবাজ'। তাঁর ঘরে পুস্তকভাণ্ডার। রাত দশটায় তিনি সেই ভাণ্ডারে ঢুকে টেবিলবাতির আলোয় একটা কিছু পড়া যাক ভাবছিলেন, সেইসময় পান্নার স্মৃতি অনুষঙ্গে 'থুতু চাটলেন হেবজুলদা' ফের তাঁকে প্রহার করল। ক্রমে মনে পড়ল, পান্না তাঁকে বলেছিল, 'ইবারে দেখবেন, বিরেংজেঠু আপনাকে পাট্টিতে খাটাবে। না করতে পারবেন না। হেবজুলদা, আমার মুখের কথা শুনে রাখেন গো, এখুন রাজনীতি বেক্তিগত..' পান্না মদ খেয়েছিল তৎকালে। জড়িয়ে মড়িয়ে বলছিল, 'হুঁ, এখুন রাজনীতি বেক্তিগত গো, লেখে রাখেন পেপারে...পান্না বলে গেল, এ-খু-ন রা-জ-নী-তি বে-ক্তি-গ-ত।'

মরুঝঞ্ঝাটির মধ্যে ভূত হয়ে, শ্বাসরুদ্ধ, কিংবা গ্রামের বেগুনক্ষেতে যেমন ইউরোপীয় পোশাকপরা কাকতাড়ুয়াটি দেখেছিলেন এবং আমোদ পেয়েছিলেন শুনে যে, 'অলক্ষ্মী সাহেব দেখে ডরাবে গো মশাই', সেই কাকতাড়ুয়াটি হয়ে হাফিজুল বসে আছেন, এমত সময়ে হাইওয়ের দিকের একটি জানালায় শুনতে পেলেন, 'ডরাবেন না গো মাস্টোমশাই, ইটো সোনারু...প্যাটজ্বলা গো!'

গুরুতর তত্ত্ববিশ্লেষণের মুহূর্তে, অস্তিত্ব এবং 'সেলফ-আইডেন্টিটিক্রাইসিসে' বিপন্ন প্রাক্তন বিপ্লবী চোইত-পাগলকে অপ্রত্যাশিত হামলা গণ্য করলেন, তেড়ে গেলেন কুকুর-খ্যাদানে ভঙ্গিতে। 'কী চাই? অ্যাঃ? যাও, যাও বলছি!' তিনি রাক্ষুসে তর্জনগর্জন করছিলেন। সুইচ টিপে ঘরখানি পুরো আলোকিত করলেন।

দুঃখে সোনারু দাঁত বের করল। 'প্যাটজ্বলা গো...জানমারির দিনে দক্ষিণডিহি মানুষ থাকে না গো! ...পেঠরুল ছাড়া মটোরগাড়ি চলে না...'

রুক্ষ, স্বরভঙ্গ উচ্চারণে হাফিজুল বললেন, 'খেটে খেতে পার না? লজ্জা করে না ভিক্ষে করে খেতে? গতরখানা তো...'

রাগ চেপে সোনারু তবু হাসিমুখ। জিভ কেটে বলল, চাপা কণ্ঠস্বরে, যাতে বেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল, 'জানমারির দিন গো! জানমারির দিনে খাটাখুটি মুন চাহে না...নাহিলে খাটি, খেটেই খায় ই সোনারু...তাজা যোয়ান ছেলোটার জানমারি, বদ হোক, মানুষ বটে তো গো। পঢ়নবাজ আপনি, বুলুন?'

সঙ্গীতা ছুটে এসেছিলেন, অতীত সন্ত্রাস আজও পিছু ছাড়েনি, সেই অনুষঙ্গে। মৃদুস্বরে বললেন, 'দুখানা রুটি...'

হাফিজুল পাথর-মুখে বললেন, 'সবই তো ছেড়েছি, অন্তত এই একটা প্রিন্সিপল মেনে চলা যায়, আমি মেনে চলি। ভিক্ষা একটা সোশ্যাল ক্রাইম, আনএথিক্যাল...যে করে তার চেয়ে বেশি দোষী যে দেয়...মানবতার অবমাননা। লেট দেম থিংক, কেন তাদের চেয়ে খেতে হচ্ছে...এভাবেই কনশাসনেস আসে। আর গিতু, তুমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছ, অনেক সংস্কার ছেড়েছ, কিন্তু আমি দুঃখিত, তুমি এই পেটিবুর্জোয়াটিক সংস্কার, মানে—এইসব দান-টান...বিবেককে ভর্ৎসনা মাত্র...দুখানা রুটি দিয়ে বুভুক্ষার মহা...' শ্বাস ছেড়ে তিনি থামলেন।

সঙ্গীতা দ্রুত সরে গেলেন, তাঁর প্রিয়তম স্বামী একদা জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন, দেখেছেন। এখন দেখেন একটি অদ্ভুত রোবোট, ডাটাফিড করানো হয়েছে এমন একটি আমদানিকৃত কম্পিউটার মাত্র, ধরা পড়ে কোনও কোনও মুহূর্তে।

তবু সোনারু অপেক্ষা করছিল, রুটি দুখানি আসছে ভেবে এবং মুচকি-মুচকি হাসছিল। 'পরীক্ষে' বলে এসেছিল চুনিকে, সেই পরীক্ষার ফল ঘোষণার কথাটি মাথার ভেতর জলটলটল করছিল। তার মুখের ওপর জানালাটি নির্মম বন্ধ হলে বজ্রগর্জন শুনলে সে। অমনি 'পরীক্ষে' জলবিন্দুটি ছ্যারাভ্যারা হল এবং হ্রস্ব বারান্দা থেকে নিচে লাফ দিয়ে সে চেরাগলায় চ্যাঁচাল, 'থুতুচাটা তু, থুতুচাটা রে! ...লকশাল কুমরেড হঞেছিলি...হিঁদুর বিটি ভাগিঞে এনে. .জাতনাশা রে...ছোট্‌না না থাকলে তাবৎ হিঁদুমোসলমান তোকে কুকুরমারা করত...'

দরজা খুলে গেল এবং হাফিজুলের হাতে কাঠের হুড়কো ছিল। তিনি বারান্দা থেকে নামলে চোইত-পাগল সভয়ে হাইওয়েতে দৌড়ুতে লাগল। ব্যাখ্যা এড়িয়ে হাফিজুল ঘরে ফেরেন, তখন সঙ্গীতা আস্তে বলেন, 'একটু প্র্যাকটিক্যাল না হলে বাঁচা যায় না, কী করে তোমাকে বোঝাব?'...

বাজার-বরাবর সমস্ত দোকান এখন বন্ধ দেখল সোনারু। কিন্তু এতক্ষণে ট্রাকচলাচল ঘন হয়েছে অন্য অন্য রাত্রির মতই। সোনারু হাঘরে মানুষ। সে রাত্রিযাপনে এই সড়কের প্রান্তবর্তী কোনও-না-কোনও আশ্রয় বেছে নেয়, বেগতিক দেখলে মুসলমান এলাকায় ঢোকে এবং অন্তত একটি দাওয়া জোটে, করুণাবশে একখানি তালাইত পায়। 'প্যাটজ্বলাটি'ও নেভে। মুসলমানলোকেরা অধিকতর দাতা স্বভাবী, ধর্মসূত্রে। একারণেই মুসলমান লোক সকলের মধ্যে ভিক্ষুক লোকেরও সংখ্যাধিক্য। হাফিজুলের এই থিসিসে যুক্তিযুক্ত, সঙ্গীতা স্বীকার করেছিলেন। আর তৎকালে সোনারু নালার সুদৃশ্য সেতু অতিক্রম করছিল। আর এইসময় বিশাল ট্রাক-যূথকে পাশ কাটিয়ে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর গাড়িগুলিন সেকুলার ক্ষেত্রে এসে থামছিল। বীরেন্দ্রের আশঙ্কাটি একঘণ্টার মধ্যে সদর প্রশাসনকে লালসংকেত দেখায় এবং ইনফরমেশন ব্রাঞ্চও এই এমার্জেন্সি ব্যবস্থা সমর্থন করে, অন্তত 'মিনিপাকিস্তানে' যা ঘটে ঘটুক, সাম্প্রদায়িক ভায়োলেন্স যেন না ঘটে। বীরেন্দ্র নিজের শক্তির পরোক্ষ খুঁটি রবিনহুড পুত্রটিকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, পান্নার মৃত্যুর দরুনই। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিন ওত পেতে আছে, তিনি সমঝে দিয়েছিলেন প্রশাসনকে।' বামুন-কায়েত ট্রাডিশনাল সংঘর্ষ এক মুসলমানযুবক পান্নার হত্যাজনিত পরিপ্রেক্ষিতে 'কমিউন্যাল ভায়োলেন্সে টার্ন নিতে পারে', এই শঙ্কা-বাক্যটি বীরেন্দ্রের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল।

সোনারু নালাটি পেরিয়ে যাওয়ার পর মহকুমা শহর থেকে ধাবিত চোখ ঝলসানো পুলিশের গাড়িগুলিন দেখে আরও ভয় পেয়ে ধানক্ষেতের দিকে ঢুকেছিল। একটি একলা তালগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে ভীত স্বগতোক্তি করছিল, 'জানমারি! জানমারি হে! ভালা মজা!' কারণ তার চোইত-পাগল অভিজ্ঞতায় ছোট জানমারিগুলিনের চেয়ে বড় জানমারিগুলিন, এমন কী তারও চেয়ে আরও-আরও বড় জানমারিগুলিন থরে-থরে রাখা আছে। তৎকালে সে বলেওছিল, 'গরমেনও বেরৎ জানমারি হে!' সীমান্তজেলার এই সড়কের সামরিক বাহিনীর সবুজ জলছবিগুলিনও তার স্মৃতিতে দাগড়া-দাগড়া ছাপ। আর তারই মত আর এক চোইত-পাগল নোলে চক্কোত্তি গাজনের গানে বাঁধতেন, গানের 'হেঁদুস্থলী-পাকস্থলী' লোকসকলকে গাজনতলায় হাসিয়ে ছ্যারাভ্যারা করেছিল, সেই কথা মনে পড়ে। সে বিড়বিড় করতে করতে শিশিরভেজা ঘাসে ঢাকা আল ধরে হাঁটছিল, 'জানমারি' শব্দটি তাকে এভাবে মাঝে মাঝে ভূতগ্রস্ত করে। একটু পরে সে নিজের ভূতদশাটি টের পেয়ে 'ভালা মজা' বলল এবং ভয় পেল ভেবে, প্রথম চোইতপাগল নোলে চক্কোতি পরে পুরোপাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সে নিজেকে তাই সতর্ক করল, 'মনা রে মনা, বুঝদার হ।' সে নিজেকে এরূপ বলল, কারণ চুনির কথা তার মনে পড়েছিল। আর এই সতর্কীকরণের মুহূর্তে একটি বোধ-বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল তার ঘিলুর শিথিল দড়কচাপড়া স্নায়ুকোষে। সে নামুপাড়ার দিকে কোনাকুনি হাঁটতে লাগল। পেট্রল পূর্ণ তার মোটরগাড়িটি স্টেশনে চুনিকে পৌঁছে দেওয়ার চেয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আরেকটি স্যাংচুয়ারির কথা তার মাথায় এসেছিল।...

সইদুর হাজি সার্ফেস রিয়্যালিটিতে থুত্থুড়ে বুড়ো মানুষ, কিন্তু জিঘাংসু বাঘ তাঁর অস্তিত্বের খাঁচায় পোষা, যাকে তিনি মাঝে মাঝে অতীতের পাদশাহদের মত খেলাছলে ছেড়ে দেন। অরু সিং বাঘটির তারিফ করেন এবং সইদুর বোঝেন, এই তারিফ প্রকারান্তরে দিল্লিরই তারিফ। তিনি গদিআঁটা ইজিচেয়ারে বসে পুলকিত বলছিলেন, 'খুদার কুদরত বুঝা কঠিন রে বাপ! ক্যানে কী, ইসমাইলের ব্যাটার জান ইসমাইলের বিটিরই হাতে খুদা সঁপেঞে দিঞেছিলেন'...এমন সময়ে ঘরের বাইরে মোতায়েন সতর্ক প্রহরীরা 'কে রে তু' বলে ওঠায় ভাবলেন, তাঁর লোকগুলিন মহকুমাশহর থেকে ফিরে এল। ঘটনার পরই দ্রুতগতি তিনি এস ডি পি ও সকাশে এবং ফৌজদারি আদালতে মামলা পাঠিয়েছিলেন। পেনাল কোড এবং সি আর পি সি তাঁর মুখস্থ। তাঁর মুসাবিদা আইনজীবী সমাজ দুর্ভেদ্য গণ্য করেন। ঘটনাটি ১৪৭ ধারা মোতাবেক সাজানো হয়েছিল এবং ১৪৪ ধারা তদ্দণ্ডে জারির আর্জি ছিল। দ্বিতীয় ধারাটি তদ্দণ্ডে কার্যকর হয়েছে দক্ষিণডিহির সমগ্র এলাকায়। প্রথম ধারাটি দাঙ্গা হাঙ্গামা সংক্রান্ত এবং আসামি তালিকায় মৃতপান্না এক নম্বরে, দু নম্বরে ভাকা, এভাবে একুশজন। পান্নার যদি মৃত্যু হয়ে থাকে, ১৪৭ ধারার আওতায় হয়েছে। ৩০২, এমন কী ৩০৬ ধারার প্রশ্নই ওঠে না, এইরূপ অসাধারণ মুসাবিদা। পক্ষান্তরে পান্নার পক্ষে ছোটনের আইনজ্ঞানহীন কমনসেন্স থেকে স্থানীয় থানায় খবর যায় মাত্র এবং স্থানীয় থানার এফ আই আরে ৩০২ ধারার সঙ্গে ১৪৭ ধারা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারূপে পরিমিশ্রিত। তবে ছোটন আইনের প্যাঁচালো পথের যাত্রী নয়। সে রবিন-হুদ কিংবা মাফিয়ালিডার স্বভাবে প্রাকৃতিক আইনের অনুগামী। শুধু এইটুকু বোঝে, মামলা সেশনে গেলে তার বাবার করতলগত হবে। হলেও প্রাকৃতিক আইন চূড়ান্ত, সে জেনেছে।

নামুপাড়ার প্রহরীরা 'কে রে তু...কেরে তু' বলছিল, আগ্নেয়াস্ত্র বা তীর বা ভল্লাদি প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগ করছিল না, এর একমাত্র কারণ কবিসকল যাকে বলেছেন শারদচন্দ্রিমা। শেষে তারা খি খি করছিল।' ই শালো চোইত-পাগল...এমুন রেতেও ভূত হঞে ঘুরে হে!' সোনারু ভাঙ্গাগলায় শুধু বলল, 'প্যাটজ্বলা।' তারপরই এক প্রহরী গর্জন করল, 'শালো তু পান্নার জন্যে কেঁদেঞছিলি...খবর কানে আসে...' তৃতীয় প্রহরী বলল, 'ঝঞ্ঝাট কোর না হে, পাগলা না ছাগলা...এই কাঁদে এই হাসে'। এই প্রহরীটি দার্শনিক হওয়ার হেতু শত্রুদুর্গ ডাঙ্গাপাড়ায় এক নির্দলের ঘরে তার বোন আছে।

সইদুরের কাছে খবর হলে তিনি বললেন, 'পাঠিন দে, দেখি সোনারুদ্দিকে।' বস্তুত নার্ভের প্রচণ্ড চাপ এক চোইতপাগলের সান্নিধ্যে তিনি মোচন করতে চাইছিলেন। সাদা দাড়ির শীর্ষে সরু সরু দাঁতগুলি ঝকঝক করছিল মানবিক সৌন্দর্যে। সোনারু পবিত্র তীর্থেফেরত লোকের সন্নিধানে মুসলমানি

ভব্যতায় 'ছালামালেকুম গো হাজিসাহেব, ই বড়ই প্যাটজ্বলা' বলে কারণগুলিন জানাতে চাইল। কিন্তু সুযোগ পেল না। হাজিসাহেব সস্নেহ চিকনহাস্যে বললেন, 'ওরে শয়তান! তু দুগ্গির চালির ছামুতে লেচেছিলি, তু সালাম দিস, তোর গড়নে হেঁদু সাধুর ছাপ...চুপ কেটেঞে মুচ ছেঁটেঞে আগে মোসলমান হ, তোবা কর মৈলবির ঠেঞে...' এবং সমস্ত কথা মেনে নেওয়ার ভঙ্গিতে সোনারু পায়ের কাছে বসে মাথাটি কাত করল।

হাজিসাহেব বললেন, 'কে আছিস বাপ? ভাতে বোধ করি পানি ঢেলেছে। থাকে তো তাই এনে দে।'

সোনারু ফিসফিসিয়ে উঠল, 'হাজিসাহেব বাপজি গো, ই সোনারু আগে দুটা কথা বুলবে আপনার ঠেঞে।' তার কথায় গা ছমছম করা রহস্য ছিল এবং গুপ্তচরের ভঙ্গিটিও চোখে পড়ার মত।

ফলে সইদুর উৎকর্ণ এবং ঈষৎ ত্রস্ত। নিষ্পলক তাকালেন। তাঁর ছেলে হারুন, জামশেদ, বরকত যথাক্রমে কলকাতা, সিউড়ি এবং লালগোলায় আন্ডারগ্রাউন্ডে গেছে। পুলিশের তালিকাভুক্ত অন্যান্য যোদ্ধারা আশেপাশে গ্রামে কুটুম্ববাড়ি গেছে এবং কোনও ঘটনার খবর পেলে বিশাল বাহিনী নিয়ে নামুপাড়াশিবিরে এসে পড়বে। সোনারু সর্বচর। সে কি আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়া কোনও যোদ্ধার দুঃসংবাদ এনেছে?

কিন্তু সোনারু বলল, 'পান্নার বহিন, বাপজি গো...লেংড়িভেংড়ি বিটিটার জানমারি হবে। ই রেতে কেহু তাকে থল দিলে না, সেও প্যাটজ্বলা...পায়ে পড়ি হাজিসাহেব, বিটিকে থল দেন...নেকি হবে খুদার কাছে' সে চোখে চতুরাল ঝিলিক তুলে পুনঃ বলল, 'বিটি পান্নার বোমাগুলিন পানিতে ফেলে দিঞেছিল কি না?' সে কৃতজ্ঞতা আশা করেছিল এশিবিরে এবং তার আশা যুক্তিযুক্তই ছিল।

অথচ সে হাজি সইদুরকে পলকে রক্তশূন্য লাস দেখল এবং বিকট লাসের ভুতুড়ে ফোঁসফোঁসানি শুনল, 'পাগলা রে পাগলা! ...ই কী বুলে...মামলা-কাঁচা ফাঁদ গো!' পরক্ষণে বাঘটি খাঁচা খুলে বেরিয়ে এল। 'ই হারামজাদাকে ফাঁদ পাততে পাঠিঞে দিয়েছে! ...বাপ্! নামুপাড়া থল দিবে, আর ছোট্‌না পুলিশ পাঠাবে...' বাঘের থাবাটি চোইতপাগলের চুড়োবাঁধা চুল ধরল। 'ওরে শয়তান! আসল কথাটো শুনি। কে তোকে পাঠালে আমার ঠেঞে?' সইদুর নাড়া দিচ্ছিলেন মুণ্ডুটিকে। তাঁর সরুদাঁতে অত্যাশ্চর্য মানবিক সেই সৌন্দর্যময় চিকনহাস্য ক্ষয় পাচ্ছিল দ্রুত।

সোনারু গোঙাচ্ছিল। তেল-না-পাওয়া জটাবাঁধা চুলে মুহুর্মুহু খিঁচুনির যন্ত্রণায় কাতর সে। 'খুদার কিরে...মসজিদের কিরে..., কুরানের কিরে...' এইসব শপথ নিষ্ফল হলে সে পেছনে দুপা ছড়িয়ে আলম্ব হল। জবাইকরা পশুর মত তার ঠ্যাং দুটি নড়বড় করছিল। সে অগত্যা প্রার্থনা করছিল, 'জবাই করুন...জবাই করুন...'

এইসময় খবর হল মহকুমা শহর ফেরত দলটি এসে পৌঁছেছে। তখন সইদুর চোইতপাগলকে ছাড়লেন এবং দলটি হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকার সুযোগে চোইতপাগল গুঁড়ি মেরে শেয়াল পালানো পালাল। কেউ তার প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার কারণ দলটির আপেক্ষিক গুরুত্ব।

এইবার সোনারুর সঙ্গে তার প্রিয় গামছাটির চিরবিচ্ছেদ ঘটেছিল। চুলে গামছাটি না জড়ালে এটা হত না ভেবে সে বড় মর্মাহত। বসতি-সংলগ্ন পুকুরপাড় এবং আগাছার জঙ্গলের ভেতর ছুটে যেতে যেতে সে হাঁফানি সামলাতে ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় একটি বটতলায় দাঁড়াল। বটটি কোন প্রাচীন পির-দরবেশের সমাধিভবন 'মাজার' ধ্বংস করে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভাঙ্গা ইট, লাইমকংক্রিটের চাঙড় ঝুরিও শেকড়বাকড়ের গরাদবন্দি নিষ্ফলতা সদৃশ্য। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মৌলবাদী শুদ্ধিকরণ মাজারটিকে মহিমাহীন করেছিল। তবু গোপনে সাঁঝবাতি জ্বলত। গোপনে মাটির সরায় বাতাসা আর খুদে মাটির ঘোড়াগুলিন কুমোরপাড়া থেকে সংগৃহীত হয়ে সিন্নি-নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গীকৃত হত। কিন্তু পুনঃ পুনঃ ধর্মীয় মৌলবাদী শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া, শেষে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দক্ষিণডিহির মুসলমান লোকসকলের চৈতন্যে যুগপৎ মার্ক্সবাদ এবং ইসলামি মৌলবাদী নব-অভ্যুত্থান পিরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এমনই জেহাদ ঘোষণা করে যে, বটগাছটির প্রাকৃতিক স্বাধীনতা অবাধ হয়। পক্ষান্তরে নামুপাড়া সীমানায় দরগাটি বর্তমান মুসলমান নোম্যানসল্যান্ডের ব্যাপারে সীমান্ত স্তম্ভরূপে অটুট। তবে সেটি

কোনও পির-দরবেশের মাজার নয়, নিছক 'দরগা', ইরাকে অবস্থিত কারবালাযুদ্ধের শহিদ বীর হুসেনের কবরের প্রতীক, এবং অতীতে মোহরম শোকানুষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল ছিল দরগাটি। মৌলবাদী নব-অভ্যুত্থানে তাকে ঘিরে মর্সিয়া ঐতিহ্যের শোকগাথা স্তব্ধ হয়। মৌলবী নাসিরুদ্দিন এ দশকে ফতোয়া জারি করেন : তাজিয়া, মর্সিয়া, কৃত্রিম যুদ্ধ, বুকচাপড়ানো মাতমজারি শিয়াসম্প্রদায়ের রীতি। সুতরাং সুন্নিগণের পক্ষে অশাস্ত্রীয়। চূড়ান্ত রগড় যে, এই দরগা-সংলগ্ন নোম্যানসল্যান্ড ক্ষেত্রে মিলনী ক্লাব সিরাজুদ্দৌলা নাটক অভিনয় করেছিল, যে নাটকে শহরের ভাড়াকরা হিন্দু অভিনেত্রীরা আলেয়া, লুৎফা, ঘসেটি চরিত্রে অভিনয় করেন। এও তাৎপর্যপূর্ণ রগড় যে, পরবর্তী জুম্মাবারে মৌলবী নাসিরুদ্দিন প্রথানুসারী শাস্ত্রীয় ভাষণে সিরাজুদ্দৌলার ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন, মিরজাফর চরিত্রটিকে সাম্প্রতিক মুসলমানি বাস্তবতার সঙ্গে লিপ্ত করে হুঁশিয়ারি দেন, 'বেরাদানে ইসলাম! হুঁশিয়ার! বেআকুব মিরজাফরের পশ্চাতে রাজবল্লভ জগৎ শেঠগণ খাড়া...তখন আংরেজ ছিল, এখন নাসারা (খ্রিস্টান)-ইহুদি ইজরায়েল-নাস্তিক বৃহৎশক্তি সকল অ্যাক্টিভ...' প্রসঙ্গত কমিউনিস্ট পার্টি ও দেশগুলিনের নাস্তিক্যের বিরুদ্ধে অগ্নিময় ভাষণে নামুপাড়ার প্রবীণেরা 'মারহাবা মারহাবা' ধ্বনি তোলেন। বস্তুত এই অংশটির প্রচণ্ড প্রাসঙ্গিকতা ছিল, যেহেতু ডাঙ্গাপাড়া বিরেংবাবুর 'সাপোর্টার'। তাঁরা মিরজাফরকেও পান্নার বাবা ইসমাইল হোসেনের মধ্যে চমৎকার আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁকে ফিনিসের এটিও উপাদান।

'ভালা মজা!' বটতলায় দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছিল চোইতপাগল। আজ রাতে এতবছরের চেনা পৃথিবীর এতবেশি অদলবদল তাকে ভাবিয়ে তুলছিল। একটু পরে সে হিসেবে লিপ্ত হল, সে কি নোলে চক্কোত্তির শেষ দশায় পৌঁছে গেছে, নাকি, সে নিজের অতীত দশায় প্রাক-চোইতপাগল-কালে ফিরে এসেছে, যাতে এইসব অঘটন ঘটছে? হয় অতর্কিত সুস্থতার দরুন প্রকৃত বাস্তবতাগুলিন তার ঠাহর হচ্ছে, নয় তো প্রকৃত বাস্তবতাগুলিন পুরোপাগল হওয়ার ফলে এভাবে গুলিয়ে যাচ্ছে। সে ভাবছিল, এমন কেন হচ্ছে? বিপন্ন, ক্ষুৎকাতর, দায়িত্বশীল মানুষটি এই মগ্নতার ভেতর যে-মুহূর্তে টের পেল যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানটি একটি পিরস্থান, সে-মুহূর্তে সে ফিসফিসিয়ে ডাকল, 'বাবা আছ কি?' পিরবাবা সাড়া দিলেন প্রাকৃতিক কণ্ঠস্বরে, 'আছি রে বাপ!' সোনারু বলল, 'কী করি?' পোকামাকড়ের ডাকে জবাব এল, 'গরুটা খ্যাদা...' সোনারু চমকে উঠল। বট-সীমানার পারে কাফনজ্যোৎস্নায় গরুটিকে খেয়ালহীন দেখছিল সে। গরুটি শাদা। কচি ধানের বুকে থোড় এসেছে সবে, শাদা গরুটি সেই ধান খাচ্ছে। দৃশ্যটি চোইতপাগলার চোখে অলীক সাব্যস্ত হয়েছিল। জ্যোৎস্না এবং গরু এই নির্জন প্রকৃতিতে নিছক অমর্ত্য একটি প্রতিভাস। বহু বছর আগে সে মাঠ-পাহারা 'জাগালি'-র কাজ পেয়েছিল এবং একইভাবে জ্যোৎস্নারাতে শাদা গরুর ধানক্ষেতে বিচরণ সৌন্দর্যময় ঠেকেছিল, সে বাধা দেয়নি এবং পরিণামে তার জাগালি চাকুরিটি যায়। এখন সে 'জাগাল' নয় কিন্তু স্পষ্ট শুনেছে পোকামাকড়ের কণ্ঠস্বরে পিরবাবা তাকে বলেছেন, 'গরুটো খ্যাদা', সেকারণে ধানক্ষেতের ধারে গেল সে। কোমরে দুটি হাত রেখে গরুটিকে দেখল কয়েকদণ্ড। সে দৃশ্যটি বাস্তব কিনা বুঝতে চেয়েছিল, কারণ তৎকালে সে বাস্তবতার সঙ্গে সংঘর্ষে ও চরম বোঝাপড়ার মুখোমুখি। ক্রমে গরুটির গলায় বাঁধা দড়ির সঙ্গে একটি হুড়কো সামনেকার দুই ঠ্যাঙের ভেতর দিয়ে পেটের তলায় ধানগাছের ভেতরে ডুবে থাকা লক্ষ্য করে সে বুঝল, ঘটনাটি অতিশয় পার্থিব এবং বাস্তব। এই গরুটির দুষ্ট স্বভাবের দরুন হুড়কো-শাস্তি প্রাপ্য হয়েছিল। বিশেষ কথা, শাস্তিপ্রাপ্ত শাদা এই গরুটি সকলের চেনা। এটি বাঁজা গাইগরু। মুসলমানি প্রথানুসারে এটি কোরবানি পরবে উৎসর্গীকৃত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর মালিক নেয়ামত আলি, ডাঙ্গাপাড়াবাসী এক নির্দল এবং সরকারি সঞ্জ্ঞায় 'প্রান্তিক চাষী' অবরে-সবরে ক্ষেতমজুর, এমন কী এই চোইতপাগলার সঙ্গেও মুনিশ খেটেছে, বাঁজা গরুটিকে বউ মোহরাবিবির জেদে হালাল করতে অপারগ। মোহরা খাতুনের প্রেমে নেয়ামত এমনই কোমল কাদার গোটা, লোক সকল হেসে আকুলিবিকুলি হয়, 'মাগের আঁচলধরা হে!...কে জানে শালো মাগের বুকের তন খায় কিনা..' এইসব কথা তাকে সামনাসামনি নির্ভয়ে বলা হয়। নেয়ামত রোগাভোগা মানুষ, মুচকি হাসে মাত্র, ক্বচিৎ বলে, 'যা বুলিস বুলে যা ..' এই পর্যন্ত। গুজব আছে, বউ তার মুখে একবার তাড়ির

গন্ধ পেয়ে বেদম ঠেঙিয়েছিল। সে-কারণে হিন্দু এলাকার কুনাইপাড়ার পচু, তার 'প্রাণের মিতে', ভুলেও যে তার বাড়ি আসে না, এ ঘটনা সর্বজ্ঞাত।

সোনারু এতক্ষণে বাস্তবকে সরাসরি আক্রমণ করল। 'শালোর গরু...প্যাটজ্বলা করছে দুনিয়াটোকে', বুভুক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুংকার দিয়ে সে ধানক্ষেতে নামল এবং তাকে খ্যাদাতে থাকল। গরুটি এতে রেগে গেল, সোনারুও তার বেশি রাগল এবং চ্যাঁচাল, 'নেয়ামুতে শালো মাগের তন খায়...' এটি তীব্র শ্লেষাত্মক একটি ঘোষণা ছিল। আরও একটি বিশেষ কথা, জমিটুকুও নেয়ামতের, পূর্বসীমান্তে বাড়িটিও তার, মাটির ঘর খড়ের চাল, দোতলা একটি 'মাটকোঠা'। ঘোষণাটি সহজে কানে যায় দম্পতির, যেহেতু এ রাতে সকলেই সন্ত্রস্ত ও সজাগ, যদি নামুপাড়া থেকে অতর্কিত হামলা ঘটে! এমন কী রোগাভোগা দুর্বল নেয়ামতও এ রাতে সশস্ত্র শুয়েছিল। চালটি খড়ের হওয়ায় সে তার ঘ্রাণশক্তিকে শান দিয়েছিল, আগুনেরও ঘ্রাণ আছে।

'নেয়ামুতে-এ-এ! প্যাটজ্বলা হবি-ই-ই!' সোনারুর দ্বিতীয় ঘোষণাটিই বস্তুত দম্পতিকে কোঠার ওপরতলা থেকে মাটির সিঁড়ি বেয়ে ভূপৃষ্ঠে টেনেছিল। খিড়কি খুলতে তারা ভয় পায়নি, কারণ চ্যাঁচানিটি সোনারুর। নেয়ামতের হাতে ভল্ল ছিল, যা প্রয়োগ করা কোনওক্ষেত্রেই তার পক্ষে অসম্ভব। মরদকে ঠেলে তেজি স্ত্রীলোকটি অগ্রগামিণী হওয়ায় গরুটির কীর্তি চোখে পড়ে। সে, মোহরা খাতুন, 'ম্মা গো...হারামজাদি ই কী...অমন ঠাসবাঁধন বেঁধেও...হায় হায় হায়', বিলাপে ধানক্ষেতে নেমে প্রিয় পশুটির দুই গালে থাপ্পড় মারতে লাগল। সোনারু উঠে এসে দুহাত কোমরে রেখে ভল্লধারী মরদটির পাশে দাঁড়িয়ে প্ররোচিত করছিল, 'থাপুড়ে মুখ ভেঙ্গে দ্যাও...প্যাটজ্বলা কল্লে হে...আফলা শালীবিটি, গরু না আক্কস,...মারো, মারো, হাগিএ্যে দ্যাও...।' প্রতিবেশী বাড়িগুলিন থেকে নির্দল ও দলীয় কিছু লোক আতঙ্কে সশস্ত্র বেরিয়ে এসে ঝকঝকে জ্যোৎস্নায় দৃশ্যটি দেখে নিরুদ্বেগে ফিরে গেল। জমিটি নেয়ামতের না হলে অন্তর্দলীয় কিছু বাধত এবং নেয়ামতের ওপর নামুপাড়া বিরোধী তাবৎ ক্রোধ ঝাঁপিয়ে পড়ত, এরাতে হিংসা এত মুখিয়ে ছিল।

গরুটি টেনে এনে গোয়ালঘরে বাঁধার পর প্রশ্নটি জেগেছিল। 'কুন পথে যেয়েএ্যছিল হারামজাদি?' নেয়ামত খুঁজছিল। তারপর আবিষ্কৃত হল পাঁচিলের ভাঙ্গা অংশ তালপাতার তাপ্পিতে বিরাট সুড়ঙ্গ। সোনারু বলল, 'ই কী কথা! ...খড়খড়ানি কানে যায়নি তুমাদের...ভালা মজা!' দম্পতি চেপে গেল প্রকৃত তথ্য। তৎকালে তারা মৈথুনলিপ্ত ছিল। শুধু নেয়ামত আস্তে কৈফিয়ত দিল, 'কুকুর...কুকুরগুলিন...।' এসময় তার বউ অতিশয় গম্ভীর। সেও কুকুর ভেবেছিল। তাছাড়া তার গর্ভে সন্তান টেঁকে না, সে তখন সন্তান-প্রার্থনায় ব্যগ্র ও একমুখী ছিল। শব্দটি গ্রাহ্য করেনি। সোনারু সহসা খি খি করল, 'উবগার কলাম হে...ঠিক কি না?' নেয়ামত শব্দহীন সায় দিলে সোনারু সুযোগপ্রাপ্ত কথাটি পাড়ার সুযোগ পেল, 'ই রেতে আমি প্যাটজ্বলা।'

মোহরা খাতুন গম্ভীর। চোইতপাগল সত্যই উপকার করেছে, তাকে কিছু খেতে দেওয়া নিশ্চয় উচিত কাজ, কিন্তু তারা মাগ-মরদ এখনও শরীরে অশুচি। শাস্ত্রীয় নিয়মে স্নান পালনীয়, তবে সেমত নিষ্ঠা দুজনকারই নেই। তাই বলে এই অশুচি শরীরে খাদ্যবস্তু ছুঁতে কাউকে খেতে দিতে বাধে। নেয়ামত খুঁত খুঁতে ভঙ্গিতে বলল, 'মাগ-মরদের সোমসার হে! এত রেতে কী দিই খেতে? ...সারাদিন যা অবস্তা থেল, আঁধাবাড়া হবে কী...ডরে গত্তোতে সেঁধিএ্যে আছি হে! ...ক'আড়ি ধান দেড়িতে ধার লিএ্যে...তাও ভাবছি, কুনো ঠেএ্যে লুকিন থুয়ে আসব নাকি...' সে থেমে গেল। তার আশঙ্কায় যথার্থ ছিল, অনস্বীকার্য। পান্নার মতন নির্দলদেরও হিম করেছিল।

'দুটি মুড়ি দ্যাও বরঞ্চ। বড়ই প্যাটজ্বলা...' সোনারু প্রার্থনার স্বরে বলল। কিন্তু কথার ভেতরে দাবি ছিল, যেহেতু সে বৃহৎ উপকার করেছে। সে মোহরাখাতুনকে চন্দ্রালোকে চুল বাঁধতে দেখছিল এবং দুপুরে চুনিকে যেভাবে বলেছিল, তার চেয়ে বলশালী উক্তি করল, 'বুন, তু লুটুন বাঁধিস, ইটো কি লুটুন বাঁধার সুময় রি? এক প্যাটজ্বলা ইখানে ডাঁড়িএ্যে মুড়ি চাহেএ্য। ইদিকে সে তোর সম্পক্কোতে ভাসুরও বটে রি...'

প্রান্তিক চাষীর বধূটি খোঁপা বেঁধে দুঃখে হাসল। বয়সের বিচারে চোইতপাগলটির ভাসুর হওয়ার যোগ্যতা আছে এবং ভাসুরের সামনে খোলামাথা হওয়া খোঁপা বাঁধা তো তারও বেশি গর্হিত কাজ। সে মাথাটি আঁচলে ঢাকার ভঙ্গি করে বলল, 'ভাসুর মানি গো! কিন্তুক আজ মাথার ঘায়ে কুকুরপাগল অবস্তা...ঘুম আসেনা, ...ইদিকে হারামজাদির কাণ্ড দ্যাখ...' এই সময় তার জ্ঞান এসে গেল 'ওই গো! পায়ে কাদা কাপুড়ে কাদা...একডণ্ড বস, ভাসুর! ধুয়েপাখলে আসি।' অশুচিনাশের সুযোগ পেয়েছিল সে। খিড়কি খুলে পুকুরগামিনী হল।

নেয়ামত তখনও দাওয়ায় খুঁটির গায়ে উল্লম্ব। দেখল, চোইতপাগল তার পাশেই ধুপুস করে বসল। সর্বচর এই মানুষটির কাছে সর্বশেষ পরিস্থিতির খবর মিলতেও পারে, এই ভেবে উদ্বিগ্ন প্রান্তিক চাষী এভাবে চতুরাল সূত্রপাত করল, 'এত রেতে উঠেঞে কী করছিলা হে?' সে কুণ্ঠিতহাস্যে প্রশ্নটি করল। 'নিশিরেতে তুমি শিয়ালচরা জানি...তবে এমুন রেতে কিসের খবর করে বেড়াও...তুমাকে বুঝা কঠিন হে! লোকে বোলে বটে চোইতপাগলা, তুমি বুঝদার সেটো আমি ভালই জানি...ক্যানে কী, গায়ে-গায়ে তুমার সঙ্গে মুনিশ খেটেছিঞে...' সে বৃত্তিগত মৈত্রীটির উল্লেখ করল।

এই প্রশস্তিতে আপ্লুত নিশাচর ফিসফিস করল, 'বানভাসা...থল পায়না...' সাংকেতিক কথাদুটি সূচনার পর ক্রমে স্বরূপে ব্যক্ত হতে থাকল, 'ই রেতে দখিনডি জলতল...পর্বতে বান চড়েঞেছে...খুদার ঘরও থল দ্যায় না বানভাসাকে! ইদিকে প্যাটজ্বলা..' সে নিজেকে দেখিয়ে যেদিকে চুনির অবস্থান, সেইদিকে তর্জনী ঘোরাল, 'সে বিটিও প্যাটজ্বলা, লেংড়িভেংড়ি...শান্তি চেহেঞেছিল হে, ইটোই দুষ! সেই দুষে বিটি বানভাসা হয়।' সে ফোঁস শব্দে গরম শ্বাস ছাড়ল, যার মধ্যে ক্ষুধা অভিমান, অসহায়তা, হাহাকার, অভিশাপ সমুদয় ওতপ্রোত ছিল।

গ্রামীণ নিরক্ষর প্রাকৃত জন ভাষার যথাযথ ব্যবহারে অপটু, ফলে শব্দগুলিন প্রায়শ এমন সাংকেতিক, কখনও প্রতীকী, ভাষা বিজ্ঞানীর সংজ্ঞাকৃত চিহ্ন-তত্ত্বও এভাবে প্রমাণযোগ্য হয়ে ওঠে, এবং চোইতপাগলের শব্দসংকেত ও চিহ্নাদি মুদ্রাসহযোগে প্রান্তিক চাষীটির মর্মে অর্থবহ হয়েছিল। সে সতর্কতায় ধীরে বসে পড়ল, ফুসকথা তাকে এমন রহস্যাবিষ্ট করেছিল। সে বায়ু কণ্ঠে বলল, 'সব্বোনাশ সব্বোনাশ...'

'ই রেতে আমি ঘুড়া হে!' সোনারু হৃদয় খুলে ধরেছিল। 'বিটিটোকে পিঠে চড়িন থল টুঁড়ি...যে-ঠেঞে যাই, থল নাই থল নাই শুনি খালি...শালোশালীদের মেলোয়ারি জ্বর উঠে হুঁ হুঁ হুঁ...' জ্বরকম্পের নমুনা দেখাল সে, হাসছিল না।

নেয়ামত পূর্ববৎ বায়ুকণ্ঠে বলল, 'পান্না ফিনিস হঞেছে, আমি খুশি। শালো দিনে তারা দেখেঞেছিল।' দিনে তারা দেখার সঙ্গে যে এপিসোডটি যুক্ত, সে একনিঃশ্বাসে শোনাতে চাইল। 'সেদিন বিরিজের ধারে শালো মাতাল আমাকে বলেছিল মাগের তনচুষা...ইঃ, সহ্য যায় না, সহ্য যায় না।' সে মাথাটি দোলাতে থাকল। তার পৌরুষ অন্যান্য মুখে অপমানিত হলে সে গাহ্য করে না, কিন্তু পান্নাকে সে হিরো জানত। হিরোর মুখে এই বাক্য কুঁদুলি কাজিরুনের দুরমুষটির চেয়েও কদর্য বোধ হয়েছিল বস্তুত তার মত অবহেলিত পুরুষ ব্যক্তিত্বের কাছে পান্না ছিল আরাধ্য মডেল। সেখান থেকে 'মাগের তন-চুষা' বিশেষণ প্রক্ষেপণ মর্মবিদারক। কিন্তু পরক্ষণে নিজের এই ফুসকথাটি এক সর্বচর চোইতপাগলের কানে দিয়েছে জ্ঞান হওয়ামাত্র সে আকাশকে আলোচ্য করল। 'লক্ষণ ভাল লয় হে একটুকুন ম্যাঘ নাই, চাঁদজ্বলা! ভুঁইক্ষ্যাতে যেটুকুন পানি আছে, রিঞ্চি রিঞ্চি কমছে...দেখেছ? আর এক সপ্তা এমুন থাকলে পরে ডাঁড়িয়ে-ডাঁড়িয়ে মরে খ্যাড় হবে...' সে ধানগাছগুলিনের কথা বলতে লাগল 'ডিপটিউবেল...হুঁ, দেখেঞে লিও, সুময়কালে বুলবে রিঞ্জিল খারাপ...' কৃষি সমস্যাকে সে বিশালতা দিচ্ছিল, যেহেতু মুখ ফসকে একটি গোপন খুশি ছিটকে গেছে, যা ভাকদের কানে গেলে পরমাণুবোমা হবে।

থত্‌পত্‌ থত্‌পত্‌ এমত আওয়াজ করে সিক্তবসনা ফিরে এল। যতক্ষণ সে নিচের ঘরের তালা খুলে ঢুকে কাপড় বদলাচ্ছিল অন্ধকারে ততক্ষণ পুরুষদুটি শালীনতাবশে স্তব্ধ ছিল। ভিজে কাপড়টিকে

মোহরা খাতুন উঠোনের তারে জ্যোৎস্নায় মেলে দিতে বেরুলে তার পুরুষ তারস্বরে বলল, 'মুড়ি দ্যাও, গুড় দ্যাও..., দুজনকার প্যাটজ্বলা, জান?'

কাপড় মেলতে মেলতে মোহরা খাতুন ঘুরল। পরিহাসে বলল, 'বিহা কল্লে ভাসুর? ওম্মা গো! ইটো কী রকম কথা!'

চোইত পাগল জিভ কেটে 'আ ছি ছি ছি' করলে নেয়ামত পূর্ববৎ বায়ুকণ্ঠে বলে উঠল, 'তুমার উতর-পুর দিশে নাই, লয়কে হয় করো ই রেতে...কথার অথ বুঝনা, বুঝদার হওদিকিন!' সে ফুসকথাটি বলার জন্য তৈরি হল।

মোহরা খাতুন শরিয়তি বিধিতে অর্ধস্নানে শুচিতা ফিরে পেয়েছে, সে শুচিতাহেতু মুক্তমনা, বলল, 'দুজন প্যাটজ্বলা কথাটো কানে বাজে, তাই বুলি!' সে দাওয়ায় উঠল, রহস্য আঁচ করেছিল।

নেয়ামত সোনারুকে তর্জনীতে খোঁচা মারল। বরং ফুসকথাটি সোনারুই বলুক। সুতরাং সোনারু সাংকেতিকে বলতে থাকল, 'লেংড়িভেংড়ি বিটিটো বানভাসা..., থল নাই...ঘুড়া হঞেছি গো! ...ছান্তি চেহেঞছিল, অথচ হায় হায় হায়. .তার জানমারি হবে। ...দিনমান প্যাটজ্বলা...মা-জনুনীও বোলে থল নাই, চোখের ছামুতে বিটির জানমারি হবে...'

এপর্যন্ত শুনেই মোহরা খাতুন শ্বাস ছাড়ল। 'কতি সে?' একটু পরে পুনঃ পুনঃ বলল, 'শুনেছি, শুনেছি!...' তার শোনাজানায় কিছু দুঃখ ছিল। 'লিজের ভাইটোকে...হা খুদা, ক্যানে ইকাজ কত্তে গেল, বুঝি না!' তাকে চঞ্চল দেখাচ্ছিল।

সোনারু বিড়বিড় করছিল, 'ছান্তি চেহেঞছিল গো, ছান্তি...'

'বড়ই বুকা! দখিনডিতে ছান্তি হবে না' বলে মোহরা খাতুন ফের প্রশ্নটি তুলল, 'কতি সে?'

'ছোটআজাবাবুর ঠেঞে থল না পেঞে ঘুড়ানিমতলায়...' সোনারু নড়ে উঠল সহসা। 'বুন রে, থল দে। বিটি মামুর বাড়ি যেতে চাহেঞ! বোলে কী, ইস্টিশানে পহুঁচে দ্যাও...হায় গো, ই সোনারুর প্যাট পুড়ে, ঘুড়া হঞে হঞে ছুরতে আর একটুকুন জোর নাই...ও বুন, থল দে, আমি বাঁচি। রাতটুকুন কাল দিনটুকুন, বেশি লয় বুন রে!'

মোহরা খাতুন শ্বাস প্রশ্বাসপূর্ণ ঘোষণা করল, 'লিঞে এস।' এতে তার মরদ স্তম্ভিত পাষাণ, তারপর ঠোঁট ফাঁক করেছিল। কিন্তু আবার ঘোষণা হল, 'উঠ ভাসুর, লিঞে এস।' তখন সে স্পন্দনহীন হয়ে গেল। আর সোনারু প্রকৃত ঘোড়ার মত খিড়কিপথে বেরিয়ে গেলে স্ত্রীলোকটি উঠোনে অবতরণ করল। মৃদুস্বরে বলল, 'ছাতে লুকিন থুব আর শুনো, উয়ার কিছু হলে পরে তুমাকে কুপিঞে কাটব, হুঁ। প্রান্তিক চাষী-কাম-ক্ষেতমজুরটি এই সঙ্কটকালে কিয়ৎক্ষণ জড়ীভূত দশায় অবস্থানের পর অগত্যা মরিয়া হয়ে শুধু বলল, 'না না...'। এই শব্দে প্রতিশ্রুতি ছিল। মৃত পান্নার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা ছিল।...

আগাছা-পরিবৃত মেহগিনি, যার আঞ্চলিক নাম ঘোড়ানিম, এতক্ষণে তার দিকে চাঁদটি ঈষৎ তির্যক দৃষ্টিপাত করছিল। সেখানে ঝিমঝিম নির্জনতার ঘোরটি কেটে গেল সোনারুর ছটফটে আবির্ভাবে এবং নৈঃশব্দ্যও চিড় খেল, 'বিটি রি' এই পাতাখসা কণ্ঠস্বরে। কোনও সাড়া না পেয়ে সে নিশাচর চোখে গাঢ় ছায়াগুলিন দেখতে দেখতে এবং খুঁজতে খুঁজতে রেগে যাচ্ছিল। অবশেষে থমকে দাঁড়াল। মুখখানিতে বাঁকাজ্যোৎস্না অমর্ত্য সৌন্দর্য এঁকেছিল, চুনি ঘুমিয়ে পড়েছিল। কুঁকড়ে গুটিসুটি শুয়েছিল ছায়ার ভেতর, ইতিমধ্যে কখন তার মুখে জ্যোৎস্না বেঁকে এসে নামে। কোমরে দুহাত রেখে চোইতপাগল তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিল। ওই পরিমুখের প্রতিভাস তাকে ক্রমশ মুগ্ধ করায় সে ভাবছিল, কেঁদেকেটে দক্ষিণডিহি ভাসিয়ে না দিলে তার মৃত্যু অনিবার্য। এই কারবালা শোক বইয়ে দেবার মত ইউফ্রেটিশ নদী তার মানবশরীর নয়। সে নাক ঝেড়ে একটু ঝুঁকল, মর্সিয়া-সুরে ডাকল, 'বিটি, উঠ্ রি।' কিন্তু ঘুমটি গাঢ় ছিল। অগত্যা সে দুঃখিত হাসল। 'জানমারি বংশ...কেমুন ঘুমায়...' বলে আরও ঝুঁকে গেল। 'ই কী ঘুম রি...সাপঘুম ঘুমাস তু...উঠ্ উঠ্' এবার তার কথায় ভর্ৎসনা এসে মিশল। তারপর সে কৌতুকে চুল টেনে দিল।

তখন চুনি ধুড়মুড়িয়ে উঠে বসল। কয়েকমুহূর্ত পরে সে বাস্তবতা পুনরুদ্ধার করল। সে কষ্টে হাসছিল। 'চাচা...ক্যানে ঘুমালাম ভেবে পাই না...' বলে সে চুপ করল এবং খসা চুল বাঁধতে থাকল। তাকে আহ্লাদী দেখাচ্ছিল, স্টেশনের পথে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে ভেবে।

কিন্তু সোনারু বলল, 'থল মিলেছে! মোহরা খতুন বুলালে, লিঞে এস। আয়, লিঞে যাই!'

অমনি সে ছটফটিয়ে মাথাটি এপাশে-ওপাশে এত জোরে দোলাতে থাকল, এতে চোইতপাগল হতভম্ব। চুনির জন্য লুটুন বাঁধা চুল ক্রমাগত খসে একটি হুলুস্থুলুস চিত্রায়িত, তির্যক জ্যোৎস্নাপাতে তাকে ভর ওঠা ভৈরবী দেখাচ্ছিল। তাকে সঠিকভাবে বোঝবার জন্য এবং হতচকিত রাগে সোনারু তার সামনে দুহাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে ঠেকিয়ে ব্যাঙ-বসা বসল, কিছু চ্যালেঞ্জও ছিল। চুনি পুনঃ পুনঃ 'নাহ্' বলছে বুঝতে পেরে সে কোলাব্যাঙের গর্জনে 'থাপুড়ে...' বলে ডান হাত তুলেছিল, তারপরই হাতটি নামিয়ে নিল। প্রচণ্ড অভিমানে সে অতিকষ্টে উচ্চারণ করল, 'ক্যানে?'

চুনি বলল, 'তুমি খ্যাপা গো...'

ঢোক গিলে 'হুঁ, আমি তো খ্যাপাই বটে', বলল সোনারু। 'খ্যাপা ঘুড়া আমি। পংখিরা-জ!' এই বলে সে গম্ভীর কালো দুই নগ্ন হাত দুদিকে ছড়াল, ডানানাড়ার ভঙ্গিতে নেড়েও দিল, কিন্তু রগড়হীন, এই পক্ষসঞ্চালন, রোষ ও অভিমানে খ্যাপা-খ্যাপ্ত। কিঞ্চিৎ ছ্যারাভ্যারাও, কারণ হাত নাড়ায় দুর্বলতা প্রকট হচ্ছিল।

চুনি তার কথাটি শেষ করতে ব্যগ্র। সে গ্রাহ্য করছিল না চোইতপাগলের পক্ষিরাজ-হুংকার। বলল, 'ও চাচা, ই জানমারি মাটিতে আমি থল লিব না, বুঝনা গো! তুমি পংখিরাজ হএছ...মানুষ হও। বুঝ।'

'তার আগুতে তু বুঝদারনি হ।' অভিমানী ও ক্ষুৎকাতর পক্ষিরাজ ডানা মুড়ল। সে চ্যালেঞ্জ ছুড়ল ঘাসেঢাকা মাটিতে একটি কিলে। ঘাস শিশিরভেজা, ফলে অদ্ভুত এক অলীক শব্দ হল। 'তু বোল আমাকে, কুনঠিঞে যাবি জানমারি নাই? দ্যাখা তু...হুঁ, টেরেনে চড়ে মামুর বাড়ি যাবি' বলেই সে ট্রেনের চাকার আঞ্চলিক প্রতীকগুলিন আওড়াতে থাকল, ওঝা যেমন মন্ত্রপাঠ করে, 'টিকিটবাবুর কত টাকা টিকিটবাবুর কত টাকা...ক্যাঁথাচাপা ধোকড়চাপা...ক্যাঁথাচাপা ধোড়কচাপা...' চুনির সামনে এক অশরীরী ট্রেন চলে যাচ্ছিল। যা কোনও স্টেশনে দাঁড়ায় না এমনই ট্রেন। চোইত-পাগল এটাই চেয়েছিল। লেংড়িভেংড়ি বিটি সেটা বিশদ বুঝুক। সে অলীক এবং শ্বাসপ্রশ্বাসময় ট্রেনটিকে কিছুতেই কোনও স্টেশনে দাঁড়াতে দেবে না, কারণ সর্বত্র জানমারি। কিন্তু ততক্ষণে চুনি বুঝদারনি হয়েছে ভিন্নভাবে। কখনও অলীক ট্রেন কখনও পক্ষিরাজ ঘোড়া, জানমারি রাতের এই এক বহুরূপী জিনের হাতে সে বিপন্ন। তার চেয়ে মোহরা খাতুনকে বেছে নেওয়াই এখন প্রাথমিক উদ্ধার।

সে ফোঁপানিতে শুধু বলল, 'চল' এবং তাতে কাজ হল। কিম্ভূত প্রাণীটি ঘুরে তাকে পিঠ দিল এবং যথার্থ পক্ষিরাজের ভঙ্গিতে চাঁদ-জ্বলা মাঠের দিকে উড়ে গেল।...

পাঁচ

প্রান্তিক চাষী-কাম-খেতমজুরের দুঃসাহসী বউটি যখন আঁধার ঘরের দরজার কাছে চুনিকে মায়ের হাতে জলদেওয়া ভাত আর কী একটা ছালুন খাওয়াচ্ছে, তখন তার 'তন-চুষা' মরদ সতর্কতায় খুব-গম্ভীর। তাই তার সোনারুর গুড়-মুড়ি চিবুনোর শব্দও মেঘগর্জন হয়ে কানে বাজে। সে ভাবছিল, 'ই শালো খ্যাপার দাঁতগুলিন ই বয়েসেও দড়!' শেষে না বলে পারল না উৎকণ্ঠাবশে, 'পানি মেখে খাও হে, মুড়ি শক্ত।' এ কথায় সোনারু কান করল না। সে প্রতিটি মুড়ির ভিন্ন ভিন্ন মধুরতা আবিষ্কারে মনস্ক। প্রাণীরা যে-ভাবে খাদ্য গ্রহণ করে, সেইমত নিষ্ঠা ছিল। ক্রমশ প্যাটজ্বলাটি যত ঘোচে, সমস্ত কিছু তত স্বাভাবিক হতে থাকে তার বোধে। সেই স্বাভাবিকতার মধ্যে একবার করে চেতনা ঝিলিক দিয়ে যায়, পান্নার বহিনের নয়, তারও একটা থল মিলেছে এভাবে—এক সাংঘাতিক জানমারি সময়ে পৃথিবীর সঙ্গে তার ছিন্ন সম্পর্ক অকল্পনীয়ভাবে পুনঃস্থাপিত। সে খুশি হয়। 'যেদিন ল্যাখা হবে জানমারি বন্ধ, সেদিন ই সোনারু বড় মুখ করেঞ এত বুলে বেড়াবে হে, ই খ্যাপা চোইতপাগলা মনুষ

এক লেংড়িভেংড়ি বিটিকে পিঠে চড়াঞে...' সহসা এই বাক্যগুলি তাকে গৌরবে হাসায়। সেই গৌরব তার মুখে দুবার খ্যা খ্যা করলে নেয়ামত বিরক্ত। 'কী খালি হাসো হে! ইটো হাসির সুময় লয়।' সে খসখসে গলায় বলল, 'রাত বেড়েঞে গেল ইদিকে। ভোরে কামে যাব...' ঘুমের গুরুত্ব বোঝাতে সে একটি নকল হাইও তুলল। সোনারু চড়া সুরের হাইটি লক্ষ্য করে মৃদুস্বরে মাত্র মন্তব্য করল, 'বারো বছর ঘুম নাই!' এই কথাটি সে গুরুত্ব দিয়ে না বললেও ক্ষীণ দুঃখ ছিল। 'বারো বছর'-এর আংশিক সত্যতাটি অবশ্য বিমূর্ত, কারণ সে সন্ধিপাগল, কিবা দিন কিবা রাত্রি হিসেবজ্ঞানহীন এবং এই পৃথিবীর সঙ্গে কবে যেন তার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল অন্যান্য প্রাণীগুলিনের মত, এটুকুই মনে পড়ে। বাকি সবটাই তার কাছ থেকে বৃত্তাকারে দূরে সরে গেছে, যেন সে একটি বিন্দু—যা আকারহীন এবং কোনও-কোনও সময়ে সহসা কোনও দিক থেকে কী আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় একটি কী দুটি নিবিড় স্মৃতি, জগা মেকদারের গড়া প্রতিমার সাজের একেকটি ঝিলমিলে টুকরো হয়ে তাকে—সোনারু নামক বিন্দুটিকে আকার দেয়, আর সে বিস্ময়াবিষ্ট, আতুর, বলে, 'ভালা মজা!' এ রাতে যেমন সে সিং রাজাদের বাড়ির ভেতর হাঁটতে হাঁটতে তেমনি একটুকরো স্মৃতি ফেরত পেয়েছিল। বাবার সঙ্গে খাজনা দিতে যাওয়া 'পুণ্যার' দিনে, রাজবাড়ির শোভা, এই চকিত রাঙতার কারুকার্য কয়েক মুহূর্ত। সে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে রইল। ঘুমের কথায় তার এ রাতেব শোয়া, যা বস্তুত ভূপৃষ্ঠে সরীসৃপ হয়ে থাকা মাত্র, অনুষঙ্গ-নিয়মে চিন্তায় এসেছিল। 'ছাতে লুকিন থুবো' বলেছিল মোহরা খাতুন, স্মরণ হয়। তাহলে কি এরা মাগ-মরদে এই দাওয়ায় শোবে, এই চিন্তা চোইত-পাগলের। রাতের পর রাত যেখানে-সেখানে শুয়ে কাটানো তার মত খালি-গা মানুষের চামড়াকে গণ্ডার করেছে। সে নিজের চামড়া সম্পর্কে বলে থাকে, 'ই শালা বড়ই গণ্ডার বটে হে!' ফলে মশাগুলিন তার ক্ষেত্রে এত ব্যর্থ যে সে এ কথাও অহঙ্কারে ঘোষণা করে, 'ই খ্যাপা এক মশামারা বাবু হে!' বহু বছর আগের ম্যালেরিয়া কন্ট্রোলের বাবুদের সম্পর্কে তার এই বিশ্বাস ছিল।

আঁধার ঘরের দরজার কাছে তখন ফিসফিসিয়ে ফুসকথা চলছিল। নেয়ামতের এক কান সেদিকেও। তার সাহসউলি বউ বলছিল, 'ই কাজ তু ক্যানে কত্তে গেলি রি', তখন চুনি প্রশ্বাসময় কান্নায় জবাব দিচ্ছিল, 'দুখে...কিছু বুঝিনি...আমার ভাইটোর জানমারি নিজের হাতে কচ্ছি ভাবিনি গো!' এই জবাবে জিভ চুকচুক করে ব্যথিতা মোহরার মন্তব্য, 'তু বড় বুকা রি! কিন্তুক সে-খবর নামুপাড়ায় যায় কী করে...ই তো আরও বড় ধন্দ', শোনামাত্র তার 'তন-চুষা' মরদটি গোয়েন্দার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বলে ওঠে, 'কেহু দেখেঞে ছিল...লিচ্চয় দেখেঞেছিল' এবং বুঝদারনি বউটি দ্রুত হিসহিসিয়ে ওঠে, 'কাজিরুন! তাইলে পরে হারামজাদি কাজিরুন!' এ কথায় তার মরদও সায় দেয়, কারণ তার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে পান্নাদের বাড়ির উঠোনে কাজিরুনের সবিলাপ বিবরণ 'শহিদে কারবালা' পুঁথিপাঠের সুরে। সে নিজের বিস্মৃতিকে ধিক্কার দিতে দিতে বলে, 'ভুলা মুন আমার...তাইতো বটে...' এবং তার বউ ঘৃণায় বাঁকা প্রথাসিদ্ধ কথাটি উচ্চারণ করে, 'উ মাগি বড়ই তাঁতিন...খালি মাকুচালাচালি স্বভাব।' তারপর চুনিকে জল খাইয়ে আঁচলে তার ঠোঁট মুছিয়ে দিতে দিতে বাইরের জ্যোৎস্নাধোয়া পৃথিবীর তাবৎ মানুষজনকে বুঝদার করার ভঙ্গিতে ঘোষণা করল, 'খুদার গজব...হাতে-হাতে দেখিয়ে দিলে। নিজামের বাঁশের বুনে উয়ার ছাগলটো ছ্যারাভ্যারা হল।'

চোইত-পাগলেরও খাওয়া শেষ। তার অন্যমনস্কতা চিড় খেয়েছিল। এতক্ষণে। সে 'কী কী' করে উঠলে নেয়ামত রেগে গেল। 'ছাগল হে, ছাগল! সব কথায় খালি...' সে আবার বড় একটি হাই তুলল। মাগের তন-চুষা পুরুষ, শক্ত কথা বলতে পারে না কাউকে। এই হাইও আপদ-খ্যাদানোর প্রতীক।

চুনিকে কাঁধে ধরে দাওয়ায় আনছিল মোহরা খাতুন, দাওয়ায় জ্যোৎস্নারাতের ছায়া। স্বামীর কথার ঢঙে বিরক্ত, বলল, 'ভাসুরকে বুঝিঞে না দিলে কী বুঝবে...হারুন হারামিরা নিজামের বাড়ি দিঞে ঢুকেছিল...পালাবার সুময় বাঁশের বুনে বোম ফাটালে আর তাঁতিন মাগি মাকুচালানির ছাগলটো সেখানে...আহা রে অবলা জীব! কার পাপে কে জ্বলে যায়! খুদা গজব দেয় বটে, তবে খুদা কানা গো, বড়ই কানা!'

তখনই চোইত-পাগলের মাথায় লাঠির বাড়ি, এভাবে মাথায় হাত পড়ে। সে ছাগলটিকে খুঁটি খুলে তাড়া করেছিল হনুমান-শেয়াল-বাঘ এইসব বিবিধ প্রাণীর ভয়াবহ ভঙ্গিতে এবং ভীত ছাগলটি কীভাবে পালিয়ে যাচ্ছিল, ঘটনাটি আদ্যোপান্ত স্মরণ হয়। সে ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝাড়ছিল। সে নিজেও একটি জানমারির কারণ হয়েছে, কনফেসনের প্রথায় সেকথা বলতে লজ্জা করে। কিন্তু নেয়ামতই অবশেষে একটা ব্যাখ্যা দিল, 'ভাই রে! ঘরে আগুন লাগলে কত লিদুষির জান যায়, ভাবোদিকিনি একবার! আর ই তো জানমারির কাল। বেরৎ আগুন হে! আরও কত জান যাবে...সড়কে হাজার পুলিশ! ভাবছি, পান্নায় লাস ফেরত এলে কী হয়—কত জান যায়!'

'মাকুচালানির জানটা আগে যাক।' কোঠাঘরে ছাদে ওঠার মাটির সিঁড়ির ধাপে গিয়ে চাপা গর্জাল মোহরা খাতুন। 'ভাকাদের কাছে খবর হয় না ক্যানে এখনও? ইয়াদের বুদ্দি নাই,...গুঁয়ার...বুকা! শুনি, ভাকার নাকি পিস্তোল আছে...আমদ্দা!' কথায় এমন তাপ, যেন এখনই সে গিয়ে ভাকাদের এই প্রকৃত তথ্যটি জানাবে। পিস্তলটির নামে কিরে দেবে।

সিঁড়ির ওপরদিকে লম্প জ্বলছিল। সেই আলোয় বউয়ের মুখের হিংস্রতা দেখে কী কারণে খুশি তার মরদ। 'ভাবছ বুকা, বুকা লয়। এতক্ষণ কাজিরুনকে ফিনিস করেছে...হিঁ হিঁ...' সে অদ্ভুত শব্দে হাসতে লাগল।

তার বউ এই হাসিতে অধিক রেগে গেল। 'হাসি কিসের?...ভাসুরকে উঠেঞে বিছানা করেঞে দ্যাও।'

হুকুমটি অমান্য করা দুঃসাধ্য নেয়ামতের। সে বিব্রত। কিন্তু মুশকিল-আসান-গলায় চোইত-পাগল বলে উঠল, 'নাহ্!' সে সবেগে উঠল এবং নেয়ামত কিছু বলার আগেই বেরিয়ে গেল। তাকে জ্যোৎস্নায় হনুমান বোধ হচ্ছিল। কয়েকমুহূর্ত বিমূঢ়, পরে স্বস্তিতে খুশি নেয়ামত সদর দরজা বন্ধ করতে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল, সোনারু আদাড় ভেঙে ঘন চকবন্দি বাড়িগুলিনের ভেতর কোনও এক রন্ধ্রে, যা গলিপথও নয়—নিতান্ত দুটি বাড়ির মধ্যসীমানায় চাল-চোয়ানো বৃষ্টিধারাবাহী নালা, প্রাক্তন মুর্গিচোর শেয়ালগুলিনের মত ঢুকে গেল, ওইখানে জ্যোৎস্না যথেষ্ট ছিল। নেয়ামত উঠোনে এসে খি খি হাস্যে ছাদে বউয়ের উদ্দেশে বলতে বাধ্য হল, 'শালো খ্যাপা...খ্যাপা আর বুলব কাকে? এই হুঁশ এই বেহুঁশ! খালি বোলে, ভালা মজা! ভালা মজা!...উ লিজেই এক ভালা মজা হে! পালিঞে গেল ক্যানে, বুঝি না।'

ছাদের ঘর থেকে আকাশবাণী ঘোষিত হল, 'তুমি নামুতে বিছানা করে শও। ক্যানে কী, রাত খারাপ।...' ঘরে কুলুপ এঁটেঞে ছুড়ান (চাবি) আমাকে দিঞে যাও।'

শোনামাত্র মরদটি দুঃখিত। সে বউ ছাড়া শুতে পারে না। মনে মনে অবশেষে লেংড়িভেংড়ি মেয়েটাকেই একশ গাল দিতে দিতে বউয়ের হুকুম তামিল করছিল। তারপর চাবি দিতে গিয়ে আবার মরিয়া হয়ে বলবে ভাবল, তুমি ঘরে সাপ ঢোকালে, জানমারি বংশের মেয়েকে থল দিলে, দেখবে তোমারই সাধের সংসার ছ্যারাভারা হবে—যদি না হয়, আমি বেজন্মাই বটে!

কিন্তু এমন কঠিন কথা কিছুতেই বলতে পারল না। ছাদের ঘরের দরজার সামনে লম্পটি জ্বলছিল। সেই আলোয় বিছানায় শোয়া তার স্তনবতী বাঁজা বউয়েব দুই স্তনের মাঝখানে জানমারিবংশজাত সাবিনী মেয়ে প্রকৃতই 'তন-চুষা' কন্যার মত মুখ গুঁজেছে, পিঠ কাঁপছে শব্দহীন কান্নায় এবং সেই পিঠে মায়ের হাতের ঘুমপাড়ানি মৃদু-মৃদু থাপ্পড়। আরও আশ্চর্য ঘটনা, হাত বাড়িয়ে যখন ছুড়ানটি নিল, তখন মোহরার দুটি চোখ ভিজে ছিল। দ্রুত ফুঁয়ে লম্প নিভলে এই দৃশ্যের সত্যাসত্য বুঝতে নাপারা প্রান্তিক চাষী-কাম-খেতমজুরটি সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় আছাড় খেল অন্ধকারে। অথচ সিঁড়িটি অভ্যাসে তার যথাযথ চেনা। আপৎকালেও অন্ধকারে নিচে নামতে কখনও পা টলে আছাড় খায়নি। আছাড় খেয়ে সে বিড়বিড় করছিল, 'এক শালো খ্যাপা!...ই শালীও এক খেপি। মরুক। জ্বলুক। পুড়ুক।' মশারির ভেতর চিত হয়ে শুয়ে সে তারিয়ে-তারিয়ে দেখছিল, এই বাড়িটা জ্বলছে এবং সে ফাকির হয়ে দুনিয়াদারি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, হাতে বেরৎ লোহার চিমটে, গলায় রঙিন পাথরের মালা, পরনে কালো আলখেল্লা, আশ্বিনেব সবুজ ধানক্ষেত পুড়ে কালো হয়ে পড়ে আছে তার দুধারে।

তারপরই সে নড়ে উঠে শক্ত হল এবং পাশের ভল্লটি চেপে ধরল। অনুচ্চারিত বাক্যে ফোঁস করল, 'নাহ্! নাহ! জান যায় তো লড়েই যাক্'। এইগুলিন তার মরিয়া শপথবাক্য, পারিশেষে তাকে শান্তি দিল এবং তখন তারও দুই চোখ ভিজে গিয়েছিল।...

ততক্ষণে চোইত-পাগলা তিনবার 'তু কে রে, তু কে রে' জানমারি রাতগুলিনের রীতিসিদ্ধ এই চমক-হুঙ্কার শুনেছে এবং প্রতিবারই সাড়া দিয়েছে, 'ই সোনারু হে, খ্যাপা, বড় ই খ্যাপা'—যা সে নিজের আইডেনটিটি কার্ড হিসেবে ব্যবহার করে থাকে যে-কোনও চ্যালেঞ্জের মুখে। উত্তর-পশ্চিমরাঢ়ের কঠিন মাটিতে ঘরগুলিন ঠাসাঠাসি। বিশেষ কথা, শরৎকালীন চন্দ্রালোকে তাদের পোড়ো ও রহস্যময় দেখায়। কুকুরগুলিনও সেই রহস্যকে শনাক্ত করতে পারে। বার বার তারা গর্জন করে বস্তুত রহস্যকেই শাসায় এবং সোনারুকে দেখলে তো কথাই নেই, কারণ এই দ্বিপদ মূর্তিটি দিনরাত্রি সর্বকালের রহস্য চতুষ্পদগুলিনের কাছে। কিন্তু সোনারুকে তারা ভয়ও পায়। সেও চতুষ্পদ হয়ে, যেভাবে কাজিরুনের হতভাগিনী ছাগলটিকে ভীত করেছিল, বিকট অঙ্গভঙ্গিতে তাদের মোকাবিলা করে। এরাতে সে তাদের গ্রাহ্য করছিল না। তার লক্ষ্য ছিল কাজিরুন। চতুষ্পদগুলিন কিছুদূর তাকে যথেচ্ছ শাসিয়ে সদর রাস্তায় থেমে গিয়েছিল, সেখানে জ্যোৎস্না ছিল, তারা সোনারুর আরেক রন্ধ্রে নিপাত্তা হওয়া দেখে সেখানে জড় হয়ে সেইদিকে মুখ করে রিলেপ্রথায় শাসাচ্ছিল, ক্রমে কণ্ঠস্বরের বেগ ক্লান্তিতে কমেও আসছিল। সেই সময় থানার মেজবাবু জনাকতক বন্দুকবাজ সেপাইসহ দরগাতলার নোম্যানসল্যান্ডের টহলদারের রিইনফোর্সমেন্ট কাজে এসে পড়েন এবং প্রাণীগুলিন তাঁর মুখে 'হালার কুত্তা' শোনামাত্র উল্টোদিকের কয়েকটি ছায়াসঙ্কুল রন্ধ্রে লুকিয়ে যায়।

সোনারু তখন আকন্দ কালকাসুন্দের জমাট নিচু জঙ্গলটুকু পেরিয়ে কাজিরুনের কুঁড়েঘরটির সামনে গুঁড়ি মেরে বসেছে। একদা উঠোনঘেরা মাটির পাঁচিল ছিল মনে পড়ে। পাঁচিল ঢিবি হয়ে গেছে। ডানদিকে ফুলকুঁড়িদের ঘর, যে পড়নবাজ মেয়ে। বাঁয়ে তার চাচার ঘর। দুপাশের দুটি ঘরই আব্রুঘেরা, সে আব্রু বেড়া দিয়ে তৈরি মাত্র। বেড়াগুলিন তালপাতা, কোঙ্গাপাতা, আর খেজুরপাতার ঘনসন্নিবেশ। মাঝখানে বিধবার আব্রুহীন কুঁড়েঘরটির দিকে জীবনে এই প্রথম দয়ার্দ্র অবলোকন করছিল সোনারু। এপাড়ার মৌলবিসায়েবের মুখের 'দেল ফেটে যায়, দেল ফেটে যায়' বিলাপ তার মুখ দিয়ে বেরুতে চাইছিল। হুঁ, পাড়াকুঁদুলি আর মাকুচালাচালি স্বভাব বটে মেয়েটার, তার জানমারি বহু বছর ধরে কাম্যও ছিল চোইত-পাগলের, কিন্তু আজ রাতে সে নিজের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং সহসা তার মনে পড়ে যায়, এই মেয়েটাই কবে কোন যুগে, বিধবা হওয়ার পর কোনও এক সময়ে, হুঁ...জনহীন দুপুরবেলায়, তখন গ্রীষ্মকাল এবং লু হাওয়া বইছিল, হানিফ মোল্লার আম গাছটির তলায় হাওয়ার দাপটে খসে পড়া আম কুড়োতে গিয়ে...

সোনারু স্মৃতির ভেতর ঘুরতেই দৃশ্যটি অলৌকিক বোধ হল। একটি খসে পড়া ডাঁসা আমের ওপর একইসঙ্গে দুটি হাত...

কেউ ছিল না সেখানে, কেউ না। 'তুমার থল নাই, আমার একটুকুন আছে। থল দিতে চাহিঞ্,...তো তুমার কথাটো কী, শুনি!' তারপর মুখে আঁচলচাপা হাসি। তখনও কাজিরুনকে যৌবন ছেড়ে যায়নি। আর সোনারুও ছিল খাটিয়ে মরদ। যার বাড়ি খাটে, তার বাড়ি শোয়। বাপ ভিটেখানি তোরাব মিয়ার কাছে বন্ধক রেখে কবরে শুতে যায়। সেই ভিটেয় মিয়াসায়েবের মুদির দোকান হয়। দোকানটির সামনে দিয়ে যেতে সোনারু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভেংচি কেটেছে, যথারীতি মৈথুনমুদ্রা প্রয়োগে হেনস্তা না করে ছাড়েনি এবং চোখে পড়লে মিয়া ব্যাটাদের লেলিয়ে দিয়েছেন। একবার সোনারুকে সারাদিন গাছে বেঁধে রেখেছিল।...

'বোলো, তুমার কথাটো কী, শুনি!'

'এই লে!' কী দুর্জ্ঞেয় হঠকারিতায়, কিংবা ভয় পেয়ে, সোনারু আমটি ছুঁড়ে ফেলে চলে গিয়েছিল। ডাইনি, কুঁদুলি তো বটেই, 'ভাতারখাকি', 'প্যাট-পোড়ানি'—যে মেয়ে ব্যভিচার-নেশায় ডিম্বকোষদুটিকে কাপাসের শেকড় বেটে খেয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে, এইসব বদনামই কি সোনারুকে

সরিয়ে দিয়েছিল নির্জন দুপুরে হানিফ মোল্লার আমতলা থেকে? পরে কিন্তু কতবার দূরে বা আড়াল থেকে কাজিরুনের দিকে লক্ষ্য রাখত, কষ্টিপাথরে সোনাকষার সময় পাঁচু স্বর্ণকারের মুখে যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসময় ভাব ফুটতে দেখেছে, সেই ভাব তার মুখেও ফুটে উঠত। ভাবত, কী করবে? নিজেকে জিজ্ঞেস করত, 'মনা রে মনা! তু ঠিক করে দে।' মনা-শালাও যেন বাপের ভিটের মত কোন মিয়ার তমসুক খতে বাঁধা। আর এই আড়িপেতে কাজিরুনকে লক্ষ্য করা থেকেই প্রথম কাজিয়া বাধে।

সেই গ্রীষ্মের দুপুর, লু হাওয়া, মোল্লার আমগাছটি, খসেপড়া আমে সোনারুর হাতের ওপর কাজিরুনের হাত, মেয়েলি হাসি এবং জীবনে সেই প্রথম পুরুষ হাতের ওপর নারীর হাত।

চোইত-পাগলা অনুচ্চস্বরে শুধু বলল, 'ভালা মজা!' কৌতুক ও দুঃখমিশ্রিত। সঙ্গে একটি ওজনদার শ্বাস ছিল।

সে গুঁড়ি মেরে উঠোন পেরিয়ে গেলে অপ্রশস্ত দাওয়াটি চোখে পড়ল, ছায়া ঢাকা। নিশাচর চোখে দাওয়াটি শূন্য দেখল সে। দাওয়ায় তেমনি গুঁড়ি মেরে উঠে সে ফিসফিসিয়ে ডাকল, 'কাজিরুন! কাজিরুন!' এই ডাকে গাঢ় ব্যাকুলতা ছিল। প্রতি মুহূর্তে সে বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে একটি কাজিয়ার হুংকার আশা করছিল এবং সেজন্য তৈরিও ছিল। কিন্তু কোনও সাড়া এল না। তখন সে বাঁশবাতার কপাটটি ঠেলতে গেল, টোকা দিল না যেহেতু দুধারে কাজিরুনের দুই দেবরের বাড়ি এবং জোরালো 'তু কে রে, তু কে রে' সম্ভাবনা, পরিণামে এই জানমারি রাতে জঘন্য খিটকেলেরও আশঙ্কা। সে খুব অবাক হয়ে দেখল, বাঁশবাতার কপাটের একধারে, মাঝামাঝি জায়গায়, বাঁশের চৌকাঠের সঙ্গে লোহার কড়ায় একটা তালা আটকানো!

এত রাতে কোথায় গেল কাজিরুন, বুঝতে না পেরে হতাশ সোনারু এদিক-ওদিক তাকাতে থাকল। সে আরেকটি জানমারি বন্ধ করতে এসেছে, অথচ চেষ্টাটি বৃথা হয়েছে। এতে রেগে যাচ্ছিল। এই সময় দাওয়ায় ছাগলের নাদিগুলিন, যা তার হাতে ও হাঁটুতে প্রচুর মেখে গেছে, নিশাচর চোখে প্রত্যক্ষ হল। ফলে সে আরও রাগল। তার প্যাটজ্বলাটি না থাকায় সে এখন যথেষ্ট উদ্দীপিত, কর্মক্ষম। ভাবছিল, পড়নবাজ ছুঁড়িটিকে ডেকে তার এই চাচি সম্পর্কে কিছু অকথা বলবে এবং তাতে আগুনের উত্তাপও থাকবে। তবে এখন সে কাজিরুনের প্রতি দয়ালু। তাই তার জানমারির কথাটিও তুলবে। কিন্তু ফুলকুঁড়ির বাড়ির বেড়ার কাছে নিমগাছটির তলায় সবে গিয়ে হাঁটু ভাঁজ করেছে, কালকাসুন্দর জঙ্গল ফুড়ে দুটি কালো মূর্তি বেরিয়ে এল। অমনি সে গুঁড়ির পেছনে সেঁটে গেল এবং দৃষ্টি তাক করল। মূর্তি দুটি কাজিরুনের উঠোনে পৌঁছুলে সোনারু শিউরে উঠল। দুই জানমারি! সে তাদের হিংসার ঝাঁঝও স্পষ্টত অনুভব করছিল।

'ইঃ...ই কী রে? তালাবন্ধ।'

'মাকুচালানী...ডাহিন মাগী...হাওয়ায় গন্ধ পায় হে!'

'তাই বটে। নামুপাড়ায় যেঞে ঢুকেছে, আর কতি যাবে?'

'চালে আগুন দিই...শালী বুঝুক...'

'নাহ্।'

'নাহ্, ক্যানে? ...তু...'

'ভাকা বুললে না ছোটনদার মানা? একটুকুন চেপে থাক, বুলবে না?'

'ধুস্ শালা! তাইলে এলি ক্যানে?'

'ফিনিস কত্তেই এলাম।'

'তাইলে পরে?'

'থাকলে ফিনিস করে নিমগাছে ঝুলিয়ে দিতাম। সুসাইড কেস...খি খি খি...'

'হাসিস না বে! চ, ফুলকুঁড়ির বাপকে উঠিন জিজ্ঞেসা করি...'

'ছেড়ে দে। চ, ভাকা কী বোলে, শুনি। ...আয়!'

'বিবিজি কথাটো যদি টাইমে বুলত...'

'শোকে মাথার ঠিক নাই। খ্যাল হয় নি...আমাদেরও শালা খ্যাল হয় নি,...মাকুচালানী নিজের মুখে বলেছিল...ইঃ, চান্স মিছু করেএ্র এখুন শালা কপাল চাপড়াও!' সে সত্যিই কপালে থাপ্পড় মারল। চটাস শব্দে স্তব্ধ পারিপার্শ্বিক শিহরিত। জানমারিদ্বয়কে হামাগুড়ি দিয়ে সদর রাস্তা অবধি অনুসরণ করছিল সোনারু। তাহলে যা ভেবেছিল, কাঁটায়-কাঁটায় মিলে গেল। কাজিরুনকে গলা টিপে মেরে নিমগাছটিতে ঝুলিয়ে দিত! ফের ঠাসাঠাসি বাড়িগুলিনের আনাচ-কানাচ ঘুরে আরও কয়েকবার 'তু কে রে, তু কে রে' এসবের মোকাবিলা করতে করতে চোইত-পাগল অবশেষে গহুরআলির সেই পোড়া ঘরের কাছে গিয়ে আধপোড়া পাকুড়গাছটির তলায় খটখটে মাটিতে বসে পড়ল। তারপর সহসা নিশুতি রাতের সেই জনহীন মাঠপুকুরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে কাঁদতে থাকল। এতক্ষণে এই সুনসান নিরিবিলিতে সে কারবালা-শোকের দরজা খুলে দিয়েছিল। গাছপালা, জ্যোৎস্না, জল, পোড়ামাটি সবকিছুকে শুনিয়ে সে আর্তনাদ করছিল, 'ছান্তি...শুদু ছান্তি চাহেএ্র ই খ্যাপা, আর কিছু লয় গো বাবাসকল, মাসকল...ছান্তি-ই-ই-ই!'

তৎকালে জাতীয় মহাসড়কের সেকুলার সেক্টরে রাষ্ট্রীয় পেশী প্রদর্শনের সকল তথ্য একাদিক্রমে ছোটনের সামনে স্তূপীকৃত, যা সে শীতল চোখে দেখছিল। সে তার প্রমোদকক্ষে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে তিনবার 'শালাও' উচ্চারণ করেছিল। তিনটি 'শালা'-র মধ্যবর্তী নীরবতাত্রয়ে অনুচ্চারিত বাক্যগুলিন ভানু ও আসগার সুস্পষ্ট শুনতে পায়। তারা দুর্ধর্ষ জানমারি, কিন্তু হুইস্কিবশে তখন কোমল, মাঝে মাঝে চমকে উঠেছিল, পান্না ফিনিস! পান্না বেঁচে নেই! 'পা-ন্না-আ!' ছোটন তাকিয়েছিল ভানুর দিকে, কারণ এই টানযুক্ত হাহাকারটি ছিল তারই। ভানু, যে সেদিন মায়ের মৃত্যুশোকেও পাষাণ ছিল, সহসা পান্নার জন্য এমন হাহাকার কবে! একমুহূর্ত অবাক থাকার পর ছোটনও দুহাতে গেলাসটি বুকে চেপে ধরে প্রশ্বাসময় উচ্চারণ করে, 'আমার ফাদারটা এক পাঁঠা...শালা পলিটিক্সে পেচ্ছাব...ভোট...পার্টি' সে সোজা হয়ে বসে। ভানু টেবিলে মাথা রেখেছিল। তার চুল ধরে টেনে মুখটা তুলে দেয় ছোটন। 'কাঁদবি না...কক্ষনো না...তুই মাগী যে কাঁদবি?'

এই ধিক্কারে ভানু রক্তচক্ষু। হিংস্র বলে, 'রাগে কাঁদি। জেঠু কাঁদালে...সি আর পি পর্যন্ত...' সে গর্জন করে, 'কিসের কমিউন্যাল হে? হারুনরা ফিনিস করলে পান্নাকে। কিসের কমিউন্যাল? আসগার, বুঝিয়ে দে।'

আসগার হাঁকরায়, 'ছোটনকে বুঝাও হে! উয়ার বাবার পাট্টি আছে, আমাদের নাই?...আছে।'

ছোটন চোখ বুজে দুলছিল, গেলাসটি দুহাতে ধরা, কিন্তু এখন টেবিলে, আস্তে বলে, 'তোদের নেশা হয়েছে। বাড়ি যা। সকাল-সকাল উঠবি। বডি আসবে, মিছিল-ফিছিলও হবে। সব প্রোগ্রাম ঠিক আছে। কোনও গণ্ডগোল যেন না হয়। যা!'

আসগার গেলাস শেষ করে বলে, 'পান্নার বহিনের কথাটা বুলছ না, খালি বাড়ি যা, বাড়ি যা! বাড়ি তো পড়েই আছে...যাব।' সে হুকুম শুনতে চাইছিল নেতার মুখে। তার আজ সারাক্ষণ এমন ভাব, যেন তর সইছে না, ট্রিগারে আঙুল।

'কাল ভাকার সঙ্গে কথা হবে। এখন যা।' ছোটন মূল্যবান বৈদেশিক সিগারেট ধরাল এবং ওদের - দিল। একটু হাসল সে। 'অনুকূলকাকা আর ফয়েজ...শালাদের ব্রেন মাইরি! লোক আসবে...পার্টি ফ্ল্যাগ...বড় মওকা, তাই না? শালা! পান্না তোদের না আমার? যার গেল, তার গেল! যাঃ! একলা ভাবতে দে।' সে বড় শ্বাস ছাড়ল।

অনুচর দুটি উদ্যানপথে বেরিয়ে গেল। সেখানে খিড়কির দরজার পাশে করগেট শিটের চালাঘরে দুই প্রহরী সজাগ, জাস্তু আর নাজিম। খাটিয়া আছে। মশারি আছে। ফুলের গন্ধ আছে। বোমা, রিভলভার, কুকরি এসব আছে। ছোটনের সেট-আপ সুদৃঢ় ও সুন্দর। মুক্তির দশকে সে ভাল অর্গানাইজার ছিল। অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে জানে। খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে ঢুলুঢুলু চাঁদটির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করল। সহজে তার নেশা হয় না। চাঁদটিকে দেখামাত্র হাজি সইদুরের মুণ্ডুটি তার

মনে পড়ছিল। অন্যমনস্ক ভাবছিল, কিছুদিন পরে হাজিসায়েবের মুণ্ডটিকে ট্রেতে সুন্দর সাজিয়ে সিংহ-বাড়ি, নাকি থানায়, অথবা তার জনপ্রতিনিধি বাবার কাছে ভেট পাঠালে মন্দ হয় না। এ খুবই সহজ কাজ। অথচ কেন করে না, করেনি এতদিন? 'কমিউন্যাল' হবে ভেবেই কি? ধুস শালা! কিসের 'কমিউন্যাল'?...ঠিক আছে। আগে অরু সিং। সিংহ-মুণ্ড। তারপর হাজি-মুণ্ড। সহসা পান্নার কথা স্মরণ হল। পান্না বেঁচে নেই! জীবনে তার প্রিয়তম এক জিনিস পান্না, পান্নার চেহারা, গড়ন, ঐতিহাসিক বীরের ভঙ্গিমা, একটি অনুপম ভাস্কর্য, সকলই স্মরণ হওয়ায় সে, পুলিশ-ভাষ্যে মাফিয়ালিডার এবং আঞ্চলিক টার্মে রবিনহুড বা রবিনহুদ, পঁয়তিরিশ বছর বয়সী শুভ্রাংশু, এতক্ষণে নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল। এই জানমারি রাতে কান্নাগুলির ব্যর্থ হিংসাব, নাকি বস্তুত মানবিক, যারা-যারা যেখানে-সেখানে ক্রন্দনরত, কেউ সঠিক বুঝতে পারছিল না। শুধু এটুকুই বোধগম্য ছিল যে, তারা সকলেই একটি করুণ ও অসহায় হত্যাকাণ্ডের শোকে দীর্ণ।

'শোবে, না কী?' পেছনে এই মৃদু প্রশ্ন শুনে সে ঘোরে এবং স্মিতাকে দেখতে পায় দরজার কাছে, কপাটে একটি শিথিল হাত। সদর শহর থেকে সামান্য প্রেমাত্মক ঘটনার পর কিডন্যাপ করে আনা, পরে বিচক্ষণ জনপ্রতিনিধির হস্তক্ষেপে রফা হয়েছিল, এমন বউকে অবশ্যই প্রচুর নিখাদ ভালবাসে ছোটন। 'এস' বলে পুনঃ ডাকতেই সে বশীভূত হয়। ঘরে নীলাভ বাতি জ্বলছিল, আজ রাত্রে দক্ষিণডিহিতে লোডশেডিং হবে না, সেই অল্প অস্বাভাবিক আলোয় দুর্ধর্ষ বীর স্বামীর ভিজে চোখ ও গাল দেখে বউয়ের অবিশ্বাস্য লাগছিল। এই প্রথম সে আবিষ্কার করেছিল, ও কাঁদে! স্বামীর বীরত্বে বউদের গৌরব স্বাভাবিক। খুনির বউও ব্যতিক্রম নয়, যদিও মুখে বলতে পারে, আহা! কেন যে এসব...এটুকুই। অবশ্য এর বেশি এগিয়ে লাভ হয় না। স্মিতা জানে, সে মেয়ে এবং পুরুষজনেরা অপ্রতিরোধ্য। ফলে সে মেনে নেয়, নিয়েছে এই সাত বছর ধরে সমস্ত কিছু, একবার মাতাল হাতের একটি থাপ্পড়ও, যদিও ক্ষীণ অভিসম্পাত দিয়েছিল, 'হাত খসে যাবে!' ক্রমশ সে বুঝেছিল, অভিসম্পাত কিংবদন্তিমাত্র। কিন্তু এসময়ে চকিত ধারণা হয়, পান্নার মৃত্যুকে সত্যিই একটি হাত খসে যাওয়া বলা চলে এবং তার বীর স্বামী আজ দুপুর থেকে কতবার বলেছে, 'আমার একটা হাত কাটা গেল!' তারপর সব দরজা বন্ধ করে দিয়ে যখন সে আলো নিভিয়ে পাশে শুল, কেন কে জানে স্মিতার ধারণা হল, পাশে একটি শীতল চন্দ্রবোড়া নিয়ে রাতের পর রাত কাটিয়েছে। তিন বছরের কন্যা কাত হয়ে ঘুমোচ্ছিল। সে তাকে বুকের কাছে টেনে নিল। বিশেষ কথা, এই কন্যার অন্নপ্রাশনে তৎকালীন দারোগাবাবু একটি স্বর্ণহার ভেট দিয়েছিলেন। হারটির প্রতি ঘৃণাবশে স্মিতা মেয়েকে পরায় না। ছোটন লক্ষ্য করে না। তার লক্ষ্যপথে অনেক বড় জিনিস আছে। আর প্রকৃতপক্ষে সে তো দক্ষিণডিহি ঐতিহাসিক পরগণার বে-সরকারি শাসকই। দুর্ধর্ষ ডিহিদার।

স্বামীর কান্নাটি দেখার পর স্মিতার বুকের ভেতরটা এরাতে ঠাণ্ডাহিম। সাত বছর নীরব আত্মসমর্পণের পর এমন একটা মুহূর্তে সে পৌঁছেছে, যখন অবশেষে আবিষ্কৃত হল, আশ্চর্য! সে কেন ঘৃণা করছে না ওকে, শীতল হিংস্র সরীসৃপটিকে? ওই কান্না কিসের সে বুঝেছে। মানুষ মমতার কারণেই কি শুধু কাঁদে? ব্যর্থতা, ক্রোধ, মৃত্যুভয়ও কাঁদায়। পান্নার মৃত্যুর খবর পেয়ে স্মিতা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ছিল। তার বিশ্বাস হয়নি, পান্না হোসেনকে কেউ মারতে পারে। পরে একটু দুঃখ হয়েছিল মাত্র, নিছক অতিপরিচিত কেউ খুন হলে যে ভয়মিশ্রিত দুঃখের উদ্রেক হয়, তার বেশি নয়। সে তার স্বামীর এই অনুচরদের সহ্য করতে পারে না। তার ধারণা, এরাই ওকে নষ্ট করেছে, নতুবা অনেক ভাল জিনিসও ওর মধ্যে ছিল, এখনও আছে। রবিনহুডি দানখয়রাতগুলিন প্রথম প্রথম বোকামি মনে হত, পরে ভাবত এগুলিন গুণ এবং মানবিক। কল্পনা করত, স্বামীর নিজস্ব যে-বৃত্তটি আছে, তার বাইরে অবস্থান তার। শাশুড়ি শহরে চলে যাওয়ার পর সেই বৃত্তে চমৎকার কারুকার্যে একটি সংসার গড়ে তুলেছে সে। এটি তার নিজস্ব বৃত্ত। এখানে সে তার গর্ভজাত সুন্দর প্রাণীটিকে নিয়ে যেন বা সুখী। অথচ হঠাৎ-হঠাৎ টের পায় এই নিজস্ব বৃত্তটি আরেক বিপজ্জনক বৃত্তের অন্তর্বর্তী, যেটি তার স্বামীর। তখনই সুখের তলায় কাঁটা ফোটে; অসহ্য লাগে। রিটায়ার্ড স্কুলশিক্ষক বাবা বার দুই এসেছিলেন,

শেষবার ঝুমার অন্নপ্রাশনে, মা একবারও না, দাদারা তো কেউই না। না চিঠি, না কিছু! সে এত একা! ঝুমা না জন্মালে সে গায়ে পেট্রল মেখে পুড়ে মরত। তার কোনও দোষ নেই, অথচ সে দোষী। পৃথিবী সত্যিই অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন এবং কেন যে মানুষ এখানে জন্মায়! স্মিতা শিশুটিকে বুকে চেপে মানবজন্মের উদ্দেশ্য চুঁড়তে চেষ্টা করছিল।...

তখন গহরআলির পোড়া ঘরের কাছে চোইত-পাগলের কান্নাটি গানে রূপান্তরিত এবং সে চিড় খাওয়া গলায় প্রচণ্ড স্তব্ধতাকেই আক্রোশে আক্রমণ করেছিল, 'পালা রে পালা রে পাখি/দ্যাশে এল পাখমারা'...প্রকৃতপক্ষে আধপোড়া পাকুড়তলায় ন্যাড়া অসমতল মাটিটি তার শয়নযোগ্য মনে হয়নি। সেকারণে গা তুলেছিল সেখান থেকে এবং প্যাটজ্বলা ভাবটি না থাকলেও ক্লান্তি ছিল। পা ফেলেই বুঝতে পারছিল মাটি তার ঠ্যাঙ ধরে টানছে। টলমলো কয়েকপা হেঁটে গানটি দুকলি গেয়ে একবার থেমে মাটির দিকে নিষ্ঠুর দৃষ্টিপাত করেছিল, বলেছিল, 'আমি মাটিকাটা মুনিশ, তু জানিস?' এটি শাসানি এবং পুনঃ ঘোর স্তব্ধতা অনুভূত হওয়ায় সে গানটিকে সঙ্গী করেছিল, 'পালা রে পালা রে পাখি...' আর এইসময় দুই ছায়ামূর্তি তার সামনে এগিয়ে আসতে দ্যাখে, তবু গান থামায় না। কাজিরুনের বাড়িতে দেখা সেই জানমারিদ্বয় নিশ্চিত এবার তাকেই গাছে ঝোলাতে আসছে ভেবে সে সিদ্ধান্ত করে ফেলে, গানটি গাইতে গাইতেই মরবে এবং সুরকে আরও করুণ করতে থাকে। কিন্তু জানমারিদ্বয় তার সামনে এসে খ্যা খ্যা করে, 'শালো খ্যাপার মরণ নাই হে...এত রেতে গান গাহে!' কথাটি আসগারের।

চেনামাত্র সোনারু 'মা দুগ্গার চালির ছামুতে' নাচার ইসলামি অভিযোগ নিশ্চিত মৃত্যুর আগে প্রচণ্ড দৃষ্টান্তস্বরূপ এবং জ্যান্ত প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতে চাইল, 'মরি, তো লেচেই মরি...মা দুগ্গার চালি ছামুতে নাই থাক্' এই সংকল্পে। সে হাত ঘুরিয়ে ও কোমর দুলিয়ে প্রাচীন গন্ধর্ব হয়। এতে জানমারিদ্বয়ের খ্যা খ্যা খি খি বৃদ্ধি পায়, বস্তুত বৃহৎ সন্তাপ ও ব্যর্থতার পর তারা রিলিফ চেয়েছিল। বিতর্কিত ঘাসজমিটিতে, যেখানে কাজিরুনের ছাগলটি বাঁধা ছিল, ঢুলুঢুলু জ্যোৎস্নায় ঘটনাটি ক্রমে উপভোগ্য হওয়ায় ভানু তালবাদ্য মৃদু ধ্বনিত করে, আমোদগেঁড়েমি এমন পরিবেশ ছাড়া তার মত বি কম পড়া যুবকের পক্ষে অশোভন হত এবং সে ঠাণ্ডাহিম জানমারিস্বভাবী তো বটেই। সহসা সোনারু ধুপুস করে শিশিরভেজা ঘাসে বসে পড়ে। 'ছরত চলে না হে, ঘুড়া...' বলেই সামলে নেয়। ভানু বলে, 'যাঃ শালা! ঘুড়া! ঘুড়া কী রে?' কথার কথা। তবু বিজ্ঞ চোইত-পাগল সতর্কতায় আড়ষ্ট হেসে বলে, 'ই পংখিরাজ রে বাপ! রেতের পংখিরাজ!' তাই শুনে ভানু বলে, 'তাহলে থামলি কেন, বাবা?'

'ড্যানা ভাঙ্গা।' সোনারু হাসবার চেষ্টায় সরু দাঁতগুলিন বের করে। জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকিতে তার সন্ন্যাসী-মুখ রহস্যসঙ্কুল দেখায়। আসগার সঙ্গীর হাত ধরে টেনেছিল। সঙ্গী নড়ে না দেখে সে বিরক্ত হয়ে বলে, 'সকাল-সকাল উঠতে হবে।' এটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া বাক্য এবং এতে এমন আভাসও নিহিত ছিল যে, তাকে আর এগিয়ে দেওয়ার দরকার হবে না। ভানু গোলাপি মাতাল। তার দৃষ্টি ঘাসের ওপর চোইত-পাগলের দিকে, আমোদটি পুরো লুঠতে ইচ্ছে করছিল। তাই আসগার রাগ করে চলে গেলেও সে দাঁড়িয়ে থাকে। পোড়া বাড়িটির ওপাশে দুটি বাড়ি পেরুলেই আসগারদের বাড়ি, পরিবার। ভানু বলে, 'অ্যাই পক্ষিরাজের বাচ্চা! আয়, নাচি।'

'বাপ রে!' সোনারু করুণ সম্ভাষণ করল। 'তু পঢ়নবাজ ছেল্যা, বাপ! ছরত চলে কী চলে না...' সে একটা ব্যাখ্যা দিতে চাইছিল। 'আর কথা কী, ই জানমারি রেতে কী লাচন লাচি? ..লাচি কী হায় হোসেন হায় হোসেন মাতম করি...ওরে! মা দুগ্গার চালির ছামুতে লাচব, তখুন দেখিস...বড় দুখ।' সে দুই হাত নিজের বুকে রাখে।

তারপর সে অবাক হয়ে গেল। যার বাবা রাজবাড়িতে এক খাঁড়ায় একশ আটটি পাঁঠার মুণ্ড কাটত, সে পঢ়নবাজ, অদূরে মাঠে ইরিগেশন সেন্টারে পাম্পযন্ত্র চালায়, জলোচ্ছ্বাসে ভূমি শস্যশালিনী হয় তার হাতে! এই রাতে সে কোমর দুলিয়ে নাচে! এই জানমারি রাতের বিভীষিকায় নাচটি পরস্পরবিরোধী মনে হয় চোইত-পাগলের বোধে। যে-হাত ভূমিকে শস্যবতী করে, সেই হাতটি খাঁড়াধরা হাতেরই উত্তরাধিকার, এ এক আশ্চর্য ঘটনা বটে! সে ভানুর জানমারি হাতের কাজগুলিনও

দেখেছে, আবার সেই হাতে পাম্পিং সেন্টারে সুইচটেপাও দেখেছে। কোমরদোলানি নাচের সময় সে তাই হাতদুটিকেই আকাশে লক্ষ্য করছিল। 'ওই হাত, আহা রে মানুষের হাত!' সে চিন্তা ও ধন্দে পড়ে গিয়েছিল। তারপর ভানু তার চুল খামচে, নাচতে নাচতেই, টেনে তুলে নাচের সঙ্গী করতে চাইলে সোনারু রেগে গেল। 'লাচবি যদি, দরগাতলার চটানে যেঞে লাচ্ দেখি', সে হাঁসফাঁস করছিল চুলের যন্ত্রণায়, 'নামুপাড়ায় ছামুতে যেঞে লাচ, তবে বুঝি তু বীর বটে,' বলে চুল ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। তারপর বুদ্ধি খেলেছিল, চোইত-পাগলের মস্তিষ্কে কিছু স্নায়ুকোষ অতি খর, দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়। সে 'ছাড় বাপ্, লাচি' বললে ভানু চুল ছাড়ামাত্র পরস্পরবিরোধী হাতটিকে সহসা কামড়ে দিল।

কামড়টি জোরালো ছিল। ফলে ভানু 'আহা উহু' আর্তনাদ করে উঠেছিল এবং যখন সে জ্ঞানশূন্য ক্ষিপ্রতায় স্প্রিঙের ড্যাগারটি বের করেছে, তখন সোনারু পুনঃ পংখিরাজ ঘুড়া হয়ে মরিয়া ডানা মেলেছিল। জ্যোৎস্নায় সমস্ত কিছু এমনই তালগোল পাকানো যে ভানু কিছুক্ষণ ফণা তুলে থাকার পর শান্ত হল। এমন কী সে খিখি করতে থাকল, যদিও ডানহাতের যন্ত্রণাটি আবছা টের পাচ্ছিল।

মাঠের ইরিগেশন সেন্টারে এ রাতে সে যাবে না। বাড়ি ফেরাই উচিত মনে হয়েছিল এবং ক্রমশ দংশিত হাতে যন্ত্রণাটি, যত হাঁটে তত বাড়তে থাকে। সে সিদ্ধান্ত করল, শিগগির চোইতপাগলার শ্বাসনলী কেটে সবুজ ঘাসে, ওই বিতর্কিত ঘাসজমিটিতেই শুইয়ে রাখবে।...

এই সময় সেকুলার সেক্টারে গফুর আলির নিভৃত কক্ষে থানার ছোটবাবু 'হরর'-শীর্ষক চলচ্চিত্র দেখছিলেন। কক্ষটিতে আরও কিছু গণ্যমান্য ছিলেন, পঞ্চায়েতি দানখয়রাত ও ডেভলপমেন্টকর্মে ব্রতী পুরুষেরা, তাঁদেরও রিলিফ প্রয়োজন হয় এবং কার্যত যৌনক্রিয়াত্মক বৈদেশিক জ্যান্ত ছবিগুলিন 'হরর'-চিহ্নিত। এটি ছদ্মবেশ। ভূতপ্রেত অধ্যুষিত পোড়ো বাড়ি 'হন্টেড হাউসে' যুবক-যুবতীদের সারমেয়-মৈথুনকলা, কিংবা ক্রাইম স্টোরিতে অপরূপ ধর্ষণদৃশ্য, 'বুভুক্ষু তৃতীয় বিশ্বের নিঃসাড় শরীরে ইঞ্জেকশন' হাফিজুল যেমত ব্যাখ্যা করেন, হাজার-হাজার দক্ষিণডিহির পুরুষ-চক্ষুগুলিন নিষ্পলক করে এবং ছোটবাবু যখন বেরুচ্ছিলেন, তখনও তাঁর চক্ষু নিষ্পলক ছিল। কয়েক পা এগিয়ে ডাইনে নবনির্মিত একটি মন্দিরের সামনে 'ব্যবসায়ী সমিতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত' এই মার্বেল ফলক সাঁটা নাট-শালাটির দিকে তাকালেন। একডজন থামের ওপর চাপানো কংক্রিট ছাদ ও মেঝের রঙ লাল, খোলামেলা, কীর্তন-ভজন-নামগানাদির আসর বসে কোনও-কোনও রাতে এবং মাইকে সেকুলার কান ঝালাপালা করে দেয়. আরও বিশেষ কথা, এই নাটশালাটি কলকাতা থেকে পূর্তমন্ত্রীমহোদয় এসে উদ্বোধন করেছিলেন। ছোটবাবু নাটশালাটির মেঝে জনহীন দেখলেন, সেখানে তির্যক জ্যোৎস্না ছিল। কোনও-কোনও রাতে ওই মেঝেয় সাধু, ভৈরবী, ভিখিরি বা দৈবাৎ সন্দেহভাজন আউটসাইডারদের রাত কাটাতে দেখেছেন এবং সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ পাতি-মস্তানদের গাঁজার আসরও প্রথাসিদ্ধ। কিন্তু একটি থামের গড়ন বিকৃত ও সন্দেহজনক, সহসা আবিষ্কার করে টর্চ জ্বালালেন। চাপা গর্জালেন, 'অ্যাই ব্যাটা! ও কী করছিস?' তারপর হা হা অট্টহাস্যে বললেন, 'তুই সেই পাগলটা না?'

সোনারু থামের আড়ালে সেঁটে ছিল। মাথাকোটার ভঙ্গিতে বলল, 'পাগলা তো পাগলাই বটে, হুজুর...ই পাগলার জায়গাথল নাই...' সে সংলগ্ন মন্দিরের দিকে শীর্ণ আঙুল তুলেছিল, 'বাবার ঠেঞে থল মাঙি হুজুর...'

সে এক মুসলমান-জাতক, মন্দিরের নাটশালায় থল নেওয়ার কারণ হিসেবে 'মা দুগ্গির চালির ছামুতে লেচেছিলাম' এই যুক্তিটি দেখাতে উদ্যত, হেন সময়ে আইনরক্ষক পুনঃ অট্টহাস্য করায় থেমে গেল। 'ধুর ব্যাটা! বাবা কী রে? মা! এটা কালীমন্দির...পাগলা...' ঘোষিত হল।

ঘোষণায় হুংকার না থাকায় চোইতপাগল দার্শনিকতায় উদ্দীপ্ত। হাসল। 'হুজুর গো! যিনি বাবা, তিনিই মা! বাবা-মায়ে ফারাক করে না ই খ্যাপা তো খ্যাপা, পাগলা তো পাগলা।'

ধর্মভীরু ছোটবাবুর মনে প্রমোশনসহ এই বিপজ্জনক থানা থেকে বদলির গোপন আকাঙ্ক্ষা খচ করে উঠেছিল, কারণ দিব্যজ্ঞানী সাধকেরা পাগলবেশে মর্ত্যে লীলা করেন, অবচেতনা এমন বিশ্বাসের গোঁজ পোতা। তিনি ঘুরে মন্দিরবাসিনীর উদ্দেশে কপালে ও বুকে বেটনসুদ্ধ হাত ঠেকিয়ে মহাসড়কে নীরবে নেমে গেলেন। মনের কোনায় চোইতপাগলের উদ্দেশেই কাকুতি ছিল।

তিনি কতকদূরে গেলে সোনারু থামে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল। তার নিঃসাড় শরীর মসৃণতার স্বাদ পেতে উন্মুখ, সে হাত বুলিয়ে মেঝে ও থাম পরখ করছিল এবং অভিভূত হচ্ছিল তার এরাতের থলটির নির্মাণসৌকর্যে। বিড়বিড় করছিল, 'বড়ই সোন্দর, বড়ই সোন্দর!' সে সৌন্দর্য চেনে, সে কারণে মাদুগ্গার চালির ছামুতে লেচেছিল। আর এভাবে ক্রমশ ভুলে যাচ্ছিল জানমারিগুলিন, সমস্ত সন্ত্রাস ও শোক। ফলে মসৃণ সৌন্দর্যের ওপর তার শুতে ইচ্ছে হল। পা ছড়িয়ে শুল সে, পা দুটি মহাসড়কের দিকে।

চাঁদটি নেমে গিয়ে তাকে দেখছিল। চাঁদটি ভড়কে গিয়েছিল অবশেষে। এই চোইতপাগলের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বহুবছর ধরে, সেই সূত্রে চাঁদটিও তার প্রতি লক্ষ্য রাখে। সে ওকে ঘুমোতে দেখছিল, বড় বিস্ময়কর এই ঘুম, এবং ব্যাপারটা কষ্টকরই হবে, খ্যাপা ঘুমুলেই খ্যাপামি ঘোচে পৃথিবীতে এরূপ ধারণা আছে, চাঁদটি জানে। সে প্যাটপেটে চোখে তাকিয়ে রইল এবং মন্দিরের পেছনের শিরিষগাছে প্যাঁচা ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও করে ডেকে উঠলে জ্যোৎস্নার মুঠোয় তাকে ধরতে গেল, কিন্তু ধূর্ত প্যাঁচাটি চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে গফুরআলির বাড়ির দিকে উড়ে গেল। সেখানে একটি বুড়ো বটগাছ আছে।...

'একটা কেরাচ, একটা কেরাচ!'

পান্নার সাজিয়ে রেখে যাওয়া বাইরের ঘরে প্রহরীরা সচকিত ঘুরল এবং খাদেমুন্নিসাকে দেখতে পেল। ঝুলন্ত পর্দা ঝটকায় সরিয়ে তাঁর আলুথালু চুলে আবির্ভাব, ভাকাও এমন বিমূঢ় যে বাক্যটি বিপজ্জনক কিসের প্রতীক বোধগম্য ছিল না। চারজন তক্তাপোষে তাস খেলছিল। দুজন রাস্তার দিকে দুটি জানলার পর্দা ফাঁক করে নজরদারিতে রত ছিল। তারা চেয়ারে বসে ছিল, সশস্ত্র। একটি টেবিলে বসে আরও দুজন ঢুলছিল। সকলেই ঘুরেছিল।

'একটা কেরাচের জন্যে...ওরে, আমার লেংড়ি বিটিটোকে দুষিস না...পান্নার মা ভাঙ্গা গলায় এই হাহাকার করে ওঠার পর প্রথমে ভাকা বুঝল।

সে আস্তে বলল, 'কেরাচ!'

'হু, কেরাচ!' খাদেমুন্নিসা দুহাতে দুই কপাট আঁকড়ে বললেন। 'পান্নাকে উ সাধত, ও ভাই, এত কিনিস অত কিনিস, আমাকে একখান কেরাচ কিনে দে! ...সেই রাগে বিটির আমার হুঁশ ছিল না। ...উ লিদুষী, বড়ই বুকা।'

ভাকা একটু হাসল, কষ্টের হাসি। 'কী বোলেন গো! উটা কথাই লয়।'

'কথা।' পান্নার মা আর্তনাদ করলেন, 'উটাই কথা, বাপ! বুঝে দ্যাখ! ...পান্না বুলত, হঁ, তোকে কেরাচ এনে দিই আর তু ঠকঠকিঞে দখিনডি চরে বেড়া! দুবো না...পান্না বুলেছিল।' খাদেমুন্নিসা, শরিফ বংশের মেয়ে, প্রতিবন্ধী কন্যার প্রাণভিক্ষায় সহসা নির্দয় জানমারিটির রুক্ষ কর্কশ একটি হাত চেপে ধরেছিলেন। সাপের চোখে দৃশ্যটি দেখছিল প্রহরীরা। 'তুরা ভালই জানিস বাপ, চুনি গুঁয়ার বড়। খেপি, রে, বড়ই খেপি! ...ওরে, আমারই দুই ব্যাটা গেল, আমারই মরদ গেল...গেল তো আমারই গেল কি না ভেবে দ্যাখ। দেখে বিটিটোকে মাফ দে...তাকে থল দিই!' দুহাতে মুখ ঢাকলেন চুনির মা।

জানমারিরা মুখ তাকাতাকি করছিল পরস্পর। শেষে ভাকা শ্বাসের সঙ্গে বলল, 'ছোটনদার হুকুম নেই। উয়াকে জিজ্ঞাসা করে...তবে কথাটো ঠিক লয়। কেরাচ-টেরাচ লয়।'

গনি হুংকার দিল। তার হাতে পাইপগান এবং সে জানালার ধারে চেয়ারে। 'কী বোলেন গো আপনি? কেরাচ! ...হারুনরা আপনার বিটিকে বিহার লোভ দেখিঞে...হঁ, সব্বাই বুলছে!'

'মিছা!' খাদেমুন্নিসা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। 'মিছা কথা! কাজিরুনের কথায় তুরা...' কপালে চাপড় মারলেন। 'ওই ডাহিন মাগীকে তুরা কিছু বুলবি না? উ হারামজাদি...'

কথা কেড়ে ভাকা ভরাট গলায় বলল, 'উ মাগীকে পেলে তো...বারুরা ঘুরেঞে এসে রেপোট দিলে, দরজায় তালা। তবে বিটির কথা বুলছেন, ঠিক আছে। তার মুখে শুনেঞ তা'পরে ছোটনদার

কাছে লিঞে যাব। সে যা বুলবে, তাই হবে।' বলে একটু হাসল, পূর্ববৎ ক্লিষ্ট হাসি। 'কতি সে? কতি লুকিন থুঞেছেন তাকে?'

খুবই আশায় ছটফটিয়ে চুনির মা শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বললেন, 'সোনারু এসে খবর দিলে...চোইতপাগলা বড়ই বুকা...খ্যাপা রে, খ্যাপা! চুনিকে পিঠে চড়িন থল টুঁড়ে-টুঁড়ে-শ্যাঘে, খ্যাপা রে খ্যাপা! অরু সিংয়ের বাড়ি-হুঁশবুদ্ধি বিটিরও নাই, খ্যাপারও নাই...'

সকল জানমারি 'সোনারু...অরু সিং' শব্দে ফোঁস কবেছিল, এবং তাদের বিষাক্ত শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘরটি গুমোট—যদিও নতুন সিলিংফ্যানটি লাবণ্যে ঘুরছিল। বারুর হাতে চীনা পিস্তলটি ঝকমকিয়ে উঠেছিল। তরুণ জানমারি 'ওরে শালা চোইতপাগলা' বলে থেমে গেল। গনি বলল, 'সেয়ান পাগল হে! কাজিরুনের সঙ্গে শালোর নটাঘটা ছিল...এখুনও আছে তাইলে,' সে একটি নিটোল চক্রান্ত তুলে ধরল নতুন নেতা ভাকার সামনে। আর নতুন নেতাটি বলল, 'হ্যাঁ—টেরাপ!' শব্দটি ছোটনসংসর্গে লব্ধ এবং বস্তুত ইংরেজি 'ট্র্যাপ'। বহুপ্রচলিত ইংরেজি শব্দটি বাংলা 'ফাঁদ'-এর চেয়ে মারাত্মক ও বিপজ্জনক মাত্রা পেয়েছে দক্ষিণডিহি অঞ্চলে। প্রতিটি জানমারি 'ট্র্যাপ' সম্পর্কে সতর্ক, রণক্ষেত্রে সৈনিকদের আচরণ যেমত।' 'টেরাপ! টেবাপ!' এই চাপা ঘূর্ণিঝড় বইছিল এবং কেন্দ্রে এক চোইতপাগল। অবশেষে নতুন নেতা হাত তুলে সবাইকে চুপ কবিয়ে দিল। তারপব বলল, 'এত রেতে ছোটনদাকে ডিসটাব করব না...শোকে সেও ঝড়ভাঙ্গা গো! ইদিকে সকালে বডি আসবে, পোসেসান হবে, অনেক কাজ! ...তাপরে...' সে চুনির মায়ের উদ্দেশে বলল, 'আপনি শুয়ে পড়ুন গো! যান। চুনি...চুনি...ঠিক আছে।' সে সিদ্ধান্ত অস্পষ্ট রাখতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ ছোটন যা বলবে, তাই হবে। পান্নার পতনে এখন ডাঙ্গাপাড়ার জানমারিদের চূড়ান্ত আশ্রয় ওই ছোটন।...

চাঁদটি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, প্যাঁচাটি আবার মন্দিরের পেছনে শিরিষগাছে ফিরে এসেছে, মহাসড়কে মাঝে মাঝে দূরপাল্লার ট্রাকের মাটিকাঁপানো শব্দ, আলোর ঝলক, এবং সেই ঝলকানিতে দুধারে ইতস্তত রাষ্ট্রীয় পেশীগুলিন দলা-দলা ফুলে আছে দৃষ্টিগোচর হয়। নাটশালায় কুঁকড়ে পড়ে থাকা একটি সাধুবৎ ও কৃশকায় মানবশরীরেও সেই ঝলকানি এসে পড়ে। বড় বিস্ময়কর ঘটনা, বহু বছর পরে সোনারু ঘুমায়।

একটি রাত ফুরিয়ে গেল ভেবে ঘুমঘুম স্বরে পাখিগুলিন মাঝে মাঝে ডেকে উঠছিল। আর সোনারু দেখছিল বিশাল অথৈ বিলের ধারে একটি কালো নৌকো বাঁধা। কার নৌকো, কে এই নৌকো রেখে কোথায় গেল, ভাবতে ভাবতে নৌকোয় উঠে বসতেই নৌকো, সেই কালো নৌকো তরতরিয়ে ছুটেছে, সোনারু ভয় পেয়ে গোঙাচ্ছিল এবং তারপর ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

তারপরেই হুড়মুড় করে সে উঠে বসল। কালো নৌকোটি কোথায় গেল? এটা মন্দিরতলা, মসৃণ মেঝে, শেষরাতে ঠাণ্ডাহিম। সে মেঝেয় হাত বোলাতে থাকল। নৌকো, না মন্দিরতলা, বাস্তবতা পরীক্ষা করছিল। একটু পরে ভীষণ চমকে ওঠে সে। স্বপ্ন দেখছিল! তাহলে এতকাল পরে তার চোখে ঘুম এসেছিল। বিমূঢ় চোইতপাগল বুঝতে পাবে না খুশি হবে, না দুঃখিত। সে শবাসনের ভঙ্গিতে বসে কালো নৌকোটির কথা স্মরণ করে। এবার দুঃখ হয়। বিড়বিড় করে বলে ওঠে, লিয়ে গেলে না হে, যেলে চলেঞ, গেলে...বড় পাষাণ তুমি হে!'...

ছয়

গৌরবে 'ফরেং জিনিস বড়ই দড়' বলা হয় ডাঙ্গাপাড়া মসজিদের জাপানি ঘড়িটিকে। ভোর চারটেয় তারই ইশারায় মৌলবি আলিমুদ্দিন আজান দিলেন। তখনও পশ্চিমে চাঁদ ঝুলন্ত এবং কাঁসার তৈজসে প্রচণ্ড ছাই-ঘষলে যেমন ঝকমকে হয়, সে রকম। অথচ কুয়াশা ও অদ্ভুত আঁধার ছড়িয়ে ছিল পৃথিবীতে। চারটি মাইকে নিনাদিত সেই আজান পঢ়নবাজ মেয়েটিকে রোজই জাগিয়ে দেয়, আজও জাগাল। কিছুক্ষণ সে আজান শুনছিল। মৌলবির কণ্ঠস্বর চিড় খাওয়া, ছ্যাৎরানো। আজ ভোরে তার

সঙ্গে গত রাতের 'দেল ফেটে যায়' ক্রন্দনেরও রেশ ছিল। ঘরের বাইরে যে-সব শব্দ আলতো কানে আসছিল ফুলকুঁড়ির, সে বুঝল, তার নির্দল বাবা ও ছোটচাচা বরাবর আপৎকালের মতই ঈশ্বরমুখী, নতুবা তারা তেমন কিছু ধর্মপ্রাণ নয়। চাপাস্বরে কথা বলতে বলতে তারা চলে গেল। অন্তত এক মিনিট পরে দূরে নামুপাড়ার মসজিদের মাইকে মৌলবি নাসিরুদ্দিনের আজান ধ্বনিত হল। ফুলকুঁড়ির কাছে দ্বিতীয় আজানটি সুললিত সঙ্গীত, একটি আরব্য রজনী ভোর হওয়ার যথার্থ সংকেত, ফলে সে ডাঙ্গাপাড়াবাসিনী সত্ত্বেও বেরিয়ে গিয়ে খিড়কির বাইরে পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে এটি উপভোগ করে, গোপনে। এই সময়ে সে কিছুক্ষণ চারপাশে আকাশই দ্যাখে, সে পরী হয়ে যায়, জানমারিক্লিষ্ট মাটির ওপর থেকে দূর অমর্ত্যে চলে যায় এবং ততক্ষণে তার পাঠ্য বইগুলিনের পাতায় হরফগুলিন সুদর্শন পাঠযোগ্যতা ফিরে পায়। সে বড় পড়নবাজ মেয়ে, ফার্স্ট হয়, প্রকৃতই প্রতিভা। সেই প্রতিভার পিছুটানে খুব শিগগির পরীটি মর্ত্যে ফিরে ছাত্রী হতে বাধ্য। কিন্তু আজ ভোরে দু-দিকের দুটি আজানই তাকে পর পর চমকে দিল। বড়দাদি 'মাকুচালাচালি' করা কাজিরুন বিবির কথা ছিপটিপড়া সপাং শব্দে মাথার ভেতর এসে ঘা মারছিল।

বন্ধ ঘরের ভেতর তখনও আঁধার। উঁচুতে ঘুলঘুলির সাদা চৌকাটুকু মশারির ভেতর থেকে বেশি সাদা হয়ে চোখে পড়তেই সে বালিশের তলা থেকে আংটাপরানো ছুড়ানটি বের করল। খুব দেরি হয়ে গেল কি? সে সাবধানে বেরিয়ে আস্তে দরজা খুলল। চওড়া দাওয়ার ঘুপটি কোণটিতে মশারির ভেতর তার মা এখনও গাঢ় ঘুমে মগ্ন, কারণ আতঙ্কে রাত জাগতে হয়েছিল, জানমারির রাত এ রকমই হয়। পা টিপে টিপে চারদিক দেখে নিয়ে ফুলকুঁড়ি তার বড় চাচির ভিটেয় গেল এবং দ্রুত কুঁড়েঘরটির বাঁশপাতায় তৈরি দরজার তালা খুলে দিল।

সে কোনও কথা বলার সুযোগই পেল না, কাজিরুন তৈরিই ছিল, ঘুণধরা কপাটটি ফাঁক করে বেরিয়ে এল এবং বগলে একটি পুঁটুলি ছিল। দরমা খুললে ধাড়ি মুর্গিও কঁক কঁক শব্দ করে বেরোয়, কাজিরুন অদ্ভুত চুপচাপ। তাকে ঝড়খাওয়া শকুন দেখাচ্ছিল। ছোঁ মেরে ফুলকুঁড়ির হাত থেকে ছুড়ানটি কেড়ে নিয়ে তালা আঁটল এবং ভাঙ্গা ডানা ঝাপটে হাঁটার ভঙ্গিতে বাড়ির পেছনকার আদাড়ে ঢুকে নিখোঁজ হয়ে গেল। ফুলকুঁড়ি হতভম্ব, পরে দুঃখিত হল। এটি একটি অস্বীকার। একটি অকৃতজ্ঞতা। গত রাতে প্রাইভেট পড়ে এসে সে বড়চাচিকে তাদের ঘরে জড়সড় কাতর বসে থাকতে দেখেছিল। তার নির্দল বাবার মুখে হিংস্র স্তব্ধতা ছিল এবং তার শান্ত স্বভাবী মাও বার বার বলেছিল, 'উঠ...যাও...আমরা শুবো এখুন', শেষে 'মাকুচালাচালি ছাড়ো' এই পরামর্শ দিয়েছিল। ফুলকুঁড়ির মনে হয়েছিল মাকুচালানি বড়চাচি এবার কোনও কারণে প্রচণ্ড বিপন্ন। ওই সময় তার মনে বড়চাচির প্রতি মমতার কারণ, বহু-বহুবার কাজিরুন তাকে বই-খাতা কিনতে কিছু টাকা-পয়সা দিয়েছে, এই সেদিনও ডটপেনের রিফিল কেনার জন্য পয়সা চাইতেই দিয়ে দিল এবং আশ্চর্য, কোনও কোনও সময় তার লেখাপড়ার বিরুদ্ধে বাঁকা ও বিষাক্ত একটি-দুটি কথা ছুড়ে মারলেও কাজিরুন দয়াবতী হয়, আদর করে বলেও বটে, 'খালি পড়...পড়ে যা...ভাতারের ঘর করিস না, ছান্তি নাই,' এইসব সুপরামর্শ। বড়চাচি বিপন্ন এবং সে থল টুঁড়ে বেড়াচ্ছে, বুঝতে পেরেই ফুলকুঁড়ি সোনারুর পিঠে চেপে চুনিরও থল টুঁড়ে বেড়ানোর বৃত্তান্তটি পুঙ্খানুপুঙ্খ শুনিয়েছিল। তারপর কাজিরুন ফুঁপিয়ে উঠে বলে, 'মরি তো ঘরেই মরি...ও ফুলকুঁড়ি, তু আমার কপাটে তালা এঁটে দে। কেহু এলে বুলিস, চাচি ছিরুটি চলেঞ যেল...ক্যানে যেল, সেই জানে...বুলিস। আর বিটি, ভোরে আজান হলে দরজা খুলেঞ দিস...এই লে ছুড়ান।' সে চাবিটি ফুলকুঁড়ির হাতে দেয় এবং টানতে টানতে দেওরঝিকে তার ঘরে নিয়ে আসে। তখন ফুলকুঁড়ি বুঝেছিল, তার চাচি মাকুচালানি, বুদ্ধি অতি খর। আত্মরক্ষার এই তো প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এখন ভোরে এভাবে কাজিরুনের চলে যাওয়া ফুলকুঁড়ি টের পেল, অভিমানে তার কান্না আসছে। তারও মনে পড়ে গেল, রাতে তার বাবা ও মা চাপাস্বরে বলাবলি করছিল, 'মাগির ঘরের চালে ডাকারা ঠিকই আগুন দিবে,...পুড়ে ইঁদুরপুড়া হবে...।'

এই বিভীষিকার সম্ভাবনা শুনে, সে ঠিক করেছিল, ঘরের চালে আগুন দিলে যা থাকে কপালে, সে

দরজার তালা খুলে দেবেই, চাবি তার কাছে। এই চাবিটি কাজিরুনের জন্য একটি উদ্ধার, অন্তত একটি আশ্বাসও ছিল। অথচ কখন চোখে ঘুম এসে গেল! আগুনের সম্ভাবনা এবং নির্বোধ ঘুম এ দুটি জিনিস তাকে কষ্ট দিচ্ছিল। ফুলকুঁড়ি পুকুরঘাটে গিয়ে নিমডাল ভাঙতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। পাঠ্যপুস্তকে মুদ্রিত বাস্তবতা সাংঘাতিক প্রকৃত বাস্তবতার তলায় আজ ভোরে চাপা পড়েছে এবং কাজিরুনের ছাগলটির মতই হরফগুলিন ছ্যারাভ্যারা। এই প্রথম সে জানল, মুদ্রিত হরফের পৃথিবীর সঙ্গে প্রকৃত পৃথিবী একেবারেই যোগসূত্রহীন।...

তখন কাজিরুন কুয়াশা ও আবছা আঁধারে কুঁজো হয়ে হাঁটছিল। ধানের মাঠে চবচবে শিশির। স্টেশন রোডে গিয়ে পৌঁছলে সে কিছু নিশ্চিন্ত হবে। দুধারে ঝাঁপাল আকাশমণির জঙ্গল সেখানে। মানুষজন দেখলেই লুকিয়ে পড়ার জন্য সেই ঝাঁপাল জঙ্গল সরকারি করুণা, সরকার বড় মেহেরবান। আর খুদা কানা বটে, খুদাও মেহেরবান বলে কী বাঁচা বাঁচিয়ে দিলেন এক দুখিনী বেওয়া মেয়েকে। গত রাতে বাঁশবাতার কপাটের ফাঁকে চোখ রেখে সে সকলই দেখেছে ও শুনেছে। আতঙ্কে ঠাণ্ডা হিম হয়ে সারা রাত বসে থেকেছে, ওইভাবে, কপাটের ফাঁকে চোখ। শুধু এটাই ভেবে পাচ্ছিল না সোনারু খ্যাপা কেন এল? পরে মনে হয়েছিল, নাকি সকলই ওই সেয়ানা খ্যাপার চক্রান্ত, জানমারিদের সেই ডেকে এনেছিল! আর এইভাবে ক্রমে মনে পড়ে কাজিয়াগুলিন, মৈথুন মুদ্রাগুলিন, ছাগলের খুঁটি ওপড়ানোগুলিন। ক্রমে কাজিরুন চক্রান্তটি পরিষ্কার আবিষ্কার করে এবং চাপা গরম গরম শ্বাস ছাড়ে। সাপিনীর ফোঁসানি ছিল, চক্কর ছিল তার নিরুপায় জিঘাংসায়। সহসা আবিষ্কৃত হয়, তার দুরমুষটির শক্তিমত্তার প্রসিদ্ধি আছে, অথচ কীভাবে ছাগল খুঁটি ওপড়াতে পারে এবং নিজামের বাঁশবনে গিয়ে বোমার মুখে পড়ে! হুঁ, ওই খ্যাপা হারামির কাজ। কাজিরুন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। গুলি গুলি ক্রূর চোখে তাকাল আবিষ্কারটির দিকে। খ্যাপা সেজে থাকা লোকটার অভিসন্ধিপূর্ণ ধূর্ততা অবশেষে সমস্ত ঘৃণ্য মৈথুন মুদ্রার মধ্যে দৃশ্যমান হতে থাকে।

নোম্যানসল্যান্ড থেকে নেমে আসা নালাটি ইরিগেশন সেন্টারের কাছে একটি স্লুইসগেটে বাধা পেয়েছে। স্টেশন রোডে পৌঁছুতে হলে ওই স্লুইসগেটের ছোট্ট ব্রিজটি তাকে পেরুতে হবে এবং ভানুর কথা স্মরণ হল। ওইটি একলা একটি ছোট্ট একতলা সরকারি বাড়ি। ওখানে ভানু থাকে। ফোঁস করে গরম শ্বাস ছেড়ে নাক মুছল কাজিরুন। ...'অ বাপ, পান্না, তোর মরণ চাহেঞনি ই কাজিরুন...' সে পান্নার আত্মাকে লক্ষ্য করে বিলাপটি শোনাল। আসলে তার রাগ হয়েছিল লেংড়িভেংড়িটারই ওপর, তাকে দেখেও না দেখার ভঙ্গিতে চলে গেল, 'অ বাপ পান্না, বুঝদার হ', সে বিলাপটি মাঠের শিশিরে কুয়াশায় ও নরম আলোর মধ্যে প্রসারিত করছিল, 'আমি বুঝিনি...ভাবিনি...আমি তোর জানমারি চাহিঞনি'...কাজিরুন কৈফিয়ত হেতু নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল। তার আরও টাকা থাকলে হাজি সইদুরের দশ টাকার নোটটি ছিঁড়ে ফেলে দিত, এমনই ধিক্কার মনে। ছাগলটির ক্ষতিপূরণ তো দিলই না, খালি বলে, 'হাওয়ায় গন্ধ পাই রি কাজিরুন, তোকে সন্দ হবে...তু পালাঃ!' হাজির জানমারি দলটি তাকে ঠেলতে ঠেলতে সীমান্ত পার করে দিয়েছিল। তখন কপালে চটাস চটাস থাপ্পড় মেরে গোপনে নির্জনে এমনি কেঁদেকেটে বাড়ি ফেরে ডাব্বল এজেন্ট। প্রাক্তন শেয়ালগুলিনের চাতুর্যে সে সাবধানে ভিটেয় ঢুকেছিল। পারিপার্শ্বিকে গুল্মআদাড় এবং জ্যোৎস্নারাতের ভুতুড়ে আঁধারগুলিনও তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। আর তার সাড়া পেয়েই ফুলকুঁড়ির মা বিপজ্জনক এই উক্তি করে, 'ভাকারা টুঁড়ছে, নামুপাড়ায় খবর হয় কী করে...চুনির উ কাজের খবর নামুপাড়ায় কে পাঠায়!' শুনেই পুরনো কাজিয়া ভুলে কাজিরুন তার মেজজা-এর ঘরে ঢুকে যায়, এটি একটি ব্যর্থ আত্মসমর্পণ ছিল।

ব্যথিত, আত্মধিক্কারে ক্লিষ্ট ডাবল এজেন্টের চোখে পুবের মাঠের কুয়াশা ও আবহাওয়া চোইত-পাগলার আধন্যাংটো কুৎসিত মূর্তি, নিতান্তই প্রাতিভাসিক, তিড়িংবিড়িং নাচছিল এবং সে দেখতে পাচ্ছিল বীভৎস মিথুনমুদ্রাগুলিন, এবং উত্তরোত্তর তার চাপা, অনুতপ্ত ক্রন্দন শুকিয়ে যেতে পুনঃ পুনঃ নাক ঝাড়াব ফোঁসফোঁসানিগুলিন আলকেউটের গর্জন হয়ে গেল। সে ইরিগেশন সেন্টারের দিকে মরিয়া হাঁটতে থাকল।

ঢালু হয়ে নেমে দূরের ছোট নদীটির অববাহিকায় সমতল নাবালে মিশেছে এই সুবিশাল শস্যক্ষেত্র, এর প্রতিটি ইঞ্চি কাজিরুনের চেনা। এমন কী, কোন ক্ষেতটি কার তাও সে জানে, কারণ সে মাঠচরানি এবং গ্রামের ঘটনাহীন, নিরুত্তাপ অবরেসবরে এই মাঠ ও শস্যক্ষেত্র তাকে খাদ্যদ্রব্য উপহার দেয়। কখনও মাছ, ছালিঞ্চে শাক, ধানের শিষ, গমের শিষ, বিবিধ শস্যের উচ্ছিষ্ট অংশ। কদিন আগেই সে দুপুরে ধানক্ষেতে মাছের খোঁজে বেরিয়ে ইরিগেশন সেন্টারে ভানুর সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলেছিল, ‘হাজির ব্যাটা...হারুন, বাপ! বড়ই বেড়েছে। উয়াকে তুরা ফিনিস কর।’ ভানুর শীতলতা লক্ষ্য করে পুনঃ বলেছিল, ‘উ রোজ রেতে আজবাড়ি যায়...হল্লা বাউরির বাড়ির কাছে ডাঁড়িয়ে থাকিস, ছামুতে পাবি। আর বাপ ভানু, হল্লাকে তুরা চিনিস না...হল্লা’, তাকে এখানেই থামতে হয়, কারণ অদূরে ধানক্ষেতের আলে একটি নেড়ে কুকুর দেখেছিল। সে জানে, কোনও-কোন কুকুর কাঁকড়া ও মাছ খায় এবং কোনও শুকিয়ে যাওয়া ধানক্ষেতের গভীরে খানিকটা নিচু অংশে জল জমলে মাছগুলিন সেখানে জড় হয়, ছলবল করে নড়ে, সেই শব্দ কুকুরের কানে যায়। মাঠকুড়োনিরা এই কুকুরকে অনুসরণ করলে মাছগুলিনের গোপন ডেরার খোঁজ পাবেই। ফলে কাজিরুন নেড়িটিকে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু নেড়িটি এতে বিরক্ত, খুব দাঁত খিঁচিয়েছিল, শেষে ধূর্ত প্রাণীটি এমন গাঢাকা দেয় কাজিরুন পরাস্ত এবং তার কয়েকপুরুষের উদ্দেশে খুব খিস্তি করে হতাশায় মাঠপরিক্রমা করতে থাকে। ভানুর নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট আল্লারাখা বলেছিল, ‘ভানুদা, মেয়েটা কে গো?’ সে হেসে অস্থির। কুকুরের সঙ্গে কাজিয়া করতে কোনও মেয়েকে সে দেখেনি। সে নতুন রিক্রুট। অঞ্চল পঞ্চায়েতের হেড মনিরুজ্জমানের কী সম্পর্কের ভাগ্নে, দক্ষিণডিহিতে নিতান্ত আউটসাইডার এবং সবকিছুতে বিস্ময় প্রকাশ করে। ভানু বলে, ‘কাজিরুন গাছপালার সঙ্গেও ঝগড়া করে।’ আল্লারাখা হাসতে হাসতে কুঁজো হয়ে যায়। তখন ভানু বলে, ‘হেসো না। টের পেলে নিত্যি এসে তোমার শ্রাদ্ধ করে যাবে।’ কাজিরুন কোথায় এসে দাঁড়িয়ে শ্রাদ্ধগুলিন করবে, ভানু আঙুল তুলে সেই জায়গাটি দেখিয়েছিল। সেটি নিরাপদ দূরত্বে, কাঁটাগুল্মে ঢাকা পুকুরপাড়, যে-পুকুরে চুনি বোমাগুলিন ফেলেছে।...

গতরাতে ভানু আসেনি। সব রাতে সে আসে না। তবে আল্লারাখার ভূতপ্রেতে বিশ্বাস নেই, অশরীরিদের ব্যাপারে সে প্রচণ্ড সাহসী। শুধু একটাই ভয়, সে মনিমিয়ার আত্মীয়। দক্ষিণডিহিতে যা দলাদলি এবং খুনোখুনি, এদিকে আঞ্চলিক ‘জানমারি’ টার্মটিও তার জানা হয়ে গেছে, তার এই ভয়টাই ক্রমে চেপে বসেছে মনে, বিশুদ্ধ মৃত্যুভয়। আগের অ্যাসিস্ট্যান্টটি সিংহবাবুদের কোন সমর্থকদের ছেলে বলেই নাকি বদলি হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ভানু কী, সে তা জানতে পেরেছে, ছোটনবাবুর কথাও জেনে গেছে, ফলে প্রবল আশা করে যে, সে বে-দলের বধ্য হবে না। এমন কী, এও কল্পনা করে সাহস পায় যে, তার গায়ে হাত পড়লে দক্ষিণডিহি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তার শরীরটি শীর্ণ, কিন্তু বেশ লাবণ্যময়, হায়ারসেকেন্ডারি সার্টিফিকেটে বয়স প্রায় একুশ বছর, সুন্দর গান গাইতে পারে এবং স্কুল বা ক্লাবগুলিনের ফাংশনে আমন্ত্রিত হয়, এইভাবে কিঞ্চিৎ জনপ্রিয়তা জমে উঠেছে, সেও তার সাহসের দ্বিতীয় কারণ। সে অন্যমনস্কভাবে (যে-সব রাতে সে একা), তাকে কেন খুন করা হবে? সে এমনও কল্পনা করে, নিশুতি রাতে জানমারিদের আভাস পেলেই হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইতে শুরু করবে। একলা মাঠে এই নির্জন ও সরকারি জীবনযাপনে গানই তাকে সবরকম কষ্ট থেকে আড়ালে রেখেছে।

কিন্তু পান্নার জানমারি এবং হাঙ্গামার পর গত রাতে সে ভানুকে খুবই আশা করেছিল। খালি মনে হচ্ছিল, হয়ত গান-টানও পৃথিবীর এইসব অংশে নিরর্থ পাষাণখণ্ড হয়ে পড়ে, জানমারিকালে মানুষের ভাল জিনিসগুলিন অপ্রয়োজনীয় পদার্থে পরিণত হয়, বড় দুঃসময়। কাল রাতে সে হারমোনিয়ামটি খোলেনি। জ্যোৎস্না ছিল, দরজা বন্ধ করে জানালা দিয়ে সে খালি জানমারিদের ছায়ামূর্তির বিভ্রম দেখছিল। রাত বারটা বাজলেও ভানু এল না, তখন বুঝল ভানু আসবে না, এলেও সশস্ত্র এবং কয়েকজন বডিগার্ড নিয়ে আসত। ভানুর ড্যাগার, চীনা খুদে পিস্তল, এসবই সে দেখেছে, আর ভানুর কাছেই ছোটনবাবুর স্টেনগানটির কথা সে শুনছিল, বর্ডার এলাকা থেকে চৌদ্দহাজার টাকায় নাকি সংগৃহীত। স্টেনগানটি তার দেখতে ইচ্ছে করে। টুকরো-টুকরো ঘুম, স্বপ্ন, ঘুম-ভাব এসবের ভেতর

স্টেনগানটি কখনও প্রকৃত, বহুরূপী, তাহলেও শক্তির আস্বাদ পাচ্ছিল এবং এমন একটি রাত কাটিয়ে ভোরের জৈবিকধরনের গাঢ় ও অসহায় ঘুম ভাঙতে আল্লারাখার দেরি হত। ভোর ছটায় উঠে গলা সাধার ইচ্ছেও ছিল না। কিন্তু বাইরে চেরা গলায় 'ভানু,...বাপ ভানু রে' আর্তরবে তাকে উঠতে হল। মশারি থেকে বেরিয়ে সে জানলায় উঁকি দিল এবং কাজিরুন বিবিকে দেখে ভড়কে গেল।

ডিপটিউকলের ইঞ্জিন কবে একবার চুরি যায়, ফলে চৌহদ্দি কাঁটাতারের বেড়ায় সুরক্ষিত এবং চত্বরে আল্লারাখা শিল্পীস্বভাববশে খুদে একটুকরো ফুলবাগিচা গড়েছে। সেই সৌন্দর্যখণ্ডের ওধারে মূর্তিমতী কাজিয়াটিকে দেখে তার খারাপ লাগছিল। 'ভানুদা নাই...আসেনি কাল থেকে' বলে সে মশারিতে ঢুকতে ঘুরেছিল। কিন্তু কাজিরুনের কণ্ঠস্বরে আর্তনাদ তাকে চমকে দিল। সে অবাক হয়েছিল, কুঁদুলি প্রৌঢ়া তার নাম ধরে বলছে, 'আল্লার কিরে লাগে, একবার খবর দ্যাও ভানুকে।' লোহার গরাদ আঁকড়ে গেটের সামনে বসে পড়ল কাজিরুন। সে আল্লার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক স্থাপন করছে, 'ও বাপ আল্লারাখা, আল্লা তোকে রাখেঞে, বাপ...কিরে লাগে, একটুকুন খবর দে ভানুকে!' সে কপালে চটাস শব্দে থাপ্পড় মারল। আলুথালু চুল, লুটুন খসে পড়েছিল, বাঁধতে বাঁধতে 'কিরে লাগে আল্লার' বলতে লাগল ভাঙা, চেরা ও রুক্ষ কণ্ঠস্বরে।

আল্লারাখা শিল্পীস্বভাববশে কিংবা মানসিক কোমলতার কারণে নয়, ঘটনাটিতে কিছু চমক ছিল জানমারি-পরিপ্রেক্ষিতে এবং সে এই প্রত্যুষে কাজিরুনের কাজিয়ার ভয়েও অগত্যা বেরুল। দরজায় তালা আঁটল এবং গরাদওলা গেটের তালা খুলে কাজিরুনের উদ্দেশে আস্তে বলল, 'বারান্দায় গিয়ে বস, চাচি'। চাচিসম্ভাষণেও তার আত্মরক্ষার প্রবণতা ছিল। কাজিরুন ভেতরে ঢুকে বারান্দায় বসলে সে গেটের তালাটি এঁটে দেবে কি না, দোনামনায় পড়ে গেল। ফের কাজিয়ার ভয় তাকে তালাটি আঁটতে দিল না। গেট ভেজিয়ে রেখে সে ডানদিকে নালার স্লুইস গেটের ছোট্ট সাঁকোটি পেরুল। নালার পাড় ধরে যেতে যেতে মাঝে মাঝে ঘুরে সে কাজিরুনকে লক্ষ্য করছিল। ভোরের আলোয় অস্পষ্ট একটা পিণ্ড, খুব ঝড়খাওয়া শকুন দেখাচ্ছিল তারও চোখে, যেমনটি ফুলকুঁড়ি দেখেছিল।...

ঘর পড়েঞে কী বিরিঞ্চি পড়েঞে, সে-পড়া লয়...' ভূতগ্রস্ত এবং দূরের মানুষের কণ্ঠস্বরে এই দার্শনিকতা ঘোষণা করছিল সে, যদিও খুব সুস্থ দেখাচ্ছিল তাকে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও আনুপাতিক স্বাভাবিকতা ছিল। 'ঠাকরানদিদি, ইটো মানুষপড়া গো...' ভাঙা নোনাধরা পুরনো পাঁচিলের গা ঘেঁষে আগাছার জঙ্গল উপড়ে ফেলতে ফেলতে শ্বাসক্লিষ্ট উচ্চারণে সে, মুনিশখাটা চোইত-পাগল, দুঃখিত ভঙ্গিতে ঘুরল বৃদ্ধার দিকে এবং বৃদ্ধা, কানিঠাকুরন, কারণ তিনি একচক্ষু, তাঁর ছেলে দূরের থানার এক কনস্টেবল, সুন্দর হাসছিলেন খ্যাপা মানুষের কাজগুলিন দেখে, 'ঠিক বলেছিস' সায় দিলেন। সায় পেতে হাতিশুঁড়ো, কুকুরশুঁকো গন্ধ-গুল্মগুলিন উপরে চোইত-পাগল অন্যমনস্ক পুনঃ বলল, 'মানুষপড়া...পেচণ্ড আওয়াজ হয়।' সে আগাছার দিকে তাকাল। 'মানুষ পড়লেঞে দুনিয়া টলে...কাঁপেঞে গো। তবে ইটোও কথা, কি, দুনিয়া টললেও মানুষ পড়েঞে।'

কানিঠাকুরন হাতের নড়ির ডগা দিয়ে মুথো ঘাসগুলিন ছুঁলেন, 'এগুলিন, মানিক।' মানিকসম্ভাষণে গ্রামীণ ঐতিহ্যের বাৎসল্য ছিল। ব্যাখ্যা করলেন, 'সাপখোপের আদাড় রে...গায়ে বল ছিল, তখন নিজেই সব করিছি...পারি না।' কোনার দিকে প্রাচীন ইঁদারাটি বেড় দিয়েছে মুথাঘাস, ইঁদারাটি পোড়ো, কনস্টেবল ছেলে টিউবেল দিয়েছে অদূরে, বিধ্বস্ত গৃহস্থালিতে অতীত লাবণ্যের কিঞ্চিৎ ছাপ পড়েছে। সোনারু ছোট্ট শ্বাস ফেলে মুথাঘাসে হাত দিলে ঠাকুরান দৈববাণী ভঙ্গিতে বললেন, 'হাঁটুর ঘর, হাঁটুর সংসার। বউমা এলে বুঝে নেবে, তখন আমার ছুটি!' ছুটির কথায় মুক্তি কিংবা মোক্ষ-ভাব ছিল এবং তিনি দিনের প্রথম রোদের দিকে মুখ তুলেছিলেন, যে-রোদ এখন গাছের ডগায়, উঠোনজুড়ে উজ্জ্বল ধূসরতা। আজকাল মুনিশ খাটাদের ঈষৎ অহঙ্কার, এত সকালে আসে না, নিজে থেকে তো আসেই না, ডেকে আনতে হয়। এ খ্যাপা সাত-সকালে নিজেই এসেছে, ফলে তিনি আহ্লাদী। পুনঃ পুনঃ পিঠের কাছে দাঁড়াচ্ছিলেন। একচোখে নিবিড় লক্ষ্য করছিলেন, এই মুনিশ নিষ্ঠাবান। মাঝে মাঝে সে আগাছার

ভেতর থেকে কেন্নো উদ্ধার করছিল, তখনই গা ছমছম করা ঘেন্নায় একটু সরে যাচ্ছিলেন এবং সে নির্ভয় হাতে গুটিয়ে যাওয়া কেন্নোটিকে খিড়কির বাইরে ছুঁড়ে ফেলছিল। একটি কুনোব্যাঙকে ভর্ৎসনা ও স্নেহে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে নর্দমার ঘুলঘুলি পার করে দিল। ঠাকরান বললেন, 'সাপের কী দোষ?'

সোনারু গত রাতের কঁক, কঁক আর্তনাদটি স্মরণ করে ব্যথিত বলল 'বড়ই বুকা গো ঠাকরানদিদি...ব্যাংগুলিন! দুনিয়া এক জানমারির ঠাঁই। পান্না. .' তাকে থামিয়ে দিলেন কানিঠাকুরন, এখন পান্না নামটিই সারা দক্ষিণডিহিতে সন্ত্রাস। বললেন, 'ঘাস পোস্কের করে চা খেয়ে আয়, পয়সা দিচ্ছি। এসে ইটগুলিন সরাবি।' খ্যাপা মুনিশটির সবই ভাল খালি পান্না-পান্না করছে। উঠোনের মাঝখানে বসে আঁচলের গিঁট থেকে পয়সা খুলতে থাকলেন। পেছনে সুপ্রাচীন একতলা দু'ঘর ইটের দালান, ক্ষয়াটে, কার্নিশে অশত্থ। বাবুপাড়ার এদিকটায় ক্রমাগত এমনি প্রাচীনতা, ধ্বংসস্তূপ, শিবমন্দিরগুলিন, বিদ্যুতের লাইন পৌঁছয়নি এবং পেছনে দীঘির পাড়ে নিম্নবর্ণীয় মানুষজনের ঘন বসতি, রোজ রাতে চোরের পায়ের শব্দ কিংবা অন্য কিছু, কানিঠাকরান একটুতেই 'কে, কে' চ্যাঁচান। পাশের বাড়ির মুখুজ্যে মশাই জোরাল শব্দে কাশেন, সেটি একটি সাড়া, যার সংস্কৃত রূপ, 'মাভৈঃ!' সেই মুখুজ্যে এখন প্রাতঃভ্রমণে বাজারে গেছেন। চা খেয়ে আড্ডা দিয়ে ফিরে একবার খোঁজ নিতে আসবেন। 'ঢং!' নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনাটি মনে পড়ায় ঠাকরান অন্যমনস্ক বললেন।

'ঢং লয়, ঠাকরানদিদি!' সোনারু ঘুরল, সে ভুল বুঝেছিল। 'মানুষপড়া গো!' বলে সে পুঁথি খোলার ভঙ্গি করল। 'আমাদের শাস্তরে আছে, বাবা আদম গন্দম বিরিক্ষির ফল খেলেএ্, দেখলেএ্ কী, আমি ন্যাংটা! ...তখন খুদা তাকে ডাকে, সে শরমে ঝোড়ে লুকায়...তা' পরে ফেরেশতারা, ঠাকরানদিদি, তাকে ধাক্কা মেরেএ্ ফেলেএ্ দিলে...তো সে পড়ে...পড়ে ..পড়ছে...পড়ছে...আসমান কাঁপে গো।' একটি আধুলি সামনে পড়লে সে সসম্ভ্রমে নিয়ে কপালে ঠেকাল এবং মধুর হাসল সরু সরু দাঁতে। তার চুড়ো করে বাঁধা চুলে দু-তিনটে শিউলি ফুল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মানুষপড়া! ...তবে পান্নাপড়া বেরৎ পড়া, দিদি...চা পাই কী না পাই...ধুওয়া দেখি নাই আজ...ঝাঁপ বন্দ। আর দিদি, যেতদিকে তাকাই, পাল্লার লোছ...' সে ফিস ফিস করল এবার, 'পাট্টির বাবুরা গো, বাবুরা আর মিঁয়ারা.. ইদিকে ছোটনবাবুর জানমারিরা...পেলয়কাণ্ড...পুলিশ...আমি তো খ্যাপা, খ্যাপা মুনিশখাটা...যাই, দেখি।' সে কষ্টকর পা ফেলে বেরিয়ে গেল।

একটু আগে মুখুজ্যে নাতনি রেবা এসেছিল, সবতাতে নাকগলানে মেয়ে, বলেছিল, 'ও ঠাকমা, আজ নাকি রায়ট হবে...বাজারে যেতে বারণ করল বাবা। বডি এলে মিছিল হবে...বলল, গেট করছে, ফ্ল্যাগ...ঠাকমা, আমার খুব ভয় করছে, জান?' জবাবে কানিঠাকরান মুখ খিঁচিয়ে বলেন, 'আদিখ্যেতা!' রাগ করে রেবা চলে গেছে। যাবার সময় সোনারুর দিকে বিষদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। সোনারুর বাবা এ বাড়ির আড়াই বিঘে জমিটুকু ভাগে চষত। সোনারু যদি তাই করত, জমিটুকু কবজায় থাকত। বর্গা আইনে হাতেম নাম রেকর্ড করিয়েছে, হাততোলা দেয়। হাটু পুলিশ, মুখে খুব তম্বি, কিন্তু ছোটনের কাছে কেঁচো হয়ে এসে বলে যায়, 'কী আছে জমিজমায়? মাসে-মাসে নগদ টাকা পাচ্ছ, কী অভাব তোমার? আমরা কি চাষাভুষো?' অবশ্য জমিটা দেবোত্তর ছিল। সেটলমেন্ট রিচেকিংয়ের সময় হাটুর জন্মই হয়নি। তার বাবা নিজের নাম ঢোকান। ধূর্ত মানুষ ছিলেন চারুবাবু, মামলা-মোকদ্দমায় তদ্বিরকারীর পেশা ছিল, মহকুমাশহরে একটি অব্যর্থ স্ট্রোকে দেহত্যাগ করেন। তখন কানিঠাকরানের ভরা যৌবন, প্রতিবেশী মুখুজ্যের খুব ভালবাসতে ইচ্ছে ছিল, পাত্তাই পাননি। কড়া ধাতের মেয়ে, বালিকা বয়সে গুটি বসন্তে একটা চোখ যায়, সম্ভবত এটাই তাঁর শক্তির কারণ। চারুবাবু বিমলাবালার একচক্ষু এবং মুখে গুটি বসন্তের ক্ষতচিহ্ন গ্রাহ্য করেননি তস্য পিতাও না, কারণ এই বাড়িটিতে টাকাকড়ির প্রতি লোলুপতায় কুখ্যাতি ছিল। অথচ টাকাকড়ি জমেনি, সে কি পাপের দরুন? অষ্টশিবের অষ্টমন্দির সাক্ষী, দেবোত্তরে হাত দিলে এমনই হয়, কানিঠাকরানের সিদ্ধান্ত এবং তাই ছেলের পুলিশে চাকরি হলে বলেছিলেন, 'ঘুষ খাবি নে, অন্যায় করবিনে', বিবেকবতী মায়ের কথা শুনে হাটু খুব মাথা নেড়েছিল। এখন কথাটা উঠলে মুচকি মুচকি হাসে। মুক্তির দশকে হাটু পুলিশ হয় এবং কানিঠাকুরান শিবমন্দিরের ভেতর মাথাকোটার ভঙ্গিতে চলাফেরা করতেন। বেঁচে গেছে তাই। জমিয়ে গপ্প করে,

ক'ডজন নকশাল মেরেছিল। এই বীরত্বে মা চমকে উঠে ভাবেন, তাঁর ছেলেও খুনি? বলেছিলেন, 'নর হত্যা পাপ রে', উত্তর পান, 'তাকে আমি না মারলে সে আমাকে মারে, সেটা ভাবছ না, তাছাড়া ডিউটি...অর্ডার! আমি তো সুইচ! টিপলে যা হবার তাই হয়।' হাটু হ্যা হ্যা হেসে বলেছিল, 'আমি বন্দুক...গুলি ভরা। আমি কী করব?' চাকরি ছেড়ে দিতে বলায় তিন মাস আসেনি।

কানিঠাকরান একলা উঠোনে বসে পুরনো কথা ভাবছিলেন। ভাবতে গিয়ে পান্না, তারপর চোইতপাগলের কথাগুলিনে জড়িয়ে গেলেন। সহসা প্রশ্ন জাগল, মানুষ কেন জন্মায়?

চোইতপাগল জাতীয় মহাসড়কের ধারে দাঁড়িয়ে ডাইনে ও বাঁয়ে শ্রেণীবদ্ধ পোস্টার ফেস্টুন, নির্মীয়মান তোরণ এবং থোকবাঁধা লোকগুলিনকে সাবধানে দেখছিল। চিনতে চেষ্টা করছিল এগুলিন জানমারি কি না, তবে সন্দেহযোগ্য। সমস্ত দোকানে ঝাঁপ, চায়ের দোকানেও ঝাঁপ। হেলমেট পরা বন্দুক-মানুষগুলিনের সূত্রে অবশেষে আবিষ্কার করেছিল, শুধু সানুর চা ও সন্দেশের দোকানটি খোলা এবং বন্দুক-মানুষগুলিনের হাতে চায়ের পাত্র। সে চোইতপাগল, প্রকৃত পাগলের ছদ্মভঙ্গিতে রাস্তায় গেল এবং পারিপার্শ্বিকের প্রতিক্রিয়া বুঝতে 'পালারে পালারে পাখি/দ্যাশে এল পাখমারা' গানটি গাইতে গাইতে একটু নাচলও। কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটছিল না। সাহসে সে সানুর দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। পুনঃ দু'হাত তুলে এবং 'মাদুগ্নির চালুর ছামুতে এই লাচন লাচব' ঘোষণা করে নৃত্যরত হল। বন্দুক-মানুষগুলিন শীতল সাপচোখে তাকে দেখছিল, কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে বলল, 'আদাব হুজুর!' হুজুরেরা গণ্য করল না, তখন সে সানুর দিকে আধুলিটি তুলে পাগল হাস্যে বলল, 'একটুকুন চা দে বাপ, প্যাটজ্বলা। একখান বিস্কুট দিবি।' সানু দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'ভাগ্ বে! এক্ষুনি ঝাঁপ ফেলব।' এই সময় উত্তর দিকে স্লোগানের শব্দ, একটি মিছিল আসছিল, অন্য কোনও গ্রাম থেকে। এভাবে ছোট-ছোট মিছিল আসছে ক্রমাগত, দক্ষিণে সেকুলার ক্ষেত্রের সীমান্তে নোম্যানসল্যান্ডের কাছে জড়ো হচ্ছে, নির্মীয়মান তোরণে হাত লাগাচ্ছে। চোইতপাগল হাত জোড় করে 'মাঁটির ভাঁড়ে, বাপ, মাঁটির ভাঁড়ে...প্যাটজ্বলা' বলতে গিয়ে বাইরে চেয়ারে বসা কোনও অচেনা দারোগাবাবুর ধমক খেল, 'অ্যাই ব্যাটা! ভাগ!' হাতে বেটন ছিল, নড়ে উঠতেই সোনারু সভয়ে রাস্তায় সরে গেল। ছোট্ট মিছিলটির সঙ্গে কিছু দূর হাঁটল, চুপি চুপি 'ভালা মজা' বলছিল, মিছিলের ধ্বনি থেকে কিছু বোধগম্য না হওয়ায়। কানিঠাকরানের বাড়ি যেতে যে পিপুলতলায় বাঁদিকে ঘুরতে হবে, সেখানে মিছিলের সঙ্গ ছেড়ে সে ছদ্ম-খ্যাপামিটি ছুড়ে ফেলল। রোষে ভাবছিল, পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছু এবং সানু, সেই দারোগাবাবু, বন্দুকমানুষগুলিনের প্রতি মৈথুনমুদ্রা প্রয়োগ করবে কি না। কিন্তু সাহস পেল না। আকাশের দিকে মুখ তুলে অনুচ্চস্বরে 'দুনিয়াটো বড়ই খ্যাপা হে' ঘোষণা করে গম্ভীর ঘুরল। ঠাকরান বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল সে, আধুলিটি হাতের মুঠোয়। ভাবছিল, জানমারির কালে পয়সাকড়িও এমন পাষাণ পাথর হয়ে পড়ে কখনও দ্যাখেনি। কত জানমারির কাল এসেছে দক্ষিণ ডিহিতে, এমন তো ঘটেনি। পান্নাপড়া আদমপড়া হল কেন, ফেরেশতার ধাক্কা খেয়ে আদম পড়ছে...পড়ছে...আসমান কাঁপছে, দুনিয়া টলছে...চারদিকে আওয়াজ...হুলস্থুলুস, অবশেষে সে করুণ হাসল।

একচক্ষু ঠাকরান ইটের স্তূপের ফাঁকে লিকলিকে লেজের ডগা দেখে নড়িটি খোঁচাচ্ছিলেন। তাঁর সাহস আছে, একদা একটি বিষাক্ত সাপ মেরেছিলেন, তরুণ চন্দ্রবোড়া এবং অষ্টশিবের দেবোত্তর ভিটেয় এটি পাপ গণ্য হয়। সেও কিছু না, তবে তাঁকে আড়ালে 'মা মনসা' বলা হয়, এটি ক্ষোভের কারণ। এই দেবী 'চ্যাংমুড়ি কানি' নামে বেহুলার পালায় চাঁদ সদাগরের হুংকারে সম্ভাষিত যৌথ ঘৃণা, ফলে নিজেকে ভীষণ একলা ভাবেন। স্বামীর লাইনেই মুসলমান লোকসকলের সঙ্গে তাঁর বেশি সংযোগ, সেই সূত্রে সোনারু এভাবে প্রায়ই এসে খবর করে যায়। কখনও উঠোনের একপ্রান্তে বসে কলাপাতায় চকাম চকাম করে ভাত, এঁটো কলাপাতাটি মুড়ে ধ্বংসস্তূপ মন্দিরগুলিন পেরিয়ে দীঘির পাড়ে ফেলে আসে এবং ঠাকরান জল ছড়িয়ে দিলে স্ত্রীলোকের পারিপাট্যে বৃত্তাকারে মাটিটুকু নিকোয়।

'আঞ্জনাই গো দিদি, সাপ লয়' কথায় ঘুরলেন। ভাঙ্গা দাঁতে আধো হাসি হেসে উঠে দাঁড়ালেন। তবে তাই। গিরগিটি জাতীয় সরীসৃপটি আর ফাঁক পাচ্ছে না, লেজটুকু নড়ছে। স্তূপটির শীর্ষে কয়েকটি

কচু ঝাড়, পাতায় পাতায় নিশার শিশির টলটলে। 'যাঃ! পালাঃ!' বলে সোনারু পা দিয়ে কয়েকখানা ইট ও টুকরো ইট সরিয়ে দিল এবং অঞ্জনাটি তিড়বিড়িয়ে পাঁচিলে উঠে ওপারে চলে গেল।

বিমলাবালা বললেন, 'খেলি চা? বাজারে কী দেখলি, বল!' তিনি চোইতপাগলাকে পেলে সদা প্রীত। কিন্তু সে বড় খেয়ালি, একদিন এল তো দশ দিন আর এল না। এমন ইচ্ছে করে, মুসলমান না হলে বাড়িতেই পুষ্যি রাখতেন। কী এমন খায়? দু'মুঠোর পর তৃতীয় মুঠো পড়লে 'মরা প্যাট দিদি...মরে যাব' বলে হাত নাড়ে। ভাবেন, মুসলমান লোকের রূপ ধরে আছে, কোন সাধু কী মহাপুরুষ এবং মনে মনে বলেন, 'দোষ নিও না বাবা...তুমি যদি লীলা কর, আমিও লীলা করি, এইরকম ভেব।' চুপ করে আছে বিমর্ষ, লক্ষ্য করে পুনঃ বললেন, 'কী রে? বোবায় ধরল নাকি? ও সোনারু!'

সোনারু তাঁর পায়ের কাছে আধুলিটি রেখে ইটের স্তূপে হাত লাগিয়ে বলল, 'ঠাকরানদিদি, কাল থেকে সক্কলের ম্যালোয়ারি জ্বর...কাঁপে গো...হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ...' সে জ্বরকম্পটিও শরীরে প্রকাশ করছিল। 'ঝাঁপ বন্দ, চান্দিকে লোহুর রঙ...চোখ জ্বলে যায়' বলে সে সলজ্জ সকরুণ হাসল, 'আপনি দুটি গুড়মুড়ি দিবেন গো...ইটগুলিন আগে পোস্কের করি। দু'খানি ইট হাতে সে সোজা হল, জানতে চাইল 'কতি থুব', যথার্থ মুনিশখাটা কণ্ঠস্বরে।

'রাখ্, রাখ্। আগে দুটো পেটে দে...' কানিঠাকরান আধুলিটি কুড়িয়ে আঁচলস্থ করলেন এবং নড়ি হাতে বারান্দায় উঠলেন। খুব ব্যস্ততা ছিল তাঁর আচরণে, চোইতপাগল চোখের কোনা দিয়ে সন্তোষে সেটি উপভোগ করছিল। ইট দু'খানি রেখে সেও দ্রুত টিউবেলে গেল। ওপরে ঝাঁপালো শিউলি, এত ফুল ছড়িয়ে আছে, এখনও সুগন্ধের ঝাঁঝ, মন ভরে যায়। সে গাছটি ও ফুলগুলিন দেখছিল, নিজের অজ্ঞাতে দৃষ্টি একবার উঁচুতে একবার নিচুতে ওঠে ও নামে, বলছিল, 'ভালা মজা' অভিভূত মৃদু খ্যাপানিতে এবং এই সময় ঠাকরান ডাকলেন, 'ওরে, এইতেই খা...না করবি? ...খারাপ না রে...এনামেল। তোর দাদা এনেছিল, তোলা ছিল।' ঘুরে দেখে সোনারু সরু দাঁতে হাসছিল। এনামেলের পাত্রটির ওপর রোদের ঝিলিমিলি, ক্রমে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর দৈববাণী হল, 'এবার থেকে এতেই খাবি...ধুয়ে ওই তাকে তুলে রাখবি।' তিনি যেটিকে তাক বলে দেখালেন, সেটি দু'দিকে পাঁচিল-ঘেরা বারান্দার চৌকো ঘুলঘুলি। সোনারুর হাতে টিউবেল হর্ষে গর্জাতে থাকল।

খাদ্য দেখে প্যাটজ্বলা ভাবটি দ্বিগুণ। উঠোনের কোণে বসে চোইতপাগল জল ও গুড়মাখা মুড়ি খেতে খেতে সহসা চাপা স্বরে বলে উঠল, 'ঠাকরানদিদি গো, আর কাকে বা কথাটো বুলি,...আপনিই শুনুন।' সে সতর্কতাবশে পেছনে সদর দরজাটি দেখে নিল। 'কাল রেতে ই খ্যাপা তো খ্যাপাই বটে, ঘুড়া হএেছিল...ও দিদি, পংখিরাজ', সে প্রবল আমোদে, অথচ বিষাদও ছিল, বলতে লাগল, 'পান্নার বহিন চুনি...থল পায় না...তার জানমারি হবে...তো ই খ্যাপা...'

চুনির কীর্তি গতকালই প্রতিটি কানে পৌঁছে গেছে এবং মুখুজ্যে মশাই যেচে এসে শুনিয়ে গেছেন। বিমলাবালার মনে কৌতূহল ছিল, একটা মেয়ে নিজের দাদার মৃত্যুর কারণ হয়েছে এ এক অদ্ভুত ঘটনা, তাছাড়া চুনিকে তিনি দেখেছেন, মুখুজ্যে বাড়ির দিকটায় একচোখে লক্ষ্য রেখে অদূরে বসে পড়লেন। মুখে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা অবশ্য, 'কী খালি এক কথা তোর!'

চোইতপাগল খাওয়া থামিয়ে পক্ষিরাজবৃত্তান্ত বলতে লাগল। তার কাছে এটি আত্মরক্ষণ। ইউফ্রেটিশ নদী কারবালা শোকের সমূহ স্রোত, যা রক্ত ও কান্নার মিশ্রণ, বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বিষাদ সিন্দুর দিকে এবং বৃদ্ধা বার বার চুপি চুপি আর্ত শব্দে বলছিলেন, 'তুই সাধুপুরুষ...ও সোনারু, তুই ছাড়া আর একটাও মানুষ দেখি না রে...সব পাঁঠা...মানুষ সেজে আছে যক্ষরক্ষপিশাচ...হাঁটু এলে বলব বেচেখুচে দিয়ে টাউনে চল্।'

আসলে বৃত্তান্তটি সোনারু এমন সুতীক্ষ্ণ করছিল যে, নিরিবিলি ও প্রায়-পোড়ো এই ভিটেয় একচক্ষু একলা এক অসহায় বৃদ্ধাকে, তা তিনি যতই চন্দ্রবোড়া মারুন, ত্রাসের খোঁচায় জর্জরিত করছিল। অথচ তিনি সবটা না শুনে ছাড়বেনও না, সে থামলেই বলছিলেন, 'তারপরে, তারপরে?'...

আল্লারাখা ফিরে গিয়ে বলে, 'ভানুদা আসবে না। তোমাকে যেতে বলল, চাচি। বলল, কিছু কথা থাকলে এসে বলে যাক।' শিল্পী-স্বভাবে কোমলতায় সে এই কথাগুলিন বলে। কিছু অস্বস্তিও ছিল, কেন না কাজিরুনকে এবার শক্ত ও রুক্ষ দেখাচ্ছিল, গুলি গুলি চোখ দুটি লাল।

কাজিরুন আস্তে বলে, 'এল না?' সে ভুরু কুঁচকে নিষ্পলক চোখে দেখছিল গ্রামটিকে। গ্রামটি ততক্ষণে রক্তিম, ক্রমে হলুদ হয়ে আসছিল। আজও আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। কাজিরুন ঠোঁট কামড়ে জরিপ করছিল গ্রামটির আত্মার এদিক থেকে সেদিক, বিব্রত। ছিরুটিতে এক ভাই থাকে বটে, কিন্তু তার বউটি কাজিরুনের চেয়েও কুঁদুলি। ক'মাস আগে দু'দিনের পর তিনদিনের দিন পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে ছিল। ইচ্ছে ছিল, বাপের ভিটেয় কুঁড়ে বানিয়ে বাস করবে। দক্ষিণডিহিতে প্রাণ হাতে করে বাঁচা, পেটের দায়ে মাকুচালাচালি। কাকে বোঝাবে? তাই বলে থাকে কথায় কথায়, 'খুদা কানা গো...কানা কানা কানা।' ক্রমশ উজ্জ্বল হলুদ গ্রামটির দিকে, ডানা ভাঙ্গা শকুন যেমন ওড়ে, উড়ে যায় কাজিরুন। তবে মুসলমান পাড়ায় যেতে বললে সে পারত না, তার গতি ছিল হিন্দু পাড়ার দিকে, যেখানে ভানু থাকে এবং এখনও নিরাপত্তা আশা করা চলে।

ভানুর কাকা প্রভাকরের কামারশালার পাশ দিয়ে যাবার সময় কাজিরুন আড় চোখে দেখে যায়, প্রভাকরের ফ্রকপরা মেয়ে হাপর টানছে, চুল্লীটি এখনও গনগনে হয়নি। সে জানে, ভল্ল হেসো কাটারি বল্লম ওই চুল্লীতে তৈরি হয়। সে এ খবরও রাখে, প্রভাকরও গোপনে তার এক দোসর, ডাবল-এজেন্ট, কারণ তার তৈরি অস্ত্রাদি নামুপাড়াতেও যায়। কিন্তু সে ভানুর কাকা, তার কিছু হবে না। 'খুদা কানা, বড়ই কানা', মনে মনে বলছিল কাজিরুন এবং ভানুদের মাটির বাড়ির সামনে যেতেই ভানুকে দাঁত ব্রাশ করতে দেখল, তারই অপেক্ষা করছিল। ইশারায় বাইরেকার ঘরের দাওয়া দেখিয়ে দিল ভানু। কাজিরুন গুটি গুটি সেখানে বসল।

এদিকটায় পাড়ার শেষ, অদূরে 'রাজ বাড়িটি' দেখা যায়। উঁচু গাছপালার ফাঁকে নতুন মন্দিরটির চূড়া চোখজ্বলা। মুখ ধুয়ে লুঙ্গি গেঞ্জি পরা ভানু বাইরেকার ঘরের দরজা খুলে বলল, 'ভেতরে এস, চাচি!' আহ্বানে আন্তরিকতা ছিল, ডাবল-এজেন্ট মুহূর্তে শক্তিমতী, সে গুঁড়ি মেরে ঘরে ঢুকে মেঝেয় বসল। ভানু তক্তাপোষে বিছানায় বসে চির শীতল মুখে পুনঃ বলল, 'বল!' এই সময় তার বোন গেলাসে চা দিয়ে গেল দাদাকে। 'চা খাবা নাকি চাচি' এই প্রশ্নে কাজিরুন খুব নড়তে লাগল।

'খাব না বাপ। ওরে, চা খাব কী!' সে ফোঁস ফোঁস শব্দে বলতে লাগল, 'মুনে ছান্তি নাই...পান্না আমার বুকের ধোন...ও বাপ ভানু, তু পঢ়নবাজ ছিক্কিত...ভাকারা বোলে, লেংড়ি-ভেংড়ি বোমগুলিন পানিতে ফেললে সে-খবর নামুপাড়া কী করে যায়...আমাকে দুষে!' সে পা ছুঁতে হাত বাড়াল ভানুর এবং ভানু পা'দুটো তুলে নিয়ে বসল। কাজিরুন হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'তার আগে ই কথাটো কেহু টুঁড়ে না, ক্যানে চুনি তার ভাইয়ের বোমগুলি ফেলতে গেল? বোলে কী, হারুন বিহার লোভ দেখালে...' কপালে চটাস করে থাপ্পড় মারল সে, 'আসল দুষীকে কেহু দ্যাখে না, সে খ্যাপা সেজে ঘুরে...রাত দুপহরে ঘুড়া হয়...ও ভানু, ইয়ার জবাব দে। ক্যানে উ খ্যাপা হারামি ঘুড়া হঞে পিঠেচঢ়িন চুনির থল টুঁড়ে বেড়ায়...রাত দুপহরে?'

ভানু তার ডান হাতটি মুঠো করে চামড়া দেখতে থাকল, রাতের কামড়টি সহসা মনে পড়েছিল। একটু চিহ্ন স্পষ্ট. একটি দাঁত দেবে বসেছিল। সে চিহ্নটির দিকে দৃষ্টি রেখে বলল, 'চুনি কোথায়, জান?'

'উ হারামি জানে, সব জানে উ, কতি থল দিয়েছে, কে দিয়েছে সব জানে খ্যাপা হারামি।' কাজিরুন ছটফট করে বলল। তার ছোট চোখ দুটি ঠেলে বেরিয়ে ছিল। 'উয়ার ফুঁসে পড়ে চুনি...বুঝলি বাপ? ইবারে বুঝলি তো...ও ভানু!' এই বলা এবং এভাবে বলার মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্বেগ ছিল, ভীষণ ব্যাকুলতাও। সে জানমারিদের সামনে এক চোইতপাগলকে ঠেলে দিতে চাইছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে সামনে একটি ঢাল এবং আড়ালে কাজিরুন। 'খ্যাপা হারামি মলেই বা কী, বাঁচলেই বা কী', এই যুক্তিটি ক্রিয়াশীল ছিল তার চেতনায়। ফলে ভানুকে পুনঃ পুনঃ 'বুঝলি বাপ' বলে তাতিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু ভানুর শীতলতা লক্ষ্য করে বলল, 'পেত্যয় না হয়, ফুলকুঁড়ির কাছে যা। তার মাস্টেরের কাছে খবর লে।

খ্যাপা ঘুড়া হএে চুনিকে লিয়ে থল টুঁড়ছিল কি না...তারা বুলবে। ততক্ষণ আমি এই বসে আছি...তালা এঁটেএও দে...আমি আছি।' সে শক্ত হয়ে দেয়ালে হেলান দিল।

কিন্তু ক্ষতচিহ্নটি লক্ষ্য করেও রাতের রাগটিকে ফিরিয়ে আনতে পারছিল না ভানু, বরং হাসি পাচ্ছিল। কাল রাতে খুব নেশা হয়েছিল। এখনও প্রচণ্ড গা ম্যাজ ম্যাজ করছে। কিন্তু মিছিলে একবার নিজেকে দেখাতেই হবে। সে ঘড়ি দেখল। সাতটা পনের বাজে! ন'টায় পান্নার বডি আসার কথা। চা শেষ করে সে সিগারেট ধরাল। নাঃ, চোইতপাগলের ওপর তার রাগটি ফিরে এল না। শালা মানুষ, না কী। কুকুরের মত খ্যাঁক করে কামড়ে দিল। ভেবেছিল, দিনে দেখতে পেলে ছুরি দেখিয়ে আমোদ দ্বিগুণ লুঠবে। ঘোড়াই বটে, নড়বড় করে দৌড়য়, গানও গায়, মা দুর্গার বিসর্জনের দিন নাচে, মাথায় সন্নেসির চুল, দেখতে সাধু-সন্নেসি। ঘরদোর নেই, খালি গা, শীতে চেয়েচিন্তে রিলিফের তুলোর কম্বল যোগাড় করে এবং শীত গেলে সেখানা বেচে দেয় কাউকে। মনে পড়ল, একবার ভানু একটা জামা দিয়েছিল, তার বদলে দারোগাবাবুদের ক্যারিকেচার, অরু সিং ও তাঁর বাবার ক্যারিকেচার, অ-বি-ক-ল!

নিরুত্তর দেখে ডাবল-এজেন্ট পুনঃ তৎপর হল, 'খ্যাপা সেজে থাকে, বাপ! প্যাটে-প্যাটে বুদ্ধি! দু'বেলা মাকু চালাচালি করে।' নাক ঝেড়ে করুণ মুখে কাজিরুন শেষ কথার ভঙ্গিতে চ্যালেঞ্জ ছুড়ল, 'আমাকে তালা-বন্দি করে খবর লে আমার দেওরঝির কাছে...তাপরে'...

ভানু বলল, 'চল্। ছোটন'দা যা করার করবে। আমার কিছু করার নাই।'

কাজিরুনকে পেছনে নিয়ে ভানু যখন হাঁটছিল, তখন তার পরনে জিনস্ আর ছাইরঙা গেঞ্জি, পায়ে কেডস। খুদে চীনা পিস্তলটি জিনসের আঁটো পকেটে রুমালে জড়ানো। ড্যাগার ডান হাঁটুর নিচে বেল্টে বাঁধা, মোজার ভেতর। গলিঘুঁজি রাস্তার চকরাবকরা রোদ। ছোটনের প্রমোদ উদ্যানের খিড়কিতে পৌঁছে বডি-গার্ড জাম্বুকে দেখতে পেল। 'তোর বাবু উঠেছে বে জাম্বুয়া?' ভানুর প্রশ্নে বেঁটে কালো গরিলা মূর্তি বডি-গার্ড দাঁত বের করল। বোঝা গেল, উঠেছে।...

সঙ্গীতা বার বার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন এবং ঘরে ঢুকে উত্তেজনায় ফিসফিসিয়ে বলছিলেন, 'আমার ভীষণ—ভীষণ খারাপ লাগছে, জান? এসব কী? উল্টে কিছু...ওদের তো বিশ্বাস নেই!' চতুর্থবার শোনার পর প্রাক্তন বিপ্লবী আস্তে বলেন, 'দরজা বন্ধ করে দাও', মেয়েকে পড়াচ্ছিলেন এবং পঞ্চমবার ঈষৎ রুষ্ট হয়ে বললেন, 'কেন যাচ্ছ তুমি?...এমন তো হয়ে চলেছে, হবেই।'

'তুমি যাই বল, আমার ভাল লাগছে না।' সঙ্গীতা কাতর হয়ে বললেন। 'যদি কিছু বাধে, পুলিশ কিছু করবে? মাঝখান থেকে বোকা গরিব কিছু লোক...' শ্বাস ফেললেন জোরে। 'আশেপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে সব আসছে। আমার ভয় করছে, জান?'

হাফিজুল অনিচ্ছায় হাসলেন। 'এটা নতুন রণকৌশল। মানে, ভোটের রাজনীতির। সব সময় জনগণকে যেকোনও একটা ইস্যু নিয়ে চাঙ্গা রাখা, ঝিমোতে দিলে চলবে না।' বলে সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়ার সঙ্গে ঘোষণা করলেন, 'কিন্তু এই করতে গিয়ে একটা ব্যাকল্যাশও পাওনা হয়, অ্যানার্কি...টোটাল অ্যানার্কি সৃষ্টি হয়, যেমন হচ্ছে ক্রমশ। কাউকেই আইন মানানো যায় না। ডিসিপ্লিন! সংগ্রামী জনগণের মধ্যে এ জিনিসটা চোট খেলে বিপ্লব লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে, জানা কথা। ...আরেক কাপ চা দাও বরং।'

চা করতে যাওয়ার মুখে সঙ্গীতা বললেন, 'আইন তো অন্যাদের তৈরি...' কথাটা শেষ করলেন না। বিরক্ত হয়েছিলেন তিনি। দিনের পর দিন বাক্য-মানুষ হয়ে বাঁচা, ক্রুদ্ধ ও তির্যক দৃষ্টিপাত সমস্ত কিছুর প্রতি, কৃত্রিম থেকে কৃত্রিমতর হওয়া।

প্রাক্তন বিপ্লবী শুষ্কহাস্যে 'তাহলে ওই আইনে ক্ষমতা দখল কেন...ডিসিপ্লিনের প্রশ্নটাও এর সঙ্গে জড়িয়ে নিতে হয়', এই অসমাপ্ত উক্তি পেছনে পাঠিয়ে দিলেন সঙ্গীতার। তখন, তিনিও বিপ্লবী, রান্না ঘরে কুকার জ্বালতে গিয়ে ভাবছিলেন, দেশটা পুড়িয়ে দিতে কতটা কেরোসিন লাগে।

যখন টেবিলে চা পেলেন হাফিজুল, বললেন, 'কোনও ক্ষোভ নিষ্ফল। কারণ এই যে আমরা মাঝে মাঝে ক্ষোভ প্রকাশ করি, এটাও নিজস্বতাহীন। আমাদের ক্ষোভ প্রকাশ করিয়ে নিচ্ছে অন্য একটা ফোর্স। ঠেলে দিচ্ছে আইডিন্টিক্রাইসিসের মধ্যে। ভাবছি সবই চূড়ান্ত অ্যাবসার্ডিটি, তাও আমাদের নিজস্বতার বোধ নয়। উই আর ফলিং অ্যান্ড ফলিং ফ্রম আওয়ার সেলভস ইনটু দা ক্রুয়েল এভরিডেনেস। পুরনো কথা, কিন্তু এই পতন অমোঘ, ঐতিহাসিক...এটাই আধুনিক রাজনৈতিক সংকট'...

এই সময় বাইরে থেকে সাড়া এল, 'মাস্টারমশাই, আছেন নাকি?' দরজা খোলা ছিল। বারান্দায় হাজি গম্বুর আলি। হাফিজুল একটু অবাক ও বিরক্ত। তাকিয়ে রইলেন। হাজি গম্বুর আলি ঘরে ঢুকে একটা খালি চেয়ারে বসলেন। নিঃশব্দ হাসলেন। 'একটু ডিসটার্ব করলাম।'

'বলুন হাজি সায়েব।' হাফিজুল তাঁর বিবিধ তত্ত্ব, যা বাক্যের বাহান্ন তাস এবং যা নিয়ে পেসেন্স খেলেন, মাঝ পথে আটকে যাওয়ায় যত বিরক্ত, তার বেশি বিরক্ত এই টুপি পরা লোকটির উপস্থিতিতে। তিনি গম্বুর আলির চিবুকের সুছাঁট দাড়ি, বাজপাখির নাক, চামড়ার চেকনাই এবং সাদা সিন্থেটিক কাপড়ের আজানুলম্বিত জামাটি দ্রুত দেখে নিলেন। মনে পড়ছিল পূর্বতন গম্বুর আলিকে। এই গুরুতর অমিলের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিশ্লেষণগুলি মস্তিষ্কে বুজকুড়ি কাটতে শুরু করেছিল।

গম্বুর আলি অমায়িক হাসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মুখে থমথমে উদ্বেগ। 'বিরেংবাবু চিঠি লেখেছেন, পিসকমিটির মাথা হতে হবে ... অনুকূলবাবুরা খুব পেসার দিয়ে গেল, পিসকমিটির হেড হতেই হবে। আমি বললাম, মুরুক্ষু লোক। বলে, না, না, তুমি ইন্ডেপেনডেন লোক। ই কী বিপদ, বাবা!' সহসা একটা হাত টেনে নিলেন হাফিজুলের 'বাবা মাস্টারমশাই। আপনি হেড হন ... আপনিও তো মোসলমান, উয়ারা মোসলমান চাহেঞ।'

হাফিজুল হাত ছাড়িয়ে নিলেন। 'নাহ্!' বলে বাঁকা হাসলেনও। 'আমি কিসের মুসলমান? সব্বাই জানে আমি কী।' তিনি মরিয়া মানুষের ভঙ্গিতে পুনঃ বললেন, 'আমি বাইরের লোক। আপনাদের এসব গ্রাম্য ব্যাপারে আমাকে জড়াবেন না। প্লি-ই-জ!'

গম্বুর আলি গলার ভেতর বললেন, 'বাবা, আপনি যতই বোলেন, আপনি মোসলমান গো, মোসলমান। তবে আপনাকে বাবুরাও মানে-গোনে, ক্যানে কী, আপনি উয়াদের চালচলন আদবকায়দা জানেন। আবার কি না আপনি মাস্টারমশাই। মোসলমান পাড়াও আপনাকে মানে, জানমারি হারামজাদারাও!' খসখস শব্দে হাজি গম্বুর আলি হাসছিলেন।

'অসম্ভব। আমি ওতে নেই।' হাফিজুল প্রায় গর্জন করলেন। ভেতর দুয়ারে সঙ্গীতা, আগুনরাঙা চেহারা।

হাজি গম্বুর আলি বিমর্ষ মুখে দু'মিনিট বসে থাকার পর উঠলেন। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করে এসে সঙ্গীতা খুব আস্তে বললেন, 'দেখ, পুজোর ছুটিটা বরং আমরা বাইরে কাটিয়ে আসি। নৈলে একটার পর একটা ঝামেলা এভাবে আসবে, আমি বলেছিলাম।'

হাফিজুল মাথা নেড়ে সায় দিলেন। 'ওই রাবিশ ..পিসকমিটি-টমিটি...গম্বুর গিয়ে অনুকূলদাকে বলে এবার আমাকেও. .হরিবল্! গীতু, গোছগাছ করে নাও। এক্ষুনি। ঝটপট।' গেরস্থালিটি মুহূর্তে নড়তে শুরু করল, ইঞ্জিনে স্টার্ট এবং গর গর শব্দ। শুধু একটি বালিকার মনে দুঃখ, পুজোয় রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে তার পার্ট ছিল।...

সাত

বেড়ালটি কালো এবং যা কিছু কালো, মানুষের কাছে তাই রহস্যময়, নেয়ামত তাকে দেখেই 'বিল্ বিল্ করল আঞ্চলিক বেড়াল খ্যাদানো হুঙ্কারে। মাঠকোঠার আঁকাবাঁকা সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছিল চতুষ্পদ প্রাণীটি, যেন জানমারিবংশের লেংড়িভেংড়ি 'বড়ই বুকা' মেয়েটির তদন্তে পাঠানো হয়েছে তাকে। নেয়ামত এত হকচকিয়ে যাচ্ছে একটুতেই যে, সেই মত সাব্যস্ত করে হুঙ্কারটি ছেড়েছিল এবং সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকে দেখছিল, পরে মুঠোপাকানো হাতও ছুড়েছিল। এতে কালো বেড়ালটি উঠোনে

নেমে গিয়ে পেয়ারা গাছের ছিন্নভিন্ন ছায়ায় পেছনকার দু ঠ্যাং মুড়ে বসল, ব্যাংবসা। একটি থাবা তুলে গোঁফের একটা পাশ চুলকোতে থাকল। আর তখনই সে রহস্যহীন স্বাভাবিক হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য পারিপার্শ্বিকেও স্বাভাবিকতা ফিরে এল।

আজ সকাল থেকে এভাবে নেয়ামতের কাছে অস্বাভাবিকতা-স্বাভাবিকতার টানাপোড়েন চলেছে, যেহেতু প্রহরী সে, মোহরা খাতুন বলে গেছে, 'কাহুকে ছাতেব ঘরে উঠতে দিবা না...কড়ির দিকেঞ্রে চোখ রাখবা, হারামজাদির একহাত জিভা।' কড়ি সেই বাঁজা গোরুটি, খিড়কির পরে পিরের থান বটতলায় বাঁধা আছে লম্বা দড়িতে, প্রান্তিক মাটিতে ঘন তৃণ গুল্মাদি সকালের রোদে ও ছায়ায় সুদৃশ্য এবং নেয়ামতেরও মনে হচ্ছিল, সে গোরু হলে যথেচ্ছ খেত, অথচ কড়ি তার 'একহাত জিভা' বাড়িয়ে শুধু ধানক্ষেতকে দূর থেকে বিকটভাবে আক্রমণ করতে উদ্যত। খিড়কির দুয়ারে নেতিয়ে বসা নেয়ামত তাকে চাপাস্বরে হুমকি দিচ্ছিল, একবাব খ্যাপা-খ্যাপ্ত বলেও উঠেছিল, 'খালি খেঞে খেঞে সংসার বিনেশ রি...আবিয়োনি...মেয়েমানুষ হলে কবে তালাক খেতিস', বস্তুত এই গালমন্দ মোহরা খাতুনকেই। কিন্তু সে বড়ই বউপ্রেমিক, 'মাগের তনচুষা' পুরুষ, তালাক উচ্চারণ তার নিজের মাথায় বজ্রাঘাত, যদি বা দৈবাৎ 'তা'—মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে, সে সাবধানে থেমে যায় এবং একদা এটুকুতেই ব্যাপারটি নিমেষে আঁচ করে মোহরা তাকে দুহাতের নোখে ছিঁড়ে ফালাফালা করেছিল, চড়কিলও এলোপাথাড়ি, শেষে রাঁধাবাড়া বন্ধ, গুনগুনিয়ে মর্সিয়া ক্রমাগত, নেয়ামতকে ভাত রেঁধে সেধে খাওয়াতে হয়। আসলে বউয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ সে। একটি আঁটো সংসার, এই মাঠকোঠা, উঠোনে ফলের গাছ, লাউ-শশার মাচান, পাঁচিলে শিম-বরবটি, কয়েকটি ঝাঁপাল বেগুন গাছ পর্যন্ত, একটি সুন্দর ছবির মত গেরস্থালিটি যত্ন করে গড়ে তুলেছে মোহরা খাতুন। ছেলেপুলে না থাকার একটা গোপন দুঃখ মাঝে মাঝে চিড়িক করে উঠলেও সুসংবদ্ধ নিটোল পারিপার্শ্বিক দ্রুত তা চেপে দেয় এবং এতদ্দেশীয় প্রান্তিক চাষী-কাম-খেতমজুরের জীবনের সাধারণ সংকটগুলিনও দম্পতিকে একগলায় বলতে বাধ্য করে, 'দুটা প্যাট...যা হবার হবে', অর্থাৎ অজাতকদের প্যাটজ্বলা হওয়াটা কষ্টকর তাদের চিন্তাভাবনায়। উভয়ে বলে, 'ভাল আছি', এটি খরা বা অন্যান্য সংকটে নিজেদের প্রতি নিছক স্তোকবাক্য নয়। পড়শিগুলিনও এই ভাল থাকার প্রতি ঈর্ষাকাতর, সময়ে ব্যক্ত হয় অকারণ কাজিয়ায়, কিন্তু মোহরা খাতুন ঘোর স্তব্ধতার ঢালে তা প্রতিহত করে এবং নেয়ামত সে-সময় মুখ খুললেই 'চুপ, মুখ আছে, বুলুক' এই চাপা ভর্ৎসনা তনচুষা মরদটিকে নির্বাক করার জন্য যথেষ্ট।

বেড়ালটি কী করে পাঁচিলে উঠে গেল এবং পুনঃ রহস্যপূর্ণ হল, নেতামত আড়চোখে দেখে নিয়ে পিরের থানে কড়ির দিকে ঘুরল। দড়িটি প্রচণ্ড টানটান, যে-কোন মুহূর্তে ছিঁড়তে পারে, সে রে রে করে তেড়ে গেল এবং এই সময় কোথাও আবছা ঢনঢন শব্দ করে কিছু পড়ে গেল, গ্রাহ্য করল না। গেরস্থালিগুলিন গোরস্তানের কবরগুলিন নয় যে সতত শব্দহীন থাকবে। মানুষজনের এলাকায় সারাক্ষণ কতরকম শব্দ, বেঁচে-থাকার ধ্বনিসংকেত। গোরুটিকে যাচ্ছেতাই গাল দিতে দিতে সে ভিন্নমুখী করল, দড়ি যথেষ্ট শক্ত দেখে আশ্বস্ত হয়েছিল। থানটি উঁচু, ফলে সে দরগাতলার চটানটি পুলিশে-বন্দুকে ভরাট দেখতে পাচ্ছিল। এই রাষ্ট্রীয় পেশীপ্রদর্শন আশ্বাসব্যঞ্জক, নামুপাড়া থেকে হামলার সম্ভাবনা নির্মূল এবং সে হলফ করে বলতে পারে, ওপাড়ায় পুরুষ মানুষ বলতে কেউ নেই, গাঢাকা দিয়েছে, পান্নার পড়াটা সত্যিই বেরেৎ পড়া। মনে মনে নয়, পিরবাবাকে শুনিয়ে সে বলল, 'গরমেন ইটা ভালই করেছে।' তারপর উল্টোদিকে নিজেদের পাড়ার প্রান্তবর্তী উঁচু পুকুরপাড়ে মেয়েগুলিনকে দেখতে পেল। জোটবদ্ধ তারা পশ্চিমে মহাসড়কের দিকে তাকিয়ে আছে। ওই সড়ক দিয়ে পান্নার লাস আসবে। মোহরা খাতুনকে চেনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল সে। তারপর কোমরের কাছে লুঙ্গির ভাঁজ থেকে বিড়ি দেশলাই বের করল। বটতলায় এতক্ষণে একটু হাওয়া এল। দুটি-তিনটি হলুদ পাতা খসে পড়ল। বিড়ি ধরিয়ে নেবার সময় আবার কোথাও চাপা ঢনঢন শব্দ, সে বাঁকা মুখে তার ঘরের দিকে তাকাল। 'লাটের বিটি রি! এংকুয়েরিতে পাঠিঞে দিলে মোহরা খাতুনকে, এপোট আনবে।' মনে মনে বলছিল। পান্নার লাস এলে কী কী ঘটে, লোকসকল কী করে, সমস্ত কিছু জানতে গেল মোহরা। মেয়েমানুষের জন্য একটা গণ্ডী আছে, আর বউ মাঝে মাঝে সেই গণ্ডীর বাইরে বড়জোর একপা বাড়ায়। কিন্তু এবার

দুপা থেকে তিনপা বাইরে, বড় ভয় করে নেয়ামতের। ডাঙ্গাপাড়ার নির্দলরাও অলিখিত আইন মেনে নালার ব্রিজের কাছে জড়ো হয়েছে, নেয়ামত যায় নি, সেও একটা ভয়। তাই প্রতীক্ষায় ছটফট করছিল, কখন মোহরা ফিরে আসবে এবং সে একবার গিয়ে ভাকাদের চোখেপড়া হবে। জানমারিদের মন বোঝা কঠিন, কিসে রাগ করে বা কিসে খুশি হয়। নেয়ামত বিড়িতে ঘনঘন টান দিচ্ছিল। টান দিতে দিতে ঘুরে রাষ্ট্রীয় পেশীগুলিনকেও দেখে নিচ্ছিল দুই যুযুধান গোষ্ঠীর মধ্যবর্তী নোম্যানসল্যান্ডে। এটি আপাতদৃষ্টে আশ্বাসব্যঞ্জক। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে, তত উদ্বেগ আসছে, কারণ মৃত পান্নাকে রিসিভ করতে শেষ পর্যন্ত সেই মোহরাই লোকসকলের দলে গেল, এতে তার পুনঃ 'মাগের তনচুষা' খেতাব দৃঢ় প্রামাণিকতা পায়। রাগ দমনে ব্যর্থ সে বাঁজা গোরুটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটুকুন হুঁশবুদ্ধি আছে মাগির?' গোরুটিকে মোহরা ধরে নিয়ে যা খুশি গালাগালি করতে বাধা নেই, গোরুটি বলে দেবে না। সে গোরু, মানুষ নয়। তাই বিড়বিড় করে প্রচুর গাল দিয়ে সে আস্তে সুস্থে খিড়কির দরজায় ফিরল এবং পূর্ববৎ নেতিয়ে বসল, তবু রাগ পড়তে চায় না। পৈশাচিক মুখে সে বাড়ির ভেতরটা, দাওয়ার শেষপ্রান্ত থেকে ঊর্ধ্বগামী সিঁড়ির থ্যাবড়ানো ধাপগুলিন যতটা দেখা যায়, দেখে নিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসে বলল, 'জ্বলেপুড়ে যাক...জ্বলুক।' সকালের রোদজ্বলা গেরস্থালিটি মায়াহীন নিষ্ফলতা বোধ হল তার চোখে এবং তৎক্ষণাৎ চোইতপাগলকে স্মরণ হল, যে এই সমূহ নিষ্ফলতার জন্য দায়ী। ফুঁসে উঠে হুংকৃতস্বরে প্রান্তিক চাষি-কাম-খেতমজুরটি বলে উঠল, 'শালা ভালা মজা! ঘুড়া হএেছিল...ডাঁড়া...ভাকাদের বুলছি...।' কিন্তু এই ক্রুদ্ধ অতিকথনও অপর একটি নিষ্ফলতা, পরমুহূর্তেই স্মরণ হয়েছিল মোহরার নিশুতি রাতের শাসানি 'কুপিয়ে কাটব', পরিণামে সে পোড়ামাটির পুতুল হয়ে গেল।...

ততক্ষণে কাগুজে ১৪৪ ধারা তুচ্ছ হয়ে গেছে। অবাধ স্বাধীনতা স্রোতে সকলই তুচ্ছ ও কাগুজে হয়। গহুর আলির পোড়া ও পরিত্যক্ত মাটির বাড়ির কাছে বিতর্কিত ঘাসজমি থেকে মহাসড়ক ছাপিয়ে বিদ্যুৎ-উপকেন্দ্রের সামনে এবং নালার ব্রিজ বেরিয়ে সেকুলার সেক্টরের একাংশ পর্যন্ত মহাসড়কেও জনগণ, গ্রাম-গ্রামান্তরের জনগণ, সমুজ্জ্বল বেলা নটার রোদে ঘামছিল, গর্জন করছিল, জমাট রক্তমেঘ। এটি একটি স্থাপত্যসদৃশ নির্মাণ। পান্নার রক্তে এই ব্যাপক রক্তিম উদ্ভাসন কিছুদূরে দোতলার ব্যালকনি থেকে লক্ষ্য করে পরিতোষ তখনই সদর শহরগামী হতে চেয়েছিলেন। বস্তুত ছোটনের এই ভয়াবহ স্থাপত্যের প্রতি আতঙ্কে বিভ্রান্ত বে-পার্টির লিডার মোটরসাইকেল বের করেন। ভোরেই তাঁর রওনা হওয়ার কথা, কিন্তু রাতের রামের হ্যাংওভার এবং পরিস্থিতি বুঝে নেওয়ার কৌতূহল তাঁকে দেরি করিয়ে দেয়। মোটরসাইকেলে স্টার্ট দিতেই অবাঞ্ছিত যান্ত্রিক গর্জন ছোটনের বিশাল নেটওয়ার্কের একটি ছোট্ট অংশকে রুষ্ট করে তারা—ভোলা, তপু, পচা, খোদন এইসব কৃশকায় জানমারি গ্রুপ কাছাকাছি কোথাও তৈরি ছিল, পৃথুলাকৃতি পরিতোষের কলার খামচে ধরে। দ্রুত স্টার্ট বন্ধ করে পরিতোষ শুধু বলেন, 'ই কী...তুরা...' এবং তারপর তিনি এক ঠ্যাং তুলেছিলেন। পাশেই একটি ধাবা, যেটি ট্রাকচালকের ঠেক, আজ বেগতিকে সুনসান, শুধু কয়েকটি খাটিয়া ছিল আকাশিয়াতলায়। মড়মড় শব্দে একটি কী দুটির পায়া ভাঙ্গে এবং পরিতোষের সদ্যতোলা ঠ্যাংটিতে এসে পড়ে, ক্রমাগত পড়তে থাকে। পরিতোষ-পরিবার আর্ত শব্দে বেরিয়েছিল, ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে 'পুলিশ পুলিশ' বিলাপ করতে থাকে। পুলিশগুলিন দূরে রক্তবর্ণ জনগণের পাশে ছিল, ওই স্থাপত্যের অংশ রূপী। আর আশ্চর্য কথা, পরিতোষ স্তব্ধ ছিলেন। জানমারি গ্রুপটি ঠ্যাংভাঙ্গা অনুরূপ রক্তিম বস্তু পরিতোষকে ফেলে শোকমিছিলে মিশে যায়। ঘটনাটি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। সেকুলার সেক্টরের দক্ষিণাংশে যে বিশাল ঘটনাটি ঘটছিল, তার তুলনায় উত্তরাংশের এটি অকিঞ্চিৎকর ছিল এবং অতীতের পরিতোষের শীর্ণ আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার প্রত্যক্ষদর্শী এই অংশে প্রচুর, তারা বা তাঁরা মনে মনে খুশিও হন। তারা বা তাঁদের স্মরণে ছিল পাঁচের দশকে টেস্টরিলিফে পেমাস্টার ছিলেন পরিতোষ। এবং পায়ের বুড়ো আঙুল টিপ ছাপ দেওয়ার জন্য লোক ভাড়া করতেন। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ভোট, যোজনা এসকল গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় চেতনায় তখন সদ্যভূমিষ্ঠ ছানাগুলিনের চোখ পিটপিট দশা. ভাড়াটে ছিপছাপের অঢেল যোগান তৎকালে এবং মাথা পিছু এক বান্ডিল বিড়িই যথেষ্ট ছিল। ব্লক ওভারসিয়ার উৎখনন

স্থলে সরেজমিন মাপজোকে শোলার হ্যাটসত্ত্বেও রোদ মাথায় কিছুতেই যাবেন না, পরিতোষ এমন কৃৎকৌশলী ও জাদুকর পুরুষ, তাঁর ঘরে বসে প্রজেক্ট কমপ্লিশন ফরমে সই করতেন ভদ্রলোক। বড়ই হাঁসের ডিম পাগল তিনি, সাইকেল থেকে একবার ডজন দুই ডিম-সহ পড়ে গিয়ে লোক হাসান। এই দৃশ্য প্রবীণদের আজও যুগপৎ হাসায় এবং পরিতোষ বিরোধী করে ফেলে। পুরনো চতুরালিগুলিন আজ জোরাল প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল স্মৃতিচিত্রে, গম পাচারকারী ট্রাকগুলিন এবং পি এল ও ৪৮০ এ-সকলও। তাছাড়া রাম খেয়ে-খেয়ে পরিতোষের চামড়া অনুভূতিহীন, এমন ধারণা হয়, আর চোইত-পাগলও কী কারণে একদা বলেছিল, 'সে এক গণ্ডার।' কিছুক্ষণ পরে অরু সিংয়ের পেট্রল পাম্প থেকে ছটফটিয়ে এসে একটি জিপগাড়ি আহত গণ্ডারটিকে তুলে সদর শহরের হাসপাতালে নিয়ে গেল। মহাসড়কের উত্তর এবং দক্ষিণে ট্রাফিক জট, পুলিশ ব্যারিকেড, জিপ গাড়িটির রাস্তা পেতে সময় লেগেছিল এবং সেও স্বয়ং অরু সিংহের 'দিল্লি দিল্লি...প্রাইম মিনিস্টার' সিংহগর্জনের ফল। থানার এ এস আই সমাদ্দারবাবু সদ্য পোস্টেড। এই গর্জনে ভয় পেয়ে বেটন তুলে ড্রাইভারগুলিনকে এই মারে তো সেই মারেন, জিপটিকে পার করিয়ে দেন। সেকুলার সেক্টরের এই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দিকটিতে তাঁর ডিউটি ছিল। তিনি নবীন যুবা। রহস্যময় পুলিশ বিশ্বে ঢুকে তাঁরও চোখ পিটপিট দশা এবং একটুতেই হকচকিয়ে হাত-পা ছোড়েন।

'রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিশোধ', যে-ট্রাকে পান্নার লাস, সেই ট্রাক থেকে মাইক্রোফোনে এই তৎসম শব্দগুলিনের ক্রমাগত মন্তাজ, আকাশের পটে ধ্বনিচিত্র সদৃশ। এগুলিন আঞ্চলিক উচ্চারণের টানে বিকৃত হলেও অর্থবহ। সদর থেকে পাঠানো অফিসারটি, যিনি অধ্যাপনা ছেড়ে পুলিশে ঢুকেছেন বারবার কলিগ ও অধস্তনবর্গের কাছে জানতে ব্যগ্র, 'ছুটোনবাবু কেডা, কই উনি' পুনঃ পুনঃ। স্থানীয় বড়বাবু আস্তে বলেন, 'ফোটো আছে, দেখাবখন...বেরোন না।' এই ধরনের বহু ছোট-বড় স্থাপত্যের ডিজাইন যার হাতে তৈরি, তার দর্শন পেতে প্রশাসনের রথীমহারথীরও অভিলাষ হয় এবং আজ নির্মাণশিল্পটি বিশাল ও রক্তিম, প্রপাতগর্জন কান ঝালাপালা, তারপর খবর হয় পরিতোষের। 'ভোলার গ্যাং' শুনে বড়বাবু স্বস্তিতে একটু হাসলেন। 'যাক্, আর কমিউন্যালের চান্স নেই...ইন্টারন্যাল ফিউড!' উর্ধ্বতন অফিসারকে বলছিলেন, 'ভোলার গ্যাং লাস্ট ইলেকশনে সিংহদের ফরে খেটেছিল।' এইসময় ট্রাকসহ শোকমিছিল সেকুলার সেক্টর-পরিক্রমারত হল। পুলিশের গাড়িগুলিন মর্যাদাজনক দূরত্বে অনুসরণ করছিল। দুধারে রাষ্ট্রীয় পেশী প্রলম্বিত ও টানটান হয়েছিল, দোকানপাট লুঠের ঝুঁকি ছিল। ট্রাক থেকে মাইক্রোফোনে ঘোষিত হচ্ছিল, 'বিরেংবাবুর ফ্লু...জ্বর...তাই আসতে পারলেন না...আসবেন...পিস কমিটি..' এইসব ধ্বনি-কোলাজে বারবার 'ফ্লু' অর্থাৎ ফ্লু একটি সার্বিক যোগসূত্র ছিল। অরু সিংহের বাড়ির কাছে আধঘণ্টা বজ্রহুংকার পাঁচ-সাত বক্তার ভাষণে, তারপর পুনঃ উত্তরমুখী হল রক্তবর্ণ শোকমিছিল। তখনও প্রাক্তন অধ্যাপক 'ছুটোনবাবু কেডা.. আইলেন না...দ্যাখতাম' করছিলেন ব্যগ্রতায়। তাঁকে বোঝানো হচ্ছিল, ছোটনবাবু কখনও পাবলিকের সামনে আসে না। শুনে তিনি শ্বাস ছেড়ে বলেন, 'একবার হালারে দর্শন না কইরা যামু না!'

ডাঙ্গাপাড়ার মুখে দলীয় ও নির্দল স্ত্রীলোকেদের ভিড় ছিল। সকলের চোখ ভিজে। কেউ কেউ বুক চাপড়ে গুন গুন বিলাপ করছিল, ট্রাকটি সামনে দেখে প্রচণ্ড করল বিলাপকে। গ্রামীণ স্ত্রীলোকেরা যে-কোনও মৃত্যুতেই এরূপ করে থাকে, কিন্তু পান্না তাদের পাড়ার বীর এবং অসহায় মরেছে, এদিকে সামনে ওই বিশাল কারবালা শোকের রক্তিম সমুদ্র, স্ত্রীলোকগুলিন দুধারে সরে মুখ উঁচু করে পান্নাকে দেখার চেষ্টায় ব্যর্থ, অবশেষে চেরাগলায় নামুপাড়াকে অভিশাপ দিতে দিতে, যাতে মর্সিয়াসুর ছিল, শোকমিছিলের অনুগামিনী হল। মোহরা খাতুনও কাঁদছিল, কান্না সংক্রামক, কিন্তু সে প্রতিটি ঘটনা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লক্ষ্য করছিল, সকল চিহ্ন ও দৃশ্যাবলী মনে ছেপে নিচ্ছিল, তাকে বেবুঝ লেংড়িভেংড়িটার কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃত করতে হবে। চুনি তাকে পাঠিয়েছে। 'যা, যা হবে...সব খবর আমাকে বুলবে...আমি চোখের দ্যাখ্যা দেখতে পাব না ভাইটোকে...' এই ব্যাকুলতা স্মরণ হওয়ায় মোহরা পুনঃ পুনঃ ঠোঁট কামড়ে আত্মসম্বরণ করছিল। ইচ্ছা হয়, এই কারবালা-প্রবাহকে একবার স্তব্ধ পাথর করে চুনির ক্রন্দন দিয়ে ভেজায়, নৈলে এসকল প্রকৃত অর্থপূর্ণ হবে না। স্ত্রীলোকগুলিনের মরালীগ্রীবা,

পার্শ্ববর্তী উঁচু মাটিতে দুপায়ের গোড়ালি উত্তোলন, তারা ট্রাকের খোলে পান্নার মরামুখ দেখতে চাইছিল, আর চকবন্দি বাড়িগুলিনের ভেতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ক্রমশ বুড়ো-বুড়িদেরও নির্গমন, সমস্ত কিছু চিত্রস্থ করে মোহরা খাতুনের মনে হল, পান্নার জানমারি হলেও তার বোন বড় ভাগ্যবতী এবং এই সুসংবাদ চুনিকে না দেওয়া পর্যন্ত তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। বেঁচে থাকার কথাটি তাকে ভাবতে হচ্ছিল, কারণ প্রতিমুহূর্তে তীব্র ইচ্ছা, চুনির অস্তিত্ব প্রচার করে বলে, 'বুঝে নি...বড়ই বুকা গো...তাকে ক্ষ্যামা দাও...' শেষে সে একটি ঢোকের সঙ্গে ইচ্ছাটি গিলে ফেলল।

পান্নাদের খলিয়ানের সামনে ট্রাকটি থামল। বাড়ির দরজার সামনে পান্নার মা এবং বউ, তার কোলের শিশুটি বিকারহীন, মায়ের শাড়ির পাড় চুষছিল। লাস নামানো হল, একটি তক্তাপোষ খোলা আকাশের নিচে খলিয়ানে প্রস্তুত ছিল লাস বুকে নিতে। খাদেমুন্নিসা তক্তাপোষের পাশে এসে হাঁটু ভাঁজ করলেন, আলুথালু চুল, ক্রন্দন-শক্তিহীনা জননী মাত্র, বুকে থাপ্পড় মারছিলেন। পান্নার বউয়ের কোল থেকে কোনও সতর্ক স্ত্রীলোক শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, শিশুটির কান্না শোনা গেল এবং পান্নার বউ স্বামীর সেলাইকরা বুকে লাল কাপড়ের আবরণে মুখ রাখল। মোহরা পলকহীন চোখে দৃশ্যটি দেখছিল। মর্গ থেকে ডাঙ্গাপাড়ায় বহু লাস ফিরে এসেছে, এমন হাহাকার ও দৃশ্য নতুন নয়। কিন্তু আজ এতে বিরাট কিছুর লক্ষণ সমূহ প্রকট, যথাযথ ইউফ্রেটিশ-তীরের রক্তাক্ত কারবালা ও আসমান-জমিন বিস্তৃত মর্সিয়াগাথা, একটি স্মরণযোগ্য ঘটনা বটে। আর এ সময় মসজিদ থেকে মৌলবি আলিমুদ্দিন ছ্যাংরানো কণ্ঠস্বরে পবিত্র আরবি শ্লোক উচ্চারণ করতে-করতে এগিয়ে আসায় পান্নার জানমারি-অতীত লুপ্ত হল এবং সে এক নিতান্ত মুসলমানলোকে রূপান্তরিত হল, পবিত্র শ্লোকে গত রাতের 'দেল ফেটে যায়' ক্রন্দনের সিক্ততা ছিল। ভাকা লিড নিয়ে গর্জন করছিল, 'সরেঞ যাও, সরেঞ যাও...' পান্নার লাসের কাছে পৌঁছুনোর জন্য একটি সংকীর্ণ রাস্তা দ্রুত নির্মীত হল এবং মৌলবী আলিমুদ্দিন সেই রাস্তায় হেঁটে এলেন। এতক্ষণে পান্নার রাজনৈতিক শহিদত্বে ধর্মীয় পাঞ্জার ছাপ পড়ল।

নেয়ামত খিড়কির দরজায় পা ছড়িয়ে বসে ছিল, ঢুলছিল। অদূরে নিমগাছটি কিছু ছায়া ছুঁড়েছিল তার ওপর, একটু-একটু হাওয়া বইছিল। মোহরা ইচ্ছে করেই তাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকল। এতে হকচকিয়ে মুখ তুলে পুরুষটি তার স্ত্রীলোককে দেখতে পেল। লালা মুছে সে শিশুর হাস্যে কোমর ধরে বলল, 'লাস এল?'

মোহরার মুখমণ্ডলে বিশালতা ছিল। রোঁয়া ফোলানো মুর্গির কঁক কঁক-করা উচ্ছ্বাসে সে বলল, 'হাজারে হাজারে...মানুষ, খালি মানুষ...কে একে জানমারি বোলে, পাড়ার গৈরব!' সে হাঁফাচ্ছিল। 'যাবা তো যাও, দেখেঞ এস' বলে দাওয়ায় উঠল।

হাই তুলে নেয়ামত করুণ মুখ করে বলল, 'কাটাকুটি লাস...সহ্য হবে না।' সে বউকে অনুসরণ করেছিল দাওয়া পর্যন্ত। বউ ফেরায় তার মন প্রফুল্ল আবও কথা বলাব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মোহবা খাতুন মাটির সিঁড়ি দড়বড়িয়ে ছাদের ঘরে উঠে গেল। নেয়ামত দাওয়ার খুঁটি ধরে আকাশে দৃষ্টিপাত করতেই সাদা দুটি মেঘখণ্ড তার চাষি-চেতনাকে ঝাঁকুনি দিয়েছিল। খুব মন দিয়ে, সমস্ত কিছু ভুলে সে খণ্ডমেঘদ্বয়ের গতিবিধি পরীক্ষা করেছিল। এইরকম আরও কয়েকখণ্ড, সেগুলি যদি ধূসরবর্ণ হয়, সাদাখণ্ডগুলিনে এসে মিশলে রোদজ্বলা মাঠে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে-মরা গর্ভবতী ধান গুচ্ছের পুনরুজ্জীবন আশা করা যায়, সে আশান্বিত এবং শ্বাসের সঙ্গে বলল, 'বাপ মেঘা রে!' কিন্তু মেঘা কেন সেই রহস্যজনক কালো বেড়ালটিকে তার পায়ের কাছেই পাঠালেন, বিরক্ত নেয়ামত রুষ্ট হুংকারে 'বিল্ বিল্' করল এবং চতুষ্পদ রহস্য সিঁড়ির দিকে সরে গেল।

সে থাপ্পড় তুলেছিল তখনকার মত। তবে সেজন্য নয়, মোহরা খাতুনের সিঁড়ি দিয়ে দাপাদাপি নামার শব্দে কালো রহস্য ছিটকে গেল এবং মোহরা এসেই স্বামীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'বুবাকালা...কান নাই, চোখ নাই... ক্যানে তুমাকে বুলে গেলাম...' সে অদ্ভুত শব্দে কাঁদতে কাঁদতে নেয়ামতকে খামচাতে থাকল।

নেয়ামত 'আঃ ইঃ...কী' করলে মোহরা তার ঘাড় ধরে সিঁড়িতে ঠেলে তুলল। ছাদেরও একটুকরো দাওয়া আছে। কিন্তু ঘরের দরজায় কোনও কপাট নেই। কপাট থাকাটা প্রান্তিক চাষি-কাম-ক্ষেতমজুরের পক্ষে বিলাসবহুল জীবনযাপন স্বরূপ। এই ছাদওয়ালা কোঠাঘর করতেই স্বামী-স্ত্রীর দম ফুরিয়ে গিয়েছিল। ওপরের দাওয়া থেকে পুরুষের ঘেঁটি ধরে দরজায় মুণ্ডটি ঠেলে দিল মোহরা খাতুন। নেয়ামত এবার শুধু 'ক্বী...ক্বী...' করছিল। রোদজ্বলা আকাশ দেখে আসার ফলে ঘরের ভেতরটা গাঢ় অন্ধকার লাগে।

মোহরা শ্বাসপ্রশ্বাসে চাপা ও ক্রন্দনপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলল. 'কি হত ভেবে হাত-পা শরিল ঠাণ্ডা হিম... তুমি কানে কিচু শুন না... দ্যাখ, দ্যাখ হারামজাদির কিত্তি...' সে কীর্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। খুব কাঁপছিল।

ক্রমে ঘরের ভেতরকার অন্ধকার পাতলা হচ্ছিল। অবশেষে 'খুদা গো' আর্তনাদ করল নেয়ামত, যদিও কিছু বুঝতে পারছিল না। শুধু দেখতে পাচ্ছিল, বালিশে মুখ গুঁজে চুনি উপুড় হয়ে শুয়ে আছে এবং দরজার কাছাকাছি একটি উল্টে পড়ে থাকা খালি টিন। এই টিনটি সে খালেকমিয়াদের মুদির দোকানে কিনেছিল, মুনিশখাটা মজুরিবাবদ এবং টিনটি সর্ষের তেলের। এইসব টিনে ধান মাপা হয়। ধান মাপা টিনটি ছাদের ঘরে রাখা ছিল। সেটি উল্টে পড়ে আছে কেন, সম্যক বোঝার চেষ্টা করছিল সে। 'খুদা গো' পুনঃ বলল, সেটি প্রথম আর্তনাদটির মতই অকারণ লঞ্ছনা ভেবে। তবে দ্বিতীয়টিতে কিছু বিস্ময়ও ছিল।

মোহরা খাতুন তার পুরুষের মুণ্ডের পেছনে খামচে মুণ্ডটিকে ঊর্ধ্বে তুলে দিল। 'বুকাঃ ... এখুনও বুঝ না' বলে অপর হাতে তর্জনীও তুলল চালের দিকে। বাঁশের কড়িবর্গাগুলিন শ্রেণীবদ্ধ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, একটিতে দড়ি বাঁধা এবং দড়িটি ছিঁড়ে ঝুলছে। দড়িটি চিনতে পারল নেয়ামত। চষা জমিতে মই টানার জন্য জোয়াল থেকে মই পর্যন্ত যে-দড়িটি স্থূল কাঠের আঁকশিতে বাঁধা থাকে এটি সেটিই বটে এবং কয়েকটি বর্ষার বৃষ্টিতে ভেতরকার আঁশগুলিন জীর্ণ হয়েছিল।

নেয়ামতের মাথায় বজ্রপাত এতক্ষণে। স্মরণ হল ঢনঢন শব্দ শুনেছিল, পর-পর দুবার এবং সে ধপাস করে বসে আস্তে বলল, 'সহা যায় না, সহা যায় না।'

মোহরা তার পুরুষকে ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে কোনা থেকে দড়ির অপরাংশ উদ্ধার করল। আত্মহত্যায় ব্যর্থ লেংড়ি-ভেংড়ি এবার বালিশ থেকে মুখ তুলে কঠিন ও হিম 'পানি' উচ্চারণ করেছিল। থাপ্পড় তুলে মোহরা খাতুন ভিজে চোখে হিংস্র তাকিয়ে বলল 'মর্...তু মর্... জানমারিদের বিটি তু!' তারপর ছেঁড়া দড়িটি হাতে নিয়ে নিচে চলে গেল। চুনি চিত হয়েছিল। তার সুন্দর পরীমুখে নিষ্ঠুরতা। ঢোক গিলছিল কষ্টে।

ব্যথিত নেয়ামত 'গলায় যন্ত্রণা' বলে পাশে গিয়ে বসল। সে মমতায় তাকাল চুনির দিকে। জিভ চুকচুক করে বলল, 'ক্যানে ই কাজ কত্তে গেলি তু', ভেবে পাই না...তোকে পছি মাঠে বাস-মটোরে সনজেবেলা চাপিন দিব বুলেছি, তু কি ভাবলি...চুনি, বুন রি!' সে ঢোক গিলছিল। 'দড়িটো না ছিঁড়লে কি হত?...তোকে থল দিলাম, আমাদের কথাটো ভাবলি না!' বলে সে টিনটি সাবধানে তুলে হাতে নিল। আবার ওপরের ছেঁড়া দড়িটির দিকে তাকাল।

মোহরা গেলাসে জল নিয়ে ফিরল। সে রাগ করা একহাতে চুনির মাথাটি তুলে জল খাওয়াতে থাকল। চুনি ঢোকে-ঢোকে কিছুটা জল গিলে নিঃশ্বাসে বলল, 'আর লয়।'

ভেংচি কেটে মোহরা খাতুন বলল, 'আর লঁয়!...হারামজাদি! ভেবেএছিলি ই চোখকে ফাঁকি দিবি... ওই টিন, ওই টিন, ওই দড়ি!' সে ঈষৎ ঝুঁকে চুনির অক্ষম পায়ের দিকে গেল। 'আছাড় খেএছিলি...কোমরভাঙা...ওরে, তু লেংড়িভেংড়ি! কি সাওস তোর!' সে নিজের গালে হাত রাখল। দৃশ্যটি কল্পনা করে ভয় পাচ্ছিল। ঘুরে পুরুষকে বলল, 'দড়ি খোলো! খুলে রাঁধাবাড়া করো গা... আমি ই জানমারি আগলাই...ই সব্বনাশি।'

টিনটি দেয়াল ঘেঁষে উপুড় করে তার ওপর সাবধানে দাঁড়িয়ে নেয়ামত দড়িটা খুলল। সে মুনিশ

খাটা। এখন খুবই হুঁশিয়ার, নৈলে টিনটি পিছলে গিয়ে কদর্য শব্দ করত এবং সেও আছাড় খেত। সে বুঝতে পারছিল, টিনটি পায়ের ধাক্কায় প্রথা অনুসারে সরিয়ে ফেলে চুনি ঝুলতে যায়, কিন্তু দড়িটি দড় ছিল না। বিছানাতেই আছড়ে পড়ে। জানমারি বংশের নিষ্ঠুরতা তাকে খুব ভাবিয়ে তুলল। আশ্চর্য লাগে, গলার ফাঁসটিকে কিভাবে খুলে ছুঁড়ে ফেলেছে, নিশ্চয় দম আটকে যাচ্ছিল। মৃত্যু যে কত যন্ত্রণাময়, জানমারি বংশের মেয়েটি জেনে গেছে, এতে নেয়ামত অবশেষে একটু হাসতে পারল এবং শান্তভাবে নেমে গেল নিজের সংসারে। খিড়কিতে উঁকে মেরে গাই-গোরুটিকে ছায়ায় বসে জাবর কাটতে দেখল সে। বাঁশবাতার খিড়কি বন্ধ করে দিয়ে নেয়ামত রাঁধতে গেল। সে টিনটির ভেতর ছেঁড়া দু-টুকরো মারাত্মক দড়ি ঢুকিয়ে উঠোনের কোণে পেয়ারাতলায় ফেলে রেখেছিল, কালো বেড়ালটির মত রহস্যজনক।

চোইতপাগল আজ দীঘির আঘাটায় স্নান করেছিল। ঘাটগুলিনের দিকে যেতে তার সংকোচের কারণ এমন নয় যে সে জন্মসূত্রে মুসলমান লোক, সে 'বড়ই খ্যাপা' এবং নোংরা ভাবা হয় তাকে, মুসলমান পল্লীর কোনও পুকুরঘাটে গেলেও তাকে ভাগিয়ে দেওয়া হয়। তবে সে খুব কদাচিৎ স্নান করে। আজ কানিঠাকরানের বাড়িতে তার মুনিশখাটার অন্ন প্রাণভরে গ্রহণ করবে, এই ইচ্ছায় স্নান। কিন্তু গতরাত্রে গামছাখানি হাজি সইদুরের ঘরে খুইয়ে বসে আছে, সন্ন্যাসী চুল মোছার বিড়ম্বনা ছিল। তবে সে আঘাটায়, ফলে জলে মগ্ন অর্ধাঙ্গ ডুবিয়ে লুঙ্গিটি গামছা করেছিল। দৃশ্যটি দূরের ঘাট থেকে স্ত্রীলোকেরা দেখে আমোদ পেয়েছিল। লুঙ্গির খোপে ঢুকে জল যত কমে তত লুঙ্গি নামায়, এইভাবে পাড়ে উঠে সে নিজেও আমোদে খুব হাসাহাসি করে। অষ্টশিবের মন্দিরের ভেতর দিকে ঠাকরানবাড়ি ফিরেছিল। ঠাকরান বলেন, 'তুই ভিজে কাপড়ে...শুকনো কাপড় পরে আয়..., মরবি যে!'

সোনারু উজ্জ্বল হাস্যে বলে, আমার মরণ দিদি সস্তা লয় গো...মোসলমানের আজরাইল কি তুমাদের মশাই, যোম...খুব চেষ্টা করেছে এত গো, পারে লাই। দিদি, ই খ্যাপা যোমকে বুলেছিল, আরে যা যাঃ!... আর দিদি, আজরাইল মাথার ওপর পর পাখা লেড়ে-লেড়ে শ্যাষে উ-ড়ে পালিন গেল গো...কথা বুঝ।'

একচক্ষু ঠাকরান আজ দয়াবতী, চোইতপাগল পাঁচমুনিশের কাজ করেছে, গুল্মগুলিন বাইরে রোদে সুন্দর পাঁজা করে শুকোতে দিয়েছে, জ্বালানি হবে। বললেন, 'দাঁড়া, দেখি...' এবং ঘরে ঢুকে কনস্টেবল পুত্রের পরিত্যক্ত একটি জীর্ণ লুঙ্গি নিয়ে ফেরেন। 'কাপড় বদলা, সোনারু! ভেজাখানা বাইরে শুকুতে দিয়ে আয়।' বলে লুঙ্গিটি, প্রচণ্ড কোঁচকানো ও বেরঙা, ছুড়ে দেন। মুখে তাঁর স্নেহহাস্য ছিল। স্মরণে ছিল, ইটগুলিনও চমৎকার সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে।

সোনারু বাইরে গিয়ে লুঙ্গি বদলায়। সে আকাশের যত মেঘগুলিন লক্ষ করে। ফিরে গিয়ে ঘোষণা করে, 'ঠাকরানদিদি, আজ রেতে বর্ষাবে...না বর্ষালে ই খ্যাপার নামে কুকুর পুষবেন গো।' সে উঠোনের কোণে মাটিতে পা মুড়ে সসম্ভ্রমে বসে। অন্নকে গ্রহণ করার ভক্তি ছিল মনে, কাল থেকে প্যাটজ্বলা। এনামেলের পাত্রটিতে ভাত-ডাল-ঘ্যাঁট ভক্তি-দৃষ্টে নিরীক্ষণ করে সে পুনঃ আকাশের খবর শোনায়। 'বর্ষাবে...পাম্নার কবর ধুয়া যাবে গো দিদি', বলে সে সহসা প্রশ্ন করে, 'ই খ্যাপার মরণ ক্যানে নাই গো' এবং নিজেই জবাব দেয়, 'মা দুগ্গার চালির ছামুতে লাচি, মৈলবি বোলেন তু হিঁদু... আমার কবর হবে না!... আর দিদি, তুমরাও ই খ্যাপাকে পুড়াবা না... তাইলে? জবাব দ্যাও!'

বিমলাবালা উপভোগ করছিলেন। হাতের নড়ি তুলে বলেন, 'খা দিকিনি... খালি বকরবকর...'

'না দিদি!' সোনারু মিটিমিটি হেসে বলে। 'ই খ্যাপার শরিল খায় সাধ্যি কার? বড় তিতকুটে.. তখন খুদা বুলুন খুদা, ভগোমান বুলুন ভগোমান, উঠিন লিবে আসমানে।' সে ভ্রূভঙ্গিতে আকাশ দেখাচ্ছিল। 'আসমানে যাব গো... দেখবেন।' তারপর ভদ্রভাবে, সম্ভ্রমে, অন্নগ্রহণ করে। তাকে কথায় পেয়েছিল। অনর্গল কথা বলে। সে আবার গতরাতের পক্ষিরাজ এপিসোডটি বর্ণনা করতে থাকে।

তখন ঠাকরান নড়িটি তার সামনে ঠুকে চাপা স্বরে বলেন, 'চুপ...চুপ'!' তিনি মুখুয্যে বাড়ির দিকটি ঘরে দেখে নেন। শাসান 'আর একটা কথা বললে নড়ি খাবি...মুখ আলগা চুপ কর দিকিনি!' তাঁর ভ্রূকুঞ্চনেও ভর্ৎসনা ছিল।

চোইত পাগল বাঁ হাতে বুক স্পর্শ করে বলে, 'ই মানুষে আর ডর নাই...বড় দঢ় জান. দিদি, জানে-ধড়ে এক....তফাত নাই।' এনামেলের গেলাস তুলে একটু জল খেয়ে সে প্রশান্ত মুখে কানিঠাকরানের দিকে দৃষ্টিপাত করে। 'ছোটবেলায় মৈলবির কাছে শুনেছি', বলে সে পুঁথির সুরে গুনগুনায়, ছন্দ ও তালসহ, 'যায় ইসা পৈগম্বার/সঙ্গে লয়ে দিনদার... দেখে এক লুমড়িকে বোলে/কোথা হতেঞ হেথা আইল/লুমড়ি বোলে, যাই আমি ঘর...দিদি, লুমড়ি খেঁকশিয়ালি, বুঝলেন?' পুনঃ সুরে গুনগুনায়, 'ইসা পৈগাম্বার বোলে/এহি দুনিয়ার তলে/সকলের রএেছে গো ঘর...আমি মৈরমের ব্যাটা/আমার নাই চাটিপাটা/আমার ঘর দুনিয়া সংসার।।...ঠাকরানদিদি, খুদা ইসা পৈগম্বারকে আসমান লিজের ঠেএে উঠিন লিলে। শাস্তরের কথা গো।' সে হাসতে থাকে। ই খ্যাপা তো খ্যাপাই বটে, কিন্তু ইয়ারও চাটিপাটা নাই...ঘর নাই...দুনিয়া সংসার...' প্রকৃতই নড়ির স্নেহাঘাত তাকে থামায়। সে অন্নের দিকে ঝোঁকে। তার চোখের কোনায় জলবিন্দু ছিল।

একচক্ষুর কারণে ঠাকরানের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, আস্তে বলেন, 'আই বাঁদর! তুই কাঁদিস ক্যানে? মারলাম বলে?'

'না গো, না।' চোইতপাগলও আস্তে বলে। 'খ্যাপা গো! এই হাসে এই কাঁদে...সুখে কাঁদি, বড় সুখ।'

বিমলাবালা কথা না বাড়িয়ে বলেন, 'খেয়ে থালা-গেলাস ধুয়ে আনবি দীঘির জলে। এনে ওইখেনে রাখবি। আর শোন্, বাড়ি পাহারা দিবি। চান কত্তে যাব। দীঘিতে অনেকদিন চান করিনি রে, ইচ্ছে করে...তুই আছিস।'

সোনারু নিঃশব্দে মাথাটি দোলায়। তাকে কোমল দেখাচ্ছিল ইসাপয়গম্বরের সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কিত করতে পেরে, দুনিয়া সংসারহীন।...

উঠোনের কোণে শিউলি গাছের ছায়া ঘেঁষে একখণ্ড চটের ওপর সে কাত হয়ে শুয়েছিল। কানিঠাকরানের ডাকে হকচকিয়ে চোখ খুলল এবং খুবই অবাক হয়ে গেল ভোরবেলাকার মতই। সে ঘুমোচ্ছিল! কতকাল, ক-ত-ব-ছ-র পরে সে ঘুম ফিরে পেয়েছে হিসেব করা যায় না। সে দ্রুত উঠে বসল। উঠোনে শেষবেলার ধূসরতা মিশ্রিত ছায়া এবং আকাশে প্রচুর খণ্ডমেঘ। হাওয়া বাতাস বন্ধ। সে কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর কুণ্ঠিত মুখে বলল, 'ই কি ঘুম গো দিদি...খ্যাপা ঘুম জানে না...ক্যানে ঘুম?' সে গত রাতের স্বপ্নের কালো নৌকোটির দিকে পিছু ফিরে দেখছিল, দুচোখে ধূসরতা।

কি ভেবে কানিঠাকরান বললেন, 'মজুরি আজ নিবি, না কাল? কাল উঠোনটুকু কুপিয়ে কেটে দিবি...পিটুনি আছে ঘরে।' নড়ি দিয়ে উঠোনের সবটা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। পুজোর আগে আঞ্চলিক প্রথা উঠোন পেটানো এবং নিকনো।

'পাঁচটা টাকা দিলে বরঞ্চ উব্‌গার হয়।' সোনারু দ্রুত উঠে চটটিকে যত্নে ভাঁজ করছিল। বারান্দার কোনায় একপাশে রেখে এসে হাত দুটি জোড় করল। 'পিটিয়ে কি দিদি, হুকুম হলে নিকিয়ে দিব.. যা ইচ্ছে। ই বেরৎ এক মুনিশ খাটা গো।' কানিঠাকরান আঁচলের গিঁট খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট ফেলে দিলেন, সে হাত জোড় করে বিনয়ে গ্রহণ করল। তারপর হাসল। 'ও দিদি, ই বস্তরখানার তো জাত যেয়েছে...যা দাম হয়, কেটেঞ লিবেন...'

নড়ি পেটের কাছে আসায় সে থেমেছিল। বিমলাবালা বাঁহাত তুলে বললেন, 'মস্করা?...বাঁদর! হাটু কবে ফেলে যেয়েছে.. বউমা থাকলে ন্যাকড়াকানি করত...দাম! শিগগিরি সামনে থেকে যা...কাল সকাল-সক্কাল আসবি।'

সোনারু ঝটপট বেরিয়ে গিয়ে তার শুকোতে দেওয়া লুঙ্গিটি পরখ করল। একটু স্যাঁৎসেঁতে হয়ে আছে এখনও। নোটটি কোমরে লুঙ্গির ভাঁজে গুঁজে সে আগে সন্ন্যাসী চুল চুড়ো করে বাঁধল। তারপর কাঁধে শুকোতে দেওয়া লুঙ্গিটি ঝুলিয়ে অষ্টশিবের মন্দির ও ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকল। গুনগুনিয়ে গাইছিল, 'যায় ইসা পৈগাম্বার/সঙ্গে লয়ে দিনদার...'

মরিয়ম পুত্র পয়গম্বর ইসার প্রতিভাস দিনের শেষবেলায় দক্ষিণডিহির এই জনহীন খণ্ডহরে, এবং সে, এক চোইত পাগল, গাইছিল, 'আমি মৈরমের ব্যাটা/আমার নাই চাটিপাটা/আমার ঘর দুনিয়া সংসার।।'...সে এলোমেলো পা ফেলে অন্যমনস্ক হাঁটছিল। দু-হাত ভাঁজ করে দুই কাঁধে পিঠ-ঢাকা ঠাণ্ডা লুঙ্গিটি আটকে রেখেছিল। সহসা কেউ কোথাও তাকে ডাকল, 'অ্যাই পৈগম্বর ইসা!' সে থেমে গেল এবং নালার ওধারে ভানুকে দেখতে পেল। ভানুর মুখে শীতল একটু হাসি, সে হাত নেড়ে ডাকছিল। দেখামাত্র গতরাতের ঘটনাটি স্মরণ হল। নেতাজি কলোনির কাছে নালার বাঁশের সাঁকোটি পেরিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল। সে লম্বা পায়ে কলোনি এলাকার দিকে চলতে থাকল এবং যতবার ঘোরে, ভানুর শীতল হাস্য আর হাতনাড়া দেখতে পায়। তারপর সে প্রথমে ঘুড়া, পরে পংখিরাজ হল। সে কলোনির ভেতর দৌড়ুচ্ছিল। জাতীয় সড়কে পৌঁছে একবার থেমে বাঁদিকে নালা-বরাবর লক্ষ্য করেছিল। ঝোপঝাড়ের আড়ালে ভানুকে দেখতে পাচ্ছে মনে হয়েছিল। আতঙ্কে সে মহাসড়ক পেরিয়ে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে, গুঁড়ি মেরে, শ্রেণীবদ্ধ গাছগুলিনের আড়ালে ছুটে যাচ্ছিল। দিন শেষের এই গাছগুলিন এখনও শোকসঙ্গীতের স্বরলিপি হয়ে আছে, কারণ পান্নার মৃতদেহবাহী ট্রাক ও শোকমিছিল তাদের পাশ দিয়ে গেছে।

দুপুর থেকে পান্নার কবর খুঁড়তে খুব কষ্ট, গোরস্থানের মাটি বড় দড়, ঘুটিং ও কাঁকরে মিশ্রিত। কয়েকখানা কোদালের দাঁত ভোঁতা, পরে গাঁইতি আনা হয়। পান্নার আত্মার জন্য প্রার্থনা 'জানাজা' নামাজে কয়েকশ অথবা কয়েক হাজার মুসলমান লোক, তাদের ভেতর অসংখ্য জানমারিও ছিল, এই সমাবেশ দক্ষিণ-ডিহিতে রেকর্ড। প্রার্থনা শেষ হলে সদলবলে ছোটনকে রাস্তা দেওয়া হয়, বস্তুত মোজেস—পয়গম্বর মুসা যেভাবে রেড-সিকে যষ্ঠির দ্বারা দুভাগ করেছিলেন, সেইভাবে। আর কাফন খুলে যখন পান্নার মুখ দর্শানো হয়, তখন ছোটন...

'ছোটনবাবু কাঁদলে হে, পেত্যয় হয় না', নেয়ামত চোইতপাগলকে পিরের কিরে দিয়ে বলছিল এ কথা। সোনারু, চোইতপাগল, তখনও ভানুর কথা ভেবে সন্ত্রস্ত, গোরস্থানের বৃত্তান্তে তার কান ছিল না। মোহরা খাতুন বার-বার তাদের পাশ দিয়ে ছাদের ঘরে যাচ্ছিল, নেমে আসছিল। বাড়ির দুদিকের দরজা ভেতর থেকে হুড়কো দিয়ে আটকানো ছিল। 'রাজায় কাঁদলে পোজায় কাঁদে, নেয়ামত বাঁকা হাসল। 'তা' পরে ছোটনবাবু চলেঞে যেল...উ তো পাবলিকে থাকে না হে...ক'বার দেখেছ বোল?' সে কণ্ঠস্বর চেপে বলল, 'টেনগাং লিয়ে বোডিগাড সঙ্গে...পিরের কিরে, চলে যেল পুব মাঠ দিঞে, যেন বাঘহাঁটা হে!' তার মুখে সেই দেখার বিস্ময় ফুটে উঠেছিল। পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করছিল, 'বাঘহাঁটা...বাঘহাঁটা।'

এতক্ষণে চোইতপাগল আস্তে বলল, 'শালা ভানু...'

'ভানুও ছিল!' নেয়ামত উত্তেজনায় ছটফটিয়ে বলল। 'ছিল উ। উ পাষাণ, কাঁদে না।' সে উত্তেজনাদমনে বিড়ি ধরাল দ্রুত। ফুক ফুক করে টানতে থাকল।

মোহরা খাতুন আবার ওপরে গেল। সোনারু মাটিতে আঁচড় কাটছিল। 'ভানু আমাকে ডাকছিল,' অন্যমনস্ক বলল। তারপর সরু দাঁতে অনিচ্ছাকৃত হাসল। 'কাল রেতে শালার হাতে কামড়ে দিঞেছি...চাকু লিঞে কাটতে এল...এখুন আবার ডাকে...হাত লাড়ে' বলে সে হাত নাড়াটি দেখাল, অবিকল।

নেয়ামত বলল, 'গলাকাটা, গলাকাটা! উয়ার বাপ একশ আট পাঁঠা বলিদান করত...চোখে ভাসেঞে হে!...কি বেরৎ খাঁড়া...জানমারি বংশ!' সে বিড়িতে সুখটান দিল। তারপর ধোঁয়ার সঙ্গে ফিসফিসিয়ে উঠল, চোখের ঝিলিক ঊর্ধ্বে ছাদের ঘরের দিকে, 'ইদিকে এক কাণ্ড। চুনি...ফাঁসাতো! কি কত্তাম ভেবেই পাই না হে.. গলায় দড়ি দিঞেছিল...দড়ি ছিঁড়েঞে...' চোইতপাগল বড় চোখে তাকাল, ভীষণ চমকে উঠেছিল এবং নেয়ামত স্বভাবজ বায়ুকণ্ঠে বলতে থাকল, 'গোরুর দিকে চোখ...ঢনঢন আওয়াজে কানে এসেঞে ছিল বটে...টিন! টিন!' সে উঠোনের কোণে আবছা আলোয় পেয়ারাতলায় রাখা টিনটিকে দেখাল। টিনটিকে ধুয়ে আনা হয়েছে এবং দুগাছা ছেঁড়া দড়ি পিরের থানের জঙ্গলে বিসর্জিত। 'টিনটো ছাতে ছিল...কি সাওস হে। টিনে চঢ়িন...' মোহরা খাতুন নেমে আসায় সে থেমে গেল। মন দিয়ে বিড়ি টানছিল। মোহরা উঠোনে গেলে সে ফোঁস শব্দে বলল, 'খুব বাঁচা...খু-উ-ব!'

বুঝদার চোইতপাগল ছটফট করছিল। 'বুকা রি!...তোর লেগে ঘুড়া হএ্রেছিল ই খ্যাপা... পংখিরাজ হএ্রে উড়েছিল রি!' তার চারপাশে হাজার-হাজার পাখি ওড়ার শব্দ। চুড়োবাঁধা চুল খসে পড়েছিল, বাঁধতে লাগল, যেন হাতের কাছেই কিছু কাজ আছে। তারপর খ্যাপা-খ্যাপ্ত বলল, 'দুধ দিএ্রে সাপ পুষা...কালসাপ...লিজেকে লিজে ডংশায়।' সকল কথাই সে চুনিকে ছুড়ে-ছুড়ে মারছিল। তার চতুর্দিকে হাজার-হাজার চুনির পাখিওড়া।

নেয়ামত তার মতিগতি লক্ষ্য করে কথা বদলাল। 'একটো কথা ভাবি হে! মা খাকি' বলে সে মাটিতে হাত স্পর্শ করল, ক্যানে মা খাকি, এই মাটি পান্নাকে বুকে লিতে চাহেএ্র নাই? কত-কত কবর খুঁড়েছি, এমন দড় মাটি দেখি নাই...পাষাণ পাথর...ঘা পড়েএ্র আর ঠনাৎ করে আওয়াজ দেয়, ঠাঁই দিব না...ঠাঁই দিব না।'

মোহরা খাতুন আলো এবং আঁধার মাপছিল উঠোনে দাঁড়িয়ে। খিড়কি ফাঁক করে মাঠের দিকটাও মেপে এল। আস্তে বলল, 'মটোরগাড়ি আসতে দেরি আছে...মুখ আঁধারি না হলে তেঁতুলতলায় আসে না।' তার বাপের বাড়ি যেতে এই সন্ধ্যার ট্রিপ বরাবর বাঁধা, কারণ দিনব্যাপী সংসার সামলে রাতটুকুনের জন্য মাসে একটা দিনও বাপের গাঁয়ে যায়। ভোরের ট্রেনের প্যাসেঞ্জার নিয়ে তার বাপের গাঁয়ে বাসটি পৌঁছুতে রোদ ফোটে। সে বিশদ জানে এই বাসটির গতিবিধি। পিরের থানের বটতলার শীর্ষে নক্ষত্রটি সবে জুগজুগ করছিল। সে নক্ষত্রটিকে দেখতে থাকল, যেটি ওই বাস-সম্পর্কিত।

তার পুরুষ মন্তব্য করল, 'চাঁদ ঘড়ি মেঁরে উঠবে...অনেক দেরি।' সে কৃষ্ণপক্ষের দেরি করে ওঠা চাঁদের কথা তুলে নিরাপদ ঘন অন্ধকারের উল্লেখ করতে চেয়েছিল। তার মোটেও ইচ্ছা নেই আসন্ন চোরাপাচারে সহগামী হয়। সে সোনারুর প্রতীক্ষায় ছিল এবং বটতলা থেকে তাকে আসতে দেখামাত্র খুশি হয়েছিল। পান্নার কবর খোঁড়ার ঘটনাটিকে ভয়াবহ তাৎপর্য দিয়ে বর্ণনা করে চোইতপাগলকে বস্তুত বোঝাতে চেয়েছিল, মা বসুমতী, যা মুসলমান লোকের 'মা খাকি', ইসমাইল হোসেনের বংশজাতদের প্রতি রুষ্ট ও নির্মম। এই মাটি তাদের থল দেবে না। এতক্ষণে তার বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক বাসের কথা তোলায় সে অন্ধকারের প্রকারান্তর বর্ণনা করছিল, যা সোনারুকে উৎসাহ দেওয়ার অভিসন্ধি মাত্র 'ঘড়ি মেরে চাঁদ উঠলে' আঁধারও বড় দৃঢ় হয়...কিন্তু তুমি রাতচরা হে! ইদিকে দ্যাখো, আমি একটুন রাতকানা...দু-পাঁচ হাত তফাতে লজর হয় না...'

তার স্ত্রীলোকের কানে গেলে চাপা গজরানিতে 'আঁচল ধরা...লোকে কি মিছা বোলে? আমার মরদ রে' এই তীব্র শ্লেষ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মোহরা খাতুন কয়েক পা এগিয়ে তর্জনী তুলল। 'তুমি উয়ার সঙ্গে যাবা! ইস্টিশেনে টেরেনে চাপিন দিবা... রেক্শা চেপেএ্র পাটাগুায় আসবা...' পাটাগুা তার বাপের বাড়ি এবং তার পুরুষটির শ্বশুরবাড়ি, স্টেশন থেকে সামান্য দূরত্বে।

নেয়ামত চুপ করে গেল। সোনারু আবার অন্যমনস্ক হয়েছিল। আস্তে বলল, 'আম্মো যেতাম। কিন্তুক ভোরবেলাতে কানিঠাকরানের মুনিশ...এই বস্তর দিলেএ্র, পাঁচ টাকার লোট দিলে।' সে নোটটি বের করে দেখাল। 'ইটা উ বিটিকে দিব...উয়ার হাতখালি।' বলে জোরে শ্বাস ফেলল। ক্রমাগত অন্যমনস্কতা তাকে দূরের মানুষ করছিল। যেন বহু দূর থেকে সে কথা বলছিল, এমন কণ্ঠস্বর।

'ভাসুর, তুমি চাট্টি ভাত খাও' বলে মোহরা খাতুন ব্যগ্র হল। সে বোঝে, চোইতপাগলের প্যাটজ্বলা না থাকলে সে আরও বলশালী ঘুড়া হয়, শক্তিমান পংখিরাজ হয়, গতরাতে তার আবিষ্কার।

কিন্তু সোনারু-ভাসুর জোরে মাথা দোলাল। বলতে দ্বিধা নেই যে, সে কানিঠাকরানের অন্ন খেয়েছে, সে 'বড়ই খ্যাপা।' তাই যেখানে পায়, ভোজন করে এবং সে 'মা দুগ্গির চালির ছামুতে লাচ' করেছিল। বলল, 'আমি মুনিশ খাটা রি! মুনিশ খেটেএ্র খাই...খাব।' এটি সংকেত যে, সে চুনিকে বাসে তুলে দিয়ে ফিরে আসবে এবং মোহরার অন্নগ্রহণ করবে। এমন কি, সে আজ এই বাড়ি পাহারা দিতেও রাজি, যেখানে এই রাতে কোনও পুরুষ থাকবে না। তবে একথাটি এখন বলা উচিত মনে করল না।

মোহরা খাতুন খিড়কির বাঁশবাতার কপাট আবার সাবধানে ফাঁক করল এবং উঁকি মেরে বাইরে চারদিক দেখে নিল। বাঁদিকে পিরের বটতলা, ডানদিকে উঁচু পাড় এক পুকুর। পাড়ে গুল্মগুলিনের

আড়ালে এখন মাঠ-সারতে আসা স্ত্রীলোকগুলিনের থাকার সম্ভাবনা, তারা ঘাটে নেমে শৌচকর্মের পর বাড়ি ফিরবে। সামনে পশ্চিমের মাঠে ধূসরতা, দূরে কুয়াশায় মহাসড়কের ধারে শোকসঙ্গীতের স্বরলিপিবৎ শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরেখা আবছা হয়ে আছে। আশেপাশের বাড়িগুলিন ঘোর স্তব্ধ। বহু পুরুষ ও স্ত্রীলোক এখন পান্নাদের কলিয়ানে ও বাড়িতে গিয়ে ভিড় করেছে, বরাবর এটাই রীতি। তবে পান্নার জানমারিতে শুধু নয়, ছোটন-নির্মীত বিশাল শোকস্থাপত্য দর্শন করে পাড়াটি অভিভূত। নেয়ামত গোরস্থান থেকে ফিরেই ঘোষণা করেছিল, 'আর নামুপাড়া মাথা তুলতে 'পারবে না, দেখেঞ লিও...'সেকথা মোহরা খাতুনের সত্য মনে হয়।

দুই পুরুষ ততক্ষণে পুবের মেঘখণ্ডগুলিনের কথা বলছিল। উভয়ে একমত যে, বর্ষণ অদূরে এবং চোইতপাগলের অতিরিক্ত মত, 'রেতে বর্ষালে ঠাকরানদিদির উঠানের দড় মাটি লরম হবেঞ...কোপ লিবেঞ।' একথায় নেয়ামত সায় দিয়েও কুণ্ঠিত মন্তব্য করছিল, 'কানিঠাকরান বখিল হে, যতই বুলো। উয়ার ব্যাটা পুলিশ। ঘুশ খায়। লকশাল মেরেঞ ছিল হে...শুনা কথা। কনোসটোবলের পুলিশ...উয়ারাই তো গুলি মারেঞ...' সোনারু দাওয়া থেকে গুড়ি মেরে আকাশ দেখে বলল, 'ইবার মেঘারা গুলি মারুক...ওই! ওই মাল্লে...চিড়িক চিড়িক!' এটি রগড়। ক্রমশ সে নিজস্ব ফর্মে ফিরছিল।

মোহরা খাতুন এসে ঘরে ঢুকেছিল। স্বামীর কাছে দেশলাই নিয়ে লম্প জ্বালল। সে ভাত বাড়তে ব্যস্ত হল। মৃদুস্বরে পুনঃ অনুরোধ করছিল চোইতপাগলকে, 'তুম্মো দুটি মুখে দ্যাও, ভাসুর!' ভাসুর দ্রুত বলল, 'কাজ শ্যাষ করি, তাপরে...মুনিশখাটা...বুঝিস না রি!' নেয়ামত গম্ভীর মুখে উঠে হাত ধুতে গেল।

অপর থালার ভাত-তরকারি এবং লম্প নিয়ে মোহরা ঊর্ধ্বগামিনী হলে নেয়ামত তার থালাটি নিয়ে দাওয়ায় এল। আবছা আঁধারে ভাত খেতে তার আপত্তি ছিল না, কেরোসিনের আকাল পড়লে এভাবেই সন্ধ্যার মুখে খাওয়া সেরে নিতে আঁধার ঘন হয়, কিন্তু এখন খারাপ লাগে। সে বাইরের তাকে রাখা হেরিকেনটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। এই সোনারু কি আর খ্যাপা, তার বউটি সত্যিই 'খেপি...বেরৎ খেপি' এবং কথাগুলিন বায়ুকণ্ঠে উচ্চারণও করল। চোইতপাগল ভেবেছিল চুনির কথা, ফলে সায় দিল, খেপি...বেরৎ খেপি!' এতে নেয়ামত রুষ্টভাবে শুধু বলল, 'কথা বুঝ না হে।'

তখন ছাদের ঘরে পা ছড়িয়ে বসে চুনির মুখে জোর করে অন্ন গুঁজে দিচ্ছিল মোহরা খাতুন, জননীর হাতে। মাঝে মাঝে তার চোখ মুছিয়ে দিচ্ছিল। বলছিল, 'ঝড় বহেঞ, বান ভাসায়, ভুঁইকম্প হয়, কত কারবালার লোহু ঝরেঞ...বুন রি! আকালে প্যাটে কাপুড় বেঁধেঞ মানুষ-বাঁচা বেঁচেছি...সব ঠাণ্ডা হঞে যাবে রি! কটা দিন মামুর বাড়ি থাকবি, তোর মাকে খবর দিবো... সুময়কালে আবার বাড়ি আসবি।'

চুনির গলায় এখনও ব্যথা। বারবার ঢুক ঢুক করে জল খাচ্ছিল। বুঝতে পেরে মোহরা খাতুন ভাতগুলিন দলে নরম করছিল। লম্পটি দূরে এবং শাদা পোকাগুলিন শরৎ রাত্রে প্রাকৃতিক উপদ্রব।

আট

পান্না কবরে চির-শোওয়া শুতে গেল, এতে উত্তরাধিকারটি স্বভাবত ভাকাকে বর্তায় এবং শূন্য সিংহাসনের আশেপাশে সে গতকাল দুপুর থেকে এই দিনান্তকাল অবধি প্রায় তিরিশ ঘণ্টা ঘুরেছে, বোঝাতে চেয়েছে সে পান্নার চেয়ে বিরাট-বিরাট কীর্তি স্থাপনে পটু, কিন্তু পাকাপাকিভাবে সিংহাসনে ওঠার জন্য শুধু ছোটনবাবুর স্বীকৃতিটুকুর অপেক্ষা। ছোটনবাবু সদলবলে যখন গোরস্তানে পান্নার মুখদর্শনে যায়, তখনই ভানু আভাস দিয়েছিল, একটি জরুরি বৈঠক বসবে, স্থান ছোটনবাবুর প্রমোদকক্ষ কাল সন্ধ্যা ছটা। এলাকার পাঁচ-দশ জানমারি-নেতা বৈঠকে থাকবেই, ভাকা বুঝেছিল। গোরস্তান থেকে ফিরে সে জিনস, লাল শার্ট, কাউবয় জুতো, সকলই বৈদেশিক, দ্রুত গায়ে চড়ায় এবং সহসা তার আত্মায় পান্নার আত্মাকে আবিষ্কার করে। স্কুল ফাইনালের ড্রপআউট তরুণ জানমারি বারু তাকে প্রশংসা করে, 'খুব ফিট করেছে।' ডাঙ্গাপাড়ার সেরা জঙ্গিগ্রুপটি তাকে অনুসরণ করেছিল, যেভাবে পান্নাকে তারা অনুসরণ করত প্রতিবার জানমারি ঘটনার পরে। সকলেই সশস্ত্র ছিল। আর ভাকা পান্নার ভঙ্গিতে

পা ফেলছিল, যদিও সে পান্নার চেয়ে বেঁটে, গায়ের রঙটি চাপা, পান্নাসদৃশ উজ্জ্বল যুবাপুরুষ নয়। কিন্তু নাকটি বাঁকা, চৌকো চোয়াল, দেখনশিরি গোঁফ। তাকে এমনিতেই যথেষ্ট হিংস্র দেখায়, এই দিনশেষে তাকে আরও হিংস্র দেখাচ্ছিল, বিশেষত সে পান্নাকে অনুকরণের চেষ্টায় নিজেকে ভয়ংকর বিস্ফোরক প্রতিপন্ন করেছিল অনুচরদের কাছে। নালার ওপর নেতাজি কলোনির বাঁশের সাঁকোর কাছে দলটি ভানুকে দেখে থামে এবং ভানুর শীতল চন্দ্রবোড়া-মুখে ক্ষীণ হাসি ছিল। ভাকা বলে, 'ই কি হে? তুমি মিটিংয়ে থাকছ না, সেন্টারে যাও...ঘুরো, ঘুরো!' সে ভেবেছিল ভানু ইরিগেশন সেন্টারগামী, সেও সত্য। বস্তুত একটু আগে চোইতপাগলকে নালার ওপারে দেখে ভানুর হাতের সূক্ষ্ম ক্ষতচিহ্নটি ক্যান্সারকোষে পরিণত হয় এবং কাজিরুনের তথ্যগুলিনও তাকে ততক্ষণে গরম করেছিল। সে ছোটনের কাছে নির্দেশ না পেলেও একটা নিষ্পত্তি করে ফেলত, যদি চোইতপাগল তার কাছে আসত। পুনঃ ভাকা তাকে বলে, 'কি দেখ হে...কিসের হাসি...নাকি আমি এই শাট পিন্ধেছি, তাই দেখ, তুমাকে বুঝা কঠিন হে!' ভাকা পান্নার হাসিও অনুকরণ করেছিল এবং তার হাত ধরে টেনেওছিল। এই সময় শ্বাসের সঙ্গে ভানু বলে, 'তোমাদের ইসা পৈগাম্বার গেল হে, দেখছিলাম।' তার হাসিটুকু মুছে গিয়েছিল। তার চোখদুটি পিঙ্গল, সে বিড়ালচক্ষু, পশ্চিমে তর্জনী তুলল, এবং দৃষ্টিও ওই দিকে। দেখে নিয়ে জানমারিরা পরস্পর মুখ তাকাতাকি করছিল। ভাকা বলে, 'ই কথার মানে বুঝি না...তুমার সকল কথায় ধন্দ...ঘুরো। ছোটনদার মিটিংয়ে চল!' ভানু তাদের সঙ্গ ধরে। ইসা পৈগাম্বারের গানটি তার মাথার ভেতর ভনভন করছিল। নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোটি সাবধানে একে-একে পেরিয়ে যায় জানমারিরা। কলোনির প্রান্তিক আলপথে হাঁটতে হাঁটতে অগ্রবর্তী ভানু সহসা 'ইসা পৈগাম্বার' পুনরুচ্চারণ করে। তখন ভাকা বিরক্ত হয়ে বলে, 'কি খালি ইসা পৈগাম্বার ইসা পৈগাম্বার কর...তুমার আদ্ধেক কথা প্যাটে, আদ্ধেক মুখে।' তাকে এবং দলটিকে নিয়ে খেলা করার ভঙ্গিতে ভানু বলে, 'কি গান মাইরি।' এতে আরও বিরক্ত ভাকা পাষাণপাথর স্তব্ধ হয়েছিল। অষ্টশিবের মন্দির ও ধ্বংস স্তূপগুলিনের ভেতর শুধু বারু একবার প্রশ্ন করেছিল, 'কার গান ভানুদা?' জবাব না পেয়ে সে হাসতে হাসতে বলে, 'ভানুদা কাক দেখেঞ্ছিল! বুঝা যায়, আবার যায়ও না।' আসলে সে টুঁড়ে হন্যে হচ্ছিল।...

ছোটনের প্রমোদকক্ষের ভেতরে-বাইরে এলাকার জানমারি-নেতারা কেউ চেয়ারে কেউ মোজেককরা মেঝেয়, এবং ভেতরে যথানিয়মে নীলবাতিটি জ্বলছিল, যাতে রহস্যময় দেখায় ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট রবিনহুড বা রবিন-হুদকে। সে শুভ্রাংশু, দাদা অরুণাংশুর কারণে তার ছোটন উপনাম এবং অরুণাংশুর অকালমৃত্যুর পরও সে আদরে 'ছোটন' থেকে গিয়েছিল। ভাকা-গ্রুপ স্থানীয়তার দাপটে ভেতরেই ঢুকেছিল, আর ছোটন আস্তে বলেছিল, 'আয় ভাকা', তারপর নিচু টেবিল থেকে বৈদেশিক সিগারেট অফার মুহূর্তে ভাকাকে প্রার্থিত রেকগনিশন দিল। সেই সিগারেটে টান দিয়ে অতর্কিতে ভিডিও সেটটির পাশে জড়সড় কাজিরুনকে আবিষ্কার করে ভাকা হুঙ্কারে বলেছিল, 'মাকুচালানি...', প্রচণ্ড বিস্ময়ে সে ছোটনের ক্ষমতা আঁচ করেছিল, কাজিরুন খাঁচায় বন্দী! কিন্তু ছোটন হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়েছিল, ফলে পরবর্তী অনিবার্য 'মাগী' শব্দটি ভাকা গিলে ফেলে।

ভোলা, বাবু পরিতোষকে উরুভাঙ্গা দুর্যোধনে পরিণত করায় সে এতদিনে একটি চেয়ার পেয়েছে, যেটি গদিআঁটা, ভাকার বিস্ময়মোচনে মুখ খোলে। "গোবিন্দ...সিঙ্গিবাবুদের গোবিন্দ হে, হুন্নার শালা হয়। হুন্নাকে বলেছে, কাল রাতে চোইতপাগলা...সোনারুহে, শালার পিঠে পান্নার বোন ছিল...সেন্টার চাইতে যেয়েঞ্ছিল সিঙ্গিবাড়ি। অরুসিঙ্গি সাহস পায়নি।' কথা শেষ হতে না হতে কাজিরুন ফোঁস ফোঁস শব্দে, বহু কান্না ও কৈফিয়তে স্বরভঙ্গ, জড়িয়েমড়িয়ে বলতে থাকে, 'ও বাপ ভাকা, তুরা আমাকে দুষিস...ওই খ্যাপা, খ্যাপা সেজে থাকে, উয়ার প্যাটে প্যাটে বুদ্ধি... তার ফুঁসে চুনি বোমগুলিন মাঠপুখোরে ফেললে...আমি ভাল জানি না, মন্দ জানি না...' সে এক নাক ও চোখে পর্যায় ক্রমে আঁচল ঘষতে থাকে এবং ভাকা চার্জ করে 'চুনির খবর? চুনির খবর?' কাজিরুন ঠোঁট ফাঁক করলে ভানু তাকে থামায়। যে-হাতটি তুলেছিল, সেই হাতের পিঠে ক্ষতরেখা ছিল। আস্তে বলে, 'ফুলকুঁড়ির কাছে আসগারকে পাঠিয়েছিল ছোটনদা। আসগার, বল্ নারে!' সে অন্যহাতের বুড়ো আঙুলে আসগারকে খোঁচা মারে। আসগার আগেই এসেছে লক্ষ করে ভাকা ঈষৎ রুষ্ট। পুনঃ চার্জ করে, 'কি ফুলকুঁড়ি-

টুলকুঁড়ি...শালা মাথায় আগুন চড়েঞ যায়... বোল্, শুনি।' আসগার সোনারুর ঘোড়া হওয়ার এপিসোডটি কিভাবে ফুলকুঁড়ির কাছে আদায় করেছে, বিস্তারিত বলতে থাকে। তার কথা শেষ হলে পাশের গ্রামের জানমারি-নেতা কাদির মন্তব্য করে, 'চুনি ই গাঁয়ে নেই...যে-যার গাঁয়ে খবর লিব...পাব। যাবে কতি?' তার মুখে ও কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ছিল। এই দৃঢ়তাকে ডাবল এজেন্ট ভিন্নমাত্রা দিল, 'খ্যাপা...খ্যাপা সেজে থাকে...চেপে ধর্ বাপ! সব পাবি, স-অ-ব।'

ভাকা গরম শ্বাস ছাড়ে। তারপর ছোটনের দিকে ঘোরে। 'তুমি কি অডার কর, ছোটনদা, শুনি।' বলে সে মহার্ঘ সিগারেটটিতে লম্বা টান দেয়। আর ছোটন একটু হাসে। 'আমি কি বলব? তুই কি করিস, দেখি।' সে উঠে পেছনকার দেয়ালে সেলারের সামনে দাঁড়ায়, খোলে, থাকে-থাকে থরে-বিথরে সাজানো নানা গড়নের বোতলগুলিন পরিদৃশ্যমান হয়, সকলই বৈদেশিক, দূর-দূর সীমান্ত অঞ্চল থেকে এগুলিন ছোটনের কাছে ভেসে আসে, জাতীয় সড়কের প্রায় আঠারো কিলোমিটার অংশ তার শাসনাধীন, দূরপাল্লার ট্রাকচালকরা তাকে উপঢৌকন দিয়ে থাকে, নতুবা টায়ার ফেঁসে যাবে, শতাধিক রিকশোচালক এবং কৃষিতে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার তরুণ প্রজন্ম তাকে নেতা জানে, এমন কি খেতমজুর সমিতিগুলিনও মুক্তির দশক-সূত্রে তার প্রতি কৃতজ্ঞ, যে-প্রতিক্রিয়ায় বড় ও মাঝারি কৃষকও তাকে ট্যাক্স দেয়, সে রবিনহুড বা রবিন-হুদ, ইতিমধ্যে বহু মিথ তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, দুটি লম্বা বোতল নিচু টেবিলে রাখলে জঙ্গিনেতৃবৃন্দ চঞ্চল হয়েছিল। সুদৃশ্য গেলাসগুলিন ক্রমে অবতরণ করে। সকলেই সহযোগী হতে থাকে, এভাবে অন্তঃপুরের ফ্রিজ থেকে জলের ঠাণ্ডাহিম বোতলগুলিনও আনা হয়, চানাচুরের প্যাকেট, পটাটোচিপসের প্যাকেট, সমস্ত প্রস্তুত ছিল, বরাবর এই ধরনের জরুরি বৈঠকে এটাই রীতি, এবং ভানু 'ওয়ান...টু...থ্রি' করে লোক গুনছিল তেইশজনের মধ্যে জনাচারেক করজোড়ে মাথা নত করে, এতে ভাকার মন্তব্য, 'ওহে, এমুন একটা দিন...গরম হও, গরম না হলেঞ চলে না হে' ওই নেতৃ-চতুষ্টয়কে টলাতে পারল না। অবশ্য ছোটন তাদের সফটড্রিংকস উপহার দিলে তারা বিনীতভাবে গ্রহণ করল। আর ভাকা-গোষ্ঠীকে লক্ষ করে ছোটন বলে, 'মাতাল হলে পাছায় লাথি খাবি। তোদের হাতে কাজ।' তারা কথাটি সম্যক বুঝেছিল।

কয়েকটি চুমুকের পর ভাকা কাজিরুনের তাহে একটা পটাটোচিপসের প্যাকেট ছুঁড়ে দিলে সে, ডাবল এজেন্ট, এতক্ষণে প্রাণের গ্যারান্টিলাভে খুশি, কাতর হেসে বলে, 'আমাকে বাড়ি পঁহুছে দে বাপ, আমার ছরত চলে না।' এই মদের আসরে সে ক্রমে আড়ষ্ট, খুব খারাপ লাগছিল, হতে পারে সে মাকুচালানি, মদ-নেশা-ভাং বিষয়ে তার নীতিবোধ আছে, নাকে কাপড় ঢেকে বসে ছিল। তার বিচারও শেষ, সে ছটফট করছিল। 'ছোটনবাবু, বাপ!' সে পুঁটুলিতে প্যাকেটটি ঢুকিয়ে ছোটনের দিকে হাত জোড় করল। তখন ছোটন বলল, 'আসগার, চাচিকে রেখে আয়।'

চাচি-শব্দটি নিমেষে কাজিরুনকে উদ্দীপিত করেছিল, সে পুঁটুলিটি বগলদাবা করে উঠে দাঁড়াল এবং মদ্যপায়ী জানমারিদের প্রতি ঘৃণাবশে, এককেটি ঘৃণ্য বস্তুকে বিন্দুমাত্র না ছুঁয়ে যেভাবে যত সাবধানতায় নির্গমন সম্ভব, সেইভাবে খোলা বারান্দায়, সেখান থেকে নিচের উদ্যানে সে গুঁড়ি মেরে নামল। তার সামনে এখন অবাধ স্বাধীনতা, জীবন, পুনরুজ্জীবন। তারপর উদ্যানের সান্ধ্য গন্ধপুষ্পগুলিন থেকে মউমউ সৌরভ ঝাঁপিয়ে এল, সে হাঁ করে শ্বাস নিল। খারাপগুলিনের পাশে এই দুনিয়াসংসারে ভালগুলিনও আছে, এভাবে কখনও-কখনও সে ভালগুলিনের আস্বাদ পেয়েছে এবং খারাপগুলিনকে ঘৃণায় পেছনে রেখে ভালগুলিনের দিকে সে আবছা আঁধারে তাকাল। বৃক্ষলতাগুল্মপুষ্পরাজি একাকার ছিল আবছায়ায়। সহসা নিঃশব্দ বজ্রপাতের চোখ-ঝলসানো আলো, সে চোখ বুজে ফেলেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য, অতর্কিতে কি ঘটল বুঝতে পারেনি, আর্তস্বরে ডাকল, 'বাপ আসগার আলি রে!' জাম্বু স্পটলাইটসদৃশ বাইরের বাতিটির সুইচ টিপেছিল, সে শুধু ছোটনের বডিগার্ড নয়, এই বাড়িটি, 'সরোজিনী ভবনের' ও সিকিউরিটি গার্ড, স্বল্পভাষী, একটু কাশল মাত্র এবং কাজিরুন চোখ পিটপিট করে ঘটনাটি বুঝে হাসবার চেষ্টা করল। 'চোখজ্বলা রে বাপ' কষ্টে উচ্চারণ করেছিল সে।...

একটু পরে ডাবল এজেন্ট পেছনে, সামনে আসগার, সে টর্চ জ্বালছিল বারবার, অষ্টশিবের মন্দির ও ধ্বংসস্তূপের ভেতর ঝলকে ঝলকে আলো, ডাবল এজেন্ট বলছিল, 'চোখজ্বলা, বড়ই চোখজ্বলা।' বিরক্ত আসগার বলল, 'বুঝনা গো, খালি চোখজ্বলা আর চোখজ্বল'...মানুষের হাতে জানমারি সহ্য যায়। মরলে সেইমরা মরি, পোকায় কেটে ক্যানে মরি...বুঝনা।' সে সাপের কথাই বলছিল। হিন্দু পল্লীর এই প্রত্যন্তে, খণ্ডহরে, সাপগুলিন কিংবদন্তি, যেহেতু শিবের সঙ্গে সাপের সম্পর্ক বিদ্যমান, বেহুলা-লখিন্দরের পালায় মনসা শিবনন্দিনী, এ বৃত্তান্ত দক্ষিণডিহি পরগণা বংশপরম্পরা জানে। কিন্তু ডাবল এজেন্ট কাজিরুনের দৃষ্টি আঁধারেই খোলে, সেও কম নিশাচরী নয়, কলোনির কাছে আলপথে ক্রমে দার্শনিকতায় ভারাক্রান্ত হল। বাঁদিকে পুবে প্রসারিত ধানক্ষেত এবং গাঢ় কালো মেঘের পাহাড়টি তার শিয়রে, প্রথমে অনুচ্চস্বরে বলল, 'বর্ষাবে...ছান্তি হবে' এবং পরে শ্বাসপ্রশ্বাসে জড়িয়ে বলতে থাকল, 'যত দিন যায়, ক্রেমে-ক্রেমে ছান্তি সরে যায়...ওরে! মানুষ...কে কখুন মরে...তু মরার কথা বুলছিলি, বাপ...কে মরে কে বাঁচে...আবার দ্যাখ, কাউরি বাঁচা-মরায় ফারাক নাই...আমি বুলি কী, এক মলে যদি দুই বাঁচে...মরুক!' সে শেষ শব্দটি স্বরভঙ্গজনিত কারণে নয়, ইচ্ছে করেই ছ্যারাভ্যারা করে দিল, অবিকল তার কুখ্যাত দুরমুষটির আঘাত শোনা গিয়েছিল।...

তৎকালে ছোটনের প্রমোদকক্ষে ভাকার 'শরিল' যথাযথ গরম এবং ভানুর দিকে তাকিয়ে বাঁকা হেসে বলছিল, 'তুমার খালি ইসা পৈগাম্বার, ইসা পৈগাম্বার...চুপো হে! আমার কথা শুনো। 'মৈলবির কাছে শুনা, খুদা তাকে আসমানে উঠিন লিঞেছিল...ই শালোকে কে উঠায়? ...মা দুগ্গির চালির ছামুতে লেচেছিল...শালোর মাথায় তুমাদের সাধুবাবার চুল...মোসলমানের খুদা অকে লিবে না হে', সে রগড়হাস্যে নড়তে থাকল। তারপর ছোটনের দিকে ঘুরে বলল, 'তুমি বুলেছ আমি কি করি...ই ভাকা কি করে! ...ছোটনদা, উ খ্যাপা তো আমিও খ্যাপা...আর মাকু চলবে না।' তার দাঁত-পেষাই বাক্যে একটি উত্তুঙ্গ কীর্তিস্থাপনের অঙ্গীকার ছিল, বহু-বহু প্রজন্মের স্মরণযোগ্য কীর্তিস্তম্ভ।...

প্রাক্তন অধ্যাপক, যিনি মুক্তির দশকে অধ্যাপনা ছেড়ে ল অ্যান্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন এবং আজ পূর্বাহ্নে বলেছিলেন, 'হালারে একবার দর্শন না কইরা যামু না', প্রস্তাবিত পিস কমিটির গোড়াপত্তন করতে করতে পুনঃ পুনঃ ঘড়ি দেখছিলেন এবং থানার দেয়াল ঘড়িটিকে 'ফালাইয়া দ্যান না ক্যান' বলে নিজের রগড়ে নিজেই অট্টহাস্য করছিলেন। ধরে আনা দ্বিপদগুলিনের মধ্যে সেই জনৈক নবীনচন্দ্র পিস কমিটির কনভেনার এবং হাজি গফুর আলিকে চেয়ারম্যান হতেই হবে, আমতা-আমতা করে 'এমনি মিটে যাবে স্যার...দখিনডিতে লতুন কি' বলেও নিস্তার ছিল না। সভার দিনক্ষণ স্থির করে মিটিং ভাঙ্গতে রাত আটটা, তখন হাই তুলে প্রাক্তন অধ্যাপক স্থানীয় বড়বাবুকে বলেন, 'চলেন, যাই গিয়া...দর্শন করি।' চিন্তিত বড়বাবু আস্তে বলেন, 'চলুন। তবে... শুওরের বাচ্চা বড় হুইমিজিক্যাল। ইচ্ছে হল তো দেখা করল, নয় তো বলে পাঠাল, ব্যস্ত।' কথাগুলিন পার্শ্ববর্তী অধস্তনদের কান বাঁচিয়ে বলেছিলেন, দক্ষিণডিহি থানায় কে কার ইঁদুর, বোঝা কঠিন। বেরিয়ে গিয়ে জিপে বসে স্টার্ট দিয়ে তিনি উর্ধ্বতন অফিসার প্রাক্তন অধ্যাপককে ব্যাখ্যা করেছিলেন, 'কাগজে-কলমে হান্ড্রেড ফর্টি ফোর...কিন্তু মুসলমান লোকের ফিউনারাল প্রসেশন আটকানো যায় না...দে হ্যাভ এভরি রাইট টু অ্যাটেন্ড দা রিচুয়ালস, স্যার...স্বচক্ষে তো দেখলেন, হোয়াট ক্যান উই ডু? স্যার, দিস ইজ দা প্রব্লেম।' প্রাক্তন অধ্যাপকের মন ছোটনের দিকে, গম্ভীর, জাতীয় সড়কে পৌঁছে শুধু 'হঃ' করলেন। দুধারে দোকানপাট বন্ধ, শুধু পুলিশ এবং আধাসামরিক প্রহরীদের চায়ের যোগান দিতে দুটি বা তিনটি চায়ের দোকান খোলা। প্রাক্তন অধ্যাপক জটলাগুলিনকে লক্ষ্য করে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মর্নিংয়ে অর্ডার পাস কইরা ডিসপার্স করাইয়া দিমু, কি কেন? রেডিও মেসেজ ইজ এনাফ। পিস কমিটি কইরা দিছি, আর কি?'

আজ আপ-ডাউনে বহুদূর অবধি বড় এক জানমারির খবর গেছে, ফলে ট্রাক চলাচল কম। একটি-দুইটি বাস স্টপেজে সাবধানে থেমে চলে যাচ্ছে। বন্ধ দোকানের গায়ে কুকুরগুলিনের ছায়া বিশাল হয়ে পড়ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। দুধার থেকে জিপটি স্যালুট লুঠতে লুঠতে যাচ্ছিল। বাঁদিকে ঘুরে একটি সুরম্য গেটের কাছে পৌঁছে বড়বাবু বললেন, 'আপনি বসুন স্যার, দেখি আগে।' প্রাক্তন অধ্যাপক বেটন হাতে অবতরণ করে জিপের পাদানিতে এক পা রেখে সেই পায়ে, হাঁটুর নিচে, মৃদু-মৃদু বেটন ঠুকছিলেন,

অভ্যাসে। দেখলেন, সহসা গেট ঝলসে বাড়ির শীর্ষ থেকে স্পট লাইট, বড়বাবু এবং গেটের গরাদের ওধারে একটি কালো গরিলা, প্যান্ট-গেঞ্জিপরা বিকট দর্শন প্রাণী। প্রাক্তন অধ্যাপক রুষ্ট, এধরনের বেসরকারি পেশী প্রদর্শনী বিহারমুলুকে দেখেছেন বার দু-তিন, ওয়েস্টবেঙ্গলে কল্পনাতীত ছিল। গেটের দিকে পা বাড়ালেন, পাল্টা রাষ্ট্রীয় পেশী প্রদর্শনের জেদে। তখন বড়বাবু চাপা স্বরে বললেন, 'স্যাম্পেল...দেখলেন? তবে স্যার, শুভ্রাংশবাবু ইজ রিয়্যালি আ ভেরি চার্মিং পার্সোনালিটি...' প্রাক্তন অধ্যাপক ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'হু ইজ দ্যাট ম্যান?' বড়বাবু মধুর হাসতে বাধ্য হয়েছিলেন। 'ছোটনবাবু, স্যার! আমাদের বী রেনবাবুর ছেলে।' তাঁর এই বলার ভঙ্গি প্রাক্তন অধ্যাপককে দমিয়ে দিয়েছিল এবং 'আমাদের বীরেনবাবু' শব্দ দুটিও অর্থবহ হয়েছিল। তিনি ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লেন।

জাম্বু এসে গেটের তালা খুলে দিলে উভয় আইনরক্ষক বুঝলেন, দেখা হবে। লনের দুধারে পুষ্পতরু সজ্জা, মউমউ শিউলির ঘ্রাণ, বারন্দায় পৌঁছুলে জাম্বু ডানদিকের ঘরের পর্দা তুলে বলল, 'যান স্যার, বসুন। বাবু আসছেন।' ঘরটি সুদৃশ্য, গ্রামাঞ্চলে নাগরিক সৌন্দর্য দেখে প্রাক্তন অধ্যাপক তাচ্ছিল্যপূর্ণ হাসলেন, ঠোঁটের কোণে হাসিটি আলপিন সদৃশ এবং ইচ্ছে করছিল লাথি মেরে ভাঙচুর ছত্রখান করেন, এমনই অদ্ভুত মনে হয়েছিল এই পারিপার্শ্বিকটিকে। তারপরই 'নমস্কার, নমস্কার' হৃদ্যতাপূর্ণ গম্ভীর সম্ভাষণ তাঁর চোখ দুটিকে নিষ্পলক করল। পাঞ্জাবি-পাজামা পরা, দাঁতে পাইপ কামড়ানো, সুদর্শন সুপুরুষ, রীতিমত অমায়িক, বিনয়ী ও ভদ্রলোক সামনে করজোড়ে দাঁড়ালে প্রাক্তন অধ্যাপক অভিভূত, উঠে দাঁড়িয়েই পাল্টা নমস্কারে বললেন, 'দেখা পাইলাম...গুড লাক...শুনছিলাম ব্যস্ত থাকেন, তো মিঃ ভদ্ররে কইলাম, চলেন যাই, আলাপ কইরা আসি।' ছোটন বলল, 'বসুন, বসুন! আপনার কথা শুনেছি, ইচ্ছে ছিল আলাপ করার।' তার সংলাপে মধু ঝরছিল। 'বড্ড বাজে এরিয়া, স্যার! আজ সব স্বচক্ষেই দেখলেন...কোনক্রমে টিকে আছি ঠাকুরের কৃপায়...লাইফ অ্যান্ড ডেথ গেম, স্যার!' বড়বাবু বললেন, 'পান্না ওয়াজ আ ভেরি গুড চ্যাপ।' তাঁর সংলাপে সহানুভূতি ছিল এবং এভাবে ক্রমশ দার্শনিকতার সূত্রপাত হল।

পনের মিনিটের মধ্যেই একটি স্কচের বোতল এসেছিল। মাফিয়া লিডারের অনুরোধ রক্ষায় একটু অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে গেলাস হাতে নিতে হয়েছিল এবং প্রাক্তন অধ্যাপক বলছিলেন, 'আসল কথাটা হইল গিয়া...নো দাইসেলফ্...সক্রেটিসের কথা, মাইন্ড দ্যাট...এদিকে দ্যাখেন, আমাগো উপনিষদের ঋষি কইয়া দিছেন, আত্মানং বিদ্ধি...ছোটনবাবু, শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ...স্মরণ করেন কথাটা, কী—মানুষ অমৃতের পুত্র...তো হালাগো বুঝায় কেডা? মর কাটাকুটি কইরা...যদুবংশ!'

বড়বাবু ছোটনের সিগারেট পেয়েছিলেন এবং আগুনও, বলছিলেন 'এই এরিয়ার এটা চিরাচরিত। কথায়-কথায়...কি যেন লোকাল টার্ম? ফিনিস!' উচ্চহাস্যে কথাটি ছুঁড়েছিলেন। 'ফিনিস! আবার একটু ওয়েস্টে যান, ওই এরিয়ায় বলে, বসানো...মানুষ বসানো! প্রতি দশজনে একজন করে বর্ন-কিলার...। এক্সপ্ল্যানেশন কি?'

'হ।' প্রাক্তন অধ্যাপক বলেন। 'পুলিশ পামু কৈ যে প্রেত্যেকের লগে একখান কইরা গুঁইজা দিমু? অথরিটি কয়, ল অ্যান্ড অর্ডার...মশয়, চাইর বৎসর অধ্যাপনা করছি ...ররীন্দ্রনাথের বইতে পড়ছি, যে নিজেরে বাঁ-চা-তে পা-রে-না, কোনও আ-ই-ন তারে বাঁ-চা-তে পা-রে-না', না-এ লম্বা টান দেন তিনি, মুখে তেতো ভাব, কুঞ্চিত ভুরু। 'এডুকেশন! হঃ...আইজকাইল যত্ত এডুকেশন, তত ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম।'

ছোটন পাইপের নিভে যাওয়া তামাকে আগুন জ্বেলে বলল, 'ইকনমিক প্রব্লেম, স্যার, এ কেউ ট্যাকল করতে পারবে না, যতক্ষণ না—' তার ঠোঁটে ও চোখে মিটিমিটি হাসি ছিল, দুষ্টু শিশুরা যেমত হাসে।

প্রাক্তন অধ্যাপক তাকে থামিয়ে হাত তোলেন। 'লোভ, লোভ' আপনি যত্ত ঢালবেন, তত্ত বাড়বে...' তিনি সহসা হসলেন। 'পিস কমিটি কইরা দিলাম...এট্টু দেখবেন...কাইল পাঁচটায় মিটিং...আমি তো এখনই সদরে স্টার্ট করুম।' ঘড়ি দেখলেন। 'আপনি একটু লইক্ষ্য রাখবেন, মাই রিকোয়েস্ট..' বলে

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আড়ামোড়া দিয়ে বেটনধরা হাতে একটা ভঙ্গি করলেন, ঈষৎ অসহায়তার স্পর্শ ছিল, 'আই অ্যাম লাকি...ভেরি, ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ, নমস্কার।'

ছোটন গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেল, পুনঃ নমস্কার-বিনিময়, প্রচুর সৌজন্য এবং জিপে বড়বাবু স্টার্ট দিয়ে মুচকি হেসে যখন 'কেমন বুঝলেন, স্যার' প্রশ্ন করেন, তখন প্রাক্তন অধ্যাপক আস্তে বলেন, 'হালায় ডিপওয়াটার ফিশ...রেকর্ড কয় এক, দেখি আর এক. .ব্যাবাক উল্টা।'

তেঁতুলতলার স্টপে বাসটি থেমে চুনি ও নেয়ামতকে দ্রুত গ্রহণ করেছিল, এতে চোইতপাগল উল্লসিত, বাসটি তীব্র আলোয় দুধারের শ্রেণীবদ্ধ প্রাচীন গাছের গুঁড়িগুলিনকে ঝলমলিয়ে দিচ্ছিল, সেই দৃশ্যও তার চোখে দৃঢ় সংহতি 'গাছগুলিন কেমুন ডাঁড়িয়ে আছে' এই স্বগতোক্তিতে প্রশংসা করতে করতে সে, সোনারু, বহু দূর অবধি আনন্দিত দৃষ্টিপাত করেছিল এবং বাঁকের মুখে বাসটি অদৃশ্য হলে, খ্যাপা, বড়ই খ্যাপা সে, অন্ধকার জাতীয় সড়কে 'মা দুগ্গির চালির ছামুতে' হাত তুলে কোমর দুলিয়ে নাচতে নাচতে যাচ্ছিল। সহসা একটি ট্রাকের আলোয় সে ধরা পড়ে সলজ্জ জিভ কাটে এবং সরে দাঁড়ায়, বিনয়ে বলে 'যান বাবা, যান...যে-যার ঠেঞে যান...আমি আমার ঠেঞে যাই।' ট্রাকচালক ও তার সঙ্গীরা শুনতে পাক বা না পাক, সে এইভাবে কথা বলে। সে এই সড়কটিকে ক্রমশ এত আপন করেছে যে, তার সঙ্গেও সে কথা বলে। মাঝে মাঝে ঠোক্কর খেলে সে সড়কটির দিকে বিষ দৃষ্টে তাকায়, বলে, 'তু পাষাণ পাথর...তোর দেলে রহম নাই।' তাকে চাঁদটি বা কাজিরুন্ন বিবি গণ্য করে সময় বিশেষে সে মৈথুন মুদ্রা প্রয়োগে ভীষণ হেনস্থাও করে। কিন্তু আজ সড়কটির প্রতি কৃতজ্ঞ ও শালীন সে অন্ধকার পিচের দিকে ঝুঁকে চুপিচুপি বলে, 'বিটিটোকে সুহালে পঁহুচে দিবি বাপ। তোকে জিম্মা দিঞেছি...' এবং এভাবে সে দক্ষিণডিহির সেকুলার সেক্টরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আনন্দ তাকে আরও খ্যাপায়, ফলে সে প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রমে প্রচুর সময় নিচ্ছিল, হঠাৎ-হঠাৎ থেমে নৃত্য, হঠাৎ-হঠাৎ গলা ছেড়ে গান, 'আমি মৈরমের ব্যাটা/আমার নাই চাটিপাটা/আমারো ঘর দুনিয়া সংসার...'

বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের কাছাকাছি বাঁকের মুখে একটি শিরীষ গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সে পূর্বে দৃষ্টিপাত করে, চাঁদটি দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু কালো, জমাট মেঘ, শীর্ষে ঝিলিক, সে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করতে থাকে, 'বর্ষাবে.. বর্ষাবে।' বাতাস বন্ধ, স্তব্ধতা এত নিবিড় যে পোকামাকড়ের ডাক স্তব্ধতারই অংশ মনে হয়। গুমোট গরম, কিন্তু সে খ্যাপা, বড়ই খ্যাপা, কি গরম কি ঠাণ্ডা ধড়ে-প্রাণে এক, পাহাড় মেঘটির দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে হুকুম জারি করে, 'বেভাংকার বর্ষাবি...দুনিয়া ভাসাবি...ক্যানে কি, খুবই লোহু বহেঞে গেল...' তর্জনী তুলে শাসায় সে, 'মুখে মুত পড়বে, ই সোনারু তাও পারে', গত রাতে চাঁদটিকে তাক করে মূত্রত্যাগের ঘটনা স্মরণ হয়েছিল।

নালার ব্রিজের কাছে পৌঁছে সে একটু সাবধানী হয়। ডাইনে ডাঙ্গাপাড়ায় ঢোকার রাস্তাটি লক্ষ্য করে, জনহীন। প্রলম্বিত বাজারের দুধারে ল্যাম্পপোস্টের আলো, পুলিশ জোটগুলিন চোখে পড়ে। সে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে তার প্রিয় ব্রিজটির ধারে যায়, কিছুক্ষণ কালভার্টের নিচে সেই কোটরে শেয়ালের মত ঢুকে এবং মাথা বাড়িয়ে পারিপার্শ্বিক পরীক্ষা করে। সে শুধু ভানুর প্রতিই ভীত, গতরাতে চাকু বের করেছিল এবং সে 'গলাকাটা ভানু', তার হাতে কামড়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি, অনুশোচনায় মাথাটি নাড়ে। ট্রাক বা বাসের আলো দেখা মাত্র সে মাথাটি ঢুকিয়ে ফেলছিল কোটরে। এরাতে নালার জল নক্ষত্রহীন এবং পুবের পাহাড় মেঘের ঝিলিকগুলিনের প্রতিবিম্ব দেখছিল শুধু। মশার ঝাঁকও তাকে বিব্রত করছিল। সে কামড় অনুভব করে না, কিন্তু ভনভনানি অসহ্য লাগে। চটাস চটাস শব্দে তাদের ভয় পাইয়ে দিতে ব্যর্থ সে, মরিয়া হয়ে কোটর থেকে উঠে আসে এবং মন্দিরের নাটশালার দিকে হেঁটে যায়। কারণ এইসময় সেই কালো নৌকোটির কথা তার মনে পড়েছিল। সে নাটশালায় ঢুকে মসৃণ মেঝেয় চিত হয়ে শুয়ে পড়ে। চোখ বন্ধ করে। কালো নৌকোটিকে স্বপ্নে দেখতে চাইছিল। সে ঘুমিয়ে পড়বেই পড়বে, স্বপ্নটি দেখবেই দেখবে, এমত নিষ্ঠায় সে চোখ বুজে শুয়ে ছিল। মুনিশখাটা সে, এও তার এক মুনিশখাটা কাজ ছিল।

কাজিরুনের ভিটেয় লম্পের আলোটি প্রথম চোখে পড়ে ফুলকুঁড়ির। আজ সে প্রাইভেট পড়তে যায় নি, তাকে যেতে দেওয়া হয়নি আসলে, কারণ সূর্যাস্তকালে সহসা আসগারের আবির্ভাব এবং জেরা। পৃথগন্ন নির্দল ভ্রাতৃদ্বয়ের পাশাপাশি দুটি ঘরে গাঢ় সন্ত্রাস সেই থেকে ছমছম করছিল। এমন কি, দুজনে মসজিদে গিয়ে রাত আটটার নামাজ পর্যন্ত আত্মগোপনের সিদ্ধান্ত করে ছিল। তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা ভীষণ চুপ, শুধু ফুলকুঁড়ির সাহস যে সে মৃদুস্বরে পড়া মুখস্থ করছিল, যেহেতু মুদ্রিত বর্ণমালার প্রতি তার বিশ্বাস অপরিসীম। সে ভাবে, এইগুলিন সভ্যতার দুর্ভেদ্য বর্ম এবং বর্মটি অর্জিত হলে জানমারিদের তাবৎ অস্ত্র প্রতিহত হবে। আজ সান্ধ্য পড়াশোনায় সে আরও স্বপ্নালু, কিন্তু মাঝে মাঝে এক জানমারির হিংস্র হুঙ্কার স্বপ্নজলে ঘাই মারছিল, ফলে সে অন্যমনস্কতায় মুখ তুলে বাই'রের অন্ধকার দেখে নিচ্ছিল এবং এভাবেই পলাতকা ও মাকুচালানি বড়চাচির ভিটেতে লম্পের আলো চোখে পড়ে, সে হকচকিয়ে ওঠে। তার মা ফিসফিসিয়ে বলে, 'এল! আবার এল সব্বোনাশী...ভিটে জ্বালানী...' কিছু পরে কাজিরুনের ভাঙ্গাগলার আদুরে আহ্বান আসে, 'ফুলকুঁড়ি, বিটি রে!' ফুলকুঁড়ি মায়ের হাত ছাড়িয়ে ছুটে যায়, ওই আহ্বানে নাটকীয়তা ছিল, তাছাড়া সে বড়চাচির নির্গমন-আগমনের আকস্মিকতাকে বুঝতে চেয়েছিল।

সে আরও অবাক হয় কাজিরুনের মুখ দেখে। ভোরবেলাকার সেই ঝড়ে-ভাসা-ভাঙ্গা শকুনের আর্ত মুখ নয়, সেই পলকহীন ক্লিষ্ট চোখও নয়, মুখটিতে চিরাচরিত ধূর্ততার ঝিলিক ছিল, চোখে চাঞ্চল্য ছিল। সে পটাটোচিপসের প্যাকেটটি গুঁজে দেয় ফুলকুঁড়ির হাতে এবং খসখসে কণ্ঠস্বরে বলে, 'তুরা বেঁটে-বুটে সক্কলে খা.... আমার শরিল ঠিক নাই...বিটি, তু আসগারকে হারামি খ্যাপার খুড়া হওয়ার কথা বুলেছিস...তাতে আমার জান বাঁচল...' সে পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলছিল কৃতজ্ঞতায়। 'খা, সক্কলে বেঁটে খ...পড়া কর্‌গা...' বলেই সে কেমন হাসে। লম্পের আলোয় তার মুখের হাসিটি রহস্যপূর্ণ মনে হয়েছিল ফুলকুঁড়ির, যা তার বহু পরিচিত, এবং ফুলকুঁড়ি প্যাকেটটি আড়ষ্ট হাতে নিয়ে সবে ঘুরেছে, কাজিরুন লম্প রেখে উঠে এসে তার কাঁধে হাত রাখে, পোকামাকড়ের স্বরে প্রশ্ন করে, 'সে-খ্যাপাকে দেখেছিস?' ফুলকুঁড়ি আড়ষ্টভাবে বলে, 'অকে আসগাররা জানমারি করবে' এবং নিজের কথায় নিজেই ভয় পেয়ে চলে যায়। প্যাকেটটি সে বুকের কাছে ব্লাউস ও শাড়ির তলায় লুকিয়ে ফেলেছিল, মা প্যাকেটটি দেখলে কেড়ে নিয়ে ছাইগাদায় ফেলে দেবেই, সে জানত।

কাজিরুনের ছোট্ট দাওয়ায় লম্পটি জ্বলছিল। শাদা পোকার ঝাক, দুটি কি তিনটি উচ্চিংড়ে লম্পটির চারদিকে পায়তারা করছিল। ফুলকুঁড়ি চলে গেলে উঠোনে দাঁড়িয়ে কাজিরুন চুল বাঁধে, তারপর কুঁড়েঘরের পেছনে যায়, জমাট পাহাড়-মেঘটিকে দেখার ইচ্ছা হয়েছিল। হাওয়া বাতাস বন্ধ, দম আটকানো উষ্ণতা, পাহাড়মেঘের শিয়রে মুহুর্মুহু চিক্কুর, ডাবল এজেন্ট খুব আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সহসা আপন স্বভাবে সে নড়ে ওঠে। খ্যাপা, বিষম খ্যাপা সে, কদর্য মৈথুন মুদ্রাগুলিন যখন প্রয়োগ করে, তখনও বোঝে না সে কি করছে, তার 'জানমারি হবে!' ডাবল এজেন্টের মনে হল, ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনছে 'জানমারি হবে...জানমারি হবে...জানমারি হবে।' পুবের কালোপাহাড় মেঘে গিয়ে ধাক্কা খেল, 'জানমারি...জানমারি...জানমারি!' চাপা গর গর গম্ভীর ব্যাপক 'জানমারি...জানমারি...জানমারি' এবং ডাবল এজেন্ট সে, কাজিরুন বিবি, মাকুচালানি, আপন স্বভাবে ধী-রে হাতে মাকুটি নিল। খ্যাপা, বড়ই খ্যাপা, ঘুড়া-হওয়া এক লোকের দিকে মাকুটি চালানোর জন্য ছটফটিয়ে পা ফেলল, দাওয়ায় লম্পটি জ্বলছিল, জ্বলতে থাকল। দরজায় তালা আঁটিল না, যেন সে ভিটের আনাচে-কানাচেই আছে এমত প্রতীয়মান হয়। সে পুনঃ মাকু-চালাচালি প্রক্রিয়ায় স্বভাববন্দী হয়েছিল। স্বভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে সে চকবন্দি বাড়িগুলিনের অন্তর্বর্তী পয়ঃপ্রণালী, গলিঘুঁজি দিয়ে সতর্ক কান ও দৃষ্টি রেখে পাড়া পরিক্রমা করছিল। হেন সময়ে নৈশ নামাজের আজান ধ্বনিত হল মাইক্রোফোনে, তখন সে বটতলায় পিরের থানে এবং মুসলমান স্ত্রীলোকের রীতি অনুসারে এতকাল পরে, মাথায় ঘোমটা তুলেছিল। সে ডাবল এজেন্ট, নেয়ামতের সঙ্গে প্রায়ই মুনিশ খাটতে দেখেছে 'খ্যাপা সেই বড়ই খ্যাপাকে', শেষ চেষ্টায় খিড়কির দুয়ারটিতে হাত রাখল এবং পাতাখসা স্বরে ডাকল, 'নেয়ামত! নেয়ামত!' সে

বাঁশবাতার কপাটের ফাঁকে দেখেছিল দম কমানো হেরিকেনটিকে এবং দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকা মোহরা খাতুনকে, অথচ সাড়া নেই, দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমোয় মোহরা, সন্দেহজনক। সে কপাটটিতে থাপ্পড় মারল, পুনঃ ডাকল, 'মুহরা! ওরি মুহরা খাতোন! বুন রি!' জোরাল আকুলতা এবং ক্ষোভও ছিল, 'কি ঘুমায় অমন করে, ক্যানে ঘুমায়?'

মোহরা খাতুন পা গুটিয়ে সোজা হল অবশেষে, হকচকিয়ে তাকাল খিড়কির দিকে, ঘুমিয়ে থাকার দরুন যে লোকটির ভাত খেতে ও শুতে আসার কথা, তাকেই ভেবেছিল, 'ভাসুর' এই চাপা ডাক ডেকে সে ছুটে গেল এবং দরজা খুলে কাজিরুনকে আবিষ্কার করে মুহূর্তে পাথর মূর্তি হল, নাসরন্ধ্র স্ফীত এবং চক্ষু পলকহীন।

কাজিরুন তাকে ঠেলে ঢুকে নিজেই দরজার হুড়কো আটল, এতে মোহরা খাতুনের আচ্ছন্নতা ভেঙ্গে ছিল, সে কঠিন মুখে বলল, 'কি?' এ মুহূর্তে তার আত্মায় জানমারিদের আত্মা উপস্থিত, তাকে হিংস্র দেখাচ্ছিল।

কাজিরুন বকের পা ফেলে দাওয়ায় বসল, মুখে-চোখে ডাবল এজেন্টের ধূর্ত চাঞ্চল্য, এবং আস্তে বলল, 'তোর মরদ কতি রি, তু একলা ক্যানে...ওরে বুন, কাল রেতের ঘুড়ার খবর হয়...জানমারিরা ঘুড়াটোকে ঢুঁড়ে...আমি বুলি, সে খ্যাপা, বড়ই খ্যাপা', সে দুই শীর্ণবিধবাহাত বুকে রাখল যেন মর্সিয়া-বিলাপের ভঙ্গি। তারপর একটি হাত বাড়িয়ে সামনে দাঁড়ানো মোহরা খাতুনকে টানল, 'বুন, তোর মরদ কতি গেল? আমি মেয়েমানুষ রি। বুঝ্ কথাটো...ঘুড়াটাকে কতি পাব...বাজার জায়গায় যেতে সাওস হয় না...কি করে খ্যাপাকে খবর করি?' সে কপালে থাপ্পড় মারল। 'ই রাঁড়ির বিটি রাঁড়ি...মাকুচালানি কপাল রি...মরণকে ডর নাই, জানমারিকে ডর।'

মোহরা খাতুন ঘামছিল, কাঁপছিল, তবু শক্ত মুখে বলল, 'ক্যানে? ভাসুর কি দুষ কল্লে?' সে একমুহূর্ত থেমে ও ঢোকে গিলে পুনঃ বলল, 'ক্যানে?' দ্বিতীয় ক্যানে-টি ছ্যারাভ্যারা এবং ভিজে ছিল। সে বিষয়টি ঈষৎ বুঝে ছিল।

কাজিরুন হেঁপো রুগির শ্বাসপ্রশ্বাসে এবং গলার ভেতর ঘড়ঘড়ানি সহ বলল, 'উ খ্যাপা, বড়ই খ্যাপা, কিছু ভেবে কিছু করে না.. উ ঘুড়া হঞে পান্নার বুনকে বহেঞে লিঞে ই-বাড়ি উ-বাড়ি করে.. কাল রেতের খবর! জানমারিবা অকে ফিনিস করবে।' সে মর্সিয়া রীতিতে বুকে দুহাত চেপে ধরেছিল। 'উ যতি পালায়, পালাক বুন...খ্যাপা! খ্যাপার জানমারিতে কি...অর বাঁচামরা দুই এক...কিন্তুক কে অকে খবর দ্যায়...' বলে সে মোহরা খাতুনের দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে উপর্যুপরি ব্যগ্রতা। ফলে মোহরা খাতুন কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিল, সহসা পুবের কালো পাহাড়-মেঘ প্রচণ্ড গর্জনে তাকে থামিয়ে দিল। সেই পাহাড়-মেঘ ততক্ষণে আকাশের প্রায় অর্ধাংশ ঢেকে ফেলেছে এবং তীব্র বিদ্যুতের চাবুক পড়ল আছড়ে, আবার একটি ভয়াল গর্জন কানে তালা ধরিয়ে দিলে দুটি স্ত্রীলোকই পাথর হয়ে গেল। তারপর প্রবল এক হাওয়া ভয়ঙ্কর শ্বাসপ্রশ্বাসে শনশনিয়ে উঠেছিল।

নাটশালার মসৃণ মেঝেয় চিত হয়ে শুয়ে একটি কালো নৌকো-প্রার্থনার নিষ্ফলতা তাকে অবশেষে রাগিয়ে দেয়। সে খ্যাপা তো বড়ই খ্যাপা, রাগ হলেই ভেংচি কাটে এবং বিবিধ অঙ্গভঙ্গি করে। তার ধৈর্য জেদ নিষ্ঠা প্রচুর, কিন্তু সীমা পেরিয়ে গেলে সে, এক চোইত-পাগল, সত্যিই কিছু ভেবে কিছু করে না। কঠিন ও শীতল মেঝেটির প্রতি সন্দেহ বশে উঠে বসে রুষ্ট দৃষ্টে তাকাল, থাপ্পড় মারল এবং অভিমানী শ্বাসপ্রশ্বাসে বলল, 'কানা তু...বেরহম! দিঞে ফেরত লিস তু...' নাটশালার লাল সিমেন্টের মেঝের ওপর পার্শ্ববর্তী বিদ্যুৎবাতিগুলিনের ছটা পড়েছিল, অন্ধকারেরই চাকচিক্য ভ্রম হয়, এই রহস্যময়তা দেখে সে ঈষৎ ত্রস্ত, একপা একপা করে সরে গেল এবং নিচে মেনে নিরাপদে বারকতক মৈথুনমুদ্রা প্রয়োগ করল। পরে শিয়রে মন্দিরটি দৃষ্ট হওয়া মাত্র সলজ্জ জিভ কেটে হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকাল। হিঁদুর খুদার সামনে বেয়াদ্দপির বেহদ্দ, খুবই লজ্জায় সে কাছাকাছি অর্জুন গাছটির আড়ালে আত্মগোপন করতে গেল এবং বিড়বিড় করছিল কুণ্ঠিতভাবে, 'দুষ লিও না গো, ই খ্যাপা, বড়ই খ্যাপা।'

এই সময় তার গায়ে টর্চের আলো পড়ে এবং নিভে যায়, সে পুলিস ভেবে পালাতে পা তুলেছিল, 'থাম চাচা, থাম গো, আমি আনারুল' শুনে থামে। 'তুমাকে টুঁড়ে টুঁড়ে...' আনারুল খিখি করে হাসে। 'একমুনিশের কাম...ই শালা জানমারির দিনে মুনিশ পাই না। যাকেই বুলি, নাহ্...এস, এস। চাচাকে তামাম দুনিয়া টুঁড়ে টুঁড়ে খুদা মিলিন দিলেঞ্।'

আনারুলের বাপ ওহিদ এক নির্দল। আনারুল জানমারিদের দলে কি না, সোনারু লক্ষ্য করে নি, তবে ওহিদের গোয়ালঘর তোলার সময় সে, মুনিশখাটা, কাদা ছেনে ছিল। সে মুনিশখাটা, নিজেকে এভাবে ঘোষণা করতে তার অহঙ্কার, মুনিশখাটা ডাক এলে সে অগ্রাহ্য করে না। কিন্তু এখন তার মনভারি, অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে বলে, 'রেতের বেলা কি কাম, বাপ? ফজরে যাব...দেখে কষ্ট।' কথাটি সে বিনয়ে বলেছিল।

'সামান্য কাম...ওই দ্যাখো, এখুনি বর্ষাবে লাগে, জিনিসটা ভিজে লাদ হবে...' আনারুল তার হাত ধরে টানে। পিচের সড়কে উঠে হাত ছেড়ে পিঠ ঠেলে দেয়। সোনারু আস্তে হাঁটছিল, ক্লান্ত বলদ-হাঁটা। ডাঙ্গাপাড়ার খোয়া ঢাকা রাস্তায় গিয়ে আনারুল পুনঃ তাড়া দেয়, বলদ-ডাকানো, 'পা চালিয়ে, পা-চালিয়ে...বর্ষাবে লাগে।' সত্যিই কালো পাহাড়-মেঘ আকাশ ঢাকতে বিশাল আকারে উঠেছে। ঘন-সংবদ্ধ বাড়িগুলিনের পিঠে শালকাঠের খুঁটি থেকে বিদ্যুতের বিচ্ছুরণ, সুনসান জনহীন রাস্তা, আনারুল হঠাৎ-হঠাৎ ঠেলে বলে, 'পা চালিয়ে, পা চালিয়ে' এবং সে, মুনিশখাটা, ক্রমে বিরক্ত, 'কি খালি ঠেলিস বাপ...যেছি না ডাঁড়িয়ে আছি' বলে হাঁটতে থাকে, গতি বাড়ায়। কয়েকটি বাড়ির পর আনারুল তার হাত ধরে বাঁদিকে অন্ধকার গলিতে টেনেছিল। সোনারু অন্ধকারে ঢুকে বলেছিল, 'ইদিকে কতি তোর কাম, বুঝি না...কি কাম তু বুলিস না...খালি ঠেলিস...' সে নিশাচর, অন্ধকারে তার দৃষ্টি চলে, আনারুল তাকে যেখানে থামায় সেখানটিতে ছোট্ট চত্বর, একটি আমগাছ, চিনতে পেরে একটু হাসে। 'আলি মিস্তিরির ঠেঞে কাম...কাথাটা বুললে কি হত বাপ?' তার চিন্তায় গরুর গাড়ির একটি ধুরি অথবা ওইরকম কিছু ছিল। আলি কাঠমিস্তিরি, এই আমগাছতলায় সে কাঠের কাজ করে, খুব বকর-বকর স্বভাব, তবে কাজগুলিন দড়। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিলে ইতস্তত নানা আকারের কাঠগুলিন স্পষ্ট হয় এবং আনারুল একটির দিকে এগিয়ে ঝুঁকে বলে, 'এস চাচা, কাঁধে লাও।' সে, মুনিশখাটা, আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে নিয়ে লুঙ্গিটি কাছা দিয়ে মালকোঁচা করে, তার দুটি লম্বাটে পা ঊরু অবধি উন্মোচিত হয়েছিল এবং সে সন্ন্যাসীচুলের চুড়ো ভেঙ্গে পুনঃ আঁটো নির্মাণ করে। নিশাচর চোখে আলিমিস্তিরির কাজটি দেখতে দেখতে সে অবাক হয়েছিল। 'ই কি জিনিস বাপ...ইটা কি...' বলে পরীক্ষা করতে করতে সহসা হাসে। 'আড়-কাঠা...ই আড়-কাঠা দিঞে কি কি করবি...' খিক খিক করে হাসছিল সে। শেষে পুনঃ পুনঃ 'ভালা মজা' বলতে থাকল।

ওহিদের ব্যাটা আনারুল বাবু সেজে থাকে, ওহিদ সরোষে একদা বলেছিল, 'গায়ে ফুঁ দিঞে বেড়ায় বাবুর ব্যাটা বাবু...মরি তো বুঝদার হবে', স্মরণ হওয়ায় চোইতপাগল যখন 'আড়কাটা' খানি কাঁধে তুলেছে, তখনও হাসছিল এবং 'ভালা মজা' বলছিল। রহস্যময় নির্মাণটি তত কিছু ভারি নয়, সে বাঁ কাঁধে একদিকের খাঁজ আটকে দিল, লম্বাটে অংশটি দুহাতে ধরল, পা বাড়িয়ে বলল, 'চ...কোলকাত্তা তো কোলকাত্তাই...একখান আড়কাঠা...বোলে কি, ভিজে লাদ হবে...ওরে, কাঠ লাদ হয় না।' সে আড়কাঠাটির কঠিনতা বুঝেছিল। মন্তব্য করল, 'নিমকাঠ লাগে, বাপ...খুব দড়।'

সে আনারুলদের বাড়ি যেতে চেয়েছিল, বাধা পেল, আনারুল কাঠটি ঠেলে তাকে ভিন্নমুখী করল, 'উদিকে...উদিকে চল।' তার কণ্ঠস্বরে অন্য ভাব, ঈষৎ ঝাঁঝ, চোইতপাগল গ্রাহ্য করল না, সে মুনিশখাটা। শুধু আপন স্বভাবে বলল, 'ভালা মজা...তু যে ঠেঞে যাবি চ...কোলকাত্তা তো কোলকাত্তাই।' পুকুর পাড়, ঘাসে ঢাকা পোড়ো জমি, নিশুতি নিরিবিলিতে একটি দুটি বাড়ি, পাড়ার খণ্ড খণ্ড আঁকাবাঁকা বসতি-সীমান্ত দিয়ে আনারুল তাকে নিয়ে যাচ্ছিল, ক্রমে সে আড়কাঠাটির ভার বোধ করছিল, কাঁধ বদলের জন্য আনারুল তাকে থামতে সময় দিয়েছিল একবার। যখন বাঁ কান ঘষা

খেয়ে জ্বালা করছে, ক্লান্ত মুনিশখাটা স্বরে সোনারু বলল, 'কানকাটা কল্লি, বাপ...কান জ্বলে.. আর কদ্দূর?' জবাব না পেয়ে পুনঃ বলল, 'ভালা মজা! তো কোলকাত্তা...তো কোলকাত্তাই...ই খ্যাপা এক ঘুড়ারে, পংখিরাজ!' এই সময় সে, নিশাচর, সহসা অনুভব করল তারা দুজন নয়, আরও কারা আছে—আনারুলের পেছনে শ্রেণীবদ্ধ, মাথা ঘোরানো যায় না যে পেছনে ঘুরবে, এবং সে এবার সত্যিই ক্লান্ত, পা দুটি টলছিল, কষ্টে মুখ তুলল, উঁচু শিমুলগাছটি বিদ্যুতেব ছটায় স্পষ্ট হয়েছিল, হাঁপ ধরা গলায় বলে উঠল, 'গোরাস্তানে ক্যানে বাপ, ও আনারুল...কিছু বুঝা যায় না।' সে গোরস্থানে ঢুকেই আড়কাঠাটি সহ হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল এবং এতক্ষণে দেখতে পেল আনারুলের সঙ্গীদের। 'ভালা মজা' বলে দুপা ছড়িয়ে দুটি হাত দুধারে মাটিতে রাখল, সে, শ্বাস নিতে থাকল। ছায়ামূর্তিগুলিনের দিকে তাকাতে ইচ্ছে নেই, সে মুনিশখাটা, কিন্তু ধন্দে পড়েছিল।

'উঠ চাচা..কাম সারো...বর্ষাবে লাগে।' আনারুল তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারপর সেই আড়কাঠাখানি তুলে ধরলে মুনিশখাটা সে, আপন স্বভাবে, বাঁ কাঁধে নিল। আনারুল টর্চের আলো ফেলে পুরনো সব কবর, যেগুলিন ঘাসে ঢাকা এবং লম্বাটে খোঁদল হয়ে আছে, দেখতে দেখতে একখানে গিয়ে থামল। সেখানে একটি ছোট্ট গর্ত, টাটকা খোঁড়া হয়েছে, বলল, 'থামো...ধরো...পুঁতো ইখানে', সে চোইতপাগলাকে সাহায্য করছিল। চোইতপাগল 'ভালা মজা' বলে নির্দেশ মত আড়কাঠার লম্বা দিকটি গর্তে ঢোকাল। মুনিশখাটা সে, আনারুল জাদুকৌশলে তাকে একটি শাবল দিলে গর্তে মাটি ফেলে নিষ্ঠায় গাদতে থাকল। 'কিছু বুঝা যায় না...' বলে সে মুখ তুলে অদূরে ছায়ামূর্তিগুলিনকে দেখছিল, তারা পাষাণভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সহসা তার নিশাচর ইন্দ্রিয়ে কি এক অনুভূতি, মনে হল, এরকম আরও একটি দঙ্গল তার কাছাকাছি কোথাও বসে আছে এবং ঠিক তখনই বিশাল কালোপাহাড় মেঘ ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দিল। আনারুল আড়কাঠাটির শক্তি পরীক্ষা করছিল, অনুচ্চ স্বরে কিছু বলেছিল, মেঘের হুঙ্কারে বোঝা যায় নি। চোইতপাগলের চোখের সামনে পুনঃ চোখ ধাঁধানো ঝিলিক, পুনঃ কানে তালা ধরানো হুঙ্কার, এই বজ্রবিস্ফোরক হুঙ্কারটি ঈষৎ প্রলম্বিত ছিল, পশ্চাদ্ধাবনকারী একটি ঘূর্ণিঝড়ও অতর্কিত রোষে শ্বসমান ছিল, গোরস্তানের বৃক্ষলতাগুল্মাদি আমূল আলোড়িত হল এবং বৃত্তাকারে, কবর থেকে পৃথিবীর শেষদিবসে মৃতরা যেভাবে উত্থিত হবে, সেভাবে ছায়ামূর্তিগুলিন উত্থিত, তারা এগিয়ে এল, আর সোনারু, সেও উত্থিত, নিবপেক্ষভাবে আবহমণ্ডলকে আলোচ্য করল, 'বর্ষাবে...খুবই বর্ষাবে', তারপরই সে নিজেকে 'পর-হাতি' হতে দেখল। অন্য-অন্যদের হাতে তার মুনিশখাটা ধড়, তার ধড়ে-প্রাণে এক, তার মুনিশখাটা দুটি হাত আড়কাঠাটির উর্ধ্বাংশে টান-টান করে বাঁধা হচ্ছিল, তখনও সে 'ভালা মজা' বলেছিল, ক্রমে তার কোমর ও পেট, দুটি পা বাঁধা হলে 'আমি খ্যাপা রে, বড়ই খ্যাপা', বলল, যেহেতু সে এই ভয়াল দুর্যোগেও এগুলিন প্রথাসিদ্ধ রগড় ভেবেছিল এবং বিবিধপ্রকার রগড় তাকে নিয়ে করা হয় সেও সত্য। ফলে আরও খ্যাপামি দিয়ে রগড়টিকে উপভোগ্য করে তুলতে খিটখিট শিশুহাসি হাসছিল। পুনঃ পুনঃ বলছিল, 'ভালা মজা...ভালা মজা...'

ততক্ষণে ঝোড়ো খ্যাপাখ্যাপ্ত হাওয়া-বাতাসের ভেতর ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টিকণা, কণাগুলিন ক্রমশ স্থূল ও তীব্র হচ্ছিল, আকাশঢাকা পাহাড়-মেঘ গর্জনের পর গর্জন করছিল, ঝলকে ঝলকে বজ্রবিদ্যুতে গোরস্তানে প্রোথিত আড়কাঠাটি—যা প্রকৃতপক্ষে একটি ক্রুশদণ্ড, ঝলসে যাচ্ছিল, আর অঝোর ধারায় ভিজছিল এবং প্রভাকরের কামারশালে জরুরি হুকুমে তৈরি তীক্ষ্ণাগ্র আট ইঞ্চি পেরেকগুলিনের প্রথমটি বিদ্ধ হলে সে, সোনারু, চোইতপাগল, এক মুনিশখাটা, যে দিনশেষে গেয়েছিল, 'আমি মৈরমের ব্যাটা/আমার নাই চাটিপাটা/আমারো ঘর দুনিয়াসংসার', এতক্ষণে যথাযথ মরিয়মপুত্রে পরিণত এবং অত্যদ্ভুত দুর্বোধ্য সুপ্রাচীন ভাষায় আর্ত চিৎকার করেছিল, 'এলি এলি লামা সা-বাক্তানি...'

এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমটি বিদ্ধ হয় এবং ঝড়-বৃষ্টি বজ্রগর্জনের প্রাকৃতিক নাদগুলিন ভেদ করে তীব্র আর্তবাক্যটি প্রতিবার শোনা যায়, 'এলি এলি লামা সা-বাক্তানি...' আর সহসা শিমুল গাছটির মাথায় বজ্রাঘাত, দাউ দাউ জ্বলে ওঠে, আর মসজিদের জাপানি ঘড়িটিতে তখন নটা বাজল।...

And about the ninth hour
Jesus cried with a loud voice,
Eli Eli Lama Sa-bakthani,
.....My God, my God, why hast thou
forsaken me? .....*(St. Mathew 27:46)*

আর প্রচণ্ড আতঙ্কে জানমারির দলটি পালিয়ে যাচ্ছিল, দিকদিশাহারা, কানে হাত, কুঁজো, ঝড়বৃষ্টি-বজ্রবিদ্যুতে বিপর্যস্ত দ্বিপদ প্রাণীগুলিন একবার ঘুরে কি দেখতে কি দেখেছিল, আবহমণ্ডলে ঊর্ধ্বগামী এক মানবপুত্র এবং সবচেয়ে হিংস্র তরুণ জানমারিটি চিৎকার করে ওঠে, 'উঠিন লিলে...অকে উঠিন লিলে,' তার মুখে জঙ্গিনেতার হাত পড়েছিল, তাকে বগলদাবা করে নিয়ে যায়।

আর তৎকালে মোহরা খাতুন ও ডাবল এজেন্ট দাওয়ায় জড়োসড়ো, কোণঠাসা, তারাও আবহমণ্ডলে একটি উত্থান দেখেছিল, তার বিস্মিত ব্যগ্রতায় 'ই কি...ই কি...' বলেছিল।...

আমেন আমেন আমেন
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ
আমিন সুম্মা আমিন...

মায়ামৃদঙ্গ



ক

প্রথম যৌবনের ছ'সাতটা বছর, এখনকার বিবেচনায় খুব দামী আর সম্ভাবনাপূর্ণ ছ'সাতটা বছর—তার মানে, খুব কম করে ধরলেও আড়াই হাজার দিন আর আড়াই হাজার রাত, আমার যা নিয়ে এবং যাদের সঙ্গে সৌন্দর্য ও যন্ত্রণায় কেটে গেছে, তাই এবং তাদের নিয়েই এই উপন্যাস।

এখন ভেবে শরীর হিম হয়ে যায়। ষাট হাজার ঘণ্টা ধরে যেন টানা ঘুমের মধ্যে একবারও পাশ ফিরে শুইনি। মেয়েদের হৃদয় এবং মুখমণ্ডলবিশিষ্ট তরুণ পুরুষের শরীর কিংবদন্তির গ্রামপরীদের দ্বারা আক্রান্ত দেখেছি। আকাশে ঝাকড়মাকড় চুল নাড়া দিয়ে আগুনের হালকার মতন লোকগাথার বিস্ফোরণ ঘটেছে। আর হাজার হাজার বিপন্ন মানুষকে দেখেছি—যাদের মোহিত দু'চোখে পাপ আর সৌন্দর্যের ছায়া অচরিতার্থ কামনার দুঃখে কালো হয়ে গেছে। সৌন্দর্যের গলায় পাপ সেই ষাট হাজার ঘণ্টা ধরে রত্নহার হয়ে ছিল। তবে কি না, জীবনের শ্লীলতা-অশ্লীলতা বাছবিচার নেই—এ ব্যাপারটা ব্যক্তিচেতনার অধিকারে।

এখন সবটাই স্বপ্নবৎ। আজ পনের-ষোল বছর পরে সেগুলো চেতনার অন্ধকারে চলে গেছে। প্রাগৈতিহাসিক গুহার দেয়ালে আঁকা ছবির মতন কিছু ধূসর ফ্রেস্কো। কিছু কিম্ভুত কার্টুন। কিছু গ্রামপরী। কিন্তু আজও ভয়ের কথা, ঘুমের রেশমি শিকড়ে তারা গুচ্ছগুচ্ছ স্বপ্নের ডিম পাড়ে। মেয়েদের হৃদয় ও মুখমণ্ডলবিশিষ্ট তরুণ পুরুষ অবাঞ্ছিত ভালবাসার অবতারণা করে। এই অসবর্ণ ভালবাসা বড় বিপজ্জনক। এখনও বড় মায়ায় আক্রান্ত হই। ওরা আমাকে রেহাই দেয় না এখনও।

কিন্তু পিকাসো যা পারেন, আমি তা পারিনে। এই উপন্যাস তাই নিতান্ত একটা আত্মবিস্ফোরণ। এর শেষ এখানেই হতে পারে না। এ বই সেই টানা ষাট হাজার ঘণ্টা সময়ের কিছু অংশের প্রতিবিম্ব। নিছক প্রতিবিম্ব শুধু। তার বাঁকাচোরা কিংবা কিম্ভুত মনে হওয়া স্বাভাবিক। বিদগ্ধ পাঠক আমার অক্ষমতা সম্পর্কে যথেষ্ট সতেচন।

সম্ভবত এ বিষয়ে প্রথম উপন্যাস শ্রদ্ধেয় ৺নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈতালিক'। সুতরাং এটি দ্বিতীয়। উপন্যাসের চরিত্রেরা নামে-স্বনামে এখনও বেঁচেবর্তে আছে এবং পদ্মা-গঙ্গা-অজয়-ময়ূরাক্ষীর এপার-ওপার যোজনবিস্তৃত অববাহিকায় গ্রামগঞ্জ হাটমেলায় উৎসবে-নিরুৎসবে লোকগাথা বিস্ফোরণ করছে। এই অত্যাশ্চর্য এবং ধ্রুপদী লোকনাট্যরীতির জনপ্রিয়তা লোকসমাজে শ্রেষ্ঠতম। আবার বলছি, শ্রেষ্ঠতম। অবশ্য, আরও লোকশিল্পের মতনই এর গায়েও মৃত্যুর ধূসর ছায়া পড়েছে।

খ

কিন্তু কিমাশ্চর্যম্। তথাকথিত লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের কেতাবপত্তরে এই লোকনাট্যদল 'আলকাপে'র যা ব্যাখ্যা-বর্ণনা পড়েছি, ভাবা যায় না! আমার এ বই উপন্যাস এবং মূলত অর্ধনারীশ্বর বিষয়ক, তত্রাচ অকপটে প্রকৃত তথ্যজ্ঞাপক। যে-সব গান বা ছড়ার অংশ এতে দেওয়া হয়েছে—সে গুলিও আলকাপদলে প্রচলিত, অর্থাৎ আমার বানানো নয়। শুধু ঘটনা বা কাহিনীঅংশ সাহিত্যশিল্পের রঙে রঞ্জিত করা ছাড়া উপায় ছিল না, এই যা।

শুনতে পাই, গ্রামীণ দারিদ্র্য আর সিনেমার মারাত্মক চাপে 'আলকাপ' এখন বিপন্ন। হাজার-হাজার বছরের মানুষের ইতিহাসে অনেক জন্ম-মৃত্যু ঘটেছে। রাষ্ট্র এবং সময়ের তাতে কিছু যায়-আসে না। শুধু এ বইয়ের লেখক এবং রাঢ়-বরেন্দ্র ভূমির লক্ষ লক্ষ সাধারণ গ্রামীণ মানুষের মনে আমৃত্যু থেকে গেল যা—তা ধনপতনগরের প্রখ্যাত ওস্তাদ ধনঞ্জয় সরকারের ভাষায় 'এক বিবল মায়া।'

লেখক

আর কয়েক পা বাড়ালে শেষ মাঘের শান্ত স্তব্ধ নদী—জেলার ভূগোলে লেখা আছে ভাগীরথী, লোকে বলে গঙ্গা। 'পতিতপাবনী কলুষবিনাশিনী সুরেশ্বরী—জননী জাহ্নবী।' ওস্তাদ মানুষ। যখন তখন সভায় আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে পদ বেঁধে বলে, 'আমি তাঁর কোলেরই ছেলে বাবাসকল। মুক্তির তীরে আমার বাস। চক্ষু মুদে পা বাড়ালেই অগাধ শান্তির তলা ছোঁব।' .. পরক্ষণে ফিক করে জনজয়ী হাসিটি হেসে ফের বলে, তবে কিনা শান্তির তীরই যত অশান্তি, শুচিতার পাশে যত অশুচিতা। যেমন কিনা জলের পারে জ্বলন—গঙ্গার পাশেই ধূ ধূ চিতা। জীবন মরণ গা ছোঁয়াছুঁয়ি বন্ধন। ...' এই উপমার জের বড় সহজে থামে না। হাততালি পড়ে। দোহারকিরা দেয় জয়ধ্বনি। ওৎ পেতে থাকা বাঘা 'খলিফা' জোরসে একটি ডুডুম্ বাজিয়ে দেয় বাঁয়া তবলায়।

কিন্তু এতদিন সে শুধু ছিল নিতান্ত উপমা। পদে-পয়ারে ধ্বনির মিল। ছন্দের মিল। 'কল্পনা।' 'আলকাপ' দলের লোকের একে বলে কল্পনা। শুধু কল্পনা নয় 'কবিকল্পনা।'

আজ যা দেখল, তা কিন্তু কল্পনা নয়। বলেছিল, শুচিতার তীরে যত অশুচিতা, পুণ্যের পাশে পাপ—আজ পঞ্চাশের প্রান্তে এসে তা হল প্রত্যক্ষ। যা ছিল ভাবনায়, তা এল বাস্তবে। ওস্তাদ ঝাঁকসা—ধনপতনগরের খ্যাতনামা আলকাপ ওস্তাদ শ্রীধনঞ্জয় সরকার—স্তম্ভিত আর বিমূঢ়।

বাঘের মত গর্জে উঠতে সাধ যায়। নয়ত বুক ফাটিয়ে হাহাকার করে। লাফিয়ে পড়ে মাঝখানটিতে, নয়ত পা টিপে পিছু ফিরে পালিয়ে যায়। এ যে এক অসম্ভব দৃশ্য। অশ্লীল। জঘন্য।

কিন্তু কিছু যেন করার নয়। ওরা দুটিতে যেন নিজেরই দুখানি হাত। যে হাত কাটে, সে হাতেই যন্ত্রণা। দুটি চোখ। একটি নষ্ট হলে আদ্দেক পৃথিবী আঁধারে ডোবে।

শেষ বিকেলের লালচে সূর্য ওপারের বিস্তীর্ণ মাঠের ওপর রোদ গুটিয়ে নিচ্ছে সন্তর্পণে। পাকা গম কি ছোলার ক্ষেত থেকে লোকেরা গতর তুলে ঘরের কথা ভাবছে। চরের ঢিবির ওপর একটা শকুন কতক্ষণ বসে রোদ পোহানোর পরে সবে উড়ে আসছে এ পারের উঁচু শিমুল গাছটার দিকে। শিমুলচূড়া থোকা থোকা লাল ফুল ভরা। কিংবদন্তির শ্মশানবাসী রাহুচণ্ডাল বুঝি মাথায় লাল ফেট্টি বেঁধে লাঠিতে ভর রেখে অমনি দাঁড়িয়ে থাকত কবে। আসন্ন সন্ধ্যার নির্জন পটভূমিতে এইসব পাড়াগাঁয়ে একে একে যেন কিংবদন্তির যত নায়ক নায়িকারা চেহারা পায়—গাছ গাছালি ঝোপ-ঝাড়ে, বালির চরে, কালো জলে নক্ষত্রের ঝিকমিকিতে, পাখির ডাকে।...

ওটা শ্মশান—তাই আঘাটা। আকন্দ কালকাসুন্দে আর সোনাবাবলার ঝোপঝাড়ে ভরা পাড়। ঝোপের ওপর ঝালরের মত, ঝরোকার সদৃশ্য, আলোকলতার ছাউনি। বন চড়ুইয়ের ঝাঁক আছে। গাঙ শালিক আছে। তাদের চিৎকার তবু কোন বিকার তোলে না ও স্তব্ধ-নিঝুম নির্জনতায়। ঘাসের ওপর মাকড়সারা ফের পুরোদমে জাল বুনতে শুরু করেছে—শিকার ধরবে সারাটি রাত। এখনও হিমের ঋতু। শিশির জমে ওঠে। দিনের দিকে রোদ খর হলে শুকিয়ে যায় জালগুলো। গরু-বাছুরের পায়ের আঘাতে সব ছিঁড়ে যায়। মাকড়সারা বড় পরিশ্রমী।

আর এই পিঁপড়েগুলোও। পোড়া কাঠের টুকরো ছড়ানো নরম মাটিতে তাদের আনাগোনা। কামড়ালে জ্বালা করে। অবিশ্রান্ত সরু দাঁতে ঝুরো ঝুরো মাটি কাটছে আর কাটছে। এখানে ওখানে উঠেছে অজস্র চাপ চাপ ঢিবি।

ঢিবি উইপোকাদেরও কম নয়। কচি বাবলা কি কাশঝোপের গোড়ায় তাদের ঘরবাড়ি। কোনটার

ওপর সাপের খোলস পড়ে আছে।

আর আছে হাড়। মানুষ কি অমানুষের হাড় কে বলেতে পারে দেখামাত্র? তবে শুধু মুণ্ডু দেখলে চেনা যায়। ওই একটা মোষের—শিঙ দুটো এখনও ভাঙেনি। আর পিটুলি গাছের গোড়ায় ওটা প্রকৃতই মানুষের। সিঁদুরের ছোপ রয়েছে। কিছু কালিঝুলিরও চিহ্ন। কোন ওঝা বদ্যি হয়ত তন্ত্রচালনা করেছিল। ফেলে গেছে। কোন গৃহস্থ একদিন নিয়ে যাবে। সব্জি মাচায় কি ফসলের খেতে ঝুলিয়ে রাখবে।

এই রকম একটা বিচ্ছিরি জায়গা। পোকামাকড়, সাপ, মড়ার মাথা, শ্মশান মশান।

এইরকম জায়গা ওদের দরকার ছিল। এমন নির্জনতা অগম্যতা, আড়াল! নিজের অজান্তে ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু কুঞ্চন জাগে ওস্তাদ ঝাঁকসার। আলোকিত আসরে হাজার শ্রোতার মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে 'রাজা' হয়ে তাকে বলতে হয়—ওরে বিশ্বাসঘাতিনী নারী, ওরে কুলটা, শিরশ্ছেদই তোর প্রকৃত দণ্ড এবং হাতে তলোয়ার কাঁপে, আলোয় ঝলকায় রাঙতার পাত, মিঠিপুরের সঙদার ফজল কোটালের ভূমিকায় করজোড়ে অনুনয় করে—বোকা মেয়ে গো, নাক না থাকলে 'আবিল' খায় ওনারা, ক্ষ্যামা দেন.. এবং লোকে হা হা করে হেসে ওঠে... আর হাঁটু দুমড়ে 'ওই শালার ব্যাটা শালা' নাচিয়ে ছোকরা শান্তি রানির চরিত্রে মিনতির গান গায়, কাঁদে—

সত্যি সত্যি ঢ্যামনা বাচ্চার চোখে অঝোর ধারা চিকচিক করছে দেখে শ্রোতাদের মন গলে যায়, আর ঝাঁকসা ওস্তাদ কোমরে কাঁধের চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে গর্জায়, ম্লাঃ! বাস রে, সে কি হুংকার! ওই কণ্ঠের আওয়াজ শুনে মনেও থাকে না আর উদারা-মুদারা-তারা তিন পর্দর সঞ্চরিনী মিঠে সুরের মন মাতানো গানখানি এই মানুষটিই গেয়েছিল খানিক আগে। মনেই হয় না, এ গানের ওস্তাদ মরমী কবিকার, দরদী ছড়াদার। এ যেন সত্যি সত্যি রাজার রাজা। রাজকণ্ঠ রাজনির্ঘোষ। হোক তার চেহারা 'হেড মাস্টারের মত', গায়ে সাদা জামা, পরনে ধুতি—কোঁচা পাশ পকেটে গোঁজা, সাদা চাদর—সামান্য কুঁজো হয়ে হাঁটে—খাড়া মোটা নাক, চওড়া কঠিন চোয়াল, কাঁচাপাকা অল্পস্বল্প চুল মাথায় ; আসরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে—তবে আমার নাম রাজা বিজয়কেতু, মনের বিশেষ বাসনা হেতু, যাব শিকারে গহন বনের মাঝারে। বেশ মিল দিয়ে বলে যায় একটানা। আটকায় না। লোকে অবাক হয়। মনে মনে স্বীকার করে নেয় তক্ষুনি—হ্যাঁ, ওই রাজা বিজয়কেতু—শিকার করতে বনে চললেন—বহুত আচ্ছা, জোর জমে যাবে কাপ। ওরা বলে 'কাপ'। আলকাপের পালার নাম 'কাপ'। ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, সংস্কৃত-মূলে কাপট্য থেকে কাপ—ব্যঙ্গরসাত্মক নাটক। আর আল—আল মানে হুল, মৌমাছির হুল। মধু খেতে হলে হুলের জ্বালাও সইতে হবে। তাই, কেমন কাপ? না—যার আল আছে।

অবিকল সেই আলকাপ দেখছে চোখের সামনে। কুলোকে ঘেন্না করে বলে, আলকাপ নয়, আলকাটাকাপ। যা কিম্ভূত, যা হাস্যকর, যা উদ্ভট কিংবা যা আদিখ্যেতা—সুরসিকা তাকেই বলে আলকাটাকাপ। ঝাঁকসা আলকাপের ওস্তাদ। সে বলে, হ্যাঁ আলকাপ যেমন আছে, আলকাটাকাপও তেমনি আছে।

এ তাহলে আলকাপও নয়, আলকাটাকাপ। অযথার্থ, কিম্ভূত, উদ্ভট, বিকৃত।

শুধু তাই নয়, গর্হিত। মহাপাপ। এর পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর। সাক্ষী ওই চাঁদ—সারা গায়ে কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন। ওই দেখা, বেলা না যেতে তার উদয় কালবেলায়—পুবের আকাশে খসখসে রুক্ষু চাঁদ। দেকে বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

হ্যাঁ, চাঁদই বটে। কত আসরে সে চাঁদের উপমা ব্যবহার করেছে নাচিয়ে ছোকরাদের বর্ণনায়। বলেছে, মহাশয়গণ। জন্ম যদিও অভাজন 'চাঁই'কুলে. মাতৃভাষা খোট্টাই বুলি, পেশা কিনা নগণ্য সব্জী চাষ, বাস মা জাহ্নবীকূলে—তথাপি বাল্যে গুরুগৃহে গমন করেছি, শিখেছি এ মধুর বাংলাদেশের মধুর বাংলাভাষা—আর কিনা যে পুস্তকের নাম বিজ্ঞান, যার বলে মানুষ আজ বলীয়ান... এইসব আদ্যোপান্ত বলার পর চাঁদের কথায় গেছে ঝাঁকসা ওস্তাদ। রাত্রির শোভা চাঁদ আর আলোকাপের শোভা এই ছোকরা। পুরুষ—তবু পুরুষ নয়, নারী—তবু নারীও না। তবে কী?... হা হা করে হেসে বলেছে, যেমন ওই চাঁদ। নিজের আলো নাই। ধার করা আলো গায়ে মেখে বাহাদুরী করে বলে, দেখ শোভা। আর এ

আলোর মহাজন কেবা?... নিজের বুকে আঙুল ছুঁইয়ে দেশখ্যাত ওস্তাদ বলেছে, মহাজন ইনি। ইনি সূর্য। এই সূর্যের আলোয় রাঙা চাঁদ—তার পুরাণ-কথা শুনুন। চন্দ্রের গুরুপত্নী হরণ আর অভিশাপে অঙ্গক্ষতের বর্ণনায় আসর হয়েছে মন্ত্রমুগ্ধ। হঠাৎ কখন কথা গেছে সুরে—মুদারার চড়া সা থেকে রেতে। ভাঁজে ভাঁজে নেমে এসেছে খাদে। এ যেন কয়েকটি মুহূর্তে ওই ভাগীরথীর বুকে ষড়ঋতুর লীলা ঘটে যাওয়া—কখনও উত্তাল, কখনও গভীর কখনও শান্ত, কভু মৃদু। সারা আসরে অবগাহনের পুণ্য সঞ্চয়। রাত্রি হয়ে উঠেছে জীবনের মত বিচিত্র।

মানুষের জীবন বড় বিচিত্র। কত কী দেখার বাকি ছিল। এখনও কত কী আছে বাকি। শুধু মূক সাক্ষীর মত চুপচাপ থাকা—যেমন রাঙ্গচণ্ডাল লাল ফেটি বাঁধা শিমুল গাছটা—পায়ের নীচে—

ততক্ষণে সম্বৃত হয়েছে গঙ্গা। এক গঙ্গা আরেক গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছে। পাশে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে যে, তার—

মেয়েদের মত দীঘল কেশ, দুহাতে চাঁদির চুড়ি, নীলচে হাওয়াই শার্ট, ডোরাকাটা পাজামা, পায়ে কাবুলী চপ্পল—ফরসা মুখের ওপর শেষ রোদের ঝলকানি তার—চাপা চিবুক সামান্য পুরু কালচে ঠোঁট, মসৃণ নিটোল গাল, টানা চোখ ভুরুর ওপর ছোট্ট কপাল দেখে শুধু তাদের কথাই মনে পড়ে, যারা পুরুষ—তবু পুরুষ নয়, নারী—তবু নারীও নয়। যদিবা পুরুষ, সে-পুরুষ স্মৃতির পুরুষ—পরোক্ষ। যদি বা নারী—সে নারী অ-ধরা নারী, প্রত্যক্ষ কিন্তু বিভ্রম। দেহে কণ্ঠে মনে একান্ত কিন্নর।

পদ্মাতীরে কালীতলা বাজারের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ননীবাবু শান্তিকে বলেছিল সাক্ষাৎ কিন্নর হে তুমি। এ জন্মে আর তোমার মানুষ হবার আশা নেই—এ আমি গুনে বলে দিলাম। দেখে নিও। চুল কাটবে, চুড়ি ভাঙবে, পুরুষ হবে? হয়ত হবে—কিন্তু স্মৃতির জ্বালা বড় জ্বালা। সে ব্যাটা বাঘের মত চিবিয়ে খাবে দেখে নিও। মরবে, জ্বলেপুড়ে মরবে। নিজে মরবে, অন্যকেও মারবে। নামে শান্তি, তুমি অশান্তির দূত সংসারে।

পুরুষ বলে ওকে মানতে চায়নি ননীবাবু। আর লজ্জার কথা—মাতাল দশায় সবার সামনে ওকে জড়িয়ে ধরেছিল। সকালে নেশা ছুটলে সেই ননী ডাক্তার হাসতে হাসতে বলে, তুই ব্যাটা ধরাধামে এক অ-ধরা। খুব জ্বালাবি!

জ্বালাচ্ছে। জ্বালানোর আঁচ কী তীব্র এতদিনে আজ জানল ওস্তাদ ঝাঁকসা। শান্তি আজ অশান্তির দূতের বেশে দেখা দিল! সেই যে বলে বেড়িয়েছে এতদিন, শান্তির পাশেই আছে অশান্তি। শুচির পাশে অশুচি! আজ দ্যাখে গঙ্গার পাশে এ কোন গঙ্গা?

ওস্তাদের আদরের গঙ্গামণি।

মণি বলে যাকে জেনেছিল, গলায় মালার মধ্যমণি করেছিল, সে ঝুটা পাথর, বিলকুল কাচ। নাম গঙ্গা শুনেই গুনগুনিয়ে উঠেছিল একদিন,

সই আমার গঙ্গাজল হে
সই আমার গঙ্গার জল
জন্ম জন্ম ডুবলাম যত পেলাম না তো বুকের তল।।

সেই গান মাত্র তিনটি মাসেই ছড়িয়ে গেছে দেশ-দেশান্তরে। মুরশিদাবাদ ছাড়িয়ে বীরভূম—বীরভূম থেকে দুমকা পূর্ণিয়া সাঁওতাল পরগণা—এমন কি গঙ্গামণির দেশ সেই কালুপাহাড়িতেও। এক সময়ের সাগরেদ সোলেমান এখন ওস্তাদ হয়েছে। কদিন আগে বন্যেশ্বরের মেলায় তার দলের সঙ্গে পাল্লা (প্রতিযোগিতা) ছিল। সোলেমান বলছিল, কালুপাহাড়িতে এক আসর গেয়ে এলাম ওস্তাদজী। ওখানের দলের একটা গান শুনলাম—আপনার ভণিতা। ভারি সুন্দর গানখানা।... সলজ্জ হেসেছিল ওস্তাদ ঝাঁকসা। ধনপতনগরের শ্রীধনঞ্জয় সরকার—এই ওস্তাদ ঝাঁকসা যা বানায়, তাই এমন আলোর মত ছড়িয়ে যাওয়ার গৌরব পায়। সাক্ষাৎ সূর্য আলকাপের জগতে।

সেই সূর্যে যেন হঠাৎ অবেলায় গ্রহণযোগ। চোখদুটো জলে ঝাপসা হয়ে আসে। এতদিন পরে জানা গেল, প্রবলপ্রতাপ বাঘের মত ভয়ঙ্কর মানুষটিকে এক জায়গায় এসে অসহায় হয়ে যেতে হয়।

কিছুই করার থাকে না। সেই অক্ষমতার দরুন দুঃখেই চোখ ফেটে জল আসছে। যুবতী গঙ্গামণির বুকের ওপর তার প্রাণপ্রতিম 'ছোকরা' শান্তিচরণ—এই জঙ্গলময় শ্মশান—এ কি অভাবিত দৃশ্য।

খানিক পরে এই কাণ্ডজে চাঁদটা মাঠের পারে আমবাগানের শীর্ষে ভৌতিক ফানুস হয়ে জ্বলবে। শূন্য আখের ক্ষেতে 'আলসে' বা আখপাতা জড়ো করে চাষারা আগুন জ্বেলে দেবে। ভুট্টার খেতে মাচায় বসে বসে শুয়ার তাড়াতে টিন বাজাবে কেউ। শেয়াল ডাকবে। প্যাঁচা ডাকবে। আর খুব তাড়াতাড়ি নিঃঝুম হয়ে আসা পাড়াগাঁয়ে পৃথিবীতে তখন একদল মানুষের যাত্রা হল শুরু। তীর্থযাত্রার মত হাঁটবে তারা। গভীর রাতে পদ্মাতীরে আমবাগানের নীচে চন্দ্র জুয়াড়ীর জুয়ার আসর। চন্দ্র জুয়াড়ী এবার বিনোদিঘীতে মেলা ডেকেছে। পক্ষকালের পারমিট। এ অঞ্চলের সরল সুবোধ মানুষগুলো পোকার মত মেলার আলোর দিকে ছুটেছে। পক্ষকাল প্রতিটি রাতে গানের আসর বসছে! এলাকায়-এলাকায় ঢেঁড়রা পিটিয়ে এসেছে চন্দ্র জুয়াড়ীর লোকেরা। যাত্রা না, বাউল ভাজা না, ঝুমুর না—স্রেফ আলকাপ। আর আলকাপ যখন, তখন ওস্তাদ ধনঞ্জয় সরকারের একা আসর সাত রাত্রি। পাল্টা দল ঘুঘুডাঙ্গার সোলেমান, হাজিপুরের গোপাল। পাল্লায় টিকলে ওবা রইল। না টিকলে লোক যাবে পদ্মা পেরিয়ে মালদার রহিমপুর। আরশাদ ওস্তাদের হাতে বায়না দিয়ে আসবে। সে আশা অবশ্য সামান্যই। রহিমপুরকে পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। পদ্মার এপার-ওপার ওদের তুল্য দল নেই! এপারের সেরা বলে যশের মালা যে গলায় পরেছে, সেই ওস্তাদ ঝাঁকসাও সবিনয়ে করযোড়ে নতমাথায় বলে, রহিমপুর আমাদের সবার গুরু। যেমন কিনা মহাগুরু দ্রোণ—আর আমি শালা অধম একলব্য—চণ্ডালের ব্যাটা চণ্ডাল, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণা দিতে প্রস্তুত সদা।...অভ্যাসমত হো হো করে হাসে সে। বলে, কোনদিন তো মুখোমুখি হইনি ওনাদের—হলে দেখা যাবে। আসলে রহিমপুর দল কখনও পাল্লার আসরে বায়না নেয় না। ওরা বলে, আলকাপ ছিল সেকালে। একালে আমরা আলকাপকে করে তুলেছি 'লোকনাট্য'। আরশাদ ওস্তাদ শুধু লোকনাট্য বলেই ক্ষান্ত নয়—বলে 'নবনাট্য'। ঝাঁকসা হাসে। ...গাঁয়ের ছেলেটিকে শহুরে পোশাক পরিয়েছ—বাঃ বাঃ চমৎকার! বুলি শিখিয়েছ তোতাপাখির মতন। হতে পার তোমরা গুরু, আমি বাবা ওপথে নেই। গাঁ ঘরের কথা নিয়েই আমার কারবার। গুরুর যা সাজে শিষ্যের সাজে না। আমি নিজের পথেই চলি। তবে কিনা—শিখব, ফাঁক পেলেই তোমাদের কাছে শিখে নেব। কেননা আলকাপের জন্মস্থল হল রহিমপুর। আদিগুরু বোনা কানা—বনমালী দাস, একচক্ষুহীন নাপিত মহাশয় আদিতে জন্ম দিলেন আলকাপের। সে এক হিসট্রি—ইতিহাস!...

বিনোদিঘীর মেলা থেকে চন্দ্র জুয়াড়ী আজ খবর পাঠিয়েছে, রহিমপুর বায়না নিয়েছে। তবে পাল্লার আসরে গাইতে ওদের আপত্তি। সর্ত দিয়েছে, প্রথম আসর—তার মানে আসরের শুরু থেকে শেষরাত্রি অব্দি টানা সময় ওরা নেবে। তারপর আসর ছাড়বে। তখন বিপক্ষদল আসরে নামুক। চালিয়ে দিক সকাল অব্দি। রহিমপুর আর পাল্টা নামছে না। এবং মাত্র দুটো রাত্রের বায়নাই ওরা নিয়েছে। তার বেশি কদাচ নয়।

তার মানে আসরের যৌবনটুকু ওরা লুটেপুটে নিয়ে ঘুমোবে গিয়ে—তোমরা তখন ছিবড়ে চোষ। শেষরাতে শ্রোতার চোখে ঘুমের শেষ এবং প্রচণ্ড টান। অতক্ষণের উত্তেজনার পর গভীর ক্লান্তি। সেই ক্লান্তি ভেঙে নতুন উত্তেজনা জাগানো কম কথা। ফাল্গুন মাস এসে গেল। শীত শেষবারের মত চূড়ান্ত হানা দিচ্ছে। রাতের শেষ প্রহরে ঘন কুয়াশায় পৃথিবী ঢেকে যাচ্ছে। হিম বাড়ছে ভীষণতর। আসরে বড় আড়ষ্টতা, কুণ্ডলীপাকানো বিধ্বস্ত সব শরীর। হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে আসরে দাঁড়িয়ে কণ্ঠ খোলা কঠিন। সুর ফাঁপে। আঙুল জড়িয়ে যায় বাদ্যযন্ত্রে।—

তবু ভাবেনি ওস্তাদ ঝাঁকসা। হাতে আছে এক মোহিনী আগুনের বাতি। পলকে পলকে আলোর তাপে চাঙ্গা করে তোলে শ্রোতার নিস্তেজ মন। চনমন করে ওঠে রক্ত।—

আমার এ প্রথমো গান
তোমারে শোনাব বলে
জেগে আছি সারারাতি ....

শান্তির এই গানখানিই যথেষ্ট। বাসরজাগা গ্রামীণ বধূর লজ্জা আর ক্লান্তি আর ঘুমের আবেশ

মিলিয়ে 'শালার ব্যাটা শালা' যেন সাগর জাগায়—যে সাগরে উজ্জ্বল সোনার তরণী হয়ে ভাসে তার নিটোল দেহখানি, নানা ছন্দে। সে নারী—তবু নারী নয়, স্মৃতিকে যদি বা পুরুষ যদি বা পরোক্ষে কিশোর, সে-স্মৃতি তার ছায়ায় যায় লুকিয়ে—জেগে ওঠে এক অ-ধরা চিরকালের। নিজের রক্তমাংস ত্যাগ করে সে শুধু রূপে ভাসে।

আর আজ সারাটি দিন ওস্তাদ ঝাঁকসা শান্তিকে গান শিখিয়েছে। আদরে বিহ্বলতায় গভীর নেশায় প্রত্যক্ষ করেছে নিজের সৃষ্টিকে। পাশে বসিয়ে খাইয়েছে। হাতে জল ঢেলে দিয়েছে আঁচাবার সময়। বলেছে, তুই ব্যাটা বাগদী সন্তান—আমাপেক্ষা জাতে নীচ, তথাপি ইচ্ছে করে তোর এঁটো খাই। —পরক্ষণে হো হো হো হো স্বভাবসিদ্ধ হাসি।

তা শুনে শান্তি কটাক্ষ হেনে বলেছে, অত ভক্তি ক্যানে গো ওস্তাদজী? জবাই করবে নাকি মোল্লার মুরগিটা? করো না—গলাটা পেতেই রেখেছি কবে থেকে।

এইসব কথায় কিংবা ওই চপল চোখের নাচ দেখে মুহূর্তে ওস্তাদের মন ঘৃণায় কটু। গর্জে উঠেছে হঠাৎ, চুপ, শালার ব্যাটা শালা! ...তারপর ফের হাসি—হো হো হো হো!

এমনি করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রয়াস সারাটি জীবন চলে আসছে। গালটা যখন দেয়, ঘৃণা থেকেই দেয়—কিন্তু যখন হাসে, তখন মুহূর্তে গালটা নিতান্ত কথার কথা হয়ে পড়ে। শান্তি হয়ত বিশ্বাস করে—গালাগালগুলো ওস্তাদের আদরের ভাষা, মুখের কথা—মনের নয়।

তারপর দুপুরে কালঘুমে পেয়েছিল। বিকেলে উঠে দলের লোকজনদের ডাকবার কথা। সবাই এ ধনপতনগরের বাসিন্দা নয়। কারুর বাড়ি তিন মাইল দূরে—কারুর পাশের গাঁয়ে। সঙদার বা কপে ফজল থাকে মিঠিপুরে। সে ওখান থেকে আরেকটা ছোকরা আনবে। দুটো ছোকরা না হলে কাপে (ব্যঙ্গরসাত্মক পালা) বড় অসুবিধা হয়। দুটি স্ত্রী-চরিত্র থাকলে শুধু শান্তি দিয়ে তো চলে না।

ঘুম ভাঙল বেলা গড়িয়ে। প্রথম লোক পাঠানোর ব্যস্ততা—তারপর শান্তির খোঁজ। শান্তি বাইরের আটচালাটায় মাচার ওপর রোদে ঘুমোচ্ছিল। তার পাত্তা নেই। ওস্তাদ আজ গঙ্গামণির ঘরেই দিনটা কাটিয়েছে শান্তিকে নিয়ে। রাতে বায়না না থাকলে রাতটাও কাটানোর ইচ্ছে ছিল। কত ভাগ্যে মাসের মধ্যে দু-একটা রাত বাড়িতে এসে ঘুমনোর সুযোগ মেলে। তবে সেও এক ঝামেলার মধ্যে পড়া। বড় মোল্লান অর্থাৎ বড় গিন্নির দাবি সবার আগে। সেখানে তিনটি পুত্র, এক কন্যা। বড় সংসার। কমলবাসিনী মধ্যযৌবনেই হাড়গিলে রোগা কুঁজো আর তেমনি কুঁদুলি মেয়ে। সেথা সুখ থাক ভালবাসার, স্বস্তি নেই। মেজ মোল্লান সুখলতা সাক্ষাৎ বাঘিনী। বাঁজা মেয়ে। দূর থেকেই করজোড়ে এগোতে হয়। পয়সাওলা বাপের মেয়ে। বাপ শম্ভু চাঁই আজকাল ট্রেনে সবজি চালান দিয়ে একতলা ইটের বাড়ি তুলেছে। হয়ত সেই গিদেরে মাটিতে পা পড়ে না সুখলতার। স্বামীর ছিটেবেড়ার দেয়ালঘেরা খড়ের ঘরে বন্দিনী পায়রার মত সদা বকবকম কলকণ্ঠ। আর ছোটকি এই গঙ্গামণি—কালুপাহাড়ি থেকে পালিয়ে আসা ঢপদলের অজ্ঞাতকুলশীলা যুবতী মেয়ে। আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যে বয়স। ওর জন্যই ওস্তাদ গাঁয়ে একঘরে।

হোক—তবু দেশখ্যাত ওস্তাদ মানুষ। গাঁয়ের সমাজ ছাড়িয়ে আরও বড় পৃথিবীর চৌহদ্দিতে তার চলাফেরা। তার কিছু যায় আসেনি তাতে। পয়সাকড়িও বেশ কামায়। তিন জায়গায় তিন বউর বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে। সামান্য পৈতৃক খেত আছে। দুই গিন্নির মধ্যে তা সমান ভাগে বণ্টিত। ছোট পায় শুধু নগদ টাকাকড়ি।

আর সবচেয়ে মজার কথা, এই তিন মাসে গঙ্গামণিও একঘরে থাকার ব্যাপারটা ধাতস্থ তো করেছেই, অন্য বউদের মতো তার এতে কোন মাথাব্যথা নেই—উপরন্তু পাড়ায় ইতিমধ্যে তার ভাবসাবও গেছে বেড়ে। ওর দিনরাত্রি একা কাটে না। নির্মলা আছে, মধুমতী আছে—কত বৌঝি ওর আশেপাশে সব সময় ছায়ার মত ঘোরে। দল বেঁধে জলকে যায় গঙ্গার ঘাটে। সাঁতার কেটে আসে। এমন কি অবিকল চাঁই বুলিতে বলে, চল্ গে নির্মলা, নাহান করোগে গাঙমে। নির্মলা হাসলে সে বলে, কা হো রঙ্গিয়া, এত্তা হাস গাইলে কাহে?

ওস্তাদ ভেবেছিল, গঙ্গামণি যথারীতি জলকে গেছে। শীতের দিনের ঘুম—রাত জাগা মানুষের পক্ষে

বেশ গাঢ় হবার কথা। উঠেই দেখে, ঘর শূন্য। চা খেতে ইচ্ছে করছে। তবে ওদিকে লোক পাঠানো ইত্যাদি নানারকম প্রস্তুতি আছে। সকাল সকাল সেথায় পৌঁছতে হবে। শান্তি সাইকেলে মিঠিপুর যাবে ফজলের বাড়ি। কিন্তু শান্তি নেই।

বলা যায় না, যে আত্মভোলা ছেলে—হয়ত গুণমুগ্ধ ভক্তদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে। সেই ভেবে গঙ্গার পাড়ে খোঁজখবর নিতে এত দূর খেয়ালবশে চলে আসা। হঠাৎ একটা ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে পড়ন্ত বেলার অল্প রোদে শ্মশানের শিমুলতলায় একজোড়া মানুষ দেখতে পেয়েছিল। দুজনেই যেন মেয়েমানুষ—একজন তো গঙ্গাই বটে, অপরজন কি নির্মলা, নাকি মধুমতী—তাহলে ওই শ্মশান মশান আঘাটায় কেন? বুক ধড়াস করে উঠেছিল।

চুপিচুপি ঝোপঝাড় ভেঙে এখানে আসতেই চোখে পড়েছে চাবুক। কী জ্বালা কী যন্ত্রণা।

গায়ে গায়ে জড়াজড়ি যেন দুটি নাগনাগিনী জোড় বেঁধে শুয়ে আছে।

আস্তে আস্তে ঢালু পাড় বেয়ে শান্তিকে নেমে যেতে দেখে গঙ্গা বলে, ও কি! এ অবেলায় নাইবে নাকি? গা মুছবে কিসে?

নিস্তেজ গলায় ওর জবাব আসে, চুল দিয়ে মুছিয়ে দিও—এত মায়া যদি! সেই সঙ্গে সামান্য হাসি—কেবল চোখ দুটোই যা হাসে। ওর চোখ দুটো এত সুন্দর! বড় দুঃখ লাগে! সংসারে বেচারার আপনজন বলতে কেউ কোথাও নেই। এ উঠন্ত বয়সে এখনও মেয়ে সাজবার পাগলামিতে সায় দিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। ভাল খেতে পায়, ভাল পরতে পায়, নাম যশ প্রশংসা মেলে। কিন্তু ও যে পুরুষ, তা ওকে ভুলে থাকতে হয়েছে। সেই ছেলেবেলা থেকে হাতে চুড়ি, মাথায় চুল, নাকে নাকছাবি—হাস্যকর একটা হিজড়েপনা যেন। তবু কারও কী ঘেন্নাপিত্তি আছে কোথাও? আলকাপের ছোকরা—ব্যস, পরোয়ানা মিলে গেল—আর কী চাই? ঘৃণা, ঘৃণা! ঘৃণা যে এত বেশি হয়, গঙ্গা জানত না কোনদিন। গঙ্গা বলত, তোমার লজ্জা করে না মেয়ে সাজতে? ...তা শুনে শান্তি অবাক হয়েছে। সে কি গো! তাহলে ওস্তাদের যে দল অচল হয়ে যাবে। গঙ্গা বলেছে, হবে হবে। তোমার তাতে কী? পরক্ষণে চমকে উঠত সে। তুলে দেবে না তো গুরুমশায়ের কানে। না, তোলে নি শান্তি।

জামা পাজামা সব খুলে আন্ডারপ্যান্ট পরে ঠাণ্ডা কালো জলে নেমেছে শান্তিচরণ। আলকাপদলের মানুষেরা বড় নিলাজ হয়। গঙ্গা দেখেছে। শান্তি পুরো ন্যাংটো হয়ে জলে নামলেও অবাক হত না সে। কিন্তু কী ফরসা দুধের মত ঝকঝকে শরীর শান্তির। কী নিটোল। সব সময় শরীরটা মেয়েদের মত ঢাকা থাকার ফলে এই রকম হয়েছে। তেমনি নরম আর অপটুও। বিকৃতি ঘটবার ভয়ে ওস্তাদ ওকে এতটুকু খাটতে দেয় না। কাপড় কাচাও বারণ। ওস্তাদ বলে, এ নামতা ভুলো না—চলনে বলনে শয়নে স্বপনে তুমি নারী—সর্বদা নারী তুমি ভাবনায় ইচ্ছায় আহারে বিহারে। তবে না আলকাপের সার্থক ছোকরার জন্ম! প্রথম-প্রথম গঙ্গা সকৌতুকে বলত, তা এত হাঙ্গামার দরকার কী বাপু? মেয়ে রাখলেই পার দলে। ছাগল দিয়ে গরুর কাজ কেন? ঝাঁকসা ওস্তাদ হেসে উঠত। —কেন? তোমার সাধ যাচ্ছে নাকি? কিন্তু ছোটকি, কথাটা কী জান? তাতে মায়া জমে না।

গঙ্গা অবাক। —মায়া? তার মানে!

গম্ভীর হয়েছে ওস্তাদ। হ্যাঁ, তার নাম মায়া। সে তুমি বুঝবে না। সে বড় গুহ্য তত্ত্ব। দ্যাখ না ছোটবউ, ঝুমুরকে তাড়িয়ে দিল আলকাপ। বীরভূম ছিল ঝুমুরের আদি ঠাঁই। বীরভূমে আজ ঝুমুর মেয়েদের অন্ন জোটে না। রক্তমাংসের শেষ কথা রক্তমাংস—ব্যস, কথা ফুরুলো, নটে মুড়ুলো। কিন্তু মায়ার শেষ কথা নেই। সে তুমি বুঝবে না। ঝুমুর মেয়ে এলোকেশী এখন মল্লারপুর চালকলে মজুরনীর কাজ করে সাত সিকে রোজ মাইনেতে। আর আলকাপের ছোকরার কপাল দেখ। বড় কঠিন মায়ায় বেঁধে রেখেছে পদ্মার এপার-ওপার।

গঙ্গা সেই মায়াঝাঁপির ঢাকনা খুলে ভিতরটা ছুঁল আজ। নিষিদ্ধ গণ্ডিরেখা পেরিয়ে যেন সাতশ রাক্ষসের প্রাণভোমরা ছুঁল একবার। বুক ঢিপ ঢিপ করে। কোথায় বুঝি আকাশপাতাল তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে।

গঙ্গা উঠে দাঁড়ায় হঠাৎ। শীতের ভয়—তবু নাইতে ইচ্ছা করে। নির্মলারা এখনও দূরের ঘাটে তার জন্য অপেক্ষা করছে। দেরি হয়ে গেল কিছুটা। ঝোপঝাড়ের দিকে আসবার স্বাভাবিক অজুহাত একটা আছেই! সেজন্যে ভয় নেই। কিন্তু কেউ দেখল না তো?

শান্তি হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে আসছে।

প্রথমে বাঁদিকে তাকায় গঙ্গা।

এখানে গঙ্গা দুকূলেই বেশ ভরাট। এপার ভাঙা ওপার গড়ার খেলা নেই। আঁটোসাঁটো নিটোল মাজাঘষা দেহে গঙ্গা এখানে গঙ্গার মতই চিরযৌবনবতী। বাঁদিকে ঝাপসা হয়ে পড়েছে কুয়াশার নীলচে আড়ালে ছোট্ট শহর জঙ্গিপুর। দূর ঘাটে অস্পষ্ট পারাপারের মানুষ, নৌকো, মোটরগাড়ি। কাছাকাছি কেউ নেই।

তারপর সামনে ওপারে তাকায়।

ধু-ধু মাঠে সন্ধ্যার আবছায়া নেমেছে। বুনোহাঁসের ঝাঁক উড়ে আসছে। আখের শূন্য খেতে কারা সবে আগুন জ্বেলে দিল। সরষের হলুদ ফুলে অন্ধকারের আঙুল নামছে। গঙ্গার বুকে উজ্জ্বল স্তনের মত সাদা ঢিবি আর বুকের ওপর নেমে আসা কালো চুলের মত শান্ত স্তব্ধ জল ঘিরে হালকা গোলাপি ছটা। জলচরা পাখিরা উড়ে যাচ্ছে পাড়ের দিকে।

ডাইনে তাকিয়ে ছোট্ট গ্রাম ধনপতনগরের নিচে ঘাটটা দেখতে পায়। নির্মলারা এখনও ঘড়া মাজছে।

তারপর হঠাৎ—মুহূর্তে পিছনের কথা মনে পড়ে।

ওটা শ্মশান। ওখানে কেউ আসে না। ঘন ঝোপঝাড়, হাড়, মড়ার মাথা আর বিষাক্ত পোকামাকড়ের আড্ডা। কেন আসবে? আসবে—মৃত্যু হলে তবেই আসবে। এতক্ষণ কোন হরিধ্বনি তো ওঠেনি ওদিকে।

গায়ের ওপর আছড়ে পড়ল রক্তের গোটার মত কয়েকটা শিমুল ফুল! অকারণ বাতাস এল কাঁপিয়ে। গঙ্গার জলে ঢেউ তুলে চলে গেল চরের দিকে। মরশুমের প্রথম ঘূর্ণিবাতাস হয়ত এইটাই। খড়কুটো উড়ছে। এতদূর থেকে চরের ওপর ঘুরন্ত একটা হলুদ পাতা নজরে পড়ছে। পা বাড়িয়ে ফের তাকাল ঝোপের দিকে। তারপর থমকাল গঙ্গা। বুকে হাতুড়ি পড়ল জোরে। পলকে সে সাঁৎ করে আকন্দঝোপে ঢুকে হনহনিয়ে ঘাটের দিকে চলতে থাকল।

আর ওস্তাদ ঝাঁকসা শিমুলতলায় দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ডেকেছে, শান্তি!

আর শান্তি—শান্তিও ক্ষিপ্রহাতে জামা পাজামা জুতো কুড়িয়ে নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে জলে। জল বুকসমান মাত্র। ওপারে চর। তারপর ফের হাঁটুডোবানো খানিক জল। তারপর পাড়।

প্রাণভয়ে তাড়া খাওয়া শেয়ালের মত পালিয়ে যাচ্ছে ছোঁড়াটা। কিন্তু ভাঙা গলায় অসহায় লোকটা শুধু চেঁচিয়ে ওঠে, শান্তি, শান্তি!

সাড়া আসে না। সামনের আবছায়া আর গঙ্গার কালো জল মিলে এক অখণ্ড ব্যাপক অন্ধকার—তার শিয়রে রক্তের মত জ্বলন্ত লাল ছটা। যেন স্বয়ং রক্তমুকুটপরা অন্ধকারবর্ণ নরক শান্তিকে এইমাত্র গ্রাস করে নিল।

ওস্তাদজী।

উঁ।

ব্যস, ওইটুকু মাত্র সাড়া। যতবার ডেকেছে ফজল, একই অস্ফুট আওয়াজ মাত্র। সারা জীবনের সঙ্গী লোকটা আজও দুর্বোধ্য ফজলের কাছে। অত বড় টানা টানা চোখ দুটো কবে একদিন হয়ত সরল ছিল। মনের ভাব বোঝবার পক্ষে ছিল খুবই সহজ। হয়ত সে তার ছেলেবেলায়—যখন সে গাঁয়ের মোড়ল তার বাবার সঙ্গে শকরকন্দ আর সরবতি আলুর খেতে গেছে, দেখেছে কালো জলের গভীর সুন্দর নদী, নদীর পারে সুদূর আকাশ, দেখেছে জলকে যাওয়া মেয়েদের চপল হাসির ঘটায় কেমন

করে এপার থেকে ওপার ঝলমল করে ওঠে। সেই চোখ লোকটা রাত জেগে-জেগে হারিয়েছে! দুনিয়ার সবার থেকে ও এখন আলাদা মানুষ। ওই ঘোলাটে নির্ঘুম অদ্ভুত চোখে কী সে ভাবে, কী সে করতে চায়, টের পাওয়া ভারি কঠিন। ও এখন চিরকালের রাতের মানুষ—আসর ছাড়া ওর কোন আলাদা জগত নেই। যখন কথা বলে, মনে হয়, আসরে দাঁড়িয়ে আছে—সেই সুরে কথা বলছে—যে সুরে সে কাপ দিতে বলে ওঠে—তবে আমি হলাম রাজা বিক্রমাদিত্য, সুবিচারে ভুবনবিদিত, ঘর আছে সতী, নাম ভানুমতী—

কিংবা ছড়ার ধুয়ো গেয়ে ওঠে,

নদীর স্রোতের মত কালের গতিতে আমার
হেলায় বেলা বহে যায় গো।

লোকটা ওই হেলায় বেলা বহে যাবার ব্যস্ততায় ছটফট করে মরে যেন। ফজল, ওরে ফজ্‌লা, এত হয়েও কিছু হল না রে ভাই! ফজল যদি বলে, কী হল না ওস্তাদ? অমনি ধনঞ্জয় সরকার ধমক দিয়ে বলবে, সে তুই বুঝবি না রে শালা কাঠুয়া ব্যাঙ কুন্‌ঠেকার (কোথাকার)। ফজল একটু হেসে চুপ করে যাবে। মনে মনে বলবে, ভুলোর পেছনে ছুটছ কী ওস্তাদ—পুরুশ কখনও নারী হয় না।

চাঁদ ততক্ষণে বাঁশবনের মাথা পেরিয়ে গেছে। মস্ত ডাগর চাঁদ। পুরুষ কখনও নারী হয় না—কথাটা ফের তার মনের মধ্যে আটকানো পোকার মত ছটফট করছে। পুরুষ কখনও নারী হয় না—তার মানে 'নারীলোকের' যা সব সুন্দর সুন্দর জিনিস—ভালবাসা বল, মায়া মমতা বল, স্নেহ বল, কি দয়া ধর্মই বল, পুরুষলোকের মধ্যে আশা করেছ কি মরেছ! তত্ত্বকথা আমিও তো কম জানিনে ওস্তাদজী! হত যদি শান্তি কোন স্ত্রীলোক, কখনও অমন করে বুকে 'হন্তা' দিয়ে পালাত না! ও শালা আলকাপের ছোকরা বেইমান কালসাপ। দুধকলা দিয়ে পুষে একদিন বুকে দংশন করবেই করবে। ধিক ওস্তাদ, তোমার শিক্ষা হল না এখনও। ঠকতে জনম কেটে গেল—এখনও নেশা ছাড়ল না। কবে থেকে তোমাকে বলে এসেছি, সাবধান—বেশি মত তালিম দিও না, উড়তে শিখলেই অন্য ডালে গিয়ে বসবে।

এসব কথা বলার জন্যই ফজল বারকতক ডেকেছে, কিন্তু ওদের ভাবসাব দেখে মুখ খুটে আর বলা যাচ্ছে না। একটা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চুপ করে থাকছে। কাকে কী বলতে যাচ্ছে? লোকটা তো কম জ্ঞানের জ্ঞানী নয়।

ফজলের বাড়ির উঠোন থেকেই যাত্রা শুরু হত মেলার দিকে। কয়েক মাইল পূর্বে পদ্মার ধারে বিনোদীঘি গ্রামটা। দীঘির পাশে আমবাগানের মধ্যে মেলার ধুম। উপলক্ষ তেমন কিছু নেই—চন্দ্রমোহন জুয়াড়ির কাণ্ড। গ্রামের ধনী ভদ্র লায়েক মানুষদের বশ করেছে টাকা দিয়ে। ওই টাকায় দশের কোন কাজ হবে সেখানে—ওঁরা তাতেই সন্তুষ্ট। মেলার যাবতীয় দায়িত্ব চন্দ্র জুয়াড়ির। ওদিকে পদ্মা-জলঙ্গি এদিকে ভাগীরথী—'বাঘড়ী' থেকে 'কালান্তর' অঞ্চল অব্দি তার জুয়ার রাজ্যপাট। সাত-আটটা জুয়ার ফড় পাতা থাকে মেলায়। চন্দ্রমোহনের চেলারা সেখানে বসে কালোয়াতি গলায় হাঁকডাক করে। গুটি চালে। চন্দ্রমোহন সব দেখাশোনা করে। হার হলে টাকা জোগায়, জিৎ হলে কুড়িয়ে বেড়ায়। আর তার বডিগার্ড হচ্ছে কুখ্যাত সলিম। সলিমেরও অনেক চেলা-চামুণ্ডা রয়েছে। যেন ছায়ার আড়ালে গুরুর হুকুম তামিলে ওঁৎ পেতে থাকে। মেলার গোলমাল লাগলে তারা বেরিয়ে আসে আওয়াজ দিয়ে। বাস, পলকে মেলায় সূঁচ পড়লেও আওয়াজ যায় শোনা।

তার বায়নায় গান। বায়নাপত্রে সই দেবার আগে গানের দলকে একশোবার ভেবেচিন্তে নিতে হয়। আসর ফেল করলে গঙ্গার পূর্ব পাড়ে আর আসরে নামবার সাধ এ জন্মের মত ত্যাগ করা ভাল।

ফজলের হাতের মুঠোয় সেই বায়নাপত্রের একটা কপি। বেশ শীত পড়েছে এবার। মুঠিতে কোন অনুভূতি নেই—ঠাণ্ডায় জমে গেছে আঙুলগুলো। ওস্তাদ উঠোনে এসে মোড়ায় বসেছে তো বসেছেই, ওঠবার নাম নেই। তাই তার যেমন, তেমনি দলের লোকগুলোরও হিম বাঁচিয়ে দাওয়ায় ওঠা চলে না। ছোকরাহারা ওস্তাদ—যেমন মণিহারা ফণি—জ্যোৎস্নায় স্তব্ধ হতবাক লোকটাকে দেখে সবার বুকের মধ্যেটা চিনচিন করে উঠছে।

ছোকরা আরেকবার অবশ্য পালিয়েছিল। তবে এমন হঠাৎ বায়নার রাত্রেই নয়—অনেক আগে।

ফুরসৎ ছিল ফের আরেকটা জোগাড় করার। আলকাপের দল প্রতিটি গ্রামে কমপক্ষে একটা করে রয়েছেই। সে-সব দলে জানাশোনা কোন ভাল নাচিয়ে-গাইয়ে ছোকরা থাকলে, নানা কৌশলে তাকে মুঠোয় আনা যায়। কিছুকাল তালিম দিলেই—যদি ঠিকঠাক ঘিলু মগজে থাকে, আর থাকে বিধিদত্ত কোন মহিমা—দেহের ছন্দে কি মনের গড়নে—সে ছোকরা তখন আর এক মোহিনী-মায়া। একটি কটাক্ষে আসর অবশ।...

সুফল ছিল ওস্তাদের প্রথম ছোকরা। বেশি টাকার লোভে সে অন্য দলে পালিয়েছিল একদিন। তারপর এল শান্তি। বাগদীর ছেলে—মা-বাবা হারা অনাথ, এঁটোকাটা কুড়িয়ে খেয়ে বেড়ায় গেরস্থবাড়ি। একদিন ওস্তাদ ঝাঁকসা গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে আছে, শোনে ভারি মিঠে গলায় একটা বার তের বছরের আধ ন্যাংটা ছেলে আপনমনে গান গাইছে। জলের ধারে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে ছেলেটি। কী সুন্দর চেহারা! শামুক গুগলি খেয়ে বেঁচে আছে বলেই কি অমন গলার স্বর? ওস্তাদ ভাবত।

বড় সাধে নাম রেখেছিল শান্তি। কারণ, মনে তখন ঘোর অশান্তি—অন্যের দলের ভাল ছোকরা হায়ার করে বায়নার আসর তুলতে হয়। তাতে বড় অসুবিধা—হাতে নিজের তলোয়ারটি না থাকলে কি রণক্ষেত্রে মান বাঁচে না মাথা বাঁচে?

সেই শান্তি!

ফজল ফেরে ডাকে, ওস্তাদজী!

ফের তেমনি অস্ফুট সাড়া—উঁ?

চন্দ্র জুয়াড়ির বায়না খ্যাল রাখুন কিন্তু। ফজল মরিয়া হয়ে বলে কথা।

এবার একটু নড়ে ওঠে ধনঞ্জয় সরকার। আবছা জ্যোৎস্নায় উঠোনের ওপর যথারীতি হারমোনিয়াম বাক্স—তার ওপর ডুগিতবলা বাঁধা, দুখানা খাপে মোড়া ছোট্ট তলোয়ার, শান্তির পেন্টের বাক্স—যা ফজলের বাড়িতেই থাকে—এইসব কিছু তৈরি। আর তার পাশেই বসে আছে 'বাহক' রঘুনন্দন। বিড়ি টানছে এক মনে। হুকুম পেলেই মালপত্র মাথায় তুলে সবার আগে হাঁটতে শুরু করবে। বেশ বোঝা যায় মাথার 'বোঁড়ে'টা পাছার নিচে রেখে সে আরামে বসে আছে। গা-মাথা ঢাকা তুলোর কম্বল—ওস্তাদের দান। হাবাগোবা মানুষ—কী ঘটেছে যেন কিচ্ছু টের পায় না।

বিকেল থেকে ফজলের বাড়ি এসে সবাই বসে রয়েছে কথামত। ওস্তাদ আর শান্তি আসবে সন্ধ্যায়। উঠোনে মাদুর পেতে দিয়েছে ফজল। চা করে খাইয়েছে। ফজলের বউ এ সবের মধ্যে নেই। স্বামীকে গানের দল ছাড়ানোর জন্যে নিজের কলজেটা পীরের থানে মানত দিতে সে সব সময় তৈরি। ফজল গ্রাহ্য করে না। ওর মুখ চললে এর চলে হাত। লোকজন জোটবার আগে একদফা ঝামেলা হয়ে গেছে। একমাত্র ছেলেটির গায়ে জ্বর! ওষুধ পথ্যির নাম গন্ধ নেই—বেচারা মেয়ে হয়ে যাবেই বা কোথায়? ডাক্তার বলতে সেই এক জঙ্গিপুর শহর—এক মাইল হেঁটে যেতে হয়। মিঠিপুরে কবরেজও নেই—আছে এক ওঝা। ছেলেকে কি ভূতে ধরেছে যে ওঝার বাড়ি যেতে হবে? গনগনে উনুনের পাশে ফজলের বউ ছেলেকে কোলে নিয়ে আগুন পোহাচ্ছে। উজ্জ্বল অঙ্গারের ছটায় তার দুটো ভিজে চোখ দেখবার অবকাশ কারও নেই। আপন মনে নিঃশব্দে কাঁদছে সে। কতদিন এমনি করে কাঁদে।...

ওস্তাদ ঝাঁকসা যেন ঘুম থেকে জেগে এক মনে বলে, ফজল লম্ফটা আনবি?

দাওয়ায় লম্ফ জ্বলছিল। উঠে গিয়ে নিয়ে আসে ফজল। হারমোনিয়াম বাক্সের ওপর রেখে বলে, পত্র লেখবেন জুয়াড়িকে? তাই ল্যাখেন বাবু, দৈবের মার—কী করি।

ওস্তাদ একটু হাসে। —না রে ভাই। কই, দেখি বায়নাপত্রটা। ভাল করে পড়েও দেখিনি সেদিন।

ফজল বায়নাপত্রটা দেয়। পুরো ডেমি কাগজ—একটা নকল চন্দ্র জুয়াড়ির কাছে আছে। ঝাপসা লাগে অক্ষরগুলো। চন্দ্র জুয়াড়ির আসরে নতুন গান নয়, আজ নতুন বায়নাপত্র নয়—কত বছর কেটে গেল ওর মেলাগুলোয়। ফজল সন্ধিগ্ধ মনে বলে, আইনের ফাঁক খুঁজছ ওস্তাদজি? ও শালা উকিলের বাবা। মুসাবিদা যা করে, হাকিমের সাধ্যি নাই তার...

ওস্তাদ ঝাঁকসা হাত নেড়ে থামবার ইসারা করে। বিড়বিড় করে পড়তে থাকে—

... ঝড় বৃষ্টি আদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া কোন মতে বায়না খেলাপ করিব না। ... পড়তে পড়তে

হেসে ওঠে আপন মনে। বলে, শালা জুয়াড়ি বড্ড হুঁশিয়ার। বাঁধা গৎ ঝেড়েছে। যেন, বাবা মরুক বা মা মরুক, কি ঘরের মাগটাই দুম করে মরে যাক, তাও ছাড়ান নাই!

দলশুদ্ধ হাসে এ কথায়। এতক্ষণে স্তব্ধ মুখগুলো গুঞ্জনে নড়ে ওঠে।

ফের বাকিটা পড়তে থাকে ওস্তাদ ঝাঁকসা। ইতি বাইশে মাঘ, সন তেরশ, উনষাট ... ফজল। ...হঠাৎ চমকে উঠে ডাকে সে। এটা উনষাট সন?

ফজল বলে, কে জানে? ক্যানে গো?

কয়েক মুহূর্ত গুম হয়ে থাকে ওস্তাদ ঝাঁকসা। তারপর আস্তে আস্তে বলে, সন তারিখের হিসাব রাখি না রে ভাই—দিন যায় না রাত যায়। আমার তো সবই সমান—অন্ধের মতন থাকি। ফজল! উনতে কী আছে রে?

হাল ছেড়ে ফজল বলে, জান্নে বাবা। মুরুক্ষু মানুষ, সাতে পাঁচে নাই।

কেমন হাসে ওস্তাদ ঝাঁকসা। উনপঞ্চাশে আমার সুফল পালাল—তোর মনে নাই ফজল?

আমার সুফল। হাসি পায় কথাটা শুনলে। ফজল হাসে না। চুপ করে থাকে।

পাগল হয়ে বসে থাকতাম গঙ্গার ধারে। তখন আমার প্রথম যৌবন। বড় বউ ধরে নিয়ে আসত বাড়ি। প্রহ্লাদের মা তখন প্রতিমার মত রূপসী—আঁ? হঠাৎ সশব্দে হো হো করে হেসে ফেলে ধনঞ্জয় সরকার। ...তবু শালা এ পাপীর মন ভরল না, হৃদয় জুড়াল না। এর মনে পাপ, চোখে তার ছাপ পড়ছে। লোক খবর দেয় সুফল আমার অমুক দলে অমুক মেলায় গান করছে। একবার গেছি সাঁইথিয়ার ওদিকে একটা মেলায়। গিয়েই শুনি আগের রাতে পাকুড়ের দলের গান হয়ে গেছে—দারুণ এক মোহিনী ছোকরা এসেছিল—সুফল তার নাম। অন্য কোথায় বায়না আছে বলে চলে গেছে। ওঃ কী আফসোস, কী আফসোস। শালাকে সামনে পেলে কলজেটা ছিঁড়ে খাই, নয়ত...

ফজল বাধা দিয়ে বলে, পুরনো কথা থাক ওস্তাদ। বায়নার কথা ভাবুন।

ওস্তাদ ঝাঁকসা কান করে না। শালা ঢ্যামনা আমার বুক খালি করে দিলে। বুকখানা গ্রীষ্মকালের আকাশের মত জ্বলে। বিবাহ করলাম। বুক ভরবার বড় আশা নিয়ে বিবাহ করলাম। কিন্তু ফজল, কী হল? সে জ্বালা তো শেষ হল না। সুফল যা দিয়েছে তা তো কেউ দিতে পারল না। জ্বালা নিয়ে ছটফট করে মা জাহ্নবীর ধারে গিয়ে বসে থাকি। একদিন হঠাৎ যেন মা আমার বড় দয়া করে সামনে তুলেছিলেন ওই শান্তিকে। আঃ ফজল রে, সে কি দিন, সে কি আনন্দ। ফের আকাশের চাঁদ পেলাম হাতের মুঠোয়। তোর মনে পড়ে না ফজল? কিন্তু ভাই, সুফল শান্তি নয়। শান্তি সুফল নয়। সুফল যাই করুক, শান্তির মত ... হঠাৎ সতর্ক হয়ে থেমে যায় ওস্তাদ ঝাঁকসা।

স্মৃতিচারণায় যে আবেশ, তাতে ডুবে থাকলে এ আবেগবিহ্বল কথাটার জবাব দেওয়া যেত। ফজলের মন পড়ে আছে বিনোদিঘীর আসরে। চন্দ্র জুয়াড়ির বাঘের মত অন্ধকার থেকে তাক করছে—অবিকল দেখতে পাচ্ছে সে। গা শিউরে ওঠে। ফজল হিসেবি এসব ব্যাপারে—ওস্তাদের মত মরিয়া নয় সে। তাই সে বলে, ছাড়ান দ্যান জী, ছাড়েন। ভবিষ্যৎটা ভাবেন।

কখনও আপনি, কখনও তুমি বলা ওর অভ্যাস। সঙদার মানুষ—বলতে গেলে আলকাপের আসরে ছোকরার মতই তার অস্তিত্ব এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ছোকরা যেমন তেমনি সঙদার বা সঙাল বা ক'পে না থাকলেই চলে না। লোক হাসাবে কে? এ তো মূলে রঙ্গরসের নাট্য! সঙদার ফজল বাঘড়ি অঞ্চলের বুলিতে বলে ওঠে, চলেন ওস্তাদ—আমি শালা কাঠুয়া ব্যাঙ তো আছিই—গোপলার সঙ্গে পাল্লা, ডর কিসের? জোর রঙ ধরে দিব বরঞ্চ—ক্যানে, সেই পুরনো আমলের খাস্তা কাপগুলান?

কথাটা তা নয় ফজল, কথা আছে।

কী কথা?

আছে। তা তোকে বলা যাবে না রে ভাই।

ফজল অবাক হয়েছে। এই প্রথম সে শুনল—কী একটা কথা ওস্তাদ তাকে বলতে পারবে না। শুনে মনটা কেমন করে ওঠে। বুকে হাতুড়ি পড়ে হঠাৎ। সে বলে, আমাকে না বলার মত কিছু আছে ওস্তাদজি? বেশ, বল না। শুনব না।

হয়ত বলব, বলব না ... নিস্তেজ কণ্ঠে ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে। সে কথা এখন থাক। বায়নাপত্রে দেখছিলাম, শান্তিচরণের নামে কিছু লেখা আছে নাকি। নেই। থাকলে একটু কঠিন হত। ওকে নিয়ে গান না করলে টাকা দিত না জুয়াড়িটা। তা ফজল, তুই বলছিস, গান চালাতে পারবি?

আলবৎ পারব। ফজল লাফিয়ে ওঠে।

কে জানে! অঙ্গহানি তো বটে। ওস্তাদ ঝাঁকসা উঠে দাঁড়ায়। ...ওঠ, ওঠ সবাই। ভেবে আর কী হবে রে বাবা! যে পথে হাঁটছি, ওই পথেই মৃত্যু হোক---পথ বদলালে ডাঙায় তোলা মাছের মতন ধড়ফড় করে মরব হয়ত। জয় মা বাকবাদিনী কী জয়!

লোকগুলো অস্ফুট কণ্ঠে জয়ধ্বনি দিয়ে দাঁড়ায়।

ফজল রান্নাঘরের দিকে কয়েক পা এগিয়ে বলে, খিল এঁটে শুয়ে পড়ুক ঘরে। আর বাইরে ক্যানে?

পাল্টা জবাব আসে। ...যে দোজখে যায়, সে যাক। আবার কথা ক্যানে?

ওস্তাদ ঝাঁকসা চাপা গলায় বলে, ফজলাটার ঘর যেমন, আসর তেমনি। ও ব্যাটা মানুষ হবে না কোনদিন। কপে হয়েই থাকল—কপে হয়ে মরবে। চাই কি আজরাইলের সঙ্গে মস্করা করে বেহেশতটা মাগনী মেরে দেবে! ব্যাটা খোদার খাসি কাঁহেকো।

সবাই হাসতে হাসতে পথে নামে। মিঠিপুরের সেই 'কাঁনাপুকঁড়ে' ছোকরাটা এতক্ষণ ঝুপসি হয়ে মন মরা বসেছিল একান্তে। এবার মাথা থেকে কম্ফোর্টার খুলে অকারণ জ্যোৎস্নায় বেণী বাঁধা চুলের গোছাটা হাত দিয়ে টানে। বুকের দিকে ফেলে রাখে। মেয়েলি ভঙ্গিতে শরীরটা একটু দুলিয়ে সে ওস্তাদের পাশে পাশে হাঁটে। ওস্তাদ তবু তার দিকে লক্ষ্য করছে না জেনে সে একটু ছ্যাবলামি করতে চায়। বলে, আমাকে বুঝি মনে ধরছে না ওস্তাদজি?

কে? চমকে উঠেছে ওস্তাদ ধনঞ্জয় সরকার। ...

আমি ভানু গো, ভানু। আপনার নতুন মোহিনী।

চাপা গজ গজ করে ওস্তাদ। ...ধুস্ শালা। সামনে চল্ রে, সামনে। আমার চোখে টোক্কর খেয়ে পড়বি নাকি? মাদ্দী কুন্‌ঠেকার (কোথাকার)! শালাদের দেখলে ঘেন্না করে, আবার দুঃখও লাগে।

এ বদরাগী লোকটার কাছে ছোকরা টিকবে কেন? অভিমানে আহত ভানু একটু পিছিয়ে গিয়ে ফজলের সঙ্গ নেয়। ফজল ওর হাতটা ধরে হাঁটে। শান্তির নয়—তবু ছোকরার হাত তো বটেই। শীতের পথে আলকাপওয়ালাদের এইটুকুই যা উত্তাপ।

কখনও জ্যোৎস্না কখনও ঘনছায়া—জনা দশ মানুষের পায়ের ধুপধাপ শব্দ উঠছে ঠাণ্ডা ধুলোয়। এত নীরবতা আর চারদিকে। কোথাও কোন শব্দ নেই ওই পথ চলার সামান্য শব্দটুকু ছাড়া—যেন ঘুমন্ত নিঃঝুম নির্জন পাড়াগাঁয়ের হৃদস্পন্দন। ওরা আলকাপের মানুষ। রাত যত গভীর হোক, পথ হোক যত দুর্গম, ঋতু হোক বিরূপ—তবু স্বভাবে ওরা তুখোড় আর হল্লোড়বাজ। চলতে চলতে ওরা গান গায়, কোমর দোলায়, পথেই কাপের ভাষায় কথা বলে। ওদের নাটুকেপনা হাঁ করে চেয়ে দ্যাখে জনপদবাসীরা। ওদের রসিকতা শ্লীলতার চোখরাঙানি আদালতি হুকুম মানে না। দিনদুপুরে পথের ওপর হিসি পেলে, শিশুর মত সবার চোখের সামনে সে কাজ সারতেও অনেক তুখোড় আলকাপওয়ালা পিছপা নয়। আর এমন সব শান্ত স্তব্ধ ঘুমন্ত রাত পেলে ওদের তো ষোলকলা পূর্ণ। চেঁচামেচি করে সবার ঘুম ভাঙিয়ে পথ চলে। চকিত বিরক্ত গেরস্থ মানুষ একটু পরেই বুঝতে পারে, হুঁ। আলকেপেরা যাচ্ছে!

সেই স্ফূর্তিবাজ লোকগুলো আজ বিমর্ষ। শান্তি নামক তাপকুণ্ড না থাকাটা আজ এত স্পষ্ট যে, ক্রমাগত শীতের আঙুল ওদের শরীরকে নীল করে ফেলছে। ওরা টের পাচ্ছে কী ছিল কী হারিয়েছে!

ওস্তাদ ঝাঁকসা কখন দলের পিছনে পড়ে গেছে।

সামনে বেশ কিছুটা ফাঁকা জমি। শূন্য আখের ক্ষেতে শুকনো 'আলসে'র (আখপাতার) স্তূপ। সরু আলের ওপর মিয়ানো ঘাস আর গন্ধ গোয়ালের কচি নরম ঝাড়। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় সে। সামনে অন্ধকার আমবাগানের ঘনছায়ায় আগের লোকগুলো সেই মাত্র অদৃশ্য হল।

চুপি চুপি পালিয়ে যাবে বাড়ি? দেখে আসবে গঙ্গামণি এখন কী করছে? হয়ত গিয়ে দেখবে ...

হ্যাঁ, কতকিছু দেখা সম্ভব গঙ্গামণির ঘরে। এইসব নিস্তাপ নির্জন রাতে তার ঘরে রঙের বাসর। এই তো স্বাভাবিক। এই তো সহজ আর প্রকৃত কথা গঙ্গার মত মেয়ের। তিন মাস আগে সেটা আঁচ করা উচিত ছিল—করেনি। মানুষ এত নির্বোধ হয়ে পড়ে হঠাৎ। গঙ্গার মত যুবতী তার প্রেমে—তার মোহে পালিয়ে আসেনি। এসেছিল যার জন্যে—যা সিদ্ধ করতে, তা বেশ জানা গেল।

কালুপাহাড়ির কার্তিক সংক্রান্তির মেলায় তিনরাত্রি বায়নার আসর গেছে। যে বাড়ি আড্ডা, তার পাশের বাড়িতে গঙ্গামণি থাকে। বুড়োমত এক মাস্টার—সেই আবার দলপতি গঙ্গার। শুধু এটুকুই জানাশোনা—তার বেশি নয়। প্রথমে আলাপ শান্তির সঙ্গে। শান্তি এসে বলেছিল, আজ দুপুরে আমার নেমন্তন্ন গঙ্গাদির কাছে। ব্যস, তারপর শান্তির মারফত আলাপ-পরিচয়। আড্ডায় আসা-যাওয়া। নিলাজ আসরচরানি মেয়ে, লোকে তার স্বভাব বিলক্ষণ জানে। এসে বলে, ওই গানখানা শিখিয়ে দেবেন ওস্তাদ?

মাজাঘষা ছিমছাম চেহারা। রঙটা ফরসা। ডিমালো মুখ, পুরু নাকে নাকছাবি, ছোট্ট কপাল আর মাথায় ঘন কালো চুলের ঝাঁপি। হাঁটলেই ধরা যায় এ মেয়ে নাচের মেয়ে। চলে আসবার দিন দুপুরবেলা তাকে দেখবার জন্যে মন আনচান করে উঠেছিল ওস্তাদের। শান্তি টের পেয়েছিল সেটুকু। চাপা গলায় বলেছিল, গঙ্গাদি শুয়ে আছে ঘরে। ঘুমোচ্ছে—নাকি শরীর খারাপ।

কালুপাহাড়ি থেকে গান সেরে ওরা স্টেশনের দিকে আসছিল। কেউ লক্ষ্য করেনি পিছনে, অনুসরণ করছিল বাঘিনীর মত ওই ঢপের দলের যুবতী। স্টেশনে এল, টিকিট কেটে গাড়িতে উঠল, দেখল এককোণে গঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। ধনঞ্জয় সরকার ভেবেছিল, কোথায় যাচ্ছে বুঝি। একটু ইতস্তত করে শুধিয়েছিল সে, কোথায় যাওয়া হবে গো ঢপওয়ালি? গঙ্গা একটু হেসে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল মাত্র।

ট্রেন চলেছে নলহাটি হয়ে আজিমগঞ্জ। ফের গাড়ি বদল। গাড়ি এবার চলেছে উত্তরে। দলের লোক উসখুস করছে। শান্তি গল্পে মেতে রয়েছে ফজলের সঙ্গে। গঙ্গা তখনও সঙ্গে।

ট্রেন থামল জঙ্গিপুর। ঘোড়ার গাড়ি করে সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে ধনঞ্জয় সরকার তখন গঙ্গাকে খুঁজছে। গঙ্গা নেই। হঠাৎ অদৃশ্য হল কোথায়? নাকি এই দীর্ঘপথ রাতজাগা চোখে একটা ভুল দেখে আসছিল!

রিকশা করে একটু এগিয়েছে। হঠাৎ সামনে ঝোপের আড়াল থেকে গঙ্গার উদয়।

...থামুন, থামুন। আমি কি হেঁটে যাব নাকি?

আরে! তুমি—তুমি কোথায় যাবে ঢপওয়ালি?

আপনারা যেখানে যাবেন।

তুমি—তুমি সেখানে গিয়ে কী করবে?

থাকব।

ছি, ছি। লোকে কী বলবে?

গঙ্গা নীরবে কাঁদছে দেখে ধনঞ্জয় সরকার চুপ। কতক্ষণ পর একটা হাত ওকে বেড় দিয়েছে। হাতে আশ্বাস ছিল। মনে মনে বলেছে, তাই তো গঙ্গা, আমি ওস্তাদ মানুষ—ঘরে দুই স্ত্রীলোক—আমার ঘরে বড় কাঁটার জ্বালা। তোমাকে কোথায় রাখি। এ এক সমস্যা বটে। ...

রাখবার জায়গা হয়ে গেল শেষ অব্দি। ভক্ত আর চেলারা মিলে ঘর বানিয়ে দিল। সমাজ যদি বা বিমুখ, আপনজনের সংখ্যা কম নয়—তাদের সাহসে সাহস।

আর 'এ ধরিত্রীর নাম সর্বংসহা।' আসরে দাঁড়িয়ে ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে একথা। 'ভূমণ্ডলে সব সয়। পাপ সয়, পুণ্য সয়। আলো সয় যেমন, তেমনি আঁধারেরও স্থান আছে হেথা।' ...অতএব ছোট্ট পাড়াগাঁ ধনপতনগরও সব সইল। সামান্য কয়েকটি দিনেই অচেনা বিদেশি নতুন গাছটা এর অনেক গাছপালার ভিড়ে তাদেরই একটি হয়ে উঠল। গঙ্গা বদলেছে যেমন, তেমন পড়শিরাও বদলেছে। বন্ধুর শেষ নেই তার। সবাই মিলে দলবেঁধে নদীর ঘাটে জলকে যায়, জলে সাঁতার কাটে।

ওরা ধনপতনগরে 'চাঁই' সম্প্রদায়ের মানুষ। কোন পুরুষে ওরা এসেছিল বিহারের অনুর্বর এলাকা

থেকে। গঙ্গার দুপারে সতেজ উর্বর প্রাণময়ী মাটিতে নতুন বসতি করেছিল। ওরা নিজেদের মধ্যে 'খোট্টাই' বুলিতে কথা বলে—আবার বাংলাও বলে। ভাগীরথী যতদূর গেছে এ জেলায়, দুই পারে এখানে ওখানে ওদের গ্রাম। শাক-সবজির চাষবাস আছে। মেয়ে মরদ সবাই মিলে তরিতরকারি ফিরি করতে যায় গাঁওয়ালে। হাটে বাজারে যায়। গরিব-গুর্বো অভাজন মানুষ সব—কবে বিহার থেকে দলে দলে এদিকে চলে এসেছিল পেটের দায়ে। এখন কয়েক জম্মের পর মনে-প্রাণে আচারে-বিচারে ওরা বাঙালি! কত আলকাপের ওস্তাদ ছোকরা বা সঙদার ওদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে।

তাদের মধ্যে গঙ্গার মত মেয়ে কেমন মানিয়ে গেল দেখে ধনঞ্জয় সরকার কম অবাক হয়নি। এমন কি খোট্টাই বুলিতে ওকে দিব্যি কথা বলতে শুনে তার তাক লেগে গিয়েছিল। এ মেয়ে সামান্য নয়।

তবে কথা কী, নিশ্চিন্ত একটা নতুন আলোর ছটা এসেছিল জীবনে। কমলবাসিনী—তারপর সুখলতা, ঘরের দিকে। কেউ টানতে পারেনি ওস্তাদ ঝাঁকসাকে। টান দিচ্ছিল এই গঙ্গামণি। বুঝি তারও একটা নিশ্চিন্ত ঘর—একটা নির্দিষ্ট আশ্রয়ের দরকার ছিল। ছিল এক অব্যক্ত নারীর ক্ষুধা ইহজীবনে। অনেক আদরে অনেক ভালবাসার তাপে একটা ওমভরা পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। তার স্বাদ ওস্তাদ পাচ্ছিল সবে। ভাবছিল, এই তো পঞ্চাশ এসে গেল, চুলে পাক ধরেছে, যথেষ্ট হল দিগ্বিজয়—এবার সব ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসবে ঘরে। রাত জাগতে আজকাল বড় কষ্ট হয়। শরীর অপটু হয়ে উঠেছে। গলা মাঝে মাঝে বেইমানি করছে। আবার কী! সংসারের অন্য মানুষের মত সহজ-সরল জীবনে মাছ হয়ে খেলা করার দিন এসে গেল। সেই যে বন্যেশ্বরের মেলায় গেয়ে এল—

(আমি) মানুষ দেখতে এসেছিলাম ভবে—
(আমার) এমন জনম আর কী হবে।
সাঙ্গ হল দেখা শোনা চুকিয়ে দেব লেনাদেনা
(এত) দেখেও তো দেখা হল না
তল পেলাম না ডুবে
(আমার) এমন জনম আর কী হবে।

...অধিক আশা বৃথা। তাই মন এবার, তল্পী তোল. চল যাই ঘরের পানে। আর বাঘা লোকটি বেশ মজার। তক্কে তক্কে থাকে। ওই সময় কথার অন্তে জোরসে বাঁয়ার তবলায় একবার ডুডুম বাজিয়ে দেয়। সেই ডুডুম যেন বিধাতার আওয়াজ—উত্তম! চমৎকার কথা ভাই রে!

গন্ধগোয়ালে আর হাতিশুঁড়োর নরম ভিজে ঝাড়ে পা ডুবিয়ে মধ্যরাতে তন্ময় লোকটা হঠাৎ চমকে ওঠে। বুকে চাপা গুরুগুরু ধ্বনি—বাঘা মিয়া খলিফা যেন তবলা বাঁয়ায় লহরা চালিয়েছে। এক্ষুনি শুরু হবে আসরটা—চারপাশে হাজার উন্মুখ সতর্ক মানুষ।...

জোরে নিজেকে নাড়া দেয় ওস্তাদ ঝাঁকসা। ঘর কেন, ঘরে কী দেখবে, কী কৈফিয়ত নেবে—ঘর মানেই আসর, আসর ঘর এক হয়ে আছে সংসারে, একটা বিম্ব অন্যটা প্রতিবিম্ব। হাতে আলকাপের আয়না। মানুষের মুখ কতবার দেখা হয়ে গেল জীবনে। তবে, তা দেখল কে? দেখল অন্যে, নিজে তো দেখেনি। নিজে দেখার দিন এসে গেল।

লম্বা পা ফেলে প্রায় দৌড়ে ছায়ায় গিয়ে ঢোকে ওস্তাদ ঝাঁকসা। ডাকে, ফজল—ফজল রে! ফজল কই?

ফজল পিছিয়ে আসে। এই তো আছি ওস্তাদ।

আছিস। ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে। শোন ফজল। আজ একটা নতুন কাপ দেব আসরে। এইমাত্র মাথায় এল। এক কুলটা অসতী নারীর পালা। ধর এক রাজা—মস্ত রাজা, তার রাজ্যের সীমানা নাই সসাগরা বসুন্ধরা মাঝে—ঘরে তার দুই রানী, সে রাজা গেল মৃগয়ায়, চক্ষে দেখল এক অপরূপা সুন্দরী, ভুবনমোহিনী বিদ্যাধরী কি কিন্নরী—সঙ্গে তুই কোটাল, বিবেকের মত সাবধান করছিস—মুখোশ খুলে দিচ্ছিস হারামজাদি বেশ্যার ...

ধনঞ্জয় সরকারের কণ্ঠ মেঘের মত বাজে। দলশুদ্ধ থেমে কান পেতেছে।

ফের শান্তস্বরে সে বলতে থাকে। ...ঘরে ছিল রাজপুত্র—রূপবান। শয়তান মাগী তাকে ভুলাল—পুত্রসম কুমারকে ... তা'পরে কিনা ...

ফজল একটু ভেবে বলে, পুত্র?

হ্যাঁ, পুত্র।

ক্যানে, ধরুন যদি অন্য কেউ হয়—ক্ষতি কী? পুত্র হওয়াটা ...

অমানুষিক কণ্ঠে গর্জে ওঠে ওস্তাদ ঝাঁকসা। ... চোপ শালার ব্যাটা শালা কাঠব্যাঙ! তুই ওস্তাদ, না আমি বে? আমি ওস্তাদ জন্মদাতা—আমি বলি পুত্র, হ্যাঁ আমারই পুত্র, আমারই স্ত্রীলোককে সে নষ্ট করল।

লোকটা কেমন গোলমেলে হয়ে গেল কেন ফজল বুঝতে পারে না।

ঝাঁকসুর দল এসেছে শুনেই সারা মেলা একেবারে নড়ে ওঠে। গোপাল ওস্তাদের আসর চলেছে তখন। সবে একটা কাপ বা পালা জুড়েছে, জমে উঠেছে আসর। গোপাল আবার নিজেই ভাল সঙাল—উঠে দাঁড়ানো মাত্র আসর প্রস্তুত হাসবার জন্যে। কিন্তু আজ পাল্লা এক প্রখ্যাত ওস্তাদের সঙ্গে—পদ্মার এ পারে যার নাকি জুড়ি নেই। সুতরাং সে আজ আর লোকহাসানোর সস্তা ভূমিকায় নেই। সঙ্গে এনেছে এলাকার এক নামকরা সঙাল—জাগু কপে। ফজলের মত দুর্ধর্ষ সঙালের বিপক্ষে আসর রাখবার ক্ষমতা তার ছাড়া নেই কারও। কাপের শুরু তাকে দিয়েই। উঠে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে সে বলেছে, আজ বাঘের সঙ্গে সিংহের লড়াই ভাই সকল! তবে আমি কিনা বাঘের সেই ফেউ। নাম মহম্মদ জাগিরুদ্দিন, আদর করে আপনারা দশজনায় নাম দিয়েছেন জাগু কপে—কথায় বলের, বাঘের পিছে ফেউ ডাকে। আমি বাঘেই আগেই ডাকতে এলাম, হুঁশিয়ার! ঢ্যাঙা লিকলিকে চেহারা লোকটার। ছোট্ট মাথা। কিম্ভূত গোঁফ। দেখলেই বত্রিশ নাড়িতে হাসির চাপ লাগে। বকের মত লম্বা পা বাড়িয়ে দলের লোকেদের ডিঙিয়ে ফাঁকা আসরটুকুতে পৌঁছানোর ভঙ্গি দেখেই হাসির ঝড় উঠেছে। শ্রোতারা গাছের মত ভাঙছে দুলছে নড়ছে। ... তারপর ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে সে 'কাপের' (অর্থাৎ ব্যঙ্গরসাত্মক নাটকের) পালায় ঘোষণা করেছে, তবে আমার নাম আঁকাড়ি—সামান্য গরিব মানুষের ছেলে, ওপাড়ার ওই মোড়লের বেটির সঙ্গে ভাব, যাই এখন তার কাছে, দুটো মনের কথা কয়ে আসি। না কী বলেন আপনারা?

সোৎসাহে শ্রোতারা বলে ওঠে, ভাল ভাল।

আসরের ভিতরেই দলটা বাদ্যযন্ত্র ঘিরে বসে রয়েছে। সেদিকে ঝুঁকে সে ডেকেছে ওহে আমার প্রাণেশ্বরী 'গিদাম্বরী' আছ কি ঘরে?

গিদাম্বরী শুনে ফের হাসির ঝড়। নাচিয়ে ছোকরাটা হারমোনিয়ামের সামনে বসে ছিল। উঠে দাঁড়িয়েছে মাথার ঘোমটা ফেলে। বেণী দুলিয়ে কটাক্ষ আর চাপা হাসির ঝিলিক—অনেকের ঠাণ্ডা রক্ত একটুখানি উত্তাপ পায়। সেই সঙ্গে ভিড় থেকে কার চাপা মন্তব্য ঃ থামো, থামো, শান্তি আসছে। তা শুনে নিলাজ ছোকরা সকৌতুকে বলে, আমারে বুঝি মনে ধরছে না কোন নাগরের। আমি কি শান্তি দিতে পারিনে হে বঁধু? শান্তি নামেই যদি শান্তি হয়, তবে আমি যে মধু! লোক বলে মধুবালা।

জাগু বলে, শানিতে এখন গঙ্গাজলে খাপি খাচ্ছে। এস এখন মধু খেয়ে দেখি। তুমি যে মধুর হাঁড়ি!

শ্রোতারা হাসে। ওস্তাদ ঝাঁকসার ছোকরা শান্তিচরণকে তারা ভালই চেনে। গঙ্গার ধারে ধনপতনগরে ওদের বাস—তাও জানে তারা। আর মধুসূদন ছোকরা যে জাতে হাড়ি—সেও জানা। তাই এত হাসি।

... আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে ভিড়ের শেষপ্রান্তে দাঁড়ানো লোকের জটলা থেকে আস্তে আস্তে একটা লোক সরে যায় তফাতে! ওস্তাদ ঝাঁকসা! কেবল নাকটুকু বের করে দাঁড়িয়ে ছিল। সদ্য এসেই আসরের অবস্থা দেখতে চেয়েছিল সে। দলবল মেলার প্রান্তে চটের তাঁবুতে ঢুকেছে যথারীতি। ওই

তাদের সাজঘর। ঝটপট সাজতে বসেছে ভানু। ওস্তাদ ঝাঁকসা অভ্যাসমত পর্যবেক্ষণে এসেছে এখানে। তারপর ওই কথা। 'শান্তি এখন গঙ্গাজলে খাপি খাচ্ছে।'

একটু তফাতে গিয়ে সে ফিস ফিস করে ওঠে, শালা কুত্তার বাচ্ছা।..আলকাপ যে আকথা কুকথা নয়, তা ওরা এখনও বোঝে না। বাজে কুচ্ছিত ভাঁড়ামো করে গেঁয়ো বলে শেয়ালরাজা সেজেছে। যেতে যদি ভদ্রসমাজের আসরে, শহরে বাজারে মহাজন মানুষের ঠাঁই, আলকাপ ছেড়ে কাস্তে হাতে পাট কাটতে হত সোজা!

ওস্তাদজী!

চন্দ্র জুয়াড়ি কাঁধে হাত রেখেছে।...একেবারে ছদ্মবেশ যে! তবে নাক দেখেই চিনেছি। হা হা করে হাসে সে। বেঁটেখাটো ভুঁড়িওয়ালা মানুষ, মাথায় টাক, মস্তো গোঁফ। সার্জের খয়েরী পাঞ্জাবি, দামী শাল, আঙুল ভরতি আংটি—চন্দ্রমোহন টানতে টানতে নিয়ে যায়।

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, ভাল আছেন চন্দ্রবাবু? সেই ভুবনপুরের মেলায় শেষ দেখা।

হ্যাঁ। মধ্যে ছটা মাস কী ঝড় যে বয়ে গেল। সে বলব'খন। আসুন, আমার ঘরে আসুন। চন্দ্রমোহনের ঘর মানে করগেট টিনে ঘেরা দুর্ভেদ্য দুর্গ। মেলার শেষ প্রান্তে একেবারে। ভিতরে খাটিয়া রয়েছে। দামী বিছানাপত্তর। গোটা দুই মোড়া। একটা ছোট টেবিল। তার ওপর টুথব্রাশ পেস্ট সাবান আয়না দাড়িকাটার সরঞ্জাম। দড়ির আলনায় কিছু জামা-কাপড় ঝুলছে। এক কোণে রান্নার স্টোভ বাসন হাঁড়ি গেলাস। বেশ পরিপাটি থাকে লোকটা। মোড়ায় বসতে যাচ্ছিল ওস্তাদ, চন্দ্র হাত ধরে টানে। ...আরে, এখানে বসুন। ঘরের মানুষ আপনি! ..পরক্ষণে হাসে। ঘর! 'ঘর না বৃক্ষের কাণ্ড—জলে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। তার কোটরে কোনরকমে থাকা। মাটির আর জীবনে পাব না রে দাদা!'

বিছানায় বসিয়ে দেয় ওস্তাদকে। স্টোভে সোঁ সোঁ আওয়াজ উঠেছে। একটা লোক খুন্তি দিয়ে হাঁড়িতে কী নাড়ছে। সুগন্ধে টের পাওয়া যায়, মাংস। চন্দ্রমোহন বলে, নবা, হাঁড়ি নামা। চা করে দে ওস্তাদকে। ...থাক্, বাইরে থেকে এনে দে।

পয়সার বদলে স্লিপ। স্লিপ নিয়ে বেরিয়ে যায় নবা। বলে যায়, কষার সময়—নাড়তে হবে মাংস।

মোড়া টেনে স্টোভের সামনে বসে চন্দ্রমোহন। ভুরু কুঁচকে দুবার খুন্তি নেড়ে এদিকে মুখ ফেরায়। ...মনমরা মনে হচ্ছে! হবারই কথা। ...হাসির চোটে দুলতে দুলতে সে বলে... একটাতে রক্ষে নেই—তাতে তিন তিনটে বাঘিনী ঘরে বাঁধা। কী সব কাণ্ড করছেন ওস্তাদ—হদিস পাওয়া ভার। এদিকে আমি শালা তো ভয়ে ছায়া মাড়াইনি অ্যাদ্দিন—বয়স ভাঁটিতে কাদায় লুটোপুটি খাচ্ছে!

একটু হাসে ওস্তাদ ঝাঁকসা! কেন, আপনার সেই সৌদামিনী কি হল? আসেনি এ মেলায়?

সদু! ...চন্দ্রমোহন কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। এসেছে। যাবে কোন চুলোয়। ওদিকে দোকান দিয়েছে। ছাড়ুন ওসব চুড়িওয়ালীদের কথা। আপনার কথা বলুন।

আমার আর কী! আছি, এই মাত্র।

আপনার শান্তি এবার দেখা করতে এল না তো? নাকি সাজতে ব্যস্ত? দেরিও হয়েছে বটে।

শান্তি নেই। পালিয়েছে।

খুন্তি নাড়া হাতটা থেমে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। ...পালিয়েছে? সর্বনাশ! তাহলে গান করবেন কেমন করে?

ওস্তাদ ঝাঁকসা আস্তে আস্তে বলে, কেন চন্দ্রবাবু? শান্তি ছাড়া কি ওস্তাদ ঝাঁকসা এমন অক্ষম যে আসর চালাতে পারবে না?

নিরাশ কণ্ঠস্বরে চন্দ্রমোহন বলে, না—কথাটা তা নয়। মানে, মেলাখেলার শ্রোতা—একটু ফুর্তি-ফার্তি চাই কিনা! এতো আপনার চ্যাংড়ামির আসর—গাঁয়ের বাইরে একেবারে। যত রঙ ঢালবেন, তত জমবে। বউঝিরা নেই, ভদ্রজন নেই—একেবারে বেলেল্লা মানুষ সব। ...কিন্তু পালালো কেন?

ওস্তাদ ঝাঁকসা হাসে। এতো নতুন কথা নয় চন্দ্রবাবু। এলাকায় আপনার চলাফেরা—জীবনটা কাটিয়ে দিলেন এক রকম। আলকাপের খবর আপনার তো সবই জানা!

চিন্তিত মুখে চন্দ্রমোহন বলে, দেখুন, আপনার দায়িত্ব আপনারই। আসর না রাখতে পারলে আসরে লোকসান হয়ে যাবে কিন্তু। লোক হবে না মেলায়।

বেশ তো! না পারলে চলে যাব। আরো ভাল দল আনবেন... বলে ওস্তাদ ঝাঁকসা উঠে দাঁড়ায়।

খুব অবাক লাগে তার। শান্তিই কি ছিল তার একমাত্র শক্তি? শান্তি ছাড়া ওস্তাদ ঝাঁকসার গান শুনবে না লোকে? পা বাড়ায় সে। চন্দ্র জুয়াড়ির চা সে খাবে না।

চন্দ্র মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে আরে! ও ওস্তাদ! রাগ হল বুঝি? কী মুশকিল! আমার হয়েছে শতেক জ্বালা—

উঠে এসে হাত ধরে টানে সে। ...বড় ভাবুক লোক মশাই আপনি! আমি তাই বলছি নাকি বসুন, বসুন!

ওস্তাদ ঝাঁকসাকে বসতে হয়। ভারি মিঠে ব্যবহার এই চন্দ্রমোহনের। কার সাধ্য এখন টের পায়, এই লোকটা মানুষকে ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করে বেড়াচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তর? কে বুঝতে পারে, দরকার হলে এক্ষুনি এই খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এক সাক্ষাৎ শমন।

নবা চা দিলে নীরবে খায় ওস্তাদ। চন্দ্রমোহন নিজে চা খায় না। ও যা খায় তার নাম কারণসুধা। হেঁট হয়ে খাটিয়ার নীচে থেকে একটা বোতল বের করে সে। একটা কাপে ঢেলে ঢকঢক করে খেয়ে নেয়। গোঁফ মুছে বলে, মাংসটা নামুক। আসরে যাবার আগে এখান হয়ে যাবেন। বিলিতি জিনিস কিন্তু। ...হল? চলুন—সলিমকে দেখি! ফতেগঞ্জ থেকে লোক এসেছে নাকি। পরের মেলা ওখানেই বসানোর ইচ্ছে আছে। এখানে মাত্র পনের দিনের লাইসেন্স।

ভিড়ে হারিয়ে যায় ব্যস্ত চন্দ্রমোহন। ওস্তাদ ঝাঁকসা একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকে। সামনে টইটুম্বুর উচ্ছ্বসিত আসর চলেছে। জোর জমিয়েছে গোপালের দল। বাইরে পৃথিবীতে এখন নিশুতি রাত। প্রচণ্ড শীত আর কুয়াসায় জ্যোৎস্নার রঙও নীলচে হয়ে পড়েছে। বাইরে পা বাড়ালেই রক্ত জমে যায় যেন। এখানে উজ্জ্বল আলো আর প্রচুর উত্তাপ। হল্লা। উত্তেজনা।

ভালো লাগে না কিছু। এই শীতের রাতে নির্জন কোন ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ওদিকে জাগু 'কাপ' দিয়ে চলছে।

গাঁয়ের দুষ্টু ছেলে আঁকাড়ি—বাবা-মা তার বিয়ে দিচ্ছে না। তাই একদিন সে বাবা-মাকে জব্দ করতে চায়। মা যখন ঘরে নেই—বাবাকে ডেকে বলে,

বলব কী আর দুঃখের কথা, পিতা
মা মজেছে নানা রঙ্গে
ওপাড়ার এক মোড়লের সঙ্গে
কইছে কথা, পিতা ......

বাবা তা শুনে মালকোঁচা মেরে খেঁটে হাতে ছুটে গেল। গোপাল ওস্তাদ সেজেছে বাবা। ছুটে যাওয়া মানে অল্পপরিসর আসরেই এদিক থেকে ওদিক ছুটোছুটি—অবশ্য সেটা নাচের ছন্দে, দ্রুত হেঁটে চালার ভঙ্গী সেই নাচে, নীচে হারমোনিয়ামে---তবলায় 'চালান' বাজছে। 'চালান' দৃশ্যান্তরও বোঝায়। বিরতি বোঝায় (যেমন রেডিওর 'ফিলার')। গোপাল বসল। এবার দ্বিতীয় দৃশ্য। অর্থাৎ ফিল্মের ফেড আউট ফেড ইন ঢঙে ছেলেরূপী জাগু উঠে ডাকল মাকে—

বলব কী আর দুঃখের কথা, মাতা
বাবা মজেছে নানা রঙ্গে
ওপাড়ার এক ছুঁড়ির সঙ্গে
কইছে কথা, মাতা...

শুনেই মা ছোটে। মা সেজেছে একটি গুঁফো লোক—দলেই দোহারকি করে। চাদরটা এমন করে দ্রুত জড়িয়ে নিয়েছে, হঠাৎ দেখলে গাঁওবুড়ি ভ্রম হবে। মুখটা যথাসম্ভব ঢেকেছে—তবু গোঁফ দেখা যায়। যাই হোক—এখন আসরে সেই মা। আলকাপের রীতিই এই। ...এবার উঠল বাবা। ....কই দেখি

সে মাগী কী করে! ব্যস। দুটিতে মুখোমুখি। পরস্পর দোষারোপ! গালিগালাজ। পরে সব জল হয়ে যাওয়া। ছেলের কীর্তি। অতএব বিয়ের যোগাড় করতেই হয়।

জমিয়ে দিয়েছে গোপালের দল। অশ্লীল ধরনের একটি উত্তেজনা ফেটে পড়ছে আসরে। বড় কটু লাগে ওস্তাদ ঝাঁকসার। ওরা এখনও বড্ড সেকেলে। পদে পদে অশ্লীলতা করে। অমার্জিত ভাষা! চাষাড়ে ইতরামি শুধু। কিন্তু আশ্চর্য, তবু লোকে প্রতিবাদ করছে না—বলছে না,—ভাল কিছু শোনাও ওস্তাদ—যাতে জ্ঞান বাড়ে, শিক্ষা হয়, 'অমল বিমল রসে' মন মজে।

হয়ত এইটাই নিয়ম। যখন যা সামনে জাঁকিয়ে আসে, তাতেই মজে যায় অবোধ শ্রোতা সাধারণ। ওস্তাদ ঝাঁকসা উঠে যখন বলবে, বাবাসকল, এ কি না লোকশিক্ষার বাহন, তখনও হয়ত বলে উঠবে, ভাল, ভাল, বেশ! চালাও ওস্তাদ, চালিয়ে যাও।

লোকের মতিগতি বোঝা সহজ নয়। বড় অবাক লাগে। দুঃখ হয়।

আসরে যাবার সময় হয়ে এল। ভানুর সাজ শেষ হল কিনা দেখতে হয়। পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, গঙ্গামণির কথা। খুবই অকারণ। নাকি কারণ একটা ছিল।

লোকশিক্ষার বাহন কথাটা মাথায় আজ গভীরভাবে বসে গেছে। এক বিশ্বাসঘাতিনী নারীর কাপ দেবে বলে তৈরি হয়েছে না সে? জনসমাজে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবে, বন্ধুগণ, সাবধান, হুঁশিয়ার—রূপের ফাঁদ পেতে যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সে এক রাক্ষসী। শুধু চোখে দেখেই মজো না। গুণ খোঁজো। পরীক্ষা করে দেখ, মিথ্যা না সত্য, আসল না নকল...

গঙ্গা—গঙ্গামণিও পালিয়ে যায়নি তো? গঙ্গাতীর থেকে আর ঘরে ফেরেনি ওস্তাদ। সোজা চলে গেছে ফজলের বাড়ি মিঠিপুরে। কোন খবর তো নেওয়া হয়নি।

যাক। ওর না থাকাই ভাল। গিয়ে যদি ঘর শূন্য দেখে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যাবে। কুলটা নারী সাক্ষাৎ সাপিনী। চলে যাক—আরও যদি কিছু যাবার থাকে, যাক। ধনঞ্জয় সরকার আর ঘরে ফিরছে না। চন্দ্রমোহনের মতই মেলা থেকে মেলায়, দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে জীবনটা কাটিয়ে দেবে তারপর হয়ত কবে একদা, কোন আসরে দাঁড়িয়ে, কানে একটি হাত রেখে অভ্যাসমত রাগিণী ভাঁজছে—হঠাৎ অন্য কানে অদৃশ্য শমন এসে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলে বলবে, চলে আয়! ব্যস, আবার কী! দেহ রেখে ধনপতনগরের ধনঞ্জয় সরকার চলে যাচ্ছে, পিছনে জমজমাট আসর—মায়াবী মোহিনী, বাদ্যযন্ত্র আর সঙদার রইল পড়ে। তারপর কী হবে? কোথায় যেতে হবে? নরকে নয়ত? চমকে ওঠে হঠাৎ।

মনিরুদ্দিন ওস্তাদের যোগ্য ছাত্র এই ধনঞ্জয় সরকার। মনিরুদ্দিন গত বছর মারা গেছে। কালুখাঁর দিয়াড়ে তার গোর। গোরের শিয়রে কাঁটামাদারের গাছ। গ্রীষ্মে রক্তলাল ফুল ধরে থোকায় থোকায়। মাঝে মাঝে গিয়ে চুপিচুপি সেলাম দিয়ে আসে বিমুগ্ধ সাগরেদ। পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ ফেটে জল বেরোয়। ওস্তাদজী, তুমি বলেছিলে, এ পথ পাপের পথ—এ নেশায় বড় গোনা (পাপ)। বড় যন্ত্রণার জীবন আলকেপেদের। তুমি এপথ ত্যাগ করতে বলেছিলে। পারছি না--তোমার আদেশ অমান্য করেছি। তুমি আমাকে মাফ করো ওস্তাদজী।

শেষ জীবনে অবসরের দিন। মনি ওস্তাদ তখন গান ছেড়ে মৌলানার কাছে তৌবা করেছে। শরীয়তে মন দিয়েছে! পাঁচ অক্ত নমাজ পড়ে কপালে চামড়ায় ছোপ ধরেছে। মসজিদ ছেড়ে বেরোয় না সে। খোদাতলার কাছে কান্নাকাটি করে। ছোট্ট জানালার ধারে মুখ রেখে ধনঞ্জয় সরকার চুপি চুপি ডেকেছে। ওস্তাদজী!

ভিতর থেকে স্থবির অজগর সাপ ফোঁস করে উঠেছে, চুপ, চুপ, ওনামে কেউ নেই এখানে। ও আল্লার ঘর—মুসল্লীর ঠাঁই।

...ওস্তাদজী, গঙ্গাপার রাতের দেশে বায়না। যাবার আগে আশীর্বাদ চাই।

...ঝাঁকসু! বেটা, হাদিস কোরাণে আছে—সাদ আর গোমরাহ নামে ছিল দুই শহর। সেখানে পুরুষ পুরুষের পিয়ারা, দিলের রওশন—হৃদয়ের বাতি। পুরুষলোক পুরুষলোককে আউরতের মত ভালবাসত। তার পরিণামে কী হল? দুটো শহর আল্লার হুকুমে গায়রত হল—ধ্বংস হয়ে গেল। এ গোনাহর মাফ নাই বেটা। পরিণামে জাহান্নাম—দুনিয়ার আগুনের আশিহাজার গুণ তেজী সে আগুন...

নাঃ, মনি ওস্তাদ নয়। এ এক মৌলানা—মুসলমানের গুরু। এর ভাষা ভিন্ন, অবোধ্য। কোথায় গেল সেই মনি ওস্তাদ—হিন্দুর বেদপুরাণ যার কণ্ঠমূলে বাস করে, মাথায় সন্নোসীদের মত লম্বা চুল, চাঁছা গাল, ধারালো গোঁফ, বেড়ালের মত পিঙ্গল চোখ, গৌরবর্ণ ছিপছিপে গড়ন, ধুতি পাঞ্জাবি চাদর পরে আসরে দাঁড়ায় করযোড়ে, যেন সভা কবি!

সেই লোকটা পাপ ভয়ে কাঁদছে। বলছে, পুরুষকে নারী সাজিয়ে লক্ষ মানুষের মনে নেশা ধরিয়েছি—নিজেও মজেছি সে নেশার ঘোরে—এ পাপ মহাপাপ। অনন্ত জাহান্নাম সামনে জ্বলে। গায়ে আঁচ লাগে।...

লাগে, লেগেছিল। আলকেপেরা টের পায় ও কী জ্বালা! খুব কাছেই যে বিশাল আগুন। ফোস্কা পড়ে তাপে। অ-ধরাকে যত ধরতে চায়, দেখে রক্তমাংসের ক্লেদ, ব্যর্থতার গ্লানি। প্রতিমার গায়ে লোভের পাপী হাত আঁচড় কাটতেই বেরিয়ে পড়ে খড় আর বাঁশের পিণ্ড। ইষ্টদেবতা তো ওখানে নেই—তার বাস মনের মধ্যে। তাকে হাতের মুঠোয় পেতে গিয়েই তাপ লাগে। মোহ ভেঙে যা পড়ে থাকে—তা অশ্লীল। তার নাম সমকামিতা।

'সাদ (সডোম) আর গোমরা' জেগে উঠেছে পদ্মার এপার-ওপার। হুঁশিয়ার ভাইসকল! ...মহম্মদ মনিরুদ্দিন বিশ্বাস ভুল বকে। ভুল বকতে বকতে মসজিদের ঠাণ্ডা মেঝেয় চিরকালের মত ঘুমিয়ে গেল একদিন। তার গোর দেবার অধিকার সেদিন মুসল্লীদের। দূর থেকে দলে দলে হিন্দু আর মুসলমান সাগরেদ শ্রদ্ধা জানাল মনে মনে।

...শরীরটা হিম হয়ে আসে আমবাগানের নীচে। ওস্তাদ ঝাঁকসার বুক কাঁপে দুরু দুরু। মনে পড়ে যায় ওস্তাদজীর কথা। হ্যাঁ, বড় সত্য কথা বলেছিলেন মনিরুদ্দিন বিশ্বাস। পুরুষকে মনেপ্রাণে নারীতে পরিণত করার কারচুপির ক্ষমা নেই। প্রতিশোধ নেন বিধাতা পুরুষ। শান্তি ওস্তাদের গঙ্গামণিকে অশুচি করেছে—এ সেই প্রতিশোধের খেলা মাত্র। বিধাতা দেখাচ্ছেন আঙুল তুলে।

বেঁচে থাকতে থাকতেই নরকের জ্বালা এল তাহলে! হতাশ ক্লান্ত ভীত লোকটা সাজঘরের দিকে হেঁটে যায় আস্তে আস্তে। বড্ড একা হয়ে পড়েছে বলেই কি এই সাত-পাঁচ এলোমেলো ভাবনার ঝড়—যেন কী আড়াল গেছে ঘুচে, এখন মাথা বাঁচে না দুর্যোগে?

প্রথমে হইচই, বিশৃঙ্খলা, তারপর সামান্য কিছুক্ষণ শান্ত সব—শান্তি নেই খবর তখন আসর জুড়ে মেলার ভিড়ে সবখানে গুঞ্জনিত। ভানুতে মন মজবার লক্ষণ নেই শ্রোতাদের। বয়সের যে সীমায় থাকলে তখনও মেয়ে বলে মেনে নিতে সাধ যায়—সে সীমা পেরিয়েছে ভানু। ফলে ওকে এখন বড় কদর্য লাগে। শান্তির মুখে অত ঘন পেন্টের দরকার হত না। সমান্য একটু সিঁদুর মেশানো ফেস পাউডার স্নো মুখে বুলিয়ে নিলেই যথেষ্ট। ঠোঁটে আলতা, কপালে টিপ। একটা কৌটোয় কিছু জিংক অক্সাইড—হাতের চেটোয় নিয়ে কয়েক ফোঁটা জল মিশিয়ে বলেছে, ফজলদা, দেশলাই কাঠি দাও। কাঠির ডগায় সযত্নে সাদা ফোঁটার অল্প দুটি আলপনা দু গালে, চিবুকে, কপালে। ওতেই ওর রূপ খুলে গেছে। বিলোল কটাক্ষ হানলেই তখন মূর্ছা যায় মনপ্রাণ।

খুব অল্প সাজগোজেই ওকে স্বাভাবিক মেয়ে দেখাত। ডাঁটালো দুখানি নরম বাহু, নাচের ছন্দে দুলে উঠলে জন্ম নিত এক নাগরী নটী। বুকে কাঁচুলির বদলে দুটো ন্যাকড়া গুঁজে নিত সে। এমনিতেই ওর শরীরটা ছিল নাচের উপযোগী—সরু কোমর, ভারি পাছা, সুডৌল ঊর্ধ্বাঙ্গ। ও যেন বিধাতার একটু ভুলে পুরুষ হয়ে জন্ম নিয়েছিল। শুধু কণ্ঠস্বরে ধরা গেছে, ও আসলে পুরুষ। কিন্তু কণ্ঠের এ বেইমানী ঢেকেছিল তার গান গাইবার ক্ষমতা, রূপের বিভ্রম।

আর ভানু পদে পদে ধরা পড়েছে যে সে পুরুষ। মুখে সফেদামিনার পুরু পেন্ট—সকাল হয়ে গেলে তখন কী বিচ্ছিরি না দেখাবে ওকে। বুকে ঠাসা বেমানান কাঁচুলি। চুলের খোঁপা আছে—শান্তির ছিল শুধু বিনুনী, যেন পাড়াগেঁয়ে বাবুবাড়ির মেয়েটি।

ভানুকে দেখাচ্ছে ধিঙ্গি বেশ্যার মত—অশ্লীল লাগে ওর হাসি, ওর দেহভঙ্গী, ওর কটাক্ষ। আসরে গুঞ্জন থামছে না। বিপক্ষের ছোকরা মধু শান্তির ঘাটতিটা বরং পুষিয়ে দিয়েছে। লোকে ওকে সিনেমার অভিনেত্রী মধুবালার নামে ডাকে।

তবে শুধু ছোকরা নিয়েই তো আলকাপ নয়। ভিড় থেকে ফরমাস ওঠে, কই হে ওস্তাদ, সঙফার্স দাও। খুব হয়েছে! চারদিকে নানান মন্তব্য শোনা যাচ্ছে।

ছোকরার গান শেষ হলে নিয়ম আছে কপে বা সঙাল উঠবে। ছোকরার সঙ্গে ডুয়েট গাইবে। দুজনেই নাচবে অবশ্য। ওরই ফাঁকে অল্পস্বল্প রসিকতা।

এবার ফজলের ওঠবার কথা। উঠল স্বয়ং ঝাঁকসা ওস্তাদ। এক কানে হাত রেখে অভ্যাসমত হারমোনিয়ামের সুরে গলা মিলিয়ে সে রাগিণী ভাঁজে। নিস্তেজ বিশৃঙ্খল আসরে একটা জোয়ার আসে যেন—দমকে দমকে, উচ্ছ্বাসে, ওই পদ্মার দুকূল ভাঙ্গা বন্যার জল।

ওস্তাদ ঝাঁকসা ধুয়া দিয়েছে ঃ

বাংলা মা তুই কাঁদবি কতকাল।।
(তোর) সোনার অঙ্গ করল ভঙ্গ রক্তধারায় লালে লাল।।
মনে করি হলাম স্বাধীন
আমরা মাগো চির পরাধীন—
হয়ে এখন বিশ্বের অধীন
অন্নবিনে নাজেহাল।।

আসর স্তব্ধ। বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে শ্রোতারা। কাছাকাছি সব চাষাভূষো অভাজন মানুষ—দূরের পিছনের দিকে বেঞ্চে বা দাঁড়িয়ে বাবু-ভদ্রজন—নানা বয়সের নানা মেজাজের শ্রোতা। কেউ ফিসফিসিয়ে ওঠে, ধুস্ শালা! এ আবার কী লাগালে!

দুবার ধুয়াটা গেয়ে সমের মাথায় দোহারকিদের ছেড়ে দেয়। দ্রুততাল ওরা গাইতে থাকে। চড়া সুরে কয়েকজোড়া কত্তাল বাজে। বাঘা মিয়া তবলায় মেঘ ডাকায়। ক্ষিপ্র আঙুলগুলো ভেলকি দেখায় যেন।

সেই ফাঁকে একটু হাঁটে ওস্তাদ। চোখ বুজে পরবর্তী পদ বানিয়ে নেয়।

লাল মুখোরা গেছে চলে,

তবলচী খলিফা বাঁয়ার আওয়াজ দিয়ে বলে, বেশ ভাল ভাই!

ওস্তাদ একটু ঝুঁকে তালে তালে সোজা হয়ে ফের কলিটা ধরে—

লালমুখোরা গেছে চলে
সে কথায় যেওনা ভুলে
কালো মুখের তলে তলে
আড়াল থেকে ছড়ায় জাল।।
(এখন) দুই সতীনে চুলোচুলি

একটু হেসে কথায় বলে—সতীন কারা? না—এই হিন্দুস্থান পাকিস্তান।

দুই সতীনে চুলোচুলি
এর গালে চুণ (ওর) গালে কালি
চুলো নিয়ে বিবাদ খালি
ঘরের চালেই ধরায় জ্বাল
বাংলা মা তুই কাঁদবি কতকাল।।

এসব কী শুরু করল ওস্তাদ ঝাঁকসা? চারপাশে গুঞ্জন, ফিসফিস, চাপা মন্তব্য। আরে বাবা, রঙের আসর—রঙ লাগাও। সঙটঙ দাও, জমাটি কাপ দাও, শুনি।

...ভাই সকল! এ আলকাপ কি না লোকশিক্ষার বাহন। আমার গুরু ওস্তাদ মনিরুদ্দিন বিশ্বাসের একথা। এ কি না এক আজব আয়না। আপনারা তাতে নিজের নিজের মুখগুলো দেখে নেন। খারাপ লাগলে বলেন, আরে ছ্যাঃ, এ হল ইতরজনের গান! আজ আমার বিপক্ষে এসেছেন সুযোগ্য পাল্লাদার গোপাল মাস্টার। মাস্টার কেন? না, ধনঞ্জয় সরকার পদ্মার এপারে এক মনিরুদ্দিন বিশ্বাস ছাড়া কাকেও ওস্তাদ স্বীকার করে না।...

ফের গুঞ্জন। এবার স্পষ্ট আসর—ফজলের ভাষায়, থিতোচ্ছে না।

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, তবে আমার পাল্লাদার গোপাল। গোপাল যিনি, তিনি কৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণ আর আমি—আমি ধনঞ্জয়—গাণ্ডীবধারী অর্জুন। তবে দুঃখের কথা ভাই, আজ গাণ্ডীব হাতে নাই। নিরস্ত্র। আর কৃষ্ণ, তোমায় সখা বলে মানি। তুমি হলে এ কুরুক্ষেত্রে আমার সারথি। তুমি আমায়...

লাফ দিয়ে ফজল উঠে বলে, তুমি আমার সহিস—ঘোড়ার ঘেসেড়া।

পলকে আসর ফেটেছে। হো হো হা হা হাসির তোলপাড়। ফজল বসে পড়ে।

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, আজ মনে বড় বাসনা গোপাল—প্রাণসখা কৃষ্ণর সঙ্গেই একবার যুদ্ধ করি। শ্রোতামহাশয়গণ! আলকাপের মধ্যে আছে পঞ্চরঙ। খেমটা আছে, নাটক আছে, তেমনি আছি কবিয়ালী। দুপক্ষে একটা আশয় বিষয় ঠিক করে দিন।

কে বলে, লে বাব্বা! কবি শুদ্ধ হবে নাকি? ...চারিদিকে ফের চাপা গোলমাল। বেঞ্চ থেকে কে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, ঝাঁকসু, এ মেলাখেলার আসর। শাস্ত্রটাস্ত্র ভাল লাগবে না বাপু। তুমি বরং বিনি আশায়-বিষয়ে গাওনা করো। কাপ দাও—জমাটি কাপ একখানা।

লোকটাকে লক্ষ্য করে ওস্তাদ ঝাঁকসা। আরে! জমিদার বিষ্ণুবাবুর বড় ছেলে ষষ্টিবাবু। কী কাণ্ড দ্যাখো। মাতাল মানুষ। আলকাপের আসরে এসে রাত জাগছে। মনে মনে খুশি হয় সে—আবার খারাপও লাগে। হাত জোড় করে বলে, বাবুমশায়! আপনাদের বাড়ির ভিতরেও এ ঝাঁকসুর গান করবার সৌভাগ্য হয়েছে। আপনার পিতা এক গণ্যমান্য মানুষ। আপনারা তো জানেন, আমি আকথা-কুকথা অশাস্ত্রীয় কিছু গাই না!

গোলমাল বাড়তে থাকে। ঠিকই বটে। এ মেলার আসর। রঙ চাই। চাই তুখোড় বেলেল্লাপনা। ঘেমে ওঠে শীতের মধ্যে। মন কত যত্নে তৈরি হয়েছিল তত্ত্বকথা শোনাবে বলে। এরা সব শুঁড়িখানার মাতাল। তবে তাই সই।

ওস্তাদ ঝাঁকসা কোমরে চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে চাপা গলায় ডাকে, ফজল! লাগা সেই ঘাট-ডাকার সঙ!

হারমোনিয়ামে দ্রুততালে একটা সুর বাজায় পঞ্চানন। তবলা বাজে। কত্তাল বাজে। স্বল্প বিরতিকালের এ বাজনার নাম 'চালান'।

বাজনা থামতেই দুহাত তুলে চিৎকার করে ওস্তাদ ঝাঁকসা-ব্যস্ ব্যস্! তবে শুনুন। আমি এক গাঁয়ের মোড়ল। ঘরে আছে এক পালচরা ষাঁড়—হারামজাদা ছেলে, কাজ নেই কম্ম নেই, টোটো ঘুরে বেড়ায় সারাদিন। তাকে ডাকি।

দম নিয়ে সে ফের বলে, গঙ্গায় একটা ঘাট ডেকে নিয়েছি জমিদারবাবু শ্রীবিষ্ণুচরণ রায় মশায়ের কাছে (বিনোদদিঘীর জমিদারবাবুর নামটাই বলে সে। তাতে রস পায় শ্রোতারা)। এখন, সেই ঘাটে নৌকো বইতে পাঠাব আমার অকম্মা ছেলেকে। কই রে বেটা, আছিস?

ফজল খালি গায়ে উঠেছে। বেঁটে কুষ্মাণ্ডসদৃশ দেহ। ডাগর মস্তো পেট। ইচ্ছে করেই একটু ফুলিয়ে রেখেছে। ধুতি কোঁচা কোমরে জড়ানো। ওর এতটুকু শীতবোধ নেই যেন। হিমের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলে, আছি হে আছি।

মোড়ল থমকায়, চোপ্ ব্যাটা! বাবাকে কেউ হে বলে নাকি?

ফজল একটুও না হেসে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে, বলে বৈকি। এ বাঘড়ী এলাকায় বাপকে মুসলমান ব্যাটায় বলে, বাজি হে, বাজি! হিন্দু বেটায় বলে, বাবা আছো নাকি হে? তা বলি মোড়ল মশায়, আমি হিন্দু না মোছলমান?

লোকের হাসির মধ্যে মোড়ল গর্জে ওঠে, কে হিন্দু কে বা মুসলমান? সবাই এক মায়ের সন্তান। সবাই মানুষ!

মোড়লের ছেলে নৌকা বইতে যাবে। যাবার সময় একান্তে বউর কাছে বিদায় নিতে যায়। গান গেয়ে বলে—

'একমাস পরে আসব রে ধনি, ঘরে থাকো না...

পরক্ষণে বউ গানে জবাব দেয় অর্থাৎ, কলিটা সম্পূর্ণ করে,

(আমি) থাকতে পারব না।

ছেলে গায়,

পনের দিন পরে আসব রে ধনি, ঘরে থাকো না।...

বউ গায়,

থাকতে পারব না।

ছেলে জোর চেঁচিয়ে গেয়ে ওঠে,

সাতদিন পরে আসব রে ধনি, ঘরে থাকো না।...

বউ কেঁদে বলে,

(প্রাণনাথ) থাকতে পারব না।

দিনের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। একদিন, তারপর ও বেলা, শেষে—

খানিক বাদেই ফিরব রে ধনি, ঘরে থাকো না।

জবাব একটাই ঃ

থাকতে পারব না।।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলে বউকে জড়িয়ে ধরে সুরে বলে,

আমার যাওয়া হল না।।

জোর জমে গেছে আসর। এরপর অবশ্য ছেলেকে বাপের ধমক খেয়ে যেতেই হবে ঘাটে। এদিকে বউ শ্বশুরকে মান্য করে না। শ্বশুর তখন গলায় হাত দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেবে। বউ মনের দুঃখে বাপের বাড়ি যাচ্ছে। পথে পড়েছে নদী। নিঃঝুম সন্ধ্যাকাল। ঘাটে আছে ঘাটমাঝি। তাকে মিনতি করে। গানের সুরে পার করে দিতে বলে। ...তারপর দেখে, ঘাটমাঝি তারই স্বামী।

আসর টালমাটাল। ওস্তাদ ঝাঁকসা সিগ্রেট জ্বেলেছে এতক্ষণে। শ্রোতাদের আড়াল করে মুখ নামিয়ে টানছে। এ ভব্যতা তার স্বাভাবসিদ্ধ।

হাসির ঝড়ের মধ্যে বেরসিকের মত কে শ্রোতার ভিড় ঠেলে দ্রুত এগোচ্ছে! ...পথ দাও, পথ দাও, আসরে যাব।

কে রে বাবা! চোখে পা দিয়ে যাচ্ছে যে। চারপাশে বিরক্তি! লোকটা এগিয়ে আসছে আসরে। ওস্তাদ, ওস্তাদজী কই। খবর আছে। খবর।

খবর? কিসের খবর? ওস্তাদ ঝাঁকসা নড়ে ওঠে। চমকায়। ধনপতনগর থেকে প্রসন্ন এসেছে। ...কী, কী হয়েছে প্রসন্ন?

প্রসন্ন কানের কাছে মুখ এনে বলে, সর্বনাশ হয়েছে ওস্তাদ। ছোটি বহু বিষ খেয়েছে—এতক্ষণ আছে কি নাই!

ছোট বউ? গঙ্গা? গঙ্গামণি? উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে বসে লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় শুধু। কী করবে বুঝতে পারে না।

ভোর হয়ে গেছে।

আমগাছগুলো গাঁওবুড়োদের মত গায়ে আর মাথায় নীলচে কুয়াসার আলোয়ান আর টুপি পরে জড়সড় স্তিমিত আগুনের সামনে বসে রয়েছে যেন—পদ্মার সীমান্তরেখা ঘিরে ডিমের কুসুমের মতে সূর্য, তার আলোর রঙ এখন জ্যোৎস্নার বেশি কিছু নয়। প্রকাণ্ড দীঘির ওপাশে জমিদারবাবুদের কালশিটে পড়া দালানে সেই ছটা। সামনে মাঠ—পাকা চৈতালী ফসলের খেতে এখনও ধোঁয়ার মত কুয়াশা ফেরে। চারদিকে মৃত্যুর স্বাদ এখনও লেগে। বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য লাগে।

মেলায় শেষ রাতের ঝিমুনিটুকু সবে কাটছে। কেউ কেউ শুকনো পাতা কুড়িয়ে আগুন জ্বেলেছে। হাত মুখ সেঁকছে। চায়ের দোকানে জটলা বাড়ছে। জুয়ার আসর এবার গুটিয়ে ফেলার পালা। চারপাশে হ্যাসাগবাতি নিভিয়ে দেবার ব্যস্ততা। গুঞ্জন বাড়ছে সব কাঁপন্ত নীলচে ঠোঁটগুলোয়। এখন আবার চড়া সুরের আসর দরকার। চেঁচামেচি করে হোক—যেভাবে হোক নতুন দামে চালিয়ে গেলেই হল। আসর জমতে দেরি হবে না।

সব আলকেপেই এই ভোরের আসরের সুযোগ পেতে চায়। সেটা ভাগ্যগুণে পেয়ে গেছে গোপালের দল। মানিক ফকিরের কাপ জুড়েছে তারা। ফকির সাজতে জাগুর জুড়ি নেই। সদ্য হাসির হাওয়া বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে ঝড় আসবেই! আসর সমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ জাগবে এখনি।

ধনপতনগরের দল এখন জিরোচ্ছে। হারমোনিয়ামের ওপর মাথা রেখে বসে আছে পঞ্চানন। বাঘা মিয়া বাঁয়াটা পেটে রেখে তবলার ওপর ঝুঁকেছে। দোহারকিরা কেউ গুটিসুটি শুয়েছে, কেউ পিটপিট করে তাকিয়ে মুখের ওপর বিপক্ষ ক'পের (ক'পে অর্থাৎ সঙদার) লম্ফঝম্ফ দেখছে—নিরুৎসাহে। আসর ছেড়ে বাইরে গেছে কেবল ওরা দুজন।

মেলার বাইরে দীঘি। দীঘির পাড়ে একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে বসে আগুন জ্বেলেছে ফজল। পাটকাঠি কুড়িয়ে এনেছে কোত্থেকে। ওস্তাদ ঝাঁকসা আগুনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে—চোখ দুটো বোজা। দুটো হাত শিখায় বাড়ানো।

প্রসন্ন যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেছে। অবাক হয়েছে, ক্রুদ্ধ হয়েছে—তাতেও কোন ফল হল না দেখে সে সেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেই ফিরে গেছে ধনপতনগর। শেষবার বলে গেছে, তবে জেনে রেখো ঝাঁকসুদা—ধনপতনগর আর তোমার মুখ দেখবে না। তুমি কি মানুষ?

না, মুখ আর দেখাবে না ঝাঁকসু ওস্তাদ। শিমুলতলার শ্মশানেই সব কিছুর অবসান হয়ে গেছে। ...প্রসন্ন, সে বেশ্যাকে তোরা ইচ্ছে হয় পোড়াস, নয়ত বালির চরে পুঁতে দিস, যা খুশি করস! আমি তাকে চিনিনে। হ্যাঁ, পষ্ট বলে দিলাম রে বাবা, আমি আর কোন কিছুতে নাই।

এমন নিষ্ঠুর এই লোকটা! নিষ্ঠুর বলেই কমলাসিনীর মত মেয়েকে পায়ে দলে সুখলতাকে বুকে টেনেছিল। নিষ্ঠুর বলেই তো ফের সুখলতার বুকের ওপর হেঁটে গিয়ে নিয়ে এসেছিল গঙ্গামণিকে। ফের বুঝি কী মতলব মাথায় এসে গেছে।

ফজল অনুনয় বিনয় করেছে। পুলিশ হ্যাঙ্গামার কথা তুলেছে। তাতেও লাভ হয়নি। বরং রাক্ষুসে মুখভঙ্গী করে হেসেছে ধনঞ্জয় সরকার। থাম্ রে কাঠব্যাঙ। পুলিশ ঝাঁকসার নামে মাথা নত করে। সেটা ভুলিস নে। আমাকে তোরা কী ভাবিস রে শালার ব্যাটা শালা? আমার নাম ঝাঁকসু ওস্তাদ।

ব্যস। ফজল কাঠ। ওই সলিম ডাকাতের মত ভয়ঙ্কর লাগে লোকটাকে। কত বড় বড় মহাজন মানুষ এর ভক্ত! এলাকার কারো সাধ্য নেই ওর গা ছোঁয়। ফজল তা জানে। সে মনে মনে বলে, কেন যে গানের ওস্তাদ হয়েছিল ধনঞ্জয় সরকাব। বড় অদ্ভুত লাগে ভাবতে। ও ডাকাতের সর্দার হল না কেন?

আসলে ও একটা মিথ্যে দম্ভের খপ্পরে পড়ে গেছে। সেই যে যখন তখন বলে, জনশক্তি হল মহাশক্তি। জনশক্তি আমার হাতে। আসরে দাঁড়িয়ে যখন চারপাশে তাকাই, দেখি হাজার মানুষ আমার হাতের মুঠোয় বন্দী। আমার বুক ফুল ওঠে সাহসে। আমি তোদের জন্যে. তারা আমরা জন্যে বাঁধা—এক প্রাণ এক মন এক সুরের পাঁচালি। ফজল রে. আমি ধন্য, এ মানব জন্ম ধন্য।

পাগল, পাগল একটা! আসরের মানুষ আর সংসারের মানুষ যে এক নয়, এ ভুল ওর ভাঙবে কবে কে জানে! বড় আফসোস লাগে।

কিন্তু আছে এ এক বিরাট ধাঁধা ফজলের কাছে! কেন বিষ খেল গঙ্গামণি? কেন শান্তি পালাল? সেই শেষরাত থেকে প্রশ্ন ওকে জ্বালিয়ে মারছে। সাহস পায় না বলতে। মুখ তোলে, জিভের ডগায় শিরশির করে কথা, ঠোঁট বুজিয়ে নিতে হয়। হয়ত জোরসে এক কিল মেরে বসবে পিঠে। দল থেকে তাড়িয়ে দেবে। ফজলের বয়স হয়ে এসেছে। ওস্তাদের চেয়ে কিছু বেশি তো বটেই। জাগুরুদ্দিনের

মত স্বাধীনভাবে গান করতে তার দ্বিধা আছে। সঙ্গত একটা বড় কথা। ঝাঁকসু ওস্তাদের কাছ থেকে সরলেই সে হয়ত মূল্যহীন হয়ে পড়বে আলকাপের বাজারে। আজ পনের-ষোল বছরের জুটি—পরস্পর ইসারা বোঝে, মনের ভাবটি স্পষ্ট টের পায়, আসরে দাঁড়ালে বুকে সাহস থাকে প্রচণ্ড—পাশেই আছে মহাশক্তিমান নায়ক। আলকাপে তো লিখিত নাটক নেই। ঘটনাটা শুধু জানা থাকে। তাকে স্থানকালপাত্র অনুসারে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। একই পালা প্রতি আসরে প্রতিবার নতুন নতুন চেহারা পায়। ঘষামাজায় ঝকঝকে হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতার ধোপে যা কিছু গলতি, সব বাতিল হয়ে যায়। নতুন নতুন কথা আসে। যেন জলমেশানো দুধ থেকে কালক্রমে জলটুকু বাতিল করে দুধটুকু শ্রোতাদের ক্ষুধিত ঠোঁটের সামনে এগিয়ে দেওয়া।

ফজলের অত সাহস নেই। কী জানি কী হয়ে যায়! জমিজমা নেই একটুও—সামান্য একটা ভিটে! গানের টাকায় সংসার চলে তার। কতদিনের সাধ, ঘরের চালে টালি দেবে—মিটছে না। পেটে খেতেই সব চলে যায়। রাতজাগা মানুষ—একটু ভালরকম খেতে না পেলে শরীর টিকবে কেন? বউটিও বেশ খরুচে। তা না হলে এতদিনে ফজলের সংসার হয়ত শক্ত মাটি পেত পায়ের নীচে।

আগুনের সামনে বসে সে এইসব কথাই ভাবছিল। ওস্তাদকে মনে মনে সে ঘৃণা করছিল। এ হৃদয়হীন মানুষের সঙ্গে সে এতদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে? যদি ফজলেরই কিছু আপদ-বিপদ ঘটে যায়, আসর ছেড়ে তো যেতেই দেবে না তাকে!...

হঠাৎ ওস্তাদ ঝাঁকসা ডাকে, ফজল!

উঁ—বলে ফজল মুখটা তুলেই নামিল নেয়। ওস্তাদ চোখ বুজেই কথা বলছে।

ঠিক করলাম, না ভুল করলাম?

ফজল বুঝেও না বোঝার ভান করে বলে, উঁ!

প্রসন্ন এসেছিল। গেলাম না।

হুঁ। গেলে না তো!

তাই তো বলছি রে, ঠিক হল, না ভুল হল?

ফজল ফোঁস করে বলে, ভুল হল।

ভুল? কেন রে?

গঙ্গামণি আপনার বহু।

খিক খিক করে হাসে ধনঞ্জয় সরকার। ...বহু? আ বে, হাম বিভা নেই করিস্ শালীকো। চাঁই বুলি খোট্টাই ভাষায় কথা বলে সে। হাঁ বে ফজল, মন্তরভি নেই পড়িস!

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ফজল। তা তো সত্যি! কথা বলতে পারে না সে। নাকের পাশের জরুলটা অকারণ খোটে।

ওস্তাদ বলে, কাল সাঁঝমে শালী শাস্তিকা সাথ জোড় লাগিস।...

চমকে উঠে ফজল বলে, আ ছি ছি ছি!

হাঁ। কুত্তা-কুত্তীন ঢ্যায়সা হো যায়। ফজলা, উসকী হামভি জান মার দেতে! এ সমঝকার লেছে বেটি ঢপওয়ালী! আপনা জান নেহি, বে ফজল, উ আপনা...

অশ্লীলতম বাক্যে সম্পূর্ণ হয় কথাটা। ফজল কানে হাত ঢাকে। ...আ ছি ছি! চুপ কর ওস্তাদ। হামার ঘেন্না লাগে, হামার খারাপ লাগে।

বাঘড়ী অঞ্চলের বুলি এবার ফজলের মুখে। অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার সময়গুলোতে ওর এমনি করে বুলি বদলে নেয়। কেন নেয়, ওরা নিজেও জানে না। বুঝি মন উজাড় করার সুখ বেশি পায় এই মাতৃবুলিতে। ফের ফজল বলে, সেটা আগে বুললেও হত জী—খামাকা শাস্তিকে হামি টুঁড়ে হয়রান হনু। হারামী জাত হারালছে ফির। পাকা মর্দানা হলছে। অর্ নারী সাজতে ফির চাহিবে না। মরবে—না খেতে পেয়ে মরবে ওস্তাদ।

বিড় বিড় করে কী বলে ওস্তাদ ঝাঁকসা। বোঝা যায় না। কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ থাকে। আগুনে অবশিষ্ট জ্বালানিগুলো দুজনেই গুঁজে দেয়। ওদিকে আসর চলেছে সমানে। কার যেন তাড়া খেয়ে

ফকিরবেশী জাগু আসরের প্রান্তে একটা আমগাছে চড়ে বসেছে। অঙ্গভঙ্গী করে কী বলছে। মাথায় টুপি, ছেঁড়া বিচ্ছিরি হাফ শার্ট গায়ে! লুঙ্গিও পরেছে, কাঁধে কাঁথা ছেঁড়া দিয়ে সত্যিকারের ফকিরী ঝুলি—এতসব সাজগোজ জোগাড় করে আসরে নেমেছে জাগিরুদ্দিন!

মুখ তুলে দুজনে আসরটা দেখে নেয় একবার। তারপর ঝাঁকসা ওস্তাদ বলে ছেড়ে দে। পরের কাপ ঠিক করা যাক। দশটা না বাজলে ছাড়বে না শালা জুয়াড়ী।

নিরাসক্ত কণ্ঠে ফজল বলে, ধুর কাপ! একটা ডুয়েট দিয়ে শেষ করব। ভাঙা আসর। জমবে না আর।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় ওস্তাদ ঝাঁকসা। চাপা গলায় ডাকে, ও বে ফজলা! চন্দ্রবাবু মাল খাওয়াবে বলেছিল। চল, গিলে আসি দুপাত্র। চাঙ্গা হয়ে যাবি। আয় বে আয়, পদ্মার বান ডাকাতে যাই!

দুজনে চন্দ্রমোহনের ঘরের দিকে যায়। নতুন উৎসাহে লম্বা লম্বা পা ফেলে দুটিতে হাঁটে।

সূর্য মাথার সোজাসুজি আসবার আগেই মেলা নিস্পন্দ। দু'চারজনের যা নড়াচড়া রোদপোহানো বা চলাফেরা আছে, তার সবাই মেলার নিজের লোক। দোকানদার বাজিওয়ালা, ফেরিওয়ালা, জুয়াড়ি। দুটো লোক—জাতে মুদ্দোফরাস, ঝাড়ু চালাচ্ছে, এমুড়ো থেকে ওমুড়ো। গাছের পাতার ফাঁকে কোথাও অল্প অল্প রোদ। রোদ অবশ্য সরছে আর সরছে ক্রমাগত। সেই ফাঁকে কেউ সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে নিচ্ছে কিছুক্ষণ। দোকানের সামনে কয়লার উনুন এনে রান্নায় ব্যস্ত অনেকে। আলকেপেদেরও রান্নার সময় এখন। গোপালের আড্ডা দীঘির পাড়ে ভাঙা একটা আটচালায়। কবে নাকি পাঠশালা ছিল ওটা। এখন জায়গা বদল করছে। ভাঙা হোক, পাঠশালা ছিল একদা—তাই ভেবে গোপালের ভারি খুশি। চন্দ্রমোহন তাদের বেশি খাতির করল ধরে নিয়েছে। ওদিকে ঝাঁকসার স্বভাব জানা আছে তার। আসরের খুব কাছাকাছি সাজঘর বা আড্ডা সে পছন্দ করে।

চটের তাঁবু মাত্র। ওপরে অবশ্য ত্রিপলের ছাউনি। তার ভিতর বেঘোরে ঘুমোচ্ছে দলের লোকগুলো। ফজল অল্প নেশাতেই কাবু হয়ে পড়ে। তাতে কড়া হুইস্কি—জীবনে কখনও এ জিনিস সে খায়নি। সে এখন প্রায় বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে। বেঁটে ফরসা থলথলে তার দুটো বাহুর বেড়ে যে ওই ধিঙ্গি ছোকরা ভানুই রয়েছে, তা অনুমান করা যায় সহজে। একটা চাদরে দুটো মানুষ ঢাকা—শিয়রে ছলকে পড়া লম্বা চুলের ঝাঁপি। ওস্তাদ পর্দা তুলে উঁকি মেরে একবার দেখে নিয়েছে। মা বাপ তুলে অশ্লীল গাল দিয়েছে। কে আর শুনবে গালিগালাজ? দুটো শুওরই গভীর ঘুমে মড়া। খাঁটি আলকেপে মড়া।

এই নেতিয়ে পড়া পিশুগুলো দেখলে অবশ্য বড্ড মায়া লাগে। কী সুখের টানে মানুষের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত রাতের শয্যা আর ঘুমের সুখ ওরা বাতিল করে দিয়েছে? ওই ফজল—সে অবশ্য গুণী মানুষ, নাম যশ চায়, টাকাকড়ি চায়। ওই বাঘা মিয়া খলি বা তবলচী, সে চায় টাকা আর হাতের অভ্যাস চালিয়ে যেতে। বাঘার হাড় অব্দি পাক ধরেছে—গোরে যাবার সময় এসে গেল শীগগীর—ভুরুর চুলও সাদা হয়ে গেছে। তবু বেচারার বিশ্রামের বরাত নেই। এ বুড়ো বয়সে ফের বিড়ি বাঁধতে জঙ্গীপুর বাজারে গিয়ে বসার চেয়ে এটা মন্দ না। ভালই দেয় ওস্তাদ। রাত্রি পিছু সাত টাকা। যা তা কথা নয়! আর ওই পঞ্চানন —ওর গলায় সুরের বদলে অসুরের বাসা; অথচ এত ভাল হারমোনিয়াম বাজায়! এত মিষ্টি ওর হাত, এত ক্ষিপ্র আঙুল চলে যে মনেই হয় না হারমোনিয়াম বাজছে! এ যেন কী বাজছে। এ যেন আশ্চর্য নতুন বাদ্যযন্ত্র! তার সুখ হয়ত ওইখানটিতে। যা কণ্ঠে প্রকাশ করতে পারে না, তা আঙুল চালিয়ে জাহির করে ও সুখী। তারপর ওই দোহারকি তিনজন। নাসির, উদ্ধব আর বটো। তিনটি আস্ত কলুর বলদ ছাড়া কিছু নয়। শুধু দোহারকি করার জন্যে ওদের অস্তিত্ব। দ্রুততালে ধুয়ো গায় আর তালে তালে উত্তাল কত্তাল বাজায় ঝম ঝম ঝমা ঝমা। ওস্তাদ ঝাঁকসা বরাবর চেয়েছে, দলের প্রতিটি লোকের যেন দরকার হলেই আসরে ওঠবার যোগ্যতা থাকে। প্রত্যেকেই যেন নাচে গানে অভিনয়ে পটু হয়। লোক হাসাতেও সমর্থ হয়। সে কিন্তু আজও সম্ভব হয়নি। যদি বা কোন হারমোনিয়ামদার আসরে উঠে কাজ করবার উপযুক্ত হল, অমনি দল থেকে কেটে পড়ল সে। নতুন কাঁচা দলে শুরু কবল মাস্টারী। তবলচী বা অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। দেখেশুনে আর সে চেষ্টা করে না

ওস্তাদ ঝাঁকসা। নিজে বরং দুটো তিনটে ভূমিকা চালিয়ে নেয়—ফজলকে দিয়েও চালায়। মোট কথা ওস্তাদ আর সঙাল থাকলেই আসর চলল, ছোকরা তো রয়েছেই। এ তিনজন মিলে চলতে থাকলে পদ্মার এপার বাঘড়ী কালান্তর আর গঙ্গার পারে রাঢ় এলাকা পায়ের তলায় বশ মানবে।

নাসির মোল্লাবাড়ির ছেলে। বাপের পয়সা আছে অনেক। উদ্ধবও মণ্ডল সন্তান। বটোর বাবার শব্জিচালানী করবার আছে ভালো। ওরা পান তামাক আর খাওয়া পেলেই খুশি। আর কী পেলে খুশি তাও ওস্তাদ জানে। মোহিনী ছোকরার একটু হাসি, দুটো কথা, অল্প ঢলাঢলি—ব্যস, স্বর্গ ওদের হাতের মুঠোয়। আরো একটা ব্যাপার আছে। সেটা যতই কদর্য শোনাক, তার সীমাচৌহদ্দি বড় কড়া—শান্তির পাশে শুয়ে থাকার ভাগ্য হয়ত দুর্ভাগ্যই। শান্তি ওদের আর যা যা সব আকাঙ্ক্ষিত, পুষিয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি কোনদিন। বিনিময়ে শান্তি অনেক কিছু উপকার পেয়েছে। কিন্তু শোবার সময় শুওরটা দেয়াল ঘেঁষে শুত। ফলে—পাশের জায়গার একমাত্র অধিকার শুধু ফজলের। এ নিয়ে মান-অভিমান আড়ালে-আবডালে কম চলত না। চলত—আবার মিটেও যেত আপনা আপনি।

আজ শান্তি নেই। নেই—তা দোহারকিঁদের ধুয়ো ধরার টানেই বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু সতর্ক ওস্তাদ ঝাঁকসা আবার নিজেই একশো—নিজে দোহারকি করতে লেগে যায়, ফজলকে করায়—এমন কি বাঘামিয়াকেও। তবে ওরা যখন মুদারায়, বাঘা মিয়া চলে উদারায়। ব্যান্ড পার্টিতে ফ্লুট-কর্নেটের সঙ্গে যেমন মস্ত ভেঁপুবাঁশি বাজে—ঠিক তেমনি।

শান্তি নেই। কিন্তু ভানু আছে। বটো—উদ্ধব—নাসির তিনজনেই তক্কে তক্কে ছিল—এ তো সেই করতলগত ভানু, যাকে অ্যাদ্দিন আমলই দেয়নি ...কিন্তু ভানুরও একটা আত্মসম্মানবোধ আছে। আজ সে প্রখ্যাত ওস্তাদ ঝাঁকসার প্রধান ছোকরা—আজ সে মহারাণী গিদাম্বরী—জাগু সঙালের ভাষায়। অবিকল শান্তির মত চাউনি তার, গান শেষে ঠিক তেমনি পদক্ষেপে দুলতে দুলতে সাজঘরে আসা, অবহেলায় শাড়ি ব্লাউজ খুলে ছড়িয়ে দেওয়া, জলের বালতির জন্য রঘুকে হুকুমদারি। তেমনি ভঙ্গীতে হাতের চেটোয় সাবান নিয়ে মুখের পেন্ট ধুয়েছে। চঞ্চল পায়ে নাচতে নাচতে চন্দ্রমোহনের ঘরে গেছে। ইয়ারকি মেরেছে। চা খেয়েছে। পয়সা আদায় করেছে। আসবার সময়, ধুৎ মিনসে বলে জুয়াড়ির চিবুকে ঠোনাও দিয়েছে। যত বিচ্ছিরিই লাগুক এ আচরণ, তবু মনে মনে সে আজ শান্তি। এবং শান্তির মতই শেষপ্রান্তে চাদর বিছিয়ে শুয়েছে। বলেছে, কই হে সঙাল—হাত বাড়াও, বালিশ করি। বটো—উদ্ধব—নাসির পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গোপনে—প্রত্যেকের অজানতে, ক্ষিপ্ত। একজায়গায় শুয়েছে—পাগুলোর গতি ভানুর পায়ের দিকে। অর্থাৎ লাথি মারো ঢ্যামনার বাচ্চাকে।

এতগুলো লোকের রান্না করবে বেচারা রঘু।

চন্দ্র জুয়াড়ি লকড়িটাই যা দেয়নি—আশেপাশে লকড়ির অভাব নেই এদেশে, বাদবাকি সবই দিয়েছে। রঘু পাঁজাকরা পাটকাঠি এনে জড়ো করেছে। জমিদারবাবুর বাড়ি পাশে খুঁজে ইট এনেছে। তাই দিয়ে উনুন। প্রকাণ্ড একটা কড়াই চাপানো। আউষের মোটা চাল সেদ্ধ হচ্ছে। বাঁধাকপি আছে, আলু আছে, ওস্তাদের খাতিরে সের দেড়েক একটা মাছ পাওয়া গেছে আর মুশুরীর ডাল সেরটাক। আনাজপাতি অঢেল মেলে। এ মাটিতে ধান হয় কম, ফলে নানারকম শাকসব্জী ফলমূল আর চৈতালী। দামও কম। মেলার কয়েকটা দিন আশেপাশের গরিব-গুরবো মানুষেরা ভাত খাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পায়। নৈলে সেই সপ্তায় একবেলা—বাকি খাদ্য মাসকলাইয়ের রুটি, ছোলার ছাতু—আর গ্রীষ্মকালে অঢেল আম কাঁঠাল। সে সুদিনও শেষ হয়ে আসছে তখন। জমিদারবাবুরা জমিদারী উচ্ছেদের হিড়িকে আর কাঁঠাল আর লিচুর বাগান কেটে সবুজ শ্যামল দেশটা খাঁ খাঁ করে ফেলেছে। সাদা মাটি যেন ভীষণ হাসি হাসছে।

ওস্তাদ ঝাঁকসা নেশায় টলছিল। টলতে টলতে রঘুকে বলেছে, কী রান্না হচ্ছে রে? রঘু কথা বলে কম। হাসে মাত্র। সে হেসেছিল।

তখন ওস্তাদ বসেছে, কফি কাটতে। মোটামোটা ফালি করে ভাতের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। রঘু হতভম্ব। বারণ করার সাধ্য নেই। ওদিকে ওস্তাদ ডাল আলু—এমনকি মাছটাও কেটে আধোয়া

টুকরোগুলো ভাতে ফেলেছে। তারপর সে কি হাসি!...দেখিস যে শালার ব্যাটা শালা, আজ অমৃতভোগ খাওয়াব।

...অমৃতভোগ একটা চেহারা পাচ্ছে এখন। রঘু বিমর্ষ মুখে খুন্তী দিয়ে ঘুঁটছে। ওস্তাদ দুলতে দুলতে আমবাগান পেরিয়ে ওদিকে চলে গেল কোথায়।

সূর্য ঢলেছে। ওদের জাগাতে হবে এবার। রঘু ওঠে। প্রথম সে বাঘা মিয়াকেই ডাকে। মিয়া, উঠ হে। ও খলিফা! ইদিকে সব্বোনাশ! ঘণ্ট রান্না হয়ে গেছে, খলিফা। উঠ, উঠ।

এ নদীর নাম পদ্মা।

সামনে দাঁড়াতেই বুক হু হু করে ওঠে। আদিগন্ত মুক্ত মাঘ শেষের আকাশ। নীচে ধু ধু বালির চড়া—অনেকগুলো হাল্কা নীল জলের ধারা এখানে ওখানে চরের গা ঘেঁষে বইছে। হাওয়া তোলপাড়। জলপাখিদের চিৎকার আছে। নৌকা আছে। সব মিলিয়ে এ অগাধ শূন্যতা যেন কোনদিন ভরবার নয়। খালি মনে হয়, কী যেন হারিয়ে গেছে। কী বুঝি ভেসে গেছে এমনি বিস্তৃতির শূন্যতার স্রোতে।

দলের লোকেরা দাঁড়িয়ে পরস্পরকে আঙুল তুলে দেখায়, ওই পাকিস্তান। ওরা কিছুক্ষণ পাকিস্তান দেখে। কিছু দেখা যায় না স্পষ্ট। আবছা কুয়াশার মধ্যে ঘন কালো একটা রেখার মত। আলকেপেরা হিন্দুস্তান পাকিস্তান নিয়ে ছড়া গায়। কাপ দেয়। সেই পাকিস্তান! যতবার পদ্মার পাড়ে দাঁড়াবার সুযোগ পায়, বলে হুই পাকিস্তান।

এই তো কিছু দিন আগে কালীতলা বর্ডারে গান হল। ওস্তাদ গান গেয়েছিল,

হায় রে হায়, কেমনে বাঁচব জান।
হল হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান।।
ভাই রাখে না ভাইয়ের মান,
কেমনে বাঁচাব জান।।
মোরা, হিন্দু মুসলমান
এক মায়ের সন্তান
ভায়ের মুখ দেখতে ভাইকে
ওনারা সব পাসপোর্ট চান,
কেমনে বাঁচাব জান।।

দুপুরবেলা পদ্মায় নেমে স্নান করছে আর নিজের মনে বিড়বিড় করে কী বলছে ওস্তাদ। ফজল শুধিয়েছিল সকৌতুকে, ভুল বকছেন না কি জী?

নাঃ, ভুল বকি নাই। হ্যাঁ রে ফজল, ধর, যদি এমন হয় কোনদিন, দেশজুড়ে হিন্দু মুসলিম হানাহানি লেগে গেল, তুই—তুই ফজল কপে, আর আমি ওস্তাদ ঝাঁকসু, আমরা কী করব রে? অ্যাঁ? ও ফজলা! জবাব তো দে একটা। চুপ করে থাকিস নে শালার ব্যাটা শালা!

লোকটা ক্ষেপল কেন রে বাবা? ফজল বলেছিল, রাখেন জী, কী সব কুকথা।

চো-ওপ কুত্তাকা বাচ্চা। জবাব দে। আমার মাথায় লাঠি মারবি?

তুমি মারবেন জী?...

সঙদারের কথা—ওই রকম আপনি তুমি আর কণ্ঠস্বরে রসের বান। ওস্তাদ ঝাঁকসা দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। মাঝে মাঝে ভাবের ঘেরে লোকটা পাগল হয়ে যায় এমনি করে। আসর বাহির জ্ঞান গম্যিই থাকে না। সে বলেছিল, ফজল, মনিরুদ্দিন বিশ্বাসের সাগরেদ ওস্তাদ ঝাঁকসু বুকের রক্ত দিয়ে বাংলাদেশে মানুষ কথাটা লিখে যেতে এসেছে। ...পরক্ষণে হো হো হেসে, আয়রে, দুই শালা পাপী একসঙ্গে ডুব দিই!

সেদিন সারাবিকেল গুন গুন করে বানাল নতুন একটা গান,

আমার এমন জনম আর কী হবে।
মানুষ দেখতে এসেছিলাম ভবে।।

আব সেই গান এখন দেশ থেকে দেশান্তরে সবার মুখে ফিরছে। কতদিন ফিরবে। হালের কৃষাণ গাইবে, মাঠের রাখাল গাইবে, হাটের ফিরতি হাটুরেরা গাইবে—আর খেয়াঘাটের মাঝি, রাঢ়দেশগামী 'বাঘড়ে' গাড়োয়ান, মাঠের ফসলপাহারাদার 'জাগাল' নিশিরাতের নিস্পন্দ পৃথিবীতে ঘোষণা করবে বারবার,

এমন জনম আর কী হবে, মানুষ দেখতে এসেছিলাম ভবে।।

তবে মানুষ দেখাই সার। চেনা গেল কতটুকু? সামনের হাত বিশেক জলধারার ওপারে যে বালির ঢিবি, তার চূড়োয় বসে আছে কে—তাকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ফজল। ওস্তাদজী না? তবে যে কে বলল, ওস্তাদজী মেলার কোন দোকানে ঘুমোচ্ছে? ঘুম যার আদৌ হয় না—সে ঘুমোচ্ছে শুনলে জাগাতে ইচ্ছে করে না। তার ওপর ওস্তাদ ঝাঁকসা। তার ওপর সদ্য অপঘাত ঘটেছে—অন্য কেউ হলে পাগল হয়ে যেত এতক্ষণ। ছোকরা গেল, প্রিয় মেয়েমানুষ মরল। ও ঘুমোক, প্রাণ ভরে ঘুমোক।

এখন ফজল বলে, আরে, ওস্তাদজী ওখানে কী করছে!

রঘু বলে, তখন আমি বললাম না, উনি মাঠের দিকে গেল! তোমরা বললে, ঘুমোচ্ছে। তোমরা কানই করলে না আমার কথাটা। গরিবের কথা—বাসি হলে...

থাম্ বে বুড়ো ভেড়া! ফজল ধমকায়। ...একটুখানি রসকস দিয়ে চাঙ্গা করে আসি লোকটাকে।

তারপর ধুতি খুলে পুরো উলঙ্গ হতেও তার বাধে না। চারপাশে এত সব লোক! বেহায়া ফজলের কীর্তি দেখে সবাই লজ্জায় মুখ ফেরায়। পরক্ষণে সে জলে ঝাঁপ দিয়েছে। হাতে ধুতিটা গুটানো—হাতটা তুলে রেখে ঝাঁপ দিয়েছে।

আন্ডারপ্যান্ট ফজল পরে না। 'শরীল' ভারি লাগে নাকি। কোন কাপের সময় তাই ছ্যাবলামি করে ছোকরা ওর ধুতির কোঁচা ধরে টান দিলেই...

দৃশ্যটা অশালীন—বিশেষত ভদ্রজন বা মেয়েরা যেখানে উপস্থিত, সেসব আসরে—কিন্তু সেদিকে লোকটা অসম্ভব সেয়ানা। সম্পূর্ণ ন্যাংটো হবাব আগেই অদ্ভুত ভঙ্গীতে বসে পড়ে। লজ্জা নিবারণ করে ফেলে। ব্যস, ওতেই হাসির তুফান ওঠে আসরে। ওই দিয়েই সীমারেখা রক্ষা করেছে সে, লঙ্ঘন তো করেনি একেবারে।

তবে বিদেশে গিয়ে স্নানের সময় সুযোগ বুঝলে ফজল ন্যাংটো হয়ে জলে নামতে দ্বিধা করে না। নির্বোধ সমান মুখভঙ্গী করে বলে, আমরা এমনিভাবে এসেছি দুনিয়ায়, যাবও এমনি ন্যাংটো হয়ে—আমি এইটুকুনই বুঝি ভাইসকল। তাছাড়া আমার বয়েস বেশি নয়—সামান্য 'বারো কি তেরো'...তারপর হঠাৎ কোন অচেনা লোক আসতে দেখলেই গতর ঢাকে সশব্যস্তে। এর নাম কপেমি। আলকেপেরা এই রকম মানুষ। সবাই তা জানে। গালমন্দও করে—আবার গানের আসরে যেতেও ভোলে না।

একগলা জল মাত্র। হেঁটে পেরিয়ে যায় ফজল। ওপারে গিয়ে ধুতিটা জড়িয়ে নেয় ফের। এক দৌড়ে উঠে যায় চূড়োর কাছে। গিয়ে ডাকে, ওস্তাদ, ওস্তাদজী!

ওস্তাদ ঝাঁকসা মুখ ফেরায় না। হাত তুলে ইসারায় ডাকে।

ফজল কাছেই বসে। পরক্ষণে চমকে ওঠে। নিঃশব্দে কখন থেকে লোকটা কাঁদছে। কী বলবে, ভেবে পায় না ফজল। সান্ত্বনা দেবার কথা হাতড়ায় সে। ন্যাংটো হবার মত ছ্যাবলামি মন থেকে পলকে উবে গেছে। ভেবেছিল, এই নিয়ে রসিকতা করে সে ওস্তাদের জমিয়ে ফেলবে। বিদেশে গান করতে আসার আসল মজা তো এগুলোই।

কিন্তু ওস্তাদ কাঁদছে। কাঁদতে কি কোনদিন সে দেখেছিল ওস্তাদ ঝাঁকসাকে? মনে পড়ে না তো!

আর ওস্তাদ ঝাঁকসা আস্তে আস্তে বলে, কাঁদছি না ফজল। যদি বা কাঁদি এত আমার আনন্দের কাঁদন। ফজল, ঢপওয়ালীর বদলে যদি আমার শান্তি বিষ খেয়ে মরত, তাহলে কেমন করে বেঁচে থাকতাম। সে কথা ভেবেই আমি কাঁদছি।

চন্দ্রমোহন বলে, কে বলেছে ঝাঁকসুকে সত্তর টাকা রাত দিচ্ছি? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে গোপাল? দলের রেট আমার প্রাইভেট ব্যাপার—বলব না। তবে জেনে রেখো, তোমার চেয়ে সামান্য কিছু বেশি হতে পারে। সেটা তুমিও স্বীকার করতে বাধ্য—ওর একটা নামডাক আছে বৈকি।

গোপাল ব্যঙ্গ করে হাসে। ...নাম ডাকের বহর যা দেখছি, আপনিও দেখছেন স্যার বলবেন না ওকথা। নেয্য বিচার করে বলুন দিকি, ওকি গান হচ্ছে? আসর রাখতে পারছে? লোকের মধ্যে গিয়ে বসে খবর নিন—ওরা রাত জাগছে, কখন আমরা আসর নেব সেই আশায়। বলুন, আপনিই বলুন।

চন্দ্রমোহন ভুরু কুঁচকে কথাটা যেন বোঝবার চেষ্টা করে। ঠোঁট দুটো জড়োসড়ো আর গোলাকার করে একটা অদ্ভুত শব্দ তোলে চুকচুক চুকচুক। তারপর বলে সেটা ঠিক। কাকেও বলে না—চুক্তিমত পুরো টাকা ওকে আমি দিচ্ছিনে। শান্তি—শান্তি কই দলে? তবে হ্যাঁ, তোমায় বরং বকশিস বাবদ বাড়তি কিছু পুষিয়ে দেব—কথা দিচ্ছি গোপাল। আরে ভাই, টাকাই কি সব। হলফ করে বলো দিকি, এই যে তুমি গোপাল—বড় ঘরের ছেলে বলেই শুনেছি, তুমি গান করছ শুধু টাকার জন্যে? আজ ঝাঁকসুর মত ওস্তাদকে ঘায়েল করে তোমার মাথায় তো এখন যশের মুকুট হে!

গোপাল বলে, কিন্তু কেমন করে দল চালাই দেখুন ইদিকে। হিসেব ধরুন—জাগুকে হায়ার এনেছি, দশ টাকা রাত নেবে। পাইপায়সা কমে ছাড়বে না। নিজের সেটের লোকজনকেও টাকা দিতে হয়। তবলচী নেবে তিন টাকা। হারমোনিয়ামদার দু টাকা। ছোকরা মধুর আগে ছিল মাস মাইনে এখন আসর পিছু টাকা দিই। তার পাঁচ টাকা। চারজন দোহার নেয় চার টাকা। কত হল? চব্বিশ। বাকি রইল ছয়। ইদিকে ছোকরার সাজপোশাক আছে, হাতখরচা আছে, পেন্টের জিনিসপত্তর আছে। এখন বলুন, ত্রিশ টাকায় আসর চালিয়ে আমার কী থাকল? আমি শালা কি বানের জলে ভেসে এলাম সার?

গম্ভীর হয়ে ওঠে চন্দ্র জুয়াড়ী। বলে, দেখ—সেটা বয়না নেবার সময় ভাবা উচিত ছিল।

ছিল। কিন্তু...আমতা হাসে গোপাল। ...বলেছিলেন ঝাঁকসুর সঙ্গে চালিয়ে যেতে পারলে তখন বিবেচনা করবেন। এখন দেখুন, চালিয়ে যাওয়া ছেড়ে দিচ্ছি, তবে প্রায় টিট করে ফেলেছি না?

চন্দ্রমোহন বলে, ফেলেছ। ঠিক আছে, ভেবে দেখছি। তুমি চালিয়ে যাও।

গোপাল ওঠে। ...ঝাঁকসুকে গঙ্গাপার না করে আমি থামছিনে চন্দ্রবাবু। দেখে নেবেন। শালা দেমাক হয়েছিল বড্ড। । জাতে চাঁই মোড়ল—সে আবার হেড মাস্টার সেজেছে, আলকাপ নাকি ওর কাছেই শিখতে হবে।

চন্দ্রমোহন হাসে। ...ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আমার বাবা আসর চালানো নিয়ে কথা। যত বেশি লোক জমবে, তত আমার কাজ হবে। তোমার দিব্যি গোপাল, আর দু'একটা আসর যদি দেখি ওইরকম টিমে তেতালা শুরু হয়েছে—ঘাড় ধরে বিদেয় করব। বরং সোলেমানের দল এলে তোমরা দু দলেই মেলাটা শেষ করবে। শেষ দিকে দু রাত্রি মালদার রহিমপুর আসছে। ওরা একাই একশো।

যাবার সময় উৎফুল্ল গোপাল বলে যায়, আপনার আশীর্বাদ থাকলে রহিমপুরের সঙ্গেও লড়ে দেখতে পারি। চান্স দিয়ে দেখুন না সার।

চন্দ্রমোহন গলা থেকে মাফলার খুলে অস্ফুটে স্বগতোক্তি করে, এ শালার বাড় বেড়েছে দেখছি — রহিমপুরের সঙ্গে লড়বে।

কিন্তু গোপাল ওস্তাদের কথা সত্য। ঝাঁকসুকে সত্তর টাকা রাত দিতে হচ্ছে। অথচ গানের এই ছিরি! মেলায় উৎসাহ কমে আসছে লোকের। গোপালের দল যতটুকু জমাক, সেটা নেই-মামার চেয়ে

কানা-মামার মত স্বস্তিমাত্র। কোথায় শান্তিচরণ আর কোথায় এই মধুচরণ! লোকের মন না ভরলে খেলা জমবার নয়।

চন্দ্রমোহন বেরিয়ে পড়ে।

খোলা মাঠের চট বিছিয়ে ঝাঁকসুর দল বিকেলের রোদ পোহাচ্ছে। ধিঙ্গি ছোকরাটা একজনের উরুতে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়েছে। লোকটা তার চুলে বিলি কাটছে। তবলচী বা খলিফা বুড়ো পা দুটো সটান ছড়িয়ে মুণ্ডু সামনে ঝুঁকিয়ে ঝিমোচ্ছে আরামে। আশেপাশে দু-চারজন ভক্ত ঘুর ঘুর করছে। ভানুর সঙ্গে ভাব জমাতে চায়।

ওস্তাদ কই, ওস্তাদ? চন্দ্রমোহন ডাকে।

ওরা হুড়মুড় করে উঠে বসে। ...লায়েকমশাই যে! ওস্তাদ কোথায় গেলেন যেন ফজলের সঙ্গে।

ছোকরা ভানু কটাক্ষ হেনে হাত জোড় করে বলে, নমস্কার দাদা। আসুন।

কান করে না চন্দ্রমোহন। মেলার দিকে এগিয়ে যায়। একটু পরেই চায়ের দোকানে দেখা মেলে ওস্তাদ ঝাঁকসার। বেঞ্চে চুপচাপ বসে রয়েছে। পাশে দুজন লোক। এ এলাকার লোক নয়, তা অভিজ্ঞ চন্দ্রমোহন বুঝতে পারে। ...অমন ছিমছাম গড়ন, সুবেশ ভব্য চেহারা—গঙ্গাপারের রাঢ়ের লোক বলেই মনে হচ্ছে।

চন্দ্রমোহন ডাকে, এই ও ওস্তাদজী, আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছি।

মুখ তোলে ওস্তাদ ঝাঁকসা। কিছু বললেন চন্দ্রবাবু?

বলব। একবার আমার ঘরে আসুন দাদা। চন্দ্রমোহন স্মিত হাসে।

ওস্তাদ বলে, চলুন। এঁদের সঙ্গে কথা সেরে নিই।

বায়না বুঝি?

আজ্ঞে।

গঙ্গাপার?

আজ্ঞে।

চন্দ্রমোহন চলে যায়। মেলাপ্রাঙ্গণের মাঝামাঝি গিয়ে তার গতি বাড়ে। কী সর্বনাশ! থানা থেকে স্বয়ং বড়বাবু হাজির। অবশ্য সলিম আছে পাশে। আপ্যায়নের ত্রুটি হবার কথা নয়। পাশের দোকানের সামনে চেয়ার পেতে বসতে দিয়েছে। সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

চন্দ্রমোহনকে কত দিক সামলাতে হয়। নমস্কার করে বলে, আসুন স্যার! কী সৌভাগ্য।

জেদ করে ফজল গেছে ধনপতনগরে। মাইল দশেক পথ। পায়ে হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। তবে সাইকেল থাকলে ভিন্ন কথা। ফজল মেলায় কার সাইকেল জোগাড় করেছিল। সন্ধ্যায় ফিরবে।

ব্যাপারটা জানতে গেছে সে। গঙ্গামণির গতি কী হল, ওস্তাদের স্বার্থেই তা জানা দরকার। এদিকে এমন গোঁধরা মানুষ, পৃথিবীতে ওলটপালট হলেও গ্রাহ্যি নেই। সেবার ফতেগঞ্জের মেলায় খবর এল, ওস্তাদের বড় ছেলের সাংঘাতিক অসুখ—মরমর অবস্থা। কী নিষ্ঠুর হয়ে বসে রইল ধনঞ্জয় সরকার। ফের যে এল, সে স্বয়ং মেজ.মোল্লান সুখলতা। ছইবিহীন গোরুর গড়ি করে হাজির। এসেই তুলকালাম কাণ্ড। চাঁইবোলিতে চেঁচামেচি, মেলাশুদ্ধ মজা দেখতে দাঁড়িয়েছে—ধনঞ্জয় সরকার বিব্রত মুখে বলছে, তেরা সতীনকা ছেইলা গে মেঝকি, তে ক্যা? যা, যা, ঘর চলা যা।

সুখলতাকে হার মেনে যেতে হল। সারাপথ কাঁদতে কাঁদতে গেল সে। ফজলের সেদিনও বড় তাজ্জব লেগেছিল। বলেছিল, তোমার মত জ্ঞানী দেখি না ওস্তাদ। আসরে দাঁড়িয়ে তুমি জ্ঞান দাও মানুষকে। তোমার এ কি কাণ্ড! মুখে বল এক, কাজে কর অন্যরকম!

ওস্তাদ আর কী বলবে! সেই বাজখাঁই চেঁচিয়ে গালমন্দ। চুপ করিয়ে দেওয়া। তারপর জনান্তিকে একসময় বলেছিল, ফজল রে, আমার বড় জ্বালা! তুই বুঝিস না সেটা...

এবার অবশ্য প্রসন্নর পরে আর কেউ আসেনি। গরজই বা কার! অজাত-কুজাতের মেয়ে গঙ্গা

পালিয়ে এসে রক্ষিতার মত বাস করছিল—নিলাজ বেশ্যা এত তাড়াতাড়ি বিদায় চুকিয়েছে। স্বস্তিতে হাসছে সারা ধনপতনগর। দেশজুড়ে ওস্তাদের সাগরেদ যে-যেখানে আছে, তারাও হাসছে। গ্রহণমুক্ত হয়েছে ওস্তাদ। রাহু সরে গেছে। মানসম্মান বেঁচে গেছে ধনঞ্জয় সরকারের।

গঙ্গাপার রাঢ় থেকে দুটি লোক বায়না এনেছে। মাত্র এক রাতের আসর। রাঢ়ের বায়না এলে ওস্তাদ ঝাঁকসা পারতপক্ষে ছাড়ে না। রাঢ় দেশ আমন ধানের দেশ। বড় সুখি ওরা। কত সুন্দর মিহি চালের ভাত খায়। প্রতিদিন তিন বেলাই ভাত—ছাতু রুটি নয়, ভুজা নয়, পশুখাদ্য নয়—ভাত। আর কত ঝকঝকে সব রাস্তাঘাট—ধু ধু মাঠ, বিরাট আকাশ, ইচ্ছে করে ফজলের ভাষায়, যবে যাই চলেই যাই যদ্দুর খুশি। সেখানে মানুষ কত সভ্যভব্য, শিক্ষিত আর বিচক্ষণ, শাস্ত্র বোঝে, তত্ত্ব বোঝে। আর এ গঙ্গার পূর্ব পার বাঘড়ী থেকে কালান্তর—পদ্মা থেকে সোজা দক্ষিণে নদীয়াকুজলার সীমান্ত অব্দি বিস্তৃত অঞ্চলটা এত গরিব, এত দুঃখী। রাঢ়ের দিকে সবার দৃষ্টি। তার এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে এরা বেঁচে থাকে। রাঢ়ে ফসলকাটা শুরু হলে দলে দলে বাঘড়ী থেকে গরিব মানুষেরা বেরিয়ে পড়ে। ভিখ মাঙতে যায়, ভাত খেতে যায়—মুখে বলে, মুসাফির চননু (চললাম) সফরে—হামরা মুসাফির। যাদের জমি আছে—সব্জী আনাজপাতি ফলে, আম কাঁঠাল লিচুর গাছ আছে—তারা বছরের সবসময় গোরু মোষের গাড়িতে মাল বোঝাই করে যাতায়াত করে রাঢ়ে। তার বদলে ধান নিয়ে আসে। আর এক সম্পদ পাট। পাট ওঠার সময় অর্থাৎ শরতকালটা মোটামুটি সচ্ছল। গানবাজনার ঘরোয়া আসর—পূজায়-পার্বণে কি কোন অনুষ্ঠানে—তখনই যা কিছু জমে ওঠে। তারপর তো এইসব চন্দ্রমোহনদের মুখ চেয়ে বসে থাকা। একসময় জমিদারবাবুরা আসর দিতেন। উচ্ছেদের হিড়িক চলেছে, তার ওপর তাঁদের অবস্থাও পড়-পড়।

তবে রাঢ়ে ভদ্রসমাজ আলকাপের প্রতি এখনও মনে মনে বিরূপ। ওখানে আলকাপ বলে না, বলে, ছ্যাচোড় বা ছ্যাঁচড়া। দল আছে অগুনতি—কিন্তু তার মান এত নীচুতে যে ভদ্রসমাজের পাতে দেওয়া চলে না। ইতরজনে গায়, ইতরজনে শোনে। ওস্তাদ ঝাঁকসার বড় ইচ্ছা, রাঢ়ে আলকাপের কদর বাড়ুক। যখনই যাবার সুযোগ হয়, যায়। গিয়ে আলকাপের তত্ত্ব প্রচার করে। ভালভাল কাপ দেয় আসরে। অশ্লীলতা করে না। ভদ্রজন দৈবাৎ উপস্থিত থাকলে, লক্ষ্য করে বলে, আমাদের গাওনার বিষয় আধুনিক। আধুনিক শব্দটা রাঢ়ে বেশ চালু হয়েছে ততদিনে। যারা নিজেদের দলকে এতকাল ছ্যাঁচোড় বলত, তারা বলতে শুরু করেছে, শুধু আলকাপ নয়—আধুনিক। ভাল দল আসরে নামলে এখন শ্রোতারাই বলে ওঠে, আধুনিক লাগাও, আধুনিক।...

লোকদুটো এসেছে রাঙামাটি থেকে। জঙ্গীপুর থেকে রেলপথে খাগড়াঘাট রোড স্টেশনের পরে চিরোটি। সেখানে নামলে সামান্য পথ মাত্র। ছিমছাম চেহারার যুবকটি শিক্ষিত সভ্যভব্য। নাম পরিতোষ। পরিতোষ মণ্ডল। পরিতোষ বলেছে গিয়ে দেখে আসবেন ওস্তাদজী। রাঙামাটির নাম আছে ইতিহাসে। রাজা শশাঙ্কর রাজধানী ছিল ওখানে। আদিনাম কর্ণসুবর্ণ—কানাসোনা বলে লোকে। নিচে ভাগীরথীর মজা খাত। লাল মাটির বড় বড় ঢিবি---সে এক সিনারি।

সঙ্গের লোকটি মধ্যবয়সী। হাতের চেটো দেখে ধরা যায়, ও ক্ষেতেও গতর খাটায়, মোড়লীও করে গ্রামে। জামাকাপড়ে বিষয়বিত্তের প্রকাশ আছে। বড় বড় দাঁত বের করে বলেছে, আমার নাম হাতেম আলি। বড় সখ ছিল—কত বড় বড় দলের আসর তো দিলাম—একবার আপনার দিই। আপনার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরছে আজকাল। ধন্য হলাম দেখে। এবার কিনা আমার দেশবাসীকে ধন্য করুন।

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলেছে—চোখ বুজে বলেছে, একশো টাকা লাগাবে। পারবেন?

.. একশো? ওরা মুখ তাকাতাকি করছিল পরস্পর। আলকাপের দল একশো টাকা রাত! পাড়ায় পাড়ায় দল আছে সব—তারা তো তেল তামাকের বিনিময়েই গান করে বেড়ায়। কিছু চা-মুড়ি থাকলে তো কথাই নেই। সকাল অব্দি চালিয়ে দেবে। একটু ভাল বা নামী যারা—দশ পনের কি পাঁচিশে মেলে। বীরভূমের মনকির ওস্তাদ এদিকে গাইতে এসেছে অনেকবার। তার বায়না ত্রিশটাকা। বরকত ওস্তাদও

নেয় ত্রিশ। পাতু ওস্তাদ বাড়ির লোক। বারো পেলে বারো, আবার দশ পেল তো দশেই সই। তাছাড়া কত দল ফেরিওলাদের মত যন্ত্রপাতি মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গান করাবেন গো, গান?

এই তো অবস্থা। আর এই লোকটা চায় এ—ক—শো টাকা! রাঙামাটি থেকে কমাইল দূরে—সাঁওতাপাড়া দলের আজকাল নামডাক ভারি। ওরা একেবারে 'আধুনিক।' ওদের দলে যে ছোকরা আছে সে নাকি সাক্ষাৎ মেয়ে—মোহিনীদের রানি। আছে এক নতুন মাস্টার—এখনও তাকে ওস্তাদ বলে না লোকে—কিন্তু সে নাকি একেবারে সিনেমা দেখিয়ে দেয় আলকাপের আসরে।

তারাই বায়না নিয়েছে রাঙামাটিতে। পঁচিশ টাকা মাত্র রাত। আর ওস্তাদ ঝাঁকসা নেবে এ—ক—শো! মগজে আগুন জ্বলে ওঠে ধিকি ধিকি।

ওস্তাদ ঝাঁকসার মুখে অন্য কথা নেই। যা, বলেছি, লাগবে। যদি বলেন, ভাল যাত্রার দল পাবেন এ টাকায়, তাই নিয়ে যান। বহরমপুরের বীণাপণি অপেরার নাম শুনেছি। ওরা আশি টাকা নেয়—কমেই হবে।

পরিতোষ বলে, নাঃ, যাত্রা শুনবে না লোকে। পাড়াগাঁর লোক সব। শুনলেও মন ভরবে না। যাত্রাকে প্রায় ডুবিয়ে দিলে আলকাপ। একে সস্তায় মেলে—তার ওপর লোকও জমে যায় মশামাছিরই মত। যাই বলুন ওস্তাদ, দেশ বলতে তো ওরাই সব—ওদের নিয়েই পাড়াগাঁ। যা করবার, ওদের বাদ দিয়ে চলে না। তাছাড়া আজকাল যে যুগ পড়েছে, বুঝতেই পারছেন—ওরা যেদিকে ঢলে, সেইদিকে সবটুকু জল গড়িয়ে যায়।...

তীক্ষ্ণদৃষ্টে ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকায় ওস্তাদ ঝাঁকসা। তারপর একটু হাসে। কিন্তু বলে না কিছু। এ চরিত্র আজকাল এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে। এদের মতিগতি গতিবিধি তার জানা। মানুষ তো কম দেখা হল না এদেশ-সেদেশে।

বলুন ওস্তাদজী!

বলার কী আছে ভাই? জনদরদী মানুষ আপনারা—জনসাধারণের চিত্তের খোরাক কিনতে বেরিয়েছেন। যা যোগ্য দাম, তাই দিয়ে কিনুন। ওস্তাদ ঝাঁকসা আস্তে আস্তে শান্তস্বরে বলে একথা। এখন তার বাচনভঙ্গী, তার কণ্ঠস্বর—সবকিছু শান্তিকথিত হেডমাস্টারের মত। উরুর সঙ্গে উরুর আঁকসি-লাগানো, পায়ের ওপর পা—তালিমারা কালো পাম্পসুটার ডগা দুলে দুলে মাটি ছুঁয়ে নিচ্ছে। ভারি সম্ভ্রান্ত আর ধীর গম্ভীর লাগে তাকে। ফের বলে, পরিতোষবাবু, আপনাদের মত শিক্ষিত যুবকের ওপর আমার বড় ভরসা। আপনারা সাহায্য করলে আমি সারা বাংলাদেশে আলকাপকে মানের আসন দিতে পারি। যা রেট বলেছি, তা সাহায্য বলেই জানবেন।

পরিতোষ যেমন চুপ, তেমনি হাতেম আলিও। হাতেম আলি তার কোটের পকেট থেকে কাঁচি সিগারেটের প্যাকেট বের করে। অন্যমনস্কভাবে ধরে থাকে শুধু।

ওস্তাদ বলে, টিপেডাঙার যাত্রা দেখে যাত্রাগানের বিচার হয় না। কলকাতার যাত্রা দেখেই যাত্রার বিচার হবে। তেমনি কোন আদাড় গাঁয়ের 'আল্‌কাটাকাপ' কিংবা রাঢ়ী মানুষদের 'ছ্যাঁচোড়' (রাঢ় অঞ্চলে আলকাপের নাম একদা ছিল ছ্যাঁচোড়) দেখে আলকাপের বিচার করা উচিত নয়। ঝাঁকসুকে না মানুন, রহিমপুর দেখুন—দেখে বিচার করুন আলকেপেদের—সন্ধ্যায় জুড়ে দিলেন তো দিলেনই—সকাল হল, দুপুর গড়াল—তবু আসর ভাঙবার হুকুম দেবেন না। নিজেরা ভাঙলে বলবেন, পয়সা দেব না। ওদিকে, পাল্লার আসর হলে দুদলের মাঝখানে মাথার ওপর টাঙিয়ে দিলেন কলা আর মেডেল—জিতলে মেডেল হারলে কলা! বুঝুন ঠ্যালা। কোন শালা মাতব্বর তার মীমাংসা করে দেবে কী, মজা দেখবে বরং। আসর যে দল গোটাবে, সেই ভাগছে বলে কলা খাবে—এই তো বিচার আপনাদের! এখন বলুন, এই রক্ত শুকোনো গানের নগদ দক্ষিণা কত হওয়া উচিত, আপনারাই বলুন!

বিব্রত মুখে ওরা বলে, না, না—কলা মেডেল নয়। সে বাজে দলের বেলায় চলে—আপনি হলেন মানী লোক।

মানী লোকের মানের যোগ্য দাম চাই। নযত, কাটুন।.. সোজা জবাব—মুখটা লাল আর থমথমে।

আর একবার মুখ তাকাতাকি পরস্পর—তারপর হাতেম আলি কোটের পকেটে হাত চালায়। দশটাকার নোট বের করে। বলে, তাহলে বায়নাপত্র...

সে লোক আছে। পঞ্চানন ভলো মুসাবিদা করে। ওরা তিনজনে আড্ডার দিকে হাঁটতে থাকে। ততক্ষণে দলের সবাই মাঠ থেকে মেলায় হাজির হয়েছে। আমবাগানের ছায়া লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেছে ওদিকে। হলুদ ফুলে ভরা সরিষার ক্ষেত পেরিয়ে চলে গেছে কুঁড়েঘরগুলোর পৈঠায়। ধোঁওয়া উড়ছে উঁচু ভিটের বেড়াবিহীন ফাঁকা উঠোন থেকে। উনুনে লকড়ী গুঁজছে মেয়েরা। কানের সারবদ্ধ রুপোর আংটায় শেষ রোদের ঝিকিমিকি। তারপর এক সময় গাভীর ডাক, ছাগলের চিৎকার, আজানধ্বনি—তারপর আবছায়া এসে ঢেকে ফেলল সব মাঠ গাছপালা ঘরবাড়ি জনমানুষ আর প্রাণীদের। কুয়াশার ঠাণ্ডা বুরুশ চালিয়ে বাকিটুকুও মুছে দেওয়া হল পৃথিবীতে। কেবল জেগে থাকল মেলায় আসা পায়ের শব্দ ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ। বাঁশের বাঁশি, টুকরো আলাপ, গানের কলি—সব ছাপিয়ে কে ডাকতে ডাকতে আসে, ছৈবদ্দি, ছৈরদ্দি হে! ...অমূল্লো...ও...ও...! তারাচরণ, তারা হে!

ডাকটা বাইরের অন্ধকার বিপুলতা ভেদ করে আছড়ে পড়ে আলোর প্রান্তদেশে। ...ছৈরদ্দি হে...এ...এ! অমূল্লো . ও ...ও...ও! তারা—চ—রো—ণ!

সাড়া যায় : আমরা আছি—আছি হে—এ—এ!

তারপর সব চুপ কিছুক্ষণ। তারপর মিঠে কাঁপানো গলায় আলকাপেব গান ধরেছে কোন তুখোড় রসিক—

মজা লুটিয়ে লে না রে বন্ধু আমরা ও বিদেশী।

ক্রিং ক্রিং ঘণ্টি বাজিয়ে ফজল আসছে সাইকেলে। টর্চ জ্বলে উঠছে মাঝে মাঝে। চাঁদ উঠতে বেশ দেরি আছে। অন্ধকার পথের ঠাণ্ডা ধুলো ক্রমশ শিশিরের ছোঁওয়া লেগে ভিজে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাড়ছে ধুলোয়। তার ওপর মজা লুটিয়েদের মিছিল চলেছে মেলার দিকে। নানা বয়সের নানা পোশাকের মানুষ। শাপুরের বাঁকে টর্চ জ্বেলে ফজল অবাক। মাথায় গোল সাদা টুপি, হাঁটু অব্দি জোব্বা জামা পরা একদল যুবক আর কিশোর। ফজলের ঠোঁটে চাপা হাসি খেলে যায়। দলটা চেনা। শাপুরের ওদিকে এক মাদ্রাসা আছে—তার শিক্ষার্থীরা চুপিচুপি মেলায় চলেছে। গাছের আড়ালে বা ছায়ার প্রান্তে চাদরমুড়ি দিয়ে বসে গান শুনবে। ওরা 'তালেবুল এলেম' (শাস্ত্র শিক্ষার্থী)—লোকে বলে 'তালবিলিম'। মৌলবীসাব শুনতে পেলে দশ হাত নাক ঘষতে হবে মসজিদের সামনে।

সেবারের এক কাণ্ড মনে পড়ে গেল ফজলের।

গান সেরে বিশ্রাম নিচ্ছে দল। এক তালবিলিম গাছের আড়াল থেকে শান্তিকে ইসারা করছে—শান্তি সেটা দেখতেই পায় না। ফজল তাড়া করতেই হাউমাউ করে বলে, বলে দেবেন না জী, আপনার গোড়ে ধরি।

ফজল হাসি চেপে বলেছিল, তা বলব না। কিন্তু ইদিকে ক্যানে জী? পালাও, পালাও, গোনা হবে।

যুবকটি হঠাৎ পকেট থেকে একমুঠো নোট বের করে বলেছিল, ইগুলোন সব দিয়ে দিচ্ছি—দলে নেবেন জী?

ফজল অবাক! দলে? তুমি গান গাইতে পারো? নাচতে পারো?

পারি বৈকি। শুনবেন? বলেই এক বিচিত্র হেঁড়ে গলায় গান শুনিয়ে দিল সে। সেই সঙ্গে কোমর দুলিয়ে সে কী তাজ্জব নাচন-কোঁদন!

ফজল আরও রসিকতা করতে যাচ্ছিল। দৃশ্যটা ওস্তাদের চোখে পড়ায় সেটা আর বেশি দূর গড়াল না। ওস্তাদ এসে প্রথমে এক চাঁটি বেচারার মাথায়---তারপর ফজলকে সেইসঙ্গে গালিগালাজ! যুবকটি জোব্বা-ঝাব্বা নিয়ে দৌড়ে জান বাঁচাতে হিমসিম!

—তবু দুর্ভাগ্য বেচারার। কীভাবে ব্যাপারটা রটে গিয়েছিল। সেদিন বিকেলে দলের লোক তো দেখলই, সারা গ্রাম সকৌতুকে দেখল—জোড়া কতক জুতো গলায় মালাব মত পরিয়ে তাকে গ্রাম প্রদক্ষিণে নিয়ে চলেছেন খোদ মৌলবীসাব!

রাতের আসরে সেদিন আলকেপেরা এক জনপ্রিয় কাপ দিয়েছিল—'মৌলবীসাবের কাপ'। এক ভণ্ড মৌলবীর মুখোশ খুলে শ্রোতাদের বড্ড আনন্দ দিয়েছিল ওরা। শেষে ছড়া গাইল ফজল—সঙালও ছড়া গায়—

বাহবা মজা দেখছি দাদা ধন্য কলিকাল।

সে ছড়া আলকাপের এক জনপ্রিয় ছড়া। তাতে মোল্লাপুরুত—ধর্মের ভেকধারীদের সবংশে মস্তক মুণ্ডন করে সাধনোচিত ধামে পাঠানো হয়েছে। আলকাপ কাকেও ছেড়ে কথা কয় না। যা বলে স্পষ্ট বলে—মুখের ওপর বলে।...

সেই 'তালবিলিমে'র দল আজ পথের ওপর আলোর জিভে আটকে গিয়ে কাঠ পাথর।

ফজল টর্চ নিবিয়ে হাসতে হাসতে বলে, কুন্‌ঠে (কোথায়) যাবেন জী?

দলের জবাব নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেছে। ফজল কপেকে চিনেছে ওরা।

ফজল বলে, আজ কোন কেতাব পহড়বেন (পড়বেন) জী? আ মর! বাতচিৎ নাই যে ভাইজানদের! খাড়াও, মৌলবীসাবের কাছে যাছি হামি।

আচমকা দুদ্দাড় ধপধপ আওয়াজ—যেন একদল বাদুড় ভয় পেয়ে অন্ধকারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে গেল! ফজল টর্চ জ্বেলে দেখে, পথ খাঁ খাঁ—ধুলোর ওপর শুধু একটা টুপি পড়ে রয়েছে।

সাইকেল থেকে নেমে টুপিটা সযত্নে ঝাড়ল সে। ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে মাথায় পরল। ফের ওই কিম্ভূত বেশে চলতে থাকল বিনোদিঘী মেলার দিকে।

এতক্ষণে একটু হাসবার সুযোগ পাওয়া গেছে। মনের বার কিছু হালকা লাগে। এতক্ষণ সারা পথ সে শুধু নিজেকে গালমন্দ করেছে, আলকাপকে অভিশাপ দিয়েছে, ওস্তাদজীকে আড়ষ্ট শীতকাঁপা দাঁতে শুকনো চালের মত চিবিয়ে চিবিয়ে পিষেছে আর থুথু ফেলেছে। এবার কেন সারা দেহ মনে তুখোড় রসের ফোয়ারা উথলে ওঠে। পড়ে যাওয়া টুপিটা মাথায় বসে যাদুর খেল দেখাচ্ছে যেন। হাসিতে শরীর ঘুলিয়ে উঠছে। এ গল্প ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে কতক্ষণে শোনাবে, তর সইছে না। আজ আসরে নামবে এই মুসলমানী টুপিটা পরে। আসর যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ এটা খুলবে না। খালি গায়ে তাকে বেশিরভাগ সময় আসরে উঠতে হয়। কপে হওয়ার ভাগ্যি এই—দুরন্ত শীতে হাড় অব্দি নড়ে যায়। তবু উপায় নেই। আজ কিন্তু খালি গায়ে, ফুলন্ত পেট, মাথায় টুপি ফজল কপেকে দেখলেই লোকের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়বে নির্ঘাৎ। শুধু বাকচাতুরী, কথার পাল্টা রসের কথা দিয়েই তো বড় কপে হওয়া যায় না—চেহারাটাও কিছু বেখাপ্পা থাকা চাই। এমনিতে না থাকলে করে নিতে হয়। শুধু কথা শুনে কতক্ষণ লোক হাসানো সম্ভব? অঙ্গভঙ্গীর অলঙ্কারও তো দরকার!

কতকদূর হাল্কা মনে যায় সে। তারপর হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা। ভয়ে বুকের ভিতরটা টিপটিপ করতে থাকে। লোকের সাড়া পেলে একটু আশ্বস্ত হয়। পথ নির্জন হলে সেই কঠিন ত্রাস! শুধু মনে হয়, সেই গঙ্গার ধারে শিমুলতলা থেকে সারাটি পথ তাকে অনুসরণ করছে ঢপওয়ালী। তার—

এলোমেলো অনেকটা চুলের নিচে—মুখের দুটো পাশে মাংস নেই, বড় বড় দাঁত—নাকটায় গর্ত, চোখে গর্ত, আধখানা দেহ, একটা পচা স্তন...

মাটি থেকে টেনে তুলেছে শেয়ালগুলো। শকুনের ঝাঁক যাচ্ছে ঝাঁপিয়ে। তীক্ষ্ণ চিৎকারে ডানার ঝাপটায় কানে তালা ধরে যায়। দুর্গন্ধে বমি আসে। ঢিল মানে না, হাঁকডাক গ্রাহ্য করে না—একপাল ক্ষুধার্ত রাক্ষস কী কাণ্ড না করছে।

আফসোসে দাঁত কিড়মিড় করছিল ফজলের। এত অসহায় বলে কোনদিন মনে হয়নি নিজেকে। চোখ ফেটে জল এসেছিল। বলেছিল, হা রে মানবজম্মো! মানুষের জন্মকে ভেবে কাঁদছিল ফজল সঙদার।

তারপর বাঁধের কাছে গিয়ে দেখেছিল, প্রসন্ন একা দাঁড়িয়ে আছে। ফজল বলেছিল, কয়েকখানা কাঠও জুটেনি রে ভাই। পাঠকাঠির তো অভাব নাই দ্যাশে! অমন করে পুঁতে দিলি মানুষটাকে! দিলি দিলি—খানিকটা কাঁটাও যদি গেড়ে দিতিস ওপরে।

কোন কথা বলেনি প্রসন্ন।

তবে পেসন্ন, ঝাঁকসু মানুষ নয়—একটা আজরাইল। কবে কোন বিদ্যাশে আমার যদি মরণ হয়, ও শালা ওস্তাদ আমার লাস পথে ফেলে রেখে বয়ানা মারতে যাবে। তাকিয়েও দেখবে না, বুঝলে পেসন্ন? 'গেনে' লোকের লাস—জাতভাই মোছলমানে তো ছোঁবেই না, হেঁদুতেও ছোঁবে না—কাপড় তুলে দেখেই ঘেন্নায় পালাবে।—এইসব কথা বলেছিল ফজল। গভীর দুঃখে চলে এসেছিল সে।

সাইকেলে চাপবার সময় প্রসন্ন ডেকেছে, ফজলদা! ওস্তাদকে বলো—ধনপতনগরে যে এত মানুষ, এত আত্মীয়কুটুম বন্ধুবান্ধব তার—কেউ মড়ায় কাঁধ লাগায়নি। চিতের খরচ দেবে কে হে? আমার অবস্থা তো জানো—অনেক কষ্টে সংসার চলছে। চাট্টি সরবতী লাগালাম—ইঁদুরে খেয়ে শেষ করে দিলে। ইদিকে মরশুম এসে গেল—রাঢ়ে যাব ভাবছিলাম, কারুর গাড়িতে ব্যবস্থা করে নিতাম—কিন্তু যাবো কী নিয়ে? কন্দই নাই। শেষে বাজার থেকে খানিক পাউডার আনলাম—ইঁদুর মারা পাউডার। ...দম নিয়ে প্রসন্ন বলেছে, ওই হল কাল, ফজলদা, ওই কিনা কালবীজ!

চমকে উঠে ফজল বলেছিল, ক্যানে প্রসন্ন, ক্যানে?

প্রসন্ন বলেছিল, বউটা কবে বুঝি কথায় কথায় বলেছিল গঙ্গাদিকে—তোমার লাউগাছের গোড়ায় ইঁদুর লেগেছে তো ওষুধ দিও—ভয়ানক বিষ কিন্তু। আমাদের কন্দে লেগেছিল—খুব ভাল কাজ হয়েছে। ...কথাটা বুঝি মনের মধ্যে ছিল গঙ্গাবউদির। সেদিন সাঁঝবেলায় ঘাট থেকে দুটিতে দিব্যি এল গল্প করতে করতে। তাপরে হঠাৎ গঙ্গাদি বললে, হ্যাঁ রে নির্মলা—তোদের ঘরে সেই ইঁদুর মারা বিষ আর আছে? ফজলদা, তোমার দিব্যি, বারান্দায় লম্ফ জ্বলছিল—সামান্য আলো—তার ওপর চাঁদের আলোর ফিঙ ফুটেছে—কেমন যেন ...কেমন ...শুখা শুখা চেহারা গঙ্গাদির! সদ্য চান করেছে, গায়ে ভিজে কাপড়—আর, বলতে নাই—অমন পিতিমার রূপ, তবু ওইরকম লাগল। গলার স্বরেও বেশ খসখসে ভাঙা—কেমন যেন...

রুদ্ধশ্বাসে ফজল বলেছিল, তারপর, তারপর?

... অমন পাড়ামাতানী মিশুক মেয়ে! তার অমন দশা দেখে সন্দ যে হয়নি, এমন নয়। কিন্তু সবই কপালের লেখা। প্রসন্ন হাউ মাউ করে কেঁদে উঠেছিল। ...সারাজীবন এ দুঃখ থাকবে ফজলদা, আমি 'তিনি সাঁঝের' বেলায় নিজের হাতে অমন সুন্দর মেয়েটাকে বিষ দিলাম।

নাক মুছে প্রসন্ন টানল ওকে। ... চল, বাড়ির দিকে চল। বউটাতো আজ কদিন থেকে দাঁতে কুটোটি কাটছে না। শুধু কাঁদছে আর মাথা ভাঙছে। নিজের হাতে বিষ দিলাম দিদিকে!

ফজল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, থাক। যাবো না রে পেসন্ন। দেরি হয়ে যাবে।

কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে গেছে প্রসন্ন। তারপর বাকিটুকু বলেছে। ...সেই শেষরেতে অত জাড়ের মধ্যে কোন শালাশালী এল না—কেবল আমরা দুই মাগমরদ আর সুখিবউদি। মেজ ওস্তাদিন? ফজল অবাক।

হ্যাঁ, তিনজনে ধরাধরি শিমুলতলা নিয়ে গেলাম। ভাগ্যে জ্যোসনা ছিল। তিনজনেই মাটি কোপালাম। পুঁতলাম মেয়েটাকে। পোড়াব কিসে? তা কাঁটা দেওয়ার কথা বলছ। খুবই উচিত ছিল হে! কিন্তু কথাটা তখন মাথায় আসেনি।. .

পিছনে মেয়েলী গলায় একটা ডাক শোনা যাচ্ছিল। ...কা গৈলা হো ...হেই রসবতীকী ভাতিজা! ডাক নয়, গালমন্দের বাড়া। ত্রস্তে প্রসন্ন দৌড়েছে। বউটা ডাকাডাকি শুরু করেছে ফজলদা। একলা ঘরে থাকতে ভয় লাগছে। হামি গেনু হে!...

নাঃ, বড় ছোট লাগছে নিজেকে। এটা অশোভন অসঙ্গত। জীবনে কিছুক্ষণের জন্যে আজ ফজল আর ঝাঁকসু ওস্তাদরূপী শয়তান রাজার ভাঁড় থাকবে না।

মাথার টুপিটা খুলে পকেটে রাখে সে। মনে মনে বলে, ছোটওস্তাদিন, প্রণাম লাও, মাফ করো। তারপর টুপিহারা সেই কমবয়সী লোকটিব উদ্দেশে ও বলে, মাফ দিস্ ভাই। আসসালামু আলাইকুম!

পদ্মাভাগীরথীর সীমানাঘেরা চিরসবুজ বাঘড়ী অঞ্চলের আমবাগানে তখনও শীতের কুয়াশা মোছেনি, এখানে রাঢ়বাংলার রাঙামাটিতে গোরুর খুরে ধুলো উড়িয়ে বসন্তকাল এসে গেল। শিরিষ বট অশ্বত্থের শূন্য ডালপালায় শুরু হ'ল ফের সবুজ পাতার ঝাঁপি বোনার পালা। ঢেউখেলানো শস্যহীন ধূ ধূ মাঠে ঘূর্ণিহাওয়ায় খড়কুটো উড়তে থাকল। বাঁজাডাঙার একলা তালগাছের পাতা নড়ল খরখর সর সর। শুকনো ঘাসের নীচে ফের বেরিয়ে পড়ল কাঁকর ঘুটিঙ খোলামকুচি। কোচিঝোপ ফণিমনসা আর মাদারগাছের নীচে সাপগুলোর ঘুম ভাঙল। কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার রঙিন ফুলে দিগন্তের আকাশ গেল রেঙে।

এদিকে মরশুমের ফসল ঘরে তুলে কিছুকালের জন্যে পাড়াগাঁয়ের 'রাঢ়ী মানুষেরা' নিশ্চিন্ত। অবসরের সুখ কানায় কানায় মনে ভরা। এবার স্ফূর্তি চাই। মজা লুটবার সময় কিছুদিন।

রোদের তাপ বেড়েছে। সূর্য একটু করে সরে এসেছে উত্তরায়ণের পথে। সামান্য কয়েকফোঁটা ঘাম জমে ওঠে ওঠে নাকের ডগায়, চিবুকে—অলক্ষিতে। অজয় ময়ূরাক্ষী দ্বারকা আর পূর্বসীমায় ভাগীরথী—বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জুড়ে হাজার পাড়াগাঁয়ে এবার খেলার ধুম, হল্লা-হল্লোড়, রসের বান ডাকল। তালগাছের কচি মোচার দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকাচ্ছে তেড়েল মানুষেরা। ধূ ধূ নীরসতার দিন এসে গেলে শুধু জলপানেই তৃষ্ণা মেটে না।

বিকেলের মিঠে রোদে পিঠ রেখে, নিজেদের লম্বা-লম্বা ছায়া সামনে নিয়ে, হেঁটে চলেছে একদল 'আলকেপে' অর্থাৎ লোকনাট্যদল আলকাপের লোক। কাঁচারাস্তার দুপাশে কোঙাঝোপ নিশিন্দাগাছ শেয়ালকুলকাঁটার ঝাড়। ডাইনে বাঁয়ে মাঠ—রুক্ষ আর অসমতল। খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে সে-মাঠকে। উড়ছে বগাড়ী আর বনচড়ুইয়ের ঝাঁক। ক্বচিৎ হাঁটছে দূরে কি কাছে কোন একলা শেয়াল। কিংবা ঘরে ফিরছে কোন কাঠকুড়োনী মেয়ের দল। গাঁইতিকাঁধে সাঁওতাল—হাতে তার তালপাতার শিরে গাঁথা কয়েকটা ইঁদুর, একটা ঢ্যামনা সাপের চামড়া—হয়ত মরা শালিকও।

আলকেপেরা তুখোড় মানুষ। হল্লা ছাড়া হাঁটে না। কিন্তু দলটা মোটামুটি নীরব। তীর্থযাত্রীদের মত গম্ভীর। সাঁওতাপাড়ার 'আধুনিক' আলকেপেরা। কালো পাথরে তৈরি নিখুঁত গ্রীক ভাস্কর্যের মত বিশালদেহী 'মেনেজার' আমির আলি। তার কাঁধে চিত্রবিচিত্র ব্যাগ। কোমরে একটা খয়েরী সুতী চাদর জড়ানো। শ্যাওলারঙের পপলিনের হাফশার্ট গায়ে। পরনে টাটকা কাচা ধুতি—হাঁটু অব্দি গোটানো। পায়ে পাম্পসু।

হারমোনিয়ামবাদক কাদু বা কাদের আলি সৌখিন ছিমছাম ধোপদুরস্ত বাবুটি। নীলচে ফুলশার্ট, হাতে ঘড়ি, ধুলোর কোঁচা লুটিয়ে চলে—বেঁটে শ্যামবর্ণ --মোটামুটি সুশ্রী চেহারা—তার কাঁধেও ব্যাগ।

ঘনশ্যাম বাগদী ওরফে কাবুলও আজ তকতকে জামাকাপড় পরেছে। বেজায় ঢ্যাঙা সে—রঙটা ময়লা, মাথায় বাবরী চুল, তবে জুতোর বালাই নেই। পাদুটো নাকি ভারি লাগে হাঁটতে। হাতে নিয়েছে একটা সুন্দর ছড়ি—কাপের সময় কাজে লাগে।

মুখুয্যেদের বকাটে ছেলে নন্দ। বড় চঞ্চল। কাবুলী চপ্পলে আওয়াজ তুলে হাঁটছে। হাতাগুটানো সাদা শার্ট, পাজামাস্টাইলে পরা ধুতি—কোমরে জড়ানো তুষের চাদর। কমবয়সেই নানান অত্যাচারের ছাপ পড়েছে মুখে। সামনের ডাঙাটার কাছে পৌঁছলেই সে একবার গাঁজা খেয়ে নেবে। আপাতত লক্ষ্য এটুকুই।

আর সুবর্ণ। দলের প্রাণপাখিটি। সবুজ বুশশার্টমত গায়ে, পরনে সবুজ পাজামা, পায়ে সরুফিতের স্লিপার। দুহাতে তিনটে করে ছ'টা চাঁদির চুড়ি। খোলা চুল কোমর ছুঁয়ে নেমেছে। মুখ ফেরালে চোখে চমক লাগে। মেয়ে না ছেলে! ছেলে না মেয়ে! ...না, কিম্পুরুষদের কথা মনে হয় না। ওর চেহারায় কী একটা আছে।...

একটা চলন্ত নৌকায় একবার এদিক একবার ওদিক হাঁটলে যেমন দেখায়, সুবর্ণর আনাগোনা সেইরকম! সবার আগে চলেছে কালাচাঁদ বুড়ো—কালা বাউরি। দলের গুণীন—তুকতাক তন্তরমন্তরে সিদ্ধপুরুষ। তবলা ফাঁসানো, গলা বসানো, গান জমছে না—এমনতর দুর্ভোগ আসরবিশেষে ঘটেই থাকে। বিপক্ষের কারচুপি সেটা। বগাবগী বাণ ছেড়ে দিয়েছে হয়ত আসরে। সেটা আটকাতে কালা বাউরি সিদ্ধহস্ত। ...তবে, তোমরা মানো না—আজকালকার ছেলে সব, আমরা হলে 'আধুনিক'—আমি বাপু পায়ে হেঁটে যাবই সঙ্গে। তোমরা অবুঝ হতে পারো, আমি তো লই। সেই এতটুকুন বয়েস থেকে দেখে আসছি এসব। ছিলাম 'ছ্যাচড়া' দলের 'বালক'—ওই সুবন্নর মত মাথায় ছিল ঘনকালো কেশ, গলাও ডাকত কোকিলের সুরে। ত্যাখন অবশ্যি 'আলকাপ' বলত না—'ছোকরা'ও শুনিনি। বালক—ছ্যাঁচোড়দলের বালক! শাস্তর ধরে গান গাই। নাচন-কোঁদন করি কোমর ঘুরিয়ে। তার মধ্যে একটা সঙ—দুটো ছড়া। তাবলে শাস্তরের বাইরে যাবার উপায় নাই। বিপক্ষ যদি 'মা'কে বড় করে পাল্লা ধরল, আমরা ধরতাম 'বাবা'কে বড় করে। শুনবা নাকি ছড়াখান?

এই বলে ভাঙা কাঁপানো গলায় মাঠের মাঝেই জুড়ে দিয়েছে,

(তবে) মাথাছাড়া কত ছেলে জন্মেছে সংসারে গো
মাতাছাড়া কত ছেলে জন্মেছে সংসারে।।...

সুবর্ণ হাসি চাপতে সুন্দর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে হাতের তালু দিয়ে ঠোঁটদুটো ঢাকে। বলে, ওম্মা! তাই নাকি! এত সব জানতে তোমরা খুড়ো!

সোৎসাহে কালাচাঁদ মাথা নাড়ে। ... হুঁ হুঁ বাবা, গুহ্যতত্ত্ব। আজকাল তো তোমরা সব গুষ্টির পিণ্ডি চটকে দিলে গো সুবন্ন! যতসব অশাস্তরী অকথাকুকথা। ধুৎ!

সুবর্ণ আরও হাসে। বলে, তা যাই বলো বাপু, তোমাদের আমালে সেই মাথার ওপর ছেঁড়া খেজুর তালাই, ভাঙা হেরিকেন ..পরক্ষণে জিভ কেটে থামে সে। বুড়োকে নিয়ে বেশি মজা করতে গেলে এক্ষুণি চেঁচামেচি লাগিয়ে দেবে।

কালাচাঁদ অবশ্য রাগ করে না। বলে, হ্যাঁ, যথার্থ কথা। তা ছিল। তোমাদের মতন সামিয়ানা ডেলাইট আমরা পেতাম না। বাঁশবনে কি গাছতলায় বাঞ্চোৎ আমাদের মতন ছোটলোকের মাগীমদ্দর মিলে আসর জমিয়েছে। একবাণ্ডিল বিড়ি আর চাট্টি মুড়ি—ব্যস! ওই হল বিজিট (ভিজিট) দলের। ...কালাচাঁদ ফোকলা দাঁতে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে। ...তবে বললাম—তাহলেও জাত ছিল বাবা সুবন্ন। ময়নাপাখির মতন পরের বুলি আমরা বলতাম না।

সুবর্ণ বলে, পরের বুলি মানে?

ক্যানে?...কয়েকমুহূর্ত ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে কালাচাঁদ। এত সহজ কথাটি বুঝতে পারে না দেখে ওঁর অবাক লাগে। তারপর সে বলে, যাই বলো বাবা সুবন্ন—তোমাদের ওই লতুনমাস্টার জাতকুল সব খেল। এ আমি পষ্ট বলে দিলাম। মেনেজারকেও বলো। মানিক রে! যদি ছিনেমার গানই তোমার কণ্ঠে শুনবে লোকে, তবে পয়সা খরচ করে বহরমপুর টকিবাজি বরঞ্চ দেখবে। কথাটি লতুনমাস্টারকেও বোলো। এটা সব্বনেশে কাণ্ড কিন্তুক।

সুবর্ণ একটুখানি অন্যমনস্ক। তারপর আস্তে বলে, শুনছে তো লোকে।

বুড়ো ভেংচি কেটে বলে, অভিলয় লয় গো, অভিলয় লয় ...হুঁ! গান কী!...

সুবর্ণ ফের হাসি চেপে পিছিয়ে যায়। বুড়ো হনহন করে হাঁটছে। মুখটা ধাবমান ঘোড়ার মত উঁচু। সামনে দলের 'বাহক' নফরআলি—মাথায় হারমোনিয়ামের বাকসো, তার ওপর তবলাজোড়া, পেন্টের ছোট্ট বাকসো। বুড়ো তাকে গিয়ে বলছে, সঙ্গ ছাড়িস না নফ্‌রা। যন্তর আমার সঙ্গে সঙ্গে চলুক।

'যন্তর' অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্র আগলে নিয়ে চলেছে কালা গুণীন।

আমির আলি বলে, কী বকরবকর করছিল রে খুড়ো?

সুবর্ণ জবাব দেয়, ছেড়ে দাও খুড়োর কতা। আমিরভাই, আনিসরা কখন পৌঁছবে?

আনিস? ...একটু চুপ করে থাকে আমির আলি। একটু ভেবে নিয়ে বলে, মাস্টার নাকি গাঁতলায়

আছে শুনেছি। যদি সেখানেই থাকে, ওনাকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছবে ঠিকসময়। না থাকলে ভাবনার কথা। তবে সাইকেলে গেছে—যে রাজ্যে থাক, ধরে নিয়ে আসবেই।

সুবর্ণ বলে, যদি না আসে?

আমির গোমড়ামুখে জবাব দেয়, না আসে না আসবে। অত ধরাধরি সাধাসাধির ধার ধারে না সাঁওতাপাড়া। বিশ-পঞ্চাশ ধারি না কারো। জন্মদাতা পাতুওস্তাদকেই পাত্তা দিলাম না—তো সনাতন মাস্টার!

বড় গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ এই আমির আলি। অকৃতজ্ঞ লাগে সুবর্ণর। সনাতন মাস্টারের সঙ্গগুণেই আজ সাঁওতাপাড়া ঝাঁকসু ওস্তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার সুযোগ পেয়েছে। নয়ত রাঙামাটির লোকেরা পাল্টা দল আনতে চলে যেত নলহাটির মনকির ওস্তাদ অথবা তুড়িগ্রামের লাতুর কাছে। আজ যে লোকে সাঁওতাপাড়াকে এত বড় ভাবছে, তার মূলে তো ওই নতুন মাস্টারেরই দান সবটুকু। যদি না শেখাতো এমন সব সুন্দর গান, নাচের ভঙ্গী, কাপের রকমারি ফ্যাসান! সুবর্ণ কৃতজ্ঞ মনে মনে। সনাতনদাই তার চারপাশটা খোলামেলা করে দিয়েছেন। ইচ্ছেমত এখন ফুল হয়ে ফোটো, গাছ হয়ে ডালপালা ছাড়াও—মাথার ওপর অনেক রোদবাতাস।

সুবর্ণ পিছিয়ে আসে। চাপাস্বরে ডাকে কাবুলকে। লম্বালম্বা পা ফেলে সে হাঁটছিল। গতি কমায়। কি রে শালা মুদ্দোফরাস?

গাল কানে নেয় না সুবর্ণ। ফিসফিস করে বলে, সঙাল সত্যি গেছে নতুন মাস্টারের কাছে?

কাবুল বলে, ক্যানে? পীরিতের লদী উথলে উঠেছে তোর? শালা চামার!

গাল দিও না বাপু। সুবর্ণ একটু হাসে।...

এগিয়ে আসে নন্দ। বলে, শ্যামচাঁদের বাঁশি না বাজলে তো রাধিকে নাচবে না রে কাবুল! সখি আসবেন, শ্যাম আসবেন। ধৈর্য ধরো। ...গুনগুনিয়ে ওঠে সে। .. 'বহু ধৈর্যং রাই ধৈর্যং, শ্যাম গচ্ছং মথুরায়ে।' তা সুবর্ণ, ভাবিস নে রে ভাবিস নে। যা, কাদুর কাছে যা দিকিন। বেচারা এতক্ষণ পরীক্ষা করছে। সবার পিছনে ঢিমেতেতালা হাঁটছে—পরীক্ষা করে দেখছে, দেখি, সুবর্ণ প্রিয়তমা নিজে থেকে কাছে আসে নাকি ...অশ্লীল হেসে ওঠে সে। কাবুলের কাঁধে হাত রাখার চেষ্টা করে ফের বলে, চলো স্যাঙাত—একবার বাঁশিতে ফুঁ দিই। ভাল মাল আছে মাইরি—সারগাছির মাঠের তাজা জিনিস। শালা গবরমেন্ট শেষঅব্দি মাঠময় গাঁজা বুনে দিয়েছে হে! বড় জনদরদী আমাদের ভোটের সরকার।...

ওরা এবার ছিলিমে বসবে। দল এগিয়ে যাক কদ্দুর। বাঁকীনদীর পাড়ে অপেক্ষা করতেই হবে।

তবে মিথ্যে বলেনি নন্দ। সবার মন রাখতে প্রাণান্ত সুবর্ণর। একজন সঙ্গে একটু হাসাহাসি ঢলাঢলি দেখলে অন্যজনের মুখে আষাঢ়ের মেঘ। উঃ! ছোকরা হওয়ার কী জ্বালা রে বাবা! সুবর্ণ কাদের আলির পাশে এসেই বুঝেছে, মেঘ জমজমাট।

হাত বাড়িয়ে গলা জড়ানোর অপেক্ষা শুধু। কাদু হাতটা আলগোছে সরিয়ে দেয় অবশ্য। মেঘ কেটেছে বলে মনে হল সুবর্ণব। এত সামান্যতেই মানুষ রাগ করে —আবার সামান্যতেই খুশি ওঠে। সুবর্ণ মিষ্টি হেসে কটাক্ষ হানে, কাদুভাই, ছিলিম টানবে ছিলিম?

নাঃ। কাদু মাথা নাড়ে। ব্যাগ দেখিয়ে বলে, সকালে বহরমপুর গেলাম। তোকে বললাম, আয়। গেলিনে। উনচল্লিশ টাকার বোতল এনেছি—খাস বিলিতি মাল।

সুবর্ণ চোখ বড় করে বলে, উ-ন-চ-ল্লি-শ।

তাচ্ছিল্য করে হাসে কাদু। দুমণ ধানের দাম। মহা ওস্তাদের সঙ্গে পাল্লা। তার মান রাখতে হবে না!

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সুবর্ণ। অনেক জোতজমার মালিক কাদের আলি। এত কমবয়সে সংসারের কর্তা হয়েছে। সব উড়িয়ে ফকির হয়ে যাবে নির্ঘাৎ। ফারাজী (পিউরিটান) মুসলমানের ছেলে—সমাজে বড় কড়াকড়ি। একে আলকাপ, তায় ছেলেকে মেয়ে সাজানোর জঘন্য গোনা। কাদের যেমন একঘরে, তেমনি অন্যরাও। এখনও বুক কাঁপে সুবর্ণর। প্রথম যখন দল করল, সুবর্ণ সবে ছোকরা হয়েছে, লুকিয়ে বাউরিপাড়ায় মহড়া দেয়। মুসলমানপাড়ার লোকেরা এসে চড়াও হল একদিন। কে কোথায় পালিয়ে বাঁচে তখন। শেষঅব্দি বাবুপাড়ায় লোকেরা পাল্টা রুখে দাঁড়াল। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার উপক্রম। থানাপুলিশ হল। সে এক কাহিনী।

এখন অবশ্যি সয়ে গেছে সব। ওদের সমাজেই ভাঙন ধরেছে। একদল মানুষ কাদের আলিদের সমর্থন করে। শুধু সমর্থন করে না—প্রকাশ্যে মুসলমানপাড়ার মধ্যে খোলামেলায় মহড়া দিতে বাধ্য করে। করুক, এ তো ভালই হয়েছে। সুবর্ণর চুল কেটে নেবার শাসানি আর শোনা যায় না মুসলমানপাড়ার। এখন সে অনেকের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায় নির্বিবাদে। সব গেরস্থর হাঁড়ির খবর রাখে। মেয়েরা কেউ ওর বুবু, কেউ ফুফু, কেউ নানী—কেউবা ভাবী। আবার কেউ কেউ ওর 'সতীন'। মেয়েলীপনা করে বলে, কী রাঁধলে সতীন?...

সুবর্ণ বলে, ভাবী জানলে মুড়ো ঝাঁটা মারবে দেখে নিও।

কাদু জবাব দেয়, সে কোথায় আর আমি কোথায়! আজ তিন-চারমাস বউর কাছে শুইনি, তা জানিস? বাড়ি থাকলে খাবার সময় চুপচাপ খেয়ে আসি—তারপর তোদের সঙ্গে আড্ডা মারি।

হেসে ওঠে সুবর্ণ। ...ওম্মা! কেন, কেন?

দেখছি। মেয়ে ছাড়া পুরুষ বাঁচে কিনা সংসারে। তাই পরীক্ষা করে দেখছি।

ভাবী কিছু বলে না?

রাতে বাড়ি গেলে তো বলবে। আমি রিহারসালঘরেই শুয়ে থাকি।

কথা শুনে সুবর্ণ অবাক। একটু পরে বলে, এবার থেকে আমিও শোব তোমার কাছে। বাড়িতেই শুই—তার চেয়ে ম্যানেজারের বৈঠকখানার বিছানাটা নিশ্চয় ভাল পাব। খিলখিলিয়ে হাসে সে।

কাদু ওর হাতটা হাতে নেয়। বলে শুস্। আমি—আমি তো বনের পশু নই সুবর্ণ, আমি মানুষ রে, মানুষ। তুই শুলে আমার ভালই লাগবে। পরক্ষণে সকৌতুকে বলে সে, আমি অবশ্যি নতুন মাস্টার নই। তোর কেমন লাগবে কী জানি! অত রসকষ আমার নেই। চাষার ছেলে!

সুবর্ণ আহত মনে মনে। বলে, নতুন মাস্টারকে কেন এত হিংসে তোমাদের কাদুভাই?

যাঃ! হিংসে কিসের?

না—তোমরা সবাই ওকে হিংসে করো। ও আমি বেশ বুঝি।

কাদু ব্যস্ত হয়ে বলে, যে করবে করুক, আমি করিনে। ছেড়ে দে ও-কথা। সেদিন কী গানটা গাইছিলি রে সুবর্ণ, সুরটা ঠিক জমাতে পারিনি যন্ত্রে—গা দিকিনি!

সুবর্ণ ক্ষুব্ধমুখে বিড়বিড় করে, আমি তো মেয়ে নই। আমার দশায় পড়লে মেয়েরা গলায় দড়ি দিয়ে মরত। কী করে বোঝাব, আমি কী?

কাদু অবশ্য তামাসা করে, ক্যানে? সেদিন দীঘির পাড়ে বসে বেশ তো বলছিলি রে সুবণ, আমি মেয়ে হলে আপনাকে ভুলতে পারতাম না—হি হি হি ...হাসির চাপে নড়ে ওঠে সে।

বলেছি, বেশ করেছি। সুবর্ণ পা বাড়ায়। ... ঠিক বলেছি। আর তোমরা বুঝি সবসময় গোয়েন্দার মত পিছনে লেগে থাকো? জানতাম না কথাটা—আজ জানলাম।

কাদু দৌড়ে গিয়ে ওর হাত ধরে। ধুস্ শালা! ছেড়ে দে অকথা। তোকে আমবা খুব ভালবাসিরে সুবর্ণ, খু-উ-ব। নে, এবার ধর দিকিনি সেই মন-উড়ুউড়ু গানখানা...আহা, কী যাদু আছে রে! বুকটা খালি করে দেয় একেবারে। লাগা!...

সুবর্ণ জবাব দেয় না। ভাবছে। চুপচাপ ভাবছে। কালাখুড়োর কথাগুলো নিয়ে মনটা তোপাড় হচ্ছে তার। সেই যে আজেবাজে দলের আনাড়ি ছোকরারা সেকেলে একটা গান গায়,

বালুচরে ঘর বাঁধিলাম, ভেসে গেল জলে হে,
(ক্যানে) বালুচরে ঘর বানাইলাম।...

বালুচরের ঘর। আজ একটুখানি হেসে কথাবলা, অল্পখানিক ছুঁয়ে থাকা, পাশে শোওয়া—এমনকি অসভ্য ঠোঁটগুলোর লোভী নিলাজ অপেক্ষা সারাক্ষণ তারপর তো বয়সের দয়াহীন ভয়ঙ্কর বানের জল সুন্দর শরীরে ধ্বস ছাড়াবে। প্রতিমার রাংতা যাবে ভেসে। রঙ গলবে। গলবে মাটি। বেরিয়ে পড়বে খড়মাটির টুকরো। বিসর্জনের রুক্ষ নীরস টাটখানা যেন খরার শুকনো নদীর চরে পড়ে থাকা। কেউ নেই ধারেকাছে। তুমি একেবারে ন্যাংটো হয়ে গেছ। একলা হয়ে পড়েছ। তুমি তখন কঠোর পুরুষ।

ভালবাসা কেন—দয়া করবারও মানুষ নেই। ...তাই, ভেবে ভেবে পাগল হই—ওই কালাখুড়োও একদিন বালক ছিল। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। খুঁজে দেখি। তোবড়ানো গাল, ভাঙা দাঁত, জোঁকের মত বিচ্ছিরি ঠোঁট—ওই ছেঁড়াখোঁড়া দলাপাকানো কাগজেব মত তামাটে মুখটা দেখে গা শিউরে ওঠে। অথচ একদিন তার ওই শরীরে বাস করেছিল এক মোহিনী নটী। ...কেউ না বুঝুক, আমি তো বুঝি—কেন আজও কালাচাঁদ খুড়ো এ বয়সেও ধুঁকতে ধুঁকতে দলের সঙ্গে যায়! গুণ নয়, মন্তরতন্তর নয়—ওটা ছল। ওটা ওর অসহায় মুখোশ। কালাখুড়ো ভুলতে পারে না পিছনটাকে। পিছনের নটীর স্মৃতি ওকে উত্ত্যক্ত করে। পাগল হয়ে ছুটে আসে তখন। সেই জগতে ছুটে এসে নিশ্বাস নিতে চায়। মিলিয়ে দেখে, হাত বুলিয়ে পরখ করে—এই সেই পুরনো ঘরের দেয়াল! ওই সব খাটপালঙ্ক আসবাব তার অচেনা। দেয়ালের রঙ নতুন লাগে। মনোমত হয় না। আফসোস করে বলে, ইটা ঠিক লয়, ঠিক লয়! ...সে খোঁজে তার বয়সের অতলজলে হারানো কোন এক মোহিনী প্রতিবাস—যে নারী—কিংবা নারী নয়, পুরুষ তবু পুরুষ নয়—বিরল মায়া। তারপর তো আমিও একদিন কালাখুড়ো হয়ে যাবো! তখন? ...

ধুর ছাই! কার কথা ভাবছে সুবর্ণ? কার চোখে দেখছে? নতুন মাস্টারের কথা—নতুন মাস্টারের চোখজোড়া! এতসব ভেবে বসেছে লোকটা! মাত্র বছরখানেকেব আসা এ লাইনে—এরই মধ্যে কত কী ভাবা হয়ে গেল, জানা হয়ে গেল। রাগ লাগে, ভয় করে, চমক লাগে—আবার ভালোও লাগে শুনতে। ...সুবর্ণ, সাবধান। ওরা তোমার মজা লুটিয়েরা। চুযে ছিবড়ে হলেই ফেলে দেবে। তাকিয়েও দেখবে না। ...তাই বলছি সুবর্ণ, এখন থেকে তৈরি হও। গানকে সাধনার বস্তু বলে জানো। তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করো। কল্পনাশক্তি বাড়াও। রচনা শুধু শক্তি থেকেই হয় না, হয় অভ্যাস থেকে। এই যে দেখছ, আমি দিব্যি এক বছরের মধ্যে মুখে মুখে পয়ার বাঁধতে শিখে গেলাম—এ আমার অভ্যাস, সাধনা মাত্র। যখন চুল কাটবার দিন এসে যাবে, ঘরে ফিরে পুরুষেরা চিরকেলে মনখানি খুঁজে নিতে হবে, তখন যেন সংসারের বিস্মৃতির অবহেলা সইতে না হয়। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। ছিলে ছোকরা—তারপর হবে ওস্তাদ! কেমন সুবর্ণ?

সুবর্ণ হঠাৎ ভয় পেয়ে যায়। মাঝে মাঝে তার মনেই থাকে না যে সে পুরুষ, সতের বছরের কিশোর। সব বদলাবে ; তার এই মন—সাত বছর ধরে তৈরি মনটা কি বদলাবে কোনদিন? এই যে তার আয়নার সামনে সাজ করে সেজেগুজে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকা, মুগ্ধ হয়ে ওঠা নিজের ওপর—নিজের ওপর অনন্ত ভালবাসায় প্রেমে অধীর হয়ে ওঠা—আর নিজেকে কেবলই কারো কাছে নিঃশেষে সঁপে দেবার গোপন সাধ, কেউ এ রূপের ললিত তরল স্রোতের ধারাকে নদীর মত নিজের বুক চিরে বয়ে যেতে দিক—এইসব অদ্ভুত ইচ্ছাবাসনা চিন্তাভাবনা কবে কোনদিন কি মিথ্যা হয়ে যাবে?

আর একদিন—এক নিশুতি রাতে এমনি গভীর বিহ্বলতায় সে বলে উঠেছিল নতুন মাস্টারকে। ...সত্যি, আমার আজ এত ভালো লাগছে কেন বলুন তো মাস্টারমশাই? দেবার মত কিছু থাকলে আজ তা সবটাই দিতে পারতাম। ...পরক্ষণে অন্ধকারে চাপা হাসির শব্দ। ...মেয়েরা এরকম বলে, না মাস্টারমাশাই? কাকেও কখনো ভালবেসে দেখেছেন? ...মেয়েরা এমন কথা জানে গো? আঃ, বলুন না! আমি আলকাপের ছোকরা, কাপের (নাটকের) মধ্যে বলে-বলে কত মজার কথা না রপ্ত করেছি! তাই না! নিজেই বুঝতে পারি, এ আমার ময়নাপাখির বুলি। কিন্তু বলতে বলতে যেন সত্যি বলছি মনে হয়। মুখের কথা মনের কথা হয়ে যায়। যায় না?...ও মাস্টার? বলুন না, কোন মেয়ে আপনাকে কেমন করে ভালবেসেছে! কি বলেছে সে? বলবেন না? মাস্টারমশাই, ওগো!

নতুন মাস্টারের নাক ডাকছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুবর্ণ অস্ফুট বলেছে, নাঃ, ঘুমোই বাবা! কাল আবার রাত জাগতে হবে।

এইজন্যেই ম্যানেজার আমির আলি ধমকায় তাকে। ...শালা ছোটলোকের জাত—বেড়োত মাঠেমাঠে কাঠ কুড়িয়ে ঘুঁটে খুঁজে—ভাগ্যিস পড়েছিল আলকাপের দলে। বুলি ফুটেছে। বা হয়েছে চোপায়। পণ্ডিতের মাগ হয়েছে সুবন্ন। শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর—ভ্যানর ভ্যানর—বকর বকর...

তখন 'বাহক' নফর আলির মন্তব্য : পায়রাটা মস্তেছে গো, মস্তেছে!

সুবর্ণ আহত হয় মনে মনে। পরে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, না, ম্যানেজার নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে আমাকে। আদর করে গাল দেয়।...

কিন্তু বাঁকীনদীর অববাহিকায় মাঠের পথে এতক্ষণে আমিব আলির বাজখাঁই চীৎকারটা সত্যি গালিগালাজ।... হেই গেনের ব্যাটারা! পা চালিয়ে আসবে নাকি?

সবাই প্রায় দৌড়ে সঙ্গে ধরতে চায়। দেমাকী ম্যানেজারটাকে সবাই ভয়ভক্তি করে।

সবে গোমস্তাবাড়ির প্রকাণ্ড উঠোনে চট টাঙিয়ে চারটে হেরিকেনের আলোয় ছোট্ট আসরখানা তৈরি হয়েছে। চারপাশের দাওয়ায় মুসলমান মেয়েরা তালাই পেতে অন্ধকারে বসেছে। আসরের আসরের চারপাশে জনাপঞ্চাশ লোকের জটলা। বাদ্যযন্ত্র গেছে। দু-দুটো অবোধ বালিকাবেশী ছোকরা সেজেগুজে বসে পড়েছে তার সামনে। মাস্টার আসবার অপেক্ষা শুধু।

এলেই সমবেত জয়ধ্বনি দিয়ে শুরু হবে আসর। শ্রোতারা প্রস্তুত। প্রস্তুত আলকেপেরা। কোবাদ গোমস্তার ছেলে দলের ম্যানেজার। বুড়ো গোমস্তাও গানের নেশায় চিরকাল বুঁদ। এককালে ইমামযাত্রায় এজিদ বাদশা সাজত। 'বন্দে'র গানে বইয়ালি (স্মারক) করত। জারিগানের ছিল মুখপাত্র। কাজেই কালের হাওয়ার গতিকমত যে-আলকাপ আজ ছ্যাঁচোড় নামক ইতরামির পুরনো ডিম ভেঙে তাজা পাখির মত কাকলীতে দেশ মাতাচ্ছে, তার ব্যাপারে উৎসাহ তার স্বাভাবিক। তবে সমাজে-গাঁয়ে মানীভদ্রজনে দোষ দিচ্ছে। ছিঃ বুড়ো বয়সে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়লেন গোমস্তাসাহেব? ভিড়লেন যদি, তবে যাত্রাটাত্রা হলে কথা ছিল—ওই আলকাটাকাপ? ...কুলোকে আরও নিন্দে করে বলছে, জানো মজার কাণ্ড? বাপব্যাটা দুজনেই এখন ছোকরা নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। ধিক্! অনুকূল বাগদীর সেই নাকে ছিকনি পড়া পেঁচোটা আর গরিব শেখের খেঁকশিয়ালপানা ছেলেটা—গোমস্তা দুটোরই দায়দায়িত্ব নিয়েছে। মানে দশটাকা হিসেবে মাইনে, খোরাকী—পোশাক-আশাক যা লাগে! উঃ! মুনিশ খাটতে গিয়ে গরিবগুরবো মানুষ যদি এক টাকার বেলায় এক টাকা দু'আনা চায়, কঞ্জুসটা বাপ তুলে গাল দেয় হে! ধিক!

এইরকম সখের দলের সখের আসরটা মুহূর্তে বরবাদ করে দিতে হাজির হয়েছে একটা লোক। সনাতন মাস্টার চোখ বুজে সিগ্রেট টানছে তো টানছেই। মুখে কথা নেই।

গুজব ছড়াচ্ছিল টুকটাক। মুহূর্তে আসর নড়বড় করে উঠেছে। একজন দু'জন করে বাইরের ঘরের সামনে ভিড় জমাচ্ছে। আসর খালি হয়ে যাচ্ছে দেখে সামনের বড় ঘরের বারান্দা থেকে গোমস্তা চেঁচাচ্ছে, সবুর, সবুর, তোমরা সব যেও না। আরম্ভ হল বলে! ও হালিম, মাস্টারমশাইকে ডাক রে!

কে কাকে ডাকবে! রটে গেছে, সাঁওতাপাড়ার প্রখ্যাত সঙাল আনিস এসেছে বাইরে। মুখোমুখি দেখার জন্যে অনেকগুলো মুণ্ডু ক্রমাগত জিরাফের মত গ্রীবা বাড়াচ্ছে। বৈঠকখানা ঘরের ভিতর বসে আছে আনিস। বাসরে! সেই তুখোড় কপে—সুবর্ণর সঙ্গে ডুয়েটে উঠলে যেমন গানে তেমনি নাচে, আবার তেমনি হাসির কথায় আসরকে দুলিয়ে দেয় তোলপাড়! সেই আনিস! আহা, দেখি, দেখি, নয়ন সার্থক করে দেখি হে! ... নানা মন্তব্য, নানা ফিসফিস, গুজগুজ চারপাশে। ...তবে দ্যাখ হাতেমদা, বলেছিলাম না, আমাদের নতুন মাস্টার যেমন তেমন নয়। খুব বড় মাস্টার হে! ওস্তাদ, ওস্তাদ ! ...বক্তা অনুকূল বাগ্দী। তার ছেলে একদিন সুবর্ণ হবে। এই তার আনন্দ। একই শিক্ষাদাতা—হবে না কেন? ... কে ফুট কাটে পিছন থেকে, ...সুবন্নর মূল শিক্ষা পাতু ওস্তাদের হাতে। লতুন মাস্টার শুধু ফ্যাসান শিখিয়েছে মাত্তর! এত কম বয়সে ওস্তাদ হওয়া চাট্টিখানি কথা লয়। দেরি আছে!

অনুকূলের সঙ্গে লোকটার বচসা লেগে গেছে সঙ্গে সঙ্গে।...

আনিস রুমালে মুখ মুছে বলে, কই, উঠুন। প্রথম আসর আমাদেরই নিতে হবে! নয়ত ঝাঁকসাকে বাগ মানাতে পারব না।

সনাতন মাস্টার ভাবছে। এদের ক্ষিদের মুখে ছাই পড়বে। নতুন দল—অ্যাদ্দিন মহড়া দিয়ে প্রথম আসরে নামছে! কাল সকালে চুক্তির বাকি টাকা পাওয়া যাবে। ...তাছাড়া, এমনি হঠাৎ বায়নার দিন—একেবারে বেরিয়ে পড়ার মুখে সাঁওতাপাড়ার ডাক এসেছে। কেন? বায়না তো আগেই

হয়েছিল। তখন বুঝি মনে পড়েনি সনাতনের কথা? শেষ মুহূর্তে ভয় পেয়ে ভেবেছে. নতুন ফ্যাসানের বাঁদর নাচাতে সেই লোকটিকেই চাই—যার লাঠি ছাড়া বাঁদর নাচবে না—কেমন?

সনাতন তক্তাপোষের কাঠে সিগ্রেটটুকু ঘষে নিভিয়ে দেয়। তারপর বলে, তা আনিস—বড় দেরি করে এসেছ হে! যাওয়া অসম্ভব। ম্যানেজারকে বলো—মাফ করে দেয় যেন।

আনিস একটু হাসে। সবই বোঝে সে। একটু চাপা গলায় মুখ নামিয়ে বলে, ওদের কথা বাদ দিন। সুবর্ণ—সুবর্ণর মান বাঁচাতে আপনাকে ডাকতে এসেছি মাস্টারমশাই। আজ দুদিন থেকে ও আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করছে, আনিসভাই, নতুন মাস্টারকে নিয়ে এস। ...আমির আলিকে কথাটা বলতেই রাজি হল অবশ্যি। তবে ও গোঁয়ার মূর্খ লোকটার কথা ছেড়ে দিন। ...বিশ্বাস করবেন, আপনি যদি আজ আমার কথা না রাখেন, এ জীবনে আমি আর গান করব না? তৌবা করে মসজিদে গিয়ে ঢুকব। আমি এক বাবার পয়দা ছেলে, মাস্টারমশাই।

মুখ লাল হয়ে উঠেছে উত্তেজনায়। আনিস আরও বলে, যেদিন শুনেছি দলের লোকে আপনাকে আর সুবর্ণকে নিয়ে যা তা বলছে, সেদিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—সনাতনদা বাদ গেলে সাঁওতাপাড়ার দলও আমি যেভাবে পারি, ভেঙে দেব।

জেলার নামকরা রোড কন্ট্রাকটারের ছেলে আনিস। ম্যাট্রিক পাশ। বাবার মৃত্যুর পর কন্ট্রাকটারী করতে গিয়ে লোকসান মেরে ফতুর হয়েছিল। তারপর হঠাৎ আলকাপের নেশায় মজে গেল একদিন। দলের মধ্যে এই একটি যুবকই জ্ঞানবুদ্ধিতে সততায় স্পষ্টভাষীতায় অনন্য।

সনাতন ভাবছে আর ভাবছে। ফের সিগ্রেট জ্বেলেছে। চোখ দুটো বোজা। ...বায়না হবার পর কথাটা উঠেছিল। কেউ গা করলে না। হোক ওস্তাদ ঝাঁকসা, চালিয়ে দেব। সুবর্ণ একাই একশো। তাছাড়া, কবিয়ালী তো আমরা ছেঁটেই দিয়েছি আপনার কথায়। বিনি ওস্তাদেই আসর চলে যাবে। তখনই আমার রাগ হয়েছিল। ধিক শালা নেমকহারামের দল। তবে হ্যাঁ, আপনাকে লুকোব না—ওস্তাদ ঝাঁকসাকে কখনও দেখিনি, তার সঙাল ফজলেরও নাম শুনেছি। বড় লোভ ছিল মনে, মাস্টারমশাই। বুঝলেন?

সনাতন চোখ খুলে মিটিমিটি হাসে। ...আমারও।

...তবে দেরি করবেন না। উঠুন। আমি গোমস্তাকে বুঝিয়ে বলছি। দরকার হলে হাতেপায়েও ধরে ফেলব। বলতে বলতে অবিকল আসরের কাপের ভঙ্গীতে হাসে সে। পলকে ভিড় হা হা হো হো করে হেসে ওঠে। আনিস করজোড়ে বলে, ভাই বন্ধুরা, আপনারা দয়া করে আজকের রাতটুকু ওনাকে ছেড়ে দেন। কথা দিচ্ছি, যেদিন বলবেন, আমি সুবর্ণকে শুদ্ধ এখানে এনে আপনাদের দলে মিশে গান শুনিয়ে যাব।

ভিড়ের ফাঁকে গোমস্তা নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। এবার বলে, আলবাৎ যাবে মাস্টার। বা রে! ঝাঁকসুর সঙ্গে পাল্লা—যাবে না মানে? যাও বাবা মাস্টার, গান করে এসো। আমাদের ঘরের দল, ঘরেই আসর—যখন খুশি শুনব। আমরা তো বাণিজ্য করবার জন্যে দল করিনি রে বাবা! যাও, যাও—দেরি কর না। তা বাপধন ইয়ে, কোথায় বায়না?

রাঙামাটি। বলে প্রায় লাফ দিয়ে আনিস বেরোয়। ভিড় সরে যায়।

সনাতন মাস্টার ব্যাগ গোছাচ্ছে।

বাইরে তফাতে মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। হেরিকেনের আলোয় তাদের কৌতূহলী মুখগুলো দেখা যাচ্ছে। ফিসফিস গুঞ্জন সেখানে। সঙাল, সঙাল! গত পুজোয় বারোয়ারিতলায় বায়না ছিল সাঁওতাপাড়ার। সবাই শুনে এসেছিল ওদের মনমাতানো গান। এক বুড়ি বলে উঠেছে, মর। ধিঙ্গি আইবুড়ো মেয়াটাকে লিয়ে নাচনকোদন করে বেড়ায় মুখপোড়ারা। এবং তা শুনে এক যুবতী খিলখিলয়ে হাসছে। ...না না চোখের মাথা খেয়েছিস! মেয়া লয়, ছেলা।

বুড়ি বলছে, ছেলা! তবে কি ভেলকি দেখালে জাদুঅলারা? আহা, বড় সোন্দর মুখখানা!

অলিগলি কিছুদূর হেঁটে সদর রাস্তা। জনতা চলেছে সঙ্গে। বারোয়ারিতলায় তাসের আসর বসেছে। মুখ তুলে তাকায় ওরা। ...কারা যায়?

...সাঁওতাপাড়ার সঙাল। এসেছিল আমাদের মাস্টারকে নিয়ে যেতে। রাঙামাটিতে ঝাঁকসু চাঁইয়ের সঙ্গে পাল্লা হবে।

...কার সঙ্গে?

...ঝাঁকসু গো, ওস্তাদ ঝাঁকসু।

...ইয়ারকির আর জায়গা পেলে না?

সাইকেলের কেরিয়ারে চেপেছে সনাতন, আনিস অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে প্যাডেল ঠেলছে। যেতে যেতে ওদের কানে আসে, বারোয়ারীতলায় তর্ক চলেছে জোর। দ্বারকানদীর তীরে গাঁতলা গ্রামে। নদীর পাড়ে যারা থাকে, তারা সচরাচর দুর্ধর্ষ প্রকৃতির হয়। বচসার সুর শুনে ভাবনা হয়, যথারীতি বুঝি লাঠি সড়কি নিয়ে বেরিয়ে না পড়ে শেষ অব্দি।

ফাঁকা মাঠে পৌঁছে সনাতন মুখ খোলে। সুবর্ণ ডাকে চিঠি লিখেছিল। কাল পেয়েছি।

সাইকেল চালানো পরিশ্রমের শ্বাসপ্রশ্বাসে মিশে আনিসের কথা শোনা যায় : সুবর্ণ আপনাকে ভালবাসে।

ভালবাসে! কেমন ভালবাসা—কিসের ভালবাসা? .. সারা পথ ভেবেছে সনাতন মাস্টার। ব্যঙ্গে ঘৃণায় ঠোঁট কুঁচকে গেছে তার। মন বিস্বাদে কিছুক্ষণ ভরে উঠেছে। তারপর গলা ফাটিয়ে হাসতে চেয়েছে। হাসছেও। আনিস সীট থেকে মুখ ফিরিয়ে বলেছে, কী হল? হাসছেন কেন?

সনাতন বলেছে, এমনি। আর কদ্দুর?

এখনও মাইল তিনেক তো বটেই। রাস্তাঘাট ভাল। কষ্ট হচ্ছে না তো?

নাঃ।

সুবর্ণ তাকে ভালবাসে! কী সব ভাবে এই লোকগুলো! সুবর্ণ যদি মেয়ে হত, কোন মানে খুঁজে পাওয়া যেত এ কথার। একজন পুরুষ আর একজন পুরুষকে ভালবাসে। বেশ তো, সেটার আসল নাম বন্ধুতা। সেটা সমবয়সী দুজনের মধ্যে সম্ভব! এখানে একজন ষোল-সতের, অন্যজন পঁচিশের মধ্যে। গুরু আর সাগরেদ। বন্ধুতা সম্ভব কদাচ নয়। একজনের শ্রদ্ধা, অন্যজনের স্নেহ। তা নয়, ভালবাসা! স্রেফ নির্ভেজাল 'ভালবাসা।' কী মানে হয় এর? কথাটার গুরুত্ব এত দিত না সনাতন মাস্টার। সুবর্ণর চিঠিতে ওই কথাটি লেখা ছিল। আনিসও ওই কথাটি স্পষ্ট বলে বসল।

যেন নবীনা রজকিনী সুবর্ণ। চণ্ডীদাসী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়। বাঃ রে, সুবর্ণ বাঃ! চমৎকার বুলি শিখেছিস তুই! একদিক থেকে ভাবলে তো, কথাটা ওইরকমই দাঁড়ায়।

...অথচ, হঠাৎ অবাক আর বিমূঢ় হয়েছে সনাতন মাস্টার। সুবর্ণকে তো সে আজ অব্দি কোনমতে পুরুষ ভাবতে পারে না। ভুল জেনেও চোখে মায়া জড়িয়ে থাকে—যেন সদ্য যৌবনাবতী কিশোরী মেয়ে! ওর হাসিতে, কটাক্ষে, বাকভঙ্গিমায, চলনে সেই ছবি স্পষ্ট। এমনকি ওর দুই বাহু, আঙুল, কোমর, পাছা, উরু থেকে পায়ের পাতা অব্দি সেইমত নিটোল, কমনীয় আর সুঠাম। ছাঁদে ছাঁদে গড়া নটীর দেহলতা। অপরূপ মুখশ্রী!

কণ্ঠস্বরেও ভুল হয়েছিল প্রথমদিন। সোনাডাঙাব মেলার আসরে যে রাতে ওর গান শুনেছিল প্রথম। ঝুমুর মেয়ে ভেবেছিল।

হাতে বাঁশের বাঁশি নিয়ে সনাতন ঘুরে বেড়ায় তখন এদেশ সেদেশ—মেলা থেকে মেলায় ঘোরে। আলাপী বন্ধুমানুষের অভাব নেই কোথাও। দিনগুলো অকারণ বিভোল কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ সাঁওতাপাড়াব দলের আসরে ওর মুণ্ডু যেন ঘুরে গিয়েছিল। যেচে আলাপ করেছিল। গান গেয়েছিল অনেকগুলো। ফিল্মের গান। লোকগুলো মেতে উঠেছিল ওকে পেয়ে। তারপব ওই বাঁশের বাঁশি। একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর। ...ওরা সনাতনকে ছাড়েনি। সাঁওতাপাড়া নিয়ে এসেছিল। সবচেয়ে

বেশি টান সুবর্ণ আর আনিসের। ওই সব গান শিখবে ওরা। আর বাঁশের বাঁশি বাজাবে সনাতন, সুবর্ণ নাচবে। একেবারে নতুন ফ্যাসান চালু হবে এলাকায়।..

কেন এসেছিল সনাতন? সুবর্ণর কণ্ঠের গানে কী যেন যাদু আছে। শুধু এটুকু মাত্র? তবে বলি, আমি বাঁশি বাজাই ও নাচে—এই আমার সুখ। ...তাও তো সব নয়। তবে কী? ...ওর নাচগানের মধ্যে কাকে যেন খুঁজে পাচ্ছিল। সে বড় আবছা। তাকে স্পষ্ট করার বড় লোভ জেগেছিল মনে! নিশুতিরাতে মাঠের মধ্যে একা বাঁশি বাজাতে বাজাতে তার সাধ হত, আকাশ থেকে পরী নামুক! সেই পরীকে টের পাচ্ছিল হয়ত। ওই সে দ্রুত উড়ে আসছে—কাছে, আরও কাছে!

হয়ত এগুলোর কোনটাই কারণ নয়। আসলে বাউণ্ডুলে চালচুলোহীন জীবনে একটা সুন্দর আশ্রয় খুঁজে মরছিল সে। হঠাৎ এই আশ্রয়টার দিকে ছুটে এসেছিল তাই। মিলবে দুমুঠো খাবার অন্ন, শোবার বিছানা, কিছু পয়সাকড়ি।

নাঃ, তাও হয়ত একপেশে।

নাকি মানুষের ভিড়ে নিজেকে জাহির করার দুরন্ত লোভ? চারপাশে যেদিকে তাকায়, মানুষ আর মানুষ আর মানুষ। এত সরল ওরা, এত সহজে সাড়া দেয়, বাহবা দেয়। যা পায়, তাতেই খুশি। আদি অন্তহীন লাগে মুখের মিছিল। বুকে আবেগ দুলে ওঠে। টালমাটাল হয়ে ওঠে মন। বাঁশি ফেলে চিৎকার করতে সাধ যায়, দ্যাখো, তোমরা দ্যাখো, আমি আছি—আমি সনাতন, সনাতন মাস্টার! কণ্ঠের গভীর থেকে সব আবেগ দুলতে-দুলতে স্তবকে-স্তবকে পাপড়িমেলা পূর্ণ ফুলের মত গান হয়ে ছড়িয়ে যায় চারদিকে!

কিন্তু কী গান গাইবে সে? ফিল্মের গান আর ভাল লাগে না। আসরের পর আসর ঘুরে তার কাছে মনে হয়েছে, শেখা অন্যের গানে আত্মপ্রকাশ করা অসম্ভব। চাই নিজের গান—নিজের কথা, নিজের সুর। সনাতনের সাধ গেছে, কবিয়ালের মত কানে হাত রেখে মরমী সুরে পদ বেঁধে-বেঁধে আত্মপরিচয় ঘোষণা করে। সেই সাধনার বিরাম নেই এই একটি বছর। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণশাস্ত্র কিনেছে। পড়েছে। তবে এপথও একঘেয়ে লাগে তার। নতুন তত্ত্ব চাই। কবিয়ালারাও তো নতুন কথায় কবিগানকে বেঁধে ফেলেছে দিনে দিনে। শাস্ত্রপুরাণের একঘেয়েমিতে মন ভরে না কারো।

সে কাপে অংশগ্রহণ করেছে খাঁটি ওস্তাদের মত। এমনকি ডুয়েট দিয়েছে ছোকরার সঙ্গে। সুযোগ পেলে কাপের মত লোক হাসানোর চেষ্টাও করে সে। আর, নাচে? যাত্রাদলে সারা ছেলেবেলাটাই তার কেটে গেছে। ছিল সখী ব্যাচের সেরা নাচিয়ে, (না, সেটা আলকাপের ছোকরা হওয়ার মতো ব্যাপার ছিল না মোটে) শিক্ষা পেয়েছিল সে সময়ের প্রখ্যাত মাস্টার ভোম্বলবাবুর কাছে। ছন্দতাল মুদ্রা আছে জানা, জানা আছে অনেক রাগরাগিণী।

ছেলেবেলা থেকেই টের পেয়েছিল, একটা কিছু হতে পারে সে। পারছিল না। কিন্তু তাহলে সেই হতে পারাটা কি এই আলকাপের মাস্টারী?

না, মোটে তা নয়। সনাতন অতৃপ্ত। মন বলে, এ নয়, অন্য কিছু—অন্য কোনখানে। এক সময় লোকে পরামর্শ দিয়েছে, ওহে সনাতন—এমন খাসা চেহারা তোমার! এত ভালো কণ্ঠখানা! চলে যাও সোজা কলকাতা কি বম্বে। ফিল্মে তোমায় লুফে নেবে হে, লুফে নেবে। পাড়াগাঁয়ে পড়ে মরছ কেন বাবা?

মজার কথা, পাড়াগেঁয়েদের এইসব ভূতদের কথায় পড়ে বেঘোরে ক'মাস কলকাতায় হন্যে হয়ে ঘুরে এসেছিল সনাতন। সে দরজা তার সামনে খুলে যাওয়া এক অলৌকিক ঘটনাই। ফিরল যখন, মাথায় রুক্ষু জটপাকানো চুল, মুখভরতি দাড়িগোঁফ, কতদিন নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—কংকালটি। ...লোকে বলল, বোম্বে গেলেই পারতিস। ওখানে চান্স একটা জুটতই। সনাতন বলেছিল, পরের জন্মে দেখব। উঃ, শহরে কি মানুষ বাস করে? সব দয়ামায়াহীন কাঠখোট্টা লোক। লোক নয়, যেন ঘরবাড়ি। গাঁয়ের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলাম।

লেখাপড়া বেশি শেখার সুযোগ পায়নি। কিন্তু সুযোগ পেলেই বই সে পড়ত। এখনও পড়ে। আর

বিশেষ কথা কী, রকমারি মানুষের সঙ্গে মেশা—নানান জায়গায় ঘোরাফেরা, সংসারের আর মানুষের অনেক গভীর কথা শেখাবার পক্ষে এই ছিল যথেষ্ট।

এ নতুন জীবনে মিলেছে কিছু আশ্রয়, খাওয়াপরার সুযোগ, যশ সম্মান শ্রদ্ধা। পথে তাকে দেখলে লোকে ফিসফিস করে ওঠে, ওই যাচ্ছে সনাতন মাস্টার। এগিয়ে এসে আলাপ করে। ডেকে নিয়ে গিয়ে চা পান সিগ্রেট দিয়ে আপ্যায়িত করে। সোনাডাঙার ওদিকে ভদ্রপুরে তার ভিটেয় এখন ঘুঘুর বাস। ছাগল চরে। মাটির-ঘরের দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে কতকাল—ধ্বসে যাচ্ছে না। কী শক্ত মাটি! সোনাডাঙ্গা ভদ্রপুর এলাকার অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হয়। তারা বলে, কেমন আছ সনাতন? খুব যে নামডাক শুনছি! ভদ্রজনে বলেন, আরে, সনাতন যে! ...সনাতন তখন লজ্জায় পড়ে যায়।

তা, হ্যাঁ হে সনাতন, শেষঅব্দি ছ্যাঁচড়া দলের মাস্টার হলে? ছি, ছি, ছি!

সনাতন হাসে মিটিমিটি।

সদ্বংশের ছেলে—তোমার অনেক গুণ ছিল বাপু। ভেবেছিলাম, দেশ ছেড়ে বেরিয়েছ, তখন দিগ্বিজয় না করে ফিরছ না। খবরের কাগজে তোমার ছবি ছাপা দেখব। ...হা কপাল! শেষে এই কোমরদোলানির পাল্লায় পড়লে! অনেক আশা ছিল আমাদের—হ্যাঁ, অনেক আশা!

কিসের আশা ছিল? প্রশ্ন করতে সাধ যায় তার। এর জবাবই তো সে খুঁজছে। একটা কিছু হওয়ায় কথা ছিল তার। বিরাট অভাবনীয় মহত্তম কিছু। তা আর যাই হোক, এ আলকাপ নয়।

আজ পাড়াগাঁয়ে 'দলশিক্ষা' দিতে গিয়ে এইসব কথা ভেবেছে সে। গভীর রাতে লাফ দিয়ে উঠে বসেছে। পালিয়ে যাবে কোথাও? ফের কলকাতা যাবে? বোম্বে? ...এখন তার উপযুক্ত বয়স হয়েছে। যদি মিলে যায় কোনকিছু?

সেইসব সময় হঠাৎ মনে পড়ে যায়, কতমাইল দূরের এক মাটির ঘরে এখন শুয়ে স্বপ্ন দেখছে যে, তার—

গায়ে সবুজ বুশসার্ট, পরনে সবুজ পাজামা, মুখে জ্যোৎস্নার রঙ, চুলে অন্ধকার, সে পুরুষ—তবু পুরুষ নয়, নারী—তবু নারীও নয়—তার নাম সুবর্ণ।—

তাকে সাধ যায় ডাকতে—সুবর্ণলতা!

কত জন্মের আরব্ধ দায়িত্ব রয়েছে সনাতনের কাঁধে, একটা অসম্পূর্ণ প্রতিমাকে সম্পূর্ণ করে তোলার দুশ্চ্ছেদ্য দায় আছে চেপে। আর সেই সম্পূর্ণতা হয়ত সনাতনকেও সম্পূর্ণ করে তুলবে সঙ্গে সঙ্গে।

তাকে ফেলে যেতে বড় বুক টাটায়। পাদুটো ভারি লাগে! মুহূর্তে পৃথিবী শূন্য হয়ে পড়বে মনে হয়। তখন মনে হয়, এই তো ক'দিন হলো এসেছে সাঁওতাপাড়া থেকে—আবার ফিরতে হবে সেখানে। সেখানেই আপাতত স্থায়ী আড্ডা সনাতনের।

তবে আজ দিন পনের হল, রাগ করে চলে এসেছে। মনে মনে ঠিক করেছিল, আর ওখানে ফিরবে না সে। চার-পাঁচটা নতুন দল পেয়েছে হাতে—মাস্টারীর জন্য। তার কোনটায় স্থায়ী থেকে যাবে। নিজের দল বলে জানবে সেটা। দলওয়ালারাও খুশি হবে! হাতে আকাশের চাঁদ পাবে। বেছে নেবে একটা তাজা কচি ছোকরা—তাকেই গড়ে তুলবে মনোমত।

তবু সুবর্ণর জন্যে মন কেমন করছে। একমুহূর্ত শান্তি পায়নি মনে। সুবর্ণ ছায়ার মত সঙ্গে থেকেছে এতদিন! ওকে ছেড়ে এলে এত একলা লাগে। সাঁওতাপাড়া যাবার দিন কী উত্তেজনা আর আনন্দ তাকে টালমাটাল করে রাখে! যাবার সময় টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যায় সুবর্ণর জন্য। সাবান স্নো চুলের ফিতে—জামা-পাজামার রঙিন ছিট। একবার ভুল করে কানের দুলও কিনে ফেলেছিল একজোড়া। আসলে, কেনবার সময় দোকানদার গছিয়ে দিয়েছিল।—নিন না, রোলগোল্ডের জিনিস। দুটাকা মাত্র দাম! সে কি ছাই জানত যে কার জন্যে এগুলো কেনা হচ্ছে? যে ফিতে বাঁধে, সে তো দুলও পরে।

দেখে সুবর্ণ হেসে খুন।—ওমা দুল কে পরবে? চুড়ি পরেছি, কবজি গোল থাকবে, তাই। দুল পরলে লোকে কী বলবে?

লজ্জা পেয়েছিল সনাতন।—থাক, ফেরত দিয়ে আসব।

সুবর্ণ কিন্তু নিয়েছিল দুলজোড়া।—বারে! আসরে তো পরা যাবে! তখন আমার দুল চাই না?

সনাতনের লজ্জা মুহূর্তে ঘুচল।—আরে, সেইজন্যেই কিনেছিলাম বোধহয়। অমন ভুলটা কি মিছেমিছি হয়?

তখন, খচ্চর সুবর্ণটা, অপরূপ হেসে, ভ্রূভঙ্গী করে বলেছিল, ভুলটা সবসময় হলেই ভাল লাগাবে আমার।—

সেই ভাল লাগা, ভালবাসা! ন্যাকামি লেগেছে একদিন। আর তো লাগে না। মনের মধ্যে কে যেন মাথা কোটে, ভুলে ভরে থাক, ভুলেই জীবনটা ডুবে থাক। এই মিথ্যে নিয়েই চিরকাল যেন বাঁচতে পারি।—

সাইকেলের সীটে বসে আনিস টর্চ তোলে সামনে!—সামনে রেললাইন। তার ওদিকে ওই-ই আলো দেখছেন?

কাত হয়ে উঁচুতে আলো দেখে সনাতন ...আরে বাবা! আকাশে গানের আসর বসছে নাকি?

আনিস জবাব দেয়, কতকটা ডাঙার ওপর মনে হচ্ছে।

যেদিকে তাকায়, শুধু মানুষ, মানুষ আর মানুষ! এত মানুষের আসর কখনও দেখেনি ওরা। এর নাম তবে জনসমুদ্র। তীরে দাঁড়িয়ে বুক টিপটিপ করে সনাতনের। বিস্তীর্ণ একটা বাঁজা ডাঙ্গার ওপর অনেকগুলো সামিয়ানা ঝোলানো হয়েছে। অজস্র পেট্রোম্যাক্স আর ডেলাইট জ্বলছে! গুঞ্জন নয়, সমুদ্রের কল্লোল উঠছে। খুঁটিতে রঙিন কাগজের ঝালর, ঝালর সামিয়ানার তলায়, বেড়া দিয়ে ঘেরা আসরটা আলাদা করে সাজানো। সতরঞ্চি পড়েছে আসরে। অনেকখানি ফাঁকা জায়গা রয়েছে দু-দলের মাঝখানে। তখন সবে দুটি দলই আসরে ঢুকেছে। দুইপ্রান্তে বসেছে নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে। লায়েকদের হুকুম পেলেই যে কোন দল প্রথম শুরু করবে।

চারপাশে আলোর ছটায় আবছা ঘরবাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে। স্কুলের প্রাঙ্গণ এটা। বিশ্রামের সময় নেই। ওরা একফালি পথ বেয়ে দলে ঢুকছিল। কুঁজো হয়ে জনমণ্ডলী পেরিয়ে আসরে যাচ্ছিল। এত দীর্ঘ লাগে পথটা।

চারপাশে ঢেউএর মত ছড়িয়ে যাচ্ছে চাপা, গুঞ্জন, আনিস কপে, আনিস! সনাতন একটু ক্ষুব্ধ। তাকে কেউ চেনে না! নতুন মাস্টারের নাম যতটা ছড়িয়েছে, লোকটার চেহারা এখনও কালে স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি। হয়ত তাই।...

'বাহক' নফর আলির বানরের মত চেহারা। তার চাউনিও তদ্রূপ! কখন থেকে আলো গুনছে আঙুল তুলে। চোদ্দটায় গিয়ে ফের গুলিয়ে যাচ্ছে। হাল ছেড়ে দিয়ে তখন বলছে, চোদ্দটার বেশি।

আনিস দোহারদের মধ্যে বসে পড়ে। সনাতনকে দেখেই ম্যানেজার সরে বসে শশব্যস্তে।...আসুন, আসুন। ভাবলাম,...

কী ভেবেছিল, তা বলার আগে সুবর্ণ দুহাতে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছে। ঠোঁটে আলতো হাসি। কিন্তু মুখটা জ্বলে উঠেছে হঠাৎ। ...রাগ পড়েনি এখনও? কী মানুষ রে বাবা!

কাদের আলি হারমোনিয়ামের সামনে বসে রয়েছে। তার পাশেই বসে সনাতন। কাবুল হাসছে। নন্দ হাসছে। আমিরের মুখে হাসি। কালাচাঁদ খুড়ো সোৎসাহে মুখ বাড়িয়ে কী বলার চেষ্টা করছে। তারপর অবাক হয় সনাতন। ...আরে, দেখনহাসি যে! কেমন আছেন?

শরত চাঁই—পাতু ওস্তাদের আমলের বিখ্যাত সঙালও এ দলে আমন্ত্রিত আজ। আনিস সঙাল হবার পর কালেভদ্রে শরতকে ডাকা হত। আয়োজন চূড়ান্ত তাহলে। শরত বলে, আপনাদের আশীর্বাদ।

সুবর্ণ দিকে তাকাতে পারে না সনাতন। এখন সুবর্ণ আর পুরুষ নয়, মেয়ে। শুধু মেয়ে নয়—নটী। ঠোঁটে আলতার টকটকে লাল রঙ, আঁকা ভুরু চোখের পাপড়ি, পদ্মকলির ফোঁটা, চোখ জ্বলে যায় দেখতে। আড়চোখে একবার দেখে নেয়, সুবর্ণ তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

শরত বলে, মরে গেলে সাতদিন হত দেখনহাসি! পটল তুলতে বসেছিলাম প্রায়।

অসুখ হয়েছিল? সনাতন শুধোয়!

হ্যাঁ। কলাডাঙার ওখানে গান করতে গিয়ে সে এক বিপদ। খাবার জিনিসে বিষাক্ত কিছু ছিল নাকি—মারাত্মক কাণ্ড একেবারে! রাতজাগা গেনে মানুষ আমরা—যা দেয় সামনে, গোগ্রাসে খাই। কে রাঁধল, কী রাঁধল তো দেখি না। তারপর...

আমির তাড়া দিয়েছে হঠাৎ। ...আমাদের প্রথম আসর। মাস্টারমশাই, কাদু হারমোনিয়াম চালাক এখন।...

কয়েকজোড়া কত্তাল একটানা রিনঝিনি আওয়াজ তুলেছে। 'আধুনিক' রীতির কত্তাল বাজনা। ঝমর ঝম নয়। মিঠে, শান্ত, অলঙ্কারে ভরা বোল। ডুবু তবলচী বাঁয়া-তবলার গুরগুর ধ্বনি দিচ্ছে! কাদুর আঙুল হারমোনিয়ামের এগারো পর্দায়। অবিকল সনাতনের যা সব নির্দেশ, নিখুঁত পালন করছে দল। যন্ত্রের মত। বুকে ভরে গেল সনাতনের।

সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল একটি মাত্র পর্দায়, একটানা, গম্ভীর—

জয় জয় মা বাকবাদিনী কী জয়
জয় জয় ওস্তাদ তানসেন কী জয়
জয় জয় ওস্তাদ পাতু কী জয়
জয় জয় ওস্তাদ সনাতন কী জয়।।

ওস্তাদ সনাতন। ...চমকে উঠেছে সনাতন মাস্টার। হারমোনিয়ামের ওধারে হাঁটুর দুমুড়ে বাঈজীদের মত বসে সুবর্ণ মিটিমিটি হাসছে। জয়ধ্বনির মুল গায়েন ছোকরা। সুতরাং কথাটা জুগিয়ে দিয়েছে সুবর্ণই। ...ফিসফিসিয়ে সে বলে ওঠে, আপনার আজ প্রমোশন হল। আর মাস্টার নয়—ওস্তাদ। সনাতন একটু হাসে মাত্র।

রসিকতার সময় নেই। কোলাহল থেমে গুঞ্জন উঠেছে জনসমুদ্রে। এবার কনসার্ট। বাঁশের বাঁশিটা হারমোনিয়ামে রেখেছে সনাতন। এখন নয়, চমক দেওয়া যাবে না। হারমোনিয়াম টেনে নেয় সে। তবলা কত্তাল স্তব্ধ। হারমোনিয়ামটা ভারি চমৎকার; যেমন জোর আওয়াজ তেমনি মিঠে। তবে সেও সনাতনের আঙুলের যাদু।

উদারা-মুদারা-তারায় চমক দিয়ে আঙুল ছোটে, দমকে দমকে জটিল কী সুর বেজে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। একপলক ঝট করে ওদিকের দলটা দেখে নেয় সে। ওরা কান খাড়া করেছে। ঝাঁকসা ওস্তাদ কোনজন? ওই বুঝি ছোকরা। ছ্যাঃ ধুমসো এক মাগী যে!

বড় বড় ঝাকড়ামাকড় চুল নাড়া দিয়ে সনাতন অস্ফুট একটা চিৎকার তোলে, আ-চ্ছা! পরক্ষণে বেজে ওঠে কত্তালগুলো, বাজে তবলা। তরঙ্গ থেকে দোলে সুর। একমিনিটে আসর অনেকটা সায়েস্তা।

ধুয়োতে ফেরামাত্র ইসারা পেয়ে ঘোমটাঢাকা মুখে বন্দনা ধরেছে সুবর্ণ। তান প্রথমে। তারপর কথা।

...মনমন্দিরে তোমার আরতি বাজে মা।

সনাতনের নিজের রচনা। দুবার কলিটা গেয়ে ছেড়ে দেয় সুবর্ণ। এবার দোহারকিদের কণ্ঠে চলে গেছে কলি। এখানেই সনাতনের নতুনত্ব। প্রথম ধীর শান্ত লয়ে ঘুরে ঘুরে ক্রমশ দ্রুত হতে হতে দ্রুততর। তারপর দ্রুততম গতি—প্রচণ্ড গম্ভীর ব্যাকুলতা ছড়িয়ে পড়ে তোমার আরতি বাজে মা... তোমারই আরতি বাজে, তোমার আরতি মাগো বাজে,...

সুবর্ণর মুখটা নামানো। সনাতনের অকারণে চোখ ছলছল করে ওঠে। ...মাগো, তোমার আরতি বাজে, শোন তোমারই আরতি বাজে মা...

না, এমন কোনদিন হয় না। এত আবেগ, বিহ্বলতা, এত তোলপাড়। কানের কাছে ফিসফিস করে ওঠে অভিজ্ঞ কালাচাঁদ খুড়ো—গান লেগে গেছে। বাকবাদিনী এসে গেছেন। জয় মা, জয় মা!

বন্দনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষিপ্রহাতে বাঁশি তুলে নেয় সনাতন। মুহূর্তের দেরি নয়। কাদু হারমোনিয়ামে আঙুল রেখেছে। বাঁশি বেজে ওঠে। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকারের মত। কে যেন কেঁদে উঠল কোথায়। কে যেন ডাকল।

নাচের ভঙ্গীতে প্রণাম করে—প্রথমে নিজের দলের সকলকে, তারপর ওদলে গিয়ে সামনে যাদের পেল, তাদেরকে—তারপর ঘোমটা নামিয়ে দিল মাথাটা সামান্য দুলিয়ে—চুলে বেণী বাঁধেনি সুবর্ণ, লাল ফিতে আটকানো রয়েছে—চারদিকে করযোড়ে নমস্কার করে হাসল। ব্যস, জনসমুদ্র স্তব্ধ—নিথর!...ঝুমঝুম নূপুর বাজছে। বাঁশির সুরে রাতের আসর উথাল-পাথাল।

বাঁশি শেষ করে ঘর্মাক্ত মুখে সনাতন ফের হারমোনিয়াম নেয়। গান ধরে সুবর্ণ। রাতের পর রাতজাগা আলকাপের ছোকরার গলা—একটুখানি ধরা, একটু যেন চিড় খাওয়া—তবু সুবর্ণর ছলাকলার অভাব নেই। ঠাটে-ঠমকে, ভঙ্গিমায়, আধোআধো উচ্চারণে, সব ঢেকে দেয়। বরং ওইটুকুই তখন আর খুঁত নয়, মাধুর্য।...

ডুয়েটে সনাতন নিজেই ওঠে। এত বড় আসরে এই প্রথম। কিছু কিঞ্চিৎ হাসানোর রীতি আছে। সে কাজের মধ্যে অছিলা করে আনিসকে ডাকে সে। আনিস উঠে বাঁদরের মত মুখভঙ্গী করতেই হাসিতে দোলে শ্রোতা। খানিক পরেই সনাতনের গান শোনে তারা।

উত্তেজিত কে চেঁচিয়ে ওঠে, ছিনেমা, ছিনেমা! আর টকিহাউছে যাবো না হে!

কারা বলে, সাবাস ভাই! বলিহারি!

সুবর্ণর সঙ্গে নাচে সনাতন। সে শার্টের ওপর দিয়ে ধুতির একটা দিক বেড় দিয়েছে কোমরে। মুখের কাছে মুখ আনে নটীবেশী সুবর্ণ—বারবার। ইচ্ছে করে—এই জনমণ্ডলীকে মিথ্যে করে অরণ্য জেনে দেহে দেহ মেশায়। ...ভুল, ভুল। মিথ্যে! ধিক, তোকে শত ধিক সনাতন! নিজেকে ধমকায় সে। সুবর্ণর দেহ দোলে—ভাঁজে ভাঁজে ধূপের ধোঁওয়ার মত পা থেকে কোমর পেরিয়ে উর্ধ্বে তরঙ্গ বয়। ...সুবর্ণ, নাকি সুবর্ণলতা—কিংবা তুই কী! আমিই বা কে? কোথায় যেন ছিলাম আমরা—কার শাপে পৃথিবীতে চলে এলাম।

...সত্যিসত্যি বলে ফেলে সনাতন। শ্রোতাকে শুনিয়ে নাচের মধ্যেই কথায় বলে (আর আলকাপের এই তো মজা! মনের কথা কত সহজে বল যায়, যা-ইচ্ছে বলে আনন্দ দেওয়া যায়।) ...কোথায় ছিলাম আমরা,—কার শাপে পৃথিবীতে এলাম।

পায়ের কাছে কে বলে ওঠে চাপা গলায়, বহুত আচ্ছা মাস্টার! ভাল, ভাল!

একপলকে লোকটাকে দেখে নেয়। মাথায় অল্প কাঁচাপাকা চুল, খাড়া নাক, উদ্ধত চোয়াল, চওড়া কপাল, উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি—তার গায়ে হাফশার্ট, কাঁধে চাদর, পরনে ধুতি। বিপক্ষ দলে বসে আছে। কে লোকটা?

বিপক্ষ দলের লোকে তো কদাচ এমন সাবাসধ্বনি দেয় না! বরং দমিয়ে দেবার চেষ্টা করে। নাকমুখ সিঁটকে বসে থাকে। কিন্তু এ লোকটি হাসছে। এখনও বলেছে, চমৎকার, চমৎকার!

আজ আসরের অবস্থা সে বোঝে। তাই ছোট্ট একটা কাপ দিয়েই পাল্লা শেষ করে। কবিয়ালীর যখন তাগিদ নেই—তখন থাক। লোকে ভিতর ভিতর ওস্তাদ ঝাঁকসার গান শুনতে নিশ্চয় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এবার। অত বড় ওস্তাদ—কত নাম শোনা গেছে এতদিন ধরে!

সাত-পাঁচ চিন্তা করেই আসর ছাড়ে সনাতন। লোকটাকে ফের লক্ষ্য করে। মুখ ফিরিয়ে বসেছে এবার। ওদের দলে কোন বাইরের লোক এসে বসে আছে নাকি? কিন্তু চেহারাটা ভোলা যায় না। কেমন যেন—কেমন—ধীর গম্ভীর, পুরনো গাছের মত, অনেক ডালপালা ছড়ানো—

একটু পরেই সেই লোকটা কানে হাতে দিয়ে তান ভাঁজতে ভাঁজতে আসরে উঠে দাঁড়াল। চারদিক ঘুরে নমস্কার করে বলল, অধমের নাম শ্রীধনঞ্জয় সরকার—আপনারা বলেন, ওস্তাদ ঝাঁকসা।...

চারপাশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাততালির শব্দ। হাততালি আর হাততালি। থামতে চায় না। মাথা একটু নামিয়ে, চোখ বুজে, করযোড়ে—একটু সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। শ্রোতার অভিবাদন গ্রহণ করেছে। শান্ত, নম্র, ধীর।

ছলাৎ করে রক্তের ঢেউ পড়ল ভিতর। সনাতন বিড়বিড় করে বলে, আশ্চর্য, আশ্চর্য!

সুবর্ণ ঝুঁকে এসেছে।...কী আশ্চর্য ওস্তাদ?

সনাতন হাসে।...আমি ওস্তাদ? ওই দ্যাখো—ওস্তাদের রাজা দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওঁকে প্রণাম করব সুবর্ণ।

আলকাপ দলের আসরে এ দৃশ্য অভাবিত। চারপাশে নানারকম মতামত শ্রোতাতরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে অবিচ্ছিন্ন। ...যাঃ বাবা! নিজে থেকেই হট মানলে নতুন ওস্তাদ!

...সাঁওতাপাড়ার ইজ্জত ডোবালে হে! রাঢ়ের মাথা হেঁট হল বাঘড়ীর পায়। ধুৎ!

...নাঃ। রাতজাগা সার হল রে দাদা। পাল্লা (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) জমবে না। এখন তো আপোষে রাতটি ভোর করে কড়ি গুনে ঘর পলাবে শালারা। ...মধু, বিড়ি দে রে, মন ভরল না মাইরি। উভয়ে উভয়কে পাল্টাপাল্টি 'ঠেস' মারবে—তা নয়, গা চাটাচাটি! সেইজন্যে আশয়-বিষয় ধরলে না কোন পক্ষ।

...চুপ করো মানিকরা, আলকাপ হয় এই রকমই হয়। চুপচাপ দেখ না, কী করে।

ওরা অবশ্য গরিবগুরবো অভাজন অপাংক্তেয় মানুষ বেশির ভাগই। খাটে খায় চলে যায় এমনতরো গতরজীবীর দল। চায় একটু অশ্লীল ধরনের উত্তেজনা—রাত জাগা মানেই তো পরের দিনটি ঢুলুঢুলু লাল চোখে গতর খাটানো, এদিকে লুটিয়ে পড়ার ঝোঁক আসছে বারবার হয়ত চাষজমির চাঙড়েই, ওদিকে তেজী সতর্ক গেরস্থ আশেপাশে টেরচা তাকাচ্ছে! এই কষ্টটা উসুল না হলে শান্তি পায় না মনে। তবে, অতি অল্পেই তুষ্ট সব। যা জ্বলজ্বলে দেখে নিজেদের রহস্যময় অন্ধকার জীবনে, তাই ভাবে মানিক। যা মাতায় তাদের সামান্য মন, তাই হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রসকুম্ভ থেকে চুইয়ে পড়া। সত্য ত্রেতা দ্বাপরের কথা তার শুনেছে। তখন নাকি অঢেল সুখশান্তি ছিল মানুষের জীবনে। এখন তো কলি—শুধু কলি নয়, ঘোর কলি। আলকাপের ওস্তাদের মুখে তার শুনেছে, পঞ্চমরঙের ডালি। ছোকরার কোমরদোলানি, ডুয়েট ফার্স, কপের কাপ, 'আলগা' ছড়া আর ওস্তাদের কবিয়ালী—এই হল কিনা সেই পঞ্চরঙ! দলে দলে রঙে ডুব দিতে রাত জাগতে আসে।

পিছনের সারিতে বেঞ্চে বসে আছে যারা, তাদের মন্তব্য অন্যরকম।

...গ্র্যান্ড! দেখবার মত সীন মাইরি! গুরু-শিষ্য সংবাদ!

...যাই বল্ সুকান্ত, ওই নাচিয়েটা...ইস্, মেয়ে হলে যা হত না একখানা!

...পাল্লাফাল্লা বুঝিনে বাবা, নাচিয়ে তোলাও। কোমরদোলানি দেখি বরং।

...মহী, এক টাকার পেলা ধর্ না, জমে যাবে।

বয়সী মাতব্বর মানুষেরা চারদিকে বাজখাঁই চেঁচাচ্ছে, এই গোল, চুপ, চুপ। রসিক কে বলে ওঠে, এই গোল, মেরে চ্যাপটা করে দোব।

একজন চুপ বললে সবাই চুপ চুপ করতে থাকে। সেটা বিস্ময়কর রকমের তাণ্ডবের সূত্রপাত বটে। জনসমুদ্রে ঝড় বয়ে যায়। চুপ, চুপ, চোপরাও চো-ও-প! লাঠি ঘোরাতে থাকে লায়েকমশাইদের লোকজন।

তারপর ওস্তাদ ঝাঁকসা রাগিণী ধরেছে। মুহূর্তে স্তব্ধতা আসরে। দূরতম প্রান্তে ফিসফিস করলেও শোনা যায়। ক্রমশ ফিসফিসানিগুলোও মুছে যেতে থাকে।

প্রণাম করে সনাতন নিজের দলে এসে বসেছে। দলের সবার মুখ গম্ভীর—কেবল দু'জন বাদে। আনিস আর সুবর্ণ। সনাতন তা জানত। জেনেও লোভ সম্বরণ করতে পারেনি।

গান থামিয়ে ওস্তাদ ঝাঁকসা বলছে, ভুল, ভুল! আপনাদের ধারণা ভুল, ভাইসকল! আমি ভাঙা দালান, ওরা বটের চারা। আমার বুক ফাটিয়ে একদিন মাথা তুলবে আকাশের উঁচুতে। আমি ওদের সঙ্গে পারি?...পরক্ষণেই নতুন করে ধুয়ো বেঁধে নিল সে—

তোমরা দেখ গো ভাঙা দালানে,
বটের চারা বাড়ে কেমনে।।
আমার বুকে বাড়বে সুখে
যাব আমি শমন ভবনে—
বটের চারা বাড়ে কেমনে।।

দুহাত তুলে ছুটে আসছে এক বুড়োমানুষ। লোকের কাঁধের ওপর কেডস্ জুতো তুলে, শশব্যস্ত কিন্তু সাবধানে, তারপর আসরে। মাথায় শনের মত চুল, তেমনি গোঁফদাড়ি, গায়ে মোটা ছিটের ধূসর জামা চাদর, হাতে ছড়ি। প্রাইমারী স্কুলের হেডপণ্ডিত মশায়। ঝাঁপিয়ে এসে কাঁপানো গলায় বলেন, শুনেছিলাম—রূপে ইন্দ্র গুণে সব্যসাচী, জিহ্বামূলে সরস্বতী অধিষ্ঠাত্রী—মরি, মরি, এ মানুষের তুলনা নাই গো, সাক্ষাৎ কিন্নর নরকুলে জন্ম। আশি বছর বয়ঃক্রম হল আমার—কখনও আলকাপ গান শুনি নাই, আজ শুনলাম। ধন্য হলাম। ধন্য হল আমার এই দুঃখিনী পল্লীগ্রাম....

ফের গোলমাল! ...বুড়োকে সামলাও, বুড়োকে সামলাও।

কাঁপছে লোল চর্মসার ডান হাতটা। বুকপকেটে কাঁপতে কাঁপতে ঢুকে যাচ্ছে। ...কিছু বের করতে চান—খুঁজে পাচ্ছেন না। পকেটভরতি কাগজ। একটা কিছু দিতে চান। ছিল, ছিল, গেল কোথায় গো।

তার আগেই কারা বাঘের মত হালুম করে এসে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেল পণ্ডিতমশাইকে। প্রায় আর্তনাদ করছেন আর হাত-পা ছুঁড়ছেন সারাপথ।

ওস্তাদ ঝাঁকসা কি একা ছড়া গেয়েই আসর চালাবে? মতিগতি সেই রকম। ফের প্রসঙ্গ বদলেছে। কথায় মিল দিয়ে বলছে।

...বড় দুঃখ বয়ে গেল মনে, সঙ্গে নাই নিজের অস্ত্র—নিরস্ত্র এ রণে, শুনে তাকবেন আমার শাস্তির নাম, সে বিহনে পূর্ণ হল না মনস্কাম, এখন...

ফের নতুন ধুয়ো।...

কী দিয়ে মন বুঝাব, এখন আমি কার কাছে যাব!
আমার হৃদয়মন্দিরে
বাঁশি বাজত দিনো-রাতে রে
এখন আমি কী নাম ধরে
বাঁশরী আর বাজাব—
এখন আমি কার কাছে যাব।।

শুধু গান নয়, ছড়ার কলিপরকলি অন্তরা নয়, কান্না। সারা আসরে মূর্ছার আবেশ এসে গেছে। কথা আর সুর মিলিয়ে এক ব্যর্থ সব খোয়ানো মানুষের বিষণ্ণ ছবিটি শ্রোতার চোখে। বিচ্ছিন্নভাবে এ গানে কী হত কে জানে, আলকাপ এমন এক জগত—যেখানে শ্রোতা-গায়ক দুই মিলিয়ে—দুয়ের জীবন ইচ্ছা বাসনা একাকার হয়ে রয়েছে।

আহা রে আহা। কে ককিয়ে ওঠে। কে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তাই তো! তুখোড় রসিক, ছোকরাকে পেলাধরা ইয়ারসম চ্যাংড়া ছেলে, অভাজন গতরজীবী, সবাই বিষণ্ণ। চুপি চুপি নাক ঝেড়ে কে বলে বেশ, ওস্তাদ, বেশ! ...আর, তার এই বলা, এই বিষাদের অনুভূতিটিও আসরের অর্কেস্ট্রায় একটি অবর্জনীয় আর অত্যাবশ্যক সুর—যা না হলে এখনই সব বড় অকারণ আর অর্থহীন হয়ে পড়ে।

এদলে সনাতন সুবর্ণকে বলে, আমার আমার চোখ খুলে গেল সুবর্ণ। গানের যাদু কাকে বলে, জানলাম। আমার মন ভরে গেল রে। এ আমি কোথায় আছি রে সুবর্ণ, কোথায় আছি!

সুবর্ণ মিটিমিটি হাসে। আলতারাঙা ঠোঁট দুটো সামান্য কাঁপে। ভুরুতে মায়া, ওর চাহনিতে মায়া, ওর লাল রেশমী শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে মায়া। ফিসফিস করে বলে, যদি কোনদিন আমি না থাকি, ওই গানখানা গাইবেন, ওস্তাদ। শিখে রাখুন।

সনাতন হঠাৎ চমকে ওঠে। বুকের ভিতর রক্ত চিৎকার করে এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর সে ক্ষিপ্রহাতে সিগ্রেট ধরায়। ধুঁয়োর রিঙ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলে না।

সুবর্ণ বলে, রাগ করলেন? থাকব গো, থাকব। যাব কোথায়?

সনাতন মাথা নাড়ে শুধু।

আর এতক্ষণ পরে ম্যানেজার আমির আলি চাপা ক্রোধটা উদগীরণ করে লাল চোখে বলে, বামুন হয়ে ওই নিচু জাত চাঁইয়ের পায়ে প্রণাম করলেন আপনি? ছিঃ!

সনাতন কান করে না। তার চোখ এখন সুবর্ণর দিকে। মায়া দেখছে। মায়ায় আটকে যাচ্ছে।

...মায়া বলে একটা জিনিস আছে, তার কথা বলি শুনুন।

চৌদ্দটা উজ্জ্বল বাতির আলোয়, হাজার হাজার বিমুগ্ধ মানুষের মাঝখানে, সারাটি রাত ধরে মায়া আস্তে আস্তে, চুপিচুপি, মনের গভীরে জাল বিস্তার করে। অভ্যাসকে করে তোলে সংস্কার। তারপর একদিন চোখদুটো বদলে যায়। আমি আছি, কিন্তু কোথায় আছি? মায়ার মধ্যে আমার থাকা।...

প্রতিটি দিন আসে। কুশীলবেরা পোশাক বদলায়ঃ মোহিনী নটী পুরুষ হয় আবার। ছটফট করে উঠি—জালের কঠিন বাঁধনে বাঁধা—বেরোন যায় না। আসরে যা সত্য বলে নিজে মানবার চেষ্টা করছিলাম, লোককে ধোঁকা দিচ্ছিলাম—তা অবশেষে নিজেকে কাছে অভ্যাসের বশে সত্য হয়ে উঠেছে। বারবার মিথ্যে বললে সেটা সত্যি লাগে নিজের কাছে—একসময় তাই সত্য হয়ে ওঠে।...

আসর ভাঙে। সভা শূন্য হয়। সামিয়ানা গুটিয়ে নেয় ওরা। আলো যায় নিবিয়ে। সাজ খোলে সুবর্ণরা। কিন্তু মনের ভিতর আসর ভাঙেনি, সভা হয়নি শূন্য, সেখানে কালে সামিয়ানার নীচে সারবদ্ধ বাতি জ্বলছে। সুবর্ণরা নাচছে। ওস্তাদেরা মরমী পদ গাইছে। কত্তাল বাজছে ঝমর ঝম। তবলায় কার্ফা বাজছে—ধেগে নাকে নাকে তিন, ধেগে নাকে নাকে তিন! হারমোনিয়ামে আঙুল নাচছে, সুরে তরঙ্গ উঠেছে—দোহারকিরা দ্রুততালে ধুয়ো গাইছে, আর ঘুঙুরের আওয়াজ উঠছে ঝুম ঝুম ঝুম... সুবর্ণরা নাচছে। নেচে চলেছে অনন্তকাল ধরে।...

ট্রেনে তো চেপেছেন মাস্টার। নামবার পরও গা থেকে গতিটি মুছে যায়নি। মনে হয়, নামা হল না গাড়ি থেকে ইহজীবনে। তেমন মায়া-গাড়ির বেগ নিয়ে বেঁচে আছি। ফুরোয় না—রেশ বহে চলে।...

সনাতন অভিভূত। ওস্তাদ ঝাঁকসার এ তত্ত্বকথা শুনে সে মুগ্ধ।

তাই তো! যখন ডুয়েটে উঠে গানে বলে... জলকে যাচ্ছো গরবিনী আওলা তোমার কেশ, আর নারীবেশী সুবর্ণ জবাব দেয়, ...পথ ছেড়ে দাও নিলাজ নাগর কোথায় তোমার দেশ—ওরা তো পরস্পরকে নারী আর পুরুষ ধরে নেয়—ধরে নেবে বলেই ওরা আসরে প্রতিশ্রুত, আসরও ধরে নিচ্ছে সেটা—বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই কোথাও। সনাতন জানে, সুবর্ণ পুরুষ—কিশোর পুরুষ। সুবর্ণ জানে, সনাতন পুরুষ—যুবাপুরুষ। তবু সনাতন সুবর্ণকে নারী ধরে নিচ্ছে, আর সুবর্ণও নিজেকে তাই ধরছে—ধরে সেইমত ভঙ্গিমায় তাব আত্মপ্রকাশ। এই ধরে নেওয়াটাই যত মজা। 'ধরে নেওয়া' একদিন অভ্যাস থেকে রক্তের ভিতর, বোধের ভিতর সত্য হয়ে ওঠে হয়ত। তা না হলে...

সনাতন চুপ করে ভাবে। নিঃশব্দে সিগ্রেট টানে। কানেব ভিতর এখনও সারারাত্রির আসর চলেছে। হারমোনিয়াম বাজছে, সুবর্ণ গাইছে, দোহারকিরা ধুয়ো ধরেছে—ধারাবাহিক সেই ধ্বনিপুঞ্জ মোহিনী সুবর্ণর ঘুঙুরে ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম।

দুপুরে খাওয়া শেষ করে ওরা স্কুলের বারান্দায় বসেছে। একটু পরেই দুটো দল দুদিকে চলে যাবে। এখন পরস্পর মেলামেশা গল্পগুজব অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পালা। ওস্তাদ ঝাঁকসা বসেছে বেঞ্চে—পায়ের কাছে সতরঞ্জির ওপর সুবর্ণ। সনাতন বেঞ্চটার অন্যপ্রান্তে বসে আছে। ওস্তাদ ঝাঁকসার কথা শুনছে। মাঝে মাঝে ওস্তাদ ঝাঁকসার টিপ্পনী : এ শালা নির্ঘাৎ অনেক মানুষের বুকে ছুরি মারবে। পরক্ষণে হো হো স্বভাবসিদ্ধ হাসি। ...সুবর্ণ, রাগ করলি রে? ছোকরাদের আমি ওই নামে ডাকি। কিন্তু বাবা, দোহাই তোকে, এ বুড়োর কথা রাখিস। ওই ভদ্রলোক ব্রাহ্মণসন্তানকে আর ভেলকি দেখাস নে!

সুবর্ণ বলে, সে আমার খুশি। কিন্তু ওস্তাদজী, নিজেকে বুড়ো বলছেন কেন বাপু? আপনি রাজপুরুষের মত দেখতে। চোখের দিব্যি।

ওস্তাদ ঝাঁকসা হাসে। ...খচ্চর মাতালে বে ফজলা! আমার সামনে ঢ্যামনাগিরি—এ্যাঁ? হা রে সুবর্ণ, জানিস, তোর মত কয়েকগণ্ডা ছোকরা জন্ম দিলাম আজ অব্দি? ইস্. বলে কিনা আমি রাজপুরুষ!

ফজল বলে, শান্তি বলত হেটমাস্টের!

সবাই হাসে এ কথায়। ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, রাজপুরুষ—ওই দ্যাখ্, বসে রয়েছেন সামনে! কী মাস্টারজী, ঝাড়ুন দুচাট্টে বুলি। গেনেদের গেনেমি বুঝি রপ্ত হয়নি এখনও? মশাই, এর নাম আলকাপ। আসরে যা বললেন—তারপর তো এই খিস্তির আসর নিজেদের জন্যে! প্রাণ খুলে খিস্তি করুন। এখানে সবাই গেনে—শ্রোতা নাই।

আশ্চর্য, এতক্ষণ, কী সভ্যভব্য ভদ্রলোকটি—কী সব তত্ত্বকথার খই ফুটছিল মুখে! হঠাৎ কেমন কটু হয়ে উঠল পরিবেশটা যেন। ওস্তাদ ঝাঁকসা কী? বড় দুর্বোধ্য লাগে লোকটাকে। হয়ত মুখোশ দেখছিল এতক্ষণ। এবার মুখ দেখছে। কেমন খারাপ লাগে সনাতনের। এর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসেছিল সবার সমক্ষে! নিজের ব্রাহ্মণত্বের কোন স্মৃতিই ছিল না যেন কিছুক্ষণ অব্দি।...

সনাতন বলে, আমি শুনি—আপনারা বলুন।

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, আপনার দিব্যি মাস্টার, আসরে প্রথম এই সুবর্ণকে দেখে আমি তো অবাক। খেমটাদলের মেয়ে এনেছে নাকি? ...এখনও আমার মনে সন্দেহ আছে মশাই। ...ইচ্ছে করছে, ...হঠাৎ চুপ করে যায় সে।

সুবর্ণ কটাক্ষ হানে। ...বলুন, বলুন, কী ইচ্ছে করছে?

শুনবি?

হুঁ-উ। আপনি ওস্তাদদের রাজা। আপনার কথা আবার শুনব না?

তবে ওই ঘরের মধ্যে চল তো বে। পরখ করে দেখি, তুই পুরুষ না মেয়ে!

দলশুদ্ধ হাসছে। কিন্তু সনাতন গম্ভীর। ছিঃ, কী কদর্য সব কথাবার্তা লোকটার! আলকাপের এসব ইতরামির দিক তো জানা ছিল না তার। হয়ত বড়দলগুলোর সঙ্গে মেশেনি—তাই জানে না। সনাতন সুবর্ণর দিকে ক্ষুব্ধদৃষ্টে তাকায়।

সুবর্ণর চোখ ওস্তাদজীর দিকে। হঠাৎ সে অশোভনভঙ্গীতে বুকটা চিতিয়ে বলে, বেশ তো—বুক দেখলেই বুঝবেন। অত ডাক্তারীর দরকার কী?

সত্যিসত্যি ওস্তাদ ঝাঁকসা বুকের দিকে হাত বাড়িয়েছে—মুখে একরকমের নিষ্ঠুর অমানুষিক হাসি! আর সনাতনের মনে হয়—যেন ওস্তাদ ঝাঁকসা সত্যিসত্যি পরীক্ষা করতে চায়। বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও।

সুবর্ণ কিন্তু তারপরই সরে গেছে। ...অত সোজা, তাই না?

খানিক পরে ওরা উঠে পড়ে। পয়সা কড়ি চুকিয়ে দিয়েছে। বিদায় দিতে মাঠ অব্দি এগিয়ে এল কত মানুষ।

সনাতন যতই ক্ষুব্ধ হোক ম্যানেজার আমির আলিকে যে ওস্তাদ ঝাঁকসা বশীভূত করে ফেলেছে, তা ঠিক। ঝিঁঝিডাঙায় ক'আসর বায়না আছে ওস্তাদ ঝাঁকসার। এদের দলের কয়েকজনকে হায়ার চায়। আসর পিছু পঞ্চাশ টাকা দেবে! ওস্তাদ ঝাঁকসা আর কজন থাকবে সঙ্গে। ভানু আর অন্যান্যদের বিদায় দেবে। খুব বড় জায়গার আসর। গুণীমানী ভদ্রজনের সমাবেশ। সুবর্ণর মত ছোকরা আর এইরকম টাটকা সুন্দর সেট থাকলে ওস্তাদ ঝাঁকসা রহিমপুরকেও কেয়ার করে না। তাছাড়া সাঁওতাপাড়ায় এমন একটা ভাল দল আছে সেটাও তো প্রচারিত হবে দেশে-দেশে। ও অঞ্চলে একবার গেলে বায়নার ছাড়ান থাকবে না। চোখে পোকা ধরে যাবে রাত্রি জেগে। টাকা বয়ে আনতে পারবে না আমির আলিরা! আর ওই সুবর্ণর বুকটা টাকায় আর মেডেলে ভরে যাবে একেবারে।

আমির আলি রাজী। সুবর্ণর মাইনে আছে, সাজপোশাক আছে, খোরপোষ আছে—চিরকাল কি গাঁট থেকে চাঁদা করেই দিতে হবে সেগুলো? এখনও দলের নাম ভালমত ছড়ায়নি। বড় ওস্তাদের সঙ্গে থাকলে শিক্ষা যেমন হবে, তেমনি প্রচারও কম হবে না। তার ওপর বলে কী! আসরপিছু পঞ্চাশ টাকা! এযে যাত্রাদের 'বেতন'! বেচারা তখনও জানে না, রাঙামাটির আসরেই ওস্তাদ ঝাঁকসা একশো টাকা রাত নিয়েছে।

দলের লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। সবাই রাজী। কেবল, —কেবল যেন সনাতন কেমন নিরুৎসাহী। খামখেয়ালী লোক—আমির চোখ টিপেছে সুবর্ণকে, ...তুই সাধলেই যাবে। বল না গিয়ে।

সনাতন বলে, গেলে আমারও শিক্ষা হবে, বুঝি। ওস্তাদ ঝাঁকসাকে আমি নিজেও ওস্তাদ বলে মেনেছি। কেমন করে আসর রাখতে হয়, গান গাইতে হয়, কাপ জমাতে হয়—সে ব্যাপারে উনি সেবার ওস্তাদ। কিন্তু এদিকে যে অনেক সব দল ধরেছি—তাদের কাছে 'দলশিক্ষার' টাকাও নিয়ে বসে আছি। যাই কী করে!

সুবর্ণ বলে, কথা বুঝি তাই ছিল ওস্তাদ? কেন দল ধরলেন অত? যদি সাঁওতাপাড়ার এরা কোনদিন আপনার অসম্মান করে...

চাপা গলায় সে বাকিটুকু বলে, তাহলে আপনার সঙ্গে আমি পালিয়ে যাব।

চোখ জ্বলে ওঠে সনাতনের। পালিয়ে যাবি? আমার সঙ্গে? ...পরক্ষণে সে হাসে। ...তুই কী সব বলছিস! ঘর বাঁধবার জন্যে পালানো শুনেছি—আমরা কী বাঁধব রে সুবর্ণ?

দলের লোকেরা এগিয়ে গেছে সামনে। দুটো দল এখন মিছিলে এক। এরা পিছিয়ে পড়ছে। সুবর্ণ ওর হাতটা ধরে গা ঘেঁষে পথ হাঁটে। বলে, ঘর বাঁধব না, দল বাঁধব।

অজানা ভয়ে সনাতনের বুক টিপটিপ করে। পাদুটো অবশ লাগে। সে বলে, তারপর?

...তারপর আর কী? গান করব।

...তারপর?

...গান করব।

...তারপর?

হাত ছেড়ে ভুরু কুঁচকে হাসে সুবর্ণ। ...যান! তারপর আর কিছু থাকতে নেই। চুপ করে হাঁটে সনাতন। কথা বলে না।

সুবর্ণ বলে, গান ছাড়া আর করব কী বলুন! মরে যাবো না?

সনাতন বলে, একদিন বয়স হবে। বুড়ো হতে হবে। চুল পাকবে। দাঁত ভাঙবে। তখন—তখন কী হবে রে সুবর্ণ?

সুবর্ণ কপট ক্ষোভে বলে, ও বুঝেছি! আমার যখন চুলকাটবার বয়স হবে, তখন আমাকে আর ভাল লাগবে না আপনার। এই তো বলছেন?

সনাতন ওর হাতটা নেয়। নরম নিটোল হাতের চুড়িগুলো নাড়াচাড়া করে। বলে, কে জানে কী হবে! অতদূর আমি দেখতে ভয় পাই রে সুবর্ণ।

আনিস এক ফাঁকে পিছিয়ে আসে। সাইকেলটা গড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিল সে। এসে বলে, চলুন মাস্টারমশাই—থুড়ি, ওস্তাদ হয়ে গেছেন আজ থেকে, ওস্তাদই বলি। চলুন ওস্তাদ, ঘুরে আসি ঝাঁকসার সঙ্গে। ক্ষতি কী? এতদিন তো আদাড়-বাদাড়ে শেয়ালরাজা হয়ে কাটালাম, এবার দেশেদেশে দিগ্বিজয় করে আসি। যত নাম তো হবে সুবর্ণ আর আপনার! আমরা মশাই চিরকাল 'তলপেট' (নিচের তলার) হয়ে থাকব।

সনাতন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি বলছ যেতে?

কেন বলব না? এমন সুযোগ ছাড়া কি ঠিক?

বেশ, যাবো।

সুবর্ণ দৌড়ে যাচ্ছে। ম্যানেজারের কাছে খবরটা দেবে।

ঝিঝিডাঙা। নামটা চেনা মনে হচ্ছে। নলহাটির ওদিকে কোথায় যেন। ...মনে পড়েছে সনাতনের। খুব বড় মেলা বসে ওখানে। চৈত্রমাস অব্দি থাকে মেলাটা। বিস্তার বাউলবোষ্টম আসে। আসর হয়। নদীর ধারে ভারি সুন্দর জায়গাটা। খুব বড় গ্রাম। একবার গিয়েছিল সেখানে। বাউলদের দলে মিশে সারারাত্রি গান গেয়েছিল। হরিপদ বাউল—তার বোষ্টুমীর নামটা কী যেন ছিল, ...সোনা বোষ্টুমী—ভারি মিঠে গলা। কোথায় তাদের আখড়া আছে যেন। তিনচার বছর আগের কথা ...আহা, বড় ভাল লেগেছিল সেখানে।

সনাতন যাবে। সেদিন সেখানে সে ছিল অখ্যাত—অজ্ঞাতকুশীল এক বাউণ্ডুলে নিতান্ত গায়ক। এবার সেখানে সে সনাতন ওস্তাদ—আত্মপ্রকাশ করবে নিজের পূর্ণ মহিমা নিয়ে। থাকনা ওস্তাদ ঝাঁকসা—সে নিজেও তো কমকিছু নয়। সুবর্ণর সঙ্গে ডুয়েট দেবে। স্বাধীনভাবে ছড়া গাইবে। আত্মপরিচয় ঘোষণা করবে জনমণ্ডলীতে।

বুক ফুলে উঠেছে সনাতনের। গুনগুন করে এখনই সে-আসরের ছড়া বাঁধতে থাকে সে। ...হঠাৎ চমকে ওঠে খানিক পরে। এ কোন সুরে গুনগুনানি চলেছে তার? সেই--

কী দিয়ে মন বুঝাব, এখন আমি কোন পথে যাব।।

এসে গেল যখন, ছাড়তে পারল না। মুখস্থ হয়ে গেছে কলিগুলো। গাইতে লাগল সে। মন কেমন উড়ু উড়ু লাগছে। উদাস আর বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে মনটা। গাইতে গাইতে ভাবছে, কী হারিয়েছে তার জীবন থেকে—কেন এত পরিচিত লাগে গানখানা? যেন নিজের নাড়ীতে বাঁধা—অচ্ছেদ্য মর্মবাণী প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াচ্ছে এমনি করে। নাকি ভবিষ্যতে কী অনিবার্য হারানোর বিশ্বাসে আগে থেকেই তার আত্মা এই গান সুরখানিকে প্রিয় করে রাখছে! নাকি আলো পড়ে গেছে সামনের অন্ধকারে—সবহারানো আগামী সনাতনকে দেখে বর্তমান বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে ? ...ভাবতে ভাবতে গাইছে সনাতন। ...'আমার হৃদয়মন্দিরে, বাঁশি বাজত দিনরাতে রে—এখন আমি কী নাম ধরে'...ঠিক এখানেই একটা মারাত্মক, বিষণ্ণ, দরদী ভাঁজ আছে—মোচড় পড়ে সুরটার—তানেতানে সাতটা স্বর কড়িকোমলে ঘুরে আসে, কতকটা কীর্তন—কিছু যেন বেহাগ রাগের স্পর্শ...স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় না—মর্মবাণী রক্তের সঙ্গে উ গরে পড়ে, 'কী নাম ধরে'...কী, নামটা ছিল কী তাহলে! ছিল, একটা কিছু ছিল। সূর্য ডোবার পর কিছুক্ষণ জুড়ে মাঠ নদী গাছপালা দিগন্তে নীলাভ আবছায়া দেখে, হঠাৎ ভিড়ের একাকারে কোন একটি মুখের দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ সনাতনের বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে কতদিন। কী যেন ছিল, কে যেন এল—ঠিক সেই রকম। ভুলে থাকার অভ্যাসে সব কবে ভুলে গেছে।

ব্যাগ থেকে বাঁশিটা বের করে সনাতন। চলতে চলতে মাঠের পথে বাঁশি বাজাতে ভারি ভাল লাগে। কিন্তু ফুঁ দিতে গিয়ে রেখে দেয়। ওস্তাদজী বলছিল, বাঁশি ভাল জিনিস। তবে দেখবেন, আপনার দামী গলাটা খুন করবে শালা। অ্যাদ্দিন করে নি কেন, অবাক হচ্ছি। হুঁশিয়ার মাস্টারজী, শরীরের এক যন্ত্র দিয়ে ডবল কাজ করাবেন না।

তা শুনে ফজল কী বুঝল কে জানে, হেসে বলছিল, মনে তো বোঝে না রে ভাই! কী বলেন মাস্টার?

ওস্তাদজী তেড়ে গিয়েছিল তাকে, চুপ, বেহুদা খবিস, চুপ! সবসময় ইতরামি।

এখন সনাতন ফজলের রসিকতাটা বুঝতে পেরেছে। জঘন্য! গানবাজনার মত পবিত্র ব্যাপারে ওরা এত কদর্য জিনিস জুড়ে দেয়! বড় খারাপ লাগে তার। সেও কি একদিন এদের মত ইতর হয়ে পড়বে?

ফের সে গুনগুনিয়ে ওঠে, ...কী দিয়ে মন বুঝাব—

পবিত্রতর—পবিত্রতম বিষণ্ণতায় মন ফের সব ধুলোমাটি ছাড়িয়ে সামনের আকাশের দিকে চলে যেতে থাকে। না, সে আর কিছু আশা করে না—শুধু গান, শুধু 'শুনিয়ে' মানুষ, শুধু সেই আসরের মোহিনী নটী—কিশোর সুবর্ণ নয়। সে এক অমর্ত সুবর্ণলতা।

স্টেশনের দিকে সবার গতি। সন্ধ্যার ট্রেনেই ঝিঝিডাঙা পৌঁছবে। অদূরে স্টেশনের লালবাড়ি, টেলিগ্রামের তার, সিগন্যাল পোস্ট, রেললাইন—শেষবেলার আলোয় সনাতনের মনে একঝলক সহজ খুশি ছাড়িয়ে দিল এতক্ষণে। এত ভাল লাগবে এইরকম যাওয়াটা! বাকি জীবন শুধু যাবে, যাবে আর যেতেই থাকবে—পিছু ফিরবে না সে।

পাশ থেকে আনিস ফিসফিসিয়ে ওঠে, শালা ফজলার কাণ্ড দেখছেন! সুবর্ণর মত ভাল ছেলেটার ও সর্বনাশ না করে ছাড়বে না।

সনাতন নিরাসক্ত চোখ তুলে একবার দৃশ্যটা দেখে নেয় মাত্র। ফজল সুবর্ণর কাঁধ

ধরেছে—অসভ্যের মত সুবর্ণর বুকে হাত রেখেছে—কী বলছে আর দুজনেই হাসির চোটে ভেঙে পড়ছে। ...

তাতে কী! সুবর্ণ তো মেয়ে নয়। ...সে মনে মনে এইকথাটা বলে নেয়।

ঝিঝিডাঙা।

কি অদ্ভুত নাম! এখানে বুঝি সারাটি রাত ঝিঁঝিপোকা ডাকে? ...সুবর্ণ কয়েকবার বলেছে কথাটা। কেউ কান করেনি। সবাই ক্লান্ত। পিছনে মেলা—প্রকাণ্ড দীঘির পাড়ে বিরাট চটানে অজস্র দোকান, সার্কাস, ম্যাজিক আর সিনেমার তাঁবু—লোকসমুদ্র গর্জন করছে। কাছারিবাড়ির একটা ঘরে ওদের আড্ডা। কেউ হাঁটুর ফাঁকে মাথা রেখেছে—কেউ দেয়ালে হেলান দিয়েছে। বাহক নফর আলি শুয়ে গেছে যথারীতি। ওস্তাদ ঝাঁকসা দিব্যি হারমোনিয়াম বাক্সের ওপর বসে রয়েছে দেখে ম্যানেজার আমির আলি বিরক্ত। সনাতন এত ক্লান্তিবোধ কোনদিন করেনি। ক্ষিদে পেয়েছে। লায়েকপক্ষ সেই যে গেছে ফেরার নাম নেই। আপাতত চা-মুড়ি আসবার কথা, তারপর রান্নার ব্যবস্থা। আসর দেবে সেই শেষরাত্রে। এখন সেখানে স্থানীয় দলের যাত্রা চলেছে।

দরজার সামনে ভিড়। সবাই ছোকরা খুঁজছে। সুবর্ণ মাথাটা চাদরে মুড়ি দিয়েছে—নয়ত হাজাররকম রসের তুবড়ি ফাটবে ভিড়ে। তবে কণ্ঠস্বর শুনে কেউ কেউ বুঝি ধরে ফেলেছে। বলছে, ওই তো, ওই যে ...একজনের তীব্র প্রতিবাদ—ধুর, শান্তিকে আমি চিনি, ঝাঁকসুর ছোকরা শান্তি। গতবার গান করে গেল না?—হয়ত বদলেছে। —এই দাদু, মুখটা আলোয় ঘোরাও না, দেখি আমরা! বুঝতেই পারছ ঝিঁঝিডাঙা নাম—আসর না জমাতে পারলে ঝিঁঝিপোকা ডাকিয়ে দেবে মাথায়। বড় বড় দলের গান হয় এখানে। বিখ্যাত সব ছোকরা মেডেল নিয়ে যায়। হুঁ হুঁ বাবা।

হ্যাসাগটার শোঁশোঁ শব্দ এককোণে। ঘরের ভিতর আর কোন শব্দ নেই। শেষরাত্রে আসর? কী নিয়ম এদেশে! আমির আলি একবার অস্ফুটকণ্ঠে একথা বলেছে। জবাব না পেয়ে চুপ করে থেকেছে।

কতক্ষণ পরে লায়েক পক্ষের লোক এসে গেল। মাথায় মাড়োয়ারী টুপি, পরনে প্যান্টশার্ট—যুবকটি প্রথমে ফজলকে খোঁচা মেরে 'বাঘড়ে ভাষায়' * (ফজলের যা ভাষা) বলে, উঠনা জী! ভুজা খাবা, ভুজা! ভিড় হাসছে। হাসতে হাসতে দুভাগ হয়ে যাচ্ছে। পুরো এক বস্তা মুড়ি। এনামেলের হাঁড়ি ভরতি নতুন গুড়। কয়েকটা কাচের গ্লাস। একবোঝা শালপাতা। আর একবালতি জল। দলশুদ্ধ লাফিয়ে বসেছে।

কেউ-কেউ কোঁচড়ে নিয়ে নিজের জায়গায় সরে যাচ্ছে। বাদবাকি সবাই বস্তার সামনে গোলাকার। নন্দ মুখুয্যের হাত সবার আগে বস্তার ভিতর। তারপর 'বামুনব্যাটা জাত মারলে রে' বলে স্বয়ং রাশভারি আমির হুমড়ি খেয়ে পড়ে তারপর 'আমি বাগদী হে মামু' বলে কাবুল—ঘনশ্যাম তার অসাধারণ লম্বা হাতটা ঢুকিয়ে দেয়।

সনাতন ইতস্তত করছিল। আনিস বলে, আরে সর্বনাশ! আপনি—

ওস্তাদ ঝাঁকসা মাথা তুলল বস্তার চার পাশের ভিড় থেকে—মুখে একগাল মুড়ি, চিবুকে গুড়, খপ করে বাঁহাতে সনাতনের একটা হাত টেনে ঢুকিয়ে দিল সে।

সনাতন চোখ বুজে চিবুচ্ছে। স্বপাক খায় এখনও—যেখানেই যাক। আজ সব বিধি ভেঙে গেল যে! যাক গে। মন্দ লাগছে না! কিন্তু সুবর্ণ কই? সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, সুবর্ণ কোঁচড়ে মুড়ি নিয়ে কোণের দিকে বসেছে। তার হঠাৎ লোভ হয়, সুবর্ণর সঙ্গে এককোঁচড়ে খাবে—কিন্তু পারে না।

যে পারল, সে ফজল। দুহাতে যতগুলো পারে, তুলে নিয়ে সুবর্ণর কাছে গেল সে। বলল, কই রে, আঁচল খোল।

সনাতন অবাক। সুবর্ণ হাসতে হাসতে কোঁচড়ে নিয়েছে মুড়িগুলো। ফজলের সঙ্গে খাচ্ছে। কেমন কটু লাগল দৃশ্যটা। মুসলমানের সঙ্গে খাচ্ছে সুবর্ণ!

---

* 'বাঘড়ে ভাষা'—মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরপূর্ব অঞ্চলের ভাষা।

বাইরে থেকে কে মন্তব্য করল, গেনেরা খাচ্ছে। গেনেরা গেনে—আর কোন জাত নেই তাদের! সনাতন তার চারপাশে গেনেদের দেখে। ছায়াগুলো দেয়ালে একাকার হয়ে নড়ছে—কচরমচর চিবুনোর আওয়াজ শুধু, অস্ফুট মন্তব্য মাঝে মাঝে, বাইরে থেকে হঠাৎ ভেসে আসে মেলার কলরোল, নাগিন বাঁশির সুর, আসে পাঁপরভাজার গন্ধ, ... পরিব্যাপ্ত এক বিরাট স্পন্দন সব মিলিয়ে, এক বিচিত্র রঙের সমাবেশ, তবু এক বই দুই নয়।...

ঘুম এসেছিল সনাতনের। বারান্দায় ইটের উনুন পেতে রান্না হচ্ছে। রাঁধছে নন্দ। ছিলিমও টানছে মাঝেমাঝে। কাদের আলির বিলিতি বোতলটা শেষ হয়নি—তাই নিয়ে চলে গেছে আনিস ফজল আর সে। ওস্তাদ ঝাঁকসা বাইরে কোথায় বেরিয়েছে। হয়ত মেলায় ঘুরছে। আমিরকে ডেকে নিয়ে গেছে। সনাতন ঘুমোচ্ছিল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার। কোথায় শুয়ে আছে সে? এবড়োখেবড়ো মেঝে—মাত্র সতরঞ্চী পাতা রয়েছে, পায়ের ধুলোয় তা বিশ্রী হয়ে উঠেছে, তার ওপর শুয়ে পিঠ ব্যথা করছে। মাথায় ব্যাগটা বালিশ করেছিল। কিন্তু এখানে কেন সে? কয়েক মুহূর্ত সবকিছু অস্পষ্ট লাগে তার। উদ্দেশ্যহীন তাকিয়ে থাকে অন্ধকার ঘরে। আলোটা বাইরে রান্নার কাছে নিয়ে গেছে ওরা। দরজার বাইরে কাছারির প্রাঙ্গণে একটা কুকুরের মস্তো ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেলার আওয়াজ কানে আসে।

পরক্ষণে সে দেখল, তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সুবর্ণ শুয়ে আছে। কে জানে কেন, তক্ষুণি কী এক হঠকারিতায়, প্রবল মায়ায় আত্মমগ্ন ব্যাকুলতায়, হয়ত চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল ঘুম থেকে জাগবার সঙ্গে সঙ্গে এবং জলে ডুবে যাওয়া মানুষের অসহায়তায় খড়ের টুকরো আঁকড়ে ধরার মত—এক অজানা আবেগে খুব জোরে চেপে ধরল সুবর্ণকে, তারপর বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে চুমু খেয়ে বসল ঘুমন্ত দুটি ঠোঁটে, শ্বাসপ্রশ্বাসে কী ঝাপটা এল—সেটা অসম্ভব কোন অমর্ত ফুলের গন্ধ ভেবে সে তন্ময় হল কয়েকটি মুহূর্ত—তারপরই সুবর্ণ জেগে উঠল। জড়ানো গলায় বলল, আঃ, ফজলদা, সব সময় ইয়ারকি ভাল্লাগে না...

সনাতন ফিসফিস করে বলে ওঠে, আমি, আমি রে সুবর্ণ!

সুবর্ণ মুখটা তুলে একটু শব্দ করে হেসেছে। তারপর ওকে সামান্য আকর্ষণ করে বলেছে, আসরের অনেক দেরি। শুয়ে থাকুন, চুপচাপ।

শুল না সনাতন। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল সে। প্রাঙ্গণে হেঁটে পথের ওপর গিয়ে দাঁড়াল। কৃষ্ণপক্ষের একফালি চাঁদ ঝুলে আছে তালগাছের মাথায়। ঝমঝম করে বাজছে রাত্রিবেলাটা।

মনে মনে তেতো—ভারি, আর ক্লিষ্ট সনাতন ডাইনে ঘুরে মেলার দিকেই যাচ্ছিল। আফসোসে ছটফট করছিল সে। কী ভাবল সুবর্ণ? কেন সে এমন ইতর হয়ে পড়ল? মুখ দেখতে লজ্জা করছে সুবর্ণকে।

সামনের বটগাছের নিচে কারা বসে রয়েছে। সনাতনকে দেখেই ডেকেছে, মাস্টারজী! আরে আসুন, আসুন।

ফজল, আনিস আর কাদির। সনাতন দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। মদ খাচ্ছে ওরা। তারপর হঠাৎ সনাতন বসে পড়ে। ফিসফিস করে চাপা উত্তেজনায় বলে, দাও—একটু ফুর্তি করা যাক।

আনিস বলে, বাঁচলাম দাদা। সবাই লেজ কাটলাম—তা নাহলে খুব খারাপ লাগত। কিন্তু, আপনি খান—তা অ্যাদ্দিন বলেন নি তো! আমরা তো প্রায়ই খাই।...

সনাতন এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে গুনগুনিয়ে উঠল,

আজ, কী আনন্দ দেখলাম রে নভে নবীন চাঁদের উদয়।
মায়ায় মায়ায় জন্ম যাক না, যদি আরেক জন্মে সত্যি হয়।।

ওরা লাফিয়ে উঠল, বাহবা ওস্তাদ, বাহবা!

তারপর ঠিক কী কী ঘটেছে, মনে পড়ে না সনাতনের। অনভ্যাসের ফলে—একটু বেশি খেয়ে ফেলেছিল ওস্তাদী ঝোঁকে—এখন খুব খারাপ লাগে। কষ্ট হয়। মুখ তুলে ফ্যালফেলে চোখে চারপাশে তাকায়। আসরে বসে আছে সে। যন্ত্রগুলো বাজছে। ওপাশে বুঝি বিপক্ষ দল। কার দল, মনে পড়ল না তার। সুবর্ণ এখন নারীবেশী। আসরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাহলে যন্ত্রের মত নিজের দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে। কারণ, এখনও বাঁশিটা তার কোলে রয়েছে। ...ফের ঘুম পেল তার। কুঁকড়ে অপরিসর জায়গায় শুল সে। কে বলল, শরীর ঠিক হয়নি এখনও?

ঘুম ভাঙল গানের আওয়াজে। কী কাপের গান ধরেছে ওস্তাদ ঝাঁকসা। শেষ রাতের আসরে আবিষ্ট শ্রোতা চারদিকে—সনাতনের কানে আশ্চর্য প্রতিধ্বনি আসে, পালাটা তখন তার অপরিচিত, পূর্বাপর কিছুই জানে না—শুধু মনে হয়, একটা কিছু ভয়ঙ্কর ঘটে গেছে কারো জীবনে, সেই মহাকাশের সাগর উথলে উঠেছে চারপাশে, সনাতন হুড়মুড় করে উঠে বসল।

জোর জমে গেছে কাপটা। মাথার চুল ছিঁড়বার ভান করে ওস্তাদ ঝাঁকসা বিলাপ করছে কার জন্যে।

সুবর্ণ হাঁটু দুমড়ে বসে আছে হারমোনিয়ামের সামনে। ফিসফিস করে বলে, নেশা ছুটল? সুবর্ণর চোখে ভর্ৎসনার কুঞ্চন। ছিঃ, ওই খায় নাকি মানুষ! কতক্ষণ মাথায় জল ঢেলে তবে সুস্থ হয়ে ঘুমোলেন! ক্ষিদে পায়নি? থামুন, আমরা বসলে ওরা উঠবে—তখন গিয়ে খেয়ে আসবেন। খাবার রেখে দিয়েছে আপনার।

সনাতন হাসে। মনে পড়ছে এবার। কখন ঝোঁকে আসরে চলে এসেছিল হুড়মুড় করে। হ্যাঁ, সব মনে পড়ছে। সে বলে, বিপক্ষে কে যেন সুবর্ণ?

...বিপক্ষ দল এই এলাকারই। নলহাটির মনকির ওস্তাদ। ওই যে বসে আছে, গলায় লাল মাফলার, জহরকোট আর শার্ট গায়ে—দেখছেন? ছিপছিপে, পাতলা চেহারা? ...সুবর্ণ দেখায়। তারপর মন্তব্য করে, মন্দ নয়। ওর গানের সুর আলাদা! কথাও অন্যরকম। ছোকরা গাইবে, শুনবেন। অবশ্যি আপনার মত 'আধুনিক রীতি' ও জানে না। ...সুবর্ণ হেসে ওঠে।

সনাতন বলে, খাবো না কিছু।

হঠাৎ ফজল ঝুঁকে আসে তার কানের কাছে। বলে, জুবেদাবিবির কাপ দিচ্ছে। এবার আপনি উঠুন। ইসা পয়গম্বর সেজে উঠুন। বলুন, কাঁদিওনা বাদশা, তুমি যা চাইছ—তাই হবে। তোমার আদ্ধেক আয়ুর বদলে তোমার বেগমের প্রাণ ফিরে পাবে। কবরে হাত দিয়ে বলো, আমার আদ্ধেক আয়ু তোমাকে দিলাম...দিলাম...দিলাম।

সনাতন হাঁ করেছে। বলে কী? আগামাথা জানা নেই। সে ইতস্তত করে।

ফজল ধমকায়, উঁহু। আপনার রাজপুরুষ চেহারা—আপনাকেই উঠতে হবে। আগামাথা জানবার দরকার নেই। উঠেই দেখবেন—সব ঠিক হয়ে যাবে। ওস্তাদজী যা বলার আপনাকে বলিয়ে নেবে। ...ব্যস, হ্যাঁ—উঠুন!

এরই নাম আলকাপ। সনাতন টের পায়। পরক্ষণে সে ফজলের চিমটি খেয়ে উঠে দাঁড়ায়। মুহূর্তে মাথায় খেলে যায় তার—সেও তো সমর্থ ওস্তাদ, গান বাঁধতে পারে, পাল্লা তৈরিও হয়ত করতে পারে—অভিনয়েও সে পটু, কথার পিঠে কথা জুড়তেও সে সক্ষম—তাহলে তার ঝিঝিডাঙা আসরে এই প্রথম উদয়টুকু শ্রোতার মধ্যে উজ্জ্বল হবে না কেন? সনাতন ধাঁ করে ধুয়ো বেঁধে নেয়—তান দিয়ে আসরকে উচ্চকিত করে তোলে সে, মদ খেলে নাকি গলা ভালো খুলে যায়...সে গায়,

হেথা—বাদশা ফকির সবায় সমান
হিন্দুরা শ্মশান বলে, মুসলমানে গোরস্থান।।
আবার—এইখানেতে যিনি খোদা
সেইখানেতেই ভগবান।।

সনাতন বায় ভেবে বলে
মুদলে চক্ষু যাব চলে
হিন্দু ভাইরা বলুন হরি, আল্লা বলুন মুসলমান।।

অমনি যথারীতি চারপাশে একই সঙ্গে হরিবোল আর আল্লাবোল মিলেমিশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল কিছুক্ষণ। আলকেপে রীতিতে কথায় বলে সনাতন, তবে—এ ভীষণ গোরস্থানে আমার উদয়, মনে বড় চিন্তা হয়, কে হারাল প্রিয়জন, না জানি কী অমূল্যরতন, তারে দিতে আশা, আমি পয়গম্বর ইসা...সুনিপুণ অনভ্যস্ত মিল দিয়ে ওস্তাদ ঝাঁকসার মত বলতে চেষ্টা করে সে। আর ওস্তাদ ঝাঁকসা টেরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটে মৃদু হাসি। কাছাকাছি হতেই সে ফিসফিসিয়ে ওঠে, বাঃ মাস্টার! ভাল।

অর্ধেক আয়ুর বললে বেগমের প্রাণ ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দেয় শ্রোতারা। কে কেঁদে ওঠে বিশ্রী শব্দ করে। কে ফ্যাঁচ করে নাক ঝাড়ে। কে বলে, আহা হা গো।

সুবর্ণ—জুবেদা বেগম যেন ঘুম থেকে চোখ খোলে, চারপাশে শরীর ঘোরায় নাচের ভঙ্গীতে। দুটো বাহুর ওপর আলো খেলে। লাল ঝকমকে ব্লাউজ। হাতে চুড়ি—চুড়ি বাজে। কানের দুলে আলো। শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে—দেহের ভাঁজে ভাঁজে আলো খেলে। লাল ঠোঁট ঈষৎ কাঁপে। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত—চোখে তুলনাবিহীন দৃষ্টি। মায়া জীবন্ত হচ্ছিল ক্রমশ। ...আঃ, কোথায় আমি ঘুমিয়েছিলাম। কেন? সে বলে ওঠে অপরূপ কণ্ঠস্বরে...

সনাতনের কানের কাছে ওস্তাদজী বলে, বসে পড়ুন। কাজ শেষ। সনাতন মোহগ্রস্ত যেন। হঠাৎ আলকেপে রীতিতে ওস্তাদজী শ্রোতার দিকে বলে, কেমন লোক দেখুন...প্যাট প্যাট করে আমার বেগমকে দেখছে। এবার আসেন মিয়াসাব, আমার বিবি নিয়ে এখন ঘর যাই!...

হাসির ঝড়ে বিস্রস্ত হয়ে সনাতন বসে পড়েছে।

সকালে তখনও আসর চলেছে। দুপুর অব্দি চলবে। কে একজন আসরে এসে সনাতনকে বলে যায়, বাইরে আসুন—একটি মেয়ে আপনাকে ডাকছে।

মেয়ে? সনাতন অবাক। বাইরে গিয়ে সে দেখে, মনোহারী দোকানের সামনে একটি মেয়ে তার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাছে যেতেই সে বলে ওঠে, চিনতে পারছ তো? আমি সুধা।

সুধা! কয়েকমুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে সনাতন। তারপর হেসে ওঠে। ...আরে কী মুশকিল! তোমায় চেনাই যায় না যে! এত বড় হয়েছ তুমি! ইস আমি ভাবছি—কে রে বাবা!

সুধা ভুরু কুঁচকে হাসে। হাতে একগাদা পাঁপরভাজা। ঠোঁটের কোণে তেলের ছোপ। আঁচলে ঠোঁটটা মুছে নেয় সে। বলে, তুমি। সেই কখন থেকে দেখছি—অত চেনা মানুষ, চেনা গলা! অথচ তুমি যে আলকেপেদের দলে ঢুকেছ, তা কেমন করে জানব বাপু! আর কিছু পেলে না—এই মিঙ্গেনাচানো! যাও।

সনাতন সুধাকে দেখতে থাকে। বেশ দামী ঝকমকে শাড়ি জামা পরেছে সুধা, গলায় হার, হাতে রুলি, কানে পাশা, সবই সোনার—আলতা পরা পায়ে স্যান্ডেল। শ্রী খুলেছে মুখের। সুধা তো অমন স্বাস্থ্যবতী ছিল না কোনদিন। রোগা হাল্কা গড়ন ছিল ওর। কী মোটা হয়েছে সে তুলনায়। সনাতন দেখতে দেখতে ওর কথার জবাব দেয়, তা তুমিও তো মিঙ্গেনাচানো দেখতে এসেছো।

নাঃ। সুধা মাথা দোলায়। ...সেই প্রথম রাত্রে যাত্রা শুনে ঘরে গেছি। সকালে আমার দেওরপো বায়না করল, সাইকেল কিনবে...ফিক করে হাসল সে, ...সাইকেল না কী বলে জানে বাপু...ওই যে রয়েছে, চাকার মাথায় লাঠি লাগানো। দাম শুনে অস্থির। কী রে পেঁচো, কী হল? মিটল সাধ?

সুন্দর চেহারার সাত আট বছর বয়সের হাফপ্যান্ট পরা ছেলেটিকে পেঁচো বলছে শুনে সনাতন হাসে। তবে সুধাব এই অভ্যাস। সনাতন বলে, ঝিঝিডাঙ্গায় তোমার বিয়ে হয়েছে তাহলে? বাঃ। কদ্দিন?

এক বছর হবে আসছে জষ্ঠিতে। সুধা বলে। ...তুমি তখন ছিলে নাকি ভদ্রপুরে যে জানবে! শুনেছিলাম, কলকাতায় গান রেকর্ড করাতে গেছ। দেশে দেশে নাম ফুটবে এবার। তা ওমা—আলকেপেদের দলে!

ঠাট্টা কেন? সনাতন ম্লান হেসে বলে। ...কেমন আছ বল?

বড় বড় চোখ তুলে শান্তভাবে সুধা বলে, খুব ভাল। তুমি? রাত জেগে চেহারাখানা তো একেবারে হাড়গিলে করে ফেলেছ! ভদ্রপুর থেকে কবে এসেছ? দাদার সঙ্গে দেখা হয়নি? বৌদিরা কেমন আছে সব?

সনাতন বলে, আমি অনেকদিন যাই নি বাড়ি। ...আর...একটু ইতস্তত করে সে বলে, বাড়ি যে ছিল না, সে তো তুমিও দেখেছ। গেলে এর-ওর চুলোয় রাতটা কাটাতাম।

কয়েক মুহূর্তে সুধা মেলার বাইরে চোখ রাখে—দূর দিগন্তের দিকে কোথাও—তারপর উদাস চাহনিতে একটু শান্ত হাসে সে। অস্ফুট চাপা প্রশ্বাস ফেলে বলে, আমারও তো তাই। কতকটা!

কেন? তোমার দাদা আছেন—

সে কথার জবাব না দিয়ে সুধা দেওরের ছেলের দিকে হামলা করে, হ্যাঁ রে, এরই মধ্যে গাড়িখানা ভাঙবি নাকি? বাড়ি গিয়ে চালাস যত খুশি। আমার তো আবার শতেক জ্বালা—বলবে ইচ্ছে করে ভাঙা গাড়ি কিনে দিয়েছে। বললেই হল—না কী?

প্রশ্ন সনাতনকে। সনাতন বলে, জামাইদা কী করেন?

সুধা হাসতে হাসতে জবাব দেয় এবার, ছেলে ঠ্যাঙানো পণ্ডিত। তোমার বাবা যা ছিলেন!

সনাতন একটু কাসে। একটু ইতস্তত করে। তারপর বলে, ওনাকে নিয়ে গান শুনতে এসো আজ। সন্ধ্যার পরই আসর পড়বে। দেখবে খারাপ লাগবে না। আসবে তো?

সুধা জিভ কেটে বলে, তাহলেই হয়েছে! আলকাপ শুনতে এসেছি শুনলে টি টি পড়ে যাবে না চারিদিকে! তার ওপর, গাছপাথরের মতন মানুষটি—খায় দায়, ছেলে ঠ্যাঙায় আর ঘুমোয়। গানটানের দিকে ঝোঁকই নাই। যাত্রা কেত্তন হলে কারো সঙ্গে আসি—সেও খানিকক্ষণ!

সনাতন হেসে ফেলে কথার ভঙ্গীতে। বলে, তুমি কিন্তু গানের নামে একেবারে মেতে উঠতে। গোরাদার ঘরে যখন হাবুল গোঁসাইকে নিয়ে আখড়া দিতাম—

সুধা বাধা দিয়ে বলে, থাক। আর সে রামায়ণ গেয়ে লাভ নেই। এরা যদি শোনে যে পণ্ডিতের বউ গান গাইত, পষ্ট বলে বসবে, ওম্মা, এ যে খেমটাওলী গো!... সুধা হেসে ওঠে।...

সনাতন বলে, সেকি! আজকাল নাচগান না জানলে তো মেয়েদের বিয়ে হওয়াই মুশকিল।

সে তোমায় বোঝাতে পারছি না বাপু। ...সুধার মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠেছে।...বাড়ির লোকেরা সব মানুষ তো নয়, বলদ—বলদ! কী রে ভুতো, ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছিস যে? বলে দিবি নাকি? উইদ্যাখ, বলদ চরছে দীঘির পাড়ে—তাই বলছি। বুঝলি?

পেঁচো বা ভুতোর মন অবশ্য নতুন খেলাগাড়িটার দিকে বেশি। সে এদিক ওদিক ঠেলছে গাড়িটা। মাঝে মাঝে বুভুক্ষু চোখে সুধার হাতের পাঁপরগুলোর দিকে তাকাচ্ছে এই পর্যন্ত।

...তা ওই রকম সব মানুষ। ...সুধা জের টানে কথার। ...তিন বউতে যা বলে, তিনটি মানুষ তাই শুনেই বেদস্তু। বলদ নিয়ে আমার হয়েছে ঠেলা।

সনাতন বলে, তোমারটিও তাই তো?

সুধা সলজ্জ কটাক্ষ হানে। ...যাও! ইয়ারকি করো না। আমার সঙ্গে যেতে বলতাম—তাতে আবার চোখ পড়বার ভয় আছে। বরং...একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে সে বলে, এই এমনি ধরো তুমি নিজে থেকেই গেলে—কি না, গাঁয়ের মেয়ের বিয়ে হয়েছে ঝিঝিডাঙায়—ঠিকানা বলে দিচ্ছি। তুমি কিন্তু বাপু দরজায় ডেকে বলবে, ভদ্রপুর থেকে আসাছি গো, এখানে চারভেয়েদের বাড়ি বিয়ে হয়েছে, ঘোষ মাশাইদের বাড়ি... কেমন?

সনাতন বলে, বা রে! এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হল—পাড়ার কেউ নিশ্চয় দেখবে সেটা।

এ অব্দি শুনে সুধা শশব্যস্ত ঘোমটা টানল। ফের জিভ কেটে বলল, দ্যাখো, কী জ্বালা। আমি যাচ্ছি বাপু, তুমি কিন্তু এস। এতক্ষণ হয়ত ঢাক বাজতে শুরু করেছে।

বলে সে হিড়হিড় করে ছেলেটির হাত টেনে হাঁটতে লেগেছে। সনাতন দাঁড়িয়ে থাকে। ভারি অদ্ভুত এই সুধা মেয়েটি! বিয়ে হয়েও এখনও মনের দিকে বিশেষ বদলায় নি। ...পরক্ষণে সে লাফিয়ে ওঠে। ওই যা! ঠিকানা বলবে বলছিল, বলে গেল না তো! এত বড় আঠারো পাড়া গ্রাম, কাঁহাতক খুঁজে হয়রান হবে রাতজাগা শরীরে!

সনাতন দ্রুত হেঁটে সুধাকে অনুসরণ করার আগেই ভিড়ে সুধা অদৃশ্য। বিরাট মেলার প্রাঙ্গণে তাকে খুঁজে বের করা এখন সময় সাপেক্ষ। ওদিকে ফের একপাল্লা গাইতে হবে বিপক্ষদলের শেষ হলে। কিছুদূর হেঁটে ফিরে এল সনাতন। থাক, আছে তো আরো দুটো দিন—দেখা যাবেখন।

লোকের ভিড় ঠেলে আসরে ঢোকে সে। নিজের জায়গায় বসতেই সুবর্ণর দিকে চোখ পড়ে তার। সুবর্ণ ছোট্ট আয়নার সামনে ঝুঁকে মুখে পাউডার বোলাচ্ছে। দিনের আসরে হাল্কা মেক-আপে ব্যস্ত সে। সফেদার ফোঁটা দিচ্ছে কপালে গালে চিবুকে। ঠোঁটে আলতা দিয়ে ঠোঁটদুটো নেড়ে নিচ্ছে। ভুরু বা চোখের আঁকনটা ঠিকই আছে। ...দেখে নিয়ে চোখ ফেরায় সে। তারপর চোখ টিপে একটু হাসে। কেমন অশ্লীল লাগে ভঙ্গিটা।

সনাতন কিছু বলে না। বিপক্ষের মনকির ওস্তাদ ছড়া ধরেছে আসরে। গমগমে গলার আওয়াজ। ছড়ার তালে তালে কবিয়ালের মত নাচছে। ধুয়োটা বেশ সুন্দর—

মন কি মিলে রে,
মনের মানুষ না হইলে, মনের কথা না কইলে।।

সুবর্ণ ঝুঁকে আসে। ফিসফিস করে বলে, মেয়েটা কে ওস্তাদ?

সনাতন বলে, আমাদের গাঁয়ের মেয়ে। এখানে বিয়ে হয়েছে!

সুবর্ণ বলে, বাবা। মেলার মধ্যে দাঁড়িয়ে অতক্ষণ বকতে পারে মানুষ! যত হাসি তত কথা!

সনাতন অন্যমনস্কভাবে বলে, সুধা ওইরকমই।

নাম বুঝি সুধা! ...সুবর্ণ ভুরু কুঁচকে মিটিমিটি হাসে। ...অমন সুধা ছোকরা হলে কী হত ওস্তাদ? শ্রোতারা কী করত? ওস্তাদরাই বা কী করত? উঃ, সে এক মজার কাণ্ড না বেধে যেত!

খারাপ লাগে সনাতনের! বিরক্তভাবে সে বলে, ঝুমুর শুনেছ কোনদিন? ঝুমুরে মেয়ে থাকে।...

সুবর্ণ বলে, নাঃ ওস্তাদের মেজাজ এখন ভাল নেই বাবা, ইয়ারকি করব না। 'তুমি' বললেই বুঝতে পারি চালে কাঁকর আছে।

সনাতনের মনে সুধার ছবিটি তখনও স্পষ্ট। সুবর্ণর কথাগুলো সে ছবিকে আরও স্পষ্ট করেছে। তাই তো! সুধা একসময় গান শিখত হাবল গোঁসাইজীর কাছে—সনাতন ছিল গোঁসাইজীর বিনি মাইনের ছাত্র। আর সুধার দাদা দু'পাঁচটাকা সেলামী দিত সুধার জন্যে। তার পিছনে কারণ অবশ্যি একটাই ছিল—আজকাল গানটান জানা পাত্রীর পক্ষে অন্যতম গুণ। কিন্তু সুধা সত্যিসত্যি ভাল গাইতে পারত। গোঁসাইজী বলতেন, ওর ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল। আর তুই সোনা (সনাতন)—তোর ওই মেঠোগাওনা ছাড়া বরাতে কিছু নেই। শোন রে শালা, কান করে সুধা ভজনখানা গাইছে শোন। তোকে গাইতে দিলে তো তুই মাঠময় করে ছাড়বি। ...সনাতন সেই দিনগুলো ভাবছে। গুরুজী সত্যি কথাই বলতেন। সনাতন আসরের গাইয়ে—সুধার মত ঘরের গাইয়ে নয়। সুধার গান ছিল যেন তার একান্ত নিজের জন্য, সনাতন শ্রোতার কথাই ভাবত। ...সেই সুধা, ঝিঝিডাঙার কোন পণ্ডিতের বউ! ...আচ্ছা, এমন যদি হত, সুধা—সুধা আর সনাতন...।

সনাতনের মনে পুরনো কথার ভিড়। ঝড় ঢুকে ঘরের ভিতরটা বিশ্রস্ত করে ফেলেছে যেন। কলকাতা যাবার সময় সনাতন কল্পনা করেছিল, সিনেমায় চান্স হয়ে গেছে—সে নায়ক, আর নায়িকা—নাকি ভদ্রপুরের মেয়ে সুধামুখী—বাঃ, বেশ চমৎকার দৃশ্য হয় কিন্তু!

সেই সুধা। সময় সময় স্বপ্ন দেখতে সনাতন—ওইরকম দিবাস্বপ্ন। প্যান্ডেলে বসে হাজার মানুষের সামনে দ্বৈতসঙ্গীত গাইছে সে আর সুধা।

পরে একদিন সবই ছেলেমানুষী মনে হত সনাতনের। সেটা কি ভালবাসার টান? সে ছিল একটা নেহাৎ ভাবের টান! রোগা হতশ্রী একটা কিশোরী মেয়ের জন্যে ওইরকম কথা ভাবা চলে বড়জোর—রক্তেমাংসে বিন্দুমাত্র আঁচ লাগেনি কোনদিন। কোনদিন মনেও হয়নি, সুধাকে সে জড়িয়ে ধরবে বা চুমু খাবে—কিংবা আরো ঘনিষ্ঠতর কিছু। না, না। তা হয়নি কোনসময়। ...সনাতন মাথা নাড়ে।

তবে আজ এ সুধা সে সুধা নয়। দেহমনে বিস্তর ফারাক এখন। সুধার দেহটাই চোখে এল বেশি। সে মন নেই—দিন তার সেই মন, তার সে স্মৃতিকে নিয়ে পালিয়েছে পিছনে। দিন যত আসছে, সুধাকে মেরে যেন তার দেহটাই বুদ্বুদের মত মোটা করে ফেলছে।

আর, কত পাতলা ঠোঁট ছিল সুধার। কত নীরস খসখসে গাল, কোটরগত চোখ! সনাতন দেখল। পুরু হয়েছে ঠোঁটদুটো, গাল ড্যাবডেবে হয়েছে, চোখদুটো ভারি—ঝকঝক করছে নক্ষত্রের মত। হলুদ রঙ মুছে কমলা হয়েছে—রক্তের ছটা পড়ে মুখ দোলালে।

হঠাৎ নিজের উপর অসম্ভব রাগ হতে থাকে সনাতনের। নিজেকে এত দীনহীন ছন্নছড়া লাগতে থাকে।...চণ্ডাল, চণ্ডাল! হরিশচন্দ্র চণ্ডাল! কিছু নেই—কেউ---নেই। যেদিকে তাকায়, শুধু ইতর অভাজন চাষাভূষা ছোটলোকের ভিড়। সামান্য তানেই বাহবা ওঠে। তার রুক্ষমলিন শ্রীবিহীন চেহারাটা ডেলাইটের সামনে দেখে ওরা চিৎকার করে, রাজপুরুষ, রাজপুরুষ! সিনেমার ঢঙে কিছু গাইলেই ওরা বলে ওঠে, ছিনেমা ছিনেমা! ...ধুৎ ওস্তাদ ঝাঁকসা আবার ওই নিয়ে গর্ব করে! ওই নিয়ে তার জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। ধেৎ, ধেৎ!

সনাতন তা নয়! তা হতে পারে না—হওয়া উচিত নয় কদাচ। আরো বড় কিছু যে আশা করেছিল। আরো বেশি মানুষ—শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী মানুষ তাঁরা—শহরে নগরে যাঁদের বিচরণ, যাঁরা না থাকলে ওস্তাদ ঝাঁকসার ওই 'বাংলা মা'র কোন মানেই সনাতন খুঁজে পায় না। আর, এত যে চিৎকার করে মরল এই ওস্তাদটা, কজন কী বুঝল, কী তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করল? যত্তোসব!

তেতো মুখে বসে সনাতন। ইচ্ছে করে, এখুনি পালিয়ে যায় এখান থেকে। সুধার সেই ভর্ৎসনা—'মিঙ্গেনাচানো' কথাটা যেন মৌমাছির দংশনের জ্বালা দিচ্ছে এতক্ষণ।

...ওস্তাদ! রাগ করেছেন?

চমকে দ্যাখে, সুবর্ণ তার হাতটা আলগোছে নাড়াচাড়া করছে। আসরে সামিয়ানার ছায়া —একটু আগে রোদ পড়ছিল। ছায়ার মধ্যে নিস্পন্দ শব্দহীন একটা সাগর—তাতে ভেসে আছে পদ্মফুলের মত সুবর্ণর মুখটা। পুরুষ? অসম্ভব। ...মনের ভিতর মন আছে। সেই মনের গভীরতর ছায়ার কার চলাফেরা—কার ঘুম থেকে জেগে ওঠা টের পায়। সনাতন আর আস্তে আস্তে তার শরীরটা ভারি লাগে, ক্লান্ত লাগে, রাতজাগা শরীর প্রতিবারের মত কী একটা দাবি করছে। সে বুঝতে পারে দাবি মিটছে না বলে যেন এইরকম খারাপ লাগা, এই ক্লান্তি। ওস্তাদ ঝাঁকসার কথাগুলো মনে পড়ে সনাতনের।... রাত জাগার পর মানুষের শরীরে কামভাব বৃদ্ধি পায় মাস্টারজী। হুঁশিয়ার! আলকেপের বিষয়ে যত কুশ্রী কথা, যতরকম অনাছিষ্টি কেচ্ছা শোনেন—তার সত্যিমিথ্যে যতটুকুই থাক—ওদের আমি দোষ দিতে গিয়ে কতবার ভাবি!

হাতটা ছাড়িয়ে নেয় সনাতন। বলে, তাহলে মনকির ওস্তাদ পাল্লায় (প্রতিদ্বন্দ্বিতায়) টিকে গেল দেখছি! বাহাদুর!

সুবর্ণ সেকথায় কান করে না। চাপা গলায় বলে, সুধাদির জন্যে মন খারাপ করছে?

সুধাদি? কী বলে সুবর্ণটা। সনাতন না হেসে পারে না। কেন? তোর বুঝি রাগ হচ্ছে তাতে?

আমি মেয়ে নাকি যে রাগ হবে? সুবর্ণ ভ্রূভঙ্গি করে।

তবে যে বলেছিস।

মুখ দেখেই বুঝেছি। সুবর্ণ জবাব দেয়। মেয়ে নই—মেয়ের মত থাকি। পুরুষ মানুষের কত কী বুঝতে পারি। আমার সবাই মেয়ে বলে ধরে নেয় কি না!

সনাতন ধমকে ওঠে হঠাৎ। রাখ! আর ন্যাকামি ভাল্লাগে না রে!

আর সুবর্ণ আহত মনে সোজা হয়ে বসে। একটা নোটবই খুলে গান মুখস্থ করতে থাকে। ওস্তাদ ঝাঁকসার কাছে লিখে নিয়েছে গানটা। খোট্টাই বুলির গান।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে বিকেল।

শীতের আমেজ ছিল শেষ রাতে—তারপর লোকের ভিড়ে বেশ গরম গেছে। সকাল থেকে দুপুর অব্দি গরমটা বেড়েছিল। কিন্তু দীঘির জল অসম্ভব ঠাণ্ডা লাগছে। রাত জাগলে স্নানের সময় জল এরকম ঠাণ্ডা লাগে। তাই খাওয়ার পর কাছারিবাড়ির প্রাঙ্গণে রোদে জিরোচ্ছে গেনেরা।

মনকির ওস্তাদের আড্ডা গ্রামের ভিতর—মুসলমানপাড়ায়। সেখানে থেকে চলে এসেছে ছোকরা নিয়ে। ওস্তাদ ঝাঁকসার দলে আড্ডা দিতে এসেছে। নন্দর সঙ্গে জমে গেছে খুব। কারণ দুজনেই ছিলিমের ভক্ত। চোখ লাল করে মনকির গল্প জুড়েছে। সনাতনকে কী কারণে সে 'দোস্ত' বলে শুরু করেছে। সনাতনের খারাপ লাগছিল না। লোকটি বেশ সঙ্গী হবার মত। কত অভিজ্ঞতা, কত কথা জানে। পউসের মেলায় 'শান্তিনিকেতনে' গান করে এসেছে—সেই গল্প বারবার বলছে। রবীন্দ্রনাথের নামে নমস্কার করছে করযোড়ে। যাই বলুন দোস্ত, মহাকবি বেঁচি থাকলে এ গানের কদর বাড়ত। তিনি এখন গত হয়েছেন। যেসব বাবুমাশাইরা সেথা রয়েছেন, হেসি (হেসে) খুন...মনকিরের কথায় নলহাটি এলাকার টান স্পষ্ট। 'করে'কে বলে 'করি' 'ধরে'কে 'ধরি'। সনাতন একপলক ভাবল, সুধাও কি এই করে কথা বলে নাকি? লক্ষ্য করা হয়নি তো?

...তবে হ্যাঁ, দোস্ত, এই ওস্তাদ ধনঞ্জয়দা যদি সেথা যেতেন, ওনারা বুঝতেন জিনিসটে কী। আমরা—মুখে যাই বলি, ওনার কাছে তো শিশু! পাল্লায় দাঁড়িয়ে দুটো কড়া কথা না বললি শ্রোতার মন পাব না—তাই বলতি হয়, বললাম। কিন্তু হাঁ করে গিলেছি ওনার কথাগুলা। কাপ বাজেকথায় যে উড়ি যাবে, লেট হবে—তার সাধ্যি নাই বাবা। যেন হাত বাড়িঞি ধরি রেখেছেন 'নাট্যখানা'। 'পাশকপে'দের (সহঅভিনেতা) সামলে রাখছেন। নাঃ, শেখবার কত কী আছে। ...হ্যাঁ, শান্তিনিকেতনের কথা বলছিলাম। মহৎ জায়গা হে দোস্ত, পা দিলি জীবন সার্থক হয়। বুকে বল আসে। কলিযুগের মহামুনি বাল্মিকীর আশ্রম।

ওস্তাদ ঝাঁকসা ঝিমোচ্ছিল মোড়ায়। ঝিমোতে ঝিমোতে চোখ না খুলেই বলে, ও, হ্যাঁ।

...পরক্ষণে গুনগুনিয়ে ওঠে সে।

আমরা যত মাঠের কবি, কবি তুমি রাজসভার
ধন্য ধন্য বিশ্বকবি বিশ্বেরো মাঝার।।
(আমরা) ছোটলোকের ছোট কবি
বড়লোকের তুমি রবি
দশদিকে যদি করলে আলো
আমরা কেন অন্ধকার
হায় গো, আমরা কেন অন্ধকার।।

মনকির হোসেন ছুটে গিয়ে পয়ে প্রণাম করে। ...ধন্য, ধন্য ওস্তাদজী! তবে আমি হলাম ক্ষুদ্র মানুষ, ততদূর রচনাশক্তি নাই। গেয়িছিলাম বটে একখান পদ।...

(বড়) ভাবের জায়গা ভাবের ভবন শান্তিনিকেতন।।
কত মহারথী বিদ্যাপতি দিয়েছেন চরণ।।

ওস্তাদ ঝাঁকসা চোখ খোলেনি। সে বলে, ভাল, ভাল! তবে ওনারা কখনো আমাকে ডাকেন নি। ডাকলে যেতাম।

মনকির সোৎসাহে বলে, সবায় যায় সেথা। না ডাকলেও যায় মেলায়। সে এক জায়গা! ভাবের জায়গায় রসের নদী গো ওস্তাদজী। 'অবগাহনে' শান্তি আছে।

হুঁ! রাখেনজী শান্তি। ...হঠাৎ বিরক্ত ঝাঁকসা। ...মাস্টার, ওস্তাদ ঝাঁকসা বিনে আমন্ত্রণে স্বর্গের দেবরাজের সভায় যাবে না।

ফজল মনকিরের কানে কানে বলে, শান্তি কথাটা উনি সইতে পারে না। শান্তিচরণ ছিল ওনার ছোকরা—নাম শোনেন নি?

মনকির অপ্রস্তুত হেসে বলে, শুনেছি। সে তো নাকি চণ্ডিতলায় আছে। আজ সকালে আসরের বাইরে লোকে বলাবলি করছিল। চণ্ডিতলার ওদিকে মদনপুরে গোরুর হাট আছে। সেখানে গিয়েছিল গোরুর পাইকার—তারাই বেলছিল। হাটের ওদিকে দেখেছে শান্তিকে।

ফজল লাফিয়ে ওঠে, ওস্তাদজী ওস্তাদজী! শুনছেন, জী, শুনছেন?

ওস্তাদ ঝাঁকসা চোখ খুলেছে। কিন্তু বলে না কিছু। মুখ ফিরিয়ে নেয় অন্যদিকে।

সনাতন উঠে দাঁড়ায় এতক্ষণে। আড়মোড়া দিয়ে পা বাড়ায়। পাঁচিলঘেরা প্রাঙ্গণের ভাঙা গেটের কাছে যেতেই সুবর্ণ ডাকে, চলুন না, বেড়িয়ে আসি কোথাও।

সনাতন বলে, নদীর ধারে যাই। মন্দির আছে রুদ্রদেবের। শ্মশান জায়গা। অনেক সন্ন্যাসী থাকে।..

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে। হাতে হাত দুজনের। রাস্তাটা চেনা সনাতনের। দুলেবাগ্দীপাড়া ঘুরে ছোট্ট মাঠ। তারপর নদী। লোকে বেরিয়ে আসছে বাড়ি থেকে। মেয়েরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকছে। সবাই যেন চেনে সুবর্ণকে। কী সুবন্ন কোথা চললে? ...সুবর্ণ মাথা দোলায় আর হাসে।

ছোটখাটো একটা ভিড়ে আটকে পড়ে ওরা...আপনি বুঝি সুবন্নর ওস্তাদ? সব শুনেছি। ওস্তাদ ঝাঁকসুর দলে হায়ার এসেছেন আপনারা? ঝাঁকসুর ছোকরাও ভাল ছিল—তবে সুবন্নর পায়ের কাছে লাগে না। দেখবেন, সামনেবার আপনার দলের বয়না হবেই।...

জবাবে হাসি ছাড়িয়ে ওরা কোনরকমে বেরিয়ে মাঠে পড়ে। একসময় পিছন ফিরে কী দেখে নিয়ে সুবর্ণ বলে, একটা মেয়ে—মাইরি পাগল হয়ে গেছে। সক্কালে আসরে দেখেছি, দুপুরে চান করতে গেলাম, তখনও দেখি ঘুর ঘুর করছে আর হাসছে। ওই দেখুন, দাঁড়িয়ে আছে। দেখছেন?

সনাতন দেখে নিয়ে বলে, তোর প্রেমে পড়েছে।

যান! বলে সুবর্ণ ক'পা এগিয়ে যায় ...গা জ্বলে যায় শুনলে। কাছে আসুক না, গলাটা টিপে দেব।

সনাতন ফাজলেমী করে।...কেন রে? ভিড়ে যা।

সুবর্ণ কি ভান করছে? মুখটা গম্ভীর। নিঃশব্দে সামনে গটগট করে হাঁটছে। সনাতন সঙ্গ নিয়ে বলে, কেন রে শালা? পুরুষ নোস?

গাল দিলেন! সুবর্ণ কেমন হাসে।

দিলাম। সনাতন বলে। ...আমি ওস্তাদ হয়েছি—গাল দেবার অধিকার হয়নি?

দেবেন। তবে 'শালা' কেন?

কী বলব? শালী বলব? তুই কি মাগী নাকি রে সুবর্ণ?

সুবর্ণ ফুঁসে ওঠে! যান, যান! অত যদি ইয়ে, তবে রাত্তিরে 'কিস' করলেন যে বড়? তখন বুঝি মনে ছিল না?

কী করলাম? সনাতন থমকে দাঁড়ায়।

কিস, কিস! সুবর্ণ অবশ্য হাসতে হাসতে বলে একথা।

আচমকা এক চড় মেরে বসেছে সনাতন। সুবর্ণ গালে হাত চেপে মুখটা নামায়। স্থির দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ওর হাতের ওপর দিয়ে দু'ফোঁটা চেখের জল গড়িয়ে পড়ে।

সনাতন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মুখে কোন কথা নেই। তারপরই ব্যাপারটা খারাপ লাগে তার। নিজের হঠাৎ চটে ওঠার প্রতি অবাক হয়। এ তো অকল্পনীয়! সুবর্ণ—সুবর্ণকে সে নিজের হাতে ঠাট্টার

ছলে কতদিন সাবান মাখিয়ে দিয়েছে! চুল আঁচড়ে দিয়েছে—সেই সুবর্ণকে সে চড় মারা দূরের কথা, কোনদিন কটু কথা বলবে—ভাবতেও পারেনি!

মুহূর্তে হো হো করে হেসে ওঠে সে। বলে, কী রে! বড় সাধ করে ওস্তাদ বলে ডেকেছিলি যে! জানিস নে, ওস্তাদের হাতে মারও খেতে হয়! তোকে এত নাচ গান শিখিয়েছি। কোনদিন মারিনি তো—সেটা আজ উসুল করে নিলাম।

সুবর্ণ চোখ মুছে ভারি মুখে বলে, হাড়িমুদ্দোফরাসের ছেলে। মার খেতে খেতে তো এত বড় হলাম। মার খেতে কি দুঃখ লাগে ওস্তাদ? লাগে না।

বড় বড় তত্ত্ব কথা রাখ তো! আয়, একটা নতুন গান শেখাই। সনাতন ওর হাত ধরে টানে। পিঠে হাত বুলিয়ে ফের বলে, পৃথিবীতে আর কার ওপর রাগ ঝাড়ব বল? তোরা আছিস, সইবি জেনেই মারলাম একটা। না সইলে মারব না। অধিকার তো নাই কিছু।

সুবর্ণ বলে, অধিকার আছে বইকি। ওস্তাদ হয়েছেন, 'দলশিক্ষা' দিচ্ছেন নানান দলে—মারতে হবে, না মারলে—ছাত্রের জ্ঞান হয় না। তবে এ মার সে-মার তো নয়।

সনাতন বলে, নয়! খুব জানিস!

না। আপনি 'কিস' করেছেন—তার জন্যে আমি তো রাগ করিনি! সুবর্ণ বলতে থাকে। ...ওই কপাল তো ছোকরা হওয়া অব্দি জুটে গেছে। ওটুকু পাবার জন্যে দলের মধ্যে দলাদলি। ওদের বউরা আমায় দিনরাত্রির শাপমন্যি করছে—ওদের স্বামীগুলোকে আমি নষ্ট করেছি! কী ভাগ্যি আমার ওস্তাদ!

চমকে ওঠে সনাতন। ...তুই কাঁদছিস সুবর্ণ? এখনও কাঁদছিস!

...কাঁদব কেন? কে দেখবে আমার কান্না? কদিন পরে চুল কাটতে হবে, চুড়ি ভাঙতে হবে—গলা যাবে নষ্ট হয়ে, তখনই তো কাঁদবার দিন শুরু! আজ এটা সখের কান্না। বলে সুবর্ণ হাসবার চেষ্টা করে। একটু পরে আবার সে বলতে থাকে, ...ম্যানেজার বলে, ভাগ্যিস আমি ছোকরা হয়েছিলাম—তা নাহলে তো ঘুঁটে কুড়িয়ে বেড়াতাম অ্যাদ্দিন। সেটা সত্যি। কে পুছত আমায় বলুন? একদিন যখন ছোকরাগিরির নটেগাছটি মুড়োবে—তখন? না শিখলাম কোন কাজকর্ম, না শিখলাম গতরটা খাটাতে। রোদবাতাস শীতবর্ষার খোয়ার সইলাম না। পারব তখন ননীর মত গতরটা খাটাতে? একদিন যারা আমার একটুখানি ছোঁওয়া পাবার জন্যে নোটের মালা গেঁথে গলায় পরাচ্ছে আসরে...সেদিন তারা তাকিয়েও দেখবে না। তখন আমার কী হবে—সেকথা ভেবেই কাঁদছি। আজ সুবর্ণর এই ঠোঁটে যে ওস্তাদ চুমো খেল, সেদিন...।

এত কথা জানে সুবর্ণটা। সনাতন ওর মুখে হাত চাপা দেয়। বলে, থামরে সুবর্ণ, চুপ কর বাবা, হয়েছে। শোন, আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, এখনও পৈতেটা ফেলিনি, পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি যদি ততদিন জীবনে বেঁচে থাকি—

সামনে সদী। নদীর পাড়ে ঝোপঝাড়। অশ্বত্থগাছ। তার ভিতর মন্দির! মন্দিরে সন্ধ্যাবেলার আরতি শুরু হবে। খুব জাগ্রত দেবতা এই রুদ্রেশ্বর। সনাতন জানে। নানা দেশ থেকে মানত নিয়ে লোক আসে। সারাটি দিন লোকজনের ভিড় জমে থাকে।

...আমি যদি ততদিন বেঁচে থাকি—বলার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে কে বলে উঠেছে, তাই তো। তখন থেকে লক্ষ্য করছি—চেনাচেনা লাগছে, কে লোকটা!

সনাতন পিছন ফিরে চমকাল। সুধা। হাতে ভেগের থালা—সঙ্গে সেই পেঁচো বা ভূতো।

সুধা বলে, কই গেলে না যে বড়? দুপুরবেলা পথপানে হাপিত্যেস করছি—মানুষের পাত্তা নাই। ওকে বলতেই পণ্ডিতি গলায় বললে, খেতে বলেছ তো? বলো নি? ছিঃ গাঁয়ের মানুষ...তার বামুনভদ্র! ...অতশত খ্যাল ছিল না বাপু। সে কাল হবে'খন। পালাচ্ছ না তো দেশ ছেড়ে। তা, কাল কিন্তু দুপুরে খেয়ো। ...একটু ইতস্তত করে সুধা বলে, আর ও যদি যেতে চায়, সঙ্গে নিও। আমার দিব্যি সোনাদা। ...ফিকে করে হাসে সে। ...ওকে বলেটলে রাজি করিয়াছি। ও আসবে না—রাত জাগা সয় না নাকি—আমি আসব, আর বিমলি নাপতানী। বিমলির ছেলেটা ওর কাছে প্রাইভেট পড়ে—বিনি পয়সায়। বিমলির সঙ্গেই গানটান শুনতে যাই। তবে জায়েদের কথা বলবে, ওদের সব হাতেকোলে

ছেলে, সংসারের হরেক ঝঞ্ঝাট। সারাদিন গায়ে গতরে খেটে আর পারে নাকি? যেমন পড়ে, অমনি ঘুমে কাঠ। ঘরে ঘরে আমার তখন ছোটাছুটির পালা—ও মেজকি, তোমার ছেলে কাঁদছে, ও সেজকি, তোমরা যৌতন কাঁদছে—তারপর, ও ছোটকি, তোমার ইয়ে! দেওরগুলো সব বলেছিলাম না, বলদ, বলদ। বড়বউ হবার জ্বালা যে কী, হাড়ে হাড়ে বুঝছি। ...তা কাল যেও কিন্তু! এই! তুমিও যেও। কেমন? গরিব মানুষের সংসার—যা হয়, দুটি খেয়ে আসবে। দেশেদেশে রাতজেগে বেড়াচ্ছে সব—বাড়ির অন্ন তো জোটে না।...

বলে সুধা যেমন আসছিল, হনহন করে চলে গেল। সনাতন কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সুবর্ণকে বলে, শুনলি?

সুবর্ণ ঘাড় নাড়ে।

যাবি তো?

সুবর্ণ ফের ঘাড় নাড়ে।

লায়েকরা বলে গেছেন, রাত নটাতে আসর—একেবারে কাঁটায় কাঁটায়। সাড়ে আটটার মধ্যে মেলার দেবতা ৺শ্যামচাঁদের ভোগ হয়ে যাবে। ভোগারতি দেখতে বড্ড ভিড় হয়। যেন সেই ভিড় ফিরে এসেই আসবে বাদ্য যন্ত্রপাতি দেখতে পায়। তা নাহলে গোলমাল লাগিয়ে দেবে।

রাতের খাওয়া আজ লুচি বোঁদে আর একটা তরকারী। আসরে যাবার আগেই খেয়ে নিতে হবে। দোকানে বন্দোবস্ত করা আছে। তারপর যদি ক্ষিদে পায়, মুড়ির বস্তা রইল। নতুন গুড় রইল। সারারাতে তিনবার চা 'ছাপ্লাই' হবে দোকান থেকে। সকালে ফের চা-মুড়ি। আসর সকাল আটটার মধ্যে ভাঙতে হবে। কাল আবার ৺শ্যামচাঁদের স্নান অনুষ্ঠান আছে।

সুবর্ণ সাজতে বসেছে। প্রথম আসর এ দলের। তা নাহলে লোক থামানো যাবে না। ওস্তাদ ঝাঁকসা নতুন কাপ ঠিক করতে ব্যস্ত। অনিস আর সুবর্ণকে বলে দিচ্ছে ঘটনাটা। সনাতনের ভূমিকা নগণ্য। মাস্টার মানুষ—বেশি খাটতে চায় না সে।

সাজঘরে শাড়ি পরে সুবর্ণ উঠে দাঁড়িয়েছে। সনাতনকে খুঁজছে। বেরিয়েছে হয়ত। সুবর্ণ দরজার ভিড় সরিয়ে বাইরে যাচ্ছে দেখে ম্যানেজার আমির আলি বলে, একা যাসনে। সঙ্গে লোক নে। এই নন্দবাবু, সঙ্গে যাও!

নন্দ কোণে ছিলিম টানছে কাবুলের সঙ্গে। ফজল বলে, হ্যাঁ—বলা যায় না জী, একবার সুফলকে শালারা তুলে নিয়ে মাঠে পালিয়েছিল।

সবায় হাসে একথায়।

তার আগে সুবর্ণ বেরিয়ে গেছে। চাপা গলায় ডাকে সে, সোনাদা!

বারান্দার কোণ থেকে সনাতন সাড়া দেয়, আয়। ...তারপর সুবর্ণ ওর কাছে গেলে সে বলে, আজ সুধা আসরে থাকবে, সুবর্ণ। আমার বড্ড লজ্জা করছে রে! ...আকাশপাতাল ভেবে পাচ্ছি না।

অনেককালের পুরনো একতলা দালান বাড়ি। ফাটল আছে, শ্যাওলা আর আমরুলের চারা আছে দেয়ালে—কার্নিশে বটের চারাও বাড়ছে। দেখে গা ছমছম করে। ছোট্ট উঠোনে কুয়ো, শিয়রে চাঁপাগাছ। কবে একদিন বাড়বাড়ন্ত ছিল সংসারের। এখন হয়ত কোন রকমের চলে যায়। উঠোনের কোণে মরাই আছে একটা। সেও হতশ্রী—মাটির পাতলা স্তর ফেটে বেরিয়ে পড়েছে খলপাবাতা।

একান্নের সংসার। চারদিকে পায়রাখোপের মত ঘর আর টানা বারান্দা। টুটাফাটা শ্রীহীন নোংরা। বাচ্চাছেলের গুয়ে কুচ্ছিত জাঙিয়া, ভাঙাচোরা খেলনা, ছড়ানো মুড়ি, এইসব। আর থিক থিক করছে একদঙ্গল ছেলেপুলে। সুধা ফিসফিসিয়ে বলে গেছে, রাবণের গুষ্টি। বাড়ছে আর বাড়ছেই—থামবার লক্ষণ কই?

কোণের দিকে—রাস্তার ধারে যে ঘরটা, ওটা একসময় বৈঠকখানা ছিল সম্ভবত। নড়বড়ে পালিশ-ওঠা দুটো চেয়ার আর তেমনি একটা টেবিল আছে। তার ওপর একগুচ্ছের খাতাপত্র আর বই। তক্তাপোষ আছে। তক্তাপোষে মাদুর বিছিয়ে দিয়েছে অতিথির সম্মানে। সুবর্ণ পা ঝুলিয়ে বসেছে। সনাতন পা তুলে আসনপিঁড়ি হচ্ছে কখনও—কখনও পা নামিয়ে দিচ্ছে। এইখানে সুধা থাকে! ভিতর দরজা দিয়ে ভিতরের সবকিছু দেখতে পাচ্ছে সে। মাঝে মাঝে টুকরো কথাবার্তা কানে আসছে। কখনও ঝংকার টংকার, সামান্য কোলাহল। পুরুষ ও মেয়েরা কী নিয়ে কথা বলছে বা বচসা করছে। ফের সুধা এসে চাপা গলায় বলে গেছে, দিনরাত্তির চিল-শকুন উড়ছে বাড়িতে। কানের মাথা খেয়ে বসে আছি—নয়ত অ্যাদ্দিন মরে যেতাম সোনাদা!

...এই যে আপনারা, নমস্কার!

সনাতন মুখ তুলল। রোগা ঢ্যাঙা কুঁজো একটা লোক—গায়ে ফতুয়া, পরনে লুঙি, বাস্তুসাপটি যেন—নড়বড় করে ঘরে ঢুকছে। মাথায় কাঁচাপাকা অল্প চুল, একটা টিকিও আছে, গলায় তুলসী কাঠের মালা। হাতে থেলো হুঁকোটি থাকলেই ভদ্রপুরের নৃসিংহ পণ্ডিত হয়ে উঠত। সনাতনের মনে হয়।

সনাতন শশব্যস্তে সরে বসে। সুবর্ণও।

উঠে বসুন। আরাম করে বসুন ...লোকটা চেয়ারে বসে মিটিমিটি হাসে।...ভদ্রপুরের লোক এসেছে শুনে আমি কালই ভাবছিলাম, যাব নাকি। হয়ে ওঠে না মশাই—নানা কাজ। পঞ্চায়েত ব্লক—নানারকম হ্যাঙ্গামা সব। থাক গে, অনেকদিন ভদ্রপুরের কেউ আসেনি। কী ব্যাপার, বুঝতে পারছি না। রাগটাগ করলে নাকি...

সনাতন কেঠো হাসে। এত নীরস কেজো লোকের সঙ্গে কী নিয়ে বাক্যালাপ করবে বুঝতে পারে না। আর, সনাতন কিছুটা স্তম্ভিত। অমন পাখির মতন টুকটুকে মেয়েটির বিয়ে হয়েছে এই আধবুড়ো লোকটার সঙ্গে? তার ওপর, কী মুশকিল, নামটাও জানে না—এমন বিড়ম্বনায় পড়া গেল।

...আপনি তো গানের দলের লোক শুনলাম! ওটি বুঝি নাচিয়ে? বাঃ, বেশ! লোকটা খিকখিক করে হসে। ...আজকাল এদিকে আলকাপের রবরবা খুব। আমি শুনিনি মশাই, লোকে বলে। শুনি যাত্রাথিয়েটারেও অত লোক হয় না নাকি। তোমার নামটি কি খোকা?

খোকা শুনে সুবর্ণ মুখ ফিরিয়ে হাসে। সনাতন বলে, ওর নাম সুবর্ণ! ...আর আমার নাম তো শুনেছেন—

সোনাবাবু? ও সোনাদা-সোনাদা বলছিল তাই না?

সনাতন হাসি চেপে বলে, হ্যাঁ—ওরা তাই বলে! আসল নাম সনাতন—সনাতনকুমার রায়।

সনাতনকুমার রায়। বিড়বিড় করে বলে সুধার বর—যেন মুখস্থ করে নেয়। তারপর বলে, গান বাজনা খুব ভাল জিনিস। শুনলে চিত্তশুদ্ধি হয়। আজকাল আবার পাঠশালাতেও গান শেখাচ্ছে সব। বোর্ড থেকে সারকুলার এসেছে—কী কাণ্ড দেখুন! উপযুক্ত মাস্টার খুঁজছি—

সনাতন ফস করে বলে ফেলে, কেন? আপনার ঘরেই তো যোগ্য মাস্টার রয়েছে!

লোকটা সোজা হয়ে বসে। অবাক চোখে বলে, আমার ঘরে! কে?

কেন? সুধা! আরে বাবা, ও গোঁসাইজীর সেরা ছাত্রী ছিল—ভজনে মাতিয়ে দিত একেবারে! ...সনাতন ঝোঁকের বশে বলতে থাকে। জেলা কমপিটিশানে নাম দিয়েছিল—হঠাৎ গোঁসাইজী গেলেন মারা। আর সব কী হল যেন—সুধা যায়নি!

লোকটি হা হা করে বিকট হাসে। ...কী সর্বনাশ! ওরা কিছু বলেনি তো! আমার ঘরেই গেনের বাসা। ওগো, কোথায় গেলে গো! সে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে।

সুধা উঁকি মারে ... কী হল?

তুমি গাইতে জান? এরা সব কত কী বলছে তোমার নামে। এ, কী আশ্চর্য!

ফেট! বলে ভ্রূ-কুঁচকে চলে যায় সুধা। যাবার সময় সনাতনের দিকে কটাক্ষ হেনে যায়!

সুধার বর হাসতে হাসতে গম্ভীর হয়ে ওঠে হঠাৎ। কী যেন ভাবতে থাকে।

সনাতন বলে, দেখবেন , খুব ভাল শেখাবে। মাইনে পাবে নিশ্চয়। এ বাজারে—

সুধার বর নাক মুখ বাঁকিয়ে বলে, মাথা খারাপ মশাই। হেড পণ্ডিতের বউ গানের মাস্টার হবে। কী যে বলেন—তার ঠিক নাই। পল্লীগ্রামের সমাজে মুখ দেখাতে পারব তাহলে? তাছাড়া মশাই, মুখে যাই বলি—ও নেশা লক্ষ্মীছাড়া। গেনে-গুণে-কেত্তনে, এই তিনে উচ্ছন্নে—কাকপুরুষের বচনে আছে। যে গান করে যে মন্ত্রতন্ত্র গুণ করে, আর যে কীর্তন করে—

পরক্ষণে যেন নিজের বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষার কথা স্মরণ হতেই অনুচ্চস্বরে দুবার 'গউর, গউর' বলে একটু থামে। শুধরে নিয়ে বলে, অবশ্যি নাম সংকীর্তন পবিত্র জিনিস সে আমি নিজেও করি টরি।

পরিবেশটা কট্টু লাগে সনাতনের। সে সিগ্রেট প্যাকেট বের করে এগিয়ে দেয়, আসুন দাদা—

করজোড়ে নমস্কার করে সুধার বর। ...চলে না।

বাইরের পথে কে ডাকছে—সাধুপদবাবু, ও সাধুবাবু! ও পণ্ডিত, আছো হে?

তাহলে ইনিই সাধুপদ? সনাতন দ্যাখে, লোকটা হুড়মুড় করে উঠেছে। সুবর্ণর পায়ের ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে দরজার কাছ গিয়ে দাঁড়ায় সে। চৌকাটে দুই লম্বা হাত রেখে মুণ্ডুটা বাইরে বের করে দাঁড়িয়েছে। পাছার প্রায় কাছাকাছি—একটা কারে মাদুলী ঝুলছে। ...তারিণী যে! কী খবর?

পথ থেকে তারিণী নামে কেউ বলে, প্রধান মশাই যেতে বললেন। ব্লক থেকে কে এসেছে।

এসেছে। সাধুপদ লাফ দিয়ে সরে এল। ভিতরে দৌড়ল। তারপর সে নিখোঁজ। হয়ত উঠোনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে যথাস্থানে।

কতক্ষণ পরে সুধার সেই পেঁচো বা ভুতো ডাকতে আসে। ...ভেতরে আসুন। জেঠিমা ডাকছে।

দুজনে পরস্পর মুখ তাকাতাকি করে ওঠে। দুটি মুখেই হাসি নেই।

বারান্দার এককোণে থামের পাশে দুটো আসন। সুধার হাতের কাজ হয়ত—চটের আসনে নকসার কাজ করতে করতে হাঁটু দুমড়ে গান শিখতে যেত গোঁসাইজির সামনে। গোঁসাই বলতেন, ছিঁড়ে ফেলব বলছি। রাখ এখন। ...সুধা আসন ছুঁচ-সুতো গুটিয়ে হাসিমুখে বলত, নিন। হল তো?

সেই আসনে বসামাত্র খুশি হয়ে ওঠে সনাতন। সুবর্ণ একটু ইতস্তত করছিল! নিচুজাতের ছেলে—এরা তো সে খবর জানে না! সনাতন চোখ টিপে ইশারা করে, বসে পড়। সুবর্ণ আড়ষ্টভাবে বসে।

ঝকমকে কাঁসার গ্লাসে জল টলটল করছে সামনে। সুধার মনের মত ভরা। সনাতনের ভাল লাগে। প্রকাণ্ড কাঁসার থালায় ভাত, ভাজাভুজি বিস্তর, নুন, লেবু। বাটিতে ডাল। সুধা বলে, ধীরেসুস্থে খাবে কিন্তু! উনুনে চাপানো আছে এখনও।

সুধার নাকের ডগায় ঘাম, চিবুকে ঘাম, কপালে ঘামে ভেজা চুলের পোঁচ। ময়লা তাঁতের শাড়ি—আঁচলটা কোমরে জড়ানো। সকালে স্নান করেছিল—পিঠে এল চুলের ঝালর। জ্বলজ্বলে সিঁদুর সিঁথিতে, কপালে টিপ। গলার কাছে দলাপাকানো পাওডারের দাগ। হেঁট হয়ে বাটি রাখে সামনে। বলে, ছানার ডালনা। সব খেও কিন্তু। ফের দৌড়ে ওদিকে কোথায় রান্নাঘরের দিকে যায়। ধুপধুপ শব্দ তুলে ফেরে। ফের বাটি থালার ওপর। ...সুকতো আছে। আলুকফির ছ্যাঁচড়া। আস্তে আস্তে খাও। মাছের ঝোল এখনও উনুনে রয়েছে। উঃ, কত বেলা হয়ে গেল দ্যাখো তো! ফের চলে যায় কিছু আনতে। সনাতন আর সুবর্ণ পাতের দিকে ঝুঁকে পরস্পর মুখ তাকাতাকি করে। খুব আস্তে মুখে তোলে গ্রাস। সামনে এদিকে ওদিকে এক দঙ্গল ছেলেপুলে—কেউ ন্যাংটো, ছিকনিপড়া নাক, ঘেয়ো চোখ—প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে এদের খাওয়া দেখছে। আড়চোখে সনাতন দ্যাখে, ঘরের দরজার কাছে কয়েক জোড়া চোখ—শাড়ির পাড়, হাতের বালা। কোমরে রুপোর বিছেপরা ডাগর ন্যাংটো মেয়েটি—এখনও হাঁটতে শেখেনি, পাছা ঘেঁষড়ে বার বার পাতের দিকে আঙুল তুলে হানা দিচ্ছে—গী গী গী! তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ফ্রকপরা মেয়েটি। পিছনে বুঝি তার মায়ের ধমক, আঃ, ওকে নিয়ে বাইরে যা না ক্ষেন্তি। ভিতর থেকে পুরুষকণ্ঠে কে বলে, হেগেটেগে দেবে—সরিয়ে আন। ফের সুধা এসে বাটি রাখে—গরম বাটি! আঁচল দিয়ে সাবধানে মুড়ে নামায়। ফিসফিস করে বলে, যত জ্বালা তো আমার! তোমাদের কেউ আসুক এবার—শুয়ে গতর দোলাব'খন।

খেতে কেমন বাধো-বাধো লাগে সনাতনের। সামনে সুধা হাসিমুখে বসেছে এতক্ষণে। মেঝেতেই বসেছে।...

...একটুও চেনা যাচ্ছিল না, যা সাজের ঘটা। বিমলি তো তর্ক জুড়ে দিল। মল্লারপুরের ঢপের মেয়ে। আমি বলি, বা রে, আমি দিনের বেলা দেখেছি।...তা অপূর্ব নাচে কিন্তু। বাঁশির সুরে কী সুন্দর না নাচল!

কথাটা সুবর্ণকে লক্ষ্য করে। সুবর্ণর খাওয়ার ভঙ্গিতেও মেয়েলিপনা আছে। সুবর্ণ মুখ তুলে সলজ্জ হাসে। ফের মুখ নামায়। সনাতন বলে, এখন চেনা যাচ্ছে?

মাথা দোলায় সুধা।... না বলে দিলে সাধ্যি নাই। ফ্রক বা শাড়ি পরালেই পারতে! পরাও না কেন? বেশ জুটিয়েছ সব!

সনাতন বলে, তা কতক্ষণ ছিলে আসরে?

হাই তুলে সুধা জবাব দেয়, যতক্ষণ তোমাদের নাচনকোঁদন হল। আচ্ছা নাচতেও শিখছ! লজ্জা করে না?

প্রশ্ন সরল। সনাতন ঘাড় নাড়ে। বলে, এক সময় যাত্রাদলের সখী সাজতাম, জান না?

সুধা ঢলে পড়ে হাসির চোটে। মেঝেয় একটা হাত রেখে ভর সামলায়। বলে, ওমা! তাই নাকি। তখন আমার জন্মই হয়নি হয়ত!

সনাতন বলে, হয়েছিল—মনে নাই। তা সুধা, এদের কেউ তোমার সত্য পরিচয়টা জানে না দেখছি! তোমার কর্তা তো ...

জিভ কেটে চোখ টেপে সুধা।...ডালটা কেমন হয়েছে? রান্নাটান্না তেমন জানিনে তো—কোনদিন কুটো ভেঙে দুটো করিনি! বউদের সঙ্গে ওই নিয়েই তো প্রথম লেগেছিল।...তোমার নামটা কী যেন ভাই, ভুলে যাচ্ছি—

সুবর্ণ বলে, নাম জামাইবাবু নতুন রেখেছেন—খোকা! এবং তা শুনে তিনজনেই হাসে। তারপর সনাতন বলে দেয়, ওর নাম সুবর্ণ!

নামটা তো বেশ! সুধা বলে। লজ্জা করো না ভাই। খাও। কোনটা চাই বল—এনে দিচ্ছি। ওকি! সোনাদা। আর ভাত নেবে না? কী খেলে? না খেয়ে চেহারাটা কী করেছে দ্যাখো তো!

সনাতন জল খেয়ে ঢেকুর তোলে। বলে. আঃ! কতযুগ পরে মেয়েদের হাতের রান্না খেলাম। পেট তো ভরেছেই, মনটাও কম ভরল না। নাকি রে সুবর্ণ?

যাঃ, বলে সুধা উঠে যাচ্ছে। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বলে, এখানে জলের বালাই। আঁচাবে।

এক সময় ফের বাইরের ঘরে ওরা বসেছে। পেঁচো বা ভূতো পান দিয়ে গেল। তারপর সুধা আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে এল। চেয়ারে ধুপ করে বসে অস্ফুটকণ্ঠে বলল, আঃ!

তুমি খাবে কখন? জামাইদা ফেরেন নি বুঝি? সনাতন বলে।

সে কথায় কান না করে সুধা হঠাৎ বলে, কাল তোমাদের আসরে বসে থাকতে থাকতে আমার কী সব হয়ে যাচ্ছিল যেন সোনাদা! তুমি গান গাইছিলে ওর সঙ্গে—ঠিক সেই ভজনটার মত সুর—গুরুজীর প্রিয় গানটা গো—ধুর ছাই—পেটে আসছে মুখে আসছে না। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিয়ে সে বিষণ্ণ হাসে।

সনাতন বলে, কোন গানটা?

সুধা বলে, কাল রাত্তিরটা আমার যা গেছে না! সে এক অনাচ্ছিষ্টি। যতক্ষণ ছিলাম আসরে, ...উঃ কেন যে মানুষ ওসব ছাইপাঁশ শিখতে যায়! বাকি রাতটুকু আর ঘুমই এল না চোখে। শুধু এপাশ ওপাশ করেছি। কান থেকে তোমাদের সুর যাচ্ছে না, চোখ বুজলে সেই নাচকোঁদন—এখনও কানের ভিতর বাজছে। আর ওই কত্তাল-টত্তাল বাজানোটা তুলে দিতে পার না তোমার? বাব্বা! কানের পোকা মেরে দেয় এক্কেবারে।

সনাতন নিজের করতল খুঁটে বলে, আমাদের সয়ে গেছে। কত্তাল তুলে দেব কী, বরং আরও জোর

বাজালে মনে হয় তৃপ্তি পাব। আসলে এক-একটা ঝোঁক আসে, আর মনে হয় পাগলের মত যা খুশি করে ফেলি।

সুবর্ণ মন্তব্য করে, গানবাজনার নিয়মই এই।

সুধা কী ভেবে নিয়ে বলে, ঠিক। গাইতে গাইতে অমন হয়। ভগবান মানুষকে এই জিনিসটা না দিলেও পারত। ...জীবজন্তুরা গায় না—বেশ তো বেঁচে আছে!

শেষ বাক্যটা স্পষ্ট আর তীব্র ঘৃণার সঙ্গে সে উচ্চারণ করল, সনাতন আর সুবর্ণ দুজনেই তাকাল ওর দিকে।

সুধা বলে, আর করাত্তির গাইবে?

সনাতন জবাব দেয়, আজই শেষ। অবশ্যি ফের বায়না করল কিনা জানিনে। তারপর?

তারপর আর কী? চলে যাব। সুবর্ণদের গ্রামে সাঁওতাপাড়া।

সুধা অস্ফুট স্বগতোক্তির মত ফের শুধোয়, তারপর?

সনাতন আসে। ...এর কোন 'তারপর' নাই সুধা। এইরকম এদেশ ওদেশ,—রাতের পর রাত।

সুধা মুখ তুলে বলে, তোমার ভাল লাগে?

না লাগলে বেড়াচ্ছি কেন?

সুবর্ণকে লক্ষ্য করে ফের প্রশ্ন করে সুধা, তোমার?

সুবর্ণ মাথা নামিয়ে বলে, ভাল বইকি দিদি। গানবাজনা তো নিজের জন্যে নয়—পরকে শোনাবার জন্যে।

সুধা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক বলে, ঠিক বলেছ ভাই।

সনাতন ভাবছে। সুধার এই মূর্তিটার কথা ভাবছে। কাল হঠাৎ সে সুধার সঙ্গে দু-দুবার দেখা, একটু আগে যে-সুধা সামনে ভাত তরকারি পরিবেশন করছিল, সে এ-সুধা নয়। এর চেহারা ভিন্ন, কণ্ঠস্বর ভিন্ন, এর হাসিটি অন্যরকম।

...বেশি আশা করা ভাল না। দাদা সব সময় বলত কথাটা। আমিও মেনে নিয়েছিলাম, বেশি আশা মানুষকে করতে নেই—ঠকতে হয়। আশা আমি করিনি—কিন্তু ... সুধা হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলায়। ...হ্যাঁ সোনাদা, যাবে না একবার ভদ্রপুরের দিকে?

দেখি, বলে সনাতন উঠে দাঁড়ায়। ...এবার আসি তাহলে। খুব জ্বালিয়ে গেলাম।

সুধা বসে থাকে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে সনাতন। পাণ্ডুর নীরক্ত খড়িখড়ি শ্লেটে আঁকা মুখের মত মুখ সুধার। ফের সনাতন বলে, যদি কাল চলে যাই, যাবার আগে দেখা করে যাব। দাদাকে চিঠিফিটি দিতে হলে লিখে রেখ। পৌঁছে দেব যেভাবে হোক। আর ...

কী? ...সুধার স্বরটা খড়ের শব্দের মত।

আজ যদি সুযোগ পাও, যেও গান শুনতে। কাল তো তোমার ভয়ে গলা চেপে গেয়েছি। নচ্ছারামি করিনি। আসরে দাঁড়িয়ে কী মনে পড়েছিল জান? সেই যে সবসময় তুমি আমার খুঁত ধরতে—ভেংচি কাটতে ...উঃ, যা সব দিন না গেছে! তবে এ তো আলকাটাকাপের গান—যা খুশি গাইলেই হল। রাগরাগিণী তালের ব্যাকরণ নাই—ধরবার লোক নাই। আমি এখন এ মহলে সুরের রাজা সেজে বসে আছি। ...

পরক্ষণে সনাতনের কথাটা মনে পড়ে যায়—সে বলে ওঠে, ধুর ছাই, সুরের রাজা কী বলছি! গুরুজি তোমায় ঠাট্টা করে বলতেন, কী রে সুরের রাণী, হাঁ করবি না জপবি বসে বসে? বলত না সুধা?

সুধা কাঠপুতুলের মত বসে আছে। একটু হাসি ঠোঁটের কোণে—সূর্য ডোবার পর যেমন কালো মেঘের ফাঁকে ঝিলিক—রক্তের মত লাল দিগন্তটা!

সুধা, যাই। কর্তার সঙ্গে তো দেখা হল না। ওঁকেও বল। চলি কেমন?

সনাতনের পা উঠছিল না। এইরকম বসে থাকবে মেয়েটা? পাখির মত চঞ্চল, ধড়ফড়ে, এককণ্ঠে শতকথা বলা মেয়েটা এমন নীরব হয়ে পড়বে! ওর দুঃখের ঘরের দরজা সনাতন এসে খুলে দিয়ে গেল। নিজেকে অপরাধী লাগে। বুক কেমন করে ওঠে। মন বলে, ওকে সান্ত্বনা দিতে আরো দুদণ্ড বস—সেটা আর শোভন নয়।

সনাতনের হাত ধরে সুবর্ণ টেনেছে। কেন, টেনেছে, সেও জানে না। না জানে সনাতন। তবু মনে হয়, টানটা সঙ্গতই। উঁচু বারান্দা থেকে নেমে নিচের পথে যায় ওরা। পা তুলতে গিয়ে মুখ ফেরায়। সুধা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। স্থির, নির্বাক, পাণ্ডুর।

শ্বশুরবাড়িতে বাপের বাড়ির লোক দেখলে কি এইরকম হয়ে ওঠে গাঁয়ের মেয়েরা? সনাতন জানে না। শুধু সুবর্ণ বলে, আহা, মেয়েদের সত্যি বড় কষ্ট। বাপের বাড়ি ছেড়ে ভিনদেশে ঘর করা—তার ওপর এমন একটা বুড়ো বর।

সনাতন মন মনে সায় দেয়। অকারণে কার ওপর রেগে ছটফট করে সে। হাতের মুঠো শক্ত হয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে বলতে ইচ্ছে করে কাকে—আয়, সামনে আয় দেখি। পাগল! কীসব তোলপাড়া ঘটছে অকারণ। মনে হচ্ছে, কবে অলক্ষিতে—না জেনে, খুব দামি কিছু হারিয়ে গিয়েছিল, ফেলে দিয়েছিল আরও পাঁচটা বাতিল জিনিসের সঙ্গে—আজ সেটার খোঁজ পড়ে হুলস্থূল কাণ্ড বেধে গেছে। তন্নতন্ন খোঁজা হচ্ছে অন্ধিসন্ধি আনাচে কানাচে। ...

আরও কয়েক পা হেঁটে গুনগুন করে ওঠে সে, কী দিয়ে মন বুঝাব, এখন আমি কার কাছে যাব।

স্কুল-প্রাঙ্গণের কাছে হরগৌরী ফুল ফুটেছে থোকাথোকা। সুবর্ণ ফুল পাড়তে চায়। সনাতন গাইতে থাকে—আমার হৃদয় মন্দিরে, বাঁশি বাজত দিনে রাতেরে, এখন আমি কী নাম ধরে বাঁশিটি আর বাজাব।

সেদিন সন্ধ্যায় দীঘির পাড়ে একা গিয়ে চুপচাপ কতক্ষণ বসে থাকে সনাতন।

সেজেগুজে আসরে যাবার মুখে সুবর্ণ একবার প্রণাম করে যায় সনাতনকে। ওটা তার নিজের নিয়ম। আসরে ওঠবার আগে প্রণামের পালা তো আছেই।

যন্ত্রপাতি সব চলে গেছে। দলের সবাই গেছে। সনাতন প্রাঙ্গণের গেটের কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সময় পিছন থেকে কে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। চকিতে বুঝতে পেরে সে বলে, আসরে গেলি নে যে?

নিয়মটুকু বাকি আছে। বলে সুবর্ণ সামনে আসে। পায়ে ঝুঁকে প্রণাম করে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। মুখোমুখি—খুবই কাছে যে দাঁড়িয়ে থাকে। পেন্টের গন্ধে মেশা শ্বাসপ্রশ্বাসের ঝাপটাও টের পায় সনাতন। কেন অমন করে দাঁড়াল সুবর্ণ? সুবর্ণ তার দু কাঁধে হাত রাখে। গলা বেড় দিয়ে ফিসফিস করে বলে, আপনার মন খারাপ কেন গো আজ? কী হয়েছে?

আর আবিষ্ট সনাতন চুপ করে থাকে না। দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত চুমু খেয়ে বসে। রক্তে ঝড় বইতে থাকে তার। কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর যেন সম্বিত ফিরে পায়।

আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় সুবর্ণ। অস্ফুট হাসে। এঁটোমুখে আসরে পাঠাবেন আজ? পাঠান। আপনি তো ওস্তাদ—আমার আর দোষ কী। কিন্তু ঠোঁট মুছুন—লাল হয়ে গেছে না?

পকেট থেকে রুমাল বের করে হো হো হাসে সনাতন। দেশলাই জ্বালে। ঠোঁট মুছে রুমালটা পরখ করে। ঠিকই। রঙের ছোপ লেগেছিল।

হাত ধরাধরি দু'জনে জনবিরল অংশটুকু পার হয়। তারপর হাত ছেড়ে দেয়। সনাতন বলে, আজ তোকে এত ভাল লাগছে কেন রে সুবর্ণ? তোর চেহারা হঠাৎ খুলে গেছে যেন। সত্যি, আসরে আজ পাগল করে ফেলবি!

সুবর্ণ মোহিনী নটী এখন। বয়সের সীমানা পেরিয়ে কল্পান্তকালের নাগরীনটীদের সবটুকু অভিজ্ঞতা—সব আলো-অন্ধকার ওর মধ্যে চলে এসেছে এখন। আসরের সুবর্ণ কিশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে পৌছানো সেই কিছুটা বেল্লিক, কিছুটা বিষণ্ণ, কিছুটা অস্থির কিছু অমনোযোগী পুরুষটি নয়। এ এক ভিন্ন সত্তা।

সনাতন বলে, হ্যাঁ—আমাকেই! আমিও আজ পাগল হতে চাই রে। আজ আমার কিচ্ছু ভাল লাগে না!

এইসময় কানের কাছে মুখ এনে সুবর্ণ বলে ওঠে, সুধাদির জন্যে তো?

এ্যাঁ? বলে সনাতন থমকে দাঁড়ায়।

সুধাদি, সুধাদি!

জোরে বল শালা?

সু—ধা! বলে সুবর্ণ দৌড়ে ভিড়ে গিয়ে ঢোকে।

সনাতন দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। কতক্ষণ পরে কাবুল এসে ডাকে তাকে, ব্যাপার কী? আসর ধরতে পারছে না—আসুন শিগগির!

সনাতন বলে, মাথা ধরেছে বড্ড। ওস্তাদজি তো আছেন। চালাতে বল আমি পরে যাচ্ছি! ঠিক সময়ে পৌঁছব।

বাঁশির নাচ?

আজ বাদ গেলেই বা! দু'রাত দেখল লোকে। একঘেয়ে লাগবে।

কাবুল চলে যায়। সনাতন তখনও চুপ। মাথা ধরা বলতেই সত্যি সত্যি যেন মাথা ধরে উঠেছে। আর—আর বড় অশুচি লাগছে নিজেকে। বড় দীনহীন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কী গুরুতর পাপ করে ফেলেছে—এ পাপের ক্ষমা নেই। সারা শরীর ক্রমশ ভারি হয়ে আসছে কীজন্যে?

ওরা আসরে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

জয় জয় মা বাকবাদিনী কী জয়
জয় জয় বাবা শ্যামচাঁদ কী জয়
জয় জয় ওস্তাদ তানসেন কী জয়
জয় জয় ওস্তাদ ঝাঁকসা কী জয়
জয় জয় ওস্তাদ পাতু কী জয়
জয় জয় সোনাওস্তাদ কী জয়।

... সোনা ওস্তাদ! সুবর্ণর কীর্তি! সে যা বলবে, ঝোঁকের মুখে সবাই তা উচ্চারণ করবে। কিন্তু এই ভাল। সনাতন নয়, সোনা ওস্তাদ। সনাতন মরে গেছে কবে। ... এতদিন পরে সঙ্গীতগুরু হাবল গোঁসাইয়ের উদ্দেশে প্রণাম করতে সাধ যায়। পারে না—দেহ যেন অশুচি। রক্তে পাপের নৌকো বেয়ে যাবার শেষ ঢেউটি মিলিয়ে যায়নি। বড় দুঃখে সনাতন ভাবে, সুবর্ণ তাকে নরকের দরজায় পৌঁছে দিতে চলেছে ক্রমশ। আর—এখন এই বিপদের মুহূর্তে বড় দরকার কারও একজনের—যে তাকে ...

কে? অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে সনাতন। ... কে ওখানে?

অল্প আলো পড়েছে পাঁচিলের ওপর—দুটো দোকানের ফাঁক দিয়ে আসা মেলার আলো। সেখানে—মাত্র হাতদশেক তফাতে কে সামনাসামনি এগিয়ে আসছে। মুখটা অন্ধকার—পিছনে সেই আলোর ফালি। সনাতন দু'পা এগিয়ে ফের বলে, কে?

কুচমুচে পাঁপরের শব্দ। তার মধ্যে কথার বুনোন। ...কখন থেকে ভাবছি, লোকটা কে? আসরে যেতে তো দেখলাম না! সন্ধ্যাবেলাতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম—কত্তাবাবু সেই দুপুরে বেরিয়ে ফিরল তোমরা যাবার পরে। রামপুরহাট ছুটল তক্ষুণি। কাজ লেগেছে কিসের। আমার তো ছুটি এখন! দেওর-ফেওরদের কে গ্রাহ্যি করে। কই রে পেঁচো—কোথায় গেলি? ওই যাঃ, ছোঁড়াটা হারাল কোথায়? ওম্মা, কী করি এখন। ওগো, দ্যাখো, দ্যাখো একটু। আমার মাথাটা রাক্ষুসীরা চিবিয়ে খাবে যে!

সনাতন কয়েকপা এগিয়ে এদিক ওদিক দেখে ফিরে আসে। বলে, থাক। আছে কোথাও। অতবড় ছেলে—হারাবে কোথায়?

সুধা বলে, ওই দ্যাখো—সবায় এদিকে তাকাচ্ছে। অন্য কোথাও চল বাপু। চেনা লোক দেখলেই ঢিঢি পড়ে যাবে দেশে।

পাঁচিলের পাশে পাশে অন্ধকারে নিজেকে আড়াল করে হেঁটে যায় সুধা। যেতে যেতে ফের বলে, দোষ কিসের সে বিচার তো কেউ করবে না। সোনাদার সঙ্গে এমনি কত রাতে বাড়ি ফিরেছে গুরুজীর আখড়া থেকে।

সনাতন বলে, তখন তুমি কচি মেয়ে ছিলে।

সুধা একমুহূর্তে দঁড়িয়ে মন্তব্য করে, মেয়েদের বয়স বাড়ে নাকি? কই—দাঁড়াব কোথায়? চারদিকেই তো লোক আনাগোনা করছে।

সে ঘোমটা টেনে দেয় আরও। সনাতন হাসতে হাসতে বলে, লোক যেখানে নাই, সেখানে গিয়ে কেলেঙ্কারিতে পড়ব না তো?

কিসের কেলেঙ্কারি? ও ফিরবে কাল দুপুরে। তখন যদি সাতপাঁচ কথা ওঠে—সুধা অবহেলায় বলে যায়, তাহলে বিষ নাই? দড়ি নাই? আগুনেরও অভাব আছে নাকি! মিথ্যে কেলেঙ্কারি সইবার মেয়ে সুধা নয়।...

সনাতন বাঁদিকের শস্যশূন্য মাঠে নেমে পড়ে। বলে, মিথ্যে?

সুধা থমকে দাঁড়িয়েছে। কয়েক মুহূর্ত। তারপর ফিক করে হাসে। ... যাও! এমন করে বলছ যেন তুমি সোনাদা নও, অন্য কেউ।

কয়েকটা জমির পর বাঁজা ডাঙা। অন্ধকারে একলা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। শুকনো ঘাস। ঘাসের মধ্যে কাঁকর খোলামকুচি। একটা কোঙাঝোপের সামান্য তফাতে সনাতন বসে। বলে, এখানেই খানিক বসা যাক।

সুধা একটু তফাতে বসে। বসার পর পায়ের দিকে কাপড়টা ঠিক করে নেয়। নক্ষত্রের আলো কিংবা কিছুক্ষণ অন্ধকারে থাকার পর দৃষ্টি স্পষ্ট হয়। এত স্পষ্ট যে কাঁকরগুলোও ঠাহর করা সহজ।

সুধা বলে, তোমরা—মানে তুমি এসে আমার ঘরকন্নাটা ভণ্ডুল করে ফেলেছ সোনাদা! বুঝলে?

আমি? কেন বল তো? সনাতন সিগ্রেট বের করতে গিয়ে করে না। আলো জ্বালানো ঠিক নয় এখন। তার বুক টিপটিপ করছে।

সুধা সহজভাবে বলে, কী জানি! শুধু ভদ্রপুরের কথা মনে পড়ছে। গুরুজির কথা মনে পড়ছে। শুনেছি, গুরুজি মবার সময়ও আমার নাম করেছিলেন। ...এই। পাঁপর ভাজা খাও! এঁটো করেছি কিন্তু।

সনাতন হাত বাড়িয়ে ভেঙে নেয় খানিকটা। তারপর বলে এঁটো! আখড়ায় আমরা মুড়ি তেলেভাজা খেতাম একসঙ্গে। মনে নেই?

আছে। বলে সুধা চুপ করে থাকে।

মরুক গে সেসব পুরনো কথা। ...সনাতন হাতদুটো অকারণ ঝেড়ে সাফ করে নেয়। তোমার সংসারটা মন্দ নয়। তবে অতগুলো মানুষ বাচ্চাকাচ্চা।

সুধা ঝাঁঝাল স্বরে বলে, থাম। আমার সংসারের কথা বলবার জন্যে এমন করে আসিনি।

সনাতন কনুই ঠেস দিয়ে আদ্ধেক শুয়ে বলে, কেন এসেছ সুধা?

সুধা চুপ। কতক্ষণ চুপ। নক্ষত্র দেখছে। নাকি আকাশ দেখছে! আকাশ আর নক্ষত্র দেখলে হয়ত মনটা প্রসন্ন হয়। পৃথিবী তুচ্ছ লাগে। এরপরও কিছু থাকার বিশ্বাস মনকে হালকা করে তোলে—পাখিরা যেমন উড়ে যেতে পারে অনেকদূর। এখানে ভাল না লাগল তো অন্য কোথাও—অন্য কোনখানে। কিন্তু চারপাশে বড় স্তব্ধতা। অন্ধকার ভিজে যাচ্ছে মনে হয়। জেবড়ে যাচ্ছে সব ভিজে কাগজের লেখার মত।

সনাতন স্তব্ধতা ভেঙে ফের বলে, আমার একসময় মনে হত—এমনি একলা রাতে অন্ধকারে যখন বাঁশি বাজাতাম—মনে হত, যদি সত্যি সত্যি আকাশ থেকে পরী নেমে আসে! ... আজ বলছি সুধা—সে পরীর মুখটা অবিকল যেন তোমার মত—আজ সব স্পষ্ট মনে পড়ছে। এই সুধা শুনছ? সে কি সাধ আমার! সনাতন খিক খিক করে হাসে। তার রক্ত তোলপাড় হতে থাকে। হাত বাড়াতে সাধ যায়। পারে না। কতক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সে ডাকে, সুধা! আর হঠাৎ তার মনে হয় যেন সুধা কাঁদছে। সে তার পিঠে হাত রাখে। অস্ফুটস্বরে বলে, তুমি কাঁদছ? কেন সুধা, কেন?

সুধা আস্তে—ভিজে স্বরে বলে, চুপ কর। আজ আমাকে কাঁদতে দাও সোনাদা।

সনাতন কী করবে, ভেবে পায় না! শুধু আকাশে দেখে, নক্ষত্র দেখে। পৃথিবীর সব অন্ধকারের মধ্যে সব চেনা মুখ আর শোনা কথা হারিয়ে যেতে থাকে তার। সুধাও অচেনা হয়ে ওঠে।

আবার একটা দিন শুরু হল। কিছু পুরনো কিছু নতুন—কিন্তু যে সুর নিয়ে শুরু তা আজও বাজছে।

ওস্তাদ ঝাঁকসা সকালে গান ভাঙার পর আড্ডায় ফিরে চুপচাপ উবুড় হয়ে শুয়ে আছে। কোন কথাবার্তা নেই মুখে। ফজল কয়েকবার জিগ্যেস করতে গেছে, চড় খেয়েছে—বাপান্ত শুনেছে! ফজল বলেছে, লাও জী! সেই ঘোড়ারোগে ফের কাহিল হল লোকটা। ফজল মনমরা হয়ে রোদে বসে থেকেছে। সঙাল মানুষ। কিন্তু সুবর্ণ কাতুকুতু দিলে সেও ওস্তাদজীর মত খেঁকিয়ে উঠেছে। ...ভাল্লাগে না রে ভাই। তোদের দুনিয়া ডুবলেও হাঁটুপানি!

দুনিয়া কিসে ডুবল ওরা টের পাচ্ছিল না। ওদিকে লায়েকরা সহজে ছাড়তে রাজি নয়। আরও অন্তত তিন-চার আসর গাইয়ে তবে ছাড়বে। যাত্রা থিয়েটার আর কবিগানের বায়না দেওয়া আছে। সেও হবে সন্ধ্যাবেলার দিকে। দুপুর রাত্রি থেকে চলুক না আলকাপ। মেলায় বেচাকেনাটা বেশি হবে—লোক থাকবে। তাই দোকানদারেরা বাড়তি চাঁদা দিতে রাজি। কিন্তু ওস্তাদজী বলছে, না মশাই। আমি আর পারব না। ওরা যদি পারে তো জিগ্যেস করুন।

লায়েকপক্ষের লোকেরা ম্যানেজার আমির আলিকে নিয়ে পড়েছিল। আমির সনাতনকে ডেকেছে। সনাতন বলেছে, নিন না বায়না! আমার অমত নাই। চালিয়ে যেতে কি পারব না? খুব পারব।

আমির বলেছে, ষাট টাকা রেট। ঝাঁকসুকে তাহলে আরও বেশি দিত! সত্যি, আমার বড্ড অবাক লাগছে।

বারান্দায় যথারীতি রান্না হচ্ছে। আলুকপির ছ্যাঁচড়া, মুসুরি ডাল—ব্যস! নন্দ ছিলিম সেজে মোড়ায় বসে রয়েছে উনুনের সামনে। পাশে কাবুল। ছিলিমে আগুন দেবার মন নেই নন্দর—মনটা কটু। বারবার আড়চোখে আনাজপাতির দিকে তাকাচ্ছে আর রাগে বুকের ভিতর ধিকিধিকি ওইরকম উনুন জ্বলছে। ...শুধু ছ্যাঁচড়া আর ছ্যাঁচড়া! নিত্যি এই ছাড়া জোটে না শালাদের। এতবড় দলটা এল—একবেলাও কি মাছ-মাংস দেবার নাম আছে? হতাম যদি দলের ম্যানেজার—সোজা বলে দিতাম—হুঁঃ!

কাবুল বলে, তামুক জ্বালো মামু। নয়ত আমায় দাও। চোখে চশমা পরে বসে থাকি।

নন্দ খেঁকিয়ে ওঠে, খাব না রে তামুক। শালার দেশে তামুকেও ভেজাল দেয়।

কাবুল বলে, আবগারির মাল!

নন্দ চোখ পাকায়। ...তখন বললাম, গভর্নমেন্টের মালটুকু থাক, অমন জিনিস আর পাব না। রয়ে সয়ে খাই। তা কি না তর সইল না তোর। নে, এখন ইয়ে চোষ।

কাবুল হাত বাড়িয়ে বলে, নাও ঠাকুর—এবেলা ওই চোষ। আমি দেখছি—নদীর ধারে ঘুরে আসব একপাক। সন্ন্যাসীদের কাছে কিছু ভাল জিনিস বাগিয়ে আনব। মনকির ওস্তাদ বলছিল—খুব জমিয়ে ফেলেছে সাধুবাবাদের সঙ্গে। সে কি জিনিস মাইরি—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর রঙ বদলে দেয়।

নন্দ লোভার্ত চোখে বলে, মনকিরদার মত মানুষ হয় না রে! বুঝলি? তোদের সোনামাস্টার ছোকরার প্রেমে পড়ে আলকাপে ঢুকেছে—আর মনকির মাস্টার কি না সত্যিকার মাস্টার!

পিছন থেকে সুবর্ণ বলে ওঠে, আর তুমিও খুব সাধু হে নন্দবাবু!

নন্দ মুখ ফিরিয়ে কাঁচুমাচু হাসে। কালচে পাঁকাটি শরীরটা মোচড় দিয়ে বলে, তুই আছিস!

গেটের কাছে কালাচাঁদ খুড়োকে দেখা যায়। দু'হাত তুলে প্রায় নাচতে নাচতে দৌড়চ্ছে। সঙ্গে হোঁৎকামোটা একটা টেকো লোক! পেটে পৈতে জড়ানো। খালি গা! কালাখুড়ো চেঁচাচ্ছে, প্রসাদ, প্রসাদ! ঠাকমশাই রুদ্রদেবের প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছে গো! আজ মচ্ছব হবে! মচ্ছব!

শালপাতায় মোড়া সের দুই পাঁঠার মাংস। স্বয়ং সেবাইত মশাই নিয়ে আসছে। নন্দর হাতে দিয়ে বলে, নাও বাবারা! বাবার ভোগের জিনিস দশজনাকে বিতরণ করাই বিধি।

কাবুল সবিনয়ে বলে, আজ সকালে কতগুলো পড়েছিল বাবাঠাকুর?

লোকটা অবহেলায় জবাব দেয়, সাতটা। বলির কথা যদি বললে, তা রুদ্রদেবের এ এক লীলা গো! দিন গড়ে দশ বারোটা মানসিক তো বলি হচ্ছে।

মাংসের খবর শুনে দলের যে যেখানে ছিল দৌড়ে এসে ভিড় করেছে। ফজলও নাচছে ...সেই কবে নেশ্‌তা-তালাই গ্রামে কালীপুজোয় পাঁঠা খেয়েছি, উঃ—এখনও পেটের মধ্যে ব্যা ব্যা করে ডাকে শালা! কিন্তু রান্না করবে কে? হেঁদুর কম্ম লয় বাবা! দাও, ব্যাটা এ মোছলমানকে দাও।

আমির ফিসফিস করে, আপনি পাঁঠা খান ফজলভাই?

ফজল বলে, ঝাঁকসু কি কিছু বাদ রেখেছে খাওয়াতে হে? অজগর তো অজগর, হাতি তো হাতিই। একবার বুধিগ্রামে গান হচ্ছে। লায়েকরা কেটে পড়েছে গান করিয়ে। না টাকা, না পেটের ব্যবস্থা! ওস্তাদজী বলে, লে শালার ব্যাটারা, ওই ঢাকগুলো খেয়ে লে। ঢাকের চামড়ায় কামড় দিয়ে বসি আর কী! ঢাকীরা ঢাক তুলে লিয়ে ভোঁ দৌড়! বাপরে বাপ ...

ভিড় হাসছে হো হো করে। শেষ অব্দি দেখা গেল, সবাই যখন মাংস খাবে—তখন আলু কপির সঙ্গে মাংসটা একত্র রান্না ছাড়া উপায় নেই। এতগুলো লোক। আনিস পরামর্শ দিয়েছে, মাংসটা আগে মশলা আর দই দিয়ে কষে ফেলতে হবে। তা নয় তো, উৎকট গন্ধটা যাবে না। সে জানে। তার পাঁঠাখাওয়ার গল্পটাও সবাইকে হাসাল। সেও যে সঙাল, ফজলের চেয়ে কম কিছু নয়—এ প্রমাণ সে দিতে কসুর করল না।

সনাতন রোদ থেকে সরে পাঁচিলের কাছ শিরিষগাছের ছায়ায় বসে আছে। কাল রাতের ঘটনাটা ভাবছে।

আর এই ফাল্গুনের দিন—গাছে গাছে কচিপাতার ঝালর, সতেজ রাঢ়মাটির পৃথিবী আর আকাশ, মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে জলহাঁসের উড়ে যাওয়া নদীপারের বিলাঞ্চলে, শিরশিরে হাওয়ায় মিঠে উষ্ণতা—মনজুড়ে গান খেলে বেড়ায়। ঠোঁটে অলক্ষ্যে গুনগুনানি শুরু হয়!

আজ ফের আসর পড়বে ঝিঁঝিডাঙার মেলায়। সুধা কি আসবে আজও? মন বলে, আসবে, আসবে। প্রস্তুত হও। প্রস্তুত থেকো। ...

বারান্দায় ওস্তাদ ঝাঁকসা তখন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নে শিমুলগাছের মাথাটা জ্বলে যাচ্ছে। বাজ পড়ছে। মেঘ ডাকছে। গঙ্গা তোলপাড়। গঙ্গার জল নয়—আসর, জনকল্লোল। ঢপওয়ালি নাচছে। নাকি শান্তি? মুখটা শান্তির, দেহ ঢপওয়ালির। বাঃ রে বাঃ ঢপওয়ালি! ..দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। শরীর জ্বলে যায়। চারপাশে এত লোক! একটু আড়াল দরকার। আড়াই চাই, আড়াল! এত লোক! ওস্তাদ—ওস্তাদ—ওস্তাদজী! আঃ, কেন যে ডাকে শালার ব্যাটা শালারা!

ধুড়মুড় করে উঠে বসে ওস্তাদ ঝাঁকসা। সাবধানে কাপড় চোপড় সামলে নেয়। কাম! সর্বনেশে কামের মারমূর্তি শরীর ভিতর। রাতজাগা শরীর কামঘরে পরিণত। হয়—এ তার নিজের কথা। আর লাল চোখে সামনের লোকটাকে দেখে সে। সুবিদ পাইকার না? মদনপুরের সুবিদ হোসেন। ওস্তাদ হাসবার চেষ্টা করে। ...সুবিদভাই রে! কখন আইলি? ভাল আছিস? কুশল তো সব? হেফাজদ্দি কেমন আছে?

বাঘড়ী অঞ্চলের বুলিতে সুবিদ হোসেন বলে, চণ্ডীতলার দলের বায়না দিয়ে এনু জী।

চণ্ডীতলা? নামটা কোথায় যেন শুনেছে। ওস্তাদ ঝাঁকসা স্মরণ করতে থাকে। ... চণ্ডীতলার দলের কথা শুনিনি! নতুন দল? বাঃ, ভাল ভাল!

সুবিদ মাথার পাগড়িটা খোলে—চাদর পেঁচিয়ে পাগড়ি বানানো ওর পাইকারি রীতি। হাতে ছড়ি—ওই দিয়ে গরুকে খোঁচাখুচি করে। সাদা লংক্লথের ময়লা পাঞ্জাবি—তার ভিতর ফতুয়া। কোমর খুঁজলে গেঁজের ভিতর কৌটোয় একগুচ্ছের নোটের দেখা মিলবে। সে বলে, হ্যাঁ—নতুনই বটে। তবে কি না ... কেমন রহস্যময় হেসে চুপ করে সে।

উঁ? বলে ওস্তাদ ঝাঁকসা সপ্রশ্ন তাকায়।

সুবিদ বলে, মদনপুর গোহাটের দিন—হাতেনাতে কাল মঙ্গলবার এক আসর গান দিবে পাইকারগণ। তো ফির, হামারে দায়িত্ব দিলে কি ঝাঁকসু ওস্তাদ তুমার যে চেনা লোক—সুবিদ তুমিই যাও জী। তাই গেনু ধনপতনগর। গেনু তো পেসন্নর মুখে খবর পানু, আপনি রাঢ়ে আছেন। বাপ রে বাপ, সেই রাঙামাটি-চাঁদপাড়া থেকে ঘুরতে ঘুরতে ঝিঝিডাঙা। তেবে (তবে) হামি বুলেছিনু জী—যে ঠিঞে (যেস্থানে) থাকেন উনি, ঢুঁড়ে বার করবই। ..লেন জী, বায়না লেন।

দশটাকার নোট বের করে সুবিদ। ওস্তাদ ঝাঁকসা চোখ বুজে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, ফজলকে ডাকি। ...ফজল, ফজলা রে!

ফজল দৌড়ে আসে! আরে পাইকার যে! আস্‌সালামু আলাইকুম!

...আলাইকুম আস্‌সালাম। ভাল আছেন জী? সুবিদ হাত বাড়ায়।

মুসলমানি রীতিতে করমর্দনের পর ফজল বলে, বায়না? দেখেই বুঝেছি।

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, চণ্ডীতলার দলের কথা শুনেছিস ফজল?

চণ্ডীতলা! ...চণ্ডীতলা...কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে ফজল। তারপর গুম হয়ে যায়। মাথাটা ঝুলে পড়ে। মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে তার।

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, কী হল রে কাঠব্যাঙ?

ফজল নিরুত্তর। সুবিদ হোসেন চোখ পিটপিট করে হাসছে!

ওস্তাদ গর্জে ওঠে, এই শালা খবিস? বলবি তো?

ফজল মুখ তোলে। কালো—ভয়ঙ্কর রাক্ষুসে মুখ। ঠোঁট কামড়ায়। তারপর বলে, ওস্তাদজী, সেই হারামিবাচ্চা চণ্ডীতলার দলে গেছে। মনকির মাস্টার বলছিল—মনে নাই? ...পাইকার, এটা ঠিক লয় ভাই, ঠিক লয়। তুমি কুপ্রস্তাব লিয়ে এসেছ।

ওস্তাদ ঝাঁকসা চোখ বুজেছে আবার। সুবিদ। খ্যাক খ্যাক করে হাসে। ... বেশ তো জী, হুকুম দেবেন—শান্তির চুল ধরে আপনার কাছে হাজির করে দিব। লিয়ে যাবেন ধনপতনগর। কার সাধ্য আপনারঘে গায়ে হাত দেয়। একেবারে আসর থেকে তুলে লিয়ে আসব জী!

ফজল লাফিয়ে ওঠে। ...তাই! হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাই করতে হবে! যদি বশ না মানে, শালার চুল কেটে লিব ফির। ন্যাড়া করে দিব শালাকে। ... ফজল প্রতিশোধের নেশায় নেচে ওঠে।

ওস্তাদ ঝাঁকসা ধমকায়। ... চুপ বে, চুপ। হামাকে ভাবতে দে। হামি শোচ করতে লাগি। ...

ওস্তাদজী কতক্ষণ শোচ করবে। সুবিদ হোসেন ফজলকে মেলার দিকে ডেকে নিচে যায়। চা পান খাওয়াবে। পাইকার মানুষ—নগদ পয়সাকড়ির অভাব নেই ট্যাকে। যেতে যেতে ফজল সেইসব দিনগুলোর কথা ভাবছে। শান্তিকে আসরে পেলা ধরত সুবিদ পাইকার। একবার তো একগাদা নোটের মালা গেঁথে দিয়েছিল গলায়। সে রাত্রে সে দারুণ তাড়ির নেশায় মাতাল। ফের সেফটিপিনে দশ টাকার নোট গুঁজতে গেলে সঙ্গের লোকেরা তাকে পাঁজাকোলা তুলে নিয়ে গেল। .. কী কাণ্ড সব! মেয়ে তো নয়, আস্ত পুরুষ। তবু মাথাটা খারাপ হয়ে যায় অমন হিসেবি ঝানু পাইকারটার।

চায়ের দোকানে বসে সুবিদ বলে, ঝিঁঝিডাঙা আমার চেনা জায়গা। স্বরূপ মণ্ডলের সঙ্গে দোস্তি আছে। চাটা খেয়ে চলেন যাই ওনার বাড়ি। খানিক ফূর্তি করাও যাবে। মণ্ডল মাঠকোঠার ছাদে চোলাই হজম করে রাখে।

ফজল বলে, না হে পাইকার। ঝাঁকসুর মেজাজ আজ ভাল নাই। মাতাল দেখলে মেরে দম বের করে দেবে। নিজে যখন খাবে না, অন্যকেও খেতে দেবে না। বড় বেয়াড়া মানুষ হে পাইকার।

ওরা এইসব কথাবার্তা বলে। ফজলের পাশে ভিড় জমেছে ততক্ষণে। সঙাল দেখছে! দেখেই হা হা করে হাসছে। শূন্য মেলাপ্রাঙ্গণে ঘূর্ণি হাওয়ায় শালপাতা উড়ছে। একটা কুকুর দৌড়ে যাচ্ছে তার পিছনে। ফজলের চোখ পাতাতেই। ফের ঘূর্ণি এল। ফের শালপাতা উড়ল। এবার হঠাৎ ফজল উঠে কয়েক পা দৌড়ে যেতেই ওদের পেটে খিল ধরে গেছে। রামধনিয়া চানাচুরওলা পেটে হাত দিয়ে কঁকাচ্ছে। আরে বাপ! জান মার দিয়া বে, বিলকুল! ...

ঝিঝিডাঙায় এখন এগুলো সবই উৎসবের অঙ্গ। ঝিঝিডাঙায় এখন উৎসবের মরশুম। কাছারিবাড়ির প্রাঙ্গণে ইতস্তত জটলাপাকানো গেনেরা, দিনের মেলার অজস্রস্বল্প এইসব লোকজন আর ঘটনাবলী—সব নিয়ে পাড়াগেঁয়ে মানুষদের মনে কতরকম শোরগোল। কত তোলপাড়। কিছুদিন পরেই তো এখানে শ্মশানের গা ছমছমানি, কবরের নিরুপদ্রব ঘুম! এখন যে-যেখানে যে-অবস্থায় আছে, সবার মনে ওইসব দৃশ্য অবিচ্ছিন্ন চলচ্চিত্রে ভাসছে আর ভাসছে। ..

আনিস দই আনতে যাচ্ছে। সুবর্ণকে ডেকে যায়। সুবর্ণ চুপচাপ শুয়েছে ঘরে। কাদের আলি এসে বলে, সঙ্গে গেলে অনেক মিষ্টি খেতিস সুবর্ণ।

সুবর্ণ ভুরু কুঁচকে মাথা দোলায়। কাদের আলি তার পাশে শুয়ে পড়ে। ওর চুল শুঁকে বলে, বাড়ি ফিরলে ভাল হেয়ার টনিক এনে দেব বহরমপুর থেকে। কল্পনায় একটা দারুণ নাচ-গানের ছবি চলছে রে। দেখে আসবি। অনেক শিখতে পারবি।

সুবর্ণ গুনগুন করে। বশ মানবার মত নিজেকে কিছুটা কাদের আলির কাছে যেন সমর্পণ করে দেয়। তারপর বলে, সেই হিন্দি গানটা কী গো মাস্টার? ম্যায়নে ক্যা করু ...

কাদের আলি বলে, থাম। বাড়ি ফিরেই রেডিও কিনছি। কত শিখবি, শিখিস।

সুবর্ণ অবাক চোখে বলে, তোমার বাড়ি তো 'ফারাজি' (ওহাবী মুসলিম—পিউরিটান পন্থী) পাড়ায়, রেডিও বাজাতে দেবে লোকে? ভেঙে দেবে না তো?

কাদের আলি চিন্তিত মুখে জবাব দেয়, দেখা যাক।

সুবর্ণর চুড়িপরা হাতটা অকারণ নাড়াচাড়া করে সে। পায়ের দিকে 'বাহক' নফর ঘুমোচ্ছে। ইচ্ছে করেই তার গায়ের ওপর পা দুটো চাপিয়ে দেয় কাদের আলি। নফরের হুঁস নেই। সে একটু হেসে বলে, সখ আমাদের আর কতটুকু? সখ এই কুম্ভকর্ণটার! ছোঁড়া চিরদিন যন্ত্র বয়েই মল—আস্বাদন পেল না।

সুবর্ণ হাসতে হাসতে বলে, তোমরা সবাই ওইরকম।.আমিও। ...

দই কিনতে গিয়ে আনিস ফিরে আসছে। সুবর্ণ যায়নি সঙ্গে। না যাক। খচ্চরটার খুব বাড় বেড়েছে। ঠিক আছে। ফিরে গিয়ে দলের চাঁদা আর দিচ্ছে না সে। সুবর্ণর খোরাকি মাইনে যা দিতে হয়, ওরা আর সবাই দিক। আনিস দলের সঙাল—তাকে ছাড়া দল চলবে না!

সে সনাতনকে ডাকে। ... আসুন ওস্তাদ, ঘুরে আসি।

সনাতন ঝিমোচ্ছে। চোখ তুলে বলে, কোথায়?

হাত ধরে টানে আনিস। ...আসুন না ছাই! মেলায় এলাম, মেলার স্বাদ পেলাম না।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সনাতন সঙ্গে যায়। মিষ্টির দোকানে গিয়ে বেঞ্চে বসে দু'জনে। আনিস বলে, যতরকম ভাল মিষ্টি আছে, সব দুটো করে।

সনাতন লাফিয়ে ওঠে। ... আরে! না না—মিষ্টি আমার ভাল লাগে না।

কিন্তু হাতে মস্ত ঠোঙাটা এসে গেলে সে নিতে দ্বিধা করে না। নিঃশব্দে খায়। অনেকদিন মিষ্টি খায়নি—কেন খায়নি তাও ভাবে সে। পয়সার অভাব? ...তবে এটা ঠিক, বহরমপুরে ফিল্ম দেখাতে নিয়ে গিয়ে সুবর্ণকে অনেকবার সে মিষ্টি খাইয়েছে। নিজে খায়নি। কেন খায়নি? ...হাল ছেড়ে দিয়ে সনাতন রাজভোগের রস চুষতে থাকে শিশুর মত। সত্যি, জীবনে মিষ্টি খাবার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছু নেই। ...

তারপর সূর্য মাথার ওপর।

কতক্ষণ পরে রান্না শেষ হয়ে আসে। কাবুল যথারীতি ডাকাডাকি শুরু করে। হেই গেনেরা, চান করে এস। খাবার রেডি! যে যেখানে ছিল ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অনেকে তেল মাখতে বসে। ওস্তাদ ঝাঁকসা আজ স্নান করবে না। শরীর খারাপ। সুবর্ণ ব্যাগ থেকে সাবান বের করে। সাবধান জামাগেঞ্জি তুলে তক্ষুণি গামছা জড়িয়ে নেয় গায়ে। যেতে যেতে একটানে ফজল ওর গামছাটা টেনে ফেলে। সুবর্ণ দু'হাতে অকারণ বুক ঢাকে—বড় অকারণ!

নাকি তা নয়। সনাতন আড়চোখে দেখে, এই বয়সে—আশ্চর্য, পুরুষের বুক নিয়ে বিধাতার এ কী রসিকতা। সনাতন স্মরণ করে, তারও এইরকম হয়েছিল। এই নিয়ম। কিন্তু অবাক লাগে তার। ...

দীঘির পাড়ে আশ্বত্থশিরিষের মাথায় শেষ আলোর টোপর। তখন গাঁয়ের মেয়েদের জলকে আসার সময় হল। গেরুয়া ধুলো আর খড়কুটো উড়িয়ে মাঠের কোনাকুনি দৌড়ে গেল দিনের শেষ ঘূর্ণিহাওয়া। নির্জন মাঠে শেয়ালটা পায়ে শুকনো খড় জড়িয়ে বিব্রত হয়েছে। এতদূর থেকে এরা লক্ষ্য করে, ফজল চলতে চলতে হঠাৎ থেমে তার সঙ্গে রসিকতা করে নিচ্ছে। ওস্তাদ ঝাঁকসার কুঁজো হয়ে হেঁটে চলা ভারি আর মোটা হাড়ের শরীরটা উন্মূল ভাসমান গাছের মত দেখাচ্ছে। অসমতল চড়াই-উৎরাই, বাঁজাডাঙা, পিঙ্গল আদিগন্ত মাঠের পটে দুটো মানুষকে অবেলায় এমনি করে চলতে দেখে এরা কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকে। তুখোড় নন্দও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, থাকল না ওরা!

ওরা থাকল না। মনে ঝড় নিয়ে চলেছে। ঝড়ের টানে ভেসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই ওস্তাদ মানুষটাই আসলে একটা অদ্ভুত ঝড়। ওর সঙ্গে ওরা ভেসে এসেছিল। আটকে রইল। এদেরও বড় খারাপ লাগছে। যেন ভাঙা শূন্য করে কোন বাবুমশাইরা কেটে তুলে নিয়ে গেলেন প্রকাণ্ড বট। এত একলা লাগছে। এত অসহায়। যতক্ষণ কাছে ছিল, মনটা ছিল ভরে। মাথার ওপর কঠিন আড়াল ছিল। এখন বুঝি দুঃসময় এসে গেল। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আর চাপা স্বগতোক্তি করে আমির আলি বলে, তৈরি হও ভাইবন্ধুরা!

কালাখুড়োও চুপি চুপি সুবর্ণকে শুধোচ্ছে, এরা কিছু অসম্মান করেনি তো ওনার? ঠিক জানিস বাছা?

সুবর্ণ উদাস চাউনিতে শুধু মাথা দোলাচ্ছে।

কাবুল বলে, কী বলব গো! আমার চোখ ফেটে জল আসছে। আহা-হা, কী মানুষ! এমন হয় না—এমন দেখি নাই সংসারে। আজ যেন বাবাহারা হলাম। কাছে যতক্ষণ ছিল চিনতে পারিনি গো।

কাদের আলিও আনমনা। সে ম্লান হাসছে। বলছে, পিঠে বয়ে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গেল। শ্বেতহস্তী—শ্বেতহস্তী!

আমি বলে, হুঁ। পঁচিশ টাকার 'পয়ান' (দর) বেড়ে হল ষাট। ...আমি টাকার হিসেবেই ব্যাপারটা দেখছে বলে সবার খারাপ লাগে।

দীঘির পাড় থেকে বিদায় দিতে আসা দলের সবাই চলে গেল আড্ডার দিকে। সনাতন কাটা তালগাছের মুড়োয় বসে ছিল। সে বসে থাকল। আর সুবর্ণ গেল না। সুবর্ণ পাশে এসে হেলান দিয়েছে।

সনাতন বলে, ওস্তাদজী কেন গেল, জানিস সুবর্ণ?

সুবর্ণ জবাব দেয়, হুঁ। ফজলদা বলছিল, ওনার সেই পালানী ছোকরাটার বিপক্ষে বায়না। ধনপতনগর যাবে। নিজের সেট জুটিয়ে পাল্লা দেবে।

কিন্তু আমাদের তো বলতে পারত রে! তুই ছিলি—শান্তিটান্তি ফুঁয়ে উড়ে যেত। জব্দ হত।

সুবর্ণ অকারণ ঝাঁঝালো গলায় বলে, বা রে! তাহলে আর ওনার কদর রইল কী? আপনারা ওস্তাদজী চেনেন নি—আমি চিনেছি। লোকে বলবে, ঝাঁকসু ওস্তাদ সাঁওতাপাড়ার ছোকরার জোরে শান্তিকে হটালে। ফজলদা বলছিল, সেই ভানুকে নিয়েই লড়বে ওস্তাদজী!

সনাতন হাসতে হাসতে বলে, আবার এও হতে পারে—ভানু-টানুকে নিয়ে গাইলে ওঁর টাকাকড়ি বেশি থাকবে—আমাদের নিলে সেদিকে পোষাবে না। নিজের অঙ্কে কম পড়বে।

সুবর্ণ বলে, যান! আপনিও ম্যানেজারের মত। টাকা দিয়ে সব হিসেব মেলাতে চান!

মেলে না?

না। তাহলে আপনি—আপনার মত মানুষ কেন আলকাপের দলে?

আমায় তোরা কী ভাবিস বল তো সুবর্ণ?

সুবর্ণ তর্কের সুর গলায় রেখে বলে, আপনাকে আলকাপে মানায় না।

কেন মানায় না?

সে জানিনে বাপু। আপনি নিজেও বোঝেন সেটা।

তাহলে চলে যেতে বলছিস?

সুবর্ণ চমকে ওঠে। ... যান! কী কথায় কী! আপনার চেয়ে অনেক বেশিদিন এ লাইনে আছি কি না—সব জানি। এত খারাপ এত মন্দ আর কিছু নাই সংসারে। আলকাপ এক সর্বনেশে আগুন ওস্তাদ—নরক, নরক! মানুষকে দগ্ধে দগ্ধে মারে। না পারে এ নেশা ছাড়তে, না পারে এর মধ্যে শান্তিতে বাঁচতে।

সনাতন নিষ্পলক তাকায় ওর মুখের দিকে। জানি না, তুই কী সব বলছিস। বুঝতে পারছি নে সুবর্ণ।

সুবর্ণ মুখ নামিয়ে শ্লিপারের ডগা মাটিতে ঘষড়ায়। তারপর বলে, একদিন বুঝবেন।

সে রাতের আসরে মনকির ওস্তাদ নিজমূর্তি ধরেছে।

ওঠামাত্র ব্যঙ্গ আর টিকাটিপ্পনী নানারকম। ...শিশুর সঙ্গে যুদ্ধ মহারথীর। তবে এ শিশু তো অভিমন্যু নয় বন্ধুগণ। এ হল কিনা মুদ্দোফরাসবাড়ির পেঁচোয় পাওয়া ক্ষেন্তি। আর তাকে কিনা শহুরে হাওয়া লেগেছে গো! চি চি করে গান গেয়ে বলে, 'ছিনেমা, ছিনেমা!' ... আরে বাবা, আদি আলকাপ কিছু জানা আছে? ও তো নকলের নকল, তস্য নকল। ধার করে এনেছে শহরের মামুবাড়ি থেকে।

শ্রোতারা সোজা হয়ে বসে। কাঁচারঙের খেউড় শুরু হবে তাহলে। হোক।

... আমি নলহাটি-গোবিন্দপুরের মনকির হোসেন। আমি নিজে বাঁধি গান, নিজে রচনা করি কাপ, নিজের 'কবিকল্পনা' বলে বানাই আলকাপের ছড়া। ...

মনকির ওস্তাদ জোর নাচ শুরু করল তালে তালে। সেই নাচের দশায় খুলে ফেলল গায়ের কাপড়চোপড়, খালি গায়ে কাপের চরিত্র নিল। তামাটে রঙ, ফুলন্ত বুক—শীর্ণ হলেও পুষ্ট নিটোল দেহটা। গলায় চাঁদির তক্তি। ঝাকমাকড় পিঙ্গল চুল নাড়া দিয়ে বলল, তবে শোন একখানা আদি আলকাপের নাট্য। আমরা দুই ভাই। আমি ছোট, আমার বড় একজন আছে। দুইভাই বেশ ছিলাম—দুই পরের ঘরের বেটি এনে মনকষাকষি। পৃথকান্ন না হলেই নয়।

জমে গেল কাপ। পৈতৃক সম্পত্তি বলতে সামান্যই। গাঁয়ের মোড়ল ভাগবণ্টন করে দিচ্ছে। একটা তালগাছ, একটা গাইগরু একটা কাঁথা নিয়ে সমস্যা। দুজনেই ওগুলো চায়। মোড়ল বলল, তবে এক কাজ করা যাক। তালগাছের মাথা-গোড়া ভাগ হোক। কে মাথা নেবে, কে গোড়া নেবে—তাই বল।

ছোট বলল, মাথার দিকটা তো উঁচুতে। নাগাল পাব না পৈতৃক সম্পত্তির। অতএব গোড়া আমার রইল।

বড় বলল, তাই হোক। মাথা আমার।

এবার গাইগরুর বণ্টন। সামনে কে নেবে, কে নেবে পেছনটা। ছোট বলল, সামনের মাথার দিক নেব। বা রে! পৈতৃক সম্পত্তি—কাস্তে হাতে মাঠে ঘাস কাটাতে যাব। ঘাস আনব। লোকে দেখবে। শুধোলে বলব, বাপের বিষয় গাইগরু পেয়েছি। ওরা বলবে বাঃ! লোকটার কপালে গোরু জুটেছে।

বড় বলল, ঠিক আছে। আমার পেছনের দিক রইল।

তারপর কাঁথা বণ্টন। দিনে একজন, রাত্রে অন্যজন। দিনে কে নেবে? ছোট নেবে। বাপের বিষয়—লোক দেখবে। কাঁথাগায়ে শোবে মাগ-মরদে দরজার সামনে। সবাই বলবে, দ্যাখ, দ্যাখ!

গবির গেরস্থ সংসারে আরও কত কী টুকরোটাকরা আছে। ছোট সবিক্রমে গান জুড়ে দিল,

বেঁটে দে দাদা, ছাতা,
ওরে বেঁটে দে মোরে ছাতা—
বিষয়ের ভাগ লিব রে দাদা
ময়দা-পেষা জাঁতা।।

ছোট কিছু ছাড়তে রাজী নয়! চেঁচিয়ে ওঠে মুহুর্মুহু—

বেঁটে দে দাদা, হুঁকো
ওরে বেঁটে দে মোরে হুঁকো—
বিষয়ের ভাগ লিব রে দাদা
ছাগল বাঁধা খুঁটো।।

ছাগলটা অবশ্য নেই। খুঁটো আছে। তারও ভাগ চাই। বণ্টন শেষ হলে মজার কাণ্ড বাধল। বর্ষায় তাল পেকেছে। বড় পেয়েছে ডগা। সব তাল তার। তালপিঠে খায়, তালবড়া খায়। ছোট পস্তায়। গরু দুধ দিচ্ছে। বড় পিছনের মালিক। সে দুধ খায়। ছোট হাঁ করে দ্যাখে। শীত পড়েছে। ছোট সারারাত শীতে কষ্ট পায়, বড় আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। তবে চল সেই মোড়েলের কাছে। বুদ্ধিশলা নেওয়া যাক। বুদ্ধিশলা মিলল। ব্যস, এবার চূড়ান্ত নাটক। ছোট কুড়োল এনে তালগাছের গোড়া কাটতে যায়—বড় হাঁ হাঁ করে ওঠে। উপায় নেই। ছোটর নীচের দিকটা—যা খুশি করতে পারে। বড় দুধ দুইতে বসলে ছোট গোরুর মুখে বাড়ি মারে। গোরু ঠ্যাঙ তুলে লাফায়। কাঁথাটা দিনের দিকে ছোট জলে চুবিয়ে রাখে—রাত্রে বড় ভিজে কাঁথা নিয়ে বিপাকে পড়ে যায়। অতএব?

ফের দুই ভাই একান্ন হল। ঠাঁই ঠাঁই হতে নাই—গরিবের সংসার। জোট বেঁধে থাকো। মনে মিল রাখো। নৈলে কেউ বাঁচতে পারবে না বাবাসকল।...

প্রথম পালা সাঁওতাপাড়া, গান জমাতে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছিল। তুখোড় ঘরোয়া আটপৌরে কথায় তৈরি কাপের বিপক্ষে 'আধুনিক কাপ' যেন কোণঠাসা। রাজা-রাজকন্যা জমে না, ফিল্মের ঘটনা থেকে তৈরি 'সামাজিক' কাপ সনাতনের—লোকে বলছে, স্বদেশী যাত্রা ভাল্লাগে না বাবু, খাঁটি আলকাপই হোক আজ। আশ্চর্য! সনাতনকে আশ্চর্য লাগে। কাল রাতে ওস্তাদ ঝাঁকসা আসরে ছিল। কতক্ষণ ধরে করুণ রসের নানান পালা গেয়েছে—স্তব্ধ হয়ে শুনেছ সবাই। কী যাদু ছিল ওস্তাদজীর কাছে?

দ্বিতীয় পালা পেয়ে মনকির ওস্তাদ শুরু করল 'নুনচুরির' কাপ। গরিব দুই মাগ-মরদ। পান্তা আছে ঘরে, নুন নেই। দুজনে গেছে মোড়লের বাড়ি নুন চাইতে। এত কৃপণ মোড়ল—এককণা নুন দেবে না। অতএব দুজনের পরামর্শ চুপিচুপি। বউকে পেটাতে পেটাতে দৌড়চ্ছে লোকটা! বউ দৌড়ে সেই মোড়লবাড়ি ঢুকল। মোড়ল দুজনকেই থামাতে চায়—আটকাতে পারে না। বউর চলে মুখ, ওর চলে হাত। ফের জোর তাড়া খেয়ে বউ ঢুকেছে মোডলের ঘরে। মোড়ল দরজায় দাঁড়িয়ে আটকায়।—থাম বাপু, থামদিক। খুব হয়েছে। মরে যাবে যে। লোকটা বলে, না, ওকে খুন করব। পথ ছাড়ো।

ভিতর থেকে গাল দেয় বউ, রক্তের ব্যাটা শক্ত!

মরদটা বুঝেছে, কী বলতে চায় বউ। নুন জমে শক্ত হয়ে আছে। সে পাল্টা গাল দেয়, উঁটের বেটি খুঁটে!

বউটিও বুঝেছে। স্বামী তাকে বলছে, নুন শক্ত হোক খুঁটে তোল। সে গাল দেয়, আটাব ব্যাটা ফাটা।

অর্থাৎ, কাপড় যে ছেঁড়াফাটা। নুন পড়ে যাচ্ছে। পুরুষটি বলে, অবলের বেটি ডবল।

তার মানে কাপড়টা ডবল কর। মোড়ল বলে, কী আপদ! মুখ যে কারও থামছে না রে বাবা! কেমন করে মিটিবে ঝগড়া? বাবা, তুই একবার থাম না, থেমে দ্যাখ।

পুরুষটি বলে, বেশ। থামলাম। ভিতর থেকে মেয়েটিও বলে, আমিও তবে থামলাম।

নুন চুরি করে দুজনে চলে গেল।......

এইসব 'কাপে' মনকির এস্তাদ শেষরাত্রির আসরটা চাঙ্গা করে তুলেছে। সনাতন সুবর্ণর দিকে তাকায়। সুবর্ণ বলে, ওরা তাই করুক। আমরা আরও স্বদেশী করি। সকালের আসর আমরা পাচ্ছি। তখন অনেক শিক্ষিত মানুষ এসে ভিড় করবে। সমঝদার পাবো।

সূর্য ওঠার মুহূর্তে এদের পালা শুরু। রীতি অনুসারে প্রথমে ওঠবার কথা ছোকরার। উঠল সনাতন নিজে। কোনদিন যা করবে না ভেবেছিল—তাই করে বসল। 'ঠেস' ধরল ছড়ায়। সরাসরি আক্রমণ।

"...গুণের কামধেনু! (আহা) গুণের কামধেনু
তোর, বলিহারি যাই,
পট্‌কা বাঁট দুধ মেলে না ঠ্যাঙ তুলে লাফায়।।"

রূপপুরের আসরে কালিপদ ছড়াদার আলকাপের দলে এসেছিল। সনাতনকে 'ঠেস' মেরেছিল এই ধুয়ো দিয়ে। ভারি ঝাঁঝাল—তিক্ত—তুখোড়। আসর ফেটে পড়ছে, বাঃ বাঃ!

হঠাৎ সনাতন চমকে উঠেছে। পা ওঠে না নাচে। গলা শুকনো। সুধা দাঁড়িয়ে আছে শেষপ্রান্তে। লজ্জায় মহূর্তে আড়ষ্ট হয় সনাতন। সুধা এসে দাঁড়াতেই সবটাই হাস্যকর আর ঘৃণ্য হয়ে পড়েছে। কেন এল সুধা? কেন তার সঙ্গে আবার দেখা হল? একটা গভীর হয়ে সনাতনের বুকটা কাঁপে। সুধা কী চায় তার কাছে—এতদিনে?

মধ্যরাতের আকাশে নক্ষত্র। নক্ষত্র গঙ্গার বুকের তলায় ঝিকিমিকি জ্বলছে। ঠাণ্ডা শান্ত নিশ্চুপ জল। আবছা চরের পাশে ভাঙা নৌকা কাত হয়ে আছে। নিঃঝুম এপার-ওপার পৃথিবীতে গভীর ঘুমের সময়। ধনপতনগরের ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে ফজল চেঁচিয়ে ডাকে, সুরজধনিয়া হো! হেই সূর্যধন! হো-ই-ই-ই-ই!

সাড়া পাবার কথা নয়। সূর্যধন ঘেটেল এখন গাঁজা খেয়ে কুঁড়ের ভিতর সমাধিস্থ হয়ত। জঙ্গীপুর হয়ে এলে ভাল হত। দূর দক্ষিণে আলোর ফোঁটা অগুনতি—যেন স্বপ্নের ভিতর রাজপুরী।

ওস্তাদজী ধুপ করে বসে পড়েছে বালির ওপর। ভারি ক্লান্ত! যা হয় ফজল করুক—পারে না।

ফজল বলে, চলেন জী—হেঁটেই পার হই। এককোমর বড় জোর। উঠেন!

ঝাঁকসা ওস্তাদ বিদঘুটে হাসে।...হাম নেহী শেকে বে, তু কাঁধসে বৈঠা হামকো। বৈঠাকে পার কর!

ফজলও হাসে। হামিও কেলান্ত জী। পাবব না। সাড়ে দু মণ ওজন হবে পাক্কা! ওঠেন!

ওস্তাদজী বলে, ফির ডাক না বে। ডাক, শালা ভাতিজাকো। মেরা নাম বোলকে ডাক।

ফজল চেঁচায়—তালু দিয়ে চোঙ বানিয়ে যথাসাধ্য চোঁচায়, হই সুরজধনিয়া! ওস্তাদজী আয়া বে! তেরা ঝাঁকসুভাতিজা!...

কয়েকবার ডেকে গলা ভেঙে যায় ফজলের। রাতের পর রাত চেঁচিয়ে গলায় আর রসকষ কিছু নেই। ছেৎরে যাচ্ছে ডাক। এবার ওস্তাদজী নিজেই ডাকে। ডাক তো নয়, দুপুর রাতে বাজ পড়ছে। কী অমানুষিক কণ্ঠস্বর লোকটার! সারাজীবন ফজল ওই কণ্ঠস্বর শুনছে—কোন আসরে শুনল না একটুখানি চিড় খেয়েছে বা ধরে গেছে। ঝাঁকসা ওস্তাদ ডাকে, ওবে শালার বেটা শালা সুরজ্যা! এ মেরে বহিনকা বাচ্চা!

কোন সাড়া নেই দেখে সে হুড়মুড় করে জলে নামে। কাপড় জুতো সমেত এগিয়ে যায়। ফজল অতটা পারে না। জুতো খোলে। জামা গেঞ্জি খোলে। মাথায় জড়ায়। শেষে পা বাড়াতে গিয়ে ধুতিটাও খুলে ফেলে। মাথায় পুরোটা পেঁচায়। এক হাতে জুতো জোড়া নিয়ে ন্যাংটা হয়ে নামে। ওস্তাদ ঝাঁকসা হাসে না। শুধু বলে, আবে মস্তান, গাঙমে ভি তেরা মাফিক বহৎ মস্তান জালমাছ (চিংড়ি) হ্যায়। সামাল না!

ফজল আঁতকে উঠে খালি হাতটা জলের ভিতর নাড়তে নাড়তে এগোচ্ছে। কখনো কোমর জল, কখনো হাঁটু—তারপর চর। ফের জল। কোমরের বেশি নয় এদিকে। ঘাটের সোজাসুজি গেলে বেশি হত। উঁচু পাড় সামনে। মস্তো ঢ্যাঙা গাছটার দিকে তাকিয়ে ওস্তাদ ঝাঁকসা থমকায়। ...কাঁহা আ গইলা বে ফজল!

ফজল ঠাহর করে জবাব দেয়, আপনারঘে শ্মশান।

মাটির চাঙড় আঁকড়ে দুটিতে অনেক কষ্টে পাড়ে ওঠে। ফজল দ্রুত ধুতি দিয়ে গা মুছে নেয়। কাপড় জামা পরে। হি হি করে কাঁপছে সে। তারপর ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, ঢপওয়ালীকে কাঁহা পুঁতিস বে ফজল?

মুহূর্তে ফজলের গায়ে কাঁটা দিয়েছে। সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে গেছে। দেঁতো মাংস ওঠা মুখ, একরাশ চুল, কামড়ানো স্তন—উলঙ্গ পচা দুর্গন্ধ মেয়েলী দেহটা! সে ফিসফিস করে বলে, চিনতে পারছিনে। চলেন জী, পালাই। গা বাজছে!

ওস্তাদ ঝাঁকসার কোন চঞ্চল্য নেই। পকেট থেকে কী বের করছে। বের করে সে ফজলের দিকে বাড়িয়ে দেয়—লে। রূপেয়া। একশো' থা—খরচাকা বাদ পুরা শও। লে, তেরে পঞ্চাশ আলাদা রাখিস হাম। লে!

...এত ক্যানে দিচ্ছেন জী? ফজল স্তম্ভিত। রাঢ়ে মাত্র চার রাত্রি গেয়েছে। চার আসরে তার পাওনা হয় চল্লিশ—কিন্তু যাবার আগে ত্রিশ টাকা নিয়ে বসে আছে। ফুফার কাছে দেনা ছিল—শোধ করেছে। সে হিসেবে পাওনা হয় মাত্র দশ। সে ব্যাপারটা বুঝতে চায়। ওস্তাদ কি তাকে সবসময় এমনি অগ্রিম দিয়ে আটকে রাখতে চায়! ফজলও পালিয়ে যাবে নাকি? ফজল ফের বলে, ওস্তাদজী! এত টাকা ক্যানে?

...তেরা বখশিস বে ভাতিজা। ওস্তাদ ঝাঁকসা একটু হাসে। ...শান্তিকা হিস্যাভি তেরা পাওনা। লে। গিনকে লে আচ্ছাসে।

বেশি কথা বলা সঙ্গত নয়। ফজল টাকাগুলো পকেটে রেখে বলে, আসেন!

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, যা বে, ঘর চলা যা। কাল বিহানমে আবি—ঠিক আট বাজকে! হ্যাঁ!

ফজল ইতস্তত করে। ...আপনি!

ওস্তাদ ঝাঁকসা তেড়ে যায়, মারকে তোড় দেগা মুখ—আ বে মেরা বহুকা ভাই, দর্দ দেখাতা? ভাগ শালা। ভাগ!

ফজল চলে যায়। প্রায় দৌড়ে পার হয় ঝোপ জঙ্গলগুলো। বাঁধে উঠেই সে গান ধরে—ভূতের ভয়ে মানুষ যেমন গান গায়। 'চাঁই' বোলিতে সে গায়,

সুন্দরা মুখড়াবালী বিজলী বা ধাড়িয়া
হামরে নজর লাগি যায় জী।।

'বিক্রমাদিত্য ও কুঁজো রাজা'র কাপে পিঠে কুঁজ বেঁধে ফজল ওই গান গায়। সুন্দর মুখ তাদের, চোখে বিজলীর ছটা—যেন পরী, সেই নারীদের নজর লেগেছে। কানে দেখতে গিয়ে কুঁজো রাজা হঠাৎ এই গান জুড়ে দিলে পাত্রপক্ষ তক্ষুনি থ। এ যে বদ্ধ পাগল রে বাবা!

ওস্তাদজী খিকখিক করে আপন মনে হাসে। তারপর গম্ভীর হয়। শিমুল গাছটার দিকে তাকায়। শকুন বসে আছে শূন্য শিমুল ডালে। যেন কী অসম্ভব কালো ফল ধরেছে অন্ধকার রাতের ওই গাছটাতে। ঝোপঝাড়গুলো যেন জেগে উঠে স্থির তাকাচ্ছে তার দিকে। পায়ের নিচে গঙ্গার জলে বিশাল নক্ষত্রের আকাশ যেন ঈশ্বরের মুখ হয়ে উঠেছে! টলতে টলতে গাছটার কাছে যায় সে। গুনগুনিয়ে ওঠে,

শিমুল তোর গুণের বালাই যাই
বিয়ের কাঁটা অঙ্গে গাঁথা গন্ধ মধু নাই।।

...ধুস শালা! অস্ফুটকণ্ঠে বলে চুপ করে যায় ওস্তাদ ঝাঁকসা। ঢপওয়ালী রে, তুই কার প্রেমে পড়ে পিছুপিছু এসেছিলি, এতদিনে জানা গেল। আমার মতন বুড়ো বটের কোটরে ছিল শান্তি নামে পাখির বাসা। তুই পাখিওয়ালী, পাখি ধরতে এসেছিলি!

ভিজে কাপড়ে টলতে টলতে সে হাঁটে।

সুখলতার ঘরেই যাবে এখন। গাঁয়ে ঢোকবার মুখে সুখলতার ঘর। ব্যাগের কাপড়টাও ময়লা। কাচিয়ে নিতে হবে। আর—

আর কী যেন। হঠাৎ এসেছিল কথাটা, হঠাৎ ডুবে গেল। মন যেন ওই গঙ্গার জল—মরুলা মাছের মত ঝাঁক বেড়ায় ইচ্ছেভাবনার। এই দেখি মুখ, ওই দেখি—নাই! বাঃ রে বিধাতা, চমৎকার প্রহসন! আসরে দাঁড়িয়ে এই কথাটা কতবার না বলে সে। ফের বলল অস্ফুটকণ্ঠে। স্তব্ধ কালো নির্জন গ্রামের পথে ফের ভিজে পাম্পসুর ভারি আওয়াজ উঠতে লাগল। মাথার ওপর এত রাতে উড়ে গেল বুনোহাঁসের ঝাঁক—শন শন শন শন! পদ্মার চর থেকে ওরা আনাগোনা করছে দূর উত্তর-পশ্চিমে ফরাক্কার বিলাঞ্চলে। পাথের পাশের শ্যাওড়াগাচে প্যাঁচা ডাকল একবার! ধূরে ভুট্টার ক্ষেতে শুয়ার তাড়ানো টিনের আওয়াজ হল।

...সুখবতী গে! হেই সুখিয়া! ওস্তাদ ঝাঁকসা চাপা গলায় ডাকে। খোলা উঠোন—পাটকাঠির বেড়া আছে দুদিকে। মধ্যেটা হাট করে খোলো। ছিটেবেড়ার ঘর. দরজার করাঘাত করে সে। নরম সুরে ফের ডাকে, অয়ি সুখি, মেরা বহু গে! সুখলতা!

ভিতর থেকে সদ্যজাগা অস্ফুট কণ্ঠস্বর। তারপর তীক্ষ্ণ চিলচিৎকার—কৌন রে?

...হাম গে বহু, সরকারজী। দরওয়াজা খুল ভাই!

আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে যায়। ভিতরে টিমটিমে লম্ফ জ্বলছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেজমোল্লান। শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। একটা স্তন পুরো অনাবৃত, অন্যটাও তদ্রূপ। গলায় রুপোর হাঁসুলী, নাকে মোটা নাকছাপি, কানবরতি অসংখ্য আংটা, হাতে বাজু, সুখলতা ভারী মুখে দেখছে চাঁইমোড়ল সরকারজীকে। অন্ধকার ছায়া পড়েছে মুখে। তবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওস্তাদ ঝাঁকসা।

হট ভাই। কাপড়া বদল না!

সুখলতার কোন কথা নেই মুখে।

আরে! ক্যা হুয়া তেরা বহু? দেখনা জাড়া লাগে বহুত! ওস্তাদ ঝাঁকসা আদর করে বলতে থাকে। ...তেরা লিয়ে কুছ আনেকা মতলব থা—লেকিন সব গোলমাল হো গাইলা রে! উও যো—

অতর্কিত গালে চড় পড়েছে ওস্তাদ ঝাঁকসার। ওস্তাদ হাত দিয়ে গালটা চেপে চাপা গরগর করে উঠেছে, তু মার দেইলা হো, সুখি, মুঝে তু চড় মার দেইলা!

কোন জবাব নেই। দরজাটা বন্ধ হয়ে যায় সশব্দে—মুখের ওপর। ওস্তাদ হাঁসফাঁস করে বলে, ঠিক হ্যায় মেজকি! তব, তেরা সুটকেসমে মেরা কাপড়া থা—কাপড়াঠো তো দে। কাল গাহনা হ্যায় রাঢমে—হেই মোল্লান!

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ওস্তাদ ঝাঁকসা। ভিতরে দমকে দমকে কান্নার উচ্ছ্বাস। মেজমোল্লান বিছানায় পড়ে কাঁদছে। আরো বরকতক ডেকে সে আস্তে আস্তে দাওয়া থেকে নামে।

পথে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে যেন দিকে নির্ণয় করে নেয় ওস্তাদ ঝাঁকসা। সুখলতার বুকখানা তার স্তন দুটোর মতই কঠিন। শালীর বেটি শালী, কুত্তিন, খানকী বেশরম! দাঁতে দাঁতে চেপে গাল দেয়। নিজে মানীগুণী মানুষ—নয়ত ওর চুলের ঝুঁটি ধরে এই দুপুররাতে গঙ্গাপারে ছেড়ে দিয়ে আসত। লে বে ভাতিজারা, শকুনকা মাফিক খা লে খানকীকো।

বড়মোল্লান কমলবাসিনীর ঘরে অস্পষ্ট চেঁচামেচির আওয়াজ। জেগে আছে তাহলে। ছোট ছেলেটার নাকি খারাপ কী ব্যাধি হয়েছে—সারছে না। টাকাকড়ি তো দেয় ওস্তাদ—দিতে কসুর করে না। এমনকি মেজমোল্লানকেও দেয়।

সে কেসে সাড়া দিয়ে তারপর ডাকে, রাজু, বেটা রাজমোহন!

ভিতরে বড়বউর আওয়াজ। ...ফির মূতিস রে, ফির? হা ভগবান! নিদ মেরা লিয়ে না দিস তু! হট্, ইধার হট্। ...ঝাড়ু মাত রো বেটা। চুপ সে নিদ যা! কাল তেরা বাবা আয়েগা, না? কেতো আচ্ছা চীজ লাবে গা না মেলাসে! হাঁ...বহুত সুন্দর খেলোয়ারী, আওর মেঠাই, আওর......

ওস্তাদ ঝাঁকসা শোনে। আর ডাকতে ইচ্ছে করে না।

একটি শিশুর কণ্ঠ শোন যায়। ...মোট্টর লাবে গা বাবা, কিসিকো না দেগা হাম।

চৌদ্দ বছরের রাজমোহন জেগেছে এবার। ধমক দেয়, চুপ বে চুপ রহনা। নিঁদ না লাগে রে?

রাজু, বেটা! কাল গণেশকা সফর যানে লাগে রাঢ়সে! বোল না উসকো, শকরকন্দ লেকে তু ভি সাথ যানা! বলিস, থোড়া হ্যায়—এক মণ।

কব গে মা।

কাল সাঁঝমে গাড়ি ছোড়ে গা গণেশ।

মা? রাঢ়মে বাবাকা সাথ দেখা হো যায় তো?

একটু চুপ করে থেকে কমলাবাসিনী জবাব—বেটা! রাঢ় বহুত বড়া দেশ হ্যায়।

আস্তে আস্তে পিছন ফেরে ওস্তাদ ঝাঁকসা। ডাক ওরা শোনেনি। ঈশ্বর, জোর বাঁচিয়েছ—ঈশ্বর, তুমি আছো।...ধুস শালা! আছে যদি, তাহলে 'আলকেপে' হয় কেন মানুষ!

কখন অন্যমনস্ক হেঁটে প্রসন্নর বাড়ি চলে এসেছে। ভারি গলায় ডাকে, প্রসন্ন! প্রসন্ন রে!

প্রসন্নর এখানেও সে থাকবে না। কিছু টাকা দিয়ে যাবে ওকে—বড়মোল্লানকে যেন পৌঁছে দেয়। আর—রাজু, রাজুকে যেন রাঢ়ে যেতে নিষেধ করে। ওস্তাদ ঝাঁকসার পুত্র রাঢ়ে শকরকন্দ আলু ফেরি করে বেড়াবে? ছি ছি! তা অশোভন। বরং এবার বেশি-বেশি টাকা দেবে, নিয়মিত দিতে থাকবে।

পরক্ষণে চমকে ওটে। বুকটা ধড়াস করে ওঠে। আর বায়না দেবে তো লোকে? শান্তি নেই—চারদিকে রটে গেছে। চন্দ্রজুয়াড়ীর মতে লোক—সেও কম টাকা দিয়ে বসল! সুবর্ণর মত ছোকরা হাতে থাকলে অবশ্য বয়ানার অভাব হবে না। কিন্তু সুবর্ণ—সুবর্ণ যতটা নয়, ওই সনাতন মাস্টার তা চায় না, চাইবে না। এটা সে স্পষ্ট টের পেয়েছে। লোকটা 'সিনেমা' শেখাবে ছোকরাটাকে। তাছাড়া ওদের ম্যানেজারটাও ভারি দেমাকী লোক। আহ্লাদে মাটিতে পা পড়ে না। বিদেশে এসে জাঁক বেড়ে গেছে। ভাবছে, তাদের দল কেন ঝাঁকসা ওস্তাদের অধীনে থেকে গান করবে?...তাছাড়া আরও ব্যাপার আছে। যত ভাল ছোকরাই হোক, সুবর্ণ শান্তি নয়। শান্তি ছিল তার তৈরি জিনিস—সূক্ষ্মতম ইঙ্গিত সে টের পেত। সুবর্ণ ওস্তাদ ঝাঁকসার ভাষা বোঝে না!

সুবর্ণর আশা করা বৃথা। পরের ঘরে দামী রত্ন যদি বা—আমার তাতে কী? হাতেকোলে যতগুলো মানুষ করব, একদিন না একদিন বুকে 'হস্তা' দিয়ে পালাবেই! হত যদি নিজের ছেলে, তাহলে......

পাগল! তা হয় না। অসঙ্গত, অন্যায়, অধর্ম।

ওস্তাদ ঝাঁকসা ফের ডাকে, প্রসন্ন রে, হামি সরকারজী। ঝাঁকসু সরকার। নিকাল বে!

পরের রাতে মদনপুর গোহাটের বিরাট আসরে যে লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে, সে ভিন্ন মানুষ। সে আসরের মানুষ। কার সাধ্য তার গায়ে হাত দেয় কেউ, কার ক্ষমতা আছে, 'ঠেস' মেরে বসিয়ে দেয়। নাম শুনেই পদ্মার এপার—অজয়-ময়ূরাক্ষী-দ্বারকা-গঙ্গার কঠিন রাঢ়মাটি স্পন্দিত হয়। নেচে ওঠে!

আজব তামাসা দেখতে লোক ভেঙে পড়েছে। শান্তিচরণের বিপক্ষ দলে আজ স্বয়ং ওস্তাদ ঝাঁকসা। সে শান্ত গম্ভীর মুখে 'ছড়া গান' ধরেছে,—এই প্রথম অন্যের বানানো গান গাইছে ওস্তাদের রাজা—সোনা মাস্টারের বাঁধানো পদ .

আজ আমার কী আনন্দ দেখলাম রে
নভে নবীন চাঁদের উদয়।

খচ্চর ফজল ধুয়োটার দোহারকি করতে গিয়ে কালি পালটে নিচ্ছে—দেখে শান্তি চাঁদের উদয়, ওগো, দেখে শান্তিচন্দ্রের উদয়। আর ওস্তাদ তা শুনে সবার অগোচরে ওর কোমরে লাথি মেরেছে।...

কতক্ষণ পরে প্রথম পাল্লা শেষ। ফজল কানে কানে বলে, এবার চলেন জী। যাই। ওস্তাদ ঝাঁকসা ওঠে। বাইরে যায়। যেতে যেতে শোনে, শান্তিচরণ গান ধরেছে ঃ

দেখা হল, ভাল হল, জুড়াল জীবন।
সুখে—আছো তো এখন
ভাল—আছো তো এখন।

অশ্লীল গাল দিতে দিতে হাঁটে ওস্তাদ ঝাঁকসা। বাইরে একেবারে মাঠের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায়। একটু

পরেই ফজল আসে। ফিসফিস করে বলে, ওইখানে —মাঠের মধ্যে একটা পুকুরপাড় আছে। ওখানে অপেক্ষা করতে হবে! চলেন, আঁটঘাট সব ঠিক আছে। ভানুদের সব বলা আছে। সুবিদ হোসেন কাছেই থাকবে। গোলমাল বাধলে ওদের দলটাকে নিয়ে যাবে নিজেদের আড্ডায়! আর...কেউ তো জানতে পারছে না—কী থেকে কী হল। ভানুদের কোন ক্ষতি হবে না।

ওস্তাদ ঝাঁকসা কোন কথা বলে না। ফজলের পিছনে হাঁটে সে। মনের মধ্যে শান্তির ছবিটা ভাসছে। 'মোহিনীচিত্র' —হাসছে, নাচছে, গাইছে। আঃ, কান থেকে ওর কণ্ঠস্বর ওর সুর কিছুতে মোছে না। সেই শান্তি! সেই মুখ, সেই সুন্দর শরীর, সেই অপরূপ হাসি আর ভ্রূভঙ্গি আর কটাক্ষ! বুকে আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। খুন চেপে যাচ্ছে মাথায়। না দেখলেই বরং ভাল ছিল। কেন এ দুর্মতি হল তার?

...সলিম লোকজন নিয়ে তৈরি আছে। ঠিক সময়ে গোলমাল লাগিয়ে দেবে। তারপর—

ফজলের কথা যেন হঠাৎ দুর্বোধ্য লাগে ওস্তাদ ঝাঁকসার। এ সব কী বলছে ফজল? সে ধমক দেয়, চুপসে চল বে।

সলিম—বাঘড়ীর দুর্ধর্ষ গুণ্ডা খুনে আর ডাকাত। পুলিশের একগাদা পরোয়ানা ঝুলছে মাথায়। ধরতে পারে না ওকে। চন্দ্রজুয়াড়ীর পক্ষপুটে দিব্যি কাটাচ্ছে সুখে। সে আজ শান্তিকে আসর থেকে তুলে আনবে। ওস্তাদ ঝাঁকসার কাছে হাজির করে দেবে। তারপর শেষরাত্রের ট্রেনে মুরারই থেকে আজিমগঞ্জ হয়ে জঙ্গীপুর। সলিম বলেছে, কত শালার পালিয়ে যাওয়া মাগকে বাপের বাড়ি থেকে ধরে এনে মরদের ভাত খাওয়ালাম। এ তো ছোকরা!

পালিয়ে যাওয়া বউ ধরে আনাও ওর পেশা। সলিম সব পারে। দেশের সবখানে ওর দলের লোক—অনুগত বিশ্বস্ত চেলারা রয়েছে। সলিমডাকাত জেলার আতঙ্ক। তার বন্দুক আছে, বোমা আছে।...

তৃতীয়ার চাঁদ ডুবে গেছে পশ্চিমের আকাশে। ঘন কালো অন্ধকার কিছুক্ষণ। ফাঁকা নির্জন মাঠে পুকুরপাড়ে—ঈশানকোণে ওস্তাদ ঝাঁকসাকে একা বসিয়ে রেখে ফজল চলে গেল। আস্তে আস্তে দৃষ্টি স্পষ্ট হচ্ছিল ওস্তাদ ঝাঁকসার। দূরে হাটতলায় আসরের আলো দেখা যাচ্ছিল।

একসময় হঠাৎ চমকে ওঠে সে। দূরে অস্পষ্ট গোলমালের আওয়াজ যেন। বুকে হাতুড়ি পড়তে থাকে। উঠে দাঁড়ায় সে। কান পাতে। হাটতলা উত্তরপশ্চিম কোণে। দক্ষিণ থেকে বাতাস আসছে। স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু ও আওয়াজ গানের নয়—তা ঠিক।

কেন সুবিদ হোসেনের শলা মেনে নিল সে? ছি, ছি, জনসাধারণ শুনলে লজ্জায় মুখ দেখানো দায় হবে। কোন মুখে বড় বড় কথা বলবে আসরে?

পরক্ষণে মনে হয়, যদি সত্যি শান্তি বশ মানে!

চুপচাপ শান্তভাবে অপেক্ষা করে ওস্তাদ ঝাঁকসা। আসুক আগে—সামনে হাজির করুক ওরা। তারপর দেখা যাবে।...

ফের চমকায়। উঠে দাঁড়ায়। চষা জমির ওপর কাদের দুদ্দাড় শব্দে ছুটে আসা যেন। হাঁফাতে হাঁপাতে ওস্তাদ বলে ওঠে, কে, কে আসছে?

একটা দেহ—ব্লাউজপরা, বেণীবাঁধা চুল, নিশ্চুপ দেহ নামিয়ে দেয় কয়েকটি মানুষ। হাতে লম্বা লাঠি। ফজলও আছে সঙ্গে। হাঁটু দুমড়ে দেহটার পাশে বসে সে। বেণীটা খামচে ধরে। বলে, ওঠ শালার ব্যাটা শালা।

একটু ককানি—অস্ফুট আওয়াজ, উঃ মাগো! তারপর ফের চুপচাপ।

ওস্তাদ ডাকে, সলিম, সলিমভাই!

ফজল বলে, সলিম ইস্টিশানে থাকবে।

ওস্তাদ বলে, ফজল, তোরা হাঁটতে থাক। আমি একে দুটো কথা বলব। তারপর তোদের সঙ্গ ধরব। তোরা এগো।

ফজল বলে, না না ওস্তাদজী! পালিয়ে যাবে—চেঁচাবে!

ওস্তাদ ঝাঁকসা গর্জে ওঠে। ...চুপ শুয়ারকা বাচ্চা! হামি মর্দানা না স্ত্রীলোক বে! যা, তোরা এগো!

দলটা চলে যায়। পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায় অন্ধকার মাঠে।

ওস্তাদ ডাকে, শান্তি! আবে শান্তি! ওঠ! উঠে বস। আমি আছি—তোর ওস্তাদ, ওঠ!

শান্তি আস্তে আস্তে ওঠে। পা দুমড়ে বসে থাকে অবিকল মেয়ের মত।

...ওপরে আকাশে, নীচে মাটি—এ এক কালরাত্রি শান্তি রে! ...ওস্তাদ বলতে থাকে। ...এ আমি চাইনি। বিশ্বাস কর, চাইনি। তবু এ অন্যায় আমার করতে হল। কেন করতে হল? না—তুই আমায় এই কালরাত্রির মতন অন্ধকার করে ফেলেছিস। ...শান্তি তোর সঙ্গে গান আর আমি করব না। তোর মুখও আর দেখব না। শুধু একটা কথা জানবার সাধ ছিল। সেটা জানতে চাই। জবাব দিবি?

শান্তি কাঁদছে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে।

না, তোর জানের ভয় নাই। তোকে মারব না। শুধু বল, কেন পালালি?

শান্তি নিরুত্তর।

আমার ভয়ে?

হুঁ।

একটু চুপ করে থেকে ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, ঢপওয়ালীকে তুই অশুচি করেছিস। আমি জানি, সে দোষ তোর নয়। সে তোকে কুপথে টেনেছিল। এও জানি, তোর জন্যেই সে আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। শান্তি, ঢপওয়ালী বিষ খেয়ে মেরেছে। মরার পর যদি এমনি করে তার সঙ্গেও দেখা হত, তাকে জিগ্যেস করতাম—কেন সে বিষ খেল? সেও কি আমার ভয়ে? আমি কি এমনি ভয়ানক জীব রে শান্তি? নাঃ, এর কোনটাই সত্যি নয়। কী সত্যি?

শান্তি নাক ঝাড়ে সশব্দে। শাড়ির আঁচলে মোছে। তারপর ছ্যাৎরানো কণ্ঠস্বরে বলে, গঙ্গাদি মরেছে, আমিও শুনেছি। তবে আমি জানতাম, গঙ্গাদি অমনি করে মরবেই—একদিন না একদিন। আপনাকে সাহস পাইনি বলতে।

কেন রে শান্তি?...ওস্তাদ ঝাঁকসা ঝুঁকে আসে ওর মুখের কাছে।

শান্তি বলে, আপনি ভুল বুঝছেন ওস্তাদ। গঙ্গাদি আপনার টানেই এসেছিল। কিন্তু ওকে ছেড়ে আপনি আমার কাছে শুয়ে থাকতেন—ও সারারাত ঘুমোত না। আমি দেখেছি। আপনি আমাকে চুমো খেতেন—গঙ্গাদি নিজের চোখে দেখেছে বলত। আমাকে গাল দিত। শাপ দিত সারাক্ষণ। ভয়ে বলতে পারতাম না আপনাকে। ...আর সেদিন সকাল থেকে ওর চোখমুখ দেখেই বুঝেছিলাম একটা কিছু হবে। বিকেলে আমাকে ডাকল, চল, বেড়িয়ে আসি গঙ্গার পাড়ে। বেড়াতে গেলাম। হঠাৎ গঙ্গাদি...

বুঝেছি। ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে।...

শান্তি থামে না। বলে, হঠাৎ গঙ্গাদি বললে, তোর কাছে এমন কী মধু আছে রে ছোঁড়া, পুরুষ হয়েও পুরুষকে মাতিয়ে রেখেছিস? তারপর হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে লাগল। তারপর...

হুঁ, হুঁ...

শেষে বললে, দেখলাম, তুই আরো পাঁচটা পুরুষের মত পুরুষ—না কী অন্য কেউ। বললে, তুই তো খাঁটি পুরুষ রে ছোঁড়া! তবে কেন তোকে নিয়ে এত মাতামাতি? ওস্তাদজী, সেদিন আমার সঙ্গে কুকাজ না করলেও গঙ্গাদি বিষ খেত! আমার কোন দোষ নাই। ...ফের কেঁদে ওঠে শান্তি। নাক ঝাড়ে। বিকৃত কণ্ঠস্বরে কাঁদে।

ওস্তাদ ঝাঁকসা বলে, হুঁ। আমায় স্মরণ করতে দে। সে রাতে আমি গঙ্গামণির কাছে শুলাম। গঙ্গামণি জড়িয়ে ধরল। বড় ক্লান্ত ছিলাম। আর—কতদিন থেকে নারীসঙ্গ আমার ভাল লাগে না! তেতো লাগে সব! হাঁ, হাঁ—গঙ্গামণি বললে, আমি শান্তি হলে তো মুখে মুখ দিয়ে শুয়ে থাকতে! হাঁ—তাই বললে বটে! আসলে খুব ঘুম পেয়েছিল আমার—কালঘুম রে শান্তি! কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! অথচ—আহা! কত আশা ছিল মেয়েটার! দেহের আশা—মনের আশা।

কতক্ষণ চুপচাপ দুজনে। তারপর জোরে কেঁদে ওঠে শান্তি। ..আমি কী করব ওস্তাদ?

তুই—তুই...কথা খোঁজে ওস্তাদ ঝাঁকসা। ...শান্তি, আমি—আমি আর গান করব না বে! করব না। বড় অশান্তির আগুন মনে। বিবাহ করেছি। এখনও দুই বহু ঘরে। পুত্রকন্যা আছে। আমি বাবা রে শান্তি—তবু সব ভুলে হঠাৎ গর্জে ওঠে সে। ...সব ভুলে তুই হারামী পুরুবেশ্যাদের ভাগাড়ে রাহুচণ্ডাল সেজে বসে আছিস! কেন তোদের জন্ম হয়েছিল রে গিদ্‌ধড়ের বাচ্চারা! লজ্জা করে না শালাদের মাগী সাজতে? যা, ভাগ শালার ব্যাটা শালা! তোদের মুখ দেখলে সামনে নরক জ্বলে। যা, যা, পালাঃ!

সারাপথ মূর্ছাহতের মত এসেছে লোকটা। সলিম আজিমগঞ্জ স্টেশনে কেটেছে দলবল নিয়ে। ফজল বিষণ্ণমুখে—ঠিক বানরের মত বসে থেকেছে বেঞ্চে। জঙ্গীপুরে গাড়ি থামলে ভোর হয়ে গেল।

রিকসো চেপে দুজনে আসছে। রঘুনাথগঞ্জ বাজারে এসে রিকসা থামায় ওস্তাদ। বলে, কিছু কেনকাটা করব ফজল।

ফজল বলে, কী কিনবেন জী?

কিছু খেলনা কিনব। কিছু সন্দেশ। কাপড়চোপড়। আয়।

কেনাকাটা শেষ করে ঘাটের দিকে চলে ওরা। যেতে যেতে ফজল বলে, সত্যি গান ছেড়ে দেবেন জী?

ওস্তাদ ঝাঁকসা জবাব দেয় না।

ফজল বলে, আমার ছেলেটা—এগারো সনে পড়ল। সুন্দর চেহারা। তাকে যদি ছোকরা করি? আপনি হুকুম দেন ওস্তাদজী, ছোকরা হলে তো আপনার বা আমার ইয়ারকি চলবে না! শুধু গানের দরকার, পাটের দরকার—আসরে যা দরকার। ছেলের সঙ্গে পাট করতে দোষ নাই জী। অভিনয়শাস্তর—আপনিই তো বলেন। ঠিক পারবে। গলা ভাল—দেহও ভাল।

ওস্তাদ ঝাঁকসা শুধু হাসে।

আসর শুরু হবার আগে কালাচাঁদ খুড়ো কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমূর্তি হয়ে ওঠে। তখন সে কালা গুণিন। যেন সাপের চোখে রক্তছটা, রুক্ষ চুল আলুথালু, কপালে সিঁদুরের ছোপ—সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। কেউ বললেও জবাব দেয় না। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে মুখ তোলে, তারপর বাদ্যযন্ত্রগুলো দেখাতে থাকে, তারপর সুবর্ণর পা থেকে মাথাঅব্দি দেখে নেয়। বিড়বিড় করে কী বলে। আড়ালে অবশ্য দলের সবাই হাসাহাসি করতে ছাড়ে না। সুবর্ণ তো পয়লা নম্বর অবিশ্বাসী। মুখ ঘুরিয়ে ফিকফিক করে হেসে ফেলে। টের পেলেই কালা গুণিন তখন গর্জে ওঠে, মরবি, তু মরবি সুবন্ন!

অমনি করে দলের প্রত্যেকের আর বাদ্যযন্ত্রগুলোর "দেহবন্ধন" করে দেয় সে। এই গুপ্তবিদ্যা তাকে নাকি দিয়ে গিয়েছিল তার মকু ওস্তাদ। সনাতনকে বলেছিল, কাপাসখালি-বিবিগঞ্জের মকবুল ওস্তাদের নাম আপনি শোনেন নি, বাবা। আজ তিনি গত। তেনার কাছে কোথা লাগে আপনাদের ওই ঝাঁকসু-টাকসু। কামিখ্যেয় গিয়ে ডাকিনীদের কাছে শিক্ষা ছিল ওস্তাদমশায়ের। আহা হা, কোথা ফেলে এলাম সেই ওস্তাদের রাজা বিদ্যেধরকে! হুঁ গো! গন্ধর্ব-কিন্নর-বিদ্যেধর তিনজনা ছিলেন একদেহে।

বিদ্যেধরের বিদ্যে পেয়েছিল এক সরলসুবোধ বাউরী কিশোর—তার সেই মোহিনীরূপটাই বা কোথা গেল গো। এ যে শুধু খড়-বাঁশের টাটখানি বয়ে মরছি। আহা হা।...

তখন মনকির ওস্তাদের দল আসরে চলে গেছে। সাঁওতাপাড়া দল তৈরি হয়েছে আসরে যেতে। সবে কালা গুণিন তাদের 'দেহবন্ধন' কর্ম সেরে পাঁচিলের বাইরে হনহন করে এগোচ্ছে। দুপুরে চাপাচাপি খেয়ে পেটে এতক্ষণে প্রচণ্ড বেগ লেগেছিল। তাই অন্ধকার আড়ালের দিকে টোক্কর খেতে-খেতে হন্তদন্ত চলেছে সে। মেলার উজ্জ্বল আলোয় বুড়োর চোখদুটো ধেঁধে গিয়েছিল বুঝি—দীঘি খুঁজে হন্যে কালা গুণিন বিশাল কালো গাছের নিচেই বসে পড়েছে।

হঠাৎ কী শোনে সে। শুনে ফেলে চখিয়ে ওঠে। কান পাতে। পেটের বেগটা আস্তে আস্তে উবে

যায়। কতক্ষণ অন্ধকারে জন্তুর মতন নিঃশব্দে বসে থেকে সে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় সরে আসে আলো লক্ষ্য করে। পাঁচিলের কাছে এসে অনুচ্চস্বরে ডাকে, নফর, বাবা নফর আলি!

দল তখনও আসরে যায়নি। গেটের কাছে জটলা করছে। ম্যানেজার আমির কালা গুণিনের ডাকটা শুনতে পেয়েছিল। সে একটু এগিয়ে এসে গল চড়িয়ে বলে, খুড়োর আর সময়-অসময় নাই। টর্চবাতিটা নিলেও পারতে। ওরে নফরা, যা—খুড়োকে ঘাটে লিয়ে যা।

স্বয়ং আমিরের গলা শুনে খুশি হয়েছে কালাচাঁদ।...বাবা আমের! ডাকে সে।...নফরা থাক। তুমিই এসো গো, পেয়োজন আছে। পেচণ্ড পেয়োজন।

এই 'শুদ্ধকথা' শুনে আমির আলি চমকে উঠেছে। হুঁ, কালা খুড়ো নিশ্চয় কিছু গুহ্য জরুরী কথা বলতে চায়। কিছু গুরুতর ঘটেছে। আমির আলি হুঁশিয়ার ম্যানেজার। দল ঠিক রাখতে তাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। ঝিঁঝিডাঙ্গার আসরে এসে দলের নাম-সম্মান চারডবল বেড়ে গেছে। এই সম্মান-খ্যাতি অতিশয় যত্নে রক্ষা করতেও প্রস্তুত সে। তার রাশভারি চালচলন বেড়ে গেছে। হুঁ, সে আসরপিছু ষাট টাকা 'পয়ানের' (দরের) দলের ম্যানেজার—যা তা কথা লয়, বাবা। অবশ্য এ হচ্ছে নফর আলির মন্তব্য।

কালাখুড়োর কণ্ঠস্বরে কী যেন গুরুতর ঘটনার আভাস। শিউরে উঠেছিল আমির। কদিন থেকে সে লক্ষ্য করছে, সোনামাস্টারের সঙ্গে সুবর্ণটা আবার বড় বেশি মাখামাখি শুরু করেছে। আর তাই নিয়ে যেন দলের সবাই কেমন হিংসুটে হয়ে পড়েছে। এটা ভাল নয়, ইটা ভাল লয়। ...কালাখুড়ো অভিজ্ঞ মানুষ। সে তাকে দুএকবার হুঁশিয়ার করেও দিয়েছে। ওই কিনা দল ভাঙবার বিষকুট। ওস্তাদ হোক, মাস্টার হোক, হারমোনিয়ামদার বা তবলচী হোক—নাচিয়ে ছোকরা সবার সঙ্গে সমান মিশবে। কারো সঙ্গে বেশি ঢলাঢলি নয়। সুবর্ণ মাত্রা ছাড়াচ্ছে। আমির জানে, সোনামাস্টার বাউণ্ডুলে লোক—তার ইহপরকালের ভাবনা নেই। কিন্তু অন্যেরা সবাই একই গাঁয়ের লোক, দুবেলা মুখ দেখাদেখি, ওঠাবসা। তাদের কেউ চটলে দল টিকবে না।

তাই আমির শুধু চমকায়নি, রেগেও উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। তার বড় সহজে রাগ আসে। সেই রাগ মাথায় নিয়ে সে পা বাড়ায়। কী গুহ্য কথা তাকে বলবে কালা গুণিন? হঠাৎ একবার দাঁড়িয়ে সে আলোঅন্ধকারময় প্রাঙ্গণটা ও দলের লোকগুলোকে দেখে নেয়। ফের চমকায়। সুবর্ণ কই? সোনামাস্টারও তো নেই! তাহলে কি দুজনে এখন অন্ধকার আড়ালে......

ঘৃণায় রি-রি করে জ্বলে উঠেছে আমির আলি ম্যানেজার। ...ওয়াক থুঃ। শালার শয়তান দুটো। থুঃ-থুঃ! ...একদলা থুথু ফেলে সে এগোয় কালাখুড়োর দিকে। সেই সময় নফরআলি তার পিছনে এসে গেলে তাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে চাপা হাঁকরায়—খবর্দার! কোথা যাবি রে শালার বেটা শালা। ভাগ! বাদ্যযন্ত্রর কাছে বসে থাক গে।

বিরসমনে 'বাহক' নফর আলি পিছিয়ে যায়। একলা গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাদ্যযন্ত্রের কাছে। গভীর পরিতাপে তার মনটা কয়েকমুহূর্ত ভেঙে পড়তে থাকে। কেন সে কারণঅকারণে সবার ধমক খাবার জন্যে দলে এমনি করে পড়ে রয়েছে? সে গান গাইতে পারে না, নাচতে বা পার্ট করতেও জানে না—শুধু যন্ত্র বাইবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এইসব নিষ্ঠুর হৃদয়হীন মানুষগুলোর সঙ্গে! পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে দল থেকে। রাতের পর রাত জেগে আর শরীর চলছে না যেন। একলা দুখিনী মায়ের একলা ছেলে সে। মা তার জন্যে কেঁদে কেঁদে হয়তো অন্ধ হতে চলেছে। এমন সমর্থ যোয়ান ছেলে থাকতে মাকে এখনও পথে পথে রোদবৃষ্টিতে কাঠকুটো শাকমাছ খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে! ধিক আমাকে গো, শত ধিক এই নফর আলিকে!...

কত ঠাণ্ডা রাতের আসরে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে সে ভেবেছে দূর গাঁয়ে তখন এক হতভাগিনী দুখিনী বুড়ির ঘরে অমৃত আরাম! কত স্নিগ্ধ উষ্ণতা আর স্নেহময় কণ্ঠস্বর ঃ বাপ নফর আলি, জাড় লাগে রে! ...না, মা না। ...ছেঁড়া কাঁথা ভাল করে জড়িয়ে দিয়ে বুড়ি বলেছে ঃ কাছে সরে যাই, বাপ। ...আয়, মা। কাছে আয়—হুঁ, আর জাড় নাই। মাগো. আর জাড় লাগে না আমার।

তখন সেই হিম শীতের ডাইনীর চুল ছড়ানো মৃত্যুময় রাতে সেইসব স্বপ্ন তাকে ব্যাকুল করেছে। পালাবে, পালিয়ে যাবে দল থেকে।

অথচ তখনই হঠাৎ বেজে ওঠে কাদের আলির নিপুণ যন্ত্রী আঙুলের নাচে ছন্দেছন্দে সুরের ঝংকার। মোহিনী নটী সুবর্ণ পায়ের জং বাজিয়ে দুলেদুলে রচনা করে অপরূপ প্রতিভাস। তবলচী ডুবু মাথা ঝুঁকিয়ে তবলায় বোল তোলে, ধেগে নাকে নাকে তিন...ধেগে নাকে নাকে তিন...এবং সুবর্ণ গায় :

এখনও রাত যায়নি কেটে, ডাকেনি ভোরেরো পাখি।

দুখিনী মায়ের ছেলে নফর আলি তখনই সোজা হয়ে বসে। হঠাৎ বেসুরো গলায় দোহারকিদের সঙ্গে গলা মেলায়। ঝিমন্ত নন্দঠাকুরের হাত থেকে কত্তালজোড়া কেড়ে নিয়ে বাজাতে চেষ্টা করে। চেঁচিয়ে ওঠে : বহুত আচ্ছা ভাই রে! এ রাত পোহাবে না, এ রাত ভোর হবে না!

হুঁ, এ বড় মায়া। ঝাঁকসু ওস্তাদ বলে গেছেন বটে। বড় মায়ের বাঁধা পড়ে গেছে গঙ্গাপদ্মার ওপার পল্লীগ্রাম! নফর আলির সাধ্য কী পালায়! সে চুপিচুপি ঘুমন্ত সুবর্ণকে ছুঁয়ে থেকেছে। আসরে সেজে থাকবার সময় সুবর্ণর আঁচল তার গায়ে ঠেকলে পরম আরামে জুড়িয়ে গেছে তার দেহের গোপন যত জ্বরজ্বারি। আরো একদিন আমিরের হাতে কী কারণে চড় খেয়ে তার চোখে জল এসেছিল, একলা চুপিচুপি কাঁদছিল, তখন সুবর্ণ তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছিল বটে। আহা, কী সুখ, কী সুখ গো নফর আলি 'বাহকে'র!

আজও একটা কষ্ট ঠেলে এল তার গলার ভিতর ম্যানেজারের অকারণ গালমন্দে। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, এবার আর নয়। কক্ষনো না। সে এবার নির্ঘাৎ পালাবে। তখন কে অতসব যন্ত্রপাতি মাথায় বয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ রাস্তা ঠ্যাঙায়, দেখা যায়। হুঁঃ, পেয়েছিলে এই ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো নফর আলিকে! এবার ঠেলা বুঝে নিও।...

ওখানে শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে আমির বলে উঠেছে, কী কাল'খুড়ো, কী?

কালাখুড়ো খাটো ধুতির কাছাটা হাতে ধরে গুটিয়ে রেখেছে কাপড়-চোপড়, নির্ঘাৎ শৌচকর্ম বাকি আছে, ফিসফিস করে শুধু বলে, বড় গুরুতর বাবা, পেচণ্ড!

আমির রেগে যায় আরো। ...লে মজা! বলবে তো বাপু!

কালাচাঁদ হঠাৎ হাঁটতে থাকে। দীঘিটা আবিষ্কার করে নিয়েছে বোঝা যায়। সে হাত তুলে ইসারায় আমিরকে অনুসরণ করতে বলে। আমির উত্তেজনায় ছটফট করে এগোয়। কী বলবে কালা গুনিন? যা বলবে, তা তো টের পাওয়া গেছে। আলকাপদলের সেই কুখ্যাত পাপ আক্রমণ করেছে এতদিনে। অশুচিতা ছুঁয়েছে দলটাকে। এ দল এবার খতম হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে—সুবর্ণকে নয়, সোনামাস্টারকে তাড়াবে ম্যানেজার। আগেরবার ইসারা ইঙ্গিতে প্রায় তাড়িয়েছিল। ঝাঁকসু ওস্তাদের সঙ্গে পাল্লা না হলে আর ওকে দলে কখনো আনত না। যাক গে, সুবর্ণ একা একশো।

টর্চবাতি জ্বালো। ঘাট দেখে লিই। ...কালাচাঁদ বলে।

আমির লম্বা মস্তো টর্চটা জ্বালে এতক্ষণে। দীঘির ঘাটের পুরানো ধাপগুলো ঝকমক করে ওঠে। শ্যাওলায় পিছলে পড়ার ভয়ে পা টিপে টিপে কালাচাঁদ সাবধানে জলে গিয়ে নামে। তারপর বলে, বাস, বাস! নিবিয়ে ফেলো বাপু।

যেন কিছুটা দেরি করেই উঠে আসে কালাচাঁদ। কাছে এসে কাপড়টা ঝেড়েঝুড়ে ভাল করে পরে নেয়। তারপর বলে, সময় আছে। ...বসো এই চত্বরে। বিড়ি দ্যায়নি লায়েকমশাইরা? দাও একটা।

অধীর আমির আলি পাশে বসে পড়ে। নিজে একটা সিগ্রেট ধরায়। খুড়োকে অবশ্য বিড়িই দেয়। আগুন জ্বেলে দিয়ে দেখে কালাচাঁদ গুনিন তার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে। চমকে ওঠে আমির। এইসব সময় কালাচাঁদকে কেমন যেন মনে হয়।

সে খুব আস্তে বলে, কথাটা বলছ না গুনিনখুড়ো।

কয়েকমুহূর্ত স্তব্ধ বিড়ি ফোঁকার পর অনেকটা ধুঁয়ো ছেড়ে কালাচাঁদ গম্ভীর হয়ে ডাকে, আমের আলি!

হুঁ, গুণিনখুড়ো। বলো।

কথাটো গুরুতর।

জানি। মাস্টারটাকে আমি কালই তাড়াব। ও আমার দল ভেঙে ফেলবে, খুড়ো।

কিন্তু বাপ আমের আলি, ...খিকখিক করে আচমকা হেসে ওঠে কালাচাঁদ। দুলে দুলে আপন মনে হাসে।

আমির ক্ষেপে গিয়ে বলে, হেসো না—হাসির কথা নয়। দল ভেঙে যাবে।

কালাচাঁদ মুখ তুলে ওর কানের কাছে আনে। তারপর বলে, দল ভাঙবে না গো—সোনাওস্তাদ নিজে ভেঙে যাবে। হ্যাঁ, সেইরকম লক্ষণ। আমার কপালে আরেকটা চোখ আছে, আমের। সেই চোখে দেখছিলাম কদিন থেকে। এখন আরও পষ্ট দেখলাম। হ্যাঁ বাবা, সোনাওস্তাদের নিদেন হয়েছে। তবে তোমার কথাও ফ্যালনা লয় বাছা। বড্ড তরাস পেয়েছি মনে। জানাজানি হলে পরিণামে দলকেই ঠেঙিয়ে তাড়াবে ঝিঝিডাঙ্গার লোক। অখ্যাতি ছুটবে।

আমির কান খাড়া করে শুনছিল। কিছু বুঝতে পারছিল না। সে বলে, খুলে বলবে তো খুড়ো। কী দেখলে? কী করছিল সোনামাস্টার?

গম্ভীর কালাচাঁদ বলে, হুঁ, করছিল কিছু একটা। সেটা ঠিকই।

কার সাথে? সুবর্ণর?

এ্যাঁ, সুবন্ন? ...মৃদু হাসে কালাচাঁদ। ... লা, লা। সুবন্ন লয়, মেয়ে গো মেয়ে। মেয়েছেলে বটে। সেদিন কার বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে এল ওরা—সুবন্ন আর ওস্তাদ, সেই বউটা—জান বাবা আমের আলি? সেই বউটাকে লিয়ে রঙের খোলায় ভাসতে দেখলাম সোনা ওস্তাদকে। তোমার দিব্যি, চক্ষের কিরে। হুই বাগানের মধ্যে ওরা জোড় বেঁধেছে।

আমির হাসে এবার। ...যাঃ এই! আমি ভাবলাম—

কিন্তু জানাজানি হলে বিপদ আছে, বাবা আমের।

তা অবশ্যি আছে।

সোতবাং? ...কালাচাঁদ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একটু ভেবে আমির বলে, বউটা নাকি এ-গাঁয়ের পণ্ডিমশায়ের বউ। মাস্টারের স্বজাতি—একই গাঁয়ের মেয়ে। হুঁ, মাস্টারকে সাবধান হতে বলব—বুঝলে খুড়ো? এখনও পর-পর ক'রাত বায়না দিয়েছে মেলায়। খুব জমিয়ে দিয়েছি কি না।

আরেকটা বিড়ি দাও, বাপ্।

পরে খাবে খুড়ো। আবার তো কেসে-কেসে কাহিল হবে খালি।

না রে সোনা, দে একটা।

নাও তবে, কেসে মর। হাঁফের অসুখ বাড়ুক। ...আমির বিড়ি দিয়ে এগিয়ে যায়। কালাচাঁদ বসে থাকে। বেশ হাওয়া দিচ্ছে। শরীর শীতল হয়ে যাচ্ছে। আঃ, এ বয়সে রাতজাগা আর ভিড়ের ধকল সইতে পারছে না শরীরটা। মাঝে মাঝে এত ক্লান্তি লাগে। ওরা বলে, দুপুরে খেয়ে যখন খুড়ো ঘুমোয়, হাঁ করা মুখ দেখে মনে হয়—যাঃ, মরে গেছে লোকটা। চল এখন, আসর ফেলে গঙ্গা দিয়ে আসি! ...বড় ভয় করে কালাচাঁদের। বুক কাঁপে। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে—হঠাৎ এক রাতের আসরে হাজার জনমানুষ—বিমুগ্ধ শ্রোতার ভিড় ঠেলে এসে গেল কালান্তক মহিষবাহন দেবতা, চোখ পাকিয়ে বলল—ওঠ্ রে বাছা, লিয়ে যাই। কোন বিদ্যেধর বগাবগীর বান ছেড়ে তাড়াবে তাকে? হেই বাবা দেবতা, এট্টু কিরপা কর—আর একটা আসর যেতে দাও! আহা, দলের শোভা পদ্মর পাপড়ি ফোটার মত একটা করে ফুটছে। গন্ধ মউ মউ করছে পিথিমীতে। এতসব ভক্ত মানুষজনের চোখের সামনে যে পায়ে জং বেঁধে নাচছে, ওকে কি তোমরা চেন? না—ওর নাম সুবন্ন নয়—ওই, ওই কালাচাঁদ। কিন্নরকণ্ঠি ছ্যাঁচড়াদলের 'বালক' কালাচাঁদ! অভাজন বাউরীকুলে এক কিন্নরের জন্ম হয়েছিল—তাকে তোমরা ভুলো না বাবাসকল। সে এখনও বেঁচে আছে! এখনও পায়ে জং বাজিয়ে নেচেনেচে গাইছে

সে আলোময় জনমণ্ডলীর চোখের তারায়, সামিয়ানার নিচে এবং পঞ্চাশ বছর আগের সেই মাথার ওপরকার তালপাতা বা খেজুরপাতার ছেঁড়া পাটির সামিয়ানা আর টিমটিমে হেরিকেনগুলো আজ হয়ে উঠেছে লাল ফুলকাটা ধবধবে স্নিগ্ধ বিশাল থানের চন্দ্রাতপ, আব হ্যাজাগ-ডেলাইট জ্বলছে শনশন উজ্জ্বলতায়, প্রগলভতায় আলো খেলছে, আলোয় সমানে নেচে চলেছে সেই একই মোহিনী 'বালক'—কালাচাঁদই আজ সুবর্ণ!

তাই, বড় মায়ায় টনটন করে বুক। থাম হে যমদেব, আরও কিছুদূর দেখে যাই—নয়ন সার্থক করে দেখে যাই আমারই আত্মার সেই অমল ইচ্ছাবিন্দু থেকে বেড়ে ওঠা নবীন তরু কতখানি মহাবৃক্ষ হয়ে ওঠে। কালাচাঁদ কাতর হয়ে মনে মনে বলে, আহা শরীল, এই শরীলটা কী শত্তুর দ্যাখো! মনে মনে এখনও যে সে একজনা পায়ের জং খোলেনি, দীঘল কেশ কাটেনি, শাড়ি-ব্লাউজ খুলে চলে যায়নি সাজঘরে। এখনও তার আসর হয়নি শূন্য। ওস্তাদের রাজা তাকে পদ যোগাচ্ছে, হারমোনিয়ামদার এগারো পর্দায় সুর তুলছে, নিপুণ তালী তবলিয়া বাঁয়া-ডাহিনার বোল বাজাচ্ছে কার্ফা কি দাদরায়, তার চারপাশে কত্তালের ঝমঝম আব আকাশে মুখ তুলে পাগলপারা দুলন্ত দেহ সব দোহারকিদের—হেই বাবা যমরাজ অপেক্ষা কর কিছুক্ষণ। ...

বালুচরে ঘর বানাইলাম ভেসে গেল জলে হে
(ক্যানে) বালুচরে ঘর বানাইলাম। ....

পঞ্চাশ বছর আগের শেখা একটা কলি গুনগুন করে গাইতে থাকল কালাচাঁদ। তার মনে পড়ে গেছে এমনি এক বিচিত্র রাতের কথা। সোনাওস্তাদের মতন তার কাছেও ধরা দিতে এসেছিল এক পাড়াগেঁয়ে বউ, ফিসফিস করে বলেছিল—চল, আম্‌রা পালিয়ে যাই। ঘর বাঁধি দুজনায়। কেন এমন জলজ্যান্ত মিনসেমানুষ চুল রেখে চুড়ি পড়ে ন্যাকামি করে থাকবে? তুমি তো পুরুষ—এত লজ্জা ক্যানে গো তুমার?

হুঁ, লজ্জা—বড় লজ্জা পেয়েছিল গানের দলের 'বালক' বাইশ বছরের শ্রীকৃষ্ণের মতন সুন্দর তরুণটি। দুহাতে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে হঠাৎ সরে এসেছিল। সাপ—'কালসর্প সম্মুখে তোমার'। কালনাগিনী যেন বা ফণা দোলায়। মুকু ওস্তাদের সাবধানবাণী মনে পড়ে গিয়েছিল, খবরদার বাছা, নারীপানে চেয়ো না, নারীঅঙ্গ ছুঁয়ো না—সর্বনাশ হবে।

কী সর্বনাশ হবে জানত না সে। তবু মনের ভয়, হয়ত মনেরই 'ভরম'—বিভ্রান্তি! অভ্যাসে নিজের পুরুষত্বকে চাপা দিতে দিতে এক অদ্ভুত হিমতায় পৌঁছে গিয়েছিল। মাত্র পঞ্চাশটা বছর আগে মানুষ এত বোকা ছিল ভাবা যায় না!

তারপর তো একদিন চুল কাটতে হল। খুলে ফেলতে হল চাঁদির চুড়ি। কঠোর পুরুষ হতে হল। তখন টের পেল, কী পাষাণ, হৃদয়হীন এ পৃথিবী! দু'কড়ি টাকা পণের অভাবে আর বিয়ে করাও হল না তার। সেই তিক্ততার কাহিনী তার মনে এখনও বিষের জ্বালা ছড়ায়। প্রচণ্ড রাগে প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল কালাচাঁদ—ইহজন্মে নারীপানে চাইব না, নারী অঙ্গ ছোঁব না। সে প্রতিজ্ঞা রেখেছে সে। গুণিনি ওঝা হয়ে ঘুরেছে দেশবিদেশে। কত আলকাপদলে যেচে পড়ে গিয়ে মিশেছে। তারপর একদিন নিজের গাঁয়ে সাঁওতাপাড়ায় গড়ে উঠল দল। আমির আলি বিশ্বাসী মানুষ। সে তাকে ডেকে নিল দলে। কালাচাঁদের সুখের সীমা নেই।

কিন্তু হঠাৎ এমন সব সময় আসে, এই একটা বিষণ্নতা তাকে চেপে ধরে। এত একলা লাগে নিজেকে! স্মৃতি তাকে উত্ত্যক্ত করে। রাগে ক্ষেপে গিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে সে—আমি পুরুষ, না পুরুষ লই? যদি পুরুষ তবে আমার জন্যে ক্যানে জোড় দিলেন না বিধেতা? কী শাপে আমার এমন হল গো? এখন আমার চুল পেকেছে, দাঁত ভেঙেছে, শরীল নড়বড় করছে—তবু তো সাধ মিটল না! এ সাধের অর্থ কী গো?

দীঘির জল ছুঁয়ে আসে ঠাণ্ডা হাওয়া। তালগাছের পাতা কাঁপে আর দোলে—সড়সড় খড় খড়। মেলার দিকে কোলাহল থরথর করে উচ্ছ্বাসে। সার্কাসের তাঁবুতে বাঘ ডাকে। কোথায় ড্রামের শব্দ

হয়। নির্জনে বসে গুনগুন করে সে। বিড়ির আগুন সুতো পেরিয়ে গেলেও বিড়িটা ফেলে দেয় না। কাতর প্রার্থনায় নিজেকে সঁপে দিতে থাকে : হেই বাবা যমরাজ, পালা শেষ হয়ে এল ওই—দেরি নেই। অপেক্ষা কর—আমি যাব।

প্রকাণ্ড বটগাছটার নিচে ঘন অন্ধকার। শেকড়ের ওপর বসে ছিল দুটিতে পাশাপাশি। ফিসফিস করে কথা বলছিল। কথা বলতে বলতে একবার চমকে উঠেছিল সনাতন—কে দৌড়ে গেল যেন! শুকনো পাতায় খসখস শব্দ মিলিয়ে গেল।

সুধা ওর হাতটা নিয়ে বলছিল, কেউ না।

চল, ওঠা যাক। আসরের সময় হয়ে গেল।

চুলোয় যাক তোমার মিন্সেনাচানো আসর। বস তো চুপচাপ। আজ আমার কপালে এত সুযোগ—তা জান না সোনাদা। পণ্ডিত গেছে নলহাটি! এখনও একটা দিন থাকবে সেখানে। দেওররা তো বলদ—বউ নিয়ে পড়ে আছে সার বেঁধে, দ্যাখো গে। মাগ ছেড়ে কেউ উঠবে না—যম ডাকলেও। ...ফিসফিস করে হেসেছিল সুধা।

সনাতনের শরীর কাঁপছিল। ভয়ে আর অস্বস্তিতে। হয়ত অনভ্যাসে। সে বলেছিল, সুবর্ণ ওখানটায় দাঁড়িয়ে আছে। সে কী ভাববে। ডেকে আনব?

কাকে? ওই ছোঁড়াটাকে?

ওকে তোমার এত রাগ কেন, সুধা?

সুধা একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, হয়ত হিংসে। ওকে সতীন লাগে। ...তারপর ফের সে হাসতে হাসতে সনাতনের গায়ে কতকটা ঢলে পড়েছিল।

তখন সনাতন ওকে অসীম সাহসে দুহাতে ধরেছে—বিবেচনায় মাত্র দুকাঁধে হাত রেখেই ধরেছে, এবং নিজের মুখোমুখি ওর মুখ রেখে বলেছে, সুধা, হয়ত ভুল করছ!

কিসের ভুল, শুনি?

আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না তোমার—কেমন করে হবে? অথচ তুমি—তুমি আমাকে...

আমি তোমাকে?

সুধা, বিশ্বাস কর। আমার এত ইচ্ছে করে—তোমার অবস্থা দেখে এত কষ্ট হয়েছে আমার—কিন্তু কী করতে পারি? আমি এত অসহায়, সুধা।

তোমাকে কিছু করতে বলিনি সোনাদা।

বলছ। এমনি করে অন্ধকারে একলা এসে যা বলতে চাও, তা আমি বুঝি। কিন্তু সুধা, বুঝতে পারছিনে কী করব!

কিছুই করতে হবে না তোমাকে। আমাকে ছাড়, যাই।

সনাতন হঠাৎ ওকে সবেগে টানে। সুধা ওর বুকের ওপর ঝুঁকে এলে সে প্রচণ্ড আবেগে চুমু খেতে থাকে। সুধা চুপ করে পড়ে থাকে। বাধা দেয় না। এবং হঠাৎ সনাতন একটা অদ্ভুত ব্যাপার টের পেয়ে যায়। সুধা মেয়ে—তার দেহটা এত নরম, তার ঠোঁট এমন পাতলা, চুলে সুগন্ধ, হ্যাঁ—সুধা মেয়ে—তবু সনাতনের এমন কেন লাগে? কই, কোথায় সে অমর্ত পুষ্পের ঘ্রাণ আনে না—যে সুখ মদের মতন ঝাঁঝাল, তেতো, অথচ আগুন জ্বালানো। সুবর্ণর দেহে একটা অমল কাঠিন্য আছে ... যা সিদ্ধ-ধরনের নরমতার ভিন্ন একটা রূপ অথবা ভাব। সেই পেলব কাঠিন্যের স্বাদ অন্যরকম। তা নেশা ধরিয়ে দেয় দেহে। সুধার সেগুলো কই? মন—মন নিয়ে কী করবে সনাতন? মনের অনেক জ্বালা।

কেমন নিস্তেজ হয়ে ছেড়ে দেয় সে। সুধা কাপড়ে মুখ মুছে বলে, দিলে তো আমাকে নষ্ট করে! অসভ্য কোথাকার!

সুধা, এবার ওঠা যাক।

না ... বস। যেকথা বলতে এসেছি, বলা হয়নি যে।

কী তোমার কথা, সুধা?

অনেক। একটা করে বলছি, শোন। আমি ওবাড়ি আর থাকব না।

চমকে ওঠে সনাতন। ...তার মানে?

ন্যাকা! বোঝ না? আমি ওবাড়ি থাকলে মরে যাব। তাই পালাব।

পালাবে? কোথায় পালাবে? ভদ্রপুরে দাদার কাছে?

পাগল হয়েছ তুমি? দাদা আপদ বিদেয় করে বেঁচে গেছে। সুধা হাঁসফাঁস করে প্রবল উত্তেজনায়। ...না, ওখানে আমি যাব না।

তাহলে আর কোথায় যাবে?

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ সনাতনের কাঁধে হাত রেখে সুধা বলে ওঠে, যদি তোমার সঙ্গে যাই। নেবে না তুমি। ...তারপর তার কান্নার চাপা শব্দ ফোটে, যেন বা গাছের নিচে রাতের অন্ধকারে কী পাখি অসহায় ডানা ঝটপট করছে। ...আমাকে বাঁচাবে না সোনাদা? যদি না বাঁচাও, অবশ্যি আমার অনেক উপায় আছে। হ্যাঁ, এত বড় দীঘির জল আছে, এত সব গাছপালা আছে, আর ...

সুধা, তোমার কিসের কষ্ট বলবে?

অনেক কষ্ট।

আমি যদি এখানে না আসতাম, তাহলে কী করতে?

মরতাম।

কেঁদো না—কথা শোন। আমার তো কোন ঘর নেই, সুধা। কোথায় রাখব তোমাকে! তাছাড়া পণ্ডিত ছেড়ে দেবেন না। পুলিশে জানাবেন। মাঝখান থেকে আরও কষ্ট পাবে।

সুধা ফুঁসে ওঠে, থাম! ...তারপর আস্তে আস্তে বলে, যদি অনেক দূরে কোথাও চলে যাই আমরা—যেখানে কেউ আর খুঁজে পাবে না?

ছেলেমানুষি কর না। শোন। ...

বুঝেছি! বেশ—আমার মরণই চাও। ছাড়, আমি যাই।

সুধা, আমাকে ভাবতে সময় দাও।

সুধা নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে বলে, আমার হাতে একটুও সময় নেই। আমি একেবারে বেরিয়ে এসেছি। ওখানটায় আমার সুটকেস রেখেছি। ছাড়।

সর্বনাশ! ...লাফিয়ে ওঠে সনাতন। ...কী কাণ্ড করে ফেলেছ তুমি! ছি ছি!

ছি ছি বলছ? পারছ বলতে?

কিন্তু এ কী করে ফেললে!

হ্যাঁ—তোমার মিস্লেনাচানো বাদ পড়ছে। যাও। আমি আসি। বেরিয়ে পড়েছিলাম অনেক আশা নিয়ে। মুখপুড়ী সুধার কে আছে ভাবি নি! যাক গে, পথে নেমে আর ভয় কিসের সোনাদা! হ্যাঁ, দাঁড়াও—তোমাকে, তবু একটা প্রণাম করেই যাই।

সত্যি সত্যি সে সনাতনের পায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারপর পা দুটো জড়িয়ে আচমকা হু হু করে কাঁদতে থাকে। সনাতন কী করবে ভেবে পায় না। ...

সেজেগুজে দাঁড়িয়ে সোনা ওস্তাদের অপেক্ষা করছিল সুবর্ণ। সামনে অন্ধকারে গাছের জটলা। ওস্তাদ ওখানেই কোথায় আছে। সেই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছে কিংবা মন্দ কিছু ব্যাপার করছে। মুখ টিপে হাসছিল সুবর্ণ। ওই অশুচি গায়েই কি আসরে যাবে সোনা ওস্তাদ? হয়ত দিঘীতে গিয়ে চুপি চুপি স্নানটা সেরে নেবে। মনকিরের দল দুঘণ্টার আগে আসর ছাড়ছে না—যা বোঝা যাচ্ছে।

ওরা কী করছে এতক্ষণ—কৌতূহল হচ্ছিল খুবই। কিন্তু ছিঃ, তা উচিত নয়। সোনা ওস্তাদ রাগ করবে। তাছাড়া, ছিঃ, সে বড় লজ্জার কথা!

কিন্তু দাঁড়িয়ে থেকে পা টাটাচ্ছে এতক্ষণে। এত কী কথা বলছে ওরা? ওদিকে দলের লোকেরা হয়ত আসরে যেতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। খুঁজতে বেরোবে না তো? ম্যানেজার টর্চ জ্বেলে এগিয়ে এলেই বিপদ। তেড়ে বলবে, এখানে একলা কী করছিস রে শালা?

ইঁ-উ—আমির আলি ষাঁড়ের মত হাঁকছে : হেই সুবর্ণ! কোথা গেলি রে? ... তারপর এক ঝলক টর্চের আলো ওপাশে ফাঁকা জমিতে খেলে গেল কয়েকমুহূর্ত। সুবর্ণ দ্রুত সরে একটা গাছের দিকে এগোল। কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে বাঁচাতে পারল না। জোরালো আলোয় ধরে ফেলেছে ওকে আমির আলি ম্যানেজার। হাঁক এল : হেই ব্যাটা মুদ্দফরাস! এদিকে আয়!

ভয়ে-ভয়ে কাছে যেতেই আমির চাপা গলায় গর্জে বলে, আক্কেল নেই রে ছোঁড়া? মেলাখেলা জায়গা। একলা ওখানে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছিস। দুষ্টুলোকের চোখে পড়লে তুলে মাঠে নিয়ে ফেলবে, জানিস নে?

দলের সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। নন্দ বলে, হ্যাঁ—বাছাবাছি করবে না। এবং হাসিটা আরও বেড়ে যায়। গেটের কাছে দলটা অপেক্ষা করছে। হ্যাসাগটা লায়েকরা নিয়ে গেছে আসরে! খোলামেলায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা—যন্ত্রপাতির কাছে একটা হেরিকেন জ্বলছে। মেলার আবছা আলো পড়েছে বলে এখানটা মোটামুটি স্পষ্ট। আমির সুবর্ণর কানের কাছে মুখ এনে বলে, মাস্টার জোর মাস্টারি করছে শুনলাম। লোকটা বিপদ বাধাবে। আমি কিছু বলতে পারব না —তুই আমার হয়ে সাবধান করে দিবি। বুঝলি?

সুবর্ণ সরে এসে পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। কাবুল আর নন্দ তার কাছে আসে। তারপর কাবুল ফিসফিস করে বলে, ওস্তাদ কোথায় রে?

সুবর্ণ জবাব দেয়, জানিনে।

নন্দ হাসে। ...বল্ না বাবা, ওস্তাদের প্রসাদ তো তুই নিশ্চয় পেয়ে এলি। আমরাও একটু পাই-টাই, না কী?

সুবর্ণ রাগতে গিয়ে হেসে ওঠে। ...ফুক্কুরি কর না। ওস্তাদ তেমন লোক না।

কাবুল বলে, উরে শালা! ওস্তাদ একেবারে ধোয়া তুলসীপাতাটি! আর বে ঠাকুর, আমরা দেখে আসি কী খেলা খেলছেন সোনা ওস্তাদ।

নন্দকে ডেকে নিয়ে সে বাগানের দিকে চলে যায়। সুবর্ণ হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তার ইচ্ছে করে, ম্যানেজারকে গিয়ে বলে কথাটা। কিন্তু আমিরের যা স্বভাব—হয়ত উল্টে তাকেই বাপান্ত করে ছাড়বে।

তীক্ষ্নদৃষ্টে সেই অন্ধকারটা লক্ষ্য করে সে। আকাশভরা নক্ষত্র। নিচে এই পৃথিবী। কত আশ্চর্য ব্যাপারই না ঘটছে সারাক্ষণ। মেলার দিক থেকে মনকির ওস্তাদের ছোকরাটার গান ভেসে এল এতক্ষণে :

এত রেতে ডাক এসেছে রূপসী রাই কমলিনী
চুল বাঁধা থাক পড়ে লো আয়, হবি তুই কলঙ্কিনী।।

গায় বেশ ছোকরাটা। স্বর এখনও চিড় খায়নি। শুনতে শুনতে কেমন ভয় পেয়ে যায় সুবর্ণ। তার গলা একদিন অমনি ছিল। এখন একটু করে ধরে আসছে যেন। সে কি বয়সের দোষে? বয়স যেন কী একটা চাপ ঠেলে নিয়ে আসছে আস্তে আস্তে, কত কী পুরনো খসে পড়ছে, সব টের পায় সুবর্ণ। তার এইসব সময়, একলা হলেই, সেই গোপন গুরুতর ভয় তাকে চেপে ধরে—একদিন তাকেও চুল কাটতে হবে।

সেই অনিবার্য দিনের প্রতি থমথমে চোখে সে তাকিয়ে থাকল! ...

কতক্ষণ পরে নন্দ চিমটি কাটে কাবুলকে। টের পায় কাবুলের শরীরটা শক্ত। ঠিক বাঘের বসার ভঙ্গিতে হাঁটু দুটো দুমড়ে থাবার মত দুটো হাত মাটিতে পেতে বসেছে সে। নন্দ আরও টের পায়, এখন কাবুল কাবুল নয়—নিরেট ঘনশ্যাম বা ঘনা বাগদী। তার বাবা ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত। জেলেই মারা গিয়েছিল। ঘনা বাবার মত নয়, সে নন্দর ভাষায় 'আরটিস' বা 'সিল্‌পি'—তার গানের গলা আছে। অভিনয়ে সে পটু। সচরাচর বদমাস চরিত্রগুলোই তাকে 'কাপে' দেওয়া হয়। তখন তাকে এত মানিয়ে যায় আসরে!

নন্দর মনে হচ্ছিল, আসরের সেই চরিত্রটি এখন এই বটগাছটার উল্টোদিকে ঝুরির আড়ালে এসে ওঁৎ পেতেছে। নন্দ ভীতু ছেলে। তার বাবা পূজারী বামুন। তার রক্ত যেন অন্যরকম।

হ্যাঁ, মেয়েটি চলে যাচ্ছে এতক্ষণে। গুজগুজ ফিসফাস প্রেমকথা কয়ে নাগর সোনা ওস্তাদের কাছ থেকে কেটে পড়ছে। নন্দর বলতে ইচ্ছে করে, ভাই কাবুল, ও শালী এখন কেমন সতী সেজে ভাতারের কাছে শোয়, দেখতে পেলে ধন্যি হতাম মাইরি! নন্দ উসখুস করে। ফের চিমটি কাটে।

কাবুল উঠে দাঁড়ায় এবার। ফিসফিস করে বলে, যাবি?

আরও চাপা স্বরে হাঁফাতে হাঁফাতে নন্দ বলে, কোথায়?

শিকারে। ...বলে কাবুল যেন হাসে। নন্দর একটা হাত ধরে টেনে সামনে এগোতে থাকে। গাছের জটলার ভিতর ঠাসা অন্ধকার পেরিয়ে চলে দুজনে। নন্দর ভিতরটা থরথর করে কাঁপে। সে টের পেয়ে গেছে, কাবুল কী করতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ বিকট একটা ভয় আর আনন্দ এসে চেপে ধরেছে। মেয়েটিকে ওরা দেখেছে। ভারি সুন্দর—নিটোল চমৎকার একখানা দেহ, ওর ভাষায় 'খাসা জিনিস!' আর নন্দ জানে, সচরাচর এসব সময় অসতী মেয়েরা ধরাপড়া বা আত্মরক্ষার তাগিদে খুব সহজে দেহের মূল্যে মান বাঁচায়, প্রাণ বাঁচায়। তার জীবনে এমন একবার হয়েছিল! পাড়ার বউ শেফালী সিঙ্গি মশায়ের সঙ্গে খামারবাড়িতে জোড় বেঁধেছিল। সিঙ্গি চলে যেতেই নন্দ সেখানে হাজির। ...হুঁ হুঁ বাবা, বলে দেব সব। ...শেফালী হাতে পায়ে ধরেছিল, দোহাই নন্দদা, যা চাও দেব—নাও। কিন্তু কাকেও বল না! ...অতএব নন্দর একটা চরম প্রাপ্তিযোগ ঘটে গিয়েছিল।

এবারও সেই নিয়মে চমৎকার প্রাপ্তিযোগ ঘটতে চলেছে। কিন্তু কে আগে? উঁহু—ব্যাটা বাগদীকে একটু সামলাতে হবে। আরে বাবা, 'অগ্রে ব্রাহ্মণ দদ্যাৎ'—পড়িস নি শাস্ত্র? না পড়ে থাকিস, শুনে নে। ... মনে মনে এইসব বলে আর নন্দ হাঁফাতে হাঁফাতে চলে। সামনে অন্ধকার মাঠে শেয়ালের মত তাকায়। মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে না। ঘনা নিশ্চয় দেখছে। নন্দর পায়ে শুকনো খড় জড়িয়ে যায় বারবার। রাগে বিরক্তিতে সে বিড় বিড় করে ঈশ্বরকে গাল দেয়।

হঠাৎ কাবুল থমকে দাঁড়ায়। বাঁজা ডাঙ্গার ওপর শুকনো ঘাসে মেয়েটি বসে পড়েছে। নক্ষত্রের আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখা যায়। বসল কেন? তাহলে কি সোনা ওস্তাদ ফিরে আসবে? আসুক। এসে খুঁজেই পাবে না। দিগন্তবিস্তৃত মাঠে ওকে নিয়ে উধাও হয়ে যাবার মত ক্ষমতা ঘনশ্যামের আছে। সে ধুতির কাছাটা খোলে। আণ্ডারপ্যান্টটা খুলে পকেটে ভরে।

আসর—হ্যাঁ, আসর শুরু হবার আগেই কাজ সেরে ভালমানুষের মুখে ফিরে আসবে তারা। বলবে, ঘাট সেরে এলাম হে আমের আলি। দুপুরে খাওনাটা আজ পেচগু হয়েছিল!

নন্দ ফিসফিস করে, যদি চ্যাঁচায়, মেলার লোক দৌড়ে আসবে যে কাবুল?

কাবুল তাই ভাবে কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঘুরে পিছনে দিকে দূরে মেলাটা দেখে নেয়। বাতাস বইছে উদ্দাম। চ্যাঁচালেও কানে যাবে না। তাছাড়া চ্যাঁচাতে দেবেই বা কেন? একবার অকারণে আকাশের নক্ষত্র দেখে নিয়ে সে সামনে পা বাড়ায়। বলে, পালাস নে।

সনাতন তার ব্যাগটা নিতে এসেছিল শুধু। ব্যাগটা সুবর্ণর কাছে আছে। দল তখনও আসরে যায় নি! মনকির ওস্তাদ তুফান তুলেছে শোনা যাচ্ছিল। দোহারদের ধুয়ো গমগম করে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল স্তব্ধ মেলার আসর। আমির আলি সেই সময় গেটের ওদিকে হেঁড়ে গলায় ডাকে, খুড়ো, কালাখুড়ো।

সুবর্ণ দৌড়ে এসে বলে, ওস্তাদ!

ব্যাগটা কই সুবর্ণ? ...সনাতন চাপা গলায় বলে।

সুবর্ণ ব্যাগটা দিয়ে ফিসফিস করে হাসে। ...কেমন হল ওস্তাদ?

কী কেমন হবে?

প্রেমালাপ?

সনাতন গম্ভীর হয়ে বলে, এখনও বাকি আছে। তারপর সে চারপাশটা দেখে নিয়ে পা বাড়ায়।

সুবর্ণ অমনি সামনে এসে দাঁড়ায়। ...আবার কোথায় যাচ্ছেন?

আসছি।

চকিতে সুবর্ণ নড়ে ওঠে। কী একটা আঁচ করে তার বুকটা কাঁপতে থাকে। রুদ্ধশ্বাসে সে বলে, আপনি চলে যাচ্ছেন ওস্তাদ?

যাঃ, আসছি এখুনি।

না—আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি আসবেন না।...সে সনাতনের একটা হাত চেপে ধরে। ছটফট করে বলতে থাকে, সুধাদির সঙ্গে আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন। কেন, কেন যাবেন? না—আপনার যাওয়া হবে না।

আঃ, কী হচ্ছে সুবর্ণ!

সুবর্ণ অস্ফুটকণ্ঠে বলে, না না! কেন যাবেন? এত সব বায়না নিয়েছে ম্যানেজার। তার কী হবে?

সনাতন রেগে যায়।...বায়না নিয়েছে তো আমার কী? তোরা নিজেরা তুলবি বায়না।

সুবর্ণ কাঁদো কাঁদো মুখ বলে, তাই বলে আপনি একটা কেলেঙ্কারি করবেন?

কিসের কেলেঙ্কারি রে?

নয়? আপনি একজন গুণী ওস্তাদ হয়ে সামান্য মেয়ের জন্যে আসর ছেড়ে পালাবেন?

খুব বড় কথা শিখেছিস তো সুবর্ণ! ছাড়, আমাকে যেতে দে।

সুবর্ণ হু হু করে কেঁদে ফেলে। বিড়বিড় করে বারবার, না না। আপনাকে এমন করে যেতে দেব না। কিছুতেই না।...হয়ত ওর মুখের পেন্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হয়ত দ্বিতীয়বার না সেজে ওর আসরে যাওয়া হবে না! তবু পাগল হয়ে উঠেছে নাচিয়ে ছোকরাটা, এক অন্ধ আদিম জেদ কিংবা গভীরতম অদ্ভুত বিহ্বলতায় সে সনাতনকে আঁকড়ে ধরে মাথা কুটছে, না না না না। কিছুতেই না।

ওখানে বাঁজা ডাঙাটার ওপর সুধা অপেক্ষা করছে একা। এখানে ব্যাগটা নিতে এসে এ বিপাকে পড়ে যাবে, সনাতন ভাবতেই পারেনি। সে বোঝাতে চেষ্টা করে সুবর্ণকে।...সুবর্ণ, কথা শোন। সুধাকে আমি কোথাও রেখে আবার তোদের দলে ফিরে আসব। গান কি ছাড়তে পারি রে? পারব না। তবে এ এলাকায় আর গান করা হবে না। দেশটা তো অনেক বড়। তুই ভাবিস নে। তোরা কোনরকম বায়না চালিয়ে বাড়ি ফিরে যাস। সেখানেই আমি ঠিক সময়ে হাজির হব!

সুবর্ণ ফের বলে, না।

সেই সময় আনিস এসে পড়েছে। কাদুর সঙ্গে এতক্ষণ দুচার পাত্র গলায় ঢালছিল। বেশ নেশা ধরেছে তার। এসেই বলে, ড্রামা না প্রেমালাপ বাছা সুবর্ণ? সরি, ভেরি সরি ওস্তাদজী। রাগ করবেন না। হঁউ, সুবর্ণ কী বলছে? ভালবাসে? ...হা হা করে হাসে সে। ...এই সুবর্ণটা মেয়েও নয়, ছেলেও নয়। আবার হিজড়েও না। তবে কী? কিছু না। মায়া! ইয়েস ওস্তাদজী, ঝাঁকসা বলে ইনি মায়া—মহামায়া! আ রে সুবর্ণ! তুই ওস্তাদের হাতটা ধরে আছিস কেন বে? ছাড় শালা। বেয়াদপি! ননসেন্স।

সুবর্ণ এবার ভাঙা গলায় বলে, আনিসদা, ওস্তাদ পালিয়ে যাচ্ছে!

কী পালিয়ে যাচ্ছে! ...আনিস কাছে এসে সনাতনের মুখটা দেখতে চেষ্টা করে। ...হোয়াই ওস্তাদ? কেন? আমির আলি যা তা বলেছে?

সনাতন কী করবে ভেবে পায় না। সব মাটি হয়ে গেল। সুবর্ণ তাকে এমন করে আটকাবে, সে একটুও ভাবেনি। এবার আনিস এসে গেছে! আর কোন উপায় দেখছে না সে। ধমক দিয়ে বলে, চুপ কর তো আনিস! ...

আনিস চুপ করবে না, ওস্তাদ। সুবর্ণ কাঁদছে। সুবর্ণ আপনার হাত ধরে আছে। মুখের পেন্ট চটে যাবে জেনেও সুবর্ণ কাঁদছে। ম্যানেজার আমির আলির গাল খাবে জেনেও, সুবর্ণ—শী ইজ উইপিং। হ্যাঁ, কাঁদছে শালা আলকাপের নাচিয়ে ছোকরাটা। অতএব, সোনা ওস্তাদ আলবাৎ পালাচ্ছে। কিন্তু কেন পালাচ্ছে? কে তাকে কুকথা বলেছে? তার নাম কী? ...

মাতালের কাণ্ড! তার ওপর আনিস—দুর্দান্ত জেদি ছেলে। সে গর্জায়। অমনি সুবর্ণ ফিসফিস করে বলে, সেই পণ্ডিতের বউটা নিয়ে পালাতে চায় ওস্তাদ! আনিসদা, তুমি ওকে আটকাও।

আনিস এবার হো হো করে হেসে ওঠে। সনাতন বাধা দেবার আগেই সে চেঁচিয়ে বলে, ম্যানেজার! তোদের ওস্তাদকে নিয়ে আসরে চললাম। যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে দাও। কাদু, কাদের আলি মাস্টার! কাম অন ব্রাদার। আমরা আসরে যাব। সেই কালাখুড়ো! চলে এস বাপ! আজ মনকিরকে ঠেকাতে জানপ্রাণ সব যাবে। তুণে বাছাবাছা বাণ নিয়ে এস খুড়োমহাশয়।

শক্ত হাতে সনাতনের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানে আনিস। মেলার প্রান্তে এসে চাপাস্বরে বলে, সুবর্ণ—এই সুবর্ণকে নিয়ে যদি পালাতেন ওস্তাদ, এই কন্ট্রাক্টর পুত্র ম্যাট্রিক পাস আনিস আলি আপনাদের হেলপ করত। কিন্তু মেয়ে—নিতান্ত মেয়ে! কভি নেহি ওস্তাদ, কভি নেহি!

সনাতনের বলতে সাধ যায়, নিতান্ত মেয়ে নয় আনিস, সুধা কী তুমি জান না! কিন্তু বলতে পারে না। সুবর্ণকে খোঁজে। সে আলোর সীমানায় দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে আয়না বের করছে। তার সামনে অজস্র মানুষের পিঠ। তারা দেখছে না, এক মোহিনী নটী আপন মনে নিজের মুখে পাওডারের পাফ বোলাচ্ছে তাদেরই পেছনে। আর তার ঠোঁটে প্রগাঢ় তৃপ্তির হাসি। ভুরুতে মায়া, চাহনিতে মায়া, ঠোঁটে মায়া—হা সর্বনাশ!

সনাতন দেখল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই সর্বনাশ সোনা ওস্তাদকে ঘিরে ধরেছে। সুধা মরুক। সুধা যা খুশি করুক। সামনে হাজার বিমুগ্ধ মানুষের ভিড়ে এখন সুবর্ণকে জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওনা মনে হয়েছে। এইসব আলোকিত আসর ফেলে কোথায় গিয়ে বাঁচতে চাইছিল সে?

আনিস, একটু মাল খাব আজ। আছে?

আলবাৎ। ওস্তাদের জন্যে না রেখে পারি? ...পকেট থেকে একটা বেঁটে বোতল বের করে সে। পানের দোকানের পেছনে অন্ধকারে চলে যায় দুজনে।

সনাতন বোতলটা গলায় ঢেলে প্রচণ্ড কাসে। তারপর বলে, সিগ্রেট দাও, আনিস।

এই যে ওস্তাদ।

আনিস, এ হয়ত ভালই হল।

হল বইকি ওস্তাদ।

হ্যাঁ আনিস, সুবর্ণকে আমি ভালবাসি।

আনিস হাসে শুধু।

আনিস, সুবর্ণ কিছু দিতে পারে না—তবু ওকে কেন ভালবাসি?

আনিস আরও হাসে।

এ ভালবাসার মানে কী আনিস? আমি বুঝি না। যাকে হাতের নাগালে পাব না, যা শুধু দুটো চোখ, দুটো কান আর মনের সুরে বাঁধা, তার জন্যে ... কথা শেষ না করে মাতাল সনাতন—সোনা ওস্তাদ পরিতাপে মাথা নাড়ে। বড় বড় চুল আঁকড়ে ধরে দুহাতে।

আনিস বলে, পাবেন না বলেই তো এত নেশা ওস্তাদ। নইলে আমি—আমি শালা বড়লোক কন্ট্রাক্টরের ছেলে, ম্যাট্রিক পাস—আমি কেন মেতে গেলাম আলকাপে? তবে কথা কী—আমি সুবর্ণর একটা নেশায় পড়েছি বটে, আমার আসল নেশা গানে-কাপে। আমার তাই ভয় নাই ওস্তাদ, আমি বেঁচে থাকব। আপনি—আপনাকে নিয়েই যত ভয়।

আনিস, আর মদ নাই?

কাদুর কাছে আছে। বসুন, আনছি।

আমিরের কথা শোনা যায় ওদিক থেকে। খুড়ো এলে নাকি? মলোছাই, বুড়ো ঘাটে মরে পড়ে থাকল নাকি? ওরে নফর আলি, ওরা সব কই? চল্, আসরে যাই। সুবর্ণ, হেই সুবর্ণ! ওরে শালা মুদ্দফরাস! শালা মরবে রে, মরবে। ঠিক শালার বরাতে হাসপাতাল আছে। কাবুল, কাবেল! সে শালাই বা কোথা গেল? ঠাকুর, ও নন্দঠাকুর!

ঝিমুনি ধরেছিল কালাগুনিনের। স্নিগ্ধ রাতের হাওয়া ঘুম দিয়ে তাকে ঠেলে ফেলছিল। সে চমকে ওঠে হঠাৎ। ঘাটে জলের শব্দ হচ্ছে। সে বলে ওঠে, কে গো বাবারা?

নন্দর সাড়া আসে। ...আরে! খুড়ো নাকি?

হ্যাঁ, বাবা। আসরে যাওনি?

তুমি যাওনি যে খুড়ো? তোমারই তো আগে যাবার কথা।

আজ এট্টু অনিয়ম করলাম, ঠাকুর। 'জল খরচ' (শৌচকর্ম) করতে এসেছ বুঝি?

হ্যাঁ, খুড়ো।

ওটা কে সঙ্গে?

কাবুল—তোমার আদরের ঘনশ্যাম।

বাপ ঘনা, ঘনশ্যাম।

কাবুল গামছায় হাত পা মুছতে মুছতে বলে, হুঁ, বল।

আর ক'রাত বায়না আছে রে?

পাঁচ।

আমি—আমি বরঞ্চ কাল একবার বাড়ি ঘুরে আসি, বাছা।

যেও। ...বলে কাবুল চলে যায়।

নন্দ বলে, বাড়িতে কী মধু আছে খুড়ো? বাড়ি গিয়ে মরবে? এস, ছিলিম টানবে আমার সঙ্গে। খাঁটি গরমেন্টের মাল—সারগাছিতে বুনে দিয়েছে। এস, টানবে এস।

হঠাৎ লোভী হয়ে ওঠে কালাগুনিন। দৌড়ে সঙ্গ নিয়ে চাপাস্বরে বলে, মরে যাবার আগে তোমাকেই সব দিয়ে যাব, ঠাকুর। ঘনশ্যামটা নিতে পারবে না। ও বড্ড বোকা আর পাষণ্ড। বুঝলে ঠাকুরমশাই, ওর মনে দয়ামায়া বলে কিছু নাই।

নন্দ শিউরে ওঠে। রুদ্ধশ্বাসে বলে, হ্যাঁ, নাই। ঘনা একটা জন্তু।

সে রাতের আসরে নন্দর কী যেন হয়েছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ চমতে উঠে শরীর নাড়া দিয়েছে আর লাল চোখে কাবুলের দিকে তাকিয়েছে। আমির ধমকেছে, ঠিক্‌সে কত্তাল বাজাও ঠাকুর। তাল কাটছে। কাবুল কটমট করে পাল্টা তাকাতেই নন্দ চোখ নামিয়ে নিয়েছে। তার নেশাটা আজ জমেই নি। আকাশপাতাল দোলানো সে সুখের ঢেউটা আজ আসেনি। মনের ভেতর শুধু ওই এক প্রশ্ন ভোঁস করে শুশুকের মত ভেসে উঠছে: অত ঠাণ্ডা কেন হে কাবুল? দীঘির ঘাটে যাবার আগে অব্দি সে ওই প্রশ্ন বারকয় করেছিল কাবুলকে। কাবুল বলেছিল, আবে চোওপ্‌। ছেড়ে দে। কিন্তু ছাড়তে পারেনি নন্দ। রাত যত বেড়েছে, তত সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বার দুই পেচ্ছাপের ছলে আসর থেকে বাইরে উঠে গেছে। অন্ধকার মাঠের দিকে তাকিয়ে ঝোঁকটা সামলে নিয়েছে। ভয়ে শরীর সিঁটিয়ে গেছে তার। একবার দেখে আসতে পারলে ভাল হত। ঘনাকে কিছু বিশ্বাস নেই। ওর রক্তে কী আছে।

তৃতীয় পাল্লার পর, কাদুর ঘড়িতে রাত তখন তিনটে, ছিলিম টানবার জনে কাবুল বাইরে যেতেই নন্দ তার পেছনে উঠে এসেছে। মেলার আলোর ওধারে পানের দোকানের পেছনে বসেছে দুটিতে। সেই সময় নন্দ হাত রাখে কাবুলের কাঁধে। ঘনা রে!

হুঁ।

একটা সত্যি কথা বলব?

হুঁ।

বিশ্বাস কর মাইরি তোর এঁটো আমি খাইনি।

শালা বেম্মচারী।

বিশ্বাস কর, আমি ছুঁয়েই চলে এসেছি শালীকে।

ক্যানে?

ঘনশ্যাম, আমার হঠাৎ কেমন ভয় হল রে।

ক্যানে, ক্যানে?

ওর গা ঠাণ্ডা। হিম।

হুঁ!

মরা কাঁকড়ার মত শক্ত। চিৎপাত।

হুঁঃ!

ক্যানে রে ঘনা?

ঘড়ঘড় করে হাসে কাবুল। ...ঘনা বাগদী পুরুষ বটে। আর বাবুবাড়ির মেয়েরা বড্ড নরম। ছুঁলেই মুচ্ছো যায় হে ঠাকুর।

নন্দ মাথা দুলিয়ে বলে, না না। ও মুচ্ছো যায় নি! ঘনা, কাবুল! ওর গা অত ঠাণ্ডা ক্যানে রে? মরা কাঁকড়ার মত শক্ত চিৎপাত।

চুপ বে। ছিলিম দে।

ঘনা, তুই কী করেছিস?

এ্যাও শালা!

তুই ওর গলা টিপে ধরেছিলি, ঘনশ্যাম। মেয়েটা মরে গেছে। ...নন্দ ছটফট করে। হাঁসফাস করে বলতে থাকে, হ্যাঁ—তুই ওর চ্যাচানি থামাতে গলা টিপে দিয়েছিলি। ও মরে গেছে। ঘনা তুই খুন করেছিস। তোকে পুলিশে ধরবে। তোর ফাঁসি হবে রে।

কাবুল প্রকাণ্ড থাবায় নন্দর মুখটা চেপে ধরে বলে, চু-উ-প শালা। নিজেও বাঁচবিনে। চু-উ-প।

ছেড়ে দিলে নন্দ চুপ করে যায়। কতক্ষণ চুপ করে থাকে। তার ইচ্ছে করে, ভীষণ জোরে কাঁদতে পারলে কষ্টটার আরাম হত। একটা গভীর পরিতাপ কাঁপতে থাকে তার মনে। আহা, অমন সুন্দর মেয়েটা! ফুটফুটে গোলগাল পুতুল নরম মখমল রঙচঙে! সে বিশাল আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে থাকে। নিজেকে এমন অসহায় লাগে তার।

ছিলিমে মাল ঠাসতে ঠাসতে কতক্ষণ পরে কাবুল বলে, মেলায় এমন হয়। তুই জানিস নে নন্দ, ইটা নিয়ম মেলাখেলা জায়গার। ভিড় থেকে রূপসী তুলে মাঠে নিয়ে পালায়। পার্বতীর মেলা থেকে একবার পোয়াতি রূপসীকে ...

হঠাৎ থেমে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টে সামনে তাকায়। ফিসফিস করে ওঠে। সোনা ওস্তাদ যাচ্ছে!

নন্দ চকিতে ঘুরে দেখতে থাকে।

কাবুল বলে, বসিয়ে রেখে এসেছিল। ভাবছে, এখনও বসে আছে। তাই যাচ্ছে।

নন্দ জড়ানো স্বরে বলে, খুঁজেই পাবে না। ফিরে আসবে।

হুঁ। ভাবে রাগ করে পেয়সী বাড়ি পালিয়েছে।

ঘনা, ঘনা! ওর বাকসোটা?

মাথার কাছে রেখে এসেছি।

বাকসো ক্যানে রে?

সেটাই বুঝতে পারছি নে!

হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠে নন্দ। ...আমাদের ফাঁসি হবে কাবুল! আমরা মরে যাব।

ওর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারে কাবুল। টানতে টানতে একটা কেয়াঝোপের কাছে নিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। নন্দ উঠে বসে। চুপ করে থাকে। মেলার আসরে মনকির ওস্তাদের গান চলেছে।

আজ নিশীথে দেখেছি স্বপন
আমার মন করে কেমন।

গানটা প্রতিধ্বনিময় হয়ে সামিয়ানা আলো আর জনমণ্ডলী পেরিয়ে অন্ধকার আকাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কাবুল বলে, গানটা শোন। মাথা ঠাণ্ডা হবে। কই, দেশলাই জ্বাল। ...

আসর ভাঙতে বেলা দশটা। কাছারিবাড়ির ঘরটাতে সাঁওতাপাড়া দল ফিরে এসেছে। সুবর্ণ সাজ খুলেছে। মুখ ধুয়েছে বালতির জলে। তারপর নীলচে পাজামা শার্ট পরে সনাতনকে ডেকেছে, চলুন ওস্তাদ। মেলা থেকে চা খেয়ে আসি।

সনাতন কাত হয়ে শুয়ে পড়েছিল। জবাব না পেয়ে সুবর্ণ গিয়ে পাশে বসে। তার পিঠে হাত রেখে ফের ডাকে, ওস্তাদ!

সনাতন সাড়া দেয়, কী?

চলুন, মেলায় গিয়ে চা খেয়ে আসি।

থাক। ভাল্লাগে না।

দলের লোকেরা বাইরে বারান্দায় জটলা করছিল। যে দোকানে চায়ের ব্যবস্থা, সেখানে যাবে—নাকি এখানেই আনতে বলবে। ম্যানেজারের মতে, এখানেই এনে দিক। মুড়ির বস্তা বয়ে নিয়ে যাবে কে? নফরকে পাঠানো হল অবশেষে।

কাদু টিউবেলের দিকে দাঁত ব্রাশ করতে করতে এগোচ্ছে। আনিস শিরিসগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে একদল লোকের সঙ্গে কথা বলছে। কাবুল আজ ভারি উদ্যোগী। প্রকাণ্ড ডেকচি আর কড়াই তার হাতে, বালতি খুন্তি, ইত্যাদি ডুবু তবলচি নিয়েছে, দীঘির দিকে এগিয়ে যায়। নন্দকে ডেকে যায়। নন্দ চুপচাপ বসে আছে বারান্দায়। কালাখুড়ো উনোন সাফ করতে ব্যস্ত। আমির একমাত্র চেয়ারটা নিয়ে বারান্দায় অভিজাত ভঙ্গিতে বসে রয়েছে। এইসব সময় আশেপাশের গ্রাম থেকে বায়না নিয়ে লোক আসতে পারে। আসেও প্রতিদিন। একশ টাকা পয়ান হাঁকে সে। দর চড়াতেই হবে এই সুযোগে। বায়নাওলারা ভড়কে যাচ্ছে আপাতত। আমিরের বিশ্বাস, শেষ অব্দি কেউ না কেউ একশতেই রাজি হয়ে যাবে। আমির শিরিসগাছের ছায়ায় আনিস আর সেই লোকগুলোর দিকে প্রত্যাশী চোখে তাকাচ্ছে। সে অধৈর্য। ওরা নির্ঘাৎ বায়না এনেছে। আনিসটা কী করছে! আনিসের ওপর রেগে লাল হয়ে ওঠে সে।

ঘরে সুবর্ণ ঝুঁকে আসে সনাতনের মুখের দিকে। ফিসফিস করে বলে, সুধাদির জন্যে মন খারাপ করছে ওস্তাদ?

সনাতন হাসে একটু। যাঃ!

চলুন না, চা খেয়ে আসি।

সুবর্ণ, মাতালদের নাকি দুধ খেতে নেই। চায়ে দুধ আছে। ...সনাতন আরও হাসে।

সুবর্ণ করে কী, নিঃসঙ্কোচে ওর গালে ঠোঁট নামিয়ে দিয়ে বলে, আপনি ততবড় মাতাল এখনও হোননি মশাই।

সনাতন আবিষ্টভাবে বলে, আমাকে জ্বালাসনে সুবর্ণ। উঠে বস তো।

সুবর্ণ হাসে। ...কেন? প্রেম জাগছে?

না, কাম।

বলে, সনাতন ধুড়মুড় করে উঠে বসে। দরজার বাইরে মস্ত উঠোন। নিচু পাঁচিল সামনে আমবাগান, সেই বটগাছটা। ডাইনে দীঘি। তারপর ধু ধু দিগন্তবিস্তৃত শস্যহীন ঢেউখেলানো মাঠ। বাঁজা ডাঙাটাও নজরে পড়ে। বাজপড়া তালগাছের ডগায় একটা পাখি বসে আছে। ওখানেই সুধার অপেক্ষা করবার কথা ছিল।

সুধা নিশ্চয় বাড়ি ফিরে গেছে। তার মনে হয় একথা। মুখে যাই বলুক, সুধার একা যেখানে খুশি পালানোর সাহস নেই। কিন্তু সুটকেসটা ...

গলায় দড়িটড়ি দিয়ে বসেনি তো? কয়েক মুহূর্ত উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে সনাতন। পরে ভাবে, নাঃ। সুধা নিজেকে মারতে পারবে না। যে মেয়ে পালিয়ে বাঁচতে চায়, জীবনের ওপর তার লোভটা নিশ্চয় বেশি। সুধা বাড়ি ফিরেই গেছে!

দুজনে বেরিয়ে পড়ে। বারান্দায় গিয়ে সুবর্ণ আমিরকে বলে যায়, একটু আসছি ম্যানেজার। চা ওখানেই খেয়ে আসব।

আমিরের ইচ্ছে নয়। কিন্তু সোনাওস্তাদের সামনে সুবর্ণকে বারণ করতে পারে না সে। শুধু বলে, শিগগির আসবি!

গেট পেরিয়ে পাঁচিলের ধারে ধারে হেঁটে দুজনে মেলায় পৌঁছয়। এখন মেলা ফাঁকা। দোকানদারেরা বাইরে উনুনে আঁচ দিয়ে রান্নাবান্নার যোগাড় করছে। শূন্য আসরের সামিয়ানা বাতাসে নৌকোর পালের মত ফুলে-ফুলে দুলছে। একটা চায়ের দোকনে দুজনে গিয়ে বসে পড়ে। চাওলা আপ্লুত হয়ে বলে, আসুন ওস্তাদ। এস, মা-লক্ষ্মী এস!

সুবর্ণ হাসতে হাসতে বলে, হুঁ। সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হোক।

চাওলা গড়ে পড়ে। বিধাতার রসিকতা। প্রথম রাত্তিরে যখন দেখলাম, ভাবলাম ঢপ কিংবা ঝুমুরদলের মেয়ে! পরে শুনি, ও হরি! মেয়ে নয়, ছেলে। তা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না ওস্তাদ। শুধু আমি কেন, কারও বিশ্বাস হচ্ছে না। এই যে এখন সাজ খুলেছে, পাজামা শার্ট পরেছে। তবু কি মনে হচ্ছে? আসলে শালা চোখের ঘোর সবই। আমার চোখে রাতের আসর ঘুচছে কই?

সুবর্ণ ভ্রূভঙ্গি করে বলে, চা দাও। কেক ... আর ওই বিস্কুট, হ্যাঁ, ওগুলো।

সনাতন শ্যামচাঁদের মন্দির দেখছিল। একদল লোক জটলা করছিল দাঁড়িয়ে। কেমন যেন ব্যস্ততা তাদের আচরণে। ওদিকের দোকানগুলো থেকে আরও কিছু লোক দৌড়ে যাচ্ছে! চাওলা চা ছাঁকতে ছাঁকতে সেদিকে তাকাল। ...কী হল রে বাবা?

সুবর্ণ বলে, কী?

ওই যে সব ছোটাছুটি করছে!

সুবর্ণ মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। চেনা মনোহারিওলা এগিয়ে আসে এদিকে। সুবর্ণ বলে, কী হয়েছে দাদা?

আরে, সে এক কাণ্ড! মাঠে নাকি একটা লাস পড়ে আছে। গাঁয়েরই বউ। ...মনোহারিওলা চলে গেল বলতে বলতে।

বাসনের দোকান থেকে একজন চেঁচিয়ে কাকে বলে, সাধুপদ পণ্ডিতের বউ। একলা মেলায় এসেছিল—গুণ্ডারা তুলে নিয়ে গিয়ে রেপ করেছে। মেরে ফেলেছে।

সনাতন লাফিয়ে ওঠে। পাগলের মত বাগানের দিকে দৌড়তে থাকে। সুবর্ণ পেছনে ছুটে যায়—ওস্তাদ, ওস্তাদ!

দলের লোকেরা গিয়ে দেখে এসেছে লাসটা। একটা চৌকিদার পাহারা দিচ্ছে। কাকেও কাছে এগোতে দিচ্ছে না সে। সনাতনকে আনিস ধরে নিয়ে এসেছে। পুলিশ এসে যাবে শিগগির। থানায় খবর গেছে। সাধুপদর ভাইরা নাকি কেউ তখনও যায়নি। সাধুপদ নলহটিতে কী কাজে গেছে। তার কাছে খবর গেছে কি না কেউ জানে না!

বিশাল মাঠের বুকে অনেক রোদ গায়ে নিয়ে সুধা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। গোলগাল পুতুল, চিক্কন মখমল, তুলতুলে! খোলা বড় বড় চোখ। দাঁতের ফাঁকে জিভ। রক্ত!

ওস্তাদ, ওস্তাদ!

উঁ?

হাঁ করুন, ঢেলে দিই।

হুঁ। দাও। ...ঢকঢক করে অবিকৃত মুখে মদ গেলে সোনা ওস্তাদ। দুলতে থাকে। তারপর ডাকে, আনিস!

বলুন, ওস্তাদ।

সুবর্ণ কই?

এই যে আছি। ..সুবর্ণ ওকে ছুঁয়ে থাকে।

সুবর্ণ, সুধাকে কে খুন করেছে জানিস?

ও কথা থাক ওস্তাদ।

হুঁ, থাক। আনিস, মদ দাও।

আমির ধমক দিয়ে বলে, আনিস! কী হচ্ছে! অত খাওয়াচ্ছিস কেন?

কাদু বলে, থাক না। আজ তো আসর বন্ধ।

কালাচাঁদ বলে, আজ কী? আর আসর চলতেই দেবে না শুনলাম। দারোগাবাবুর হুকুম। মেলাও নাকি উঠে যাচ্ছে।

আমির চিন্তিতমুখে বলে, একবার লায়েকদের ওখানে যাই। কথাটা জেনে আসি। খামাকা পড়ে থেকে লাভ কী? বাড়ি ফিরে যাব।

কাবুল ঘরের কোণে কাঠ হয়ে ঘুমোচ্ছে। নন্দ তার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে লাল চোখে বাইরের লালচে রোদ দেখছে। নাকি আকাশ দেখছে। নাকি অন্ধকার দেখছে। অন্ধকারে ঠাণ্ডা মেয়ে। মরা কাঁকড়া চিৎপাত।

ডুবু চিৎ হয়ে শুয়ে গুনগুন করে গাইছে। তাড়ি ছাড়া তার জমে না। একটু আগে বাগদীপাড়ায় গিয়ে একপেট গিলে এসেছে। সে অনন্ত নিরাসক্তিতে বুঁদ।

সুবর্ণ!

হ্যাঁ, ওস্তাদ?

ছুঁয়ে থাক। আনিস, মদ দাও।

অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস, ওস্তাদ। ...

সন্ধ্যার দিকে লায়েকদের চরম কথাটি জানা গেল। গান আপাতত বন্ধ। পয়সা-কড়ি চুকিয়ে দিয়েছে দুটো দলকেই। মনকির ওস্তাদ যাবার আগে দেখা করতে এসেছিল। সোনা ওস্তাদ নেশার ঘোরে ঘুমোচ্ছে। নমস্কার রইল, বলে মনকির চলে গেছে।

সোনা ওস্তাদকে নিয়ে ঝামেলা। সন্ধ্যার পর একটা ট্রেন আছে। নন্দ আর কাবুল চলে গেছে স্টেশনে। তাদের সঙ্গে যন্ত্রপাতি নিয়ে কালাচাঁদ আর নফরও গেছে। আনিস ওস্তাদের পাশে বসে আছে। কাদু আর সুবর্ণ বারান্দায় সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। আমিরও তৈরি।

কিন্তু ওস্তাদের ঘুম ভাঙে না। আমির গজগজ করছে। ট্রেন ফেল হবে নির্ঘাৎ। ও আনিস, ওনাকে ডাক না রে! এ তো আচ্ছা জ্বালায় পড়া গেল!

ওস্তাদ, ওস্তাদ?

উঁ?

উঠুন। ট্রেন ফেল করব যে।

হুঁ। উঠি।

এবার সনাতন উঠে বসে। চোখ কচলে তাকায়। রোদ ফুরিয়ে গেছে। কাছারির প্রাঙ্গণটা স্তব্ধ আর ফাঁকা। আমির মোটা ছড়ি হাতে ব্যস্তভাবে পায়চারি করছে। সনাতন টলতে টলতে ওঠে। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়। ওর ডান বাহুটা ধরে রাখে। আনিস! সুবর্ণ এগিয়ে এসে বলে, হাঁটতে পারবেন তো?

সনাতন জবাব দেয় না। বারান্দা থেকে নেমে আমিরকে বলে, চলুন। পাঁচজন গেনে মানুষ আস্তে আস্তে হেঁটে যায় স্টেশনের দিকে। ...

ট্রেনের দেরি আছে তখনও। প্ল্যাটফর্মের শেষ দিকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল সোনা ওস্তাদ আর সুবর্ণ। হঠাৎ সুবর্ণ বলে, একটা কথা তখন থেকে মাথায় ঘুরছে। বলা হয়নি। কাল রাতে আপনি সুধাদির কাছ থেকে এলেন ব্যাগ নিতে। তখন নন্দ-ঠাকুর আর কাবুলদাকে বটতলার দিকে যেতে দেখেছিলাম। আমি ভাবছি, ওরা কিছু করেনি তো?

সনাতন চমকে উঠেছিল। ...নন্দ আর কাবুল!

হ্যাঁ। ওরা জানতে পেরেছিল, আপনি সুধাদির কাছে ছিলেন। কাবুলদা যাবার সময় কী বলে গেল, মনে পড়ছে। হ্যাঁ ...বলল, আয় রে ঠাকুর, দেখে আসি কী খেলা খেলছে সোনা ওস্তাদ।

সনাতন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কথা বলতে পারে না।

ওদের ধরিয়ে দিন। সুবর্ণ ফিসফিস করে। ...এক্ষুনি পুলিশকে বলুন। ওই তো ওখানে একজন পুলিশ দেখছিলাম। নাকি, আনিসদাকে বলব? সে পারবে।

সনাতন বলে, থাক।

কেন থাকবে? পাপী পাপের শাস্তি পাবে না?

কে জানে কে পাপী, সুধা না ওরা!

কী বলছেন ওস্তাদ!

আমি তো বিচারক নই, সুবর্ণ।

সুবর্ণ একটু চুপ করে থেকে বলে, কিন্তু সব জেনেশুনে ওই খুনি দুটো দলে থাকবে, আর সেই দলে গান করব? আমি পারব না ওস্তাদ। আমার ভয় করছে। ঘেন্না হচ্ছে।

আমিও কি পারব সুবর্ণ? পারব না।

নির্জন অন্ধকারে মুখোমুখি ঘন হয়ে আসে সুবর্ণ। দুহাতে সোনা ওস্তাদকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলে, চলুন, আমরা পালিয়ে যাই।

চোখ জ্বলে ওঠে সোনা ওস্তাদের। ...যাবি?

যাব।

চারপাশটা চকিত চোখে দেখে নেয় দুজনে। দলের লোকেরা দূরে স্টেশনের বারান্দায় ট্রেনের অপেক্ষা করছে। নিচু প্লাটফর্মের ওপর কেরোসিন বাতির মৃদু আলো পড়েছে। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

দুজনে প্লাটফর্ম পেরিয়ে লাইনের ধারে ধারে আপ স্টেশনের দিকে হাঁটতে থাকে। সিগন্যাল নীল হয়ে গেল। গাড়ির আলো গায়ে পড়বে বলে বাঁদিকে মাঠে নামে ওরা। লাইনের সমান্তরালে হাঁটতে থাকে। মাথার ওপর অজস্র নক্ষত্র ওদের অনুসরণ করে।

কতদূর গিয়ে ওরা একবার থামে। ট্রেন আসছে। ট্রেনটা আলো নিয়ে চলে গেলে ওরা লাইনে গিয়ে ওঠে। দলের লোকেরা খুঁজবে। হয়ত ভাববে, অন্য কোন কামরায় উঠেছে। ...

আপের স্টেশন পাঁচ মাইল দূরে। হনহন করে হাঁটে দুজনে। কোন কথা বলে না। কোথায় যাবে, কিছু ভাবেই না। শুধু মনে হয়, পৃথিবীটা খুব ছোট নয়। আর যেতে যেতে বিহ্বলতায় হঠাৎ থেমে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে। ঠোঁটে ঠোঁট রাখে। আর ঘৃণা নয় সোনা ওস্তাদের। এই আবেগ, এই ভালবাসা, এই শরীর ছোঁয়া আবেশ—মায়া নামে নারীর উদ্দেশে। যে নারী নটী—যার ছায়া পড়েছে এক কিশোর পুরুষদেহে, যে ছায়া সারাবেলা নাচে। সেই ছায়াকে নিয়েই যত খেলা। যত পালাগান, কান্না, সুখ, ভালবাসা।

...কিন্তু সাবধান সোনা ওস্তাদ। ছায়ার পেছনে হাত বাড়িয়ে কিছু খুঁজো না। সেখানে বিষম অনর্থ। সেখানে পাপ। জঘন্যতা। প্রতিমার বুকের ভেতর শুকনো পাঁক খড় কাঠ আবর্জনা। তুমি সাবধান। অধরাকে রক্তমাংসে ধরতে গেলেই বিপদ।

পদ্মা-গঙ্গা-অজয়-ময়ূরাক্ষীর ওপর অনন্ত আকাশ থেকে ওস্তাদ ঝাঁকসার গুরু ওস্তাদ মনিরুদ্দিন বিশ্বাস চিৎকার করে ওঠে, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার! তোমার সামনে মায়া। ছায়ারূপী মায়া। তার পেছনে ভয়ঙ্কর জাহান্নাম।

সুবর্ণ!

ওস্তাদ!

কোনদিন আমাকে ছেড়ে পালাবিনে তো?

আপনি পালাবেন না তো?

না।

আমিও না!

চল, আমরা ওস্তাদ ঝাঁকসার কাছেই যাই।

আমিও তাই ভাবছিলাম, ওস্তাদ।

সামনে স্টেশনের সিগন্যাল বাতি লাল। ওখান থেকে আজিমগঞ্জ হয়ে জঙ্গীপুর—তারপর গঙ্গা পেরিয়ে ধনপতনগর। ওস্তাদ ঝাঁকসার বাড়ি থাকার কথা। না থাকলে, যেখানে আছে—সেখানেই চলে যাবে দুজনে। পদ্মার ওপারে মালদহে আলকাপের বড় খ্যাতি। ওস্তাদ ঝাঁকসাকে বলবে, চলুন—পদ্মার পারে দিগ্বিজয়ে যাই। সুবর্ণর মত মোহিনী ছোকরা, ফজলের মত কপে, আপনি ওস্তাদের রাজা—আর আমি সোনা মাস্টার, হ্যাঁ আমি আপনার সোনা মাস্টার হয়েই থাকতে চাই ওস্তাদজী!...

অনেক গান আর মায়া ভরা একটা জগতের দিকে হেঁটে যেতে যেতে দুটি মানুষ একসঙ্গে গুনগুন করে ওঠে।

কী আনন্দ দেখে গো নভে নবীন চাঁদের উদয়।
মায়ায় মায়ার যাক না জন্ম, যদি আরেকজন্মে সত্যি হয়।

গাইতে গাইতে একটা হাত আরেকটা হাত ধরে থাকে। একটা শরীর আরেকটা শরীরকে ছোঁয়। ফের কে গর্জে ওঠে, হুঁশিয়ার। পিছনে জাহান্নাম! মনে মনে চমকে ওঠে সোনা ওস্তাদ। তবু সেই হাতটা ছাড়ে না। সুবর্ণকে ছুঁয়ে থেকে একটা নতুন পালা বাঁধবার সাধ হয়।

মেয়েদের মত দীঘল কেশ, দুহাতে চাঁদির চুড়ি, নীলচে শার্ট আর পাজামা, পায়ে কাবুলি চপ্পল, ফরসা মুখের চাপা চিবুক, মসৃণ নিটোল গাল, টানা চোখ, পুরুষ তবু পুরুষ নয়, নারী—অথচ নারীও না; সে কিম্পুরুষও নয়—

সে এক অমর্ত্য মায়া। তাকে নিয়েই দেশে দেশে মৃদঙ্গ বাজে।

একান্ত গোপনে



১

খুরশিদ ম্যানসনের ওপর বড়ো একটুকরো মেঘ এসে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বিলু বা শামীমআরা হোয়াটনটের মাথা থেকে সুদৃশ্য পুতুলগুলো নামিয়ে রাখছিল পাশের সোফায়। একবার হঠাৎ কাছের জানলার রডে নাক রেখে আকাশ দেখে নিয়ে বলল, 'দেখে যাও।'

শেখর খুব কাছের সোফায় কোণঠাসা হয়ে বসেছিল। একটা পুতুল হাতে নিয়ে একটু ঝুঁকে তার গঠনসৌন্দর্য লক্ষ্য করছিল। মুখ তুলে বলল, 'কী?'

'দেখেই যাও না বাবা!' বিলুর ঠোঁটের কোণে হাসির মতন কী একটা কাঁপন কিংবা ঝিলিক।

শেখরের মাথার ওপর জানলা। প্রতিমার চোখের প্যাটার্ন রুপোলি ফ্রেম। মোট পাঁচটা সারিতে দশটা বিলোল কটাক্ষ। শেখর মাথা ঘুরিয়ে জানলার বাইরে তাকাবার চেষ্টা করে বলল, 'কই কী?'

বিলু ঠোঁটে কুঞ্চনটুকু নিয়ে সরে এল। মুরগির গুচ্ছ-গুচ্ছ ডানায় সাজানো ঝাড়নটা দিয়ে হোয়াটনটের ওপর ধুলো সাফ করতে ব্যস্ত হল।

'বললেন না যে?'...একটু হাসল শেখর।

এই মুখভঙ্গী গাম্ভীর্য নয় বিলু বেগমের, পরিচিতরা জানে। এটা অন্যমনস্কতা—যখন খুব অগোছাল হয়ে থাকে মন। চাঞ্চল্য থাকে, তবে সেটা শারীরিক অন্যান্য প্রত্যঙ্গে সীমাবদ্ধ। স্থির প্রশান্ত মুখ তার একখানা প্রোফাইল।...'কিছু না। এমনি বলছিলুম।'...দ্রুত কাজ করতে করতে সে জবাব দিল।

শেখর বলল, 'আমি বলতে পারি।'

'কী?'

'বৃষ্টি।'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে বিলু বলল, 'যাঃ!'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে শেখর বলল, 'মানে—মেঘ।'

তখন বিলু হাসল। অর্থাৎ ঠিক বলেছ। একটা কালো হাবসী পুতুল তুলে নিয়ে সে বলল, 'গরম এত বেড়ে যাচ্ছে, তবু বৃষ্টি হচ্ছে না কেন বলতে পার?'

'আজ হবে।'

'বাজি হোক।'

'তাই হোক। বৃষ্টি হলে কী দেবেন বলুন?'

বিলু পিছন ফিরে পুতুল সাজাতে সাজাতে ছোট্ট করে বলল, 'কী পেলে খুশি হও?'

শেখর সোজা বলে দিল, 'সেদিনের মত মোগলাই খিচুড়ি।'

বিলু ঘুরে চোখ পাকিয়ে বলল, 'মুসলমানের বাড়ি এলেই তোমরা হঠাৎ ভীষণ উদরসর্বস্ব হয়ে ওঠ। খাওয়া ছাড়া আর কিছু আমাদের বুঝি থাকতে নেই?'

শেখর হাসতে লাগল। 'সে আপনি যাই বলুন ভাবী, চলতি প্রবাদ আছে জানেন না? হিন্দুর বাড়ি, মুসলমানের হাঁড়ি।'

বিলু একপা এগিয়ে ঝাড়নটা তুলে বলল, 'কী বললে, কী বললে?'

'হিন্দুর বাড়ি আর...'

'উঁহু—জাস্ট আগের লাইনটা?'

টের পেয়ে শেখর বলল, 'ওঃ হো! কিন্তু আমি তো সেদিনকার মত ভাবীজী বলিনি—জীটা স্রেফ্ কেটে দিয়েছি।'

'তোমার মুখে ভাবীটা কী বিচ্ছিরি শোনায়, তুমি জানো না।'...বিলু আবার কাজে মন দিল।

শেখর মুখ টিপে হেসে বলল, 'বৌদি!'

'খুব স্বাভাবিক শোনাচ্ছে।'

'সেই বাজির কী হল?'

'বৃষ্টি না হলে তুমি কী দেবে?'

শেখর একটু ভেবে কিছু খুঁজে না পেয়ে বলল, 'যা চাইবেন।'

বিলু ঘুরল চকিতে।...'যদি আকাশের চাঁদ চাই—পারবে তো দিতে?'

'তা কেন? মানে—আমার সাধ্যের মধ্যে যা আছে।'

বিলু হঠাৎ গলা চড়িয়ে ডাকল, 'রেখা, ও রেখা, হল তোর? এ মেয়েকে নিয়ে আর পারিনে। কখন বলেছি!' তারপর শেখরের দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে বলল, 'সাধ্যে যা আছে, তা দেবার সাধ্য থাকা চাই।' পরক্ষণে একটু স্বাভাবিক হেসে বলল, 'তুমি আমাকে একটা গীতবিতান এনে দেবে।'

'গীতবিতান তো আছে আপনার—সব কটা পার্টই দেখছিলুম।'

'ওটা এক্সট্রা থাকবে।'...বলে বিলু আবার সেই থেমে-থাকা মেঘটা দেখে নিল জানলায়। 'আশ্চর্য তো! মেঘটা নড়ছে না। ওদিকটায় কেমন রোদ, এবাড়ির ওপর ছায়া। আচ্ছা শেখর...' সে ঘরের ভিতরটা একবার দেখে নিয়ে বলল, 'আমাদের এই শোবার ঘরটা তো বেশ ছোট্ট। এটা এয়ারকনডিশন করলে খুব বেশি খরচা নিশ্চয় হয় না!'

অকারণে উৎসাহিত হয়ে শেখর বলল, 'খুব চমৎকার হয়। দাদাকে বলুন না! আমার মামা তো করে নিয়েছেন—সাউদার্ন এভিনিউতে। তেতলার ঘর। একা থাকেন পড়াশোনা নিয়ে। জাস্ট এই সাইজই হবে।'

'বলব!' বলে একটু হেসে ফেলল বিলু।...'তবে নির্ঘাৎ প্রথমে একটি দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস পড়বে সায়েবের। গাঁয়ের মাঠের কিছু জমির জন্যে। এদিকে জমির আয় খরচার আদ্দেকও নয়। শরীয়তী দায়ভাগ কী জিনিস, তুমি জান না শেখর। উনি বাইরে, সেই সুযোগে লুঠপাট যা হবার হয়ে যায়। তিনটে মামলা এখনও চলছে—তা জান?'

'তিনটে মামলা?'

'হ্যাঁ। একটা হাইকোর্ট, দুটো মফঃস্বলে। তাই দেখ না, প্রায়ই দেশে যেতে হয় সায়েবকে!'

'দাদাকে আপনি সায়েব বলেন কেন, বউদি?' শেখর নিরীহভাবে প্রশ্ন করল!

বিলু চটুল হাসল—এ সময় তার চেহারায় বালিকার সরলতা ফোটে, অবশ্য খুব কম সময়ের জন্যে। সে বলল, 'বাবু বললে আমার চোখে বোকা বোকা ভীতু-টাইপ ধুতি-পাঞ্জাবি পরা চেহারা ভাসে।'

শেখর বলল, 'কেন—অনেক মুসলমান ভদ্রলোক তো পরেন!'

'সেইজন্যেই তো উনি সায়েব। উনি বলেন, ধুতি পরলেই মনে হয় নাকি স্ত্রীলোক হয়ে যাচ্ছেন!'

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল। শেখর সশব্দে, বিলু মৌন। শেখর বলল, 'তা ঠিক। সেজন্যে আমিও পারিনে। একবার এক বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী যাচ্ছি। ধুতির কোঁচাটা...'

কিশোরী ঝি-মেয়েটি এল ট্রে-হাতে। শেখর আঁতকে উঠে বলল, 'বারোটার সময় চা খাবে কী? আমি এখন গিয়ে স্নান করব, ভাত খাব।'

বিলু ট্রেটা কফিটেবিলে নামিয়ে রাখল ওর হাত থেকে।...'আমি কিন্তু দুবার ভাত খাই—সরি, তিনবার। শেখর, প্রথম যেদিন দেখেছিলে—সেদিনের চেয়ে একটু মুটিয়েছি না? সায়েব যখন আপিস যান, পাশে বসে খেতে হয়। হোল ফ্যামিলিকে পাশে চাই ও'র। চোখে না দেখলে তো বিশ্বাস করতে পারেন না যে আমি সত্যি খাই। না খেয়েই নাকি এমনি রোগা হয়ে গিয়েছিলুম, তাই। তারপর ঠিক একটায় স্নান করে আবার ভীষণ ক্ষিদে পায়। তখন সত্যিকার লাঞ্চ। বল না শেখর, দশটায় খাওয়া যায় নাকি?'

শেখর বলল, 'যায় না। আমি তো সবার শেষে দেড়টা-দুটোয় খাই।'

'রেখা, কিসে চা করলি রে? গ্যাস নয়ত? দেখিস বাবা, যা সব সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটল। আমার ছেলেপুলের ঘর, কখন কী করে রাখবে এই মেয়েটা!' গৃহিণীর ভঙ্গিতে বিলু কাপে লিকার ঢালতে থাকল।...'হঠাৎ তোমাকে দেখে চা খাবার ইচ্ছে হল আজ। আমি চা খেতে ভালবাসিনে। খুব কদাচিৎ। রেখা, হাঁ করে কী দেখছিস? দুধটা গরম করে বোতলে ঢেলে রাখ্। যা। এক্ষুনি টুকুন উঠে কান্নাকাটি করবে।'

শেখর বলল, 'ওর নাম রেখা কেন, বউদি?'

'কার নাম?' বলে বিলু ওর দিকে তাকাল। তারপর রেখার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'সায়েবের গাঁয়ের মেয়ে। একটাও ঝি টিকছিল না। ছেলে-ছোকরা রাখতে ভয় করে। না—মানে চুরি খুনটুনের জন্যে। কাগজে পড় না? শেষ অব্দি ওকে নিয়ে এল। মন্দ না। কিন্তু বোকা আর নোংরা। গাঁয়ে তো ভীষণ দুর্দশা চলেছে। না-খেয়ে না খেয়ে রোগা টিংটিংয়ে হয়ে গিয়েছিল! নাম জিজ্ঞেস করলুম, বললে বুঁচি। শ্লেটে স্কেচে আঁকলে কেমন লাগে দেখেছ? আমি বললুম, 'তোর নাম রইল, রেখা।'

'তোমার মাথায় দারুণ সব আইডিয়া খেলে, বউদি!'...চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিল শেখর।

বিলু পাশের একক আসনের সোফায় বসে চায়ের কাপ তুলে ঠোঁট রাখল। মৃদুতম শব্দও শোনা গেল না। মুখ তুলে বলল, 'দশটা থেকে চারটে অব্দি বেশ লাগে। তারপর চিকন আর ঝুমঝুমি স্কুল থেকে ফিরলেই ব্যস! ধুন্ধুমার। সত্যি, পাশের ফ্ল্যাটের ওরা সব কী ভাবেন কে জানে। তোমরা শুনতে পাও না?'

শেখর বলল, 'কে জানে।'

'তুমি তো এ ঘরটার ঠিক নিচেই থাকো?'

'তাই বুঝি? আমি অত লক্ষ্য করিনে।'

'হ্যাঁ। ঠিক এরই নিচে।'...বিলু জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আশ্চর্য তো! অতক্ষণ ধরে মাথার ওপর মেঘটা রয়েছে! কোন সাড়া নেই দেখছ? এই! আমরা কিন্তু বাজির টাইম ফিক্স করিনি। কুড়ি, না ত্রিশ মিনিট?'

শেখর ঘড়ি দেখে বলল, 'দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে সম্ভবত।'

বিলু বলল, 'তাহলে নতুন করে হোক। আধ ঘণ্টা টাইম রইল।'

শেখর নড়ে উঠল।...'না বউদি। আজ একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। অতক্ষণ বসা যাবে না। অবশ্য, আমি না থাকলেও বাজির কোন অসুবিধে নেই। হারলে, বলবেন হেরে গেছো। জিতলেও বলে দেবেন।'

'সিনেমায় যাবে তো?'

'নাঃ। ওসব ভাল্লাগে না।'

'কার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, শেখর?'

'বন্ধু।'

'অপজিট সেক্স?'

শেখর হো হো করে দুলেদুলে হাসল।...'যান! সে আমার মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের ব্যাপার।'

'শেখর, তোমরা দার্জিলিং যাবে বলেছিলে—সে কবে?'

আজই তারিখ ঠিক হবে। কেন? যাবেন নাকি?'

বিলু চায়ের কাপ হাতে জানলার দিকে তাকিয়ে কী ভাবতে লাগল।

'দাদাকে বললেই তো হয়ে যাবে। চিকনদের স্কুলের ছুটি কবে হচ্ছে?'

'সামনের সপ্তায়।'

'যাবেন? চলুন না—ভারি ভাল লাগবে।'

চা শেষ করে কাপ রেখে শেখর এক মিনিট জবাব শোনবার জন্যে বিলুর দিকে তাকিয়ে রইল। বিলু কিছু ভাবছে। তারপর ঠোঁট কামড়ে তাকাল শেখরের দিকে। তারপর সেও কাপটা রেখে দিল। মুখ ঘুরিয়ে ডাকল, 'রেখা!'

কিচেনের ওদিক থেকে সাড়া এল—'যাই মাজী।'

শেখর বলল, 'কী বলল? মাজী না?'

মাথাটা মৃদু দোলাল বিলু।...'রেখা, এগুলো নিয়ে যা।'

'আমি উঠছি বউদি।'

'উঠবে?'...বলে বিলু উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

শেখর উঠে দাঁড়াল।...'বাজি জিতলে কী যেন খাব বলেছিলুম? হ্যাঁ, মোগলাই খিচুড়ি!' বলে একটা জবাব শোনার জন্যে বিলুর দিকে তাকল। বিলুর মুখটা নির্লিপ্ত—একই রকম। ফ্যানের বাতাসে কপালের ওপর কিছু চুল উড়ছে। খোঁপাটা ভেঙে কাঁধে গড়িয়ে পড়েছে। পায়ের ওপর পা তুলে বসেছে সে, হাত দুটো হাঁটুর কাছে—আঙুলে আঙুল সেলাই-করা।

বিলু শুধু বলল, 'আচ্ছা।'

শেখর চলে গেল। যাবার সময় ওঘরে ছোট্ট খাটে ঘুমন্ত টুকুনের গালে আঙুল ছুঁইয়ে আদর করে গেল। বিলু উঁকি মেরে দেখল। তারপর ধীরে-সুস্থে উঠল। হাই তুলে একটু আড়মোড়া দিয়ে পুতুলগুলোর দিকে তাকাল। গন্ধর্ব মিথুন-মূর্তির একটা হাত ঝুমঝুমি ভেঙে দিয়েছে। কী দুরন্ত মেয়ে না পেটে এসেছিল! ছেলেবেলায় বিলু কি অতখানি দুরন্ত ছিল? কয়েক মুহূর্ত ধরে তার ছেলেবেলাটা অস্পষ্ট কিছু দৃশ্যে ভেসে এল। তারপর হঠাৎ দ্রুত সে পাশের ঘরের দিকে এগোল। টুকুন তাকাচ্ছে। হয়ত শেখরই জাগিয়ে দিয়ে গেল। বিলু ঝুঁকে গালে চুমু খেল। তারপর বসবার ঘরের ভিতর দিয়ে গিয়ে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিল। সশব্দে।

এই ঘরটা খাবার ঘর—যেখানে টুকুন শুয়ে আছে।

ছোট্ট করিডোরের মত একফালি বারান্দায় ওই বাইবে যাবার দরজা। কপাটে পেতলের ফলকে ইংরেজিতে লেখা আছে ডঃ হাসান আলি। সশব্দে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনিটায় অন্তত আধ মিনিট বিলু আঙুল ছুঁয়ে রাখল—ডান হাতটা স্বভাবত উর্ধ্ববাহু। তারপর আস্তে আস্তে ঘুরল। পাশে কাপড়রাখা সেগুন কাঠের আলনার দিকে একবার তাকাল। এগিয়ে গিয়ে অকারণে চিকনের প্যান্ট আর ঝুমঝুমির ব্লাউস স্কার্ট নাড়াচাড়া করে রেখে দিল। আলনার ওদিকে জুতো রাখবার ছোট্ট তিন থাক টবের বাক্স মত। বিশেষভাবে তৈরি। সামনে গিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে জুতোগুলোর ওপর ধুলো খুঁজল হয়ত। বাঁহাতি বাথ ও টয়লেট ঘর একত্র। একবার দরজা খুলে উঁকি দিয়ে আবার বন্ধ করে দিল সে।

এখানেই চিকনদের ঘরের দরজা। ঘন নীল পর্দা ঝুলছে। পর্দাটা একবার তুলে চলে এল। বারান্দাটুকু পার হতে হতে হঠাৎ গুন গুন করে উঠল, 'মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে...' তারপর টুকুন কেঁদে উঠেছে। প্রায় দৌড়ে বসবার ঘর পেরিয়ে গেল সে।

'এই তো! হিসি করেছ তো।' আদর করতে করতে টুকুনের পা দুটো তুলে তোয়ালেটা বদলে দিল বিলু।...'রেখা, একে ধর।' ডাকল সে।...'ওখানে পা ছড়িয়ে বোস, দিচ্ছি। দেখছ? দুধের বোতল কই?'

রেখা কিচেনে ঢুকে দুধেব বোতল আনল। তারপর গিন্নির নির্দেশমত পা বাড়িয়ে মেঝেয় বসল—দেয়ালে পিঠ। সাবধানে টুকুনকে রেখে বিলু বলল, 'দুধটা সব খাওয়াবি। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে।'

টুকুন কান্না থামিয়ে দুধের বোতলে মুখ রেখেছে। বড় বড় দুটো চোখ মায়ের দিকে। এক মুহূর্তের জন্যে বিলুর মনে পড়ল, এই সুন্দর শান্ত স্বভাবের ছেলেটি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জন্ম নিয়েছিল!...'রেখা, তাহলে আমি স্নানটা সেরে নেই!...হ্যাঁরে', ...হঠাৎ আঁতকে উঠল যেন।...জল আছে? চলে যায় নি তো?'

দৌড়ে সংলগ্ন বড় বাথ-কাম-টয়লেটের দরজা খুলে দেখে নিল বেসিনের ট্যাপটা। আছে! কখন দুম করে চলে যাবে বলা যায় না। নিচে পাম্প চালানোর দায়িত্ব দারোয়ানের। সে অনেক সময় খাটিয়ায় পড়ে ঘুমোয়। এদিকে ছাদের ওপর ট্যাঙ্ক খালি নিচের ট্যাঙ্ক ছাপিয়ে নল বেয়ে জল গড়াচ্ছে। এ বাড়িতে উঠে এসেছে মাস ছয়েক আগে। আসাঅব্দি এ জল-দুর্ঘটনা প্রায় হচ্ছে। তালতলা এলাকায় নিজের বাড়ি ছিল টুকুনের বাবার। পাম্প দরকার হবে না। ওপরে-নিচে চারটে ঘরই নিজেরা রেখেছিল। উঠোনের বিশাল টবে সারাক্ষণ জল। হাসান এ-নিয়ে প্রায় আফসোস করে। যেন যত দোষ বিলুর—বিলুই নিজের

বাড়ি ভাড়া দিয়ে ভাড়ার ফ্ল্যাটে আসতে প্ররোচিত করেছিল। বিলু রেগে যায়।...'ওই নোংরা বাজে পরিবেশে থাকলে চিকনদের মানুষ করা যেত না। ঝুমঝুমি তো নয় পেরোচ্ছিল সবে। এরই মধ্যে রাস্তার লোকগুলো...ছিঃ! তোমার কোন সেন্স তো নেই কোনদিন।'

এবং একটু বেশি রাগলে আরও বেশি কিছু বলে ফেলতে ইতস্তত করে না বিলু। সেটা হাসানের গ্রাম্যতা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে। ডঃ হাসান, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উঁচুতলার অফিসার—তার মনের ভিতর কোথায় সেই ঝাঁপুইহাটি না 'বাবুখালির' বিশুদ্ধ চাষা লুকিয়ে আছে বিলু তাকে আবিষ্কার করতে দ্বিধা করে না। এবং নিজের বিষয়ে ঃ 'আমরা কয়েক পুরুষ ধরে কলকাতার লোক। কলকাতা আমার রক্তে আছে।'

এই বিশাল বাড়িটা দেশ ভাগের সময় ছিল অবাঙালি মুসলমানের সম্পত্তি। তখন ওপর-নিচে প্রতিটি ফ্ল্যাটে অবাঙালি ও দু-একটা বাঙালি মুসলমান পরিবার বাস করত। পরে এক বাঙালি হিন্দু কিনে নেন। এখন তাঁর ছেলে মালিক। তাঁর অনেকগুলো একেলে রীতির বাড়ি আছে। তাই এই সেকেলে বিলিতি ধাঁচের বাড়িটার প্রতি মনোযোগ কম। খুরশিদ ম্যানসন নামটাও বদলানোর গরজ ছিল না। এদিকে স্বভাবত অবাঙালি মুসলমানরা পাকিস্তান চলে গেলে কিছু বাঙালি হিন্দু আর এক মাদ্রাজী পরিবার খুরশিদ ম্যানসনে এসে জুটেছিলেন। এই মাদ্রাজী ভদ্রলোক হাসানের সহকর্মী। উনি দিল্লি বদলি হয়ে গেলেন, রিটায়ার করার আগের বছর। হাসানকে ম্যানেজ করে দিয়ে গেলেন স-ফোন ফ্ল্যাটটা।

এই ফ্ল্যাটে আসতে অবশ্য বেশ দ্বিধা আর অস্বস্তি ছিল গোড়ায়। কিন্তু বিলুর জেদ। তার বক্তব্য ঃ 'হিন্দুদের আমি তোমার চেয়ে বেশি চিনি। আমি ওদের মধ্যেই মানুষ হয়েছি। তুমি জান, কোন মুসলমান মেয়ের সঙ্গে আমার বনে না?'

কেন বনে না, হাসান ভালভাবেই জানে। হাড়ে-হাড়ে টের পায়। এই বাড়িতে আসার পর হাসান প্রথম-প্রথম একটু সংকোচে থেকেছে। বিলু তা 'সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্ব' বলে ব্যাখ্যা করেছিল। গুরুগম্ভীর স্বভাবের হাসান সত্যি এখানে আসার পর কিছুদিন দারুণ অমায়িক আর মহানুভব হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য ফ্ল্যাটের লোকেদের সঙ্গে নিজে আগ-বাড়িয়ে কথা বলত না। সিঁড়িতে উঠতে-নামতে দেখা হলে সাবধানে অনেকটা জায়গা ছেড়ে দিত। পরে তার সংকোচটা কেটে গেছে। এবং ভীষণভাবে আপাতদৃষ্টে বদলেছে। কোন ফ্ল্যাটে কেউ অসুস্থ হলে গিয়ে খবর নিয়ে আসে। তালতলায় ওকে কেউ বিশেষ পছন্দ করত না। এখানে সে হাসানদা, হাসানবাবু কদাচিৎ হাসানসায়েব এবং ডক্টর হাসান। এদিকে বিলুও বদলেছে।

কতকগুলো বদল বেশ অদ্ভুত। যেমন সিঁথিতে সিঁদুর পরে। এবং প্রায়ই বলে, বাগবাজারে গিয়ে একদিন দুটো উৎকৃষ্ট শাঁখা কিনে আনবে। এখানে সে আর ভুলেও পানি বলে না—বলে, জল। মুসলমানী বাংলা বলে একটা ভাষা আছে—বিলু বরাবরই অবশ্য এ-ব্যাপারে সবিশেষ সচেতন; 'সে-ভাষা আবার কী' বললে হাসানকে শুনিয়ে দ্যায়—গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে যে ভাষায় তুমি কথা বল, কিম্বা তালতলায় যে-ভাষায় প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলতে।'

'যেমন?' হাসান উদাহরণ চেয়েছে।

'যেমন?'...বিলু চাপা হেসেছে। 'ভাত বাড়োর বদলে খানা নিকালো। ব্রেকফাস্ট রেডি করোর বদলে নাশতা ইনতেজাম কর। আরো চাই?'

'থাক। যে যা জবানে অভ্যস্ত ছেলেবেলা থেকে।'

বিলু হাততালি দিয়ে হেসেছে।...'ব্যস। জবান। ওই তো, ওই তো!'

হাসান রাগে কম। সেদিন রেগেছিল।...'হ্যাঁ, এবার ঠাকুরপুজোটাও শুরু কর।'

'সে তো শুরু হয়ে গেছে।' বিলু দমেনি একটুও।...এই তো সেদিন পাশে ইন্দিরাদির ফ্ল্যাটে সরস্বতী পুজো হল—তোমার চিকন-ঝুমঝুমি অঞ্জলি দিয়ে এল...'

'তুমি দাওনি?'

''আমি তো ছাত্রী নই। যখন ছাত্রী ছিলুম, তখন দিয়েছি।'

'ছাত্রজীবনে আমিও সরস্বতী পুজোয় যোগ না দিয়েছি তা নয়। ওতে কিছু প্রমাণ হয় না।'

'দাড়ি রাখ না কেন?'

তখন হাসান হাসে। হাসলে ওকে আরও সুন্দর দ্যাখায়।

'ক'বার নামাজ পড়েছ জীবনে? আমি তো দেখিনি—আজ বারো বছর কাটালুম।'

'সেই বিয়ের সময়—একবার। নৈলে বিয়ে হত না।'

'তবে চুপ করে থাক।'

'আছি। থাকলুম।'

হাসান এইরকম প্রকৃতির মানুষ। ওর কোন নিজস্বতা নেই যেন। যখন যা মাথায় আসে, বলে। বিলুর ভাষায় 'বায়ুচালিত যন্ত্র।'

কিন্তু বিলুর এই বদলগুলো কতখানি স্বাভাবিক, অর্থাৎ স্বভাবে নিহিত ছিল এবং অতদিন নানা অবরোধে আত্মপ্রকাশ করতে পারছিল না, এখন এই পরিবেশে এসে পারছে—তা নিয়ে হাসানের একটু সংশয় আছে, বিলু টের পায়। এতগুলো হিন্দু পরিবারের মধ্যে পড়ে বিলু কি নিজের মুসলমানত্ব ঢাকবার খর চেষ্টায় সারাক্ষণ অস্থির? অর্থাৎ সেই ঐতিহাসিক সংখ্যালঘু হীনমন্যতাবোধের প্রতিক্রিয়া?

বিলুর প্রকৃতি ও আচরণ এমন যে এ ব্যাপারে নিঃসংশয় হওয়া কঠিন। সে বাইরে যেন বলে—'এসব আমার ভাল লাগে', নিজেকেও তাই বলে কৈফিয়ত দেয়! ছেলেমেয়েদের জল শব্দটা গুলে খাওয়াতে ব্যস্ত সে। অবশ্য পরিবেশ একটা আশ্চর্য জিনিস, চিকন-ঝুমঝুমি এ কয়েক মাসে ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে অনেকটা সচেতন হয়ে উঠেছে। তালতলার বাড়িতে ওরা হিন্দি গানের ভীষণ ভক্ত ছিল। অমন চমৎকার রেডিওগ্রাম, অত সব রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথ নজরুল অতুলপ্রসাদের গান—বিলুর চয়েস, ছেলে-মেয়েদের জেদে কিছু বিলিতি বাজনা আর একগাদা হিন্দি ফিলমের গান কিনতে হয়েছিল। হাসান ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে অস্বাভাবিক দুর্বল। এটা অবাক লাগে বিলুর। এখন আরও বেশি করে চোখে পড়ে, আরও বেশি অবাক লাগে। তাহলে কি হাসানের বিশ্বাস যে বিলু তার ছেলেমেয়েদের যথেষ্টভাবে মা নয়, কিংবা বিলুর নারীত্বে মাতৃত্বের পরিমাণ কম?

এই গভীর সংশয়ের ক্ষীণ স্রোতটা আপাতত প্রচ্ছন্ন দুজনের মাঝখানে—কদাচিৎ দুজনেই যেন টের পেয়ে যায়। দুজনেই দুঃখিত হয়। দু'পারে দুটি নরনারী দাঁড়িয়ে পরস্পর অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে।

এখানে এসে হাসান অবাক হয়ে দেখেছিল চিকন মনোযোগ দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজিয়ে শুনছে, ঝুমঝুমি আনমনে পাশের ঘরে একা নাচছে। ডেকে দেখিয়েছিল বিলুই।

অথচ এই ঐতিহ্যভক্তি বা সিরিয়াস সাংস্কৃতিক রুচি খুরশিদ ম্যানসনে অধুনা দুর্লভ। এ বাড়িতে যাঁরা বাস করেন, সবাই দুহাজার থেকে পাঁচহাজারী মনসবদার। প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটে রেডিওগ্রাম বা রেকর্ডপ্লেয়ার রয়েছে। হিন্দি ও বিলিতি গানই মুখ্যত বাজে। কদাচিৎ বাংলা—তাও ফিলমের। বিলু তেতোমুখে বলে, 'সব অ্যাংলো হয়ে যাচ্ছে। যত টাকা বাড়ছে, তত। আমি কিন্তু খাঁটি বাঙালিই থাকতে চাই, বাবা। শেখর, তুমি কী থাকতে চাও? কী চয়েস?'

শেখর বলে, 'যাই বলুন অ্যাংলিয়ানার মধ্যে স্পীড আছে।'

অবশ্য বিলু ওর ওপর রাগতে পারে না। 'অত স্পীড তোমাদের সইবে না। এই দ্যাখো না, রেশনে একবেলা চাল না পেলে কী চ্যাঁচানি শুরু হয়ে যায়। পলাশীর যুদ্ধ জিতে রবার্ট ক্লাইভ নাকি একবাব ভাত খেয়েছিলেন। পরে বলেছিলেন, ওঃ হো, বুঝেছি—কেন বাঙালিকে হারিয়ে দিলুম!'

অবশ্য এ সবই হাসানদম্পতির সাংস্কৃতিক সমস্যার ব্যাপার। এবং ব্যক্তিগতও। তবে হাসানের অনেক ধারণা বদলাচ্ছে, সেটা ঠিকই। বিলুর কথা অনেকখানি সত্যি। অধুনা হিন্দুরা সত্যি কতখানি বদলে গেছে, হাসানের ধারণা ছিল না। ছেলেবেলায় কোন হিন্দু বন্ধুর বাড়িতে 'আলাদা' গ্লাসে জল খেতে দেওযার অভিমানী স্মৃতিই তাকে ক্ষুব্ধ রেখেছিল। তারপর আর পারিবারিক পর্যায়ে কোন হিন্দু বন্ধুর সঙ্গে মেশেই-নি—সব ছিল বাইরে-বাইরে। অবশ্য পালা-পর্ব-অনুষ্ঠানে তাদের নিজের বাড়িতে খাইয়েছে বরাবর। থেকেছে, মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকায় এবং দিনের বড় অংশ অফিসে। হিন্দুজীবন চারদেয়ালের ভিতর ঘরকন্নায় জীবন-যাপনে কী রূপ নিয়েছে, জানা ছিল না তার। এ বাড়িতে এসে

এবার অবাক হয়েছে সে। তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা সব ফ্ল্যাটে রান্নাঘর থেকে ঠাকুরঘর অব্দি ঘুরে বেড়ায়। অন্য ফ্ল্যাটের ছেলেমেয়ে গিন্নিবান্নিরাও তার চাররুম ফ্ল্যাটের ইঞ্চিইঞ্চি ঘোরে। বিলু কাকেও রান্না শেখায়, কাকেও গান; কাকেও নাচ। বিলুটা বিয়ের আগে কী ছিল, ভাবলে সহৃদয় স্বামী হাসানের কষ্ট হয় বইকি। সেদিন কজন কুটুম্ব এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে। বিলু একা রাঁধতে হিমসিম। রেখা তো কিছুই জানে না—এখনও চোখ থেকে পাড়াগাঁয়ের ঘোর কাটেনি। তখন এল শেখরের তিন বোন অঞ্জলি, মঞ্জরী, সঞ্চিতা। তারা ময়দা মাখে, বেলে, ঘিয়ে সেঁকে! বিলু কোরমা রাঁধে।

এমনকি শেখরের ঠাকমাও বিলুর হাতের তৈরি হালুয়া খেয়েছিলেন। এই ভদ্রমহিলার একটা মর্মান্তিক কাহিনী আছে। ছিলেন একটা স্কুলের হেডমিসট্রেস—ফরিদপুরে। দাঙ্গার সময় একরাত্রে শেখরের দাদু আর দুই কাকাকে দুর্বৃত্তেরা খুন করে ওঁর চোখের সামনে।

হাসানের কাছে এ সবই বিস্ময়কর। তার ধারণা ছিল না, শেখর যেমন বলে 'মা যা হইয়াছেন —ইতি বঙ্কিমচাটুয্যে!'

হ্যাঁ, শেখরের মা। শেখরের মা এখন বিলুর মা। ডাকে মাসীমা বলে, কিন্তু সম্পর্কটা মেয়ের। হাসানের গোপন ধারণা, এই মহিলাই বিলুর সিঁথিতে সিঁদুর পরার মূলে। ঝুমঝুমি বলেছিল—মনে পড়ে। তাছাড়া এক ছুটির বিকেলে শেখরের ছোট বোন সঞ্চিতা একটা নতুন সিঁদুর-চুপড়ি দিয়ে গেল—'মা পাঠালে বউদির জন্যে। খুব ভাল সিঁদুর। চিৎপুর গিয়েছিল সকালে মাসীর বাড়ি। সেখান থেকে এসেছে।'

অবশ্য সিঁদুর পরাটা তেমন কিছু নয়। হাসান জানে, অনেক উঁচুতলার মুসলিম পরিবারের মেয়েরা সিঁথি রাঙান। বর্ধমানের গাঁয়ে একবার একটা বিয়েতে গিয়েছিল। পাত্রপক্ষ অবাক, হাসানও অবাক—কনের সিঁথি ভরতি দগদগে পুরু সিঁদুর। সৈয়দ বংশের মেয়ে। পাত্রপক্ষ চটে লাল। কন্যাপক্ষ বুঝিয়ে বললেন, 'এটা ওদের বংশগত প্রথা। না দিলে অমঙ্গল হয়।'

হাসানের শুধু একটা জায়গায় আপত্তি। বিলু যেন নিজেকে খুব বড় করে দেখতে লেগেছে। প্রসাধনের খরচা তিনগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েক রকম দামী ক্রিম লোশন ইত্যাদি থরেথরে সাজানো থাকে তার ড্রেসিং টেবিলে। সপ্তায় একটা করে নতুন শাড়ি কেনে আজকাল। এবং সবচেয়ে যা দৃষ্টিকটু, —বিকট খোঁপা, হাতকাটা মিনি ব্লাউজ, ঠোঁটে পুঁযের মতন রং, নাইলনজর্জেটের ভিতর উন্মোচিত নাভি স্পষ্ট এবং তার রাস্তার দু ধারে বাতাসে বেখে যায় দামী (দুশো টাকায় এক ফাইল) উগ্র সেন্টের ঝাঁঝ আর আর আপামর চোখে সেক্স। এটাই অসহ্য লাগে হাসানের!

এবং একটু ভালোও-লাগে যেন।

কিন্তু যে-বিলু সেই কুড়ি বছর বয়স (বি-এ সার্টিফিকেট অনুসারে) থেকে আজ ত্রিশ বছর বয়স অব্দি তার পাশে শোয়, সে-বিলু যেন অন্য বিলু। লাস্যময়ী সেক্সি যুবতীটি যেন শুধু রাস্তার, শয্যার নয়।

কোথায় সে—যাকে আজ বিকেলে জানলা থেকে রাস্তায় হেঁটে যেতে দেখলুম শেখরের সঙ্গে? হাসান বিলুকে ছুঁয়ে অনেকক্ষণ জেগে থাকে। সেই শরীর তো? সেই চুল, মুখ এবং রহস্যময় ঠোঁট?

পাশের এ মেয়েটিকে ভারি আটপৌরে লাগে। ঘরকন্নাময়, সাদাসিদে। হাসানের আপিসের টেবিলে যেমন ফাইল! শুতে এসে আর ফাইল কার বা ভাল লাগে। হাসান ভাবে। হঠাৎ মনে হয়, এই বারো বছর ধরে সে হয়ত ভীষণ ঠকে আসছে।

ইতিমধ্যে বিলু ঘুমিয়ে পড়েছে। আজকাল তার ভাল ঘুম হয়। দেহে মেদের আভাস এবং চামড়ায় লালিত্য দেখা দিয়েছে। ক্ষিদে হবার জন্যে ওষুধ খেতে হয় না। ডাক্তারী যেটুকু লাগে—তা কসমেটিকসের।

...'সেদিন ভরা সাঁঝে যেতে যেতে দুয়ার হতে কী ভেবে ফিরালে মুখখানি'...বাকি কথাগুলো মনে পড়ছে না। মাথার ওপর মৃদু ঝিরঝির করে নকল বৃষ্টি ঝরছে। খোলা ঘন কালো চুল—বিলুর অনেক চুল, ঈর্ষাজনক—খালি পিঠের ওপর নেমে এসেছে, একটা শারীরিক সুখের স্রোত—যার সীমাবদ্ধতা আছে। পায়ে দলে আছে ব্রেসিয়ার আর ব্লাউস। একটু ঝুঁকে সায়ার ফাঁস খুলে নাভিদেশ দেখার অভ্যাস

আছে বিলুর। তখন আর গানটা মনে পড়ল না, মাঝখানে থেমে গেল। পাশের ফ্ল্যাটের দীপিতাদিরও তিনটে বাচ্চা হয়ে গেছে। পেটে কোন দাগ নেই। সে দেখিয়েছিল বিলুকে। কী সব ব্যবহার করেছিল। বিলুর অনেক দাগ। তবে নাকি দেরি হয়ে গেছে—চার মাস বয়স টুকুনের। এখন নিষ্কলঙ্ক হবার কোন আশা নেই। দীপিতাদি বলেছিল।

হাত বাড়িয়ে সাবান নিয়ে পেটে ঘষল সে। তারপর একবার উঁচু জানলাটার দিকে তাকিয়ে সায়াটা ছেড়ে দিল। পরক্ষণে নিজেকে ভীষণ একা লাগল। সায়াটা পায়ে ঠেলে দিয়ে আবার গানের ধুয়োটা গুনগুন করে উঠল 'মনে, কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে।' আবার টের পেল, সে সংযোগসূত্র হারিয়েছে বাইরের সাথে। সাবান থেকে ল্যাভেন্ডারের গন্ধ উঠছে। ঝরনার চাপা শব্দ হচ্ছে। দু'মিটার দূরের আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে বলে বিলুর কিন্তু লজ্জা নয়, সংকোচ হল। এই সময় নিজেকে দেখতে তার মত জননী মেয়েদের পক্ষে কিছু সাহসের দরকার হয়। দেখলে হয়ত মনে পড়ে যাবে, তিন-তিনবার এই শরীর ফাটিয়ে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। অনেক কর্কশ লাভার স্তর জমে গেছে ইতস্তত। অনেক অসঙ্গতি। হঠাৎ তার মনে হল, চিকন-ঝুমঝুমি-টুকুন তার সুখ না দায়িত্ব, দায়িত্ব না সুখ?

স্নানঘরের কপাটে ধাক্কা দিচ্ছিল রেখা।...'মা জী, ও মা জী!'

বিরক্ত হয়ে সে দ্রুত সায়াটা পরে নিল। তোয়ালেটা বুকে জড়িয়ে কপাট একটু ফাঁক করল। বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল।...'কী? চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'ফোন বাজছে মা জী, ফোন।'

ক্রিং ক্রিং শব্দ কানে এল শোবার ঘর থেকে। বিলু বলল, 'তুই ধর গে। যে হবে হোক, বলবি—এখন বাথরুমে আছে।'

'আমি পারব না মা জী!'—মেয়েটা ভীতু মুখে তাকাল।

হেসে ফেলল বিলু। 'ভয় কেন? তুলে কানে রাখবি—সেদিন তো দেখিয়ে দিলুম। যা শিগগির—হয়ত টুকুনের বাবা।'

রেখা দৌড়ে চলে গেল। ক্রিং ক্রিং শব্দটা তারপর বন্ধ হয়েছে। কপাট ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রইল বিলু। হাসান ছাড়া কেউ নয়। হয়ত বউ ঘরে না বাইরে জানতে চায় এই দুপুরবেলা। আজকাল হাসান তার সম্পর্কে কি অস্বস্তিতে ভুগছে? মাঝে মাঝে তাই লাগে।

রেখা এসে বলল, 'টুকুনের বাবা না—অন্য কে! বললে, ধরে রাখছি। ডেকে দাও।'

'গলা শুনে বুঝতে পারলিনে? মেয়ে—না পুরুষমানুষ?'

'মেয়ে না।'

'পুরুষমানুষ! তাহলে টুকুনের বাবাকে। বলে দে, আপিসে আছেন।'

'না মাজী। বললে, তুমি কে—আমি বললুম, আমি রেখা...'

বিলু হাসতে হাসতে বলল, 'পারলি বলতে? বাঃ, তোর হবে!'

'তখন বললে, তোমার গিন্নিমাকে ডেকে দাও। আমি বললুম —মাজীকে? বললে—হ্যাঁ।' রেখা হাঁফাতে লাগল।

কে হতে পারে! বিলু একটু ইতস্তত করে বেরোল। ঝরনার ট্যাপটা খোলা রইল; মোজাইক মেঝে ভিজিয়ে সে ফোনের সামনে গিয়েই হতবাক। রেখা ফোনটা যথাস্থানে রেখে বসেছে—অর্থাৎ সংযোগ কেটে গেছে। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'রেখা, এই রেখা! কী করেছিস!'

'কেন মাজী?'

'বুদ্ধু মেয়ে! এত শিখিয়েও পারলুম না তোকে। কেউ কথা বলতে চাইলে ফোনটা নামিয়ে রাখবি বলেছি না?'—আচমকা ক্ষেপে গিয়ে সে ভিজে হাতে ঠাস ঠাস করে মাথায় দুটো চাঁটি মেরে দিল। খুব জোরে মেরেছিল। হাতের তালু জ্বলে উঠেছে। মাথা নয় পাথর! তারপর স্তব্ধ দুটি দীর্ঘ মিনিট ফোনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল বিলু। আবার রিঙ করা উচিত। কিন্তু না—ফোনটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। কে ডাকছিল তাকে এই অসময়ে? কে ডাকতে পারে? কয়েকটা নাম আবছা এবং দ্রুত এসে মিলিয়ে গেল। আবার ক্রুদ্ধ চোখে রেখার দিকে তাকাল সে। মেয়েটা কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তেড়ে গেল বিলু—'টুকুন দুধ খেয়েছে? যা, ওকে দ্যাখ গে! হাঁদা, গবেট, হতচ্ছাড়ী মেয়ে!'

রেখা চলে গেল। আস্তে আস্তে এসে স্নানঘরে ঢুকল বিলু। দরজা বন্ধ করে সায়াটা ফের খুলে ফেলল। কিন্তু সুর কেটে গেছে। সাবান ঘষতে ঘষতে একবার থেমে ভাবল, শেখর নয়ত? কিন্তু শেখর কেন ফোন করবে? কোত্থেকে করবে? তাছাড়া এখনও হয়ত সে ঘর ছেড়ে বেরোয়নি—স্নান করছে, কিংবা খাচ্ছে। স্নানটা জমল না। কী গরম পড়েছে কিছুদিন থেকে! ফ্যানের বাতাস অসহ্য লাগে। ওপরের ট্যাঙ্কের জলও মাঝে মাঝে এত গরম হয়ে ওঠে যে স্নান করার সুখ মেলে না।

গতকাল থেকে আকাশে কিছু কিছু মেঘ দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টি হচ্ছে না!—আরে তাই তো!—তার মনে পড়ে গেল। শেখরের সঙ্গে বাজি ধরা আছে। শেখর বলেছে বৃষ্টি হবে। অবিশ্বাস্য লাগে। কিন্তু বৃষ্টি হলে প্রাণভরে বৃষ্টি দেখার মত এমন জায়গা যেন সারা কলকাতায় কোথাও নেই। বাইরে অদূরে বিশাল পার্ক। অজস্র গাছপালা। রেলব্রিজ। বিস্তৃত রেলইয়ার্ড। 'ললিতা ভবনের' ওই সব পাম গাছ। পুব-দক্ষিণ সীমায় কোন উঁচু বাড়ি নেই বলে অনেকটা আকাশ দেখা যায়। কেবল ওখানে একটা কারখানার কালো লম্বা চিমনি রয়েছে আকাশের গায়ে। মাঝে মাঝে ধুঁয়ো ওড়ে। চিমনিটাকে এত একলা আর অসহায় মনে হয় এই সব দুপুরবেলায়!

তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এল সে। শুকনো সায়া আর শাড়ি হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়াল। এই ঘরটা এয়ারকনডিশন করার কথা হচ্ছিল শেখরের সঙ্গে। 'দাদাকে বলুন না...'। হ্যাঁ, দাদা এমন স্ত্রৈণ যে বউ যা বলবে, তাই করে ফেলবে। মাসে সাড়ে চারশো ভাড়া শুনতেই সাহেব ধুঁকে মরছেন—তো.....হঠাৎ এয়ারকনডিশন প্রসঙ্গটা এত কুৎসিত ঠাট্টার মত লাগল যে বিলুর রাগে গা জ্বালা করছে। এমনকি কয়েক মাসের মধ্যে হাসান যে গাড়ি কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেটাও যেন একটা বিশ্রি পরিহাস। পরিহাস বিলুর লোভ আর সুখের স্পৃহাকে। কারণ, হাসানের একটা অন্যরকম স্বপ্ন আছে ভবিষ্যতের জন্যে—যখন সে বুড়ো হয়ে যাবে, ফিরে যাবে সেই 'ঝাঁপুইহাটি' না 'বাবুখালিতে'! সেখানে নদীর নাম আবার বকরচ! তার পাড়ে নিজের মাটিতে একটা বাড়ি বানাবে—তার নাম 'সন্ধ্যানীড়', চাষবাস দেখাশোনা করবে নিজের হাতে—কারণ, আইন ক্রমশ গোলমেলে হচ্ছে এবং ভাগচাষীরাও রাজনীতিজ্ঞ।..

তালতলার বাড়িতে থাকতে এসব ভাল লাগত। এখন এবং এই মুহূর্তে সব ব্যাপারটা এত সাজানো আর উদ্দেশ্যমূলক মনে হল যে বিলুর আজকের নিঃসঙ্গ দুপুরটা ব্যর্থ হতে বাধ্য। জানলায় ঝুঁকে সে সেই মেঘটা খুঁজল। খুরশিদ ম্যানসনের ওপর থেকে মেঘটা সরে গেছে। বৃষ্টি হল না। বিলু বাজি জিতে গেছে। শেখর তাকে কী দেবে যেন—একখণ্ড গীতবিতান!

গীতবিতান তো আছে তার। শেখর ঠিকই বলেছিল। কিন্তু আর কী চাওয়া যেত? শেখর বেচারা এখনও চাকরিবাকরি পায়নি। মধ্যে কিছুকাল—বিলুরা এখানে আসার আগে নাকি কোন কলেজের সান্ধ্য বিভাগে লেকচারার হয়েছিল, ভাল লাগেনি বলে ছেড়ে দ্যায়। এখন নাকি ওর বাবা দিল্লিতে কী সুযোগ পাইয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। সেখানে থাকতে পেলে শেখরের পাহাড়ে চড়া নেশার পক্ষে ভাল হয়। শেখর বলছিল।

মেঘটা সরে আকাশ আবার উজ্জ্বল শূন্যতা হয়েছে। বৃষ্টি হলে বিলুর এত ভাল লাগত। খুরশিদ ম্যানসন গনগনে রোদে ধু-ধু জ্বলতে লাগল।...

২

টুকুন ভারি শান্ত ছেলে। ক্ষিদে না পেলে কাঁদে না। খাবার ঘরের দোলনায় সে তখন চুপচাপ দুধের বোতল চুষছে। এ ঘরে উজ্জ্বল আলো। চিকনদের ঘরে এখন পড়াশুনার সান্ধ্য পরিবেশ। প্রবীণ এক প্রাইভেট টিউটর হেঁড়ে গলায় পড়া বোঝাচ্ছেন। শেখর ওঁর গলাটা অবিকল নকল করে শোনায়। মিমিক্রিতে আশ্চর্য দক্ষতা আছে ওর। এমন কি হাসানকে নকল করে। বিলু হেসে ভেঙে পড়ে। 'তো বিলু আজ ইয়ে—তুমি, তো ইয়ে—' হাসান অবশ্য সবসময় এমন করে কথা বলে না। অনেক সময় যখন বিলুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে, খুঁজে পায় না, তখন এমনি করে। আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা

শেখরের। মাঝে মাঝে সে বিলুকেও নকল করে। 'না বাবা, না। ওসব বুঝিনে।' এবং এটা বিলুর কতকটা মুদ্রাদোষ।

হাসান আজ অফিস থেকে ফিরেই তক্ষুনি বেরিয়েছে। জরুরি কাজ এবং অফিসেরই নাকি। এমন 'মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভ্যান্ট' সচরাচর নাকি দেখা যায় না আজকাল। বাড়িতেও ফাইল আনে। রাত জেগে পাতার পর পাতা প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে কী সব মন্তব্য লেখে। মাটির স্তর, সভ্যতার ধাঁচ, সময় এবং ঐতিহাসিক যোগসূত্র। আজ খুব ব্যস্ত দেখাচ্ছিল ডঃ হাসানকে। পোশাকও বদলায়নি। একটা ফাইল ফোলিও ব্যাগে ভরে নিয়ে বেরিয়েছে। বলে গেছে, 'ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।'

সন্ধ্যা সাতটা বাজে। শোবার ঘরে শেখর আর বিলু গল্প করছে। সত্যি একটা গীতবিতান এনেছে শেখর। দুপুরে ফোনটা অবশ্য সে করেনি। যদিও ইচ্ছে হয়েছিল যে ক্লাব থেকে ফোনে জানিয়ে দেয়ঃ 'বউদি, বৃষ্টির কী খবর?' সে এখান থেকে বেরিয়ে সোজা ক্লাবে চলে গিয়েছিল। বিকেল তিনটেয় ফিরে স্নান করে খেয়েছিল। আবার বেরিয়েছিল। আসবার সময় কলেজ স্ট্রিট থেকে গীতবিতান কিনে এনেছে। ও নিয়ে বিলু বিন্দুমাত্র মন্তব্য করেনি। বইটা কফিটেবিলে এখনও পড়ে আছে।

শেখর একটা গল্প শোনাচ্ছিল।...'সাত নম্বর ফ্ল্যাটে মোহিতবাবুদের কাণ্ড শোন, বউদি। ওঁদের তো জান ছোট পরিবার সুখী পরিবার।'...শেখরের গল্প বলার ঢঙটা অসামান্য। 'একটি মাত্র খোকা আর দম্পতি। আর একটা বাচ্চা চাকর। কাল মোহিতবাবু করেছেন কী, কোত্থেকে ইয়া বড় একবোতল টনিক কিনে এনেছেন। ক্ষিদে হয় না কারো তাই। আর ব্যস, তারপর কী প্রচণ্ড কাণ্ড হতে লেগেছে শুনবেন?'

বিলু তাকাল। নিহাস নির্লিপ্ত মুখ।

শেখর বলল, 'সে এক রাক্ষুসে ব্যাপার। সকাল থেকে মোহিতবাবু বলছেন, খেতে দাও খেতে দাও! ওঁর স্ত্রী চ্যাঁচাচ্ছেন, খেতে দে রবি—খোকা যা পাচ্ছে হাতের কাছে খেয়ে ফেলছে আর কান্নাকাটি করছে, খাঁবো খাঁবো! রবি বেচারা ভয়ে কেঁপে সারা। বারবার বাজারে দৌড়চ্ছে আর প্যাকেটের পর প্যাকেট বিস্কুট-বাদাম আম-লিচু-কলা নিয়ে আসছে। তবু ক্ষিদে মেটে না। তারপর রবির কী মনে হয়েছে, চুপিচুপি খানিকটা ওষুধ বোতল থেকে যেই না গেলা, অমনি রাক্ষস হয়ে গেছে। এখন দেখে আসুন, কী ধুন্ধুমার কাণ্ড চলেছে ফ্ল্যাটে। আসতে আসতে ব্যাপার কী জানতে কলিং বেলের বোতাম যেই টিপেছি, অমনি দরজা খুলে মোহিতবাবু ওঁর স্ত্রী, খোকা আর রবিটা হাঁউমাঁউ করে এসে পড়েছে—খাব, খাব, খেতে দাও! এক ফাঁকে দেখে নিয়েছিলুম, ঘরে একটুকরো জিনিস নেই—সোফা চেয়ার টেবিল খাট আলমারি কাপড়চোপড়...বিলকুল খেয়ে ফাঁক!'

বিলুকে হাসতে হল। তবে সামান্য। অন্য সময় হলে সে এতক্ষণ ঝড় হয়ে উঠত! সে বলল, 'গল্পটা তোমার দাদাকে শুনিয়ে দিও। দেখবে তক্ষুনি মোহিতবাবুর কাছে হাজির হয়ে টনিকের নামটা জেনে আসবে। আর সবেধন নীলমণি স্ত্রীটিকে গেলাবে।' 'সবেধন নীলমণি! কেন?'

বিলু বাঁকা ঠোঁটে বলল, 'সায়েব ইচ্ছে করলে চারটে বিয়ে করতে পারেন একসঙ্গে—তা জান না?'

'কী আনন্দ! তা করছেন না কেন? বলুন না দাদাকে!'

'এবার তোমাকে নিয়ে একটু মিমিক্রি করি! সবসময়—বলুন না দাদাকে...'

'হল না। পারলেন না।' বলে শেখর হাসতে লাগল।

বিলু বলল, 'বিয়ে নিয়ে একটা গল্প তোমাকে শোনাতে পারি। তোমার মত বানানো গল্প নয়, বাস্তব ঘটনা।'

শেখর বলল, 'আমি বানিয়ে কিছু বলি নে। আপনি নিজে গিয়ে খোঁজ নিন ওঁদের ফ্ল্যাটে।'

'সে দেখব। এখন আমার সত্যিকার গল্পটা শোন। তালতলায় আমাদের পাশের বাড়ি এক ভদ্রলোক থাকতেন—তাঁর নামও হাসান, তবে হাসান বেজা। ভদ্রলোকের ধর্মতলায় হার্ডওয়ারের ব্যবসা আছে। ভাল পয়সাকড়িও আছে। কিন্তু তোমার দাদার মতন কপাল নয়, দুটো স্ত্রী। দ্বিতীয় স্ত্রী বাবার একমাত্র মেয়ে, তিনটে বাড়ির মালিক। প্রথম স্ত্রীর ইতিমধ্যে পাঁচ-ছটা বাচ্চা হয়েছে—স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে মহিলার। দ্বিতীয়ার তখনও বাচ্চা হয়নি। হঠাৎ এক দিন হল কী, দুপুরবেলা বাড়িতে ফোন এল, আমি অ্যাকসিডেন্ট হয়ে হাসপাতালে আছি। অপারেশন হয়েছে—তবে ভাল আছি। এরা তো হইচই করে

হাসপাতালে গিয়ে হাজির। বাইরে থেকে দেখলেন, হ্যাঁ—সত্যি ভদ্রলোক বেডে রয়েছেন। অপারেশনও হয়েছে একটা. তখন তো পেসেন্টদের দেখতে দেবার সময় নয়—ভিতরে যেতে দিল না। দুই বউ আর কী করেন, বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ দেয়ালের বোর্ডে চোখ গেল। লেখা রয়েছে ঃ ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেন্টার! সে কী? একটা নার্সকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেই শুনলেন—আরে উনি তো ভ্যাসেকটমি করিয়েছেন। ব্যস, প্রথমা একগাল হাসতে হাসতে কেটে পড়লেন। আর দ্বিতীয়া কী করলেন বলত শেখর?'

শেখর হাঁ করে শুনছিল। বলল, 'নতুন বিয়ে হয়েছে। তাই স্বামীকে ফেলে আসতে পারলেন না!'

'তোমার মাথা!'...বিলু ধমকাল।...'দ্বিতীয়া তাতা থৈ নাচ জুড়ে দিলেন। পারেন তো তক্ষুনি স্বামী বেচারাকে মেরে পাট করে ফেলেন। সে এক হইচই অনাসৃষ্টি কাণ্ড—যাকে বলে অগত্যা ফের একটা অপারেশন করে ভদ্রলোক আগের অবস্থায় ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। কী দুর্গতি! এখনও খুঁড়িয়ে হাঁটেন বেচারা। ভেবেছিলেন, অ্যাকসিডেন্ট হয়ে পেটে আঘাত লেগে অপারেশন করিয়েছেন বলে ফাঁকি দেওয়া যাবে ধনবতী দ্বিতীয়াকে। একালের মেয়েকে অত সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ছেলেপুলে না হলে তার চলে? তিন-তিনটে বাড়ি—ব্যাঙ্কে পৈতৃক পয়সা রয়েছে।'

শেখর উদ্দাম হাসতে লাগল।...'ভদ্রলোক তো ভারি চালাক!'

'হ্যাঁ—ভেবেছিলেন মুসলিম মেয়ে—পর্দায় থাকেটাকে ছেলেবেলা থেকে। পুরুষদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং কী জিনিস, জানবে কেমন করে? আসলে মেয়েদের একটা ইনটুইশন থাকে হয়ত।

'আপনার ইনটুইশন কী বলে দাদার সম্পর্কে?'

বিলু সেদিকে কান দিল না।...'শেখর তোমার পাহাড়ে চড়ার গল্প কর না?'

'চড়লুম কোথায় এখনও? সে সামান্য।

'শেখর, তুমি পাহাড়ে চড়—আর তোমার দাদা কী করেন জান? পাহাড়ের তলা খুঁড়ে বেড়ান।'

'তার মানে?'

'পাহাড়ের তলায় সভ্যতা খোঁজেন।'

শেখব হাসতে লাগল।

'কিন্তু বেচারার ভাগ্য! সেবার মধ্য-প্রদেশে কোথায় একটা পাহাড়ের তলা খুঁড়ে নাকি ম্যামথের হাড় পেয়েছিলেন।'

'সভ্যতা খুঁজতে গিয়ে আদিম জন্তু!'...শেখর একটু ভেবে বলল, 'সত্যি অবাক লাগে ভাবতে। পৃথিবীটা কী ছিল, কী হয়ে গেছে, কী হয়ে যাবে! আপনার অবাক লাগে না বউদি?'

'কিসে?'

'আপনি কিছু শুনছেন না।'

'না—শুনছি তো।'

'উঁহু আজ আপনি দুপুর থেকে...বলব?'

'দুপুর থেকে মানে? কী দুপুর থেকে?'

'অন্যমনস্ক।'..শেখর চাপা গলায় বলল, 'আপিস যাবার মুখে দাদার সঙ্গে কিছু হয়ে-টয়ে যায়নি তো?'

'ভ্যাট!'...অস্ফুট হেসে ফেলল বিলু। 'আমাদের কিছু হয়টয় না।'

'আপনারা সুখী দম্পতি।'

বিলু একটু ঝুঁকে গীতবিতানের পাতা উল্টে রেখে দিল। পাশের ফুলদানি থেকে একটা রজনীগন্ধা ছিঁড়ে নিয়ে নাকের কাছে নাড়াচাড়া করতে থাকল।

শেখর বলল, 'অমন করে ফুল শুঁকতে নেই—পোকা থাকে!'

বিলু সোজা হয়ে বসল হঠাৎ।..'আচ্ছা শেখর, চালাকি করো না—সত্যি বলত, দুপুরে ফোনটা তুমিই করেছিলে!'

শেখর ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আপনার দিব্যি। আমি করলে বলব না কেন? ফোনটা আপনাকে ধাঁধায় ফেলে দিল, দেখছি!...বরং বউদি, প্লীজ—'

'কী?'

'গান করুন—শুনি।'

'যাঃ, ওরা পাশের ঘরে পড়াশুনো করছে। ডিসটার্ব হবে।'

'উঁহু—ধীরে, মানে আস্তে। গুন-গুনিয়ে।'

একটু কাসল বিলু।...'তাহলে ওপরের লাইট অফ করে দাও। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দাও।'

'বড্ড লজ্জা আপনার। অত সুন্দর গান করেন!'...শেখর উঠে গিয়ে সুইচ অফ এবং অন করে দিল। চাপা আলো জাগল ঘরে—ছায়ারই ভিন্ন একটা রং।...'আনন্দধারা বহিছে...না কী যেন গাইছিলেন সেদিন?'

'যাঃ!' বলে বিলু গুনগুন করে উঠল।...'রূপে তোমায় ভোলাব না'...পরক্ষণে গান থামিয়ে বলল, 'আসছে না। এখন থাক।'

'ভাল হবে না বউদি। বেশ তো হচ্ছিল।'

আবার গুনগুন করে গানটা ফিরিয়ে আনল বিলু।...'রূপে তোমায়...' পরক্ষণে বাইরে কলিং বেলের মিঠে টং শব্দ, বুকটা আচমকা ধড়াস করে উঠতেই গানটা চলে গেল।...'রেখা, ও রেখা! দ্যাখ তো কে এল!' বলে সে উঠে দাঁড়াল।

সম্ভবত চিকনরা কেউ ততক্ষণে দরজা খুলে দিয়েছে। কে যেন এল। কয়েকমুহূর্ত অস্পষ্ট কিছু শব্দ হল ওদিকে। তারপর হাসানকে দেখা গেল। দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল সে।...'অন্ধকারে কেন? ও কে?'

শেখর হেসে বলল, 'আমি। শুনলুম, আসতে দেরি হবে—এত শিগগির আমাদের গানের আসরটা দিলেন তো পণ্ড করে!'

হাসান ব্যাগটা আলমারির মাথায় রেখে চলে গেল নিঃশব্দে। বিলু ওপরের আলো জ্বেলে দিল। টেবিলল্যাম্পটা নিভিয়ে আপনমনে একটু হাসল। তারপর অকারণে গলা চড়িয়ে বলল, 'রেখা, টুকুনকে দিয়ে যা তো মা।'

শেখর বলল, 'উঠি বউদি।'

'কেন? বস।'

'দাদা এলেন। এখন আর হারেমে থাকা কি নিরাপদ হবে?'

এমন কাতর মুখে বলল যে বিলুকে হাসতে হয়।...'তোমার দাদা বাদশা নয়—যদিও আমি বেগম। বস।'

রেখা টুকুনকে দিয়ে গেল। শেখরই হাত বাড়িয়ে নিল তাকে। নাচাতে থাকল। টুকুন চমৎকার হাসতে শিখেছে। বিলু ভুরু কুঁচকে দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল। দেখল, হাসান পাজামা পাঞ্জাবি পরছে। প্যান্টশার্টটা হাতে নিয়ে সে বাইরের বারান্দায় আলনায় রাখতে গেল। বিলুকে ডাকল না—অন্যদিনের মতন।

একটু পরেই ফিরল সে।...'শেখরের বাবার সঙ্গেই ফিরলুম—একই ট্যাকসিতে।' বলে সে শেখরের পাশে বসে পড়ল।

শেখর বলল, 'বাবাকে কোথায় পেলেন এখন?'

'গড়িয়াহাটের ওখানে। একসঙ্গে ফিরলুম।' .... হাসানের মুখে গাম্ভীর্য নেই অবশ্য, কিন্তু কী যেন আছে। .... 'বিলু, মাথাটা হঠাৎ ধরে গেছে। দ্যাখো তো তোমার স্টকে কিছু আছে নাকি?'

বিলু উঠে কোণের টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা ট্যাবলেট এনে রাখল। তারপর কিচেনের দিকে গেল।

হাসান বলল, 'দেখো—হিসি করে ফেলে না। সাবধান! তোয়ালেটা ঠিক করে নাও।'

শেখর টুকুনকে উরুর ওপর শুইয়ে আদর কবছিল। বলল, 'দাদা, শিগগিব দার্জিলিং যাচ্ছি ক্লাব থেকে। আপনারা চলুন না। চিকনদের ছুটি তো হয়ে যাচ্ছে ইতিমধ্যে।'

'পাগল!' .... হাসান জবাব দিল। ..... 'আমাকে কালই হঠাৎ বাইরে যেতে হচ্ছে আপিসের কাজে। কদিন থাকতে হবে ঠিক নেই।'....বিলু এক গ্লাস জল এনে সেই সময় সামনে ধরেছে। ট্যাবলেটটা গ্লাসটা তার হাতে দিয়েই বিলু আবার বেরোল। হাসান বলল, 'এ চাকরি আর পারা যায় না। এই তো সেদিন এলুম মধ্যপ্রদেশ থেকে—আজ আবার বলছে, উড়িষ্যা যাও এখুনি।'

'কী ব্যাপার?'

'কলিঙ্গ ইউনিভারসিটি নিজের উদ্যোগে ঢেনকানলের ওদিকে একটা এক্সক্যাভেশন চালাচ্ছে। কী সব বেরিয়ে পড়েছে। অমনি আমার দপ্তরের টনক নড়েছে। অথচ ওরা সেই সিক্সটি সেভেন থেকে দিল্লিতে লেখালেখি করছে—পাত্তা পায়নি। হঠাৎ আজ টেলিফোন এল—এক্ষুনি একজন এক্সপার্ট পাঠাও। আর এখানে এমন অদ্ভুত রেওয়াজ—ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এই হাসান আলি।'... একটু হেসে উঠল হাসান।.....'আজকাল ওই এক্সপার্ট ছাড়া কথা নেই। আর এক্সপার্ট হয়ে ওঠা একটা মিরাক্‌ল্। কে যে কখন কর্তাদের চোখে এক্সপার্ট হয়ে উঠবে—কিছু ঠিক নেই। বুঝলে শেখর, এটা আমার কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত জান তো?'

শেখর তাকাল।

'কর্ণসুবর্ণ এক্সক্যাভেশনের সময় যে কয়েক পাতা নোট লিখেছিলুম—সেই পাপ!'

বিলু এল। ....'তুমি চা খাবে তো? খাও, মাথা ছেড়ে যাবে।'

শেখর বলল, 'আমি ডবলহাফ।'

হাসান বিলুর দিকে সহাস্য তাকাল।....'কী খাইয়েছ শেখরকে—নাকি তখন থেকে বাসি মুখে বসিয়ে রেখেছ?'

জবাব শেখর দিল।....'না, জাস্ট কিছুক্ষণ হল এসেছি। এখনও ক্ষিদে পায়নি।'

হাসান বলল, 'তোমার বউদি বলে যে মুসলমানবাড়ি নাকি অনেকের ক্ষিদে বেড়ে যায়।'

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল। বিলু আবার চলে যাচ্ছে দেখে হাসান বলল, 'তুমি যাচ্ছ কেন? রেখাকে বলে দাও না। বস, এক কাণ্ড হয়েছে।'

বিলু বলল, 'রেখা রাঁধছে।' তারপর আবার চলে গেল।

শেখর বলল, 'আপনি এলেই দেখেছি—বউদি অমনি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কী ব্যাপার বলুন তো?'

'তাই নাকি?'...বলে হাসান টেবিল থেকে গীতবিতানটি তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাল। তারপর শেখরের দিকে তাকাল।...'এ বই তো ওর আছে। আবার হঠাৎ?'

'একটা বাজি ধরেছিলুম আজ দুপুরে! বৃষ্টি নিয়ে। হেরে গেলুম—তাই।'

হাসান বইটা রেখে একবার ঘরের ভিতর চোখ বুলিয়ে নিল। কিছু বলল না। টুকুনের গলাটা একবার নেড়ে দিল। তারপর নিজের কপাল টিপে ধরল। অস্ফুট কী বলল যেন।

'দাদা, বউদির পক্ষ থেকে একটা প্রস্তাব আছে।'

'কী?'

'আপনার এই ঘরটা তো ছোট। এটা এয়ারকনডিশন করে নিন।'

হাসান তাকাল।

'হ্যাঁ, খুব বেশি খরচার ব্যাপার নয়। যা গরম পড়েছে! বউদির নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়। আপনি তো আপিসে নিশ্চয় এয়ারকনডিশনড ঘরে বসেন!'

'নাঃ! মাথার ওপর ফ্যান। আদিম পরিবেশ—যাকে বলে।'

'তা রাজি হলেন তো?'

'বিলু তোমাকে ধরেছে নাকি?'

শেখর অস্ফুট হাসল।...'আমি হলে দেরি করতুম না—মানে আপনার মত হলে।'

হাসান একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ—তোমার বউদি নিশ্চয় এয়ারকনডিশনে থাকবার যোগ্য—আই এগ্রি। তবে এই চাকরি দিয়ে তো তা হয় না। আলুর ব্যবসা করব, তখন দেখা যাবে।' নিজের রসিকতায় সে নিজেই হেসে উঠল।

বিলু আসতে আসতে শুনেছিল। গম্ভীরমুখে ট্রে রেখে বলল, 'শেখর, সবসময় তামাশা আমার ভাল লাগে না—বিশেষ করে আমাকে নিয়ে।'

'তামাশা কী বলছেন? সিরিয়াসলি আলোচনা করছি দাদার সঙ্গে।'

'না। আমাকে জড়াবে না কোন ব্যাপারে।'

'দাদা, আজ বউদির ভীষণ মন খারাপ। কেন জানেন? কে নাকি দুপুরে ফোন করেছিল। রেখা লাইন কেটে দিয়েছে।'

হাসান মুখ তুলল।...'কাকে ফোন করেছিল? বিলু—তোমাকে?'

বিলু জবাব না দিয়ে চা করতে লাগল।

'পুরুষ—না মেয়ে?'

শেখর বলল, 'বউদি ধরে নিয়ে বসে আছে যে আমি করেছিলুম। কিন্তু করিই নি। অবশ্য ইচ্ছে হয়েছিল একবার!'

হাসান একটু ভেবে বলল, 'মেহবুব নয় তো? ওর ঢাকা থেকে আসার কথা আছে।'

বিলু বলল, 'শেখর—ওকে দাও। তোমার চা।'

শেখর টুকুনকে সাবধানে এগিয়ে দিল। বিলু তাকে নিয়ে কোণের মোড়ায় বসল। সেই সময় চিকন আর ঝুমঝুমি এসে পড়ল হই হই রবে। চিকনের বয়স এগারো, ঝুমঝুমির দশে পা। কিছুক্ষণের জন্যে ঘরটা বদলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শিশুরা এইরকমই। যেখানে যায় পরিবেশ পালটায়, এবং জীবন কিংবা পৃথিবীর সব জটিলতা সরে গিয়ে সরলতা আর স্পষ্টতা আসে। আর মনেই থাকে না যে কোন অতীত সঙ্কট ছিল, কিংবা বর্তমান অস্বস্তি আছে। কেবল বিলু যেন এই সুরটা নিল না।

রাত তখন এগারোটা। কাছাকাছি গীর্জার ঘণ্টাঘড়ি বাজল। এমনিতে দশটার আগে কেউ খায় না ওরা। তারপর চিকনদের ঘরে বিলুকে একবার যেতে হয়। সে একটু দাঁড়িয়ে চুপচাপ ঘুমোতে বলেই চলে আসে। হাসান কিন্তু ইদানীং ওদের খাটের ধারে অনেকটা সময় চুপচাপ বসে থাকে—যতক্ষণ ওরা না ঘুমোয়। আসবার সময় ফ্যানের গতি কমিয়ে দিয়ে আসে সে। দরজাটা আস্তে বাইরে থেকে ভেজিয়ে দ্যায়। বাইরের দরজাব ছিটকানি আর খিলটা দেখে নেয় ঠিক আছে কি না। তারপর বসবার ঘরে একটু দাঁড়িয়ে থাকে। দুটো আলমারি ভরতি তার নিজের সাবজেকটের বই রয়েছে। ইচ্ছে হয় একটা বই বের করে নিয়ে যায়। কিন্তু আবার চাবি আনা পোষায় না। আজকাল রাতে কিছু পড়তে চায়—হয়ে ওঠে না। বিলু—সাম্প্রতিক বিলুকে পাশে রেখে তার পক্ষে কিছু পড়া কঠিন। সে ভাবে বিলু যেন তার নাগাল ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সত্যিকার বিলু কি এরকমই? বারো বছর ধরে যে-বিলু তার কাছে ছিল সে একটা মিথ্যে বিলু—সাজানো।

রাত তখন এগারোটা। গীর্জার ঘড়ির সঙ্গে এ ঘরের টেবিল-ঘড়ির তফাত পাঁচ মিনিট। হাসানের হাতঘড়ির সঙ্গে দুমিনিট।

বিলু শুয়ে পড়েছে। হাসান দরজার কাছে আসতেই ঘণ্টা ঘড়ি বেজেছিল। দরজাটা ভিতর থেকে ছিটকিনি তুলে বন্ধ করে দিল সে। বিলু আজকাল সকালে দেরি করে ওঠে। এবং যে অবস্থায় থাকে, ওকে না জাগিয়ে দরজা খোলা নিরাপদ নয়। অবশ্য বেচারার দোষ নেই, বরাবর গরম একেবারে সইতে পারে না।

খাটের পাশে টেবিলল্যাম্প জ্বলছে। আরো আধঘণ্টা জ্বলে তারপর নিভিয়ে দেবার নিয়ম আছে এ ঘরে। হাসান দেখল টুকুনের বিছানাটা আজ মা-বাবার মাঝখানে। একটু থমকে দাঁড়াল সে।

..'এরি মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে আজ? বাঃ, ভাবলুম—কাল বাইরে চলে যাচ্ছি, কবে ফিরব ঠিক নেই..'

বিলু ঘুমোয়নি। চোখ খুলে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'
'ওড়িষ্যা।'
'কবে?'
'কাল সকালের ট্রেনে।'
'এতক্ষণ তো বলনি!'
হাসান অবাক।...'বা রে, তখন খেতে বসে বললুম না?'
'আমি শুনিনি।'
'তা শুনবে কেন? যাক্ গে, শোন—আমার একটু গোছগাছ করে রাখতে হবে। আলো জ্বালব।'
বিলু নড়ে উঠল...'আলো তো আছে!'
'ওতে হবে না।'
'তা এতক্ষণ কী করছিলে? অদ্ভুত মানুষ তো!'
'ভেবেছিলুম—তুমি গুছিয়ে রাখবে। দেখছি কিছুই হয়নি।'
বিলু বিরক্ত মুখে বলল, 'পরিষ্কার করে তো কিছু বল না আজকাল। বললে গুছিয়ে রাখতুম। অ্যাদ্দিন তো রেখেছি। ছেলেমেয়েদের শোনাচ্ছিলে—কোথায় যাবে না কী, তা আমি কী করতে পারি বল? আমাকে বললে আমি নিশ্চয় গুছিয়ে রাখতুম। আর তোমাব ছেলেমেয়েরাও তো পিতৃভক্ত দেখছি!'
হাসান এই চার্জের মুখে একটু অপ্রস্তুত হল বইকি। বলল, 'ঠিক আছে। আমারই ভুল। কিন্তু আলো না জ্বাললে যে নয়।'
'টুকুন উঠে পড়লে আমি সামলাতে পারব না কিন্তু।'
'উঠবে না।'
'উঠবে। অত উজ্জ্বল আলো কচি চোখের নার্ভে ইরিটেশান আনবে না?'
'তুমি ভীষণ ডাক্তারি করছ আজকাল!' হাসান একটু রেগে গেল। তাবপর অবশ্য সে সুইচ টিপল না। এই তার প্রকৃতি। বলল, 'আলমারির চাবি দাও।'
'টেবিলে আছে—ওই তো।'
চাবিটা নিয়ে সে আলমারি খুলল। ছায়াময় এই আভায় দৃষ্টি যতটা পারে তীক্ষ্ণ করে কয়েকটা প্যান্ট শার্ট বের করল। আরো কী সব টুকিটাকি জিনিসপত্রও। 'আমার আন্ডারওয়্যারগুলো কোথায় রেখেছ?' মেঝে থেকে হাসান জিজ্ঞেস করল।
'নিচের দিকে খোঁজ।'
'রুমাল?'
'ওখানেই।'
'সেফটি রেজার?'
'আমি কি দাড়ি কামাই? তুমিই জান—কোথায় থাকে।'
টলতে টলতে বাথরুমের দিকে চলে গেল হাসান। একটু পরেই ফিরল।...'তোয়ালে চাই একটা। আমারটা তো এখনও ভিজে রয়েছে দেখলুম। রেখাকে বলোনি শুকিয়ে রাখতে? আশ্চর্য!'
'নতুন তোয়ালে আছে—নাও না একটা।'
'নতুনে গা মোছা যায় না।'
'তাহলে আমি কী করব?'
কিছুক্ষণ চুপচাপ কাজ করে গেল হাসান। তারপর ডাকল, 'বিলু! ঘুমোলে?'
'না। কেন?'
'বেডিং?'
'হোল্ডলটা চিকনদের ঘরে আছে।'
'একটা তোষক বালিশ চাদব—এসব চাই তো। অন্তত খানদুই চাদর চাই।'

'ডাইনিং রুমে রেখা যেটায় শুয়ে আছে—ওটা নাও।'

'পাগল নাকি।'...হাসান অতিদুঃখে হেসে ফেলল।..'রেখার তোষক নেব কি?'

'ওটা তো ওর জন্যে করা হয়নি। ওটাই তো সেদিন তোমার বাইরের জন্যে করিয়েছিলে।'

'ও শোবে কিসে?'

'গাঁয়ের মেয়ে। এ গরমে তোষকে নিশ্চয় শুয়ে নেই দেখ গে। ঠিক মেঝেয় শুয়েছে।'

হাসান একটু হাসতে হাসতে পাশের ঘবে গেল। তারপর ফিরে এল তোষকটা নিয়ে।

'তোমার কথাই ঠিক। বকবে বলে বিছানাটা করে সম্ভবত— তারপর ঠিক গড়িয়ে যায় মেঝেয়। কিন্তু কী গন্ধ করে ফেলেছে! ডেটল ছড়াতে হবে।'

বিলু কোন কথা বলল না। হাসান আবার চলে গেল। চিকনদের ঘর থেকে হোল্ডঅল নিয়ে এল। বলল, 'এবার বালিশ চাই। চাদর পেয়ে গেছি।'

বিলু নিজের বালিশটা তুলে পায়ের দিকে ছুঁড়ে দিল নিঃশব্দে।

হাসান লাফিয়ে উঠল।...'আরে, এ কী করছ? নতুন বালিশ তো ছিল কয়েকটা।'

'সে এখন বের করা কঠিন। কিচেনের ছাদে হাফরুমটায় রেখেছি।'

'তুমি এখন শোবে কিসে?'

'আমার চলে যাবে। মেলা বকিও না। ঘুম পাচ্ছে।'

এইসব করে হাসান যখন শুতে এল, তখন পৌন বারোটা। বিলু তখনও সত্যিসত্যি ঘুমোয়নি। ওর চোখে সন্ধ্যারাতের সেই দৃশ্যটা ভাসছে। শেখর আর সে টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়ে বসেছিল। সবে গানটা শুরু করেছে, তারপব কলিং বেলের শব্দ, চমকে ওঠা বুকের চাপা শব্দ, গান বন্ধ, হাসান এল, ব্যাগটা রেখে দিয়েই কাপড় বদলাতে গেল, নিঃ-শ-ব্দে! হ্যাঁ—নিঃশব্দে। তারপর ফিরে এসে বলে উঠল—'অন্ধকারে কেন? ও কে?'..ও—কে! শব্দটা, উচ্চারণ-ভঙ্গী, কণ্ঠস্বর কান থেকে যাচ্ছে না—যাচ্ছে না।

হাসান শুয়ে ডাকল, বিলু!'

'কী?'

'কয়েকটা চেকে—ব্ল্যাঙ্ক চেক, সই করে যাব। কেমন? দরকার মত তুলবে। তোমার অ্যাকাউন্টে হাত দিও না কিন্তু। বাইরে যাচ্ছি—কখন কী হয়ে যায়! মানুষের জীবনটাই তো এমনি! প্রতিদিন কত কী অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যাচ্ছে।'

বিলু জবাব দিল না—যদিও হাসান দু'মিনিট কান পেতে থাকল। এই কথাগুলোর ওজন কত, কী মারাত্মক এগুলো—জেনেই বলছিল সে। কিন্তু বিলু কিছু বলল না। তার মানে কথাগুলো নির্ঘাৎ ব্যর্থ হল। হাসান খুবই দুঃখিত হয়ে পড়ল।

আবার দুটো মিনিট গেল। হাসান মুখ তুলে দেখল বিলুকে। ওর মাথায় বালিশ নেই। সে ডাকল .'টুকুনকে ওপাশে দাও না। একটা বালিশেই হয়ে যেত।'...পরক্ষণে একটু হাসল।...'দেখ বিলু, বালিশ মাথায় না-থাকার দারিদ্র্যটা এই ফ্ল্যাটে, আমার স্ত্রীর পক্ষে ভারি বিলাসের ব্যাপার—ফ্যাশানে-ব্ ল্। কেন হঠাৎ অমন করছ? কী করেছি আমি বলবে? কাল চলে যাচ্ছি বাইরে-কাছে প্রচুর আদর-অভ্যর্থনা পাব। কিন্তু...' সে চুপ করে গেল।

'তোমার ট্রেন কটায়?'

'সাড়ে সাতটা।'

'তাহলে জাগছ কেন?'

হাসান বালিশে কনুই রেখে একটু উঁচু হল।..'তুমি জাগিয়ে রেখেছ—তাই।'

একটু চুপ করে থেকে বিলু বলল, 'বিদায় দিতে হবে?'

'তার মানে?'

'মানে স্পষ্ট।' খুব সোজাসুজি বলল বিলু। 'চলে এস এদিকে। আমি নড়তে পারব না।'

'তাবপর?...হাসান মিটিমিটি হাসছিল।

'পাবে।'

'কী?'

'যা চাও!'

হাসান মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, 'টুকুনের বয়স প্রায় চার মাস হল। এর মধ্যে কোনদিন কি তোমাকে ওসব চেয়েছি বিলু?'

'বেশ তো। পরমহংস হয়ে থেকেছ। এখন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে চলে যাচ্ছ। তখন...'

বিলু, তুমি এত নিষ্ঠুর কথাবার্তা শিখলে কোত্থেকে?

'তুমি কি আলো নেভাবে?...বলে অন্তত একমিনিট বড় চোখে হাসানের দিকে তাকিয়ে থাকল বিলু। এখন তার গায়ে হালকা সাটিনের ব্রেসিয়ার, পরনে গাঢ় লাল সায়া, ক্রিমাক্ত মুখ ছায়াতেও চকচক করছে! আর খোলা দেহের উজ্জ্বল গৌর রং অদ্ভুত ধূসর দেখাচ্ছে। কাচের কফিনে স্বচ্ছ স্পিরিটে ডোবানো মৃতদেহের মতন স্থির—শুধু চোখদুটো বাদ দিয়ে দেখলে।

মাথার ওপর ফ্যানটা তিনের ঘরে ঘুরছে। কোন শব্দ নেই। বালিশে কনুই এবং পিঠ খাটের বাজুতে রেখে হাসান ঘরের ভিতরটা দেখছে। আসবাবপত্র, সাজানো পুতুল, দেয়ালে দু-তিনটে পেন্টিং, ক্যালেন্ডার, আলমারির মাথায় ফোলিও ব্যাগটা—তার সংসার এবং এই হঠকারী উপদ্রুত সময়! সব অর্থহীন আর অনিশ্চিত লাগছে। পঁয়ত্রিশ টাকা দামের হাবসি পুতুলটা হাতে বেটপ খঞ্জর নিয়ে সাদা চোখে হাসানের দিকে তাকিয়ে আছে আর তাকিয়ে আছে। চৌরঙ্গীর কিউরিও শপ থেকে যেদিন ওটা কেনা হয় সেদিন ওটা শিল্প ছিল—এখন কিম্ভূত উপদ্রব লাগল। পায়ের দিকের বাজুতে শাড়ি আর ব্লাউজ রেখে বিলু পালিয়ে গেছে কোথায়।

তারপর হাসান টেবিল ল্যাম্পটা নিবিয়ে দিল। সেই সময় 'ললিতাভবনের' দিক থেকে পাম গাছগুলো নাড়া নিয়ে রাস্তার দেবদারুর ডালপালা দুলিয়ে একটা হাওয়া এল। জানলা দিয়ে হাওয়াটা এসে ঘরের ভিতর কিছু অস্পষ্ট শব্দ তুলল। ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো কেঁপে উঠল। হাসান নামল বিছানা থেকে। জানলার সামনে দাঁড়াল দুতিন মিনিট। গীর্জার ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজল। কোথায় গাড়ির শব্দ হল। কোত্থেকে ভেসে এল উর্দু গজল গানের জলসার ঝংকার হারমোনিয়ামের বাজনা—ফের মিলিয়ে গেল। কুকুর ডাকল। নিচের রাস্তায় দুটো লোক মৃদুস্বরে কথা বলতে বলতে চলে গেল। হাসান দরজা খুলে বেরোল। বসবার ঘরে গিয়ে আলো জ্বেলে আলমারিগুলোর সামনে হাঁটু ভাঁজ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে চিকনদের ঘরে গেল। ওরা ভয় পাবে বলে জিরো পয়েন্টে নীল আলোটা জ্বেলে দিল। পাশাপাশি দুটো খাটে ওর ছেলে আর মেয়ে ঘুমোচ্ছে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নীলবর্ণ দুটি ঘুমন্ত বালক-বালিকাকে দেখতে লাগল সে।...

শেষরাতের দিকে একবার ঘুম ভেঙেছিল বিলুর। অভ্যাসে সে হাসানকে দেহ দিয়ে ছুঁতে গিয়ে পেল টুকুনকে। সরে এসেছিল একটু। তারপর দেখেছিল পায়ের দিকেব জানালার কাছে হাসান চুপচাপ বসে আছে। বিলু আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আবার ঘুম ভেঙেছিল একবার। কানে এল খানিকটা দূরের মসজিদ থেকে আজানের শব্দ। ঘরের ভিতর কুয়াশা জমে রয়েছে যেন। বিলু দেখেছিল, হাসান তখনও সেখানে বসে রয়েছে। আবার ঘুমে ডুবে গিয়েছিল বিলু। এই সময়টাই তার ঘুম গাঢ় হয়।

আটটায় সে-ঘুম ভাঙল-। ভাঙত না। টুকুনের মুখে রোদ পড়েছিল। সে কেঁদে উঠেছিল। বিলু ডেকেছিল, 'রেখা, একে নিয়ে যা।'

রেখা নিঃশব্দে টুকুনকে নিয়ে গেলেও আর ঘুম আসেনি বিলুর। তাড়াতাড়ি শাড়িটা জড়িয়ে নিয়েছিল গায়ে। চিকনদের ঘরে শেখরের বোন মঞ্জরীর গলা শোনা যাচ্ছিল।

বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে বিলু বলেছিল, 'রেখা, তোদের সায়েব কই রে?'

রেখা টুকুনকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। বলল, 'উনি তো কোন ভোরবেলা চলে গেলেন। আপনাকে ডাকব বললুম, মানা করলেন। আমি চা-নাস্তা করে দিলুম। খেয়ে বেরোলেন। চিকন আর ঝুমঝুমি ট্যাকসি ডেকে দিলে। আপনি তখন ঘুমোচ্ছেন বলে কেউ ডাকেনি।'

৩

ঝুমঝুমি মঞ্জরীর কাঁধে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে ঘরে ঢুকল। '...মা, কী তোমার ঘুম! আমরা সেই ভোরবেলা থেকে কী হইচই করছি—তুমি কিচ্ছু জান না।'

বিলু মিষ্টি হাসল।..'মঞ্জরী, এস। মা কী করছেন?'

মঞ্জরী বলল, 'মা এক্ষুনি পাইকপাড়া গেল। শশাঙ্কর সঙ্গে।' শশাঙ্ক কে?'

হাসতে লাগল মঞ্জরী।...'এ মা! আপনি জানেন না? যিনি শেখর, তিনিই শশাঙ্ক। বুঝলেন বউদি? আমি পিতৃভক্ত...তাই বাবা যা বলে ডাকেন, তাই ডাকি। মা ডাকেন শেখর। শশাঙ্ক শেখর ইজ ইকোয়ালি ডিভাইডেড বাই টু পারসনস!'

'বারে! জানতুম না তো।...বিলু হঠাৎ সেই গীতবিতানের পাতা খুলে বসল। ইঁউ! শুধু শেখর লিখেছে।

মঞ্জরী ছোঁ মেরে বইটা তুলে নিয়ে দেখে বলল, 'চিরপরাজিত শেখর। তার মানে?'

'কাল আমদের একটা বাজি হয়েছিল বৃষ্টি নিয়ে।'

'শশাঙ্ক হেরেছে?'

'তুমি ওর নাম ধরে ডাকো যে।'

'ডাকি। এখনও ও ঠিক দাদা হবার যোগ্যতা অর্জন করেনি। তাছাড়া বয়সে তো আমার চেয়ে মোটে এক বছরের বড়।'

ঝুমঝুমি হাততালি দিয়ে লাফাল।...'আমার মত, আমার মত!'

'দাদা কোথায় গেলেন বউদি?'

'কে?'

'আপনার হের ডকটর। আবার কে?'

ঝুমঝুমি বলল, 'ওড়িশা। ঠিকানা দিয়ে গেছে আমার খাতায়।'

'আজ তোমার কলেজ নেই, মঞ্জরী?'

'আছে তো!'...বলে মঞ্জরী ফোনের টেবিলের দিকে এগোল। 'আরে! এ ছবিটা আপনাদের খাবার ঘরে ছিল না?'

বিলু জবাব দিল না। ঝুমঝুমি বলল, 'ছবিটা এঘরে আনলে কেন মা?'

হাসান আব বিলুর ফোটোটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে মঞ্জরী চাপা অস্ফুট কৌতুকে বলল, 'বিরহসংবাদ।'

চিকন গম্ভীর মুখে ঢুকে বলল, 'মা, এক ভদ্রলোক এসেছেন।'

বিলু বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাইরে গেছেন বললিনে কেন?'

'বলেছি। তোমাকে চাই'

বিলু এক পা এগিয়ে বলল, 'কে না কে এসে বলবে—আর তুই, তাকে বসিয়ে রাখবি? অদ্ভুত ছেলে তো তুই!'

চিকন সোজা বলল, 'তোমার সঙ্গে তো কতজনের চেনা থাকে। চলে যেতে বলে তোমার বকুনি খাই আর কী। যাও, দেখা করে এস।'

মঞ্জরী বলল, 'কী দারুণ বলছিস রে চিকন!'

বিলু আচমকা এক চড় মেরে বসল চিকনের গালে।...'হতভাগা ছেলে! কতজনের সঙ্গে আমি দেখা করি? এ্যাঁ? অদ্ভুত শিক্ষা তোমার! বাবা বুঝি এসব শিখিয়ে গেল?'

চিকন মার খেয়ে বড় বড় চোখে শুধু তাকাল। তারপর হঠাৎ জিভটা বের করে বিরাট একটা ভেংচি কেটে চলে গেল।

ঝুমঝুমি বলল, 'চিকনটা কী বদমাস হয়েছে, জান মা? কাল স্কুল থেকে আসবার সময় ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করছিল—একটা লোকের গায়ে লাগাতেই তাড়া করল। তখন...'

মঞ্জরী বলল, 'তোদের স্কুলের গাড়ি নেই রে?'

'বাংলা মিডিয়াম যে!'

'যাঃ, সেজন্যে গাড়ি থাকবে না কেন? বউদি, ওদের ভাল কোন স্কুলে দিলেই পারতেন।'

বিলু কোন জবাব দিল না সে কথার। বলল, 'ঝুমঝুমি, লোকটাকে জিজ্ঞেস করে আয় তো—কোত্থেকে এসেছে, কাকে চাই, কী নাম।'

ঝুমঝুমি চলে গেল। মঞ্জরী বলল, 'বউদি, কাল এক কাণ্ড হয়ে গেছে শোনেন নি? বলেনি শশাঙ্ক?

'কী? না তো!'

'ওরা নাকি একসময় মস্তো জমিদার ছিল। এখন একটা কোলমাইন আর এখানে কী সব বিজনেস-টিসনেস আছে। দুই মেয়ে,—কোন ছেলে নেই। বড় মেয়ের সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছে, সে ঘরজামাই।'...মঞ্জরী হেসে উঠল।...'ঘরজামাই শুনলেই হাসি পায় না আপনার?'

'পায় তো। তারপর?'

'তারপর আর কী, ছোট মেয়েকে গছাতে চায় শশাঙ্কের ঘাড়ে। কাল আবার এসেছিল। বলছে, জামাইকে বাইরে পাঠিয়ে ফারদার পড়াশুনো বা রিসার্চের সব খরচ দেবে। খুব পছন্দ হয়েছে। মেয়ে মোটে স্কুল ফাইনাল পাশ। পড়াশুনোয় বিশেষ উৎসাহ নেই দেখে আর পড়ায়নি। তার মানে বুঝতে পারছেন?'

'উঁহু।'

'ভ্যাট্—এতো সোজা। মাথায় কোন মেটিরিয়াল নেই! নির্ঘাৎ তিনবারের বার পাশ করেছিল। তবে দেখতে শুনতে ভালোই। ফোটো এনেছিল। মায়ের কাছে আছে। দেখাব'খন।'

বিলু দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাঃ, বেশ তো!'

'হুঁ—পাত্রী সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মনিপুণা!'...মঞ্জরী হাসতে লাগল।...'অবশ্য আমাদের অনেক ব্যাপার আছে। অঞ্জলিকে পার না করে তো নয়! জানেন বউদি? দিদিটা ভারি অদ্ভুত মেয়ে। আপত্তি সত্ত্বেও সখের চাকরি ছাড়তে চায় না। এদিকে কেমন একানড়ের মত বাইরে-বাইরে থাকে লক্ষ্য করেছেন? কে জানে বাবা, কোথায় প্রেমটেম করছে না কী। আমি ওসব সাতে-পাঁচে থাকি না—বলতেও পারব না।'

ঝুমঝুমি এসে বলল, 'লোকটা আমাকে কী আদর না করল মা। আমি তো চিনিই নে ওকে। বলল, তোমাদের সবাইকে চিনি। মাকে ডেকে দাও।'

বিলু বলল, 'কী নাম বলল? কোত্থেকে আসছে?'

'বাংলাদেশ। নামটা কী যেন...যাঃ ভুলে গেলুম, মা!' অসহায় চোখে তাকাল ঝুমঝুমি।

'মেফুজ? উনি তো তোর বাবার আত্মীয়—ওঁকে তো তোরা দেখেছিস!'

'না, না। ম দিয়ে নাম নয়—বেশ গোলমেলে নাম।'

বিলু একটু ইতস্তত করছিল। তালতলার বাড়িতে অবশ্য সে কোন বাইরের অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে দেখা করত না। বাড়ির বাইরে না মানলেও ঘরে অন্তত পর্দাপ্রথাটা কিছুটা মানত—মানতে ইচ্ছে করত, এবং সেটা পরিবেশের দরুন। এ বাড়িতে ওসব বালাই নেই। সবার সাথেই দেখা করে সে। অথচ হঠাৎ কেন যেন বুকটা কাঁপল। অস্বস্তি জাগল। তার মনে পড়ল, গতকাল দুপুরে রহস্যময় ফোনের ডাকটা। এই লোকটাই কি?

কে হতে পারে এই আগন্তুক? বাংলাদেশ থেকে এসেছে। বাংলাদেশে তার পরিচিত কে আছে? আত্মীয়স্বজন কিছু ছিল—কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর থেকেই বহু বছর ধরে কারো সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। এমনকি একাত্তরের মার্চের ওই বীভৎস বর্বরতার পরে অনেকের আত্মীয়স্বজন পালিয়ে এসেছিল—বিলুর কেউ আসেনি। অন্তত বিলুর কাছে আসেনি।

ঝুমঝুমি বলল, 'মা—যাও!'

মঞ্জরী বলল, 'দেখে আসুন না বাবা! বাঘ-ভালুক নিশ্চয় নয়। তাহলে ঝুমঝুমিকে আগে খেয়ে ফেলত।'

ভারি পায়ে এবং ঠাণ্ডা শরীরে বিলু এগোল। পর্দা তুলেই সে চমকে উঠল। একটু পিছিয়ে এসে পর্দার এপারে চৌকাঠে হাত রেখে দাঁড়াল। তালতলার বাড়িতে লোকটা একদিন এসেছিল। হাসান তখন অফিসে। চিকন ঝুমঝুমি স্কুলে। একটা ছোকরা চাকর ছিল। তাকে তক্ষুনি কাছের ওষুধের দোকানে ফোন করতে পাঠিয়েছিল হাসানের অফিসে। হাসানও তক্ষুনি অফিস থেকে হন্তদন্ত হাজির। তার আগেই কেটে পড়েছিল লোকটা। বিলুর তখন পাগলের অবস্থা। শুধু বলল, 'একটা পাগল ঢুকে পড়েছিল ঘরে।'

একটা প্রশ্ন হাসানের মনে অনেকদিন গজিয়ে থেকে অবশেষে খসে গিয়েছিল। বিলুর সম্পর্কে তার মনে তো একটুও সংশয় ছিল না। ওর ভালবাসায় ছিল তার গভীরতর বিশ্বাস। আর হাসানের প্রকৃতি ঠিক এরকম—কোন ব্যাপারে বেশি বাড়াবাড়ি করে না—থামতে জানে নির্দিষ্ট জায়গায় এবং সরে যেতেও পারে। এখন এই মুহূর্তে হাসানের কথাটা বিলুর মাথায় এল না, এল শেখরের কথা। শেখর তো নেই—মায়ের সঙ্গে পাইকপাড়া গেছে। এখন একটা ব্যাপার করা যেতে পারে—অন্য ফ্ল্যাটের কোন পুরুষ মানুষকে ডাকা। কিন্তু তাতে অকারণ স্ক্যান্ডাল সৃষ্টি হবে। থানায় ফোন করলেও তাই। বিলু ঘামতে লাগল। কে ওকে এখানকার ঠিকানা দিল? আর চিকনটারই বা কী বুদ্ধি! যাকে-তাকে হুট করে ঘরে ডেকে বসতে বলা! অবশ্য এটা তালতলার বাড়ি অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। এ বিলুও সে বিলু নয়। এখানে আসার পর থেকে সে একটা নিশ্চিন্ত সাহস পেয়ে গেছে। নিজেকে দেখে আর আফশোস করে বলে না—'বিলু, কী হয়ে যাচ্ছিস তুই।' পৃথিবীতে তার যে একটা জায়গা ছিল একদা, পরে যা হারিয়ে ফেলেছিল—এখন ঠিক সেই জায়গাটি খুঁজে না পেলেও (কেই বা পায়!) পেয়েছে একটা। খুব শক্ত আর সুভব্য নতুন মাটি। নিজেকে নিরাপদ আর স্বচ্ছন্দ বোধ করার পক্ষে তা যথেষ্ট।

মঞ্জরী আর ঝুমঝুমি তার পিছনে এসে উঁকি দিচ্ছিল। লোকটা খবরের কাগজের দিকে ঝুঁকে বসে রয়েছে। পড়ছে কিংবা পড়ার ভান করছে। ঘরে প্রচুর আলো থাকায় তার কানের পিছনে দুতিনটে পাকা চুল দেখা যাচ্ছে। মঞ্জরী বিলুর কানে ফিসফিস করল, 'চেনেন না?'

আশ্চর্য কান লোকটার! মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, 'বিলু, আসছ না কেন?'

বিলু আর থাকতে পারল না। পর্দা তুলে ঢুকে গেল। দু মিটার দূরত্বে দাঁড়িয়ে তীব্র কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, 'কী চাই তোমার?'

হাসতে লাগল লোকটা।...'তুমি বড্ড অদ্ভুত মেয়ে! দেখলেই ক্ষেপে ওঠ কেন? এখন তো তোমার বয়স হয়েছে, গৃহিণী হয়েছ—ভদ্রতার মুখোশও অন্তত একটা পরে থাকবে তো—না কী? ডক্টর হাসান কলকাতায় নেই শুনলুম। সেবারের মত হইচই করার সুযোগ পাবে না। বস, বেশিক্ষণ থাকতে আসি নি।'

বিলু শক্তমুখে বলল, 'চিকনের বাবা নাই—কিন্তু আমার লোক আছে।'

'লোক। বাঃ! লোকও জুটিয়ে ফেলেছ এবার!'...সে আরও জোরে হাসল। ওঘর থেকে চিকন এসে একবার উঁকি মেরে গেল।

বিলু বলল, 'তুমি যাবে না কী?'

'যাব তো। কিন্তু বসে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলতে আপত্তি কেন তোমার?'...সে কাগজটা গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল। ভঙ্গিটা খুব কেজো ধরনের। 'সেবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম, পাকিস্তান চলে যাচ্ছিলুম—তাই। ভাবলুম, আর তো দেখা হচ্ছে না। কিন্তু পাত্তা তো দিলেই না, খামোকা স্বামী বেচারাকে ডেকে নিজেই সন্দেহভাজন হলে। এবার বল, তার জন্যে তোমার দাম্পত্যজীবনে যদি কোন অশান্তি ঘটে থাকে তো দায়ী তুমি নিজেই।'

বিলুর পায়ের দিকে শাড়ি কাঁপছিল। সে কী বলবে ভেবে পেল না।

'জান বিলু? তারপর কতদিন ধরে আমার মাথায় ওই দুশ্চিন্তাটা গেল না! বোকা মেয়েটা নিজেই নিজের জীবনে হয়ত দারুণ অশান্তি ডেকে আনল! বিশ্বাস কর, কী ভীষণ ভাবতুম! কেনই বা হুট করে গিয়ে পড়েছিলুম বলে আফসোস হত। তারপর তো ওখানে গণ্ডগোল আরম্ভ হল। সবই জান। আমি কিন্তু চলে আসিনি। আসবার ইচ্ছেও ছিল না। ঢাকার গ্রামের দিকে এক আত্মীয়বাড়ি থেকে গেলুম। তুমি তো জানোই, আমি রাজনীতির ধারে কাছে ঘেঁষি না কোনদিন। তাছাড়া গ্রামটা এমন জায়গায় যে

ইয়াহিয়া খাঁর চেলারা ওদিকে পা বাড়ায় নি। অক্ষত বেঁচে রইলুম। তারপর তো বাংলাদেশ স্বাধীন হল। গণ্ডগোল মোটামুটি শান্ত হল। এবার ভাবলুম, একবার কোলকাতা গিয়ে দেখে আসি বিলু বেচারা কেমন আছে। বিশ্বাস কর, চারদিকে তখন ভীষণ অবস্থা—শুধু রক্ত আর লাস, তার মধ্যে আমি শুধু ভেবেছি, বোকা বিলুটা করল কী! এমনি করে স্বামীর সামনে সেদিন নিজের।'...

বিলু মুখ খুলল এতক্ষণে। 'তোমাকে ভাবতে হবে না। আমাদের কোন অশান্তি হয় নি।'

'হয় নি? সত্যি বলছ?'

'না—হয় নি। তুমি এখন এস।'

'যাঃ, হতেই পারে না! ডকটর হাসান তোমাকে জিগ্যেস করেন নি আমি কে?'

'না।'

'তাহলে বলব, তুমি ভাগ্যবতী। তোমার স্বামী মহাপুরুষ।

'ওকে অপমান করার অধিকার তোমার নেই! তুমি চলে যাও এক্ষুনি।'

'তুমি তাকে কি বলেছিলে সাজ্জাদ তোমার প্রথম স্বামী?'

বিলু আচমকা বইয়ের আলমারির মাথা থেকে ক্যাকটাস গড়নের মাটির ফুলদানি তুলে ওর দিকে ছুড়ে মারল। মুখ সরিয়ে নিতেই সেটা আলমারির কাচে লাগল। ফুলদানি আর কাচ ভেঙে গেল সশব্দে। চিকন দৌড়ে এসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে গেল।

সাজ্জাদ হেসে উঠল। 'বলনি যে সাজ্জাদ স্বেচ্ছায় হাসিমুখে তোমাকে ডিভোর্স করেছিল? বলনি, এমনি করে সুন্দরী ভালবাসার বউ চাইলেই তালাক দেবার মত পুরুষ দুনিয়ায় আছে—তার নাম সাজ্জাদ?'

বিলু ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ছোটলোক, ইতর, চামার! বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এক্ষুনি। নয়ত পুলিশ ডাকব।'

'আমি স্যাক্রিফাইস করেছিলুম, বিলু। যা কেউ করে না! তার জন্যে এমন অপমান আশা করি নি।'

চিকন গম্ভীরমুখে বলল, 'আপনি চলে যান! ডিস্টার্ব করবেন না।'

'বিলু, কলকাতার মত বড় শহরে সব সম্ভব। কেউ কারো পিছনের দিকটা জানতে পারে না। মেটিয়াবুরুজ থেকে পার্কসার্কাসের দূরত্ব কোন দিনই ঘোচে না। এ-বড় আজব শহর। তাই তোমার মা পার্কসার্কাসে এসে তোমাকে আইবুড়ো মেয়ে বলে চালিয়ে দিতে পেরেছিল।'

বিলু আবার কান্না-কান্না স্বরে তীব্র চেঁচিয়ে উঠল 'চিকন, ঝুমঝুমি, রেখা! তোরা সবাই আয় তো। এই ছোটলোকটাকে বের করে দে! মঞ্জরী, তুমি খবর দাওতো।...'

সাজ্জাদ উঠে দাঁড়াল। এবার মঞ্জরী বেরিয়ে এল পর্দার আড়াল থেকে।...'আপনি বেরিয়ে না গেলে পুলিশ ডাকতে হবে। কেন আপনি ট্রেসপাস করছেন অন্যের বাড়িতে? জানেন—এসব ফ্ল্যাটে ভদ্রলোক থাকে? আপনি ভারি অসভ্য মানুষ, দেখছি। শেখর থাকলে এতক্ষণ আপনি...'

সাজ্জাদ গম্ভীর মুখে শান্তভাবে বলল, 'বিলু তুমি যাই ভাব—আমি শুধু দেখতে এসেছিলাম যে সেবার গিয়ে পড়ে তোমার জীবনে কোন অশান্তি সৃষ্টি করে ফেলেছি কিনা। আর কিছু নয়। আচ্ছা, চলি, কিন্তু বলে যাচ্ছি, তুমি কোন দিন সুখী হতে পারবে না। খোদার বিচার ওস্তাদের মার—শেষ দিকে।...'

তারপর সে বেরিয়ে গেল। সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এরা ঘরের ভিতর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর মঞ্জরী এগিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। চিকন কিছু বিরক্তি কিছু হাসি মুখে রেখে 'ভ্যাট্, যতঃসব,' বলে নিজের ঘরে চলে গেল। ঝুমঝুমি অকারণ মঞ্জরীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুজনেই বিলুকে লক্ষ্য করতে থাকল।

বিলু আস্তে আস্তে হেঁটে তার ঘরে চলে এল। তারপর বিছানায় উপুড় হয়ে শুল।

শেখর এল বিকেলে।

বিলু তখন শুয়ে আছে। খাটে তার পাশে খালি রবারের ওপর শুয়ে টুকুন হাতপা ছুঁড়ে খেলা করছে। একটা প্লাস্টিকের ফুল নিয়ে তার সামনে নাড়াচাড়া করছে বিলু। চিকন-ঝুমঝুমিকে থাকতে

বলেছিল, থাকেনি। পার্কে গেছে যথারীতি। এবং রেখা গিন্নীর পরামর্শ মত কপাটের ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে শেখরকে না দেখলে দরজা খুলে দিত না। দরজা খোলার শব্দ না পেলে বিলুও বেলের শব্দ শোনার আতঙ্ক দ্রুত তাড়াতে পারত না।

শেখর এসেই বলল, 'কী হয়েছিল বউদি?'

বিলু একটু হেসে তাকাল।...'কী হবে?'

'মঞ্জরী বলল।'...বলে শেখর আজ একটু ঘনিষ্ঠভাবে খাটের পাশে মোড়াটা নিয়ে বসল।

'কী বলেছে, শুনি?'

'যাই বলুক—মা ওকে সাবধান করে দিয়েছে। ভাববেন না। আজকাল স্ক্যান্ডাল কীভাবে ছড়ায় জানেন তো!'

'আমার কোন স্ক্যান্ডাল নেই!'

শেখর হাসল।...'নিশ্চয় নেই। আমি ওটা স্ক্যান্ডাল বলিনে। আজকাল দুটো বিয়ে সবারই হচ্ছে। চার নম্বর ফ্ল্যাটের সাধনবাবু যে লুকিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে এখানে বউ রেখেছে, তাতে সাধনবাবুর সম্মান চলে গেছে কি?'

'শেখর, তুমি হাসিও না তো! ভাল্লাগে না।'

'আপনি জানতেন সাধনবাবুর ব্যাপারটা?'

'না তো! সত্যি?'

'ভীষণ সত্যি। ওঁর প্রথম পক্ষের অনেক ছেলেমেয়ে আছে— সোদপুরের ওদিকে কোথায় থাকে। মাসে মাসে দিব্যি সাধনবাবুর খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন। আর ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করতে পারেন না বলে কলকাতার মেসে থাকছেন নাকি। প্রথম বউ বিশ্বাস না করে পারে না। শনি-রোববার দিব্যি ভদ্রলোক সোদপুর গিয়ে থাকেন।'

'এই বউ জানে না কিছু?'

'জেনে ফেলেছে। কিন্তু কী করবে?'

'কীভাবে জানল?'

'ওই শনি-রোববারের অ্যাবসেন্স নিয়ে। প্রতি সপ্তাহ তো মাসীর বাড়ি কেউ যায় না! একদিন ফলো করেছিল। কী সাংঘাতিক ধূর্ত মেয়ে, কল্পনা করুন। গিয়ে সব দেখেছে, জেনেও এসেছে চুপি চুপি। পরের সোমবার ফেরামাত্র...ব্যস, ধুন্ধুমার হুলস্থূল ব্যাপার। আমরা সবাই জেনে গেলুম। তখন আপনারা আসেন নি এখানে।'

'এখন কেমন চলছে?'...বিলু মিটিমিটি তাকাল।

'কই, আর তো কিছু শোনা যায় না। তেমন কিছু হলে আপনারা মেয়েরা তো জেনেই যেতেন। সম্ভবত উভয়পক্ষ একটা সেটলমেন্ট করে ফেলেছে। সপ্তায় দুদিন দুরাত সাধনবাবুর ছুটিটা স্যাংশন হয়েছে।'...শেখর হাসতে লাগল। তারপর বলল... 'ওপাশের ওই সান লজের অসীম বোস—আপনি চেনেন না, ওর বউর প্রথম বিয়ে হয়েছিল এক অধ্যাপকের সঙ্গে। ডিভোর্স হবার পর অসীম বোসের প্রেমের লড়াই ডিক্রি পেল। সে সগৌরবে পার্টি দিয়ে অধ্যাপকের প্রাক্তন সপুত্রকা গৃহিণীকে ঘরে তুলল!'

'ছেলে আছে আগের পক্ষের?'

'হ্যাঁ। মাঝে মাঝে মা গিয়ে দেখে আসে।'

বিলু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোমাদের সমাজে এসব নেই ভেবেছিলাম।'

'পাগল! আজকাল কোন বিষয়ে হিন্দুসমাজ পিছিয়ে আছে, বলুন? খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে বিয়ে অব্দি।'

'প্রথমপক্ষের ছেলেপুলে থাকলে তাদের কী অবস্থা হয়, উঃ!'

'আপনার নেই তো?'

বিলু উঠে একটা চাঁটি দিল মাথায় শেখরের কাঁধে। 'যাঃ, অসভ্য!'

'বউদি, আজ স্নান করেন নি মনে হচ্ছে!'

'করেছি।'

'অসম্ভব। কই, চুল দেখি?'

বিলু একটু ঘুরে খোলা চুলগুলো শেখরের দিকে রেখে বলল, 'শুকোচ্ছি দেখছ না?'

শেখর একগুচ্ছ চুল শুঁকে বলল, 'নাঃ। স্নানের গন্ধই নেই।'

বিলু হেসে উঠল..'স্নানের গন্ধ থাকে নাকি? যাঃ!'

'থাকে।'

'তুমি কেমন করে জানলে? কারো চুল শোঁকা অভ্যেস আছে নিশ্চয়!'

শেখর অপ্রস্তুত হেসে বলল, 'কেন, মঞ্জরীদের!'

'যাও বেঁচে গেলে—মানে বোনেদের আড়ালে বাঁচলে।'...বলে বিলু খাট থেকে নেমে দাঁড়াল।...'শেখর, তুমি টুকুনকে দেখবে? আমি স্নান করব।'

শেখর উঠে এল টুকুনের পাশে। সেই ফুলটা নিয়ে টুকুনের মাথার ওপর দুলিয়ে বলল, 'সবতাতে অমন নার্ভাস হয়ে পড়েন কেন?'

'তুমি ছিলে না যে—তাই!'...বলে বিলু চলে গেল।

শেখর টুকুনকে নিয়ে খেলতে লাগল। মাঝে-মাঝে তার হাসি আসছিল। হেসেও ফেলেছিল। মঞ্জরীর মুখে যা শোনা গেছে, তা অদ্ভুত নাটকীয় ব্যাপার। আগাগোড়া দৃশ্যটা কল্পনা করতেই তার হাসি পায়। এই সামান্য ব্যাপারে মেয়েরা এত নার্ভাস হয়ে পড়ে! কিন্তু বস্তুত এতে ক্ষেপে যাবার কিছু নেই। এতো খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। আজকাল বিস্মিত হতে নেই, কোথাও কোন বিস্ময় নেই—সব মরে গেছে আস্তে আস্তে। চাঁদে বার বার মানুষ যাচ্ছে, কেউ মাথাও ঘামায় না। কেন ঘামাবে? মানুষ সব পারে—শুধু অনুকূল অবস্থা আর সময় এলেই হল। সেই অবস্থা আর সময় সৃষ্টি করাটাই আজ মানুষের একমাত্র লড়াই। মানুষ আজ বয়স্ক। তার মাথার ঘিলু আর নার্ভগুলো সুপরিণত। অবশ্য কিছু কিছু ইনফ্যান্টাইল ব্যাপার বয়স্ক মস্তিষ্কের খাঁজে কোথাও লুকিয়ে থাকে—এখনও কারো কারো লুকিয়ে আছে। ম্যাজিক-অলৌকিক-রামায়ণ-মহাভারত-মূল্যবোধটোধ নিয়ে নস্ট্যালজিয়ায় ভোগে। হায়, এই হতভাগারা কি টের পায় না যে এখনও আমরা সেই একই রাজতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পাই-নি? এখনও ব্যক্তিই সব কিছু করে, ব্যক্তিই চরম নিয়ামক—যুদ্ধ কিংবা শান্তির, মন্দ কিংবা ভালোর। সেই রাজতন্ত্রের প্রতীক—নেতৃত্ব নামক সিংহাসনে তার উপস্থিতি। যাক্ গে।...সব মোটামুটি পরিষ্কার হয়েছে যে মানুষের সামনে কী। এই বিলুবউদির কথাই ধরা যাক্। প্রথম যখন ওরা এল, একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব ছিল। মঞ্জরীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল প্রথমে। তারপর আমার সঙ্গে। জোর করে খেতে চাইলে তবে দ্যায়, আর বলে, 'জাতটাত মেরে দিলুম না তো?' এদিকে কবে থেকে সবাই মুসলমান হোটেলে গিয়ে বিরিয়ানি-কাবাব মেরে আসছে, কখনও একা—কখনও সপরিবারে। একদিন একটা হোটেলে গিয়ে দেখিয়ে আনলুম, তখন বিশ্বাস করল। আজকাল সবকিছু আমূল বদলে গেছে, অনেকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও বিশ্বাস করতে বাধো-বাধো ঠেকে। এই নতুন জেনারেশন সমাজে কী নিয়ে এসেছে বা এনে ফেলেছে, ভাবলেই চোখ খুলে যায়।..হুঁ, বিলুবউদি হয়ত মনে মনে লজ্জা-দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে থাকবে। কিন্তু ওর বোঝা উচিত যে চারপাশে সবাই একটা-না-একটা 'ব্যাপার' জামার তলে লুকিয়ে রেখে ঘুরছে, ঘরকন্না করছে, বাজার করছে, খাচ্ছেদাচ্ছে, আপিস যাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে...চমৎকার চলছে ঘড়ির কাঁটা। আমরা ধরতে পেরেছি যে এটাই জীবন—অর্থাৎ রিয়ালিটি। এটা মেনে নিলেই চুকে যায়। কেউ-কেউ মানে না। উচিত-অনুচিতের বস্তাপচা এথিক্স্ ঝাড়ে। তারাই কষ্ট পায়। ধরা যাক, সনি লজের অসীম বোসের ব্যাপারটা সবাই জেনে ফেলেছে। তাতে হলটা কী? অসীম বোস বা তার বউর কী আসে যায়? হোটেলে ঢুকতে দেবে না? সিনেমা দেখা বারণ হবে? ইলেকট্রনিক সাপ্লাই কেটে দেবে? ফ্রিজ কিনতে বাধা হবে? টেলিফোন বাজবে না? আজকাল সবাই নিজেকে এবং নিজের ব্যাপার নিয়েই থাকে। কে কী ভাবল তার সম্পর্কে, তাতে থোড়াই পরোয়া আছে। সমাজকে নিজের-নিজের লাইনে শ্রম দাও, সে তোমাকে পয়সা দেবে। এবং কে না জানে, অধুনা সুখ মানেই স্বাচ্ছন্দ্য, এবং পয়সাই তার চাবি?. হুঁ, মন বলে একটা ব্যাপার আছে—যেদিকে

কেউ কেউ খুঁচিয়ে দ্যায়। তবু তো মন এমন পদার্থ, যা বহুতলবিশিষ্ট রহস্যময় ইলেকট্রনিক যন্ত্র—যেহেতু তার সীমাবদ্ধতা আছে। তা না হলে কালিদাসের কালের 'মন' আর উনিশশো বাহাত্তর সালের 'মনে' কেন তফাত থাকত না। কিন্তু এই 'মন' কি সত্যি অবাধ্য কিছু? অনভিপ্রেত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সত্যি সত্যি জীবনে হিরোশিমা এনে ফেলে? অসম্ভব, আমি বিশ্বাস করিনে। তাহলে পৃথিবীর সব উন্নতি কবে ব্যর্থ হয়ে যেত। কিছু হিপি দেখেই কোন দেশের সমৃদ্ধির সংশয় সম্পর্কে বিচার হয় না। সমাজ উন্নত হচ্ছে ক্রমশ—এটাই যেন ইতিহাসের বস্তুগত নিয়ম। সব গতি আসলে প্রগতির দিকে। মনের ঘা চেপে সবাই শুধু স্বাচ্ছন্দ্য খোঁজে—তার জন্যে লড়াই করে। কলঙ্কিত রক্তাক্ত স্মৃতি নিতান্ত ফসিল হয়ে পড়ে থাকে মানুষের মনে। পিছনে কে তাকায়—সবার চোখ সামনে। আবার বলছি, তা না হলে পৃথিবী কবে ধ্বংস হয়ে যেত। এই বিলুবউদির পিছনে কিছু কলঙ্কিত রক্তাক্ত স্মৃতি থাকতে পারে। কিন্তু তার জন্যে কেন তার বর্তমান ধ্বংস হবে?..অবশ্য বিলুবউদি বড্ড এমোশনাল হয়ে পড়ে মধ্যে-মধ্যে। সেজন্যেই একটু ভয় হয়।...

বিলু এসে বলল, 'কোন কাজ নেই তো? বেরোব।'

শেখর তাকাল।

'আজ সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করছে। ইভনিং শোতে যাই, চল।'

'বাংলা, না হিন্দি দেখবেন?'

বিলু তোয়ালেতে চুল ঘষতে ঘষতে একটু হেসে বলল, 'ইংরিজি। মেট্রো চল। হিন্দি আমি দেখি কোনদিন?'

শেখর একটু পরে বলল, 'মেট্রোতে বইটা বাজে।'

'বাজে কী বলছ? অঞ্জলিদি দেখে এসেছে। খুব নাম করছিল। ভীষণ ভিড় হয়।'

'দিদির রুচি তো? আর বলবেন না। যত্তো ক্যাড, সেক্সি আর হট কেকে রুচি।'

'আর তোমার কিসে রুচি?'

'সিনেমা আমি খুব কম দেখি—আপনি তো জানেনই। কতবার বলেছেন, ছলছুতো করে এড়িয়ে গেছি।'

বিলু চিরুনি তুলে তাড়া করার ভঙ্গিতে বলল, 'ওরে মিথ্যুক!'

'হ্যাঁ—ভাল্লাগে না। আমার কাছে ভীষণ ইনফ্যানটাইল, ভালগার আর কমিক্যাল লাগে। স্ট্যান্ড করতেই পারিনে।'

'কেন শুনি?'

'আসলে ছবিটবি দিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করা সেই প্রাগৈতিহাসিক আদিম অপরিণত-মস্তিষ্ক মানুষের কাজ। সেজন্যেই তো দেখুন না—সিনেমা আপামর জনসাধারণের উপভোগ্য—গণশিল্প। সঙ্গীতও তাই—আদিম মানুষের এবং এখনও জনগণের সঙ্গে যুক্ত। সিনেমা আর গানটান উপভোগ করতে একটুও বিদ্যে-বুদ্ধির দরকার হয় না। পানের দোকানী, রাস্তার মেথর, রিকশোওয়ালা সবাই আনন্দ পায়, বুঝতে পারে। পদ্যটদ্যও একসময় তাই ছিল। জনগণের হাত থেকে তাই কিছু লোক সিনেমা-গান পদ্যটদ্যকে সবিয়ে এমন অদ্ভুত ব্যাপার করে ফেলল, ভাবা যায় না! আসলে এ একশবনের হীনমন্যতা চাপা দেবার চেষ্টা ছাড়া আর কী বলুন? অ্যাবসার্ডিটির কথাই বলছি। এই বিস্তৃত দেয়ালটা আসলে হীনমন্যতা ঢাকবার ব্যর্থ প্রযত্ন। কারণ ছবির ভাষা, গানের ভাষা, পদ্যের ভাষা—এসব হচ্ছে আদিম এমোশনাল মানুষের ভাষা। জনগণের ভাষা। হরফই কিন্তু সভ্য মানুষের প্রথম সার্থক চেষ্টা। হরফে যখন থেকে গদ্য লেখা শুরু হল, তখন সভ্য মানুষের আত্মপরিচিতি ঘোষিত হল। প্রতিষ্ঠিত হল।'

ততক্ষণে বিলুর চুলের পাট শেষ। মুখের পাট খতম। ওয়াড্রোব খুলে শাড়ি-জামা ইত্যাদি বের করে ফেলেছে।

বিলু হাসিমুখে তাকিয়ে বলল, 'আমার ক্লাস নেবার সময় নেই এখন। দয়া করে টুকুনকে নিয়ে পাশের ঘরে যাবে একবার?'

'কেন বলুন তো?'

'শাড়ি পরব।'

'পরুন না—আমি তাকাব না।'

'অসভ্য ছেলে! আমি তোমার চেয়ে বয়সে কত বড়।'

'আপনাকে দেখে তা মনে হয় না।'...বলে শেখর রবার সুদ্ধ টুকুনকে তুলে ওঘরে চলে গেল।

বিলু পিছন থেকে বলল, 'রেখাকে দাও না ভাই। টুকুনকে দুধ খাওয়াবে।'

একটু পরে আবার ডাকল বিলু, 'শেখর! শোন।'

শেখর চলে এল।

'পিঠের বোতামগুলো লাগিয়ে দাও।...'

চিকন ঝুমঝুমি আসতে দেরি ছিল সামান্য। ততক্ষণ অপেক্ষা করার তর সইল না বিলুর। সে মঞ্জরীকে ডাকতে পাঠিয়েছিল। মঞ্জরী এলে দুজনে বেরোল। এটাই রীতি। সঞ্চিতা, কখনও অঞ্জলি বিলুর ঘরকন্না পাহারা দেয়। বিলু তো প্রায়ই বেরোয় এমনি করে। কখনও একা, কখনও শেখর সঙ্গে থাকে। বিলুর এরকম বাড়ি ছেড়ে বাইরে কতক্ষণ কাটানো পরিচিতদের সবারই সয়ে গেছে অভ্যাসে। হাসানেরও সয়েছে। চিকন ঝুমঝুমি ফিরে এসে ঘরে মাকে না দেখলে হইচই করে না মোটে। বরং তখন রেকর্ড প্লেয়ার খুলে চিকন গম্ভীর মুখে বসে গান শোনে—আড়ালে ঝুমঝুমি নিঃশব্দে নাচে। হাসান থাকলে সে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে পাতার পর পাতা নোট লেখে বুকে বালিশ দিয়ে—কিংবা চুপচাপ বসে ললিতাভবনের মাথায় আকাশ দ্যাখে। কিছু করার না থাকলে কিংবা কিছু ভাল না লাগলে আকাশ দেখা ভাল। তার মনে হয়। আকাশই একমাত্র জিনিস যা এখনও মানুষকে কিছু প্রশান্তি দিতে পারে—যার কোন বিকল্প নেই। অন্তত আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

উজ্জ্বল মেট্রোর সান্ধ্য ভিড়ে হঠাৎ বিলু শেখরের কাঁধ ছুঁল। শেখর ঘুরে সপ্রশ্ন তাকাল। বিলু বলল, 'থাক। চল, মাঠের দিকে কোথাও গিয়ে বসি।'

'কেন?'

বিলু জবাব দিল না। ওর হাত ধরে টেনে রাস্তায় নামল। অকুতোভয়ে কয়েকটা গাড়ি বাঁচিয়ে দ্রুত ওপারে গিয়ে হাত ছাড়ল। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল।

মেট্রোর কাউন্টারে সাজ্জাদ দাঁড়িয়ে আছে! টিকিট কাটবে। কে বলতে পারে, বিলুর পাশের সিটটাই সে পাবে না? অবশ্য এহ বাহ্য। সাজ্জাদকে দেখামাত্র বিলু নীল হয়ে পালাল!..

৪

'এখান থেকে রাতের কোলকাতাকে স্বপ্ন মনে হয়।'...শেখর ঘাসে হাত-পা ছড়িয়ে বসে বলল।...'খুব মিষ্টি লাগে, তাই না? দেখুন!'

বিলু একটু তফাতে বসে ছিল। মাঠে এখন উদ্দাম হাওয়া। উজ্জ্বল চুমকির নকশা-কাটা একটা ঝড়ের ছবি। এখানটায় আলো নেই—ছায়া আছে। একটু দূরের রেড রোডের বাতি থেকে কাচের মতন স্বচ্ছ কিছু দীপ্তি ওপাশে ছড়িয়ে আছে। একটুকরো কাগজ কাঁপছে সেখানে। বিলু কিছুক্ষণে সামলে নিয়েছে। বলল, 'এখন একটা গল্প শোনাতে পারি। সত্যিকার গল্প।'

'বিষয়টা কী?'

'প্রেম।'

'আমার চেনা একটি ছেলে তার বান্ধবীকে নিয়ে বেড়াতে এসে ভাবি বিপদে পড়েছিল। ওই যে ওখানটায় ওই স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে। এমনি সন্ধেবেলা। খুব যখন জমে উঠেছে, হঠাৎ...'

বিলু বাধা দিয়ে বলল, 'বিপদ হল তো? আমার চেনা ছেলে-মেয়েটির বিপদটা কিন্তু খুব অদ্ভুত হয়েছিল। তুমি ভাবতে পার, ভিখিরি কাকেও ব্ল্যাকমেল করতে পারে এখানে?'

'ভিখিরি? ব্ল্যাকমেল করল?'

'হ্যাঁ, শোন। এই ছেলেটি একটু লেডি-কিলার ধরনের। প্রতিদিন নতুন মেয়ে নিয়ে ঘোরে। অবশেষে একজনকে বাছাই করে ফেলল—একেই বিয়ে করতে হবে। বাবার একমাত্র মেয়ে। পয়সাকড়ি আছে। দেখতেও অপূর্ব সুন্দরী। একদিন হল কী, এই মাঠে এসে তাকে নিয়ে বসে আছে, একটা ভিখিরি এসে পয়সা চাইল। ছেলেটি বলল, যা—ভাগ! মেয়েটি তখন ভীষণ এমোশনাল অবস্থায় আছে। ব্যাগ খুলে একটা দশ পয়সা ছুঁড়ে দিল। ভিখিরি পয়সাটা কুড়িয়ে হাতের চেটোয় দেখে মেয়েটির দিকে ফেলে দিল। মেয়েটি রেগে গেল। নেবে না দশ পয়সা? ভিখিরি বলল, কেন নেব দিদিমণি? কালকের দিদিমণি যে আধুলি দিয়েছিলেন! মেয়েটি অবাক। .... কালকের দিদিমণি মানে? ছেলেটি অমনি পকেট থেকে একটা নোট বের করে বলে উঠল—যা ব্যাটা, ভাগ শিগগির! ততক্ষণে মেঘ কালো হয়ে গেছে মেয়ের। ভিখিরিরা সবাইকে চিনে রাখে...'

বিলু হাসতে হাসতে শেখরের দিকে ঝুঁকে এল। শেখরও হাসতে লাগল। 'ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো!'

'শেখর লক্ষ্মীটি, তোমার পা দুটো বিছিয়ে দাও না।

'কেন?'

'মাথা রাখব।'

একটু ভেবে নিয়ে শেখর বলল 'এখানে ঘাস নোংরা হয়ত। কাপড়ে দাগ লেগে যাবে।'

'লাগুক না বাবা। এত শুচিবাই কেন তোমার?'

'না। আসুন।' বলে শেখর পা বিছিয়ে দিল। কনুই ভর করে দূরে বিজ্ঞাপনের লাল আলোর হরফ পড়তে লাগল।

বিলু চিত হয়ে শুল—উরুতে মাথা। তারপর বলল, 'সকালের ব্যাপারটা সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কী, বল শেখর।'

শেখর একটু নারভাস সুরে বলল, 'পা সুড়সুড় করছে, আপনার দিব্যি।'

'চেপে শুচ্ছি—তাহলে করবে না। হল তো? এবার বল।'

'আপনি একটা মস্তো ভুল করেছেন—কারণ মঞ্জরী ছিল সামনে। সোজা না চেনার ভান করে পাশ কাটাতে পারতেন ঃ...কই, আপনাকে তো চিনতে পারছিনে! এই বললেই হত।'

'উঁহু—হত না। সাজ্জাদকে তুমি চেন না!'

'নিশ্চয় হত। ওকে পাগলটাগল বলে এড়ানো যেত না? অমন কত পাগল কত বাড়ি হুট করে ঢুকে পড়ে—কত অদ্ভুত সিনক্রিয়েট করে। দেখেছি। একবার আমাদের ফ্ল্যাটেই এক পাগল—দিব্যি ধোপদুরস্ত ফিটফাট চেহারা, প্যান্ট কোট টাই পরা—বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাইল। তখন কে জানে লোকটা পাগল? ঢুকে সোজা বলছে কী জানেন? আপনার কাছে যে টাকাগুলো রেখেছিলাম, ফেরত দিন! সে এক হইচই কাণ্ড। পথে গিয়েও চ্যাঁচানি থামায় না—দেখে নেব, মামলা করব। জল-জ্যান্ত পাঁচ হাজার টাকা মেরে দেবে—চালাকি পেয়েছ?'

দুজনে হেসে উঠল। বিলু বলল, 'সত্যি তো! এটা হত।'

'নিশ্চয় হত। পাগল বলে চালিয়ে দিয়ে দিব্যি বাবার মত থাকতেন।'

'তোমার বাবারটা তো মিথ্যে। এটা যে সত্যি।'

'সত্যি তাতে কী হয়েছে? বলছিলাম না—আজকাল এসব হয়! কেউ মাথা ঘামায় না।'

'কিন্তু একজন যে সত্যি মাথা ঘামাবে, শেখর!'

'হাসানদা?'

'হুঁ। তার মনটা কী হবে, আজ সারা দুপুর ভেবে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি। সে ভেবেছিল, আমি কুমারী—অথচ আমি কুমারী ছিলাম না।'

'ওসব ভেবে মন খাবাপ করবেন না। দেখবেন—কানে গেলেও হাসানদা এসব গ্রাহ্য করার মানুষ নয়। আমি ওঁকে চিনে ফেলেছি।'

বিলু খুব আস্তে যেন নিজেকে শুনিয়েই বলল. 'বারো বছর ঘর করে যাকে মেয়ে হয়ে আমি চিনলাম না, তাকে শেখববাবু চিনে ফেলেছেন। বলো না ওকথা।'

'আচ্ছা বউদি, বিয়ের সময় ওটা লুকোনর দরকার কী ছিল? হাসানদা বিয়েতে রাজী হতেন না?'

বিলু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার এই সর্বনাশটা মা করে গেছে। আমার বয়স কম। সংসারের কীই বা জানি বুঝি। মা কী ভেবে সব কথা লুকিয়েছিল. আজও জানিনে। হয়ত টুকুনেব বাবাকে আকাশের চাঁদ ভেবেছিল। কিন্তু আমি বুঝিনে শেখর. তখনও তো ও য়ুনিভার্সিটির ছাত্র। বিয়ের পর এম-এ পাস করেছে। তারপর কয়েক বছর মফঃস্বল কলেজে মাস্টারি কবেছে। তারপর ডক্টরেট পেল। এই চাকরিটা নিল। এসব অনেক পরের কথা। বিয়ের সময় ও ছিল একটি সাধারণ ছেলে মাত্র। মা যেন ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।'

'ভ্যাট! কী যা তা বলছেন!'

'প্রেম নয়ত কী? জামাই ছিল ওর চোখের মণি যাকে বলে। মরার আগে খবর যে এনেছিল, সে কী বলেছিল জানো? মা জামাইকে দেখতে চেয়েছে। যেন মেয়েকে নয়। আশ্চর্য আমার মা।'

'হাসানদাকে খুব পছন্দ হয়েছিল আসলে। আর, পছন্দ করার মত লোক তো বটেই।'

বিলু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার মনে হয় কী জান? মা দারিদ্র্যেব জ্বালাটা নিজের জীবনে বেশ বুঝত বলেই সম্পত্তিওয়ালা হাসান আলিকে মেয়ে গছিয়ে দিয়েছিল—কোন ন্যায় নীতির বালাই মেনে নেয় নি! তাছাড়া সাজ্জাদ আরেকটি কারণ! মায়ের অমতে ওর মেসে গিয়ে উঠেছিলুম... রেজিস্ট্রিটা করা ছিল গোপনে। ওর মেসের লোকেরাই সহযোগিতা করেছিল। পরে মা আর কী করে? মেনে নিল—একমাত্র মেয়ে।'

'আপনি একমাত্র মেয়ে?'

'হ্যাঁ—কিন্তু ভীষণ গরিব। বাবা ছিলেন ব্যাঙ্কের কেরানি। হঠাৎ স্ট্রোকে আপিসেই মারা যান। তখন আমি সবে কলেজে ঢুকেছি। পড়াশোনা চালিয়ে যাবার মত কিছু ছিল বাবার—মানে মৃত্যুর ফলে পাওয়া গিয়েছিল। কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরির খোঁজ করতে গিয়েই সাজ্জাদেব সঙ্গে পবিচয়।'

'এবং প্রেম?'

'প্রেম?' বলে বিলু কয়েক মুহূর্ত যেন শব্দটার প্রতি মন দিল—শব্দটার বাস্তবতা ছুঁতে চেষ্টা কবল। তারপর বলল, 'তখন তাই মনে হয়েছিল।'

'মাকে লুকোলেন কেন?'

বললুম না—মা দারিদ্র্যকে তখন ভীষণ ভয় করতে শিখেছেন? সাজ্জাদ ছিল বেকাব—ম্যাট্রিকটা পাস করেছিল মাত্র। অবশ্যি তার বিদ্যের খবর পরে ধরা পড়েছিল।'

'বাই দা বাই—আপনাদের সমাজে পণপ্রথা নেই।'

'ছিল না। পরে হয়েছে। ভীষণ...ভীষণ হয়েছে। বরের বাজারদর ক্রমশ চড়ছে। কত ঘরে তোমাদের মেয়েদের মত ধিঙ্গি আইবুড়ো দেখবে আজকাল। আগে তো বালিকাদেরই বিয়ে হয়ে যেত। আমাব এক দূরসম্পর্কের দিদি আছেন, তাঁর বয়স এখন প্রায় চল্লিশ-টল্লিশ হবে। বর পান নি।'

'কী করেন?'

'স্কুলের দিদিমণি।'

'আপনার প্রেমজ বিয়েটা নষ্ট হল কেন, বলতে আপত্তি আছে?'

বিলু খুব আস্তে জবাব দিল, 'সব বলতেই তো এমন করে আসা শেখর। আমার কী যে ভাল লাগছে বলতে।'

'তাই বুঝি সিনেমা দেখলেন না? আমি তখন সত্যি অবাক হয়েছিলুম।'

'সিনেমা দেখলুম না—তার কারণ অন্য কিন্তু।'

'কী বউদি?'

'কাউন্টারে সাজ্জাদকে দেখলুম।'

'সে কী? আমাকে দেখিয়ে দিলেন না কেন? যাঃ, আপনি কী!'

বিলু মুখ তুলে বলল, 'ওকে মেরে বসতে নাকি, শেখর?'

'ভ্যাট! কী যে বলেন! খামকা অচেনা লোককে কেউ মারে নাকি?

'সে জন্যেই দেখিয়ে দিই নি।'

শেখর অবাক হয়ে বলল, 'ওকে মারলে আপনি খুশি হবেন?'

'যদি হই?'

শেখর জবাব না দিয়ে একটা ঘাস ছিঁড়ে দাঁতে কাটতে থাকল।

'ওকে মারতে পারবে না শেখর—যদি আমি বলি—আমি খুশি হব? মেরে কোলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না?'

'সেটা যদি আপনার পক্ষে ভাল হয়, তবে আমি ওর পিছনে কিছু মস্তানটাইপ ছেলে লাগিয়ে দিতে পারি। জীবনের মত কোলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাবেন ভদ্রলোক!'...শেখর হাসতে লাগল।

'গুণ্ডা লেলিয়ে দেবে? সে আমিও হয়ত পারি। সেবার যখন এল, তা ভেবেছিলুমও। তালতলার বস্তী এলাকায় আমার চেনা একটা গুণ্ডা আছে। তোমার হাসানবাবুর খুব ভক্ত। জান শেখর, এই লোকগুলো কিন্তু যাকে মানে, তার জন্যে জীবন দিতে পারে। হারুন গুণ্ডাকে বললেই আর দেখতে হত না!' বিলু অস্পষ্ট হাসল। ওর চোখ দুটো ছায়ায় ঝিলিক দিতে থাকল।

'এখনও শো ভাঙে নি—চলুন না। শো ভাঙলে নিশ্চয় বেরোবেন ভদ্রলোক। তখন দেখিয়ে দেবেন। চিনে রাখব।..দি আয়ডিয়া! আপনাকে আড়ালে রেখে কোন কায়দায় আলাপ করতেও পারি। ঠিকানা নিয়ে তারপর—'

'মস্তান লেলিয়ে দেবে?'

'হ্যাঁ।'

'থাক। খুব হয়েছে।'.. বলে বিলু উঠে বসল। পিঠের দিকটা একটু ঝেড়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসল।

শেখর পা দুটো গোটাল। 'বাদাম খাওয়া যাক বউদি! ডাকি।'

'না। ফিরব।'

শেখর ঘড়ি দেখে বলল, 'মোটে তো সাড়ে সাতটা। বেশ লাগছিল এতক্ষণ।'

'তোমার আর কী। ঘরকন্না যার আছে, সে জানে।'...বলে বিলু উঠে দাঁড়াল। তার খুব কাছে দিয়ে একজন ঝালমুড়িওয়ালা ষড়যন্ত্রসসঙ্কুল স্বরে কী ঘোষণা করতে করতে চলে গেল।

শেখর উঠে দাঁড়াল.. 'চলুন বউদি, অনেক দিন ফুচকা খাওয়া হয় নি।'

'না। চল, ট্যাকসি ডাকবে।'

হাঁটতে লাগল দুজনে। শেখর বলল, 'হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে? সিনেমা গেলে তো নটার আগে ফেরা যেত না।'

বিলু কেমন স্বরে বলে উঠল, 'পরস্ত্রীর সঙ্গে আড্ডা দিতে খুব ভাল লাগে, না শেখর?' তারপর হাসতে থাকল।

শেখর একটু গম্ভীর হয়ে গেল। মাঝে-মাঝে বিলু এমন সব কথা বলে—কী সুরে বলে, কী গভীর মানে রেখে বলে, সে বুঝে উঠতে পারে না। তার অস্বস্তি হয়—কখনও খারাপ লাগে। এখন বেশ খারাপ লাগল। একটু পরে রাস্তায় উঠল যখন, শেখর গম্ভীর হয়েই বলল, 'আশা করি কোন অভদ্র ব্যবহার পান নি আমার কাছে!'

বিলু জবাব দিল না। চুপচাপ হাঁটতে থাকল। দারুণ বাতাসে ওর শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছিল। উরু দুটো স্পষ্ট ফুটে উঠছিল। বার বার শাড়ি ঠিকঠাক করতে-করতে সে ঝুঁকছিল।

শেখর আবার বলল, 'বলুন বউদি?'

'কী?'

'কখনও কোন অন্যায় আচরণ করেছি কি?'

বিলু স্বাভাবিক হয়ে এবং পিছিয়ে এসে ওর একটা হাত নিয়ে বলল, 'ন্যায়-অন্যায় নিয়ে তর্ক করার সময় এখন নয়। এখন শুধু দরকার একটা ট্যাকসি।'

'দিচ্ছি ডেকে। চলুন না মোড় অব্দি।'

আবার চুপচাপ হাঁটতে লাগল দুজনে। চৌরঙ্গীর মোড়ে এসে দাঁড়াল। বিলু চুপি-চুপি বলল, 'শেখর, রাগ করেছ?

'নাঃ। রাগ করব কেন?'

কথাটা বুঝি শুনল একটা হোঁৎকামোটা ধুতি-পাঞ্জাবিপরা প্রৌঢ় লোক, সন্দেহাকুল চোখে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। বিলু সেটা লক্ষ্য করে মৃদু স্বরে বলল, 'আঃ, শুনছে!'

শেখর 'ট্যাকসি, এই ট্যাকসি' বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে রাস্তার মাঝ বরাবর চলে গেল। তারপর ফিরে এসে বলল, 'চলুন—স্ট্যাণ্ডে যাই। গরজ দেখাচ্ছে—কজন? কোথায় যাবে?'

বিলু সকৌতুকে বলল, 'দুজনেরও বেশি চাই?'

কথাটায় কী ছিল, শেখর হেসে ফেলল। তার মুখের ছবি আগের মত স্বাভাবিক দেখাল। সেই সময় হরিধ্বনি দিতে দিতে একটা মড়া এসে গেল। উজ্জ্বল স্ট্রিট লাইটে মড়ার মুখ আর ফুলগুলো ধকধক করে জ্বলছে। বিলু থেমে শেখরের হাত ধরে টানল।...

শেখর বলল, 'কী হল?'

'দাঁড়াও না বাবা, দেখি।'. .বিলু মড়াটা দেখতে লাগল।

সে রাতে বাসায় ফিরে এক কাণ্ড। চিকন ফুটবল খেলতে গিয়ে পড়ে হাঁটু ছড়ে রক্তারক্তি করেছে। ঝুমঝুমি পার্কের ট্র্যাফিক ট্রেনিং সেন্টারে সাইকেল চাপতে গিয়ে হাঁটুর নিচের মাংস এক ইঞ্চি ছিঁবেছে। অবশ্য ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা হয়েছিল তক্ষুনি। দুজনকে কারা সব রিকশো চাপিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেছে। তারপর বিছানায় দুটিতে শুয়ে মায়ের জন্যে ফুঁসছিল। ঘর ভরতি শেখরের তিন বোন, দুনম্বর ফ্ল্যাটের বাবলিদি, পাঁচ নম্বরে ভোঁদা আর তার দিদি সর্বাণী, আট নম্বরের ঠাকুর্দা জগদীশবাবু। এই বুড়ো লোকটি হাসানের ছেলেমেয়েকে বড্ড ভালবাসেন। ওরা একদিন না গেলে অমনি লাঠি ঠুকঠুক করে এসে হাজির হন। 'কই রে চেকনাই, ঝুমঝুমওয়ালি! অসুখ-বিসুখ করেনি তো?' বিলু ভীষণ খাতির করে ওকে—অর্থাৎ মাথায় ঘোমটা টেনে দ্যায়। ভদ্রলোক রিটায়ার্ড জজ। চিকন গম্ভীরমুখে ও'কে বলেছিল, 'কাদের ফাঁসি দিয়েছেন—তাদের সম্পর্কে সাবধান দাদু। হাতে ফাঁসি নিয়ে ঘুরছে।' কে জানে কেন জগদীশবাবু বলেন—'হাসানসাহেবের ছেলেটি বড় মুক্তিবাদী।'..

বিলু প্রথমে একচোট ধমক খেল অঞ্জলির কাছে। তারপর চিকন বলল, 'মায়ের কী! মা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন—এদিকে হোক না অ্যাকসিডেন্ট।'

শেখর ওর মাথার কাছে বসে বলল, 'হুঁ—মা যা হইয়াছেন। কই দেখি কটুকু ছড়েছে? বাব্বা! অত পেল্লায় প্লাস্টার চাপিয়ে দিলে তোকে? ঝুমঝুমিরটা বেশি মনে হচ্ছে। দেখি রে।'

ঝুমঝুমি বলল, 'না—না। লাগবে!'

বিলু চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিল। বাবলিদি বললেন, 'এবার যাই ভাই। হইচই শুনে আমি তো দৌড়ে এলুম। আর এই ভোঁদাটা—ভোঁদাটা তিলকে তাল করতে ওস্তাদ। না জেনেশুনে অলক্ষুনে কথা বলে বুক কাঁপিয়ে দিলে। সিঁড়িভেঙে আর ওঠা হয় না আমার।'

ভোঁদা করুণ মুখে বলল, 'আমি কেমন করে জানব? ওরা সব বলল, অ্যাকসিডেন্ট করেছে। আমি তো তাই বললুম। না না চিকন?'

জগদীশবাবু এককোণে মোড়ায় বসে সব শুনছিলেন। বললেন, অ বউমা, কথা শোন। শুনলুম অ্যান্টি-টিটেনাস দেওয়া হয়নি। আমি বলছিলুম পঙ্কজবাবুকে কল দাও। রক্ত বেরিয়েছে তো। সবখানে ব্যাকটেরিয়া কিলবিল করে বেড়াচ্ছে—যা নোংরা জমছে দিনেদিনে। দেরি করো না।'

বিলু ঘোমটা টেনে দিল মাত্র। কিছু বলল না।

অঞ্জলি বলল, 'আমিও তাই ভাবছিলুম। শেখর তুই যা।'

শেখর বিলুর মুখের দিকে তাকিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে গেল।

সর্বানী একটু হেসে বলল, 'সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন বউদি?'

মঞ্জরী বলল, 'নিশ্চয় নয়। এখন কি শো ভাঙবার সময় হ'য়ে গেছে?'

বিলু কিছু বলল না।

সঞ্চিতা বলল, 'দিদি চল এবার যাই। মা বকাবকি করবে।'

অঞ্জলি উঠে দাঁড়াল! 'চলি বিলুদি।'

সর্বানীও উঠল। 'আয় ভোঁদা।' 'বউদি, যাচ্ছি।'

জগদীশবাবু বললেন, হাসানসাহেব নেই—সেদিনই এই কাণ্ড। আমি একটু বসে যাই। পঙ্কজ আসুক। আমার প্রেসারটা দেখিয়ে নেব। চেকনাই বলে, 'প্রেসার বাড়লে তো ভালই। বেলুনের মত শোঁ করে স্বর্গে চলে যাবেন দাদু!' হাসতে লাগলেন জাগদীশবাবু।

ওরা চলে গেল। অঞ্জলি, সঞ্চিতা, বাবলিদি, ভোঁদা, সর্বানী। মঞ্জরী বসে রইল।

দুটো সিঙ্গেল খাট পাশাপাশি আছে। মাঝে মাঝে ভাইবোনে ঝগড়া হলে মধ্যে এক মিটার দূরত্ব বাড়ে। কখনও একত্র হয়। এখন একত্র আছে। ঝুমঝুমির মাথার কাছে বিলু এতক্ষণে বসল। অস্ফুটকণ্ঠে ঝুমঝুমিকে বলল, 'কী করে পড়েছিলি?'

ঝুমঝুমি বলল, 'একটা ভারি দুষ্টু ছেলে আছে। প্রায়ই ধাক্কা দিতে আসে। সিগ্‌নাল মানেই না। আজ ওকে যা মেরেছে ট্রেনারদা!'

চিকন বলল, মা, 'টুকুনকে নিচ্ছ না কেন, ও খুব কাঁদছিল!'

এতক্ষণে টুকুনের কথা মনে পড়ল বিলুর। সে ডাকল, 'রেখা, রেখা!'

রেখা এসে বলে গেল, 'ঘুমোচ্ছে।'

'শোন্ না! এসেই চলে যাচ্ছে।' বিলু আবার ডাকল ওকে।...'বাবা, আপনাকে চা দেব?'

জগদীশবাবু বললেন, 'দাও। কিন্তু চিনি ছাড়া।'

'জানি।' বলে বিলু মুখ টিপে একটু হাসল। 'মঞ্জরী, খাবে?'

মঞ্জরী দুটো আঙুল তুলে বলল, 'দুবার হয়ে গেছে।'

'রেখা একটা কাপে চিনি দিবিনে। মনে থাকে যেন।'

রেখা পর্দা তুলে দাঁড়িয়েছিল, চলে গেল।

বিলু বলল, 'আজ—মাস্টারমশাই আসেন নি ঝুম?'

চিকন জবাব দিল, 'এসেছিল। চলে গেছে। এমনি করে পড়ে নাকি?'

বিলু ঈষৎ ভর্ৎসনা করে বলল, 'বেশ হয়েছে তোমার! এত বারণ করব—এত সাবধান হতে বলব, তবু কথা তো নেবে না। এখন কর্তা সব শুনে আমার ঘাড়েই দোষ চাপিয়ে বসবে।'

জগদীশবাবু লাঠিটা খাড়া করে মুঠোয় ধরে স্বভাবমত চোখ বুজে ঝিমোচ্ছিলেন। বললেন, 'না—না, তুমি কী করবে? আর আজকালকার ছেলেমেয়েরা যা হয়েছে, বাপ্‌স্! আমার নাতি দুটোর বয়স সবে সাত আর দশ। যা করে সারাটি দিন—ভাবতে পারবে না। আমার চশমাটা দেখছ--থার্ডটাইম কাচ বদলেছি। আর কতবার বদলাতে হবে কে জানে।'

শেখর এল। 'পঙ্কজবাবুর আসতে একটু দেরি হবে। ভীষণ ভিড।'

বিলু বলল, 'আর কাকেও বললে না কেন?

'বলে ফেলেছি যখন—আর তো উপায় নেই। এসে যাচ্ছেন।'...বলে শেখর জগদীশের পাশের চেয়ারে গিয়ে বসল। 'দাদু অনেকদিন দাবায় বসিনি। আজ বসবেন নাকি?'

জগদীশবাবু বাঁ হাতটা শেখরের কাঁধে রেখে নিঃশব্দে হাসতে থাকলেন।

বিলু বলল, 'বাবাকে তুমিও দাদু বল শেখর?'

'হুঁউ। এ বাড়ির সবার দাদু উনি। তাই না দাদু?'

জগদীশবাবু ক্রমাগত দুলেদুলে হাসতে লাগলেন।

শেখর বিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাবা যায়? আমার এই দাদুর মাথায় পরচুলা, গায়ে কালো আলখেল্লা, সাক্ষাত যমদূত—কলমের ডগায় আসামীর জীবন-মৃত্যু। তাই না দাদু?'

জগদীশবাবু হাসির স্টিল লাইফ।

'দাদু, শুনেছি রিটায়ার্ড জজরা ভীষণ গম্ভীর আর বদমেজাজী হয়—একা থাকতে ভালবাসে। আপনি এমন কেন দাদু?'

জগদীশবাবু শুধু বাঁ হাতটা অদ্ভুতভাবে নাড়লেন। অর্থাৎ কী জানি কেন—এরকম।

বিলু তখন অন্যকথা ভাবছিল। তার চারপাশে এত সব মানুষ—আপদে-বিপদে ছুটে এসে পাশে দাঁড়ানোর মানুষ! মনটা কোথায় যেন ভরে গেল। টলটল করে উঠল। খুব গভীরে ভেসে বেড়ান সেই নতুন সাহসটা আবার ছুঁল সে। আর, এইসব উপস্থিতি নিশ্চয় হাসানের দরুন নয়—হাসান খুব একটা মিশুক প্রকৃতির মানুষ নয়। বিলুর জন্যেই এতসব চেনাজানা—প্রীতিস্নেহ শ্রদ্ধাভাব। বিলুকে এ বাড়ির সবাই ভালবাসে। তার দিকে সবার দৃষ্টি।

কিন্তু সেই বড় ভয়ের কথা আবার। শেখরদের ফ্ল্যাট ছাড়িয়ে কেলেঙ্কারির খবরটা সংক্রামিত হলে কী ঘটতে পারে? বিলুর ইমেজ তো নির্ঘাৎ নষ্ট হবে। সবাই যেন চুপিচুপি পরস্পর বলবে, ওই বউটির আগের স্বামী ছিল একটা। মাঝে মাঝে সে এসে কিছু যেন দাবি করে। বউটির পিছনে আরও কিছু নিশ্চয় আছে! ও খুব সামান্য মেয়ে নয়...

রাত তখন এগারোটা।

ডাক্তার এসেছিল। ইনজেকশন দিয়ে চলে গেছে। মঞ্জরী হাই তুলতে তুলতে ফিরে গেছে। জগদীশবাবু গেছেন। চিকন-ঝুমঝুমি ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ এঘরেই শোবে বিলু। মেঝেয় বিছানা করে নিয়েছে। রেখাও শুয়েছে এক পাশে।

শেখর বসেছিল—বসিয়ে রেখেছিল বিলু।

প্রথমে সঞ্চিতা এসে ডেকে গেল, তখন সাড়ে দশটা। শেখর 'যাচ্ছি' বলে আরো আধঘণ্টা দেরি করে ফেলল।

অবশ্য তেমন কোন কথা হচ্ছিল না পরস্পর। শেখর চিকনদের সঙ্গেই কথা বলছিল বেশি।

তারপর এসে গেল অঞ্জলি।...কী? খাবি না, কতক্ষণ থালা পাহারা দিতে হবে?'

বিলু বলল, 'যাও—রাত হয়েছে।'

তখন শেখর চলে গেল। অঞ্জলি যেতে যেতে বলল, 'একা থাকতে পারবে তো বিলুদি? না—মঞ্জরীদের পাঠিয়ে দেব?'

বিলু বলল, 'না—থাক। অসুবিধে হবে না।'

উঠে গিয়ে সদর দরজাটা বন্ধ করল সে। তারপর বন্ধ কপাটে পিঠ রেখে কয়েকমুহূর্ত স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল। আলনায় কাপড়গুলোর দিকে তাকাল।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। আবার ক'মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চিকনদের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে শাড়িটা খুলে রাখল। অভ্যাস! জামাটা খুলতে গিয়ে খুলল না। টেবিল বাতির সুইচটা নিল হাত বাড়িয়ে। ধরে রাখল প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড। মাঠের অসমাপ্ত কথাটা বলার জন্যেই শেখরকে আটকে রেখেছিল। বলা হল না। চিকনরা দেরি করল ঘুমোতে। তাছাড়া কী যেন সংকোচ। শেখর পুরুষমানুষ না হলে হয়ত বলা যেত। নিঃসঙ্কোচে বলে ফেলত, কেন সাজ্জাদের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়েছিল।

এই না-বলা কথাগুলো এখন সারারাত হয়ত জ্বালাবে। বলতে ইচ্ছে না জাগলে, বলবার জন্যে উদ্যত না হলে, নিশ্চয় এখন এই চাপা কষ্টের তোলপাড় ঘটত না। মাঠে বেশ বলার পথ ধরেছিল, হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল। অন্য কথা এসে পড়ে সব ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে গেল। হ্যাঁ, বিলু বলেছিল, 'বলতেই তো মাঠে চলে এলুম।' তারপর শেখর সিনেমার প্রসঙ্গ তুলে সব ভণ্ডুল করে দিল। সাজ্জাদকে ধোলাই দিয়ে তাড়ানোর কথা এসে গেল। হঠাৎ ওদিকে গিয়ে পড়াটা ঠিক হয়নি। বিলু মোড় ফিরিয়ে আবার খেই ধরতে পারত। বলতে পারত, 'শোন—যা বলছিলাম—কেন ডিভোর্স হল।'

অথচ বিলু নিজেও যেন প্রতিহিংসায় ক্ষেপে কী সব আবোলতাবোল বলে শেখরকে লেলিয়ে দিতে চাইল। যেন শেখর সাজ্জাদকে বেদম মার দিলেই সব জ্বালার নিবৃত্তি ঘটে! আশ্চর্য বিলু, বড্ড আশ্চর্য তোর মতিগতি!...

খাটের পাশে মেঝেয় বিছানা—সেখানে বসে খাটে হেলান দিল বিলু। ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না। ঘুমোলেই বিস্মৃতি। অথচ এখন কিছু ভুলে থাকা বিপজ্জনক। মনে হচ্ছে, চারদিকে বিপদের সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। এই সাজানো রমণীয় ঘরকন্না, এইসব সুন্দর ছেলে মেয়ে—তার সাজানো বাগানের কিনারায় পালে পালে ব্যাকটেরিয়া কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। তার ভয় হতে থাকল। দুঃখ তার বুক থেকে উঠে মাথায় চেপে বসল। তখন সে নিঃশব্দে—ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাঁদতে লাগল। মুখটা ঘুরিয়ে খাটের প্রান্তে গুঁজে দিল। চিকনের একটা পা তার চুলে ঠেকে গেল। একটা মৌন হাহাকার তাকে দুলিয়ে ফুলিয়ে একবার স্মৃতি একবার ভবিষ্যতের দিকে হালকা বলের মতন খেলতে সুরু করল।.

কখন একবার চিকনের ঘুম ভেঙেছিল। তার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি লেগেছিল। সে অস্ফুট ডেকেছিল, 'মা!' কোন সাড়া পায়নি। সে আবাব ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ভোরের দিকে ঝুমঝুমিও চোখ খুলেছিল আধ মিনিটের জন্যে। দেখে, মা চিকনের একটা পা ছুঁয়ে একটু ঝুঁকে মেঝেয় বসে রয়েছে। সামান্য বিস্ময় তার বালিকামনে ঢেউ তুলতে না তুলতে তার চেতনাকে আবার ঘুমের বড় একটা ঢেউ এসে দূরের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।...

সকালে সারা আকাশ আজ মেঘলা। দারুণ হাওয়া দিচ্ছে। শোবার ঘরের জিনিসপত্র কেঁপে উঠছে। ক্যালেন্ডারের পাতা উড়ছে সশব্দে। এ ঘরের বিছানা আজ রাতে শূন্য ছিল। জানালাগুলো খোলা ছিল। বিলু স্নান করে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। তার মনে হল আজ সারারাত ধরে এ ঘরে প্রচণ্ড উপদ্রব গেছে।

নিচে ছোট্ট লনের ওপাশে একটুকরো পোড়া জমি—কার যেন ডিসপুটেড প্রপার্টি, মামলা চলছে। ভিত খোঁড়া হয়েছিল, দেয়াল ওঠেনি। আগাছার জঙ্গল গজিয়েছে। তার ওধারে রাস্তা। বড় বড় দেবদারু আর কৃষ্ণচূড়ার গাছ। গাছতলায় ফুটপাতবাসীদের ঘরকন্না কোথাও কোথাও। একটা হলদে ট্যাকসি থেকে কারা নেমে ওদিকের বাড়ি ঢুকল। অ্যামবুলেন্স চলে গেল। পুলিশের গাড়ি গেল পিছনে। আজ রাতে কোথায় হাঙ্গামা হয়েছিল।

সাইকেলে খবরের কাগজের নাম লেখা—একজন হকার আসছিল তীরবেগে। হঠাৎ সাইকেল থামিয়ে কাগজ বের করল। একটা লোক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। কাগজটা নিয়ে পয়সা দিল। তাবপর ভাঁজকরা কাগজটা বগলদাবা করে ধীরে-সুস্থে একটা সিগ্রেট ধরাল।

দুমিনিট পরে তাকে হনহন কবে ছায়াসঙ্কুল ফুটপাতের পাশে রাস্তার সমান্তরাল ঘাসের ওপর পা ফেলে আসতে দেখা গেল।

খুরশিদ ম্যানসনের সামনাসামনি এসে রাস্তার ওপর সে দাঁড়িয়ে গেল। কৃষ্ণচূড়া গাছে হেলান দিয়ে কাগজটা খুলল। পড়তে থাকল।

বিলু ঝটিতে জানলা বন্ধ করে দিল। লোকটা সাজ্জাদ।

আবার ভয়ে নীল হয়ে গেল বিলু। মাথার ভিতরটা খালি লাগল। শেখরকে খবর দেবে? শেখর বলেছে, ওকে দেখিয়ে দেবেন।

কিন্তু শেখর ওকে তাড়িয়ে দিলেও কি কিছু আসে যায় আর? এটা স্পষ্ট যে সাজ্জাদ এবার নিশ্চিত মতলব নিয়েই এসেছে। তা না হলে আবার কেন এবাড়ির ওপর ছায়া ফেলল সে? বিলুকে সে ছেড়ে দেবে না। ইতিমধ্যে যা ক্ষতি করার করে ফেলেছে। হয়ত এ বাড়ির তলায় গুজব দানা বাঁধছে চুপিচুপি। বিলু দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরল।

একটু পরেই সে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকল।

৫

বিশাল পার্কটার এখানে ওখানে কিছু ছেলেমেয়ে খেলাধুলো করছে। বেঞ্চে ঘুমোচ্ছে কিছু নিষ্কর্মা, কিছু ভবঘুরে, কিছু ভিখিরি। শেষপ্রান্তে কয়েকটা বড় বিলিতি গাছ আছে। কাছাকাছি ক্যাকটাসের ঝোপ। ছোট্ট ডোবাব জলে রঙীন শালুক ফুটেছে। নির্জনতা দেখে নিয়ে বিলু বলল 'এখানে বসি।'

সাজ্জাদ একটু হেসে ধুপ করে বসে পড়ল।

বিলু কিছুটা তফাতে বসল। মিনিট তিনেক চুপচাপ দুজনে। সাজ্জাদ রহস্যময় দৃষ্টিতে বিলুকে দেখছিল। বিলু বুকের কাপড়টা মেয়েলি সতর্ক অভ্যাসে একটু টেনে দিয়ে বলল, 'কোথায় উঠেছ?'

সাজ্জাদ বলল, 'আপাতত শেয়ালদার কাছে একটা হোটেলে আছি।'

'কদ্দিন থাকতে চাও?'

প্রশ্নটা বেশ তীব্র বলে সাজ্জাদ একটু অপ্রস্তুত হল যেন।... 'কোলকাতা ছেড়ে কেই বা যেতে চায়, বিলু। সবাই কোলকাতা আসে, আর কিন্তু ফেরা হয় না কারো। কোন না কোনভাবে সে কোলকাতার মধ্যেই আমৃত্যু ঘুরে বেড়ায়। আমি অবশ্য কিছুদিন থাকব বলেই এসেছি।'

'কেন থাকবে?'

'থাকব না বলছ, কোলকাতা তো কারো একাব নয়—সবারই।'

বিলু একটা ঘাস ছিঁড়ে বলল, 'ভিসাপারমিট একটা কিছু তো আছে—আর বেশি থাকবে কেমন করে?'

সাজ্জাদ হেসে উঠল।..'নাঃ আমি এমনি এসেছি।'

'তার মানে লুকিয়ে বর্ডার পার হয়েছো!'

'তুমি তো জান—আমি চিরকাল সোসাল আউট ল।'

একটু চুপ করে থেকে বিলু বলল, 'তোমার সেই মামলাটার কী হয়েছিল?'

'জেল হলে তুমি খুশি হতে তো? হয়নি। বেকসুর খালাস। তারপর আরও ছোটখাট কেসে জড়িয়ে পড়েছিলাম—তুমি জান না। কোনটায় কিছু হয়নি।'

'বাংলাদেশে কটা কেস হয়েছিল?'

'একটিও না।'

'গোলমালের সময় খুব লুটপাট করেছিল নিশ্চয়।' বাঁকা ঠোঁটে হাসল বিলু।

'উঁহু। বেরোইনি। নদী দেখে বন-জঙ্গল দেখে সময় কাটাতুম।'

'মুক্তিযোদ্ধা হতে পারলেও তোমাকে কিছু সম্মান দিতে পারতুম। কিন্তু তোমার দুর্ভাগ্য।'

'বিলু, তুমি তো জান—আমি—মানে আমার কোনদিনই কোন ভান নেই, মুখোশ নেই, স্ট্রেটকাট। আমি কোন রাষ্ট্রের নাগরিক নই। ওসব পোষায় না। দেশ—দেশপ্রেম! ফুঃ ফুঃ। এই মস্তোবড় দুনিয়ায় আমি একজন মানুষ মাত্র। যতক্ষণ খাটনি দিতে পারব, যতক্ষণ আমার এই বডিটা ফিট আছে—আমাকে দেখাশুনা করা হবে। এটার কোন ত্রুটি ঘটলেই ব্যস। ফুটপাতে গিয়ে আকাশ দেখতে হবে—যতক্ষণ না ডোম এসে তুলে নিয়ে যায়। বিলু, ওসব আমাকে শিখিয়ো না।'

বিলু স্বাভাবিক হেসে বলল, 'যাক গে। এখন বল কী মতলব তোমার?'

সাজ্জাদ এক পা টানটান করে প্যান্টের পকেট থেকে সিগ্রেট প্যাকেট বের করল। ধীরে-সুস্থে জ্বালিয়ে টানতে থাকল। জ্বলন্ত কাঠিটা ঘাসে পড়ে কয়েক সেকেন্ড ধোঁয়াল। বাতাস অশান্ত। রিং বানাতে ব্যর্থ হল ধোঁয়ার। ঠোঁটটা গোল করে শুওরের মত আকাশের দিকে রাখল সে। দ্রুত এলোমেলো হয়ে যাওয়া ধোঁয়া লক্ষ্য করতে থাকল।

বিলু একটু ঝুঁকে এসে বলল, 'বলছ না যে?'

একটি অস্পষ্ট কী শব্দ করে সাজ্জাদ বলল, 'কোন মতলব নেই।'

'টাকা চাও?'

সাজ্জাদ হো-হো করে হেসে ফেলল। 'নাঃ, ব্ল্যাকমেইল করতে আসিনি। তাহলে কাল তোমার ফ্ল্যাটে ওদের সামনে বলে ফেলব কেন?'

'রাগে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলে।'

'না। তুমি তো জান, আমি রাগিনে—পোষায় না।'

বিলু একটু ভেবে বলল, 'ওটা হয়ত তোমার রেড সিগন্যাল—আমার ছেলেমেয়ের সামনে, বাইরের একটি মেয়ের সামনে...'

সাজ্জাদ হাত তুলে বাধা দিল।...'নেভার। ব্ল্যাকমেইল করার মতলব নেই।'

'তাহলে কেন আজ আবার ওখানটায় এসে দাঁড়িয়েছিলে?'

'জানতুম তুমি এবার ছুটে আসবে—তাই।'

'দায় পড়েছে!'...বিলু ফোঁস করে উঠল।

'কিন্তু এসেছ তো!'

'এসেছি—মুখোমুখি বোঝাপড়া করতে।'

'হ্যাঁ, দ্যাটস দা আইডিয়া। বোঝাপড়া। বারো বছর ধরে যেটার জন্যে উত্ত্যক্ত হয়ে আছি।'

বিলু সতর্কভাবে বলল, 'তুমি কী বোঝাপড়ার জন্যে উত্ত্যক্ত জানিনে—আমারটা অন্যরকম।'

'বল শুনি।'

'আমার ছেলেপুলে হয়েছে, একটা স্বচ্ছন্দ ঘরসংসার পেয়ে গেছি—এদিকে সময়টা তো কম নয়, বারোটা বছর—'

'তার মানে এক লক্ষ সাত হাজার পাঁচশো কুড়ি ঘণ্টা।'

'হিসেব করেও ফেলেছ?'

'হ্যাঁ—হোটেলে বসে তোমার সেই প্রেমপত্রগুলোর খামে গুণের আঁক কষছিলুম।'

বিলু নীল হয়ে অস্ফুট বলল, 'সেই চিঠিগুলো?'

'সেই চিঠিগুলো।'

'সাজ্জাদ, আমার জীবনটা নষ্ট করে কী সুখ পাবে তুমি?'

'বিলু তোমার কান্না দেখলে আমার সেদিনও কষ্ট হত, এখনও হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই—আমি অসহায়। আমারও যে একটা জীবন আছে, বিলু—সে যে কিছু দাবি করছে। এক লক্ষ সাত হাজার পাঁচশো কুড়ি ঘণ্টা—ভাবতে পার? এর প্রতিটি মিনিট ছোবল মেরেছে আমাকে। কেন আমি সেদিন অত উদার হয়ে পড়েছিলাম—আফসোস, দারুণ আফসোস! প্রেমিকের উদারতা সাজে না। বিলুর প্রেমিক উদারতায় আক্রান্ত হয়েছিল। বিলুকে সে হাসিমুখে ডিভোর্সের দলিল—স্বাক্ষরিত দলিল উপহার দিয়েছিল। এর কী মর্যাদা পাওয়া উচিত, তুমিই বল বিলু?'

'কিন্তু এখন তুমি কী চাও? কী পেলে খুশি হও, বল?'

'তুমি সামলে নিয়েছ—বাঃ, এই তো চাই। চোখ মোছো।'

বাধ্য মেয়ের মত চোখ মুছল বিলু। ঘাস ছিঁড়তে থাকল নতমুখে।

'সাজ্জাদ হুসেন এম-এ পাস করেনি—ডকটরেট পায়নি। কিন্তু সে ভালবাসতে জানে। তার মগজের চেয়ে হার্টটা বড়।' নিজের বুকে ঘুঁষি মারল সাজ্জাদ—মুখটা লাল উত্তেজিত।—'তাই এক লক্ষ সাত হাজার পাঁচশো কুড়িটা ঘণ্টা ধরে একটা লাশ সমানে টেনে এনেছে—একবারও ক্লান্ত হয়নি। ওটা ফেলে দিয়ে অন্য কিছু ভবিষ্যতে খুঁজতে বেরোয়নি। সে পাস্টটেন্সের মধ্যেই থেকে গেছে। প্রেজেন্টটেন্স বলে আজ তার কিছু নেই।'

বিলু ভয়ার্ত মুখে একবার তাকাল। সাজ্জাদের ঝাকড়মাকড় চুলগুলো দুর্দান্ত বাতাসে উড়ছে। কোটরগত চোখ দুটো ধু-ধু জ্বলছে। না-কামানো বিন্দু বিন্দু গোঁফ-দাড়ি—কিছু কালো কিছু সাদা, একটা বন্যতার মত ষড়যন্ত্রসঙ্কুল দেখাচ্ছে। নাকের ডগা মুছে সে দূরের আকাশ থেকে কথা খুঁজে আনছে যেন। বিলু নিঃসাড় দেহে বসে রইল।

'কী চাই বলছ? কী চাই আমি? তোমার শরীরটা এখন চমৎকার হয়ে উঠেছে। সচ্ছল সংসারের গিন্নির ঢঙ তোমার মুখে। সুখী আত্মতৃপ্ত মেয়ে তুমি। তোমার এতটুকু অনুতাপ নেই বিলু? এতটুকু ঘৃণা নেই তোমার বর্তমান জীবনটার প্রতি—যা তুমি পেয়েছ নিজের দেহটা বিকিয়ে দিয়ে? বেশ্যাদের সঙ্গে তোমার তফাত কিসের বিলু?'

বিলু দাঁতে ঠোঁট কামড়াল।...'সাজ্জাদ, আমার সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে!'

'এ তোমার পাওনা! শান্তভাবে নিতে হবে।' বলে সাজ্জাদ আবার সিগ্রেট জ্বালল। 'হ্যাঁ, কী চাই বলছিলে। ঠিকই ধরেছ। একটা কিছু চাই বলে সেবার তালতলার বাসায় হাজির হয়েছিলুম। একটুও সুযোগ দাওনি বলার। কাল গেলুম। কালও সুযোগ পেলুম না। এখন বলা যেতে পারে। কিন্তু হলফ করে বল—সত্যি জবাব দেবে?'

বিলু অস্ফুটস্বরে বলল, 'কেন দেব না?'

একটু ভেবে সাজ্জাদ বলল, 'কেন তুমি খুব হঠাৎ আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলে? কেনই বা হঠাৎ পালিয়ে গিয়েছিলে তোমার মায়ের কাছে—ডিভোর্স চেয়ে বসেছিলে?'

'সে তো তখনই বলেছিলুম।'

'না। আসল কথাটা বলনি। আমি ক্যাশ তছরুপ করেছি, চোর, আমি রেস খেলি, জুয়াড়ি টাইপ,—এসব কোন ব্যাপারই নয়। খুনীর বউরাও সংসার করে, স্বামীকে ভালবাসে। চোরের বউও স্বামীর বুকে মাথা রেখে শোয়। কারণ—মরালিটির চেয়ে ভালবাসা বড়। ভালবাসা সবকিছুর বাইরের জিনিস। তুমি বলেছিলে তোমার শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সংঘর্ষের কথা। এ কৈফিয়তও যথেষ্ট নয়। সমাজে অনেক উঁচুদরের মানুষ চোর—তাদের বউরা জানে এবং আমৃত্যু পাশাপাশি শোয়। আশ্চর্য, যে-মেয়ে তার শিক্ষা-দীক্ষার সংস্কার কিংবা অভিমানে লাথি মেরে একটা ভ্যাগাব্যান্ড আজেবাজে মার্কা যুবকের মেসে এসে উঠেছিল—সে একদিন হঠাৎ আবার চলে গেল। বন্যার মত। ঝড়ের মত। স্ট্রেঞ্জ!'

'এতে অবাক হবার কী আছে?' বিলু অন্যমনস্কভাবে বলল।...'খুব স্বাভাবিক তার ভুল হয়েছিল। ভুল করে ভালবেসে ফেলেছিল। আসলে আমাদের আচরণ তো ইমেজকে নিয়ে। ইমেজের ভিতর গিয়ে পড়ে উল্টোপাল্টা দেখলে কে আর না পালিয়ে আসে—বল?'

'কিন্তু বিলু, তাই যদি হয়—আমাকে সময় দেওয়া কি উচিত ছিল না-তোমার? দেখতে, আমি তোমার ধারণামত ভালমানুষ হচ্ছি কি না। বল, দিয়েছিলে সময়?'

'দিইনি। জানতুম, তুমি সব রোগের বাইরে চলে গেছো।'

সাজ্জাদ সিগ্রেটটা ঘষে ফেলল মাটিতে। আবার বলল, 'না—তুমি সময় দাওনি। আমি বুঝতেই পারিনি, কেন বিলু পালাল। বিলু তো কিছুটা অন্তত জানত—আমি কী, কেমন। মেয়েদের নাকি একটা সাধনার ব্যাপার থাকে। বিলু সে-সাধনা এড়িয়ে নিজেকেও কি ফাঁকি দ্যায়নি?'

'সবাই বেহুলা নয়। ভেলা ভাসানোর ঝুঁকি সবাই নিতে পারে না।'

'কিন্তু তুমি আমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসতে।'

'ভালবাসা-ভালবাসা করো না। শুনতে গা জ্বালা করে। ভালবাসার কাঁটা সবসময় এক জায়গায় স্থির থাকবে—তার মানে নেই। কত ভালবাসা বদলে ঘৃণা হয়ে যায়।'

'আমার তো হয়নি।'

'ও তোমার ভালবাসা নয়—প্রতিহিংসার জ্বালা।'

সাজ্জাদ চমকাল।...'কী বললে?'

'প্রতিহিংসার জ্বালা!'

'কিন্তু এখনও তো তোমাকে ভাল লাগছে—এই যে সামনে বসে আছ, কথা বলছ—আমার মন ভরে যাচ্ছে, বিলু।'

'তা যদি হয়—' বিলু তাকাল সপ্রতিভ চোখে—'তাহলে আবার স্যাক্রিফাইস কর না কেন—ভালবাসার খাতিরে।'

'যেমন?'

'আমার চিঠিগুলো ফেরত দাও। আর...'

'আর?'

'তুমি কোলকাতা ছেড়ে চলে যাও। কখনও তোমার সঙ্গে যেন দেখা না হয়।'

সাজ্জাদ চুপ করে থাকল।

'চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালাকনামা লিখে দিয়েছিলে—আর এ তো খুব তুচ্ছ ব্যাপার সাজ্জাদ।'

'হ্যাঁ,—তাই তো।'

বিলু ঝুঁকে এল। চাপা গলায়—একটু উচ্ছ্বাসে বলে উঠল, 'আমাকে যদি এখনও ভালবাসো, আমি যাতে সুখী হই—তোমার কি তা করা উচিত নয়?'

সাজ্জাদ তাকাল। শূন্যদৃষ্টে তাকাল বিলুর দিকে। তারপর বলল, 'আমাকে সুইসাইড করতে বলছ?'

বিলু স্থির তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কয়েকটা দিন সময় চাই, বিলু।'

'বেশ তো। দিলুম। টুকুনের বাবা ফিরে আসার আগেই কিন্তু!'...বিলু অপরূপে ভ্রূভঙ্গী করে হাসল।

সাজ্জাদ অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়াল। 'ফোনে জানিয়ে দেব—কখন কী করছি। তুমি বরং তোমার স্বামী কখন আসছেন, জানিয়ে দিও। ফোনগাইডে পাবে প্রতিভা হোটেলের নম্বর। রুম নম্বর তেরো—দা আনলাকি থারটিন।'

দুজনে হাঁটতে থাকল। মৌন পার্কের গেট পেরিয়ে বিলু বলল, 'তাহলে আসি।'

'হুঁ—এস।'

সাজ্জাদ হনহন করে হেঁটে গাছপালায় আড়াল হয়ে গেল। বিলু একটু হাসল। লোকটা একই রকম আছে এখনও। সেই একই রকম নির্বোধ গোঁয়ার আর সেন্টিমেন্টাল। ওর একটা মারাত্মক দুর্বল জায়গা আছে। ছুঁলেই ভিজেবেড়ালটি হয়ে ওঠে। তখন ওকে নিয়ে যা খুশি করা যায়।

দু পা এগিয়ে বিলু থমকে দাঁড়াল। দোতলায় নিজেদের ফ্ল্যাটের জানালায় শেখব বসে আছে। এদিকে তাকিয়ে আছে। সব তো দেখল নির্ঘাৎ। কতক্ষণ থেকে দেখছিল হয়ত।

বিলু ঘরে গিয়েই রেখাকে পাঠাল শেখরকে ডাকতে। একটু পরে শেখর এল হাসতে হাসতে।—'কী ব্যাপার বউদি? কার সঙ্গে—'

ঠোঁটে আঙুল রেখে বিলু বলল, 'চুপ। স্পীকটি নট।'

শেখর ফিসফিস করল, 'কে উনি?'

'সেই লোকটা। সাজ্জাদ।' বিলু দুলে-দুলে প্রায় নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

দিনটা আজ মোটামুটি শান্তিতে কাটল বলা যায়। চিকন দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে। ঝুমঝুমি যেন ইচ্ছে করেই একটু খোঁড়াচ্ছে। ওদের লাভের মধ্যে স্কুল আর পড়াশুনো থেকে রেহাই। 'বিলকুল নিরামিষ ছুটি'—শেখরের ভাষায়। দুপুরে খেতে বসে চিকন একবার বলে উঠেছিল—'মা, কালকের ওই লোকটার সঙ্গে তোমার প্রথম বিয়ে হয়েছিল বুঝি?' ঝুমঝুমি থামিয়ে দিয়েছিল—'কী অসভ্য রে! বলে না।' বিলু একটু হেসে বলেছিল—'হ্যাঁ।'

একটা ভুল হয়ে গেছে। মঞ্জরীকে বারণ করে দিলে কথাটা হয়ত হজম করে নিত। নিজেদের বাড়িতে কারো কানে তুলতই না। কিন্তু তখন তো মাথার ঠিক ছিল না। তবে হাসানেব কানে ওরা কেউ তুলবে না। শেখর ইতিমধ্যে ম্যানেজ করে ফেলেছে। এখন ভয় শুধু পেটের ছেলেমেয়ের। 'মায়ের বিয়ে' ব্যাপারটা কি ছেলেপুলেদের কাছে চাঞ্চল্যকর? বোঝা যাচ্ছে না। প্রায় আটাশ ঘণ্টা পরে প্রশ্নটা চিকনের কাছ থেকে এল। এটাই! এটাই অস্বস্তি লাগছে। চিকন ওর বাবার মতন কতকটা—আবার কিছু নতুন রকমও বটে। ওর একটা অদ্ভুত অভ্যাস আছে। টুকিটাকি ফালতু জিনিসপত্রের ভিতর থেকে গম্ভীর মুখে কী সব কুড়িয়ে সযত্নে রেখে দেয়। ওর সংগ্রহশালাটা বিচিত্র। পরে দেখা যায় নানান জিনিস জোড়াতালি দিয়ে আরও গম্ভীরমুখে পরীক্ষা নিরীক্ষায় রত সে। বেশ খানিকটা কারিগরি প্রবণতা আছে ওর। খেলা-ঘরের রেডিও ক্যামেরা ইত্যাদি বানাতে প্রচণ্ড চেষ্টা চালিয়ে যায়। বাবা-মাকে মাঝে মাঝে তাক লাগিয়ে দিতে চায়।

তাই অস্বস্তি ওর ওই সংগ্রহবাতিক নিয়ে। 'মায়ের প্রথম বিয়ে' এবং 'লোকটা' মনে হচ্ছে কুড়িয়ে রেখেছে ও। কখন ওই দিয়ে কী বানিয়ে মা-বাবার সামনে তাক লাগাতে আসে বলা যায় না. তবে প্রথম সন্তান—বিলু একবার বলে দেখবে।

ঝুমঝুমি সম্পর্কে সে নিশ্চিত। মেয়েরা মেয়েদের রাখতে জানে। বয়স যত বাড়ে, বাবা ও ছেলে পরস্পর দূরে সরে যায়! আর মা ও মেয়ে আরো কাছাকাছি হতে থাকে।

এই সব অস্পষ্ট ভাবনা শান্তি বিশেষ বিঘ্নিত করে নি। বিকেলে বাবলীদি, তার বর্ধমানের মাসতুতো বোন, মাসীর জা ইত্যাদিদের নিয়ে হাজির হল। কোলকাতার কোথায় কী জাতের শাড়ি মেলে, বিলু নাকি এক্সপার্ট। খুরশিদ ম্যানসনে কারো শাড়ির দরকার হলে বিলুর শরণ অনিবার্য। তাই বিকেলে খুব রবরবার সঙ্গে গড়িয়াহাটের দিকে ঘুরে আসা গেল।

সন্ধ্যার পর একটুখানি গানের আসর বসল বিলুর ঘরে। বাবলীদি আর সেই বর্ধমানের মেয়ে, মঞ্জরী আর সঞ্চিতা এল। বর্ধমানের মেয়েটি মন্দ গায় না। নজরুলগীতি গাইল কখানা, একখানা অতুলপ্রসাদ। বিলু মুখ খোলে না। অথচ ভিতরে গুনগুন সুরের জ্বালা জ্বলছিল। মঞ্জরীকে দিয়ে সে গাইয়ে নিচ্ছিল 'সে কোন বনের হরিণ'—মঞ্জরী হঠাৎ মাঝখানে হেসে হারমোনিয়াম ঠেলে দিল বিলুর দিকে। বিলু তখন গাইতে লাগল।

চিকনদের ঘরে জগদীশবাবু গল্প করছেন। ভোঁদা, চপল, সানুরা সব এসেছে।

হাসানের ফ্ল্যাট আজ জমজমাট। বিলুর মনে সুখের স্বাদ থরথর। সচেতন বিহ্বলতায় সে তার ঘরকন্নাকে বাইরের বিশালতার সঙ্গে জুড়ে দিতে পেরে মনে মনে ভাবছে, এরপর আর কিছু থাকতে নেই।

আসর ভাঙার মুখে শেখর এল।

আর গানের মুড নেই কারো। এখানে ওখানে শূন্য চায়ের পেয়ালা পড়ে রয়েছে। খাটের চাদর এলোমেলো। সোফা এদিকে-ওদিক। কফিটেবিলের ঢাকনা ঝুলছে। শেখর সব দেখেটেখে বলল, 'ঠিক আছে। আমি একাই গাই।'

বর্ধমানের মেয়েটি বাদে সবাই হেসে উঠল। শেখরের গলায় সুর ওঠে না—প্রকৃতির বঞ্চনা ছাড়া আর কী হতে পারে? সে হারমোনিয়ামে বারকয় বিশ্রিভাবে আওয়াজ তুলে বিলুর দিকে তাকাল।

বর্ধমানের মেয়েটি শেখরকে হাঁ করে দেখছে—বিশ্রি দেখছিল। এবার সে বলল, 'কদিন আছেন তো? আসবেন সবসময়—কেমন?'

বাবলীদি বলল, 'থাকবে কী! কাল সকালে চলে যাচ্ছে। মাসীর ভীষণ অসুখ। আজই চলে যেত—কেনাকাটা করতে রাত হল, বলছিলুম না তখন?'

বিলু একটু হাসল। বেঁচে গেল শেখরটা। ওই চাউনি দেখলে সব বোঝা যায়। মফঃস্বলের মেয়েরা কেমন যেন। কদিন থাকতে পেলে শেখরকে চেষ্টা করে দেখতো নির্ঘাৎ।

সবাই চলে গেলে বিলু বলল, 'ও শেখর, প্রেম করবে?'

শেখর হারমোনিয়ামের রীডে আঙুল চালিয়ে খেলা করছিল। আনমনে বলল, 'কার সঙ্গে?'

'ভিড়ে একটা অচেনা মেয়ে ছিল, দেখেছ?'

'হুঁউ।'

'কেমন?'

'ভাল।'

'তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে।'

'তাই বুঝি?'

'এই! তুমি মন দিচ্ছ না।'

'দিচ্ছি তো!'

'তোমার ভাল লাগল না ওকে?'

'কাকে?'

বিলু এগিয়ে এসে ওর চুল ধরে টানল 'শুধু ন্যাকামি। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না!'

শেখর হাসল।...'সত্যি, জানি না।'

খাটে ওর সামনে থেকে হারমোনিয়ামটা সরিয়ে দিয়ে বিলু বসে পড়ল।...'আচ্ছা শেখর, তুমি আমার সঙ্গে এত সব কথা বল, সেগুলো কি এই রকম আনমাইন্ডফুল কথাবার্তা?'

'অর্থাৎ যাকে বলে কথার কথা—বলছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'কেন এ সন্দেহ হচ্ছে আপনার?'

'কী জানি। আমার ধারণা, তুমি আমার সঙ্গে সবসময় মুখোশ পরে ঘোরো।'

'অর্থাৎ অভিনয় করে যাই?'

'নিশ্চয়। আর—পিছনে গিয়ে মনে মনে নিশ্চয় হাসাহাসি কর—মেয়েটি যেন কী।'

শেখর হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। তারপর বলল, 'হঠাৎ এসব বোঝাপড়ার খেয়াল চাপল কেন বলুন তো?

'বোঝাপড়া! হ্যাঁ—সবার সঙ্গে একে একে বোঝাপড়া করতে ইচ্ছে হচ্ছে।'...বলে বিলু একটা টানা প্রশ্বাস ফেলল—অল্প শব্দে। খাটের বাজু একহাতে আঁকড়ে ধরল সে...'বেশ মুড এসেছিল আজ। তুমি এসে পণ্ড করে দিলে যেন শেখর।'

শেখর ত্বরিতে উঠে দাঁড়াল—এবং মুখে হাসি।...'তাহলে চলে যাই।'

বিলু হাত ধরে টানল।...'উহুঁ -বস। হয়ত তোমার দোষ নেই—আমারই। কী সব ভাবি। শোন—ভাঙা মুড জোড়া লাগিয়ে দাও তো, শেখর!'

'ওরে বাবা! সে কি পারি?'

'কী পারো তাহলে? বোকা, শেখর তুমি ভারি বোকা!'

'সেকথা অস্বীকার করছে কে?'

'শেখর একটা হাসির গল্প বল না!'

শেখর তক্ষুনি বসে পড়ল।...'কোন এক গ্রামে এক পণ্ডিতমশাই ছিলেন। তাঁর বাড়ির সামনে মাঠ— মাঠে একটা ইটের পাঁজা ছিল। পণ্ডিতমশাই প্রতিদিন সকাল আর সন্ধ্যায় সেই ইটের পাঁজার আড়ালে গাড়ুহাতে পায়খানা করতে যান, আর ফেরার সময় একখানা করে ইট নিয়ে আসেন। একখানা মাত্র ইট হাতে আনলে কে কী বলবে? একদা দেখা গেল কী জানেন? ইটের পাঁজাটা নেই—আর পণ্ডিতমশায়ের বাড়িটা পাকা হয়ে গেছে।'

বিলু বলল, 'ভ্যাট! এ কী গল্প!'

শেখর চোখ বুজে একটু ভেবে বলল, 'তাহলে আরেকটা শুনুন। ছেলে ভীষণ দুষ্টুমি করে—তা নিয়ে বাবার কাছে নানান অভিযোগ আসে। বাবা অফিস থেকে ফিরে শোনেন, আর মারধোর লাগান। তবু কিছু হয় না। অগত্যা বাবা একদিন ছেলেকে বললেন, শোন খোকা—যা কর, কর! কিন্তু প্রতিদিন একটি অন্তত সৎকর্ম করলে একপেট করে রাজভোগ খাওয়াব। পরদিন আপিস থেকে ফিরেই বাবা জিজ্ঞেস করলেন—খোকা, কী সৎকর্ম করেছ? খোকা বলল,—ওই যে মোটাসোটা হোঁদল-কুৎকুৎ কেদারবাবু আছেন, প্রতিদিন বেচারা ট্রেন ফেল করেন। হেঁটে যেতে যেতে গাড়ি ছেড়ে যায়। যাবে না? অমন শরীর নিয়ে নড়াচড়াই যে মুশকিল। তা বাবা, আজ কেদারবাবুকে ট্রেন ধরিয়ে দিয়েছি।...বাবা খুশি হয়ে বললেন, কেমন করে বাবা? খোকা বলল, কেন—আমাদের বাঘাকে কেদারবাবুর দিকে লেলিয়ে দিয়েছিলুম!'...

বিলু হাসি লুকিয়ে বলল, 'কিস্যু হল না।'

শেখর বলল, 'তাহলে লাস্ট অ্যাটেমপ্ট! এক সময় উত্তরবঙ্গে আমার মামাবাড়ি বেড়াতে গেছি। হঠাৎ সকালবেলা পাশের ঘরে বিকট চিৎকার শুনলুম মামার।...টান, টান,...নামা, নামা, নামা...তোল তোল তোল,...ঘোরা ঘোরা ঘোরা ..মোচড় দে . মোচড় দে.. মোচড় দে...ব্যাপার কী? আলমারি সরানো হচ্ছে নাকি? উঁকি মেরে দেখি—ও হরি, মামা ছেলেকে 'ক' লেখা শেখাচ্ছেন।'

এইবার বিলু হাসতে হাসতে দুটো হাতে শেখরের জামা আঁকড়ে প্রায় বুকে মাথা ঘষে দিল। জামার বোতামের কাছটা ফরফর করে ছিঁড়ে গেল চাপে।

শেখর ওর দুকাঁধে হাত রেখে সোজা করে দিল। জামার ছেঁড়া জায়গাটা দেখে বলল, 'কেউ জিজ্ঞেস করলে এখন কী বলব, বউদি?'

বিলু হাসি থামিয়ে ছেঁড়াটা দেখে উঠে দাঁড়াল...'খুলে ফেলো। এক্ষুনি রিপু করে দিচ্ছি।'

'থাক। ছেড়ে দিন।'

'উঁহু। খোলো।' বলে বিলু জোর করে ওকে জামা খুলতে বাধ্য করল। তারপর টেবিলের ড্রয়ারথেকে সূচসুতোর কৌটো বের করে শেলাইতে ব্যস্ত হল। খুব নিপুণ গৃহিণীর ভঙ্গিতে দাঁতে সুতো কেটে সে হাসিমুখে একবার তাকাল শেখরের দিকে।

আলো ঘরে উজ্জ্বল। শেখরের কমলা-রঙের বলিষ্ঠ শরীরটা ঘরের পরিবেশকে কী একটা উত্তেজনা দিচ্ছিল, ঘরটা যেন উসখুস করতে থাকল। বিলু বলল, 'সেলাই একসময় পারতুমই না—এখন অভ্যাসে শিখে গেছি। চিকনের প্যান্ট তো সবসময় সেলাইয়ের কাছে কেটে যায়।...'শেখর, তুমি স্কুটার কিনবে বলেছিলে যে।'

'পিতৃদেবের ইচ্ছে।'

'আজকাল স্কুটারের পিছনে বউকে চাপিয়ে নিয়ে যায়। হাসি পায় না শেখর?'

'আপনাদের গাড়ি আসছে কবে?'

বিলু হাসল।—'আর আসছে না।'

'কেন, কেন?'

'সায়েব ফিরে এসে যখন শুনবে, এ বউ বাসি-বউ তখন...' বিলু খিলখিল করে হেসে উঠল।

'যাঃ! হাসানদা ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।'

'শেখর, ধরো—তুমি যদি টুকুনের বাবা হতে, কী করতে ভেবেছ?'

'আমি কী করতুম? কিছু না। হাসতুম।'

'ভাল করে ভেবে দেখে বল।'

একটু ভেবে নিয়ে শেখর বলল, 'হয়ত প্রথমে একটু খারাপ লাগত। তারপর এড়িয়ে যেতুম। কারণ চিকন ঝুমঝুমি টুকুন—এ সংসারটা—এসব তো একটা মস্তো হিমালয়ের চূড়ো। একটা অতীত ঘটনার ঝড়ে এ পাহাড় ওড়ানো যায় না। যায় কি বউদি?'

'উপমাটা যেন ঠিক হল না তোমার।'

'কিছু যায়-আসে না তাতে!'

দাঁতে সূচ নিয়ে বিলু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'মেয়েদের একটা ইনটুইশান থাকে। বুঝতে পারছি, সামনে ভীষণ একটা বিপদ আসছে। আমি কী করব শেখর?'

শেখর গিয়ে তার পাশে বসল।...'আপনি হাসানদাকে সব বুঝিয়ে বলবেন।'

'বলব। হয়ত—সত্যি বলেছ অতীতের ঝড়ে বর্তমানের এ পাহাড় ধ্বসে যাবে না। কিন্তু আমাকে টুকুনের বাবা তো আর আগের মত ভালবাসতে পারবে না। অবিশ্বাস এসে সামনে দাঁড়াবে। শেখর, ইমেজ নিয়েই তো যত কাণ্ড। ইমেজ ভেঙে গেলে যে কী হয় আমি জানি। ডক্টর হাসানের সংসার অবিকৃত থেকে যাবে, তার বউ থেকে যাবে বউর ভূমিকায়—অথচ একটা কিছু নষ্ট হয়ে যাবে, যা এতদিন ছিল বলে একটু সম্পূর্ণতা ছিল। শেখর, তুমি টের পাচ্ছ না যে আমি কত দূরে সরে যাব ওর কাছ থেকে, নিছক একটা দরকারী যন্ত্রের হাতলের মত। আমি স্বামীর ভালবাসা হারাব। আমি...'

'আপনি বড্ড এমোশনাল মেয়ে, বউদি।'

'আচ্ছা শেখর?'

'বলুন।'

'তোমার চোখে তো আমার ইমেজ গেছে। তুমি জেনে গেছ সব। তোমার কী রকম লাগছে আমাকে? কোনরকম বাধো বাধো ঠেকছে না?'

শেখর হাসতে লাগল।...'মোটেও না। আমি কিছু ভাবি নি। সব ঠিক হ্যায়।'...বলে সে বিছানায় থাপ্পড় দিল।..হল...? জামা দিন।'

'শেখর, তোমার বাড়িতে নিশ্চয় নানাকথা বলাবলি হয়েছে?'

'তেমন কিছু হয় নি। হলে আপনি টের পেতেন না? দিদি এল কতবার, মঞ্জরী-সঞ্চিতা এল। কিছু টের পেলেন? মা ওসব ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক। বারণ করে দিয়েছে সবাইকে।'

'কিন্তু তোমার মা কাল থেকে একবারও আসেন নি। আমিও লজ্জায় যেতে পারছিনে।'

'আরে মা কাল পাইকপাড়া থেকে ফিরে অসুস্থ। হাঁফানিটা বেড়ে গেছে হঠাৎ। বলেনি কেউ?'

'না তো।'...বিলু জামাটা ছুঁড়ে দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে উঠল। কৌটোয় সূচসুতো রেখে বলল, 'চল—যাই একবার।'...

৬

সকালের ডাকে হাসানের এক্সপ্রেস চিঠি এল। পোস্টকার্ড। অল্প কয়েকটা বাক্য। চিকন একটানে পড়ে মায়ের দিকে ছুঁড়ে দিল। হয়ত একটা চমৎকার চিঠি আশা করেছিল।

মেঝেয় পড়েছিল, কুড়িয়ে নিল বিলু।...মিছেমিছি হয়রানি। ওড়িশায় জোর বর্ষা নেমেছে। এক্সক্যাভেশন বন্ধ। শিগগির ফিরছি। তোমরা সাবধানে থেক।

ওড়িশার আকাশের মেঘ থেকে একটা বজ্রবিদ্যুতের ছটা কোলকাতার আকাশে এসে খুরশিদ ম্যানসনের ছাদ ভেদ করে বিলুর বুকের ভিতরটা চিকমিকিয়ে দিল।

সে দ্রুত ফোনগাইড বের করে প্রতিভা হোটেলের নাম্বার খুঁজল। তারপর সাবধানে রিঙ করল। এনগেজড। আবার রিঙ করল। এনগেজড। অস্থির হয়ে আবার নাম্বারটা খুঁজে লিখে নিল খবরের কাগজের মাথায়। রিঙ করল। এনগেজড।

আরো মিনিট পাঁচেক ব্যর্থ চেষ্টার পর সে উঠল। শাড়ি বদলে মুখটা সামান্য ঠিক ঠাক করে নিয়ে কিচেনে গেল। 'রেখা, আমি আসছি। ও কী রে! এখুনি এত সকালে ভাত চাপালি কেন? ওরা তো আজও স্কুলে যাবে না বলছে!'

চিকন পিছন থেকে বলল, 'যাব বলেছি। ছুটির টাস্ক দেখিয়ে দিচ্ছে না? তুমি যেখানে যাচ্ছে যাও না। ওকে নিয়ে পড়লে কেন?'

চিকনের কি মাকে অসহ্য লাগছে আজকাল? এমন ব্যবহার তো আগে করত না। ভাল করে কথাও বলতে চায় না যেন। কেন এমন করে সে?

বিলু টুকুনের গালে চুমু খেয়ে বলল, 'ঝুমঝুমি, ভাইকে দেখিস।'

ঝুমঝুমি এসে বলল, 'তুমি কোথায় চললে? বাবা যে-কোন সময় এসে যাবেন যে। আমরা স্কুলে যাব।'

বিলু মিষ্টি হেসে বলল, 'একবার ব্যাঙ্কে যাব। বেশি দেরি হবে না রে!'

চিকন বলল, 'আজ সকালেই তো একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে আনলুম। রেখা, ক টাকার বাজার এনেছিস রে?'

অদ্ভুত ছেলে তো! বিলুর ইচ্ছে করল ঠাস করে গালে একটা চড় মারে! কিন্তু মনটা ভিতরে অন্যরকম—তোলপাড়। চড় মেরে বসার জন্যেও যেটুকু লক্ষ্য দরকার, তাও দিতে পারছে না। তাই কোন জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে শুনল, পিছনে ঝুমঝুমি বলছে, 'কেন তুই মায়ের মুখের ওপর মুখ দিস্ রে বাঁদর? ভারি আমার কত্তাবাবা সেজে গেছেন। দাদুর মত চশমা পরবি, চশমা?'

'ঝুমি তোর খুব বাড় হয়েছে। দাঁড়া, বাবু আসুন।'

ঝুমঝুমির গায়ের জোরে চিকন এঁটে ওঠে না। ঝুমঝুমি হয়ত এবার মেরেই বসবে। সিঁড়িতে পা রেখে বিলুর মনে হল, তাই মারুক। পেকে লাল হয়ে গেছে এরি মধ্যে।

শেখরদের ফ্ল্যাটের দরজায় একটু দাঁড়াল। শেখরের এখন থাকার কথা। ডেকে নেবে সঙ্গে? পরে ভাবল—না। অসুবিধে হতে পারে। সাজ্জাদকে একা পাওয়া দরকার।

রাস্তায় নেমে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ট্যাকসি পেয়ে গেল। বিলু উঠে বলল, 'শেয়ালদা—প্রতিভা হোটেল।' ট্যাক্সিওয়ালা হয়ত বিলুর কণ্ঠস্বরে গতির বিপুল চাপ লক্ষ্য করেছিল, খুব স্পীডে চালাল গাড়িটা।

বিলু মনে মনে ঈশ্বরকে একটা প্রার্থনা করছিল। সব ভালোয়-ভালোয় চুকে গেলে ফিরে এসে চিকন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে। পেটের ছেলে—কথা রাখবে না মায়ের? হুঁ—আর একটু বেশি বয়সের ছেলে হলে ভাবনা ছিল না। কিন্তু ওর এই এগারো বছর বয়সটা ভারি গোলমেলে সময়। হঠাৎ বিলুর মাথায় কী ভেসে এল অস্পষ্ট মৃদু আভাষমাত্র, অথচ ওতেই সে শিউরে উঠল। কী ভাবছিল সে? স্কুলে যাবার পথে চিকনের একটা অ্যাকসিডেন্ট? তাই কি?

বিলু, কী ভাবছিলি তুই? বিলু, তুই মা।...হু হু করে শব্দহীন কান্নায় ভেসে গেল বিলু। মুখ নামাল—যাতে ট্যাক্সি ড্রাইভারটা দেখতে না পায়।

এখন প্রায় আটটা। রাস্তা কিছু ফাঁকা। অনেক দোকানপাট খোলেই নি। মোড় ঘুরে কিছুদূর গিয়ে গাড়ি প্রতিভা হোটেলের সামনে থেমে গেল। ব্যাগ খুলে ভাড়া বের করতে গিয়ে সে নিজের এ্যাকাউন্টের চেক বইটা আছে নাকি দেখে নিল। ঝুমঝুমির বিয়ের জন্য স্ত্রীর নামে টাকা জমাচ্ছে হাসান।

হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল বিলু। তারপর সোজা ঢুকে গেল। বেশ বড় হোটেল। পরিচ্ছন্ন সুন্দর। কাউন্টারে গিয়ে জিগ্যেস করল, 'তের নম্বর রুম কোন ফ্লোরে?'

'সেকেন্ড।'

লোকটা কিছু জিজ্ঞেস করল না দেখে আশ্বস্ত হল বিলু। তিনতলায় উঠে ফাঁকা করিডোরে নম্বর দেখতে দেখতে সে এগোল। তের নম্বর একবার শেষ দিকে। দরজায় নক করল সে। বুক কাঁপতে থাকল। পা দুটো ভারি হয়ে গেল। মনে হল, বিপদ যেন সামনে ওৎ পেতে আছে। কিন্তু আর তো সরে আসা যায় না। দরজা খুলে যাচ্ছে। সাজ্জাদ খালি গায়ে একটা লুঙ্গি পরে আছে। অবাক দেখাল ওকে।...'বিলু! এস, এস। আমি ভাবতেই পারিনি—ইস্!'

বিলু ঘরে ঢুকে সিঙ্গেল খাটের পাশে চেয়ারটায় বসে পড়ল।

সাজ্জাদ বলল, 'কী খাবে বল?'

'থাক। অতিথি সৎকার পরে করবে। যে জন্যে এলুম, শোন।'

সাজ্জাদ একটু তফাতে বিছানায় বসল।

'বল।'

'ও আজকাল-ই ফিরছে। চিঠি এসেছে এইমাত্র।'

'বেশ তো।'

'বেশ তো কী বলছ? তুমি কথা দিয়েছ—'

সাজ্জাদ হাত তুলে বলল, 'সবুর বিলু, সবুর। হচ্ছে। আমার মনটা ভরিয়ে দিয়েছ বিলু। অপূর্ব তোমার আসা! রিয়েলি, আমি ভীষণ বিচলিত বোধ করছি। দাঁড়াও, একটা সিগ্রেট খেয়ে নিই। আনন্দ হবে—তুমি তো জানোই, আমি কত সিগ্রেট খেয়ে ফেলি।'...বলে সে বালিশের নিচে থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করতে ব্যস্ত হল।

বিলু ওকে খুঁটিয়ে দেখছিল। ওর হাত কাঁপছে দেখল। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে লোকটা। এখন বয়স কত হল? হয়ত ছত্রিশ-টত্রিশ হবে! এরই মধ্যে কিছু চুল পেকে গেছে। হাতের দু-চারটে লোমও পেকেছে, সম্ভবত অ্যালকহলিক রিঅ্যাকশন। মদ খাওয়া অভ্যেস ছিল। এখনও নিশ্চয় খায়। পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বার বছর আগে মোটামুটি বেশ স্বাস্থ্যবান ছিল এই লোকটা। সামান্য গোঁফ থাকত তখন। এখন পুরোটা চেঁছে রাখে। কানের পিছনে সাবানের ফেনা লেগে রয়েছে।

সাজ্জাদ সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, 'সারারাত ঘুম হয়নি আজ। ইনসমনিয়া তো বরাবর ছিল—জান। কাল হল কী, একবারও চোখ বোজা গেল না। তার ওপর পাশে কোথায় বিয়ে না কী—রাত তিনটে থেকে মাইক জুড়ে দিল। তুমি কিছু খাও বিলু। নিচে রেস্তোঁরা আছে। যা হোক কিছু। কাল পার্ক স্ট্রিটের চীনা রেস্তোঁরায় গেলুম। দেখলুম, অনেক অদলবদল হয়েছে। সেই ক্র্যাব খাওয়ার কথা মনে পড়ছে?'

বিলু হঠাৎ বলল, 'বিয়ে করনি কেন?'

'সে অবশ্য তোমাব বিরহের দরুন নয়।' হাসতে লাগল সাজ্জাদ। 'কোন হতভাগিনীকে এনে কষ্ট দেব? কোন ফিক্সড ইনকাম নেই। বিয়ে করলেই তো ছেলেপুলে ঠেকানো যাবে না, তখন?'

'ইনকাম নেই তো হোটেল খরচ কোথায় পাচ্ছ?'

সাজ্জাদ হাসল। 'জুয়ো খেলি। তাছাড়া কী করব?'

'তুমি যদি সৎপথে থেকে ব্যবসা-ট্যাবসা কর, কিছু টাকা দিতে পারি।'

'তোমার দয়া বিলু।'

'না—ঠাট্টা করিনি। সত্যি দিতে চাই।'

'করুণাময়ী শামীম-আরা বেগম! তার বদলে নিশ্চয় আমাকে সেই প্রেমপত্রগুলো দিতে হবে। তাই না?'

'তুমি আমাকে কেন ক্ষমা করতে পারছ না সাজ্জাদ?'

'ক্ষমা করার মানে তো সেই চিঠিগুলো ফেরত দেওয়া! তারপর কোলকাতা ছেড়ে বাইরে দূরে থাকা।' সাজ্জাদ ভুরু কুঁচকে মিটিমিটি হাসল।...'সব ভেবে দেখেছি সারাটা রাত।'

বিলু উদ্বিগ্নমুখে বলল, 'কী ঠিক করেছ?'

'কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি।'

'কিন্তু তুমি কাল পার্কে আমাকে কথা দিয়েছিলে!' বিলু অস্ফুট চিৎকার করল।

'তুমি ভয় পেয়ো না। চিঠি কারো হাতে পড়বে না। চিঠি আমার কাছেই থাকে। তবে যা কথা দিয়েছি রাখব। বার বছর ধরে রেখে আসিনি কি বিলু? তোমার স্বামীর কানে তুলেছি? বল!'

'আমি তো নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি নে।'

'দেখ বিলু, চিঠি দিয়ে দেওয়াটা কোন ব্যাপার নয়। আমার মুখের কথাই তো তোমার স্বামীর কাছে যথেষ্ট। বুঝতে পারছ তো ব্যাপারটা? স্রেফ আমার মুখের কথা। যদি চ্যালেঞ্জ করে—ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের খাতায় তার প্রমাণ রয়েছে।'

বিলু এটা ভাবেনি। সে শিউরে উঠল।

'তাই বলছি—আমার মুখের কথাই যথেষ্ট। আমি বলছি—মানে কথা দিচ্ছি—তোমার স্বামীর কানে কক্ষনো উঠবে না। তুমি এমন করে আমার ঘরে চলে এসেছ—আর আমি পাল্টা শত্রুতা করব, যত বদমাস হই—ও আমার ধাতে নেই।'

'চিঠিগুলো তুমি কী করবে? ওগুলো দিতে আপত্তি করছ কেন?'

'তুমি ভীষণ বোকামি করছ বিলু। আমি যদি একটা চিঠি রেখে বাকিগুলো দিই? তুমি তো জানতেও পারবে না।'

বিলু হাসল।...'পারব। আমার স্পষ্ট মনে আছে—মোটামুটি তিনটে চিঠি তোমাকে লিখেছিলুম। বিয়ের আগে দুটো, পরে একটা। শেষ চিঠিটা প্রেমপত্র ছিল না। তালাক চেয়ে লিখেছিলুম।'

সাজ্জাদ মুখ নিচু করে নিঃশব্দে সিগ্রেট টানতে থাকল।

'বল?'

সাজ্জাদ ঘুরে বসল।...'কত টাকা দেবে?'

'কত চাও? অবশ্য আমার খুব বেশি তো সাধ্য নেই।'

'সাধ্য অসাধ্য বুঝিনে। যদি স্রেফ বিজনেস টক হয়—সেদিকে আমি ভীষণ স্ট্রিকট, বিলু।'

'তিনটে চিঠির জন্যে আমার সম্বল—তিন হাজার টাকা দিতে পারি।'

সাজ্জাদ নিঃশব্দে হেসে বলল, 'আমি তিন লাখ চাই যে।'

বিলু মুখ নামিয়ে বলল, 'থাকলে তাই দিতুম।'

বাইরে থেকে ট্রামের বাসের চড়া শব্দ ভেসে এল। বাইরে দিনের গোলমাল বেড়ে যাচ্ছে। ঘরে দু মিনিট টানা নীরবতা। তারপর সাজ্জাদ কেমন জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল।...'বিলু অত টাকা যখন নেই—তখন...'

তাকে থামতে দেখে বিলু চঞ্চল হয়ে উঠল, 'তখন কী?'

'তুমি—তোমার যা আছে, মানে যা খরচ হয়ে যায়নি, ফুরোয়নি—তাই দাও।'

বিলু নড়ে বসল।.. 'তার মানে?'

'মানে খুব সোজা।' সাজ্জাদ নির্বিকার মুখে বলল। 'তোমার দেহের সুখ বার বছর পরে কী আছে, দাও।'

'অসভ্য! নীচ! ইতর!'...বিলু ফুঁসে উঠল।

সাজ্জাদ দেয়ালের হুক থেকে একটা ফোলিওব্যাগ টেনে নিল। খুলে একটা মোড়কে বাঁধা কাগজ বের করল। সুতো ছিঁড়ে তিনটে বেরঙা পুরনো খাম বিলুর সামনে তুলে ধরল।...'লুক! দা প্রপার্টি। এবার ঠিক কর—কী করবে? তিন মিনিট সময় দিলুম।'

বিলু কেঁদে উঠল।...'তুমি এত নিষ্ঠুর সাজ্জাদ!'

'তুমিও কি কম নিষ্ঠুর, বিলু!'

বিলু দু-হাতে মুখ ঢাকল। তার পিঠ কাঁপতে থাকল। খোঁপা ভেঙে কাঁধে নেমে এল চুলের স্তবক। ঘর শিরশির করে উঠল—চাপা ঝাঁঝাল সুগন্ধের উত্তেজনায়।

সাজ্জাদ বলল, 'লুক! এক হাতে দেব—অন্য হাতে নেব। ব্যস।'...

কতক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বিলু তাকাল। খুব উজ্জ্বল দৃষ্টি—হিংস্র। তার নাসারন্ধ্র কাঁপছে। দাঁত চেপে বসেছে নিচের ঠোঁট। তারপর অস্ফুট স্বরে সে বলল, 'এস—দাও।'

সাজ্জাদ তাকাল—তার মুখের দিকে নয়, দেহের দিকে। তারপর খাম তিনটে ওর হাতে গুঁজে দিল। বিলু ক্ষিপ্রহাতে সেগুলো ব্যাগে ভরে ফেলল।

সাজ্জাদ ওর দু কাঁধে থাবা মারল যেন। টেনে তুলল চেয়ার থেকে। ঠেলে বিছানায় ফেলে দিল। তারপর পাশে বসে আবার ওর দুটো কাঁধে হাত রেখে মুখে কিম্বা বুকে কী যেন দেখতে থাকল। বিলু চোখ বুজে মুখটা কাত করেছে। একটু একটু হাঁফাচ্ছে। ঘরভরা ঘামের গন্ধ। সাজ্জাদ হঠাৎ মুখে একদলা থুথু ছুঁড়ে দিল—'থুঃ থুঃ!'

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলে যা, চলে যা এখান থেকে! বেশ্যা, ডাইনি, হোর! গেট আউট ফ্রম মাই রুম! গেট আউট!'

বিলুর হাত ধরে টেনে বিছানা থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল সে। আবার চেঁচিয়ে উঠল—'বেরিয়ে যা এক্ষুনি! গেট আউট ছেনাল কুত্তিন কাঁহেকো!'

বিলু মুখটা মুছেই দরজা খুলে বেরোল। পিছনে দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।...

সময় হু হু করে চলে যাচ্ছে। বিলুর চোখ ঘড়ির কাঁটার দিকে। পরে বুঝতে পারে, সময় ওখানে নেই। সময় যেন বাইরে—আকাশে সূর্যে। সূর্য কয়েক টুকরো মেঘ পেরিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমের একলা কালো চিমনি এড়িয়ে ললিতাভবনের পাম গাছগুলো মাড়িয়ে, হাউসিং এস্টেটের স্কাইক্রাপার ডিঙিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। হুগলী নদীর ওপারটা জ্বালাতে জ্বালাতে সূর্য সুসময় নিয়ে পালাচ্ছে।

আবার টের পায়, সময় বাইরে নয়—তার ঘরে ও তার ঘরকন্নায়। আর তার নিজের মধ্যেও সময়ের থাবা। যত সময়কে ওতপ্রোত দেখে সে, তত ভয় পেয়ে যায়।

দূর ঢেনকানলে যে গাড়ি সান্টিং ইয়ার্ডে কামরায় কামরায় জোড়া হচ্ছে—সেই বিশাল ধূসর এঞ্জিনটা স্পষ্ট দেখতে পায় বিলু। কামরাগুলো ঝাড়পোঁছ করছে সুইপার স্টাফ। যে নেভিব্লু উর্দিপরা ড্রাইভার আর ফায়ারম্যানরা গাড়িটা নিয়ে আসবে তারা এখন গল্পগুজব করছে। ঢেনকানল থেকে গাড়ি আসবে বলে হাওড়া স্টেশনও তৈরি হচ্ছে। যে ট্যাক্সিওয়ালা হাসানকে বয়ে আনবে সেও পাম্পিং স্টেশনে ট্যাক্সি ঢুকিয়ে তেল নিচ্ছে। ডাঃ হাসান আলি খুরশিদ ম্যানসনে ফিরে আসবে তার জন্যে এইসব ব্যাপক তোড়জোর চলেছে। মোটামুটি কয়েকশো লোক এই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে টের পায় বিলু। সেই কয়েকশো লোক—নানান পেশা ও নানান জায়গায় তাদের বসবাস, বিলুকে একটা দুর্ঘটনায় পৌঁছে দেবার জন্যে সাজোসাজো রব তুলছে।

বিলু খুব অসহায় বোধ করল। বস্তুত এসবই যেন সময়ের ষড়যন্ত্র বিলুকে ঘিরে। তার কিছু করার নেই। দুঃসময় ওরা আনতে বদ্ধপরিকর—ওই কয়েকশো লোক। এবং এখন তাহলে যা চলে যাচ্ছে তা সুসময়। এখন সে নিরাপদ। তারপর আসছে বিপদ।

কিছু একটা করে ফেলতে হয়। খুব জোর আর দ্রুত সাবান ঘষে জলে কিছু ডেটল ফেলে সে স্নান করে নিল। গায়ের ঘিনঘিনে ভাবটা কমে গেল। গালে সাজ্জাদের থু থু পড়েছিল, ঘষার চোটে সেখানটা লাল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি খানিকটা হালকা প্রসাধন সেরে নিল।

চিকন ঝুমঝুমি স্কুলে। কয়েকগ্রাস খেতে চেষ্টা করল, পারল না। বমিভাবটা বাড়ছে। একটা ট্যাবলেট খেল। খুব ক্লান্তি লাগছে। ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু শুলে যে চলবে না। এক্ষুনি বেরোতে হবে।

হোটেল থেকে ফিরেই শেখরকে আসতে বলেছিল—ঠিক বারোটার মধ্যে। বারোটা বাজতে দু মিনিট বাকি তখন শেখর এল।...'কী ব্যাপার? দুপুরে কোথায় বেরোবেন?'

'চল। কিছু জরুরি কাজ আছে।'

'কিন্তু বেরোবেন তা তো বলেনি রেখা। বলেছিল, ডেকেছেন।'

বিলু ওর পোশাক দেখে নিয়ে বলল, 'আর সাজতে নেই। বেশ অ্যাংগ্রি ইয়ংম্যান দেখাচ্ছে। চল যাই।'

'কী মুশকিল! স্নান দাড়িকামানো...' শেখর চিবুক ঘষতে থাকল।

বিলু ওর হাতে টেনে বলল, 'তর্ক করে না। চল কোথাও খাইয়ে দেব। সময় কম।' তারপর গগলস পরল চোখে।

দুজনে বেরল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। বিলু চাপা গলায় বলল'মেটিয়াবুরুজ।' ট্যাক্সি ড্রাইভার একবার ঘুরে দুজনকে দেখে নিয়ে স্টার্ট দিল।

শেখর বলল, 'হঠাৎ মেটিয়াবুরুজে কী ব্যাপার?'

বিলু হাসল।...'সব ব্যাপার তোমার জানা চাই-ই। আগে তো এমন করতে না—চুপচাপ ফলো করতে।'

'ঠিক আছে।'

বিলু বলল, 'কাজ না হওয়া অব্দি কিন্তু তোমাকে খাওয়ানো যাচ্ছে না। খিদে সইতে পারবে তো?'

'হুঁ-উ।'

বিলু একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ চাপা হাসল। 'কোথায় যাচ্ছি জান? ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে।'

শেখর চোখ বড় করে বলল, 'সে কী! কার বিয়ে?'

'আমার।'

'আপনার বিয়ে?'

'হুঁ—আমার নয় তো কার?'

'কার সঙ্গে বিয়ে?'

কথাগুলো ঝটপট হচ্ছিল। বিলু ওর একটা হাত নিয়ে খেলতে-খেলতে বলল, 'তোমার কী মনে হচ্ছে? কার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া উচিত?'

শেখর এবার হেসে ফেলল 'না—আমার সঙ্গে নিশ্চয় নয় তা তো বোঝাই যায়।'

'কিন্তু ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আবার এক ভদ্রমহিলা—সম্ভবত বুড়ি। দুজনকে দেখলেই ভাববেন, এইরে, খেয়েছে! এই ধিঙ্গি আধ-বুড়ো মেয়েটা এমন সুন্দর ছেলেটার মুণ্ডু খাবার লিগাল পারমিট চাইতে এসেছে!'

শেখর একটু আড়ষ্ট হল মুহূর্তে। পরক্ষণে হাসি দিয়ে কাটাল।

বিলু বলল, 'শেখর—তা যদি সত্যি হত, তুমি ব্যাপারটা ভাব তো!'

'ভাবলুম।'

'কী মনে হল?'

'হ্যাঁ—এমন তো হতেই পারত। কত হচ্ছে।'

'তোমার রোমাঞ্চ হল না, শেখর?'

শেখর 'যান' বলে চিবুক জানলার ফ্রেমে রাখল। রবীন্দ্রসদন—ভিকটোরিয়া হু হু করে ছাড়িয়ে গেল গাড়ি।

'মাথা সরিয়ে রাখো।'...বলে বিলু একটু চুপ করে থাকার পর বলল, 'আমার কিন্তু রোমাঞ্চ হয়। আবার নতুন করে জীবনটা শুরু করে দেওয়া যায়। কোন পিছুটান নেই, সামনেটা ক্লীন, স্বচ্ছ। এতদিনের সব অভিজ্ঞতা কাজে লাগাই তাহলে। আঃ!'

শেখর ঘুরে বলল, 'কী হল?'

'কিছু না।'...গগলসের ভিতর একটু ভিজেভাব—পাপড়ি চটপট করছে। গগলস খুলে রুমালে চোখ আর কাচ মুছল বিলু।...'এটা রেসের মাঠ না? একসময় শনিবারে শনিবারে এসে ঘোড়দৌড় দেখতুম।'

'রেস খেলতেন না তো?'

'একজন চেনা লোক খেলত—তার সঙ্গে আসতুম। বার দু-তিন এসেছিলুম যেন।'

'বউদি!'

'হুঁ, শেখর?'

'ম্যারেজ রেজিস্ট্রার দিয়ে কী হবে!'...বলে শেখর বিলুর সিঁথির দিকে তাকাল।..'আরে! আজ আপনি সিঁদুর পরেন নি যে?'

বিলু হাসল। 'অমনি ভয় ধরে গেল? শেখর আমি এখন খাঁটি শামীম-আরা বেগম। ডটার অফ লেট সৈয়দ শাহেদুল ইসলাম অফ এগারোর দুই রহিম বকস লেন। মেটেবুরুজ।'

শেখর রাস্তা আর লোকজন দেখতে লাগল। বিলুবউদি মাঝেমাঝে স্বচ্ছ পর্দার আড়াল থেকে রহস্যময়ীর মত কথা বলে, যেন দূর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। আবেগ থাকে, কাঁপন থাকে থরোথরো—বিলুবউদি তখন দূরের মানুষ। এখন সেই রকম।

..তারপর আর কোন কথা নেই। মেটেবুরুজ এসে গেল কতক্ষণ পরে। এক জায়গায় বিলু বলে উঠল, 'রোখো, রোখো!' গাড়ি দাঁড়াল। মিটার দেখে পয়সা গুনে দিয়ে বিলু আর শেখর নামল। ট্যাকসি ড্রাইভারটি বুড়ো মানুষ। হঠাৎ ফ্যাচ করে হেসে গোঁফ মুছে বলল, 'কুছ বখশিস তো দেনা চাহিয়ে ম্যাডম!'

শেখর শুনতে পেয়ে বলল, 'কাহে সর্দারজী?'

বুড়ো সর্দারজী হাসতে হাসতে হাত নাড়ল। 'যাইয়ে, যাইয়ে!'...তারপর বোঁও করে চলে গেল। পেট্রোলের কড়া গন্ধে নাক জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

বিলু বলল, 'বখশিস চাচ্ছিল নাকি?'

'হ্যাঁ। সব কানখাড়া করে শুনছিল ব্যাটা।' শেখর হাসতে লাগল। 'ভেবেছে বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

বিলু হাসল না। শুধু বলল, 'লোকটার সেন্স অফ হিউমার আছে। এস।'

দুজনে একটা গলিতে ঢুকল। কিছুটা যাবার পর মোটামুটি একটা চওড়া রাস্তা পড়ল—চারপাশে বস্তী। রাস্তাময় লোক। ছোটখাটো কারখানা। ট্রাক, টায়ার, লোহালক্কড়। আবার একটা বড় গলি। দর্জি এলাকা। কিছুদূর গিয়ে আরেকটা রাস্তায় পড়ল। একটু দাঁড়িয়ে বিলু বলল, 'চিনতে পারছিনে। ভারি মুশকিল হল তো!'

শেখর বলল, 'কাকেও জিজ্ঞেস করে নিন না।'

বিলু জিভ কেটে বলল, 'যাঃ! তুমিই লজ্জায় পড়ে যাবে। এতবড় ধিঙ্গি মেয়ে এনেছ সঙ্গে!'

শেখর পা বাড়িয়ে বলল, 'কাজ নিয়ে কথা। লজ্জার কিছু নেই।'

বিলু চারিদিকে তাকাচ্ছিল। অস্ফুট বলল, 'একটা কী গাছ ছিল—পাশে গলি, গলিতে সিঁড়ির দরজা—দোতলায় সাইনবোর্ড। আশ্চর্য তো, কোন গাছ নেই!'

'প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে কোলকাতা।'...শেখর বলল।...'আচ্ছা, নিচে কী দোকান ছিল মনে আছে?'

'আছে! ওষুধের দোকান। এদিক থেকে যেতে বাঁহাতি পড়বে।'

'চলুন—খুঁজে দেখি।'

কিন্তু কোন ওষুধের দোকান খুঁজে পাওয়া গেল না। সব দোকান ডান দিকে। এই যেন নিয়ম। যেটা খোঁজে, সেটাই মেলে না। যেদিকের বাসে যাবে বলে দাঁড়িয়ে আছে—তার উল্টোদিকের বাসই আসে

ক্রমাগত। রাস্তার শেষপ্রান্ত অব্দি দেখে ফিরল দুজনে। শেখর বলল, 'আপনার রাস্তা ভুল হচ্ছে না তো?'

মোটেও না।'

'দেখবেন—রাস্তার নামও বদলায়।'

'কিন্তু এই তো ইউসুফ দেওয়ান রোড।'

'তাহলে বদলায়নি। চলুন এবার উল্টোদিকের শেষ অব্দি যাই।'...চলতে চলতে আবার বলল শেখর, 'আচ্ছা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসও তো ঠিকানা বদলাতে পারে!'

'হ্যাঁ—তা পারে বই কি।'

শেখর একটু ভেবে বলল, 'ফোন গাইডে মিলবে না?'

বিলু চিন্তিত মুখে বলল, 'দেখে এসেছি। খুঁজে পাইনি।'

'ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের নাম মনে আছে?'

'হ্যাঁ। বেগম আসিয়া কামাল।'

শেখর হাসল। 'সব মুখস্ত আছে —আর ঠিকানাটা নেই?'

বিলু রুমাল স্পঞ্জ করল মুখে। ভীষণ ঘেমেছে। ওকে ক্লান্ত আর বিপন্ন দেখাচ্ছে। শেখর বিরক্ত হতে গিয়ে একবার তাকাল। তখন একটু কষ্ট পেল মনে।...'আসুন—নিশ্চয় খুঁজে বের ক'রে ফেলব।'

এ এমন ব্যাপার যে কাকেও জিজ্ঞেস করতে বাধছে। রাস্তার লোকেরা তাকাচ্ছে। উজ্জ্বল রোদে দুটো ঝকঝকে মানুষ—এ পরিবেশে একটু বিশিষ্ট। সবারই চোখ পড়ে যায়। অন্তত বিলুর ওপর তো পড়েই।

রাস্তাটা আবার শেষ হল। ওদিকে আরও বড় রাস্তা—সামনে বিরাট কারখানার পাঁচিল। বড় রাস্তায় কিছু গাছ আছে। একটা বটগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিলু করুণ হাসল।...'দেখ তো কী কাণ্ড! লোকে টাকা পায় না। আর আমি এতগুলো টাকা নিয়ে একজনকে দেবার জন্য ঘুরে হন্যে হচ্ছি। সে জানেও না।'

'টাকা দেবেন? কেন?'

'ঘুষ। টাকা নয়।'

'সে কী! জানেন তো ঘুষ দেওয়াও একটা ক্রাইম!'

'হ্যাঁ—আজ আমি ক্রিমিন্যাল।'

'ঘুষ দেবেন কেন?'

'বারো বছর আগের একটা বিয়ের রেকর্ড নষ্ট করতে চাই।'

শেখর এতক্ষণে বুঝল।...'তাই বলুন! আমি তো তখন থেকে আকাশপাতাল হাতড়াচ্ছি। কিছু বুঝতে পারছিনে।'

বিলু ভ্রূভঙ্গী করে বলল, 'তুমি বোঝ সবই—তবে দেরিতে।'

শেখর কিছু ভাবল। তারপর বলল, 'এক কাজ করা যাক। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি একা গিয়ে কাকেও জিজ্ঞেস করলে লজ্জা কী? আমার কোন ব্যাপারেই লজ্জাটজ্জা নেই। প্র্যাকটিকাল আমি সবসময়।'

বিলু কী বলতে গিয়ে ঠোঁট ফাঁক করল, বলল না।

শেখর বলল, 'ঠিক এখানটায় থাকবেন কিন্তু। বড্ড রোদ। ছায়া আছে এখানে।' তারপর হনহন করে চলে গেল।

বিলু মনে মনে আবার ঈশ্বরকে আবেদন-নিবেদন সুরু করল। তারপর পীরআউলিয়াদের শরণাপন্ন হল। মানত কামনা করল। তাতেও মনের খুঁতখুতোমি গেল না। তখন, শেখরের মা যে সাধুবাবার কথায় দিনরাত পঞ্চমুখ, সেই অলৌকিক শক্তিধর সাধু—যাঁর দেহ থেকে ঘামের বদলে বিভূতি ঝরে, তার বাঁধানো ফটোটা স্মরণ করে কাতরভাবে বলল, 'আমি মুসলিম মেয়ে—কিন্তু তোমাদের কাছে সব মানুষই ঈশ্বরের অনুগৃহীত—সবাই অমৃতের সন্তান!' বিলু দেখল, আবার তার গগলস ছপছপ করছে।

অদূরে নাপিতের সামনে বগলে তুলে যে খ্যাঁদানেকো লোকটা বসে রয়েছে, সে তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। আর নাপিতও ক্ষুরে শান দিতে দিতে তাকে অশ্লীল চোখে দেখল, তারপর হাঁটুর নিচে ক্ষুরটা বার-দুই ঘষে বগলের দিকে তাকাল। একটা রাস্তার ছেলে বিলুর কাছে এগিয়ে এসে হাত বাড়াল। বিলু দুটো দশ পয়সা দিল। তবু সে দাঁড়িয়ে রইল। বটগাছটা স্থির। পাতা কাঁপে না। বাতাস বন্ধ। আজও কি বৃষ্টি হবে না? ধুলো উড়িয়ে চলে গেল একটা খালি ট্রাক। নেড়ি কুত্তাটা দৌড়ে এদিকে এসে প্রাণ বাঁচাল। বিলু টের পেল, আকাশভরা বৃষ্টির মত ঝরঝর করে কাঁদতে পারলে ভাল হত। সে মুখ ঘুরিয়ে গগলস খুলে দ্রুত চোখ মুছে নিল। বুকের ভিতরটা হু হু করছে এত।...

শেখর আসছে না। এত দেরি হচ্ছে কেন ওর? প্রায় দুটো বেজে এল।

মঞ্জরীদের কাছ থেকে কোন ভয় নেই। শেখরের মা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বলেছেন, 'তুমি আমার পেটের মেয়ে, বিলু। আমার অঞ্জলি মঞ্জরী সঞ্চিতার দিদি। দোষ তো তোমার ছিল না, মা ভুল করেছিলেন তুমি কী করবে? ভেবো না। আমরা আছি—আমি আছি। কোন অশান্তি হবে না। আমি খালি ভাবছি—আমিও তো তোমার মায়ের মত করতে পারতুম। মেয়ের ভালোর জন্যেই তা করতুম। যাক গে, তুমি ভেবো না।'

ঝুমঝুমি ও নিয়ে বাবার সামনে মুখ খুলবে না—সে বিশ্বাস আছে। মেয়েরা খুব কম বয়সে সব বুঝে নিতে পারে। ভয় শুধু চিকনকে। বড় রহস্যময় ছেলেটা।

আর রেখা আছে। রেখা কাচভাঙার শব্দে দৌড়ে এসেছিল—

কিন্তু তক্ষুনি চলে যায়। মেয়েটার সাতেপাঁচে কান থাকে না। ওকে নিয়ে কোন ঝামেলা নেই।

...শুধু চিকন—

...আর সাজ্জাদ? বিলু শিউরে উঠল আবার। আজ টের পাওয়া গেছে, লোকটা তাকে কী দারুণ ঘৃণা করে। আসলে এই বারোটা বছর লোকটা নিজের ঘৃণার সঙ্গে লড়াই করে কাটাচ্ছে। আর ঘৃণা তাকে তাড়িয়ে বিলুর ফ্ল্যাটে হাজির করে দিয়েছিল। বাকি সময় তার ঘৃণাকে ঠেলে রেখে সময় গেছে। এবং ঘৃণা থেকেই প্রতিহিংসার বীজ জেগে ওঠে।

বিলুর মুঠোয় ব্যাগটা কেঁপে উঠল। কী একটা ঝিলিক দিল মাথায়। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরল। সময় চলে যাচ্ছে হু হু করে। ঢেনকানলে ট্রেনটা প্ল্যাটফরমের দিকে সান্টিং লাইন থেকে এগিয়ে যাচ্ছে। তখনই সে ঠিক করে ফেলল, তালতলায় যাবে এখান থেকে।...

এতক্ষণে শেখরকে আসতে দেখা গেল। একটা প্রাইভেট গাড়ি চলে যাওয়া অবধি অন্য ফুটপাথে অপেক্ষা করল সে। তারপর দৌড়ে এল। মুখে হাসি টলটল করছে। ..'কেল্লা ফতে!'

বিলু রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'খোঁজ পেয়েছ?'

'পেয়েছি।'...শেখর হাসল সশব্দে।...'বাপস্, কাণ্ড! নতুন আপিস করেছে গলির ভিতরদিকে। কোন বুড়ি নেই—এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এখন ওসব করেন। আপনার সেই বেগম সায়েবা মারা গেছেন ক-বছর আগে।...তারপর শুরু হল জেরা। ওরে বাবা, লুকিয়ে বিয়ে করার এত ঝক্কি কে জানত! মেয়ের বয়স, আত্মীয়-স্বজনের খবর, আমার বয়স—বাবা-মা...উঃ! অনেক কষ্টে বোঝালুম, বিয়ে করতে আসিনি। আমার এক আত্মীয়ার বিয়ে হয়েছিল বারো বছর আগে—একটা মামলায় সেই রেকর্ড দরকার হচ্ছে। কেমন, ভাল বলিনি?'

'হুঁ। তারপর?'

'ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। নো রেকর্ড। সিক্সটি ফোরের রায়টের সময় আগের অফিস পুড়ে যায়। কিছু পাওয়া যায়নি—স্রেফ ছাই ছাড়া। তারপর বছর আষ্টেক হল, আমি রয়েছি। কোন উপায় নেই, ব্রাদার।'

বিলু বলল, 'ট্যাকসি ডাকো শেখর।'

এসপ্ল্যানেডে এসে বিলু বলল, 'চলো তোমাকে খাইয়ে দিই।'

শেখর বলল, 'না বউদি। বাড়ি ফিরে খাব।'

'ভ্যাট, আড়াইটে বেজে গেছে। তাছাড়া এখনও কিছু দেরি হবে।'

'আবার কোথায় যাবেন?'

'তালতলা।'

শেখর হাল ছেড়ে বলল, 'চলুন।'

ট্রাফিক পুলিশ হাত ওঠাল। ট্যাকসি চলতে থাকল আবার। বিলু বলল, 'সাবিরে, চল।'

পর্দাঢাকা কেবিনে বসে বিলু অর্ডার দিল। শেখর বলল, 'আপনি না খেলে খাবো না কিন্তু।'

বিলুর মুখটা কঠিন দেখাচ্ছিল। চাপা স্বরে বলল, 'তোমার সঙ্গে তো কতবার খেয়েছি। কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না—বমি হয়ে যাবে।'

'তালতলায় কার কাছে যাবেন?'

'পরে বলব'খন।...'

যখন বেরল, আবহাওয়া বদলে গেছে। এসপ্ল্যানেডের দিকে আকাশে চাপ চাপ মেঘ জমেছে। বাতাস ঘুরপাখ খাচ্ছে রাস্তায়। একটা খালি ফলের ঝুড়ি গড়াতে লেগেছে। সবাই নাক ও ভুরু কুঁচকে আকাশ দেখছে। পিছনে ঝড়ের চাপ নিয়ে ওরা রিকশোয় উঠল।

গীর্জার কাছে একটা গাড়িবাবান্দার সামনে পৌঁছে বিলু বলল, 'রোখকে! শেখর, তুমি ওখানটায় অপেক্ষা কর। আমি শিগগির ফিরছি।'

শেখর দৌড়ে সেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বৃষ্টি পড়তে লেগেছে। বিলুর রিকশো এগিয়ে গেল গলির দিকে।

বৃষ্টি জোর শুরু হয়ে গেল। রাস্তায় জল জমে যাচ্ছিল। নির্ঘাৎ গাড়িটাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। শেখর বৃষ্টি দেখতে থাকল। সেদিন এই বৃষ্টি নিয়ে বাজি ধরেছিল। সেদিন বৃষ্টিটা হলে তাকে কী দিত বিলুবউদি? মোগলাই খিচুড়ি তো বটেই—কিন্তু সেটা ঠিক বাজির বাবদ যথেষ্ট নয় বিলুর কাছে—অন্তত সেই রকম মনে হয়েছিল ওর মুখ দেখে। শেখর মৃদু লজ্জায় আচ্ছন্ন হল। বিলু বউদির আচরণ সময়ে কোথায় যেন পৌঁছবার লক্ষণ এনে ফেলে। কোথাও লাল আলোর ডেনজার সিগনাল জ্বলে ওঠে, বুকটা গুরু গুরু কেঁপে ওঠে—অথচ হঠাৎ বিলুবউদি সব ইলিউশনের জাল গুটিয়ে হাসতে হাসতে বলে ওঠে, 'ও শেখর, হল কী তোমার?'

অথচ কী আছে মহিলাটির—বিপুল টান, এড়ানো যায় না, বারবার কাছে যেতে হয়, অনেক এলোমেলো কথা বলতে হয়, ভাল লাগে। ভিতরে কী জ্বালা আছে, বোঝা যায়। একটা গভীর অতৃপ্তির অস্থিরতা ওর মুখে কখনও-কখনও স্পষ্ট হয়ে ফোটে।

এক ঘণ্টা পরে আকাশ সাফ হয়ে গেল। রাস্তায় খুব বেশি জল জমে নি। মধ্যে বৃষ্টিটার দম ফুরিয়ে গিয়েছিল। আবার রোদ দেখা দিল। তারপর বিলু হেঁটেই ফিরল। মুখটা কেমন লালচে—অথচ নির্বিকার। এসেই বলল, 'এক ঘণ্টারও বেশি।'

'বৃষ্টিতে বেরোলুম না। চল, এবার ফেরা যাক। ট্যাকসি ডাকো।'

শেখর বলল, 'আর ট্যাকসি পাবেন না। বৃষ্টি পড়তেই সব উধাও হয়ে যায়। ট্রাম বাসেও ভিড় বেড়ে যায়। হাঁটতে পারবেন না?'

'পাগল! রিকশো করে নিই।'

রিকশোয় দুজনে যখন যাচ্ছে বিলুর মাথার ভিতর হাজার হাজার মাছি-ওড়ার শব্দ হচ্ছে। খুব অদ্ভুত লাগছে। কতকগুলো কথা গুড়ের মতন চেপটে লেগে রয়েছে মাথার ভিতর দিকে—তা কেন্দ্র করেই এত মাছির ভনভনানি।...'ঠিক হ্যায়—পারতিভা হোটল, রুম লম্বর তেরাহ্—শেয়ালদা—তো ঠিক হ্যায়। চুপসে বইঠ যাইয়ে।'...আবার—'ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায়! সাজ্জাদ হুসেইন! আরে এক শালা সাজ্জাদ থা ধুকড়ি বাগানমে—হাঁ, ঘোড়ে পর জীনকা বদলা জান লাগা দেতা—তো হাঁ—পারতিভা হোটল—তেরাহ্ লম্বর। হামারা আদমি ভি হ্যায় উধার ..'

ঝুমঝুমির বিয়ের টাকার এক হাজার গেল। যাক্। হাসান টের পেতে দেরি হবে। ততদিনে শাড়ি কেনা কমিয়ে ম্যানেজ করে ফেলবে।...

আবার স্নান করে ফেলতে হবে। শেখর নিজেদের ফ্ল্যাটে ঢুকে গেল। বিলু সিঁড়ি বেয়ে ভারী পায়ে

উঠতে থাকল। ফ্ল্যাটের দরজায় বোতাম টিপতে গিয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠল। হাসান ইতিমধ্যে ফেরে নি তো? চিকনদের এতক্ষণ স্কুল থেকে ফেরার কথা। প্রায় পাঁচটা বেজে গেছে।

কাঁপা হাতে বোতাম টিপল। মিঠে টং আওয়াজ হল। অস্থির হল। অস্থির হতে থাকল বিলু। তারপর ঝুমঝুমি দরজা খুলল।

বিলু রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'কেউ এসেছিল?'

ঝুমঝুমি জবাব দিল, 'কে আসবে! কেউ না! এস—চিকনের খুব জ্বর এসে গেছে! পা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। স্কুল থেকে রিকশো করে নিয়ে এলুম।'

বিলু অস্পষ্ট আর্তনাদ করে দৌড়ে গেল। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, 'চিকন, চিকন! তোর জ্বর এসেছে কেন?'

চিকনের বুকের ওপর পড়ে দু হাতে ওর মুখটা নিয়ে গালে বুলোল।...'ইস্, জ্বরে যে পুড়ে যাচ্ছে! হঠাৎ কেন জ্বর এল রে? তখন বারণ করলুম, স্কুলে যাস নে ওই নিয়ে। কেন স্কুলে গেলি বাবা?'

চিকন চোখ খুলল না।

বিলু বলল, 'ঝুমঝুমি, শিগগির সেই ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন্ মা।'

ঝুমঝুমি বলল, 'আমি চিনি নাকি? এখন ডাক্তার থাকে না। সেই সন্ধেবেলা ছাড়া বসেই না।'

বিলু ঘর থেকে বিভ্রান্তভাবে বেরিয়ে গেল। একজন ডাক্তার চাই-ই—যেখান থেকে হোক, খুঁজে আনবে।

সিঁড়িতে মায়ের অস্থির পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে শুনল ঝুমঝুমি।...

৭

পূর্বদিক থেকে আবার একটা রাত এসে অনধিক বারো ঘণ্টা খুরশিদ ম্যানসনকে ঢেকে রেখে পশ্চিমে চলে গেল। এই বারোটা ঘণ্টার খুঁটিনাটি জরীপ করলে বিলু ওরফে শামীম-আরার নিছক গতানুগতিক একটা ছবি ফোটে। সে ছবির সঙ্গে শতকরা নিরানব্বইটি সন্তানবতী যুবতী বউয়ের কোন অমিল নেই।

হাসানের ফ্ল্যাটে সন্ধ্যার দিকে যথারীতি কিছু ভিড় হয়েছিল। শেখরের মাও অনেক কষ্টে উঠে এসেছিলেন। শেখরের বাবা একটু বসে গিয়েছিলেন। মঞ্জরী রাতটা থেকে গেল বিলুর পাশে। ডাক্তার আসতে দেরি হয়েছিল। কিন্তু তেমন কোন ভয়ের কারণ নেই বলে গেছেন। এসব কাটাছড়ায় অনেক সময় কিছু ইরিটেশন ঘটে থাকে। জ্বর চলে যাবে। ফোলা কমে যাবে। পেনিসিলিন চালিয়ে যেতে হবে পর পর। উপায় নেই।

জগদীশবাবু মনে খুব কষ্ট পেয়েছেন। প্রায় সাড়ে দশটা অব্দি চিকনের মাথার কাছে বসে থেকে গেলেন। চিকন বিড়বিড় করে ভুল বকছিল জ্বরের ঘোরে। মাথা ধুইয়ে দিয়েছে মঞ্জরী। বিলু আর সে-বিলু নেই। হতাশ শিথিল উদ্‌ভ্রান্ত এক মা।

শেখর গেল এগারোটায়। তার আগে মঞ্জরী গিয়ে খেয়ে এল। ঝুমঝুমি আর মঞ্জরী নিচে বিছানা পেতে শুয়েছিল। খাটে চিকনের পাশে বিলু—একদিকে টুকুন। কিছু পরে মঞ্জরীর ঘুম ভেঙে যায়। সে দেখে কোণের দিকে বিলু হাঁটু ভাঁজ করে ঝুঁকে রয়েছে। সে চমকে উঠেছিল। বিলু মাটিতে লুটিয়ে পড়লে সে উঠে বসেছিল বিছানা থেকে। পরক্ষণে ব্যাপারটা তার মাথায় এসে যায়। ও হরি! বিলুবৌদি নমাজ পড়ছে! আশ্চর্য তো, কোনদিন দেখে নি বা ভাবেও নি মঞ্জরী।

বিলু দু হাত তুলে নিঃশব্দে প্রার্থনা করছিল।

ভোরের দিকে আবার মঞ্জরীর ঘুম ভাঙে। বিলুবউদি কি গান করছে গুনগুনিয়ে? সে মাথা তুলে দেখে, কোণে একটা নকসাকাটা সুদৃশ্য আসনে বসে একটা কাঠের আধারে মোটা একটা বই পড়ছে গানের সুরে। শাস্ত্র-টাস্ত্র হবে। ভাষাটা বোঝা যায় না। পরে মঞ্জরী টের পায়, কোরান পড়ছে বিলুবউদি। মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে কোরান পড়ছে। ছেলের অসুখে মা যে এমন টুকিটাকি ধর্ম পালনে ব্রতী হয়, এ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে বিলুবউদি বলেই অবাক লাগছে।

মঞ্জরীর আর ঘুম এল না। বিলু বউদির অমন সুরেলা গলা, আর সুরটা যেন রাগ ভাঁইরো ঘেঁষা—জায়গায়-জায়গায় অবিকল আহির-ভাঁইরো মনে পড়িয়ে দ্যায়! বিলুবউদি কি সুরে একটু-আধটু কান্না মিশিয়ে দিচ্ছিল? মঞ্জরী ধর্মের ব্যাপারে একটু নিঃসাড়, কিন্তু মনটা কেমন শুদ্ধ করে দিল বিলুবউদি। চিকন ভাল হয়ে উঠুক—আবার হাসি ফুটুক বউদির মুখে, এই ফ্ল্যাটে আবার গানের জমাট আসর বসুক, মঞ্জরী মনে-মনে কামনা করছিল।...

আলমারির মাথায় কোরান সুদৃশ্য কাপড়ের মোড়কে জড়িয়ে তুলে রাখল বিলু। আসনটা গোটাল। তুলে রাখল একপাশে। তারপর ঘোমটা ফেলে দিল। জানলায় গিয়ে দাঁড়াল একবার। বাইরে ধূসর আলো ফুটেছে। মোহিতবাবুর ফ্ল্যাটে লেগহর্ন মোরগটা বার-বার ডেকে উঠছে। বিলু এদিকে ঘুরতেই মঞ্জরী চোখ বন্ধ করে ফেলল।

বিলু পাশের ঘরে চলে গেল। রেখাকে জাগিয়ে দিল। টুকুনের দুধ তৈরি রাখতে হবে। চিকনকে বার্লি দিতে হবে। কাল সেই স্কুলে যাবার সময় খেয়েছে।

নিজের শোবার ঘরে জানালাগুলো খুলে দিল বিলু। শেষ রাত থেকে চিকন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছে। কপালে ঘামের ফোঁটা দেখে এসেছে! সূর্য উঠতে উঠতে যদি জ্বর ছেড়ে যায়, রাস্তা থেকে একজন ভিখিরি ডেকে এনে খাইয়ে দেবে। সঙ্কল্প করেছে।

আবার বিলুর চোখ ছলছল করে উঠল। কাল সকালে প্রতিভা হোটেলে যেতে-যেতে ট্যাকসিতে একটা দৃশ্য আচমকা ভেসে উঠেছিল—চিকনের অ্যাকসিডেন্ট! কোথায় ছিল চেতনার কোন অন্ধকার তলায়, কী সর্বনেশে ষড়যন্ত্র চলেছিল সেখানে। মা হয়ে ছেলের মৃত্যু কামনা করে বসেছিল সে!...বিলু, তোর এ পাপের ক্ষমা নেই!...দু হাতে জানালার রড আঁকড়ে ধরল সে। ললিতা ভবনের মাথায় হাল্কা লাল রঙ ছড়াচ্ছে। সূর্য আসছে একটা দীর্ঘ দিন সঙ্গে নিয়ে।...চিকন তার প্রথম সন্তান। মা হবার যদি কোন গৌরব থাকে, চিকন তাকে প্রথম দিয়েছিল। ও যখন পেটে এল, তখন সে কী ভয় বিলুর! সব সময় মনমরা হয়ে থাকত। হাসান সান্ত্বনা দিলে সে ক্ষেপে যেত। কী হবে, কী হবে, এই ভাবনার মধ্যে একদিন সব শেষ হল। শারীরিক কষ্টের হঠাৎ অবসান হলে যে সুখ আসে, তার মধ্যে দিয়েই পিটপিট করে ছেলেকে দেখেছিল বিলু। সে-মুহূর্তে একটু ঘেন্নাভাব আসে নি, তা নয়। অতটুকু কী একটা—বড় গিরগিটির মত—হাত তুলে মাকে বলেছিল, 'না না!' মা হেসে খুন। নার্সিং হোমের সবাই খুব হেসেছিল। 'না—জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই নতুন মায়ের স্নেহবাৎসল্য কিছু বিশাল হয়ে আসে না। ওটা আস্তে আস্তে বাড়ে সহজাতবোধকে কেন্দ্র করে—কিম্বা বলা যায়, বোধটা আস্তে আস্তে বিশাল বাৎসল্য হতে থাকে। চিকনের দৃষ্টি, হেসে ওঠা, অসহায়তা, কান্না—একটা-একটা করে রোদ-আলো-বাতাসের মত বাৎসল্যময় মাতৃত্বের পৃথিবীকে শস্য ফুল ফলে ভরিয়ে তুলেছিল।

অথচ বারো বছর ধরে বিলুর পিছনে একটা অশুভ ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার জন্যে সে একটুও শান্তি পায় নি মনে। হাসান কখনও গম্ভীর হয়ে থাকলে, কখনও অকারণ কথা-বলা কমিয়ে দিলে বিলু চমকে উঠেছে—কিছু জেনে ফেলে নি তো?

সময় সব কিছু সইয়ে দেয়। বিলুর মনে শান্তি ছিল না—কিন্তু পিছনের ছায়ার উৎপাতটা সরে গিয়েছিল। পরে টের পেয়েছিল, হাসান খুব একটা কানপাতলা স্বভাবের মানুষ নয়। নিজের চাকরি সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া কোন কিছুতে তার মনোযোগ কম। অবশ্য বিলু তার জীবনের আর একটা বড় অংশ হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়। প্রত্নতত্ত্বের নোট কিম্বা বই বুজিয়ে রেখে সে বিলুকে ভালবাসা দেওয়া-নেওয়ার প্রচুর অবসর করে নিতে জানত। তাছাড়া সে নির্বিবাদী প্রকৃতির মানুষ। ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলা তার রীতি। অন্তত বিলুর ধারণা এই।

কিন্তু উৎপাত সইলেও তবু পিছনের ছায়ার ভয়টা ঘোচে নি বিলুর—ঘোচে না! মানুষের কতটুকু বোঝা যায়? হাসানের এই চেহারা, নিতান্ত খোলস হতেও তো পারে। অনেক আগ্নেয়গিরি আছে—যা টানা ঘুমে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়। তারপর হঠাৎ একদিন জেগে ওঠে। বিস্ফোরণ শুরু হয়। হাসানের নির্লিপ্ত আচরণের পিছনে তেমনি শক্তি লুকিয়ে নেই, তার গ্যারান্টি কোথায়? মাঝে-মাঝে

বিলুর তো সন্দেহ হয়েছে, হাসান তাকে যেন সারাক্ষণ ভোলানোর চেষ্টায় ব্যস্ত। একবার তো কড়া কথা বলে নি—দু-চারটে গালমন্দও করে নি। বিলু কোন দরকাবী জরুরি কাজ করে না রাখলেও তার জন্যে হাসান চটে যায়নি। এই তো ওড়িষ্যা যাবার রাতের ঘটনা মনে পড়ছে বিলুর। কেমন চুপচাপ নিজের কাজ করে গেল।

বিলুর সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে সে-রাতে হাসানেব আচরণ। সে শেখরের ব্যাপারে কিছু সংশয়ে ভুগছে, মনে হয়েছিল বলেই বিলু ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তাই একটু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল মাত্র। কিন্তু আজ কমাস ধরে শেখরের সঙ্গে মিশছে, আরও অন্তরঙ্গ মেশার দৃশ্যও হাসানের চোখে পড়েছিল, তবু তো সে গায়ে মাখেনি কিছু। হঠাৎ এমন হল কেন সে রাতে? বিলু অনেকসময় আলাদা বিছানা করে শুতে গেছে, হাসান জোর করে তুলে নিজের পাশে শুইয়েছে তাকে।

সে রাতে হাসান বিছানায় আসে নি। জেগে বসে থেকে রাত কাটাল। ভোরে ডাকলও না—চলে গেল।

এবং আগের দিনই দুপুরে সাজ্জাদের ফোন এসেছিল! সাজ্জাদ কি তাহলে অফিসে থাকতেই তাকে...

মঞ্জরী এসে বলল, 'চিকন জল খেল, বউদি। জ্বর তো ছাড়েনি। বেড়েছে মনে হল। থার্মোমিটারটা খুঁজে পেলুম না। কোথায় রেখেছেন?'

বিলু হন্তদন্ত এগোল। 'আমার বালিশের নিচে আছে। চল, দেখছি।'

জ্বর আবার বেড়েছে। আবার একশো দুই। চিকন একটু একটু গোঙাচ্ছে রাতের মত। বিলু ওর মুখের কাছে ঝুঁকে থাকল কতক্ষণ।...'চিকন, আমার চিকন! আর জল খাবে? সোনা—আমার মানিক—আমার প্রাণ। মাথা টিপে দেব?'

চিকন লাল চোখ একবার খুলে বলল, 'বাবু আসেনি?'

'না। আসবে—এসে যাবেখন। তুমি ঘুমোও।' বিলু ওর চুলে হাত বোলাতে থাকল।...'লেবু খাবে? দেব? মঞ্জরী, লেবু দাও তো ভাই।'

কতক্ষণ পরে শেখর এল। মঞ্জরীর বদলে সঞ্চিতা এসেছে। শেখরকে দেখামাত্র বিলু উঠল। ওর হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। বিলুর চেহারা দেখে শেখর অবাক। একরাতেই মানুষ এমন বদলে যায়! সেই সপ্রতিভ অতি-নাগরিকা মেয়েটি এ কী হয়ে পড়ল!

খাটের ওপর ধুপ করে বসে পড়ল বিলু। যেন হাঁফাচ্ছে সে...'শেখর, কী হবে!'

শেখর বলল, 'আপনি একটুতেই এমন ভেঙে পড়বেন, ভাবা যায় না! সত্যি, বড্ড অবাক লাগছে। খেলতে গিয়ে অমন কতবার আমার পা ফুলে ঢোল হয়েছে, একশো চার ডিগ্রি জ্বরে ভুগেছি—ভাবতে পারেন?'

'শেখর, ও তো এখনও ফিরল না! টেলিগ্রাম করে দেবে?'

'সে দিচ্ছি। কিন্তু পাবেন কি না সন্দেহ আছে।'

'শেখর!...' হঠাৎ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল বিলু।...'কাল সকালে মা হয়ে আমি চিকনেব মরণ চেয়েছিলুম! তাই এমন হল!'

শেখর অপ্রস্তুত। সে কান্নাকাটি পছন্দ করে না। বিলুবউদি সবসময় 'ইমেজের' থিওরি আওড়ায়। শেখরের চোখে বিলুবউদির ইমেজ সত্যি সত্যি ভেঙে যাচ্ছিল। সে দুটো হাত ওর কাঁধে রেখে সোজা করে দিয়ে বলল, 'বউদি, বউদি! শুনুন—একটা কথা শুনুন। হ্যাঁ—মুখ তুলুন তো!'

বিলু মুখ তুলল। ঠোঁট কাঁপছে। গালদুটো ভিজে গেছে।

শেখর বলল, 'মা হয়ে ছেলের মৃত্যু কামনা না কী বলছিলেন! শুনুন—এই আমার মা—আমার মা কেন, আমার বন্ধুদের মাও—মাঝে মাঝে আমাদের কী বলত জানেন?'—শেখর অবিকল মেয়েলি-ভঙ্গিতে নকল করে বলল, 'মর, মর, তুই মরে যা—এখুনি মরে যা! তোর মুখে চিতের আগুন উঠুক...!'

বিলু নিষ্পলক চোখে বাইরে আকাশ দেখতে থাকল।

'হ্যাঁ—জাস্ট এসব মায়েদের কথা। শুধু বাঙালি মায়েদের নয়। ইলিয়ট রোডে আমার এক বন্ধু আছে—অ্যাংলো। তার মা তো সবসময় বলে, ম্যাথু! দা সান অফ দা বাস্টার্ড, গো—গো ইনটু দা কফিন—গো অ্যাটওয়ান্স! আই মাইসেলফ ডিগ ইওর গ্রেভ!'

শেখর বিলুকে হাসাতে পারল না। তখন সে আবার চেষ্টা করল।..'বউদি, একটা মা-ছেলেসংক্রান্ত গল্প বলি শুনুন। গল্প নয়, সত্যি।...'

বিলু উঠে দাঁড়াল।...'একবার ডাক্তারবাবুকে খবর দাও, শেখর। হঠাৎ জ্বরটা কেন বেড়ে গেল।'

'ঠিক আছে। দিচ্ছি!' বলে শেখর বেরিয়ে গেল।'

বিলু ওঘরে গিয়ে দেখল টুকুন জেগে হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করছে। বুক টনটন করছিল কতক্ষণ থেকে। ওর মাই খেলেই টুকুনের অম্বল হয়ে যায়। বাথরুমে গেলে ফেলে দেয়। এখন দারুণ মাতৃভাব ওকে পেয়ে বসেছে বলে টুকুনকে তুলে মাই দিল। টুকুন চুষেই ছেড়ে দিল। কেঁদে উঠল। বিলু একটু হাসল।...'পছন্দ হচ্ছে না—না রে? রেখা, ওর দুধের শিশি কই?'

সঞ্চিতা টেবিল থেকে এনে দিল।...'একটু গরম আছে যে!'

'থাক্। ওই খাবে। আমার দুধ ওর আর মিষ্টি লাগে না।'

হাসান এই বিলুকে দেখলে মনে মনে খুশি হত। এখন সে কোথায় হয়ত ট্রেনের অপেক্ষায় চুপচাপ বসে আছে।...

আবার একটা রাত গেল। দিন এল। চিকনের জ্বর ছেড়ে গেল। পরের রাতটা আর জ্বর এল না। পায়ের ফোলাভাবটা কমে স্বাভাবিক হয়ে উঠল। হাসান এল না।

পরের দিনও হাসানের খবর নেই। টেলিগ্রাম করা হয়েছিল, তবু। শেখর বলল, 'আজকাল টেলিগ্রামের চেয়ে চিঠি আগে পৌছয়। আসলে আমার মনে হয় কী জানেন বউদি? এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় আছেন যে সেখানে পোস্টম্যান যায় না। হয়ত ভীষণ জঙ্গল—দুর্গম পাহাড়ি এলাকা।'

আনমনা বিলু বলল, 'তাও হতে পারে।' সে তখন খবরের কাগজ ওল্টাচ্ছে। যখনই ফাঁক পায়, একই দিনের কাগজ একবার করে খুঁটিয়ে দেখে। সকাল থেকে রাতে শুতে যাবার সময় অব্দি এরকম।

নাঃ, কাগজেও সেরকম কোন খবর নেই। দুর্ঘটনা, খুনখারাবি, হোটেলের বিছানায় লাশ ইত্যাদি থাকেই সচরাচর। কিন্তু ঠিক যে খবর চায়, তেমনটি নেই।

কিন্তু আবার একটা নতুন ভয় তার সঙ্গ নিল। কলিংবেল বাজলেই ভাবে—ওই যাঃ! পুলিশ এল না তো? ওদের কিছু বিশ্বাস নেই। টাকা খেলেই বা কী! ওদের কোন ধর্মাধর্ম মরালিটি বিবেকবোধ বলতে তো কিছু নেই। ভয় দেখিয়ে একজনকে কোলকাতা থেকে তাড়াতে বলে এসেছিল হারুন গুণ্ডাকে। হারুন উৎসাহের চোটে খুনখারাবি করে বসতে পারে—ভয়টা এখানেই। সেজন্যেই খবরের কাগজে হন্তদন্ত চোখ বুলোয় বিলু। বুক ঢিপঢিপ করে ওঠে। যে গোঁয়ার লোক—হয়ত উল্টে হারুন বা তার লোককে মারতে এসেছিল, তখন ছুরি চালিয়ে দিয়েছে পেটে। বিলু ভয়ে নীল হয়ে যায় আবার।

চিকনের অসুখ সেরেছে, কিন্তু মেজাজ আগের চেয়ে তিরিক্ষি! মা যে এত করল, তার প্রতি নজরই ছিল না যেন। কী ছেলে পেটে ধরেছিল বিলু! শেখর ঠিকই বলে—'চিকন এ ফ্ল্যাটের নাম্বার ওয়ান রিবেল।'

পরদিন সকালে বিলু আর চুপ করে থাকতে পারল না। প্রতিভা হোটেলে ফোন করে দেখলে হয়। পরক্ষণে ভয় হল—যদি কিছু মন্দ ঘটে থাকে, এভাবে তেরনম্বর ঘরের লোকটি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া কি ঠিক হবে? পুলিশ দরকার হলে এক্সচেঞ্জ অফিস থেকে সব খবর নাকি বের করতে পারে—কে কত নম্বর থেকে এইমাত্র ফোন করেছিল ওখানে।

ফোনগাইড হাতে ধরে সে ভাবতে থাকল। এ খুব বিপজ্জনক ঝুঁকির ব্যাপার। প্রতিভা হোটেলের ত্রিসীমানায় তার যাওয়া উচিত নয়।

আর একটা উপায় তালতলা গিয়ে হারুনের কাছে খবর নেওয়া। কিন্তু সেখানেও একই ভয়। পুলিশ সব পারে। কোথায় ফাঁদ পেতে রেখেছে, কোন ঠিক নেই।

অতএব থাক। যা হবার, হবে। বিলু দাঁতে ঠোঁট কামড়ে চারটে ঘরে অকারণ ঘুরল। এটাওটা নাড়াচাড়া করল। সেই মাতৃত্বের ভাবটা আর মনে কোথাও নেই। গালের একটা জায়গা আবার হু হু জ্বলে উঠেছে। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। গাল লক্ষ্য করল। কোন দাগ নেই। কোন ক্ষত গজিয়ে ওঠেনি। কিন্তু মাংস কেটে একদলা ঘৃণার মতন কদর্য কিছু থু থু রক্তে গিয়ে মিশেছে। চোয়াল শক্ত হয়ে গেল বিলুর। এ জ্বালা কি প্রতিহিংসার জ্বালা? গাল থেকে মাথা, মাথা থেকে বুক—স্নায়ুতে শিরায় ধমনীতে হু হু করে জ্বালার স্রোত বইতে থাকল। সে নিজের চোখ দুটো লাল হতে দেখল। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হতে দেখল। তারপর তার চেহারা ঠেলে কী একটা ভয়ঙ্কর বেরিয়ে আসতে চাইল।

মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, শেখর এসে দুহাতে ধরে ফেলল। তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল। একটু ঝুঁকে ডাকল, 'বউদি, বউদি, কী হল হঠাৎ?'

বিলু চোখ খুলে মৃদু হাসল। মাথা দোলাল একটু।

'মাথা ঘুরে উঠেছিল?'

'কে জানে!'

'যা ধকল গেল! এত রাত জাগলেন—তার ওপর সব অদ্ভুত ঝামেলা। চুপচাপ বিশ্রাম নিন কয়েকটা দিন। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বিলু উঠে বসল...'আমার কিছু হয়নি।'

শেখর শশব্যস্তে বলল, 'আরে না না—উঠবেন না! নার্ভাসনেস অনেক সময় বড্ড ক্ষতি করে। দিদি সেবার প্রায় মাসখানেক ভুগল—বারণ শোনে নি, তাই।'

বিলু চোখ পাকিয়ে বলল, 'আমার কিছু হয়নি।'

'কিছু হয়নি যদি, আমার সামনে থেকে বিছানায় গেলেন কেমন করে?'

বিলু একটু হাসল আবার। 'দুষ্টু ছেলে! তোমার গায়ে অত জোর নেই।'

'দুষ্টু ছেলে। হ্যাঁ—গাল টিপলে দুধ বেরোয় আমার। দেখুন বউদি, চেষ্টা করে বয়স্কা প্রবীণা হওয়া যায় না। ওটা আপনি আসে বয়সের সঙ্গে।'

'আমাকে যদি কেউ দুষ্টু মেয়ে বলে আমার খুব আনন্দ হয়, শেখর।'

শেখর গম্ভীর মুখে প্রবীণ সেজে বলল, 'দুষ্টু মেয়ে, চুপচাপ শুয়ে থাকো তো!'

'শেখর, আমাকে আপনি বল কেন? তুমি বললেই পার।'

'বলব।'

'বলব নয়, এক্ষুনি বল।' বলে বিলু দুহাতে খোঁপাটা গোছাতে থাকল। আশ্চর্য, সেই জ্বালাটা কোথায় গেল? একটা অন্ধ সুখ চেপে বসেছে সারা দেহে।..'শেখর, আশা করি, এতদিনে আমরা অনেক কাছাকাছি চলে এসেছি। আর আপনি-টাপনি ভাল লাগে না।'

শেখর হাসতে হাসতে বলল, 'কাছাকাছি? হ্যাঁ—সে তো ঠিকই। মাত্র একটা ছাদের ব্যবধান এই যা। আপনি ওপরে, আমি নিচে।'

'ফের আপনি বললে কথার জবাব দেব না কিন্তু।'

'ঠিক আছে। আপনি শব্দটা ডিলিট করলুম। জবাব আমি চাই না—চাই না।'

'শেখর, তুমি বল।'

বিলুর কণ্ঠস্বরে সত্যিকার জেদ টের পেয়ে শেখর বলল, 'ঠিক আছে। আমাকে তুই বলতে হবে।'

'কেন?'

'বারে! আমি তো বয়সে ছোট।'

'বেশ, বলব।'

'এক্ষুনি।'

বিলু ফিক করে হেসে ফেলল।...'শেখর চল্ না ভাই—আজ কোথাও বাইরে ঘুরে আসি রে! মাইন্ড দ্যাট, ডবল তুই বললুম।'

শেখর একটু ভেবে বলল, 'কোলকাতার বাইরে? বেশ তো বোটানিকাল গার্ডেনে চল। ভ্যাট, ডাবল ইমপসিবল!'

বিলু বাইরে আকাশ দেখে নিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছ—সরি! বলেছিস। চল্, খেয়েদেয়ে বেরোব।'

শেখর অবাক।...'সে কী! ইয়ার্কি করে বললুম—আর সঙ্গে সঙ্গে স্যাংশনড। এই গরমে অদ্দূর যেতে নেই।'

বিলু উঠে দাঁড়াল।...'না—আমার এক কথা। তোমাদের—থুড়ি তোদের...দ্যাখ শেখর, প্রথম প্রথম একটু গুরুচণ্ডালী দোষ হবে। হোক। চালিয়ে যাই। তা যা বলছিলুম, তোদের হের ডকটর যতক্ষণ নেই, ওড়াউড়ি করে নিই প্রাণভরে। আর শেখর, এবেলা তোর নেমন্তন্ন। বাড়িতে বলে আয় কেমন?'

'কী খাওয়াবে?'

'ওই তো! বামুনের নোলায় জল গড়াচ্ছে তো!'

'অভ্যাস!'

'ও শেখর, জানিস? তোরা যেমন বামুন, আমরা—মানে আমার বাবার বংশ মুসলমানদের কুলীন বামুন। আমরা সৈয়দ তা জানিস তো?'

'তোমার হের ডক্টর?'

বিলু মুখ টিপে হেসে নাক কুঁচকে বলল, 'স্রেফ শূদ্দুর—চাষবাস পেশা।'

'তাহলে বিয়ে হল কেমন করে?'

'হবে না কেন—দুজনেরই ধর্ম এক যে।'

'সেও তো ঠিক। আমাদের মত বর্ণাশ্রম নেই তোমাদের। অবশ্য আজকাল ওসব কে আর মানে! আমাদের এখন প্রায়ই অসবর্ণ বিয়ে হচ্ছে।'

'কী বললি? অসবর্ণ?'

'হ্যাঁ। শোননি কথাটা?'

'ভ্যাট! মনে ছিল না। ও শেখর, আমার বিয়েটা তাহলে বামুনে-শূদ্রে—অর্থাৎ অসবর্ণ বিয়ে। তাই না?'

'হিন্দু শাস্ত্রমতে তাই।'

বিলু কী ভাবতে থাকল। একটু পরে বলল, 'শেখর, বর্ণ তো চার রকম—তাই না?'

'ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র। আসলে এই চতুবর্ণাশ্রম সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিল অর্থনীতি। সামাজিক বৃত্তি অনুযায়ী...'

বিলু হাত তুলে বলল, 'থাম! আমি তোর ছাত্রী নই। ওসব একসময় মুখস্থ করতুম রাত জেগে। আমি ভাবছি—হ্যাঁ ঠিক বলছিলি, সামাজিক বৃত্তি—বৃত্তি মানে তো প্রফেশন?'...

'হুঁ। কেন?'

'ধর, কোন মেয়ের প্রফেশন—ভালবাসা! ক্রিয়াপদ হিসেবে বলছি ভালবাসা...'

'ভ্যাট! ও কি প্রফেশন হয়? অবশ্য দেয়ার আর গার্লস—হু মেক লাভ, সোজা কথায়...' জিভ কাটল শেখর।...'মারবে না তো?'

'বুঝেছি—তুই কাদের কথা বলছিস।...প্রসটিট্যুটস তো? ওতে লজ্জা কিসের? না—আমি বলছি, এমন সব মেয়ের কথা—যারা আমাদের সমাজেই আছে। তাদের জীবনের একটি মাত্র লক্ষ্য থাকে—টু লাভ সামবডি—শুধু চায় ভালবেসে জীবন কাটাতে। তাদের ঘরকন্না-সংসার-স্বামীভক্তি—সবকিছু কখনও একটা উপায় বা মীনস, কখনও নেহাৎ শো—তাদের অবজেকট বা লক্ষ্য প্রেম। তাদের কী বর্ণ বলি রে?'

'বর্ণ সবসময় অর্থনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বউদি।'

'না বুঝে তর্ক করিসনে শেখর। মেয়েদের জীবনেও অর্থনীতি জড়িয়ে আছে। অত ব্যাখ্যা করাব সময় আমার নেই।'

'তবে বলে যাও, শুনে যাই।'

'এই মেয়ের বর্ণকে কী নাম দেব, ভেবে পাচ্ছিনে।'.. বিলু খুঁজতে থাকল।

'প্রেমবর্ণ। পাঁজিমতে প্রেমবর্ণ আর গণ হচ্ছে অপ্সরা—অপ্সরা গণ। ওঃ, দারুণ! প্রেমবর্ণ অপ্সরাগণ। বলে যান।'

বিলু কথা খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হল। ভ্রূ কুঁচকে শেখরের মুখের দিকে তাকাল। তারপর হেসে ফেলল। শেখর বলল, বউদি, তুমি—বুঝলে, তুমি একটা আস্ত পাগল! যাও, রান্না করো গে। আজ কিন্তু হাসানদা আসছে—আই জাস্ট স্মেল। বেশি করে রাঁধবে। মুরগি আনছ তো? নাকি সেই মাছের কোরমা?'

বিলু ওর কাঁধে ছোট্ট একটা কিল মেরে কিচেনে গেল। মনটা প্রসন্ন হয়ে গেছে! তার এ মনটা এত রহস্যময়। কখন কী হয়, টের পায় না। এখন কী নিশ্চিন্ত লাগছে! কোথাও বিপদের ব্যাকটিরিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে পিলপিল করে এগোচ্ছে কিনা আর দেখা যাচ্ছে না।

অথচ বিপদটা মিথ্যাও নয়। আছে কোথাও আনাচে-কানাচে। সাজ্জাদ কিংবা স্বয়ং হাসান—পিছনে বা সামনে দুটি পুরুষের আড়ালে মুঠিতে লুকনো ছুরির মত বিপদ। বিলু বলল, 'রেখা, এবেলা আমি রাঁধব। শোন, তুই কিছু মশলা বেটে রাখ। দ্যাখ তো কী আছে—কী নেই?'

রেখা বলল, 'সব আছে।'

'আন্দাজে সব আছে! পেঁয়াজ রসুন আদা জিরে লঙ্কা ধনে... আর কী যেন, গরম মশলা, আছে?'

'সব আছে।'

'তেজপাতা?'

'হুঁউ।'

'ঘি কতটুকু আছে?'

'গোটা কৌটোটা খরচ হয়নি।'

'বাঃ!'...বিলু কৌটো খুলে পরিমাণ অনুযায়ী একটা বড় প্লেটে সাজিয়ে রাখল। 'খুব পিষে ফেলবি কিন্তু। ছিবড়ে না থাকে।'

চিকন আস্তে আস্তে এল। ঝুমঝুমি পিছন থেকে বলল, 'মা, চিকন গন্ধ পেয়েছে—টনক নড়েছে।'

বিলু মশলা রেখে ওর চিবুকে হাত রেখে বলল, 'আজ দুটো খাবে।'

চিকন একটু গলল।..'মা, কাগজে দেখলুম—আবার হাটারি ছবিটা এসেছে। দেখব।'

'দেখবি বইকি। একসঙ্গে দেখব। আমার টুকুনও দেখবে।'...বিলু ওর কাঁধ ধরে খাবার ঘরে এল। ছোট্ট খাটে টুকুন হাত পা ছুঁড়ে খেলা করছে। রঙীন বেলুনটা ধরার চেষ্টা করছে। বিলু তাকে আদর করতে থাকল।...'টুকনছোনা কী দেখবে রে? হাটারি।'

শরীরটা কিন্তু সায় দিচ্ছে না। দুর্বল মনে হচ্ছে। বিলু মাথাটা দুহাতে টিপে ধরল। একটা ট্যাবলেট খেতে হবে। চিকন ঝুঁকে টুকুনকে দেখতে লাগল। বিলু বলল,—'ঝুম, একবার মঞ্জরীকে ডাকবি? তোরা থাকবি—আমি চট করে নিউ মারকেট ঘুরে আসি ওকে নিয়ে। মুরগী আনব।'

ঝুমঝুমি বলল, 'আমি যাব, মা!'

চিকন ভেংচি কাটল।...'অ্যাম্মি গ্যাবো ম্যাঁ। বাবু আসবে—তুই যাবিনে।'

ঝুমঝুমি তেড়ে গেল।...'ওরে হিংসুক! আমি যেতে চাইলে ওর কষ্ট হয়। বিছানায় শো গে না—দাঁড়িয়ে কেন? আঁঃ উঃ, করগে না!'

বিলু মেয়েকে ধমকাল।...'আবার অসুস্থ ছেলেটার সঙ্গে ঝগড়া করছিস? যা বলছি, শোন। মঞ্জরীকে ডেকে আন্।'...

মঞ্জরী এল একটু পরে। ওকে নিয়ে বিলু বেরল। বাইরে সে ট্যাকসি—অগত্যা রিকশো ছাড়া চলেই না। তাই বিলু ডাকলে সবাই তার সঙ্গে যেতে চায়।

খেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই বোটানিকাল গার্ডেনস যাওয়া হল না। কিন্তু বিলুর মাথায় যা আসে, তা হওয়া চাই-ই। গঙ্গার ধারে বিকেলটা কাটল। ছুটির দিন—তাই প্রচণ্ড ভিড় বাড়ছিল ক্রমশ। সন্ধ্যার দিকে ফোর্টের কাছে মোটামুটি নির্জন ঘাসের মাঠ খুঁজে নিয়ে বিলু আর শেখর বসল। বসল না ঠিক—কাছাকাছি অর্ধশায়িত অবস্থান করল। একটা ফিকে জাফরান রঙের ভাঙা চাঁদ গঙ্গার আকাশে দেখা যাচ্ছিল। খুব বেশি কথা হচ্ছিল না আজ। যা হল, তা বাইরের ব্যাপার নিয়ে। নিজেরা পরস্পর আড়ালে লুকিয়ে থেকে যেন লড়াই চালিয়ে গেল। লড়াই? দুজনে মৃদুভাবে অনুভব করছিল তাই। আক্রমণ কিংবা আত্মরক্ষা—দুটো ব্যাপারেই কত জিনিস দরকার হয়।

ওঠবার সময় দুজনেরই মনে হল—আজই কী একটা বলার ছিল, যাকে বলে সোজাসুজি পষ্টাপষ্টি—বলা হল না। অথচ বলা উচিত। খুব দেরি হয়ে যাবে ক্রমশ। এর পর সব অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু দুজনের মনেই ভয়—কে জানে কোনজনেরটা উল্টো, যারটা নেগেটিভ সে ভাবল অন্যটা যদি পজিটিভ হয়, অন্যজনও এরকম ভাবল—অবচেতনে, এবং বিস্ফোরণের তাপ কি সইতে পারবে কিংবা কী হবে পরিণতি—চুপচাপ উঠে পড়ল।

দোতলার ফ্ল্যাটে শেখর ঢুকে যাচ্ছিল—বিলু হতে ধরে টানল।...'বারে! ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেছিস, আর ঘবে পৌঁছে দিবিনে?'

শেখর একটু হাসল।...'আমি বের করিনি। তুমিই বেরিয়েছিলে বউদি।'

'তাই, হল। আয়। চা খেয়ে যাবি।'

'মাথা ধরে গেছে।'

'চায়ে মাথা ছাড়ে। তাছাড়া আমার স্টকে কয়েক শো রকম ট্যাবলেট আছে।'

অগত্যা শেখর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল। বিলু তার একটা হাত ছাড়েনি। হঠাৎ শেখরের মনে হল, বিলুবউদি নিজের শরীরের সব ভার তার হাতে চাপিয়ে দিচ্ছে ক্রমশ। তার গায়ে কাঁটা দিল। আজ কী একটা গোলমাল ঘটে গেছে কখন—অজ্ঞাতসারে। পা দুটো ভারি লাগছে। না—ঠিক এভাবে—এই চোখে কোনদিন নিজেকে দ্যাখেনি সে। বিলুবউদিকেও দ্যাখেনি। নিজেকে কেমন নতুন লাগছে।

বিলু চাপাস্বরে বলল, 'রেডি! একসঙ্গে জোড়া আঙুলে সুইচ টিপব কিন্তু।'

এ কী খেলা বিলুবউদির! ভিতরে ঢং করে আওয়াজ হবার আধমিনিট পরে দরজা খুলল। দুজনে চকিতে হাত ছেড়ে দিল। হাসান একটু সরে দাঁড়াল। মুখে হাসি—'এস, শেখর!'

বিলু দ্রুত ঢুকে গেল ঘরে নিঃশব্দে। শেখর বলল, কখন এলেন? টেলিগ্রাম পাননি?'

'ভেতরে এস।'...বলে হাসান পা বাড়াল। শেখর ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বসবার ঘরে চলে গেল। 'বস শেখর।'

শেখর বসল।

'টেলিগ্রাম পেলুম আজ সকালে। যেখানে ছিলুম, একেবারে জঙ্গুলে জায়গা। তারপর পাহাড়ী নদীর ব্যাপার। হঠাৎ হুড়মুড় করে বান এসে গেল। সেই জল নামতে দুদিনের ধাক্কা। তারপর টেলিগ্রাম—'

'চিকন সেরে গেছে।'

'হ্যাঁ। শুনলুম সব। যা খচ্চর ছেলে। তোমার খবর কী?'

'ভাল। হাসানদা, ওখানে কোথায় একসক্যাভেশন হচ্ছে? কী ব্যাপার?'

হাসান হেসে উঠল—হাসবার সময় দুহাত একটু তুলে ফেলা ওর মুদ্রাদোষ। বলল, 'আর বোলো না। সবখানেই আজকাল আড়াই হাজার বছরেব ওদিক ছাড়া কিছু মেলে না। বেগাস! পণ্ডশ্রম! কারণ টেস্টে বেবিয়ে পড়ল জাবিজুরি। আসলে চমক সৃষ্টি না করতে পারলে তো আজকাল পাত্তা পাওয়া যায় না।'

শেখব বলল, 'উঠি হাসানদা। বউদির কদিন করাত্রি যা গেল—ভাবা যায় না! তাই আজ বললুম, চলুন—একবার ময়দানে ঘুবে আসবেন।'

হাসান বলল, 'আচ্ছা ভাই—আবার এস কিন্তু।'

শেখর অকারণ একবার চড়া গলায় 'বউদি—চললুম' বলে বেবিয়ে গেল।

ওঘরে বিলু কাপড় বদলাচ্ছিল, তখন হাসান এল।...'কী? মাথা ঠাণ্ডা হল?'...বলে বিলুর দিকে চোখ টিপে হাসল।

বিলু মুখ নামিয়ে বলল, 'আমার মাথা তো গরম হয়নি। তোমারটা ঠাণ্ডা হল নাকি, তাই শুনি।'

'আমার মাথাই নেই—তো ঠাণ্ডা বা গরমের প্রশ্ন।'...বলে হাসান ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল।...'খুব ঝড় গেছে মনে হচ্ছে?'

বিলুর চোখ দুটো জ্বলে উঠল।...'ছেলের অসুখ নিয়ে রসিকতা করতে পারছ?'

'না—সে ঝড়ের কথা বলিনি। তোমার চেহারা এমন হল কেন?'

'কেমন?'

'রাত জেগে ছেলের সেবা করেছ—জানি—শুনেছি সব। কিন্তু চেহারায় এ ছাপ অন্যরকম।'

বিলু কথা বলল না। শাড়িটা পায়ে ঠেলে এককোণে সরিয়ে দিল।

হাসান বলল, 'যাবার সময় তোমাকে ওঠাই নি—ভাবলুম ঘুমোলে নার্ভ শান্ত হবে তাই।'

বিলু তাকাল।

'কাছে এস, বিলু। মনে হচ্ছে কদ্দিন তোমাকে দেখিনি!'

বিলু নিষ্পলক তাকিয়ে রইল।

'কী হয়েছে তোমার? বিলু, কেন এমন দেখাচ্ছে তোমাকে? ছেলের অসুখ—না বিলু, আমি বিশ্বাস করিনে! তুমি জান না—যাবার পর প্রতিমুহূর্তে এত ছটফট করেছি—মনে হয়েছে, খুব অবিচার করে এসেছি তোমার প্রতি। সবসময়ে ভেবেছি, একটা চিঠি লিখে ক্ষমা চাইব—'

বিলু আস্তে বলল 'কেন আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? দোষ তো আমিই করেছি। আলাদা শুয়েছিলুম। কিছু গোছগাছ করে রাখিনি।'

'না বিলু।' হাসান একটু আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ছিল ক্রমশ...'আমি ইদানীং কেমন যেন হয়ে পড়েছি। এমন ছিলুম না—তুমি তো বারোবছর ধরে দেখছ। তুমি যাতে কষ্ট পাও, তেমন কাজ বিন্দুমাত্র করতে চাই-নি—অথচ...'

আচমকা বিলু ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে। ফুলে-ফুলে কাঁদতে থাকল। রেখা এসে পড়েছিল, তক্ষুনি পালিয়ে গেল। ওঘরে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এই, তোমরা এখন ওঘরে কেউ যেও না! তোমাদের মা খুব কাঁদছে—বাবু কাঁদছে। এখন যেতে নেই।' ...

অনেক রাতে—গীর্জায় বারোটার ঘণ্টা বেজেছে তখন—বিলু হাসানের বুকে মাথা রেখে বলল, 'একটা ভীষণ নতুন কথা শোনাতে চাই তোমাকে—জানিনে কী ভাবে নেবে—তবু আমাকে ক্ষমা করবে তো? বল?'

'নিশ্চয় করব। বল—বারোটা বছর খুব কম নয়, বিলু। এই বারোটা বছর ধরে একটা কঠিন ভিত গড়ে উঠেছে। সহজে এ ভাঙবার নয়। তাছাড়া, চিকন ঝুমঝুমি টুকুন—ওরা তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে! কোন রিস্ক নেই—তুমি বল।'

বিলু টেবিল ল্যাম্পটা নিবিয়ে দিল। তারপর মুখ তুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।...'হাসি পাওয়া উচিত তোমার। অদ্ভুত একটা ব্যাপার!'

'আচ্ছা, বল না!' হাসান ওকে জড়িয়ে ধরল।

'বলছি।' বলে একটু চুপ করে থাকার পর এবার একটু শব্দ করে হাসল বিলু।...'ভ্যাট্‌, লজ্জা করছে।'

'লক্ষ্মী মেয়ে লজ্জা করে না।'

বিলু ওর মুখের ওপর ঝুঁকে দুম করে বলে বসল, 'জান—আমার আরও একবার বিয়ে হয়েছিল?'...পরক্ষণেই কান পাতল। সারা দেহে চেতনা নিয়ে প্রস্তুত হল সে। সেকেন্ডে শুনতে থাকল।

হাসান খুব আস্তে বলল, 'জানি, বিলু।'

'জান? তুমি জান?'...বিলু হাঁস-ফাঁস করে উঠল।

'হ্যাঁ—জানতুম।'

'জানতুম!' বিলু আর্তস্বরে বলল...'কবে থেকে জানতে? কে বলেছিল তোমাকে?'

'তোমার মা মারা যাওয়ার আগে আমাকে সব বলে গিয়েছিলেন।'...হাসান খুব শান্তভাবে বলল।...'তোমার মনে পড়ছে কি? আমি ডাক্তারের কাছে যেতে চাইলুম—উনি যেতে দিলেন না। আমার একটা হাত আঁকড়ে ধরলেন। তখন তোমাকে বললুম—তুমি ডাক্তার ডাকতে গেলে। ঘরে তখন কেউ ছিল না—উনি সব বললেন। আমার হাতের ওপর মাথা রেখে বললেন, তুমি আমার ছেলে হাসান—কথা দাও, এর জন্যে বিলুকে কোন দুঃখ দেবে না। কথা দিলুম।'

'ফিরে এসে মাকে দেখলুম, চলে গেছেন।'

'হ্যাঁ, তোমাকেও খুঁজছিলেন—পেলেন না। হয়ত এ নিয়ে কিছু বলতেন।'

কিছুক্ষণ দুজন চুপ করে থাকল। বাইরে রাস্তার গাছগুলো শন শন করল গ্রীষ্মরাতের বাতাসে। গাড়ির শব্দ হল। একবার কুকুর ডাকল। তারপর বিলু বলল, 'কেন তুমি আমাকে তারপর কিছু বল নি?'

'বলি নি—হয়ত অপ্রস্তুত হবে, লজ্জা পাবে—আমার কাছে অত দিন সব লুকিয়ে রেখেছ বলে।'

'আশ্চর্য! এই বার বছর ধরে সব গোপন করে আসছ!'

'তুমিও তো আসছ, বিলু।'

বিলু মৃদু কান্নায় আবিষ্ট হয়ে বলল, 'ভেবেছিলুম, তুমি আমাকে ঘেন্না করবে—মায়ের মিথ্যা বলার প্রতিশোধ নেবে আমার ওপরে।'

হাসান অস্ফুট হাসল। পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'নাও, হয়েছে। ঘুমোও।'

বিলু বলল, 'তুমি যাবার দিন সেই লোকটা এসেছিল!'

বিলু ভাবল, হাসান বলে উঠবে কোন লোক্টা—কিন্তু হাসান তা বলল না। বলল, 'শুনলাম। আলমারির কাচ ভেঙেছে, ফুলদানি ভেঙেছে! চিকন সব বলেছে আমাকে।'...পরক্ষণে সকৌতুকে বলে উঠল—'কোন আশা দাও নি তো ভদ্রলোককে?'

বিলু তীব্র ঝাঁঝাল ঘৃণায় বলল, 'চোর মাতাল জুয়াড়িকে একটা আশাই দেওয়া যায়। জেলে দেবার আশা। আর শোন, তুমি আমার স্বামী—তোমার স্ত্রীকে যে অপমান করতে আসে, তার শাস্তি তুমি দেবে না?'

'বল, কী করতে হবে?'

'ও শেয়ালদার কাছে প্রতিভা হোটেলে উঠেছে—তের নম্বর ঘরে। ঠিকানা দিলুম। এবার দেখতে চাই, স্বামীর কর্তব্য কীভাবে পালন কর।'

'ঠিকানা পেলে কোথায়?'

বিলু সেকথার জবাব না দিয়ে বলল, 'ওর একটা কিছু না হওয়া অব্দি আমার জ্বালা যাবে না।'

'দেখব। এখন ঘুমোও।'

বিলু ওর ঠোঁটে ঠোঁট নামিয়ে বলল, 'আজ আরও কিছুক্ষণ জেগে থাকি না!'

৮

দুপুরে অফিস থেকে হাসান রিঙ করল।...'কে বলছ? বিলু? শোন, প্রতিভা হোটেলের ব্যাপারটা খোঁজ নিলুম। তের নম্বরে কে এক সাজ্জাদ হুসেন ছিল—বাংলাদেশ থেকে এসেছিল—গত বুধবার সকাল দশটার মধ্যেই চেক আউট করেছে বলল।'

'গত বুধবার!'...বিলু ঠোঁট কামড়ে ধরল। বিলু সেদিনই তো সাজ্জাদের কাছে গিয়েছিল!

'হ্যাঁ। হোটেলের লোকই স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল। ভদ্রলোক বাংলাদেশে ফিরে গেছে।'

'ঠিক বলছে তো?'

'মিথ্যে বলবে কেন? ট্রেনে তুলে দিয়েছে বলল। যাকগে—তুমি নিশ্চিন্ত হলে তো?'

'হেসো না। গা জ্বালা করে।' (জ্বালা করবে না? হারুন গুণ্ডা হাজারটা টাকা মেরে দিল।)

'বিলু এখন কী করছ?'

'টুকুনকে স্নান করাতে যাচ্ছিলুম।' (হারুন টাকাটা কি ফেরত দেবে?)

'এবেলা কোথাও বেরোচ্ছ নাকি?'

'কিচ্ছু ঠিক নেই। কেন?' (নাঃ গুণ্ডার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সাহস নেই।)

'ভাবছিলুম দুটো টিকিট এনে রাখি—ইভনিং শোর।'

'বাহাদুর! হঠাৎ এ শৌখিনতা কেন?'

'কী আশ্চর্য! কখনও দুজনে একসঙ্গে দেখি নি সিনেমা?'

'দেখেছ—বারো বছরে বারো বার।'

'আসলে কী জান, সিনেমা-টিনেমা আমাকে বড্ড বোর করে!'

'তুমিও তো শেখরের দলে।'

'শেখর সিনেমা দেখে না বুঝি?'

'শোন—তাই কর। আমি তৈরি থাকব।...হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো!'

'শুনছি, বল।'

'এক কাজ কর বরং। টিকিট—দুটো নয় চারটে নিও। কোন হলে হাটারি নামে একটা বন-জঙ্গলের ছবি হচ্ছে দেখে নিও। কেমন? চিকন বেচারা বলছিল—মনটা ভাল হবে। ঝুমঝুমিও দেখবে। লক্ষ্মীটি, একেবারে আপার ক্লাশ নিশ্চয় পেয়ে যাবে—ভিড় হচ্ছে শুনলুম।...হ্যালো, হ্যালো!'

'হ্যাঁ।'

'শুনলে কী বললুম?'

'হুঁ।'

'ছেড়ে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা!'...

বিলু ব্যস্ত হয়ে উঠল। ও ঘরে গিয়ে ডাকল—'চিকন, ঝুমি! ইভনিং শোয়ে আজ সবাই মিলে সিনেমা দেখব রে! টিকিট আনতে বললুম।'

ওরা নেচে উঠল। বিলু টুকুনকে আদর করতে করতে বাথরুমে ঢুকল। মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে টুকুনকে উরুর ওপর রাখল। শান্ত ভদ্র শিশুটি হাসছে। বিলু খুব আস্তে সাবধানে সাবান বোলাতে থাকল ওর বুকে, পেটে, পা দুটোয়।...'আমার টুকুনছোনা কবে বড় হবে। হাটারি দেখবে! বাঘ-ভাল্লুক দেখবে।...ঝুমি, মা আমার, ডেটলের শিশিটা পেড়ে দাও! ও চিকন, আজ চান করবি নাকি? না বাবা—আজ থাক। গা মুছে শুধু মাথাটা ধুবি। একটু অপেক্ষা কর, আমি ধুইয়ে দেব।..' তারপর টুকুনের কান্নার মধ্যে বিলু গুনগুন করে গাইতে লাগল—'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে...'

খুরশিদ ম্যানসন ঘিরে আজ উদ্দাম পাগলাটে হাওয়া অবশ্য বইছে। কিন্তু আকাশ জুড়ে গনগনে প্রচণ্ড নীল—জ্বলজ্বলে রোদ গাছপালার ডালে-পাতায়, বাড়ির কার্নিশে, ছাদে, জলের ট্যাঙ্কে গড়িয়ে গড়িয়ে ছলকে পড়ছে। রাস্তার কালো পীচ গলে যাচ্ছে। দূরে মেয়েদের কলেজের গেটের পাশে তরুণ শিমুল ফুলে-ফুলে রাঙা। কৃষ্ণচূড়াও ফুটেছে। এখানে-ওখানে বুগানভিলিয়ার রঙীন ঝাঁপি। ও রাস্তায় গাড়ি চলে কম। দু-এক মিনিট অন্তর অন্তর একবার করে নিখাদ শূন্যতা ভেসে উঠছে ফিলমের 'ডিজলভে'র মতন।

প্রতিশ্রুত সব পারিবারিক দায়িত্ব চুকিয়ে বিলু যখন বাথরুমের দরজা বন্ধ করল, তখন তার ঠোঁটে সেই বাদল দিনের গানটা রঙের মতন লেগে রয়েছে—একটা মোহ চেপে বসে আছে, ধুয়ে যায় না।...'যা না চাইবার তাই কোথা পাই গো।' গাইতে গাইতে সে অতিধীরে ব্লাউস খুলল, ব্রেসিয়ার খুলল, সায়ার ফাঁস খুলে দিল, তারপর চুল খুলে ফেলল। চুলগুলোকে বুকের দিকে দু পাশে বয়ে যেতে দিল। স্তনদুটো ঢেকে রাখল কয়েক মুহূর্ত। ঝরনার চাবি খুলে দিল একটুখানি। ঝির ঝির জল পড়তে থাকল।...'পাব না, পাব না, মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে...।' কাল ফোর্টের মাঠে সন্ধ্যাবেলায় কী

একটা অসম্ভবের দুয়ারখোলার প্রবল চাপ আসছিল ভিতর থেকে—এই চাপের শব্দহীন যন্ত্রণাটা রাত্রি আসার মতন সব অস্পষ্ট করে ফেলছিল। এই তো হয়। সবচেয়ে কঠিন কথাটা বলতে বাধে না।—সহজতমটাই এসে আটকে যায়। হ্যাঁ—এমনি হয়। যা রোদের মতন, বৃষ্টির মতন, সূর্যের মতন সহজ আর স্বাভাবিক, যা প্রকৃতির অনিবার্যতা—তার দিকে আঙুল তুলে কে বলে ওঠে, ওই দ্যাখ রোদ, দ্যাখ বৃষ্টি, কিম্বা আরে, ওটা তো সূর্য! দেখিয়ে দিলেও কি কাজ হয়? যাকে বলি, সে বলে—বেশ তো, রোদ আছে—থাকে, তাতে কী? সে আসলে কবে থেকে বিস্মিত হতে ভুলেছে। সব সয়ে গেছে তার চোখে। হায়, এত বৃষ্টি এত গনগনে সূর্যটা নিয়ে এদিকে আমার জ্বালা! প্রহরে-প্রহরে মুহূর্তে-মুহূর্তে তুমি সব গায়ে নিচ্ছ, তবু নির্বিকার—তুমি নির্লিপ্ত। আর আমার কী হচ্ছে? আমি কখনও জ্বলছি, কখনও হু হু কাঁদছি!

...কাল ও খুব কম কথা বলছিল। অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল ওকে। কী যেন বলবে বলবে করে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। অন্ধকারে ওর চোখ দুটো বারকয় জ্বলতেও দেখলুম। অথচ ওর মুখে জাহাজের গল্প, ফোর্টটার ইতিহাস, হলওয়েল মনুমেন্ট—আর আমি বললুম সম্ভবত মুসলিম সম্প্রদায় ফ্যামিলি প্ল্যানিং ভাল চোখে দেখছে না—ওদের বোঝান দরকার। তারপর বললুম, ও শেখর, এখন কেউ এসে ছুরি দেখিয়ে ঘড়িফড়ি চেয়ে বসলে তুই কী করবি রে? আমার চেনা একটি মেয়ের গল্প শোন। বাংলাদেশে চলে গিয়েছিল—এখানে বর পাচ্ছে না, তাই। গিয়ে তো মার্চের গণ্ডগোলে পড়ে গেল বেচারা। পালিয়ে আসবার পথে নারীত্ব-টারীত্ব সব তো গেলই, কোন রকমে প্রাণটা নিয়ে আসতে পারল। এখানে যদি এল, তো আবার এক বিপদ। ভিকটোরিয়ার ওখানে একটা চেনা ছেলের সঙ্গে সন্ধেবেলা বেড়াচ্ছে, প্রেমিক নয়—নিতান্ত চেনা ছেলে—তা হঠাৎ দুজন এসে যেই বলেছে, দাদা, দেশলাই আছে? ব্যস, ছেলেটি গুণ্ডা ভেবে তক্ষুনি দৌড়ে পালিয়ে গেল। ওরা তো অবাক।...শেখর, তুই শুনছিস না?

...শুনছি।

...যাক। আচ্ছা শেখর, এই যে আমি তোর সঙ্গে ভীষণ মিশি, তোর খারাপ লাগে না?

...কেন?

...তুই তো প্রায় বলিস সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্র বিশেষে একটা ওয়েটেজ দেয়—বলিস্ নে?

...বলি।

...ও শেখর, তোর এই মেলামেশা সেই 'ওয়েটেজ দেওয়া' নয় তো?

ও হাসতে লাগল। আবার বলল, তুমি একটা পাগল, বদ্ধ পাগল।

আজকাল ও আমাকে এরকম পাগল বলে চালাবার চেষ্টা করে। সত্যি কি আমার আচরণে আজকাল কোন ইনস্যানিটি দেখতে পায় ও? অবশ্য এই কটা দিন আর রাত আমার ভীষণ গেছে। হয়ত পাগল হয়েই উঠেছিলুম। কী অদ্ভুত সব ব্যাপার করে বেড়ালুম! আসলে আমার যত ভয় ইমেজ নিয়ে। সব সময় ভেবেছি, ওই যাঃ, কারা সব লোহার রড আর হাতুড়ি নিয়ে মূর্তি ভাঙতে এল। নাকি মূর্তি ভাঙার যুগ এসে গেছে? সব ইমেজ দিকে দিকে চুরমার হতে চলেছে।...ও শেখর, আমি গেলুম রে। এই ভেনাস মূর্তি—এই আমার অস্তিত্ব। একে কোথায় লুকোব, বল্ত শেখর?...

বাথরুম থেকে বিলম্বিত তোয়ালের মধ্যে দেহ রেখে এ ঘরে আসতেই বিলু চকিতে অপ্রস্তুত হল। আসবি তো আয়, সেই শেখরই এসে বসে রয়েছে!..বিলু চমকটা কাটিয়ে বলল, 'কতক্ষণ এলি? বস, তোর কথাই এতক্ষণ ভাবছিলুম, অনেকদিন বাঁচবি।'

শেখর মৃদু হাসল।...'আধঘণ্টা ধরে স্নান কর তুমি! সর্দি করে না?'

'না তো! শোন, একটু মেহনত কর।'

'বান্দা হাজির।'....শেখর অন্যমনস্কভাবে বলল কথাটা।

'তুই বান্দা কী রে! শাহজাদা বল্। আমি অবশ্য বাঁদী।'...হেসে উঠল 'ওই খাটের বাজুতে যা সব ঝুলছে, একটা করে দে। প্রথমে—ওরে বুদ্ধু, নাঃ, এজন্মে তোর বউ হবে না! প্রথমে ওটা নয়—সায়া দে।'

ধবধবে নকসাকাটা সাদা সায়াটা পরার সময় দরজার ওদিকে দাঁড়িয়ে পর্দা টেনে শেখরকে আড়াল করল বিলু। তারপর মুখ বাড়িয়ে বলল, 'হুঁ—এবার শাড়ি।'

শাড়ির পর ব্রেসিয়ার, তারপর ব্লাউস। তারপর বিলু ঘরে এল।...'নে—পিঠের বোতাম এঁটে দে।'

বোতাম আঁটতে আঁটতে শেখর বলল, 'কী সাবান মেখেছ? নাক জ্বলে যাচ্ছে।'

'ও আমার গায়ের সুরভি।'...বলে বিলু অয়নার সামনে এসে চুলে চিরুনি চালাল।...'জানিস? আজ আমরা সপরিবারে জঙ্গলে যাচ্ছি?'

শেখর তাকাল।

'হুঁ—সত্যি। আমি, আমার সায়েব, চিকন, ঝুমঝুমি।'

'বাইরে কোথাও? সেই ঢেনকানল নাকি?'

'উঁহু—কোলকাতাতেই।'

'সব তাতেই হেঁয়ালি তোমার! সোজা বললেই চুকে যায়।'

'সোজা বলা তো সোজা নয় রে! বললেও কি কেউ বোঝে? বুঝলেও আমল দেয় না। জলকে জল বললে কেউ কান করে না। যদি বলি এইচ-টু-ও, অমনি ছুটে আসে—কী বললে, কী বললে?'

শেখর কিছু বলল না। একটা পত্রিকা টেনে নিয়ে ছবি দেখতে থাকল।

বিলু বলল, 'বিকেলে কোথাও যাবি শেখর?'

'না। কেন?'

'আমরা ইভনিং শোতে হাটারি দেখতে যাব। সে সাড়ে পাঁচটায় বেরোলে চলবে। এখন বাজে দেড়টা। দুটো থেকে পাঁচটা অব্দি আমার হাতে কোন কাজ নেই। এই তিনটে ঘণ্টা কি জলে ফেলব? উঃ, সময়—সময় এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে! আজকাল আমার প্রতিটি সেকেন্ড এত দামী মনে হয়, জানিস শেখর? ইচ্ছে করে, একটি সেকেন্ডও বাজে খরচ হওয়া ঠিক নয়—ঠকে যাব।''

'কিসে খরচ কর ঠিক, শুনি?'

বিলু ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ভালবাসায়—প্রেমে।'

শেখর হাসতে লাগল।

'আমাকে খুব নির্লজ্জ ভাবলি বুঝি?'

'নাঃ।'

'কী বলব রে—আজকাল আমার ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে...' বিলু হঠাৎ থেমে শূন্যদৃষ্টে দক্ষিণ পশ্চিম আকাশের সেই চিমনিটা দেখতে থাকল। হুসহুস করে ঘন কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। যতক্ষণ না সাদা ধোঁয়া বেরতে লাগল, বিলু একইভাবে চুলে চিরুনী ধরা হাত রেখে তাকিয়ে রইল। তারপর বাঁ হাতটা পেটে রেখে বলল, 'কদিন থেকে পেটটা কেমন ব্যথা-ব্যথা করছে। কী হয়েছে বল তো?'

'ডাক্তার দেখাও। গ্যাসট্যাস হতে পারে।'

'দেখাব। আচ্ছা শেখর, দার্জিলিং যাওয়ার কী হল তোদের?'

'দেরি আছে।'

'ও কি যেতে চাইবে?' একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলল বিলু।... 'বলবে, ছুটি পাওনা নেই। এইতো কিছুদিন আগে গাঁয়ে থেকে এল মামলার ব্যাপারে। অবশ্য আমি চিকনদের নিয়ে...নাঃ, ঝামেলা সামলাতে পারব না। তুই তো বাবা পাহাড়ে-পাহাড়ে চড়ে বেড়াবি! হবে না—আমার কিছু হবে না!'

শেখর পত্রিকার ছবি দেখতে থাকল।

'মাঝেমাঝে টের পাই, আমার জীবনটা কী হাস্যকর, কী ব্যর্থ, ভালগার! কোন কাজে লাগল না—কোন কাজে লাগল না! শুধু ছেলেপুলে ধরলুম পেটে, ঘরকন্না করে এলুম একটানা! আর কিছু না—কিচ্ছু না!'...বিলু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল।...'তোর খাওয়া হয়েছে? আয় না—আমার সঙ্গে খাবি! এবেলা বিশেষ কিছু নেই অবশ্য—স্রেফ মাছ ভাত। আয়!'

'খেয়ে ফেলেছি। খেয়েই চলে এসেছি!'

বিলু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'হঠাৎ এলি যে? কী উদ্দেশ্য বলছিস না।'

'বলব। তুমি খেয়ে এস।'

বিলু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বুকটা টিপটিপ করিয়ে দিলি। সত্যি, কাঁপছে। কী কথা রে?'

'সামান্য। তেমন কিছু না। তুমি খেয়ে এস না!'

বিলু ধপ করে ওর পাশে বসে পড়ে বলল, 'উঁহু। না শুনলে খাওয়াই হবে না।'

ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামাল শেখর। তারপর বলল, 'তুমি সত্যি পাগলামি করছ, বউদি!'

বিলু কড়ামুখে বলল, 'আর কত পাগল বলবি আমাকে, শেখর? জানিস, বারবার কাকেও পাগল বললে একসময় সত্যি পাগল হতে বাধ্য? আমার মধ্যে তুই—হ্যাঁ, তুই একটা ইনস্যানিটি এনে ফেলছিস! আমার আজকাল ভয় করে, বড্ড ভয় করে। ভাবি, কী অস্বাভাবিকতা দেখতে পায় ওরা!'

শেখর দমল না। শান্তভাবে বলল, 'তুমি না খেলে বলব না।'

তখন বিলু হাসল। 'জানিস, লোকে ঠিক এই পদ্ধতিতেই মৃত্যুর খবর দেয়? না খাওয়া অব্দি অপেক্ষা করে। কার মরার খবর দিবি রে?'

শেখর একটু চমকাল যেন। কিন্তু কিছু বলল না।

বিলু ঝুঁকে গেল। 'তাহলে,—তাহলে টাকা ধার চাইবি বুঝি?'

শেখর দ্রুত সাড়া দিল।...'টাকা কোনদিন তোমার কাছে ধার চেয়েছি? কী টাকা দেখাচ্ছ?'

বিলু হাসিতে ভেঙে পড়ল। ওর পিঠে মৃদু আঘাত করে বলল, 'এটা একটা চড় মারলুম তোকে। ব্লাইন্ড টেবর নামে একটা ইংরেজি ছবি দেখেছিলুম। অন্ধ মেয়েটি বাড়িশুদ্ধ লোকের খুন হয়ে যাওয়ার ফলে আতঙ্কে বোবা হয়ে গেছে। কী ঘটেছে কিছু বলতে পারছে না। তখন আচমকা যেই না একটা চড় মারা অমনি মুখের বোবায় ধরাটা কেটে গেল। সশব্দে কেঁদে সব বলে ফেলল। বুঝতে পারছি আমার চড়টা ব্যর্থ হল। আয়, আমি খেতে বসব—তুই সামনাসামনি বসে বলবি। আয়, ওঠ।'

ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেল খাবার টেবিলে। রেখা যথারীতি থালাবাটি সামনে সাজিয়ে রেখে গেল। বিলু একটুকরো মাছ ভেঙে কাঁটা ছাড়িয়ে বলল, 'হাঁ কর। তোকে দিয়েই উদ্বোধন করিয়ে নি।'

শেখর যন্ত্রের মতন হাঁ করল।...তারপর নিরাসক্ত মুখে চিবুতে চিবুতে টেবিলের কভারে মোমবাতির জমাট মোমের দাগ নখে খুঁটতে লাগল।

বিলু খাচ্ছিল। ওর মুখে একটা আত্মতৃপ্তির উজ্জ্বলতা ছলকে বেড়াচ্ছিল—সেটা নিশ্চয় আহারের সুস্বাদে নয়। কিন্তু নিজেই টের পাচ্ছিল এ একটা মরিয়াপনা—ভিতরে ভিতরে শক্ত হয়ে ওঠার ভাব। একটা কঠিন প্রস্তুতি। কী বলবে তাকে শেখর? খুব মারাত্মক কিছু কি? সেটা কী হতে পারে? মাঝে মাঝে আঙুলে ভাত বাছার সময় দ্রুত এগুলোও অবশ্য ভেবে নিচ্ছিল।

কিন্তু শেখর মুখ খুলল না। বিলু মোটামুটি খেয়ে নিয়ে জলের গ্লাস তুলল ঠোঁটে। জল খেতে খেতে গ্লাসের ওপর দিয়ে তাকাল শেখরের দিকে। শেখর এখন আরও গম্ভীর। জল খেয়ে ছোট ঢেকুর তুলে বিলু উঠতে যাচ্ছিল—শেখর ডাকল, 'বউদি!'

'বোস্ আসছি।'.. বলে বিলু বেসিনের দিকে চলে গেল। বেশ সময় নিয়ে মুখ-হাত ধুল সে। ব্রাকেটে টাঙানো তোয়ালেতে হাত আর ঠোঁট স্পঞ্জ করল। আয়নায় একবার যেন সিঁথিটা দেখে নিল। সিঁদুর পরার জন্যেই কি সিঁথিটা আস্তে আস্তে চওড়া হয়ে যাচ্ছে? সে সরে এসে ডাকল, 'আয়—ওঘরে আরাম করে শুয়ে শুনব।'

শেখর উঠে দাঁড়াল। কিন্তু নড়ল না। মুখ তুলল। তারপর আস্তে বলল, 'যে কথাটা বলতে এসেছিলুম!...'

বিলু থমকে দাঁড়িয়ে গেছে ঘরের মাঝামাঝি জায়গায়।

'আমাকে আর ডাকবে না বউদি। তোমার সঙ্গে মেলামেশা আমার পক্ষে আর নানা কারণে সম্ভব হবে না। ইতিমধ্যে অনেক ব্যাপার টের পাচ্ছি—সেগুলো তোমার আমার বা হাসানদার মর্যাদার পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর। শুধু ক্ষতিকর নয়, তার চেয়েও খারাপ কিছু। আর...' সে কথা খুঁজতে থাকল।

বিলু স্থির দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

'...আর, তোমার স্নেহ কিংবা ভালবাসার ভার বইবার যোগ্যতা আমার নেই বউদি।'

স্নেহ কিংবা ভালবাসা! বিলুর গলার ভিতর একটা বোবা চিৎকার উঠল দূরের ঝড়ের মতন—কী শেখর, কী? স্নেহ না—ভালবাসা? ভালবাসা—না স্নেহ? তুই কী মার্কা দিচ্ছিস শেখর, স্নেহ—না ভালবাসা? বোকা ছেলে. দুটো থেকে একটা বাছবার বুদ্ধিটুকুও নেই তোর—টের পাসনে চাল কিংবা ডাল, তেল কিংবা জল, সকাল কিংবা সন্ধ্যা?

'আমাকে ক্ষমা কর বউদি।'...বলে শেখর ঝুঁকে এল বিলুর পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে। এবং বিলু পলকে ঘুরে উর্ধ্বশ্বাসে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। জানলার রড দু-হাতে আঁকড়ে ধরে আকাশের দিকে তাকাল। ললিতাভবনের পামগাছগুলো প্রচণ্ড দুলছে ঝোড়ো বাতাসের চাপে।

ও-ঘরে শেখর এক মুহূর্ত ইতস্তত করে চলে গেল নিঃশব্দে।

দুমদাম হাতুড়ির শব্দ শুনছিল বিলু। ঝাপসা অন্ধকারে তরুণ সব হাত 'জামায় রক্তের দাগ' নিয়ে একটা অনেককালের পুরনো অর্ধশায়িত পৌরাণিক মূর্তি ভাঙছে আর ভাঙছে। দুমদাম ...ঠকঠক...ধারাবাহিক ধ্বনিপুঞ্জ।

পাঁচটা বেজে এল। চিকন ঝুমঝুমি এরই মধ্যে সেজেগুজে তৈরী হয়েছে। মাকে তৈরী হতে বলছে। জ্বালাতন করছে। বিলু শুয়ে ছিল। এই উঠি বলেই উঠছে না বিছানা থেকে। শেষে ভাইবোনে হাত ধরে জোর টানাটানি করলে উঠতে বাধ্য হল।

ওরা দু-পাশে দুই কড়া প্রহরী। বাইরে বেরোতে হলে বিলু যা-যা করে, অর্থাৎ ঠিক যেভাবে সাজে, সেদিকে দুজনের নজর। ঝুমঝুমি বলল, 'এই মা, মুখটা কেমন বাসি হয়ে থাকল যে! ভ্যাট! চোখ দুটো খালি-খালি লাগছে! এই পেনসিল, নাও—আঁকো।'

বিলু কখনও রেগে যাচ্ছিল, কখনও একটু হেসে ফেলছিল।... 'তোরা কি পেত্নী সাজাতে চাস আমাকে?'

'হুঁ—আমাদের বেলায় এমন। আর অন্যের সঙ্গে বেরোলে, তখন যে...'

'হুঁ। আকাশের পরী সেজে যাই।'

'বারে! আমাদের ইচ্ছে করে না বুঝি!'—ঝুমঝুমি অনুযোগ করল।

চিকন গম্ভীর মুখে লক্ষ্য করছিল। বলল, 'টিপ পরলে না কেন? ঝুমঝুমি টিপ পরার রঙ দে।'

বিলু টিপ পরে বলল, 'নাও—হয়েছে তো? এবার ছুটি দাও।'

চিকন বলল, 'ওকী মা! অত সিঁদুর দিয়েছ কেন? মেছুনী দেখাচ্ছে।'

বিলু বলল, 'দেখাক।'

সে শাড়ি বের করছিল। ভাইবোন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দুজনে দুটো শাড়ি বেছে নিয়ে সমান দাবি জানাতে থাকল। বিলু, রেগে বলল, 'নে—তোরাই পরে বসে থাক।'

তখন চিকন বলল, 'ঠিক আছে। টস করব। ঝুমি, তোর হেড না টেল?'

টসে কিন্তু ঝুমঝুমিই জিতে গেল। সে মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে ফেলল আবেগে। চিকন গোমড়ামুখে সরে এল।

শাড়িটা পড়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল বিলু। ঝুমঝুমির মনে কি একটা জাঁকানো ঘরকন্নার গিন্নিটি বসে রয়েছে? এই চওড়া নীল পাড় জরির কাজ করা ঘিয়ে মটকা শাড়ি নীলপাখার আঁচল—বিলুকে এক পরিপাটি গোছালো সংসারের কর্ত্রী করে ফেলেছে। বিলু দেখল, একটু ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে তার চেহারা। এর সঙ্গে আগের বাইরে সেজে বেরনো বিলুর কোন মিল নেই। বয়সটাও বেড়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। নাঃ চুলটা ম্যাচ করছে না—খোঁপা বদলাতে হবে।

সে খোঁপা ভেঙে আবার নতুন ধাঁচে খোঁপা বাঁধতে থাকল। আলতোভাবে মনে হল, হাসান যেন এরকম সাজগোজই চায়—ভালবাসে। হাসান আজ খুব খুশি হবে।

পিয়ানোটা আজ একতারা হয়েই বাজুক। খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে হঠাৎ মনে ঝিলিক দিয়ে একটা গান এসে গেল। সেদিনের গানটা। দাঁতে কামড়ানো কালো ফিতেটা চুলের ভিতর ঘুরে যেতে বিলু গুনগুন করে উঠল—'মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে।'

সব শেষ করে একটু ঘুরে আয়নায় পাছা দেখে নিয়ে গাইতে গাইতে পাশের ঘরে গেল বিলু।...'সেদিন ভরা সাঁঝে যেতে যেতে দুয়ার হতে কী ভেবে ফিরালে মুখখানি...।' টুকুনকে আদর করতে থাকল। 'উঁহু, যায় না! জঙ্গল। বাঘ আছে। বাবা! খেয়ে ফেলবে! হা-লু-ম।' তারপর ঘুরে বলল, 'সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। তোদের বাবু কই রে?'

চিকন বিরক্ত হয়ে বলল, 'ঠিক ট্রাফিক জ্যামে পড়ে গেছে! একটু আগে বেরন উচিত ছিল।'

বিলু বলল, 'আপিস থেকে বেরিয়েছে কিনা কে জানে!'

ঝুমঝুমি ঝাঁঝাল স্বরে বলল, 'শুধু কাজ আর কাজ বাবুর! আর কারো আফিস নেই!'

বিলু বলল, 'একবার দেখ না আপিস থেকে বেরিয়েছে নাকি?'

চিকন ফোনের দিকে এগিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ডায়াল করল। তারপর সাড়া পেতেই বলল 'আমি ডকটর এইচ আলির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বলছি। কে? চিকন বলছ?'

'তুমি বেরোওনি? আমরা যে. '

'তোমার মাকে দাও তো বাবা।'

চিকন ডাকল—'মা, তোমার।'

বিলু দৌড়ে এল।...'কী ব্যাপার? বেরোয়নি? কার ফোন?'

'বাবুর।' বলে চিকন ফোনটা দিয়ে পাশে দাঁড়াল। নাকের ফুটো দারুণ কাঁপছে। বারবার যেন সর্দিটানার মত শোঁক শোঁক করছে সে।

বিলু আস্তে বলল, 'হ্যালো-ও! বলছি।'

'বিলু? শোন। একটু গোলমাল হয়ে গেছে। আমার বেরনো হল না। বুঝতেই পারছ—একসপার্ট হওয়ার জ্বালা। লক্ষ্মীটি, তুমি ওদের নিয়ে যাও। টিকিট তিনটে পাঠিয়ে দিয়েছি। ট্যাকসিতে গেছে। তোমরা ওই ট্যাকসিতেই হলে চলে যাবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে বেল বাজল। হাসানের অফিসের লোক তিনটে টিকিট নিয়ে এসেছে।

৯

খুরশিদ ম্যানসনের ওপর ছায়া ফেলে মেঘগুলো চলে যায়। কোনটা একটু থেমে যায় কিছুক্ষণ। আবার চলে যায়। কিন্তু বৃষ্টি ঝরে না। এবারকার গরম অসামান্য। মাঝে একদিন নাকি একশো সাত ডিগ্রি অবধি উঠেছিল—কাগজে লিখল। মন সবসময় শুধু একটা কামনায় নুয়ে আছে ঃ বৃষ্টি! বৃষ্টি দাও! করুণায় শীতল কর! প্রকাণ্ড ভারি চাকার মতন সব দিনগুলো রাতগুলো, থরথর কাঁপন আছে—খুব ধীরে এঞ্জিনটা গড়ায় যখন বিস্তীর্ণ সান্টিং ইয়ার্ডে আর হঠাৎ হঠাৎ চমকে দেয় তীক্ষ্ণ হুইসেলে! পরে বোঝা যায় ওটা আত্মঘোষণা, আত্মস্বীকৃতি। আমি আছি—এখানে আছি, এই সোচ্চার হুঁশিয়ারি।...

দিন যায়। একটা করে মৃত্যু অস্তিত্বের একটা স্তর সম্পূর্ণ করে দেয় একটা স্থূল দীর্ঘ সীমারেখায়। তার ওদিকটায় মনে হয় শূন্য—কিছু নেই। পেরিয়ে গেলেই আবিষ্কার করি, এই তো আরেকটা স্তর। আগেরটার মতন নয় মোটেও—কিছু মিল আছে কিংবা নেই—তবে অমিলই বেশি। আগের স্তরে সবুজ ঘাস ছিল, এখানে এখন কঠিন নগ্ন পাষাণ মাটি। হয়ত কোথায় জলের শব্দ। কবি এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ডের' মতন—ড্রিপ ড্রপ...টুপ টাপ টুপ টাপ...' হয়ত ইলিউশন। ধুঁয়ো থাকলে আগুন থাকার মতন—কোথাও রিয়েলিটি একটা থাকে বলেই।

হাসান টের পাচ্ছিল, বিলুর একটা কিছু ঘটেছে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছিল না। সন্ধ্যায় ফিরে সে দেখেছে, যথারীতি তার ফ্ল্যাটে সান্ধ্য-আসর বসেছে। বাবলীদি মঞ্জরী সঞ্চিতারা সবাই এসেছে। ওরা গাইছে। কখনও বিলুও গাইছে। কিন্তু কী একটা নেই। নিশ্চিত নেই। বিলুর মুখে নয়, কথায় নয়, চেহারাতেও না—সে পরিবর্তন ধরা পড়েছে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছন্দে। বেরোয় না তেমন। জানলার পাশে বসে বই পড়ে চুপচাপ। বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। আপিস থেকে ফিরে

আর হাসানকে জিজ্ঞেস করতে হয় না ছেলেমেয়েদের—মা কখন বেরিয়েছে রে? তার ছেলেমেয়েদের মা ঠিক চুপচাপ বসে আছে ঘরে। নয়ত টুকুনকে আদর করছে। নয়ত রেকর্ড প্লেয়ারের সামনে ঝুঁকে গান শুনছে।

মঞ্জরীই একদিন আবিষ্কার করল, বিলু তাদের ফ্ল্যাটে কতদিন যায়নি। পরক্ষণে তাকে টানতে টানতে একরকম জোর করে নিয়ে গেল। তখন বিকেল। অঞ্জলি আপিস থেকে ফেরেনি। ওর মা কাসুন্দির বয়েম খুলে শুঁকছিলেন। সঞ্চিতা উদাস চোখে দেখছিল। বিলুর অন্যমনা ভাবটা মুহূর্তে কেটে গেল শেখরের মাকে দেখে। ...'মাসিমা, কাসুন্দি খাচ্ছেন বুঝি?' সে সকৌতুকে বলে উঠল।

'কে, বিলু? এস, এস। আমি কদিন থেকে কেবলই ভাবছি—মেয়ের আমার দেখা নেই কেন? আমার আবার এদিকে যা হচ্ছে, সিঁড়িতে একেবারেই ওঠানামা করতে পারিনে।'

বিলু বলল, 'পুরনো কাসুন্দি?'

মঞ্জরী পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বলে উঠল—'হ। পুরান কাসুন্দি মাঝে মাঝে রৌদ্রে দেওন লাগে।'

সবাই হেসে উঠল। সঞ্চিতা বলল, 'কথাটা কার জান বিলুদি? বাবার আপিসের বড়বাবুর। বাবা গল্প করেছিলেন। চাপাপড়া ফাইল হঠাৎ বের করতে হলে ভদ্রলোক তেতোমুখে বাবাকে বলেন, স্যার, পুরান...'

মঞ্জরী বলল, 'থাক। তোমাকে আর নকল করতে হবে না। বিলুদি, কাল আমাদের ফ্রিজ আসছে, জান?'

'তাই বুঝি? বলে বিলু সঞ্চিতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার চুলটা নেড়ে দিল একবার।

প্রতিভা বললেন, 'ফ্রিজ আসুক, এরপর বলবে গাড়ি কেনো! আর বল না মা—মেয়েরা আমার যা জেদ ধরেছে। বলে—সব ফ্ল্যাটে ফ্রিজ আছে, আমাদের থাকবে না কেন? এদিকে ওঁর তো দিন ফুরিয়ে আসছে। শেখরের কবে কী হবে, ঠাকুর জানেন। বুঝলে বিলু, হয়ে যেত অ্যাদ্দিন। দিল্লীর ঠাকুরপো ট্রাঙ্ককল পর্যন্ত করল। গেল না। বলে, দিল্লীতে ভীষণ গরম। পাহাড়ে চড়ে ঠাণ্ডা খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে। গরম আর সয় না।...' হাসতে লাগলেন প্রতিভা।

পাশের ঘরে টুং টাং বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বিলু প্রথমে ভেবেছিল—বিলিতি অর্কেস্ট্রার রেকর্ড বাজাচ্ছে কেউ। সে বলল, 'সঞ্চিতা, রেকর্ড চালিয়ে এসে বসে আছ নাকি?'

সঞ্চিতা হাসল। '...উঁহু, দাদা। গীটার শেখার ধুম পড়ে গেছে হঠাৎ। একটা প্রকাণ্ড গীটার কিনে ফেলেছে। সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় কোথায় সেটা নিয়ে ক্লাস করতে চলে যায়। জানেন না? বলেনি আপনাকে?'

বিলু অকারণ শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেল। মাথা দোলাল।

মঞ্জরী একবার উঁকি মেরে এসে বিলুর হাত ধরে টানল। বিলু তাকে নিবৃত্ত করে প্রতিভার উদ্দেশে বলল 'মাসিমা, কই আমাকে শুকতো রান্না শেখালেন না?'

'তুমি আর এলে কই?'

মঞ্জরী বলল, 'এই! বউদি! তুমি যে বলেছিলে কোরমা শেখাবে। আজই হোক। মা, মাংস আনতে দাও নগেনকে।'

সঞ্চিতাও লাফিয়ে উঠল।...'হ্যাঁ মা—মাংস আনতে দাও।'

বিলু বলল, 'আজ বিস্যুদবার না?'

আগুনটা নিভে গেল দুম করে। প্রতিভা বয়েমগুলো আলমারির থাকে সাজিয়ে রাখছিলেন। বললেন, 'শেখর ও-ঘরে কী পিড়িং পিড়িং করছে রে একা! ডাক না—ভাইবোন মিলে গল্পসল্প করুক। সঞ্চিতা, ঠাকমাকে ডাক। বিলু বিলু করে মরে গেলেন যে!'

বিলু বলল, 'কী ব্যাপার মাসিমা?'

প্রতিভা হাসলেন।...'তেমন কিছু না। মা বলছিলেন, কী হল মেয়েটার—আর আসে না, আগের মত আড্ডাও বসে না ঘরে। উনি ওই ধাতের মানুষ। হইচই গল্পসল্প পেলেই খুশি হন। ওপরে তো হেঁটে যাবার ক্ষমতা নেই—নৈলে দেখতে, ঠিক গিয়ে বসে থাকতেন তোমাদের গানের আসরে।'

ঠাকমা—বোঝা গেল এতক্ষণ ধরে গায়ে কাপড়চোপড় গুছিয়ে বিছানা থেকে উঠে

আসছিলেন—বিলুর কণ্ঠস্বর পেয়েই। পর্দা এবং হাতের মুঠো তুলে বললেন, 'তোমাকে এমন মার মারব, টের পাবে। কেন, হয়েছে কী? এমন শত্রুতা কেন শুনি?'

বিলু শুকনো হেসে কাছে গেল।

'সন্ধ্যাবেলা ওপরে খুব গান চলে। এদিকে আমি ছটফট করে মরি একা।' বিলুর কাঁধে হাত রেখে এগিয়ে এলেন এ ঘরে।...'এ শত্রুতা নয়? কী এমন কাজের মানুষ হয়ে পড়েছ হঠাৎ?'

বিলু ওঁকে ধরে সোফায় বসিয়ে দিল। নিজে পাশে বসল। বলল, 'শরীর কেমন আপনার?'

'ভাল—খুব ভাল।' বলে বিলুর চিবুকে হাত দিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন।...'একটু শুকনো-শুকনো লাগছে আগের চেয়ে। অসুখবিসুখ করেছিল নাকি?'

'না। এমনি।'

মঞ্জরী শেখরকে ডাকতে গেল।...'এই শশাঙ্ক, মা ডাকছে।'

ভিতর থেকে শোনা গেল—'কেন?'

'বউদি এসেছে। তোকে ডাকছে।'

গীটারেব শব্দ শোনা যেতে লাগল শুধু। মঞ্জরী ফিরে এসে বলল, 'বাবু এখন ধ্যানমগ্ন।'

ওরা পরস্পর নানা বিষয়ে গল্প করছিল। হেসে উঠছিল কখনও। প্রতিভাও কাজ শেষ করে একপাশে বসে গল্পে যোগ দিয়েছিলেন। এরই ফাঁকে শেখব একসময় সবার চোখের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল—প্রতিভা ডাকলে সে একবার ঘুরে বিলুর দিকে তাকাল। তারপর শুধু বলল, 'ভাল আছেন বউদি?' তারপর চলে গেল। হাতে কালো কাপড়ে মোড়া মস্তো একটা গীটার।

মঞ্জরী মুখ টিপে হাসল।...'যাক। তাও তো চিনতে পাবল বউদিকে!'

সঞ্চিতা বলল, 'এখন দাদার কোনদিকে—কোনদিকেই মন নেই, শুধু গীটার। গীটারের ভূতে পেয়ে বসেছে। দেখবে, পাহাড়-টাহাড় সব বাদ যাবে —এবার শুধু গীটারে চড়ার পালা।'

সবাই হেসে উঠল। বিলুও। প্রতিভা বললেন, 'কদিন থেকেই তাই দেখছি। সবসময় পিড়িং পিড়িং। নেই কাজ তো খই ভাজ। তবে কী জান বিলু, সেও বরং ভাল। ও যে অন্যসব ছেলের মত কিছু ভাঙচুর করে বেড়াচ্ছে না, সেও মঙ্গল।'...পরক্ষণে কণ্ঠস্বব চাপা করলেন।...'শুনলুম, নিচের অজিতবাবুর ছোটভাইকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। ওরা বলছে না কিছু। জিজ্ঞেস করলে বলছে, বাইরে বেড়াতে গেছে। শেখরের বাবা বললেন—জান, কী কাণ্ড হয়েছে? অজিতবাবুর সেই ভাইকে...যাকগে বাবা। আমরা বেশ আছি। বিলু, গান শোনাও মাকে। মা, ওকে গান করতে বলুন।'

বিলুর ফিরতে স্বভাবত বেশ দেরি হল। গিয়ে দেখল, হাসান অফিস থেকে ফিরেছে। ছেলেমেয়েদের দুজনকে দুপাশে এবং উরুর ওপর টুকুনকে নিয়ে বসে গল্প করছে। বিলুকে দেখে বলল, 'বেরিয়েছিলে নাকি?'

বিলুর মনে তখন শেখরের সেই 'ভাল আছেন বউদি' অবিরাম তার নতুন হাতের স্ট্রোকে বেজে ওঠা গীটারের ধ্বনিতরঙ্গেব সাথে ওতপ্রোত হয়ে বাজছে আর বাজছে। একটু বিরক্ত হয়ে সে বলল, 'এই বেশে কেউ বেরোয়—দেখতে পাচ্ছ না?'

হাসান হাসল। টুকুনের দিকে ঝুঁকে রইল।..

বিলু কিছুক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়াল। তারপর টেবিলের সামনে গিয়ে একটা পত্রিকা নাড়াচাড়া করল। বেরোল। খাবার ঘর, সেখান থেকে কিচেন, তারপর চিকনদের ঘর, সেখানে একটু ওদের পড়াশুনা দেখল, আবার এ ঘরে ফিরল। তখন হাসান ফের বলল, 'কী খুঁজছ?'

বিলু জবাব দিল না। জবাব দেবার কিছু নেইও।

'বিলু, একটা কথা ভাবছিলুম।'

'উঁ?'

'কদিন বাইবে কোথাও ঘুরে আসবে?'

'কেন?'

'এমনি বলছি। একঘেয়েমি কেটে যাবে।'

বিলু কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'একঘেয়েমি কার বলছ?'

হাসান একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমি তো মাঝেসাঝে বাইরে গিয়ে ঘুরে আসছি। ভালই লাগে। নতুন জোর নিয়ে ফিরে আসতে পারি। মানুষের জীবনে এটার দরকার বিলু। বাইরে থেকে না দেখলে বোঝা যায় না কোথায় আমার থাকা। তাই বলছিলুম, যাও না কোথাও—ঘুরে এস।

সব বুঝেও মন্দ লাগল না প্রস্তাবটা। খুরশিদ ম্যানসন সত্যি বড্ড একঘেয়ে হয়ে গেছে তার কাছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাত্রি—ফুরোয় না, ফুরোয় না! এমন কি এ শহরের সেই সব রঙগুলো আর চোখে দীপ্তি আনতে পারছে না। আনছে ক্লান্তি। শাড়ি কেনার সুখ নেই, সাজশয্যা প্রসাধনে সুখ নেই, ক্রমাগত নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে যাচ্ছে বেলায়-বেলায়। কোন কিছুতে মগ্ন হতে গেলেই মনে হচ্ছে, ওই যাঃ, এ অবসরে কিছু হারিয়ে ফেলব বুঝি! ফিল্ম বই পড়া ঘরকন্না পুতুল সাজানো ছেলেমেয়েদের গোছানো রান্নাবান্না স্নান খাওয়াদাওয়া প্রতিটি হাতের কাছের অবলম্বন যেন এক-একটি শত্রু, যারা বিলুর অস্তিত্বকে ছোট-ছোট ভাগে গিলে আত্মসাৎ করতে চায়! বিলু বলল, 'কোথায় যাব?'

'ঝাঁপুইহাটি যেতে পার। নদী আছে...'

বিলু ভুরু কুঁচকে বলল, 'তোমার সেই গাঁয়ে?'

'হ্যাঁ—তুমি কখনও যাওনি—তাই বলছ। খুব চমৎকার স্পট।'

বিলু মাথা দোলাল।...'ভ্যাট!'

হাসান একটু ভেবে বলল, 'তাহলে আর কোথায় যাবে? তুমিই বল না?'

বিলু কিছু বলল না।

'দীঘা যাবে? হ্যাঁ—কাছাকাছির মধ্যে দীঘাই ভাল। একটা সরকারি কটেজ নিলেই চলবে। ইচ্ছে করলেই নিজেরা রান্না করে খাওয়া যায়, নয়ত হোটেলও আছে।'

'জানি।'

'ও হ্যাঁ। সে তো একবার গিয়েছিলুমও। বিয়ের পরে। হনিমুনে।'...হাসতে লাগল হাসান।

'যাব।'

'কালই ব্যবস্থা করে দিই—কী বল?'

বিলু তাকাল।...'ব্যবস্থা করে দেবে মানে! তুমি যাবে না?'

'আমার হবে না, বিলু। ভীষণ কাজের চাপ। তাছাড়া ছুটিও পাওনা নাই। এদিকে হাইকোর্টের মামলার দিন পড়ে যাচ্ছে এ সপ্তার শেষেই। তুমিই যাও।'

'আমি একা যেতে পারব না।'

'কী মুশকিল! একা যেতে কে বলছে?'

'চিকনদের আমি সামলাতে পারব না।'

'ওদের কেন টানছ? ওদের ছুটি হতে দেরি আছে। তুমি টুকুনসোনাকে নিয়ে যাও।'

বিলু আবার বলল, 'একা?'

'না—শেখরকে নিয়ে যাও।'

বিলুর চোখ দুটো জ্বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ফিসফিস করে উঠল হঠাৎ, 'কাকে?'

'শেখরকে।'...হাসান টুকুনের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল।

বিলু ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'তুমি কী ভেবেছ, তাই শুনি? কী পেয়েছ আমাকে? আমি কিছু বুঝতে পারিনে? এত ছোট মন তোমার—এত নীচ!...' বিলু রাগে কেঁদে ফেলল।

হাসান নির্বিকার মুখে বলল, 'আশ্চর্য!' এতে রাগ করার কী আছে? এ বাড়ির অনেকেই তো শেখরকে সঙ্গে নিয়ে যায়। যায় না? কিছুদিন আগে বাবলীদিরা গেল—সেদিন মোহিতবাবুর স্ত্রী কোথায় যেন গেলেন! ও তো খুরশিদ ম্যানসনে সবাই দেখি ইমপরট্যান্ট পার্ট অফ লাইফ। এত ভাল সারভিস আর কে দেবে, শেখর ছাড়া? কাজকম্ম নেই, বাবার খায়, আর টোটো ঘোরে।'

বিলু ফেটে পড়ল আরও। 'খবরদার, তুমি অন্যবাড়ির লোকের অপমান কর না। ছিঃ! এমন কুচুটে মানুষ তুমি! মাসিমাদের কানে গেলে ডকটর হাসানের চমৎকার ইমেজ ফুটে উঠবে। বাঃ! মাটির তলায় জীবজন্তুর হাড় বের করা অভ্যেস যে! ধিক তোমার শিক্ষাদীক্ষার!'

হাসান মুখ তুলল।...'আশ্চর্য! এতে রাগের কী আছে? অপ্রিয় সত্য সহ্য করার শিক্ষা তোমার নেই, তাই রেগে যাচ্ছ!'

'কী তোমার সত্য? বল—আমি পরিষ্কার শুনতে চাই আজ। কী সত্য নিয়ে তোমার হঠাৎ মুখ ফুটে গেলে আজ?'...বিলু ঝুঁকে গেল তার দিকে।

হাসান শান্তভাবে বলল, 'দেখ বিলু স্বামী হিসেবে যা কর্তব্য করা আমার উচিত—প্রত্যেকটি আমি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করি। তাছাড়া তোমার মাকে মরাব সময় কথা দিয়েছিলুম, তার মেয়ের মুখে সবসময় হাসি ফুটিয়ে রাখতে চেষ্টা করব—কোন দুঃখ দেব না। সেই কথা আমি রেখে আসছি। তোমার সুখ তোমার শান্তি তোমার আনন্দের জন্যে স্যাক্রিফাইস করাটাই আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে ক্রমশ। শেখরের সঙ্গে দীঘা বেড়াতে যেতে বলেছি, শুধু এই ব্যাকগ্রাউন্ডে। তুমি ব্যাপারটা গুলিয়ে দিও না!'

বিলু নিজেকে এতক্ষণ সামলানোর চেষ্টা করছিল। এবার বলল, 'হ্যাঁ—গুলিয়ে যাচ্ছে না আর। এতদিনে টের পেলুম তোমার স্বামীত্বের ভিত্তিটা কী। করুণা! সব কিছু জেনে আজ বারোটা বছর ধরে শুধু করুণাই করে আসছ! কিন্তু না—আর করুণা আমার দরকার নেই।'

হাসান একটু হাসল।...'তোমার কি মনে হয়েছে এতদিন শুধু করুণাই করে এলুম? সত্যিকার ভালবাসা ছিল না একটুও? তুমি মূর্খ যদি না হও, স্বীকার করবে—করুণাও যদি সত্যি ছিল—তা কেমন করে ভালবাসা হয়ে উঠছিল।'

বিলু চোখ মুছে বলল, 'থাক। আর বক্তৃতা শুনে আমার লাভ নেই। তোমাকে চিনে গেলুম এই আমার যথেষ্ট। আর...' একটু চুপ করে থেকে সে ফের বলল, 'যা নিয়ে তোমার ভয়, যাকে এত ভয়,—সেই শেখর আমার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করেছে। সে আর আসে না! তুমি খুশি হলে তো?'

হাসান চমকে উঠেছিল। কদিন থেকে এরকম মনে হচ্ছিল তার—শেখরের সঙ্গে বিলুর একটা কিছু ঘটেছে। শেখর আর আসে না—বিলুও আগের মত তার সঙ্গে বাইরে যায় না।

সে রাতে হাসান আরও একটা ব্যাপারে অবাক হল, বিলু যেন আগের মতন সশব্দ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের জোরটা হঠাৎ কোথায় কেমন করে হারিয়ে ফেলেছে। তালতলার বাড়ির সেই বিলু—তার কথা ভাবলে আজ অবাকই লাগে। এতক্ষণ কত জিনিসপত্র দুমদাম ভেঙে তছনছ করত—খাওয়া বন্ধ করে দিত—অবিশ্রান্ত কাঁদত, এবং তখন হাসানকে বেশ খানিকটা বেহায়া সেজে সাধাসাধি করতে হত। ক্ষমা চেয়েও নিতে হত। আজ বিলু হঠাৎ সূচফোটা বেলুনের মতন চুপসে গেল। বাড়াবাড়ি করল না। খেলও। কাঁদল না—সামলে নিল কান্না। বিছানায় এসে শুলও—এবং শুল হাসানেরই পাশে। কিন্তু হাসান তাকে ছুঁল না আজ। কারণ, তার মনে হচ্ছিল, বিলুর মনটা বিলুর দেহে নেই—কোথায় সরে গেছে, আর ডাকাডাকিতেও আসবে বলে মনে হয় না।

আর বিলুও অবাক হয়েছিল। ওড়িশা যাবার রাতে হাসান কতকটা এমনি আচরণ করেছিল বটে, কিন্তু হাসানের চেহারায় একটা দুঃখের ভাব ছিল। যা দেখে বিলু খুশিই হয়েছিল মনে মনে। স্বামী অভিমান করে দূরে সরে থাকলে মেয়েরা হয়ত মনে মনে কোথাও খুশিই থাকে—কারণ অচ্ছেদ্য এবং রক্তগত আত্মীয়তা থেকেই অভিমানের ফুল ফোটে—স্মিত নৈকট্যের সুগন্ধ ছড়ায়। কিন্তু আজ হাসানের মধ্যে অভিমান নেই, যেন চাপা উল্লাস—যেন পরোয়া না করার কঠিন আত্মতৃপ্তি। গীর্জায় কতবার ঘণ্টাধ্বনি হল, বিলু আশা করল একটা রোমশ চওড়া হাত। অন্তত ঘুমের ঘোরেও—অন্তত নিছক অভ্যাসেও—সেই পুরুষ আর কর্তা হাতটা তাকে স্পর্শ করুক।

কিন্তু না। হাসান পাশ ফিরে ঘুমোতে লাগল।

বিলু বুঝল, হয়ত বা বারো বছর ধরে কাঁপতে কাঁপতে পায়ের নিচের যে ভিতরটা কালক্রমে শক্ত আর স্থির হত—তা যেন স'রে গেছে।...

আরও কয়েকটা দিন কয়েকটা রাত চলে গেল। তারপর বিলু একটা প্ল্যান করল। হ্যাঁ, এছাড়া আর কোন উপায় তার নেই। এই তার অবশিষ্ট হাতিয়ার। ব্যর্থ হলে...

সেই ভাবনা। ব্যর্থ হলে আর কী করবে? আপাতত দেখতে পাচ্ছে না সামনে। শুধু শিহরনের মধ্যে ভাবল, ব্যর্থ হয় যদি তাহলে যে খেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে, সেই খেলাটা খেলার বদলে সত্যি করে নিতেও তো পারে!

কিন্তু তার চিকন, ঝুমঝুমি—এত ছোট্ট টুকুনসোনা! তার ঘরের এই জানলা, ললিতাভবনের পামগাছের ওপর সুনীল শূন্যতায় ধরাপড়া নিঃসঙ্গ কালো চিমনি, যার অন্তর্গত বিস্ফোরণ থেকে নানা রঙের ধুঁয়ো বেরোয়!...চোখ জলে ভরে এল বিলুর।

এখনও বৃষ্টি হল না। কিছু মেঘ আসে। ছায়া দিতে দিতে চলে যায়। উষ্ণতা বাড়ে শহরে। বাতাস অসহ্য লাগে। স্নানে সুখ নেই। গত বারোবছরে এমন খরা আসেনি—কাগজে খবর লেখে।

বিলু একটা নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করছিল। সেটা তাদের বিয়ের তারিখ। কদিন পরেই দিনটা এল। সেদিন অনেক রাত অব্দি নোট লিখে হাসান শুল। বিলু ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। গীর্জার ঘণ্টা বারোবার বাজলে হাসানের নাক ডাকতে লাগল। তখন বিলু সাবধানে উঠল। তার হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল। ঠিক পারবে তো? বারো বছর ধরে স্বামীর কাছে সাজ্জাদকে গোপন করে রাখতে পারল সে—এত তার মনের জোর, সে এই আসন্ন খেলার ভিতরের সত্যও কি অবশিষ্ট জীবন ধরে গোপন রাখতে পারবে না? শুধু স্বামীর কাছে নয়, যেন শেখরের কাছেও এ তথ্য গোপন রাখবার দায়িত্ব নিতে হচ্ছে তাকে।

তবু এছাড়া আর উপায় ছিল না।

সাবধানে সে আলমারির তলা থেকে দড়িটা বের করল—হাসানের বেডিং বাঁধা দড়ি। আজ দিনের দিকে লুকিয়ে রেখেছিল ওখানে। তারপর কাঁপতে কাঁপতে হাসানের নাক-ডাকার শব্দ শুনল। কয়েক মিনিট পরে সে ফ্যানটা বন্ধ করে দিল। পায়ের দিকে খাটের বাজুতে উঠে ফ্যানের হুকে বাঁধল দড়িটা। ফাঁস বানাল অন্য প্রান্তে। তারপর মাঝামাঝি একটা বিশেষ জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখে নিল। ওই জায়গাটাই প্ল্যানের ভাইটাল অংশ।

ফ্যান বন্ধ হলেই গরম লাগে। গা ঘামছিল বিলুর। কিন্তু হাসানের নাক ডাকছে। একটু পরে নাক ডাকা থামল। হাসান জাগল না। তখন বিলু বাজু থেকে নেমে টুকুনকে জোরে চিমটি কাটল। টুকুন যেই কেঁদে ওঠা, সে ত্বরিতে বাজুতে উঠে ফাঁসটা গলায় পরে ঝাঁপ দিল।

আচমকা টুকুনের কান্না আর দড়াম করে আছাড় খাওয়ার শব্দ হতেই হাসান জেগে উঠল। টেবিল ল্যাম্প জেলে সে ডাকল, 'বিলু, টুকুন কাঁদছে।' পরক্ষণে তার চোখ গেল পায়ের দিকে মেঝেয়। কার্পেটের ওপর বিলু পড়ে রয়েছে। এবং একটা দড়ি। ফ্যান বন্ধ। হুক থেকে ছেঁড়া দড়ি ঝুলছে। হাসান এক লাফে উঠে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'বিলু বিলু!'

দুহাতে বিলুকে বুকে তুলে হাসান কান্নায় ফেটে পড়ল। পুরুষমানুষ কাঁদলে বড্ড বিশ্রি শোনায়। হতভাগিনী বিলু ওর গালে হাত বুলিয়ে বলল, 'চুপ, কাঁদে না। আমি মরব না!'

রাতটা জেগে কাটাল ওরা। পরদিন হাসান অফিসে ফোন করে দিল—শরীর হঠাৎ অসুস্থ। আজ-কাল দুটো দিন যাচ্ছে না।

ফোন করার পর বিলু হঠাৎ মৃদুস্বরে বলল, 'আমাদের বিয়ের তারিখটা কবে যেন?'

হাসান ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরে! বিলু, ও বিলু! কাল আমাদের বিয়ের দিন ছিল যে! যাঃ, সব মাটি হয়ে গেছে।'

বিলু বলল, 'কিছু মাটি হয়নি। আজ বাসর ছিল—মনে নেই?'

শুনেই ঝুমঝুমি নাচছে।...'আজ বাবুর সঙ্গে মায়ের বিয়ে!'

চিকন গম্ভীরমুখে বলল, 'যাঃ!...বিয়ে কাল গেছে, আজ বউভাত।'

'বউভাত কী জানিস!'...ঝুমঝুমি ভেংচি কাটল।

চিকন বলল, 'নিশ্চয় জানি। সেদিন ভোঁদার দাদার বৌভাত খেলুম না? মা, মুরগি আনতে যাচ্ছে কে?'

খবর পেয়ে মঞ্জরী এল, সঞ্চিতা এল। বাবলীদি এল। সর্বানী এল। হাসানের ফ্ল্যাট গমগম করতে লাগল।

তারপর বিকেল থেকে বিলুকে ওরা সাজাচ্ছে। ফুল এসেছে এক গাদা। গানের আসর বসেছে। শেখরের ঠাকমাকে ধরাধরি করে নিয়ে এল হাসান। শেখরের মাও এলেন।

কিন্তু শেখর কোথায়? সবাই মুখ তাকাতাকি করছিল। প্রতিভা বললেন, 'গীটার বাজাচ্ছে। আবার কী করবে?'

হাসান বিলুর দিকে তাকাল। বিলু আস্তে বলল, 'তোমারই তো ডেকে আনা উচিত।'

হাসান চলে গেল। এবং একটু পরে ফিরে এসে বলল, 'পরে আসবে বলল।'

বিলু বলল, 'আচ্ছা।'

কখন তার মধ্যে বৃষ্টি এসে গেছে। খুরশিদ ম্যানসনের গা গড়িয়ে বৃষ্টির জল ঝরছে। বাইরে গাছপালা স্থির দাঁড়িয়ে ভিজছে। মঞ্জরী বর্ষার গান গাইছে। সবাই তন্ময় হয়ে শুনছে। 'মন মোর মেঘের মত...' ...গানের কলিটা ঘরে মেঘের মতই শান্ত সিক্ততা দিয়ে সবাইকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ঘুরছে। এক ফাঁকে বিলু উঠল।

হাসান রান্নার তদারক করছিল। বাইরে থেকে বাবুর্চি এসেছে। বিলু গিয়ে ডাকল—'শোন। আমার সঙ্গে একটু এস তো।'

'কোথায়?'

'এস না বাবা! জাহান্নামে নিয়ে যাব না!'...হেসে ফেলল বিলু।

'তবে কি স্বর্গে?'

'উঁহু অন্য এক জায়গায়। তর্ক করে না। এস।'

সিঁড়িতে দুজনে নামতে লাগল—হাতে হাত। দোতলায় গিয়ে শেখরদের ফ্ল্যাটে বেল টিপল বিলু। ঘরের ভিতর অনুজ্জ্বল জিরো বালব জ্বলছে—মৃদু নীল আলো। অন্য ঘরে অন্ধকার। শেখর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বউদি! হাসানদা!'

বিলু এক মুহূর্ত পরে আচমকা একটা চড় মেরে বসল শেখরের গালে। হাসান স্তম্ভিত। বিলু বলে উঠল, 'হতভাগা, কী হয়েছে তোর? অত ডাকা হল আসবার নাম নেই!'

শেখর গালে হাত রেখে হাসল।...'সেই ব্লাইন্ড টেররের শক থেরাপি বউদি?'

বিলু বলল, 'আজ আমার সুখের দিনে সবটাইতে হুল্লোড় করবে যে, সে নিচে অন্ধকার ঘরে বসে গীটার বাজাচ্ছে কেন রে?'

শেখর বলল, 'চল যাই।'

হাসান লাফিয়ে উঠল।...'তোমরা এস। ওদিকে রান্নার কী হল কে জানে!' বলে সে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়েও তার গলা শোনা গেল।...'দেরি করো না তোমরা!'

বিলু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'সেদিন বাজি হেরেছিলি। আজ আমি হারলুম শেখর। মনে মনে আজ দুপুরে ফের তোর সঙ্গে বাজি ধরেছিলুম। তুই বললি, বৃষ্টি হবে, আমি বললুম—না। কিন্তু বৃষ্টি হল। আমি তোকে কী দেব শেখর?

শেখর বলল, 'দাঁড়াও বৌদি, তোমাদের বিয়ের বার্ষিকী আজ। আমি কী দেব তাই আগে বল।'

বিলু একটু হেসে বলল, 'তুই আমাকে একটা প্রণাম দে, শেখর। সেদিন নিই নি। এখন নিতে ইচ্ছে করছে।'

শেখর ঝুঁকে দুপায়ে হাত রাখল।

বিলু ওর দু কাঁধ ধরে তুলে বলল, 'আমি তোকে শেখর, আমি তোকে বাজি হারার দরুন কী দিলুম জানিস? মুক্তি।'...এবং দ্রুত মুখটা ছায়ার দিকে ঘোরাল।

শেখর ম্লান হাসল।...'চলো—ওপরে যাই।' তারপর দুজনে পাশাপাশি হেঁটে সিঁড়ির ধাপে ধাপে ওপরে উঠতে লাগল। খুরশিদ ম্যানসনের গা চুইয়ে তখন বৃষ্টির ধারা নামছে।

নির্জন গঙ্গা



কাল সারারাত নিষাদবাগে বড় ধুম ছিল। ধনপতি সরকারের মেয়ের বিয়ে। গাঁসুদ্ধ ছুঁড়িবুড়ি খুব নাচনকোঁদন করেছে। সরবতিয়ার মা, ওই যে পাড়াকুঁদুলি মেয়েটা—দিনমান যার বাড়িতে শ্যালশকুনের খেয়োখেয়ি, সেও মাথায় পাগড়ি বেঁধে কাবুলিওয়ালার সঙ দিয়েছে। নয়ানসুখের তিন বেটি—চঞ্চলা, অঞ্চলা, সঞ্চলা—হাত ধরাধরি করে মাজা দুলিয়ে নেচেছে। আর গলায় লহরা তুলে গান গেয়েছে এতোয়ারির বউ ফুলকলিয়া। কলাবেড়িয়ার মেয়েরা কত না ঠাট জানে! সেই ঠাটের একটুখানি দেখেই নিষাদবাগের মেয়েরা থ। ধনপতি সরকারের বুড়ি থুত্থুড়ি মা, যাকে ও মাসে ভুল করে চিতেয় চাপাতে নিয়ে যাচ্ছিল, তারও যেন পরমায়ু বেড়ে গেল এবং খাটিয়ায় বসে সেই নিশুতি রাতের ডামাডোলে তালে তাল দিয়ে মাথা নাড়তে লাগল। ফুলকলিয়ার কত গয়না। রুপোর মল, বাজু, পাঁছচি, নিকঁরি, চাঁদির কাঁকন। তিনটে হেরিকেনের ছটায় একশো ঝলমলানি। শেষে ঝমর-ঝমর নাচও জুড়ে দিল। আর সেই ভিড়ের মধ্যিখানে বসে থেকেছে বিয়ের কনে সন্ধ্যামণি। মোটে তো বারোয় পা, শরীরের আড় ভাঙেনি, গায়ে হলুদ মেখে লালপেড়ে হলুদ শাড়ি পরে ছোট্ট জাঁতি হাতে নিয়ে সুখে-দুঃখে ঢুলেছে আর ঢুলেছে। সেই কখন পুবের আকাশে উঠেছে ঝুঝকি তারা। কখন দূরে কাশিমবাজারের কারখানার পয়লা ভোঁ বেজেছে। তখন আসর গেছে ভেঙে। ধনপতি সরকারের উঠোনে খেজুর তালাইয়ে কত বহুবেটির আলুথালু গতরে দিনের প্রথম হাওয়া খেলেছে। উন্মোচিত স্তনের ওপর ঠোঁট রেখেছে শিশুর মতো দিনের প্রথম আলো। সবার কাপড়চোপড়ে চাপ চাপ লালরঙ লেগে আছে। সারা বাত পিচকিরিতে রঙ খেলেছে সবাই। এখন জখমী লাসের মতো পড়ে আছে মেয়েরা। আর বাড়ির সেরা পুরুষটি হুঁকোয় আগুন দিতে-দিতে আড়চোখে উঠোন দেখতে দেখতে হাঁক দিয়েছে—হেই গে বহু-বহুড়ি! উঠ্ সব! উঠ্ যা।...

কাল রাতের নাচনকোঁদনটা বড্ড বেশিরকমই হয়েছিল। হবেই তো। ধনপতি সরকারের মেয়ের বিয়ে। দশ বিঘে ক্ষেতি যার, পাঁচ কুঠি আউশধান ফলে বছরে, বারোটা কলাগাছে বড়-বড় কাঁদি ঝুলছে, বিশাল করেলার মাচায় থোকা-থোকা করেলা ঝুলছে, বেগুন খেতে বেগুন, ট্যাঁড়স খেতে ট্যাঁড়স, গরু ছাগল হাঁস, জোয়ান ছেলে যার লিখাপড়হা শিখে পণ্ডিত হয়েছে এবং সাইকেলে চেপে কত কাজে-অকাজে দিনমান ঘোরে—ধনপতি সরকার নিষাদবাগের মোড়লমানুষ, তার মেয়ের বিয়ে।

এতোয়ারি মাটির মানুষ। কোন সাতে-পাঁচে নেই। পাশের জায়গা সারারাত খালি পড়ে থেকেছে, তার তাতে কী? দিব্যি ঘুমিয়েছে। অনেকগুলো স্বপ্ন দেখেছে। ভোরের দিকে একটা কুস্বপ্ন হল। বাড়ির নিচের নদী থেকে এক বিশাল শুওর গাঁক-গাঁক করে উঠে আসছিল। এতোয়ারি গোঁ-গোঁ করে উঠলে তার মা সরস্বতী ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। তারপর বুড়ি ক্ষেপেছে। বেটার পাশে বহু নেই সারারাত—কোথায় আছে তাও জানে, কেন আছে সেও অজানা নয়। তক্ষুণি গেছে ধনপতি সরকারের বাড়ি। চুল ধরে টেনে তুলেছে বহু ফুলকলিয়াকে। তারপর যা হবার হল।

তো এতোয়ারি মাটির মানুষ। উঠোনে বহুর ওপর মা তম্বি করছে দেখতে-দেখতে নির্বিকার মুখে জামবাটির ছাতু শেষ করেছে। জল খেয়ে ঢেকুর তুলেছে। তারপর ঘরের কোনা থেকে 'বাইক' নিয়ে দুধারে দুটো মস্তো ঝুড়ি ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেছে গাঁওয়ালে। দুই ঝুড়িতে আছে মরশুমের পেঁয়াজ, রসুন, কয়েক থড়ি পাকা কলা, সের তিনেক উচ্ছে, এইসব। আজ এলাকায় কোথাও হাটবার নেই। গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে বেচবে। ফিরতে সেই মুখঢাকা আঁধার। নদীর তলায় যেটুকু জল আছে, তাতেই গতরের ঘাম ধুয়ে লোকটা ঘরে ফিরবে।

আর ফুলকলিয়া কিনা ওপারের কলাবেড়িয়ার মেয়ে। আরে ছো-ছো! নিষাদবাগের এরা আবার মানুষ নাকি? ভূত-পেরেতের দল। যত দিন যাচ্ছে, তত ধরা পড়ছে ভেতরকার গুমোর। না আছে পয়সাকড়ি, না ক্ষেতি। এরা গান গাইবার জোর পাবে কোথায়? নাচবেই বা কেমন করে? ছুঁড়িগুলোর গতর সব পাটকাঠির মতো। ফুলকলিয়া ইচ্ছে করলেই মুটমুট করে সব ভাঙতে পারে।

পারতই তো। শাস-ঠাকরুণটিকে তিন টুকরো করতে পারত। করল না, তার বেটার ভাগ্যি আর নিজের বাবার হুকুম। যতবার আসে পইপই করে বলে যায়—মা ফুলি গে! জেরা ঠাহর কারকে শুন বেটিয়া। কভি শাসকী সাথ মুখড়া না কিবি। খবর্দার গে!

তাই 'মুখড়া কিবে নাই' ফুলকলিয়া। আর সেই জ্বালা বুকে চেপে চলে এসেছে শ্মশানের ধারে বটতলায়। মোটা লম্বা যে শেকড়টা নদীর গা বেয়ে নেমেছে, তার ওপর চুপচাপ বসে আছে সেই পোঁহাতকাল থেকে। ঘন ছায়ার মধ্যে দুধে-খরিশের মতো গায়ের রঙ ফুলকলিয়ার। গা-ভরা রুপোর গয়না। ছলছল বড় দুটি চোখে একটুখানি লালের ঘোর লেগেছে। শাড়িটাও লালে-হলুদে বিচিত্তির। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে দেখেছে নদীর ওপারে টানা সবুজ গ্রাম-রেখা। তার সারা ছেলেবেলা জড়ো হয়ে আছে ওই কলাবেড়িয়ায়।

এ নদীর নাম ভাগীরথী। লোকে বলে গঙ্গা। এখন শুখার দিনকাল। শুকনো বালির চড়া আলগোছে সরিয়ে কয়েকফালি কালো জল পটুয়ার তুলির টানের মতো চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। একটু দক্ষিণে এগোলে দহ কিছুদূর। থমকানো গাঢ় কাজল জল, কিন্তু স্বচ্ছ। তলার বালিতে অভ্রের কণা রোদে ঝিকমিক করে। নীলচে শ্যাওলায় ঠোঁট ঘষে বেড়ায় মৌরলার ঝাঁক। নিষাদবাগের নাহানের ঘাট এখন ওখানে সরে গেছে। বটতলার ওপাশ দিয়ে নিচু বাঁধের পথে নাহানে যাচ্ছে গাঁয়ের লোক। ফুলকলিয়া ঝুরির আড়ালে বলে নজর চলে না। নয়নসুখের করেলা মাচানের ওপাশে কারা কোঁদল করছে। নিষাদবাগের মেয়েরা বড্ড কুঁদুলি। যাও না কলাবেড়িয়া—দেখে এসো কী শান্তি কী সুখ! খাঁ-খাঁ পথঘাট। সবাই ক্ষেতির কাজে মত্ত, নয়তো গাঁওয়ালে সবজি বেচতে চলে গেছে। দুচারজন বুড়ো-বুড়ি আছে। তাদের রা-চা নেই। ঢ্যাবা ঘুরিয়ে শনের দড়ি বানাচ্ছে। চোখে উদাস চাউনি। হেই মা গে! কাঁহা তেরা বিটয়া, কাঁহা তু চলা গেইলা যে—সব ছোড়কে মা গে...!

হঠাৎ হু-হু করে কান্না আসে ফুলকলিয়ার। বাপসোহাগী বেটিদের বরাতে অনেক দুখ্—তার মা বরাবর বলত।

এর মধ্যে বারতিনেক এসেছে এতোয়ারির বোন ছোটি।—বহুদিদি গে! মা বোলাইছে। ঘর আ।

—যা যা! ঘর যাবে না ফুলকলিয়া। ভারি তো ঘর। পাটকাঠির বেড়া, শনের চালে এক বোঝা আউশ খড় চাপানো। সেই বেড়ায় মাটির লেপন দেবারও সাধ্যি ছিল না মড়াখাকী বুড়িটার। ফুলকলিয়া এসে গুঁড়ো দুধের মতো নরম সুন্দর মাটি পুরু করে লেপেছে! তার ওপর খড়িগোলা রঙে এঁকে দিয়েছে পাখি পদ্মফুল লক্ষ্মীমায়ের চরণ। দূর দূর! নিষাদবাগের মেয়েরা জানেই বা কি?

বহুদিদি গে! ঘর আ।

বোঁচা সিকনিঝরা ছুঁড়িটা তো বড্ড জ্বালায়। ফুলকলিয়া ঢিল কুড়োবার ভঙ্গি করেছে। তখন হাসতে হাসতে পালিয়ে বাঁচে ছোটি। বহুদিদিকে তার অ্যাদ্দিনে অনেকটা চেনা হয়ে গেছে। এত রাগ, অত রাগ, বেলা গড়ালে আবার মুখে হাসির খই ফোটাফুটি। পেতলের ঘড়া কাঁখে নিয়ে মাজা দুলিয়ে বেরোবে ঘর থেকে! —আ গে ছোটি, নাহানে যাই গাঙ্গমে।

দহের জল তোলপাড় করে ননদ-ভাজ নাহান করবে। ওপরে হাজার-হাজার নাকি লক্ষ নাকি কোটি বছরের ঈশ্বরের বাথান। নীল ধু-ধু শূন্য বাথান। হেই ঠাকুরবাবা. কাঁহা তেরা কালা ভঁইসাঠো? গাঁক-গাঁক করে শিঙ নেড়ে পুবে কী পশ্চিমে একবার হাঁক দিক। গাছগাছালি তোলপাড় হোক। শিল পড়ুক। ননদ-ভাজ আঁচলভরে কুড়োবে। দুনিয়ার ছাতি হু-হু জ্বলে যায় এদিকে। পিয়াসী চিড়িয়া বাজপড়া শিমুলগাছের ডালে একলাটি কাঁদে ফ-টি-ক জ-ল।

এই রুখা গরমে মেজাজ ঠিক থাকে না মানুষের। সবজির পাতায় সবুজ জ্বলে যায়। ঠাহর করে দেখ, ধোঁয়া উড়ছে। আমড়ার ডালে দাঁড়কাক ডাকছে। দিনদুপুরে অলক্ষণ। খালডোবার ফাঁকে বুক

ডুবিয়ে জিভ বের করে হাঁপায় গাঁয়ের নেড়ী কুত্তারা। ক্ষেতে ধানপাট শুকিয়ে খড়ি-খড়ি হয়েছে। হেই ঠাকুরবাবা, জেরাসে কিরপা কর।...

বহুদিদি গো। হুই দেখ, মা নিকালিস। দূর থেকে ছোটি ডাকে।

তোর মা খিড়কির দরজায় বেরিয়েছে তো কী হয়েছে! যা, যা, ভাগ। ঘর যাবে না ফুলকলিয়া। মরদেঠা ঘরে ফিরুক, বিচার করুক —তা'পরে কথা।

এতোয়ারীর মা সরস্বতী কপালে হাত রেখে সূর্য আড়াল করে বহুকে খোঁজার চেষ্টা করছে। এই ঘন ছায়ার মধ্যে দুধে-খরিশের মতো বসে আছে বহু। দেখতে পেলে তো! এত নজর বুড়ির নেই। একটু পরেই ছোটি গে বলে দুটো হাঁক মেরে সে বাড়ি ঢুকে পড়ল।

নেহাত বরাতটাই মন্দ। নয়তো এই আজেবাজে গাঁয়ে ফুলকলিয়ার বিয়ে হয়? এই গাঙ বরাবর চলে গেলে রাধারঘাট—তার ডাইনে জেলার সদর শহর। তাও ছাড়িয়ে চলে যাও। সৈদাবাদ ছাড়িয়ে ফরাসডাঙা পেরিয়ে নদীর পাড়বরাবর—যত পুরনো শহর, নসীপুর-লালবাগ জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ ছাড়িয়ে আরো চলো উত্তরে। তারপর পাবে ধনপতনগর। জঙ্গীপুর শহরের কোল ঘেঁষে ছোট্ট সবুজ গ্রাম। সেখানেই তো বহু হবার কথা ছিল ফুলকলিয়ার। হাজার হলেও লিখাপড়হা জানা লোকের গাঁ। তারা ফুলকলিয়ার মর্যাদা বুঝত। তো ফুলকলিয়ার বরাত। সব ঠিকঠাক হয়েও ভেস্তে গেল। ফুলকলিয়া যে লিখাপড়হা জানে না।

আরে, জানে না তো কী হয়েছে। মেয়েরা পণ্ডিত হয়ে কলম চালাতে কাছারি যাবে, না সাইকেলে চেপে বাবুদের গদিতে আনাগোনা করবে? রূপ দেখ, স্বাস্থ্য দেখ—ব্যস। হায় ঠাকুরবাবা, কী হাল হয়েছে মানুষের—রূপ দেখে না, বলে ইলোমদার ঔরত চাই! ফুলকলিয়ার বাবার হাঁটু অব্দি ধুলো—পা ধোবার আগেই গুড়জল খেয়ে শান্তব্যস্ত হয়ে জানিয়েছিল—ছোড় দে, ছোড় দে। সব উল্টা বাত।...

আর বড় অভিমান হয়েছিল ফুলকলিয়ার। তার মনে ততদিনে এক স্বপ্ন। উত্তরের আকাশ থেকে দিগন্তে দৃষ্টি পড়তেই সরমে মন গুটিয়ে যেত। এই নদীতে যে স্নিগ্ধ সুন্দর রূপের ধারা শরীরে শান্তি দিতে চলে আসছে, তার মধ্যে লুকিয়ে-লুকিয়ে একজন জোয়ানের চেহারা দেখে নিত। আহা এমনও তো হতে পারে—আজ সকাল-সকাল সে নাহান করেছে এবং সেই সুন্দর শরীরের স্বাদেভরা জল এতক্ষণে কলাবেড়িয়ার ঘাটে পৌঁছেছে ফুলকলিয়ার জন্যে। বুক ডুবিয়ে বসে থেকে সে কী সুখ ছিল মেয়ের।

তারপর তো দিনগুলো চলে গেল। কলাবেড়িয়ার ঘাট থেকে জল শুকিয়ে কমে এল মাঝবরাবর। তিরতির করে কয়েক ফালি ধারা বয়ে যায়। ফুলকলিয়া দুঃখে রাগে পায়ের পাতা ডোবাতে গিয়ে সরে আসে। পা পুড়ে যায় যেন।

হেই বহু! ফুলি গে। হুয়া ক্যা গে? অ্যাঁ! দেখো, দেখো মেয়ের কাণ্ড!

নির্মলা নাহানে যাচ্ছিল। কাঁধে রঙিন গামছা, হাতে সাবানের কৌটো। নিষাদবাগের এই একটি বউ কাকের ঝাঁকে ময়ূরী। ফুলকলিয়া কতবার ভেবেছে ওর সঙ্গে গঙ্গাজল পাতাবে। কত মজার-মজার কথা জানে নির্মলা। দুনিয়াটার অনেক বেশি পরিচয় তার জানা। হবে না? ওর পুরুষ সবজি বেচে না। পাটের দালালি করে মরশুমে। আবার চৈতালি উঠলে শহরে মহাজন যখন তল্লাটে আসে, তখন সে তাদের সঙ্গে-সঙ্গে ঘোরে। সারাদিন সে পড়ে থাকে শহরের গদিতে। তারও একটা সাইকেল আছে। অল্পস্বল্প লেখাপড়াও জানে। পকেটে নোটবই আর কলের কলম থাকে। ফুলকলিয়া ভাবে ধনপতনগরের পুরুষটিও কি এমনি ছিল?

খিলখিল করে হাসতে-হাসতে দৌড়ে আসে নির্মলা। ক্যা গে? ক্যা হুয়া তেরা?

যেই না কাছে এসে ধুপ করে বসে কাঁধে হাত রাখা, ফুলকলিয়া হু-হু করে কেঁদে ওঠে আবার। কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে জানাতে থাকে সব। শাস মার দেইলা। হুঁ, চুল পাকাড়কে মার দেইলা! মড়াখাকী বুড়ি! আজ বাদে কাল ওই শ্মশানে ভুট্টাপোড়া হবে। শ্যাল-শকুনে ছিঁড়ে খাবে দেখে নিও। ও পুড়বে ভাবছ? মোটেও না। পাথর। স্রিফ পাথর। পরের বেটিকে সবার চোখের সামনে মার লাগাল?

নির্মলা তবু হাসে। শাস পিট্টি দিয়েছে তো কী হয়েছে। আরে, এই তো রেওয়াজ।

নির্মলার শাস বেঁচে থাকলে নির্মলাও পিট্টি খেত। বহু-বেটিদের জন্ম তো শাসের হাতের পিট্টি খেতে। তো ওঠ। চল, গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসি। সব জ্বালাযন্ত্রণা জুড়োবে। দেখবি, তখন কী শান্তি, কী আরাম!

চোখ মুছে তাকায় ফুলকলিয়া। নির্মলা যা বলছে, তা ঠাট্টার কথা সে বোঝে। হুঁ তুমি হলে কী করতে বহিন? বলছ তো ভাল। বলো, কী করতে—যদি শাস ঠুকনি দিত!

হামি? নির্মলা ঠোঁট টিপে হাসে। হামি কুছ না বলত। আরে, আমি তো জওয়ান বেটি। বুঢ়টি মেয়ের হাতের জোব কোথায় যে হামাকে ব্যথা বাজাবে? মার, যেত্তা খুশি মার!

ঠোঁট উল্টে ফুলকলিয়া বলে—বাবার কাছে খবর ভেজছি। দেখো না বাবা কী করে।

নির্মলা ওর গলা জড়িয়ে গালে গাল রেখে চাপা গলায় বলে—ছোড় বাত। শুন রী ফুলি! আজ বিকালমে মেরা সাথ শহর যাবি? এতোয়ারিদা ফিরতে-ফিবতে আমরা ঘরে এসে যাব। যাবি? চুপসে যাবো, চুপসে আবো।

উঁ? একটু অবাক হয়ে তাকায় ফুলকলিয়া।

আ-রী, শাসেব ডর আর করিস না...ফিসফিস করে নির্মলা বলতে থাকে। শাশুড়িটাকে সে কায়দা করে সামলে নেবে। বুড়ি নির্মলার কাছে দুটো টাকা ধার নিয়ে এসেছে কাল। নির্মলা বলবে, বহুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। রিকশোতে যাবে। রিকশোতে আসবে। যাবে কি না ডাগদারের কাছে। তো ফুলকলিয়ারও ছেলেপুলে হওয়া দরকার। এখনও কোন লক্ষণ নেই, এতো ভাল কথ নয়। ডাগদার পরীক্ষা করে দেখুক। টাকা-পয়সা সব খরচ নির্মলাই করবে।

শুনে ফুলকলিয়া বলে—উও বিশোয়াস করবে না।

করবে—ওর ঠাকুরবাবা করবে। নির্মলা একা মেয়েমানুষ যেতে ভরসা পাচ্ছে না বলেই সরস্বতীর বহুকে ধার চাচ্ছে একবেলা। হামি তুমকো রুপোয়া উধার দিইস, তুম হামকে বহু উধার দো না গে!

বলে খিলখিল করে হেসে উঠে নির্মলা। আর এতক্ষণে ফুলকলিয়াও হাসে। সব দুখ চাপা পড়ে গেছে এতক্ষণে। তো সত্যি কি ডাগদারবাবুর কাছে যাবে দিদি?

নির্মলা চোখ নাচিয়ে জবাব দেয়—নেহ রী। ছেনিমা, ছেনিমা দেখব। সমঝা?

ছেনিমা? পটের বাজি? সাচ?

সাচ। তেরা বেটাকো কিরিয়ারী!

চাপা তোলপাড় বুকে নিয়ে ফুলকলিয়া তার পেট থেকে নির্মলার দুষ্ট হাতটা সরিয়ে দেয়। ছেনিমার কথা ছেলেবেলা থেকে সে শুনে আসছে। শহরের মাত্র ক্রোশটাক দূরে বাড়ি—কতবার শহরে গেছে বাবার সঙ্গে। কত কী দেখা হয়েছে। শুধু ওই জিনিসটাই বাদ পড়েছে। তাই বলে বাবাকে মুখ ফুটে বলা তো যায় না। আর আসলে বাবার মত হচ্ছে, ছেনিমা দেখলে বহুবেটির মাথা বিগড়ে খারাপ হয়ে যায়। ফুলকলিয়া ভেবেছে, বাবা যখন বলছে, তখন তাই ঠিক। কিন্তু এমন অনেক বহুবেটি আছে, অবশ্য খুবই কম তাদের সংখ্যা—যারা ও জিনিস দু-একবার দেখে এসেছে—তারা খারাপ হয়েছে কি? কে জানে ভেতর-ভেতর কে কতটা কী হল, কেমন করে বুঝবে? ফুলকলিয়ার দুনিয়াটা খুব ছোট। সেই দুনিয়ায় ছেনিমা জিনিসটা এত দিন ধরে বাদ পড়ে থাকা ঠিক হয়েছে, না ভুল হয়েছে বলা কঠিন। বাবার অনেক মতামতই সে বিশ্বাস করে না। যেমন বাবা বলে, ছটপরবের দিনে নোনতা খেলে মুখ চিরকালের মতো নোনতা হয়। কিন্তু ফুলকলিয়া ইচ্ছে করেই একবার নোনতা খেয়েছিল। মাঝে-মাঝে এই ধরনের ছোটখাট বিদ্রোহ করা তার স্বভাব। যেমন, কাল রাতের ব্যাপারটা। নেচেকুঁদে ধনপতি সরকারের উঠোনে আবও পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে শুয়ে পড়া তার উচিত ছিল না। সে গাঁয়ের নতুন বহু। অনাদের মতো পুরনো হোক, তখন সব সাজবে। এখনই কেন?

ফুলকলিয়া চুল ঝটপট বেঁধে উঠে দাঁড়ায়। বুকের ভেতর চাপা আবেগ অথচ কী ভয়-ভয় আবছা চমক খেলে। দ্বিধায় ঝিলিক দিগন্তের আবছা মেঘে বিদ্যুতের মতো চনমন করে ওঠে তবু। সত্যি কি সে খারাপ হয়ে যাবে—মাথা বিগড়ে যাবে? শেকড়-বাকড়ের মধ্যে চঞ্চল পা ফেলতে গিয়ে টের পায়

উরুদুটো ভাবী হয়ে গেছে যেন। আর নির্মলা তার একটা হাত আলগোছে ধরেছে। এখন একেবারে চুপচাপ। ওর ঠোঁটের চাপা হাসিটা একবার ঘুরেই দেখতে পায় ফুলকলিয়া এবং একটু ছমছম করে গা। পরমুহূর্তে ভাবে, নির্মলার সঙ্গে তার জমে ভাল। গঙ্গাজল পাতাবার ইচ্ছে আছে না? এ মাসেই একটা ভাল দিনক্ষণ দেখে সেটা চুকিয়ে নেবে। বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলে সে।

বটতলার পর ডাইনে শ্মশান। ওপরে নিচু বাঁধ। বাঁধের দুধারে আকন্দ সাঁইবাবলার ঝাড়। ঝোপে সোমলতার ঝালর। জাম, জারুল, হিজলের ঠাসবুনোনি এখানে-ওখানে। তার ফাঁকে কুমড়ো তরমুজ শসাক্ষেত। লাঠির ডগায় মড়ার মাথা বসানো। কারুর ক্ষেতে কাকতাড়ুয়া। ঘটের দুধারে সরবতি শকরকন্দের ক্ষেত। বাবলাকাঁটার বেড়া। নির্মলা হঠাৎ মা রী বলে অস্ফুট ককিয়ে হেঁট হয়। কাঁটা তুলে ফেলে থুতু ঘষে। অশ্লীল গাল দিতে থাকে চাপা গলায়। ফুলকলিয়া বলে—চুপ চুপ। হুই দেখো, সরকারজি মাচায় বসে হুঁকো খাচ্ছে।

হুঁ, সরকারজির মেয়ের বিয়ে। আজই তো বর আসবে বাবলবুনিয়া থেকে। বাড়িতে কত কাজ। তা ফেলে চলে এসেছে সরবতীর ক্ষেত দেখতে। হিজলতলার মাচায় বসে হুঁকো খাচ্ছে। নির্মলা উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে—সরকারজি! জান মার দিইস বাবা! এত্তা কাঁটা! হামি আগ জ্বলিয়ে দেব, হুঁ।

ধনপতি সরকার হুকো নামিয়ে হেঁড়ে গলায় বলে—কৌন গে?

—হামি নির্মলা।

—কুছ্ বলিস্ বেটিয়া?

—হাঁ বাপ। বলিস কী আগ লাগা দেগা তেরা কাঁটামে।

খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বিকট হাসে ধনপতি সরকার। বুকের লোমগুলো সাদা হয়ে গেছে, অথচ মাথার চুল কুচকুচে কালো। মাচা থেকে উঠে গেরিলার মতো দুলতে দুলতে আসে এদিকে। —উও কৌন গে—এতোয়ারিকা বহু? বেটিয়া, তেরা শাস কুছ বোলিস শুনা। আভি শুনা। হামকো ভি গাল দিইস বহুৎ!

ফুলকলিয়া খুব উৎসাহ পায়। মাথাটা জোরে দোলায় সায় দিতে। ভাবখানা এই, তুমি স্বয়ং গাঁয়ের পঞ্চায়েতমোড়ল। তোমার বেটার বিয়েতে গিয়েই আমার কপালে এত লাঞ্ছনা। তার ওপর তোমাকেও গালমন্দ দিয়েছে। দেখি এবার মোড়লের বিচারটা কী দাঁড়ায়।

নোনা আতা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ধনপতি বলতে থাকে—তিনপুরুষ কেটে গিয়ে চারপুরুষ পড়েছে নিষাদবাগে। তোমার শাশুড়ির মতো হিংসুটে মেয়ে কখনও দেখা যায়নি, বেটি। ধনপতির বাবা রঘুপতি, তার বাবা মহাপতি (মহীপতি) এই তিনপুরুষ। মহাপতিয়া ছিল হনুমানজির মতো দেবতা মানুষ। পূর্ণিমা থেকে পায়দল আসছিল ভাগীরথীর দিকে। তো এল, কিন্তু মাটি পছন্দ হল না। তখন হাঁটতে থাকল। দিনরাত হেঁটে মুখসুদাবাদ পৌঁছল। তারপর পৌঁহাতে উঠে ফের হাঁটতে-হাঁটতে বহরমপুর শহর ছাড়িয়ে দুনিয়ার শোভা দেখতে দেখতে নিষাদবাগে এসে দাঁড়াল। বিলকুল জঙ্গল আর জঙ্গল। বাঁকের দুদিকে গেরস্থালির ঝুড়ি, পিছনে বহু, তার কোলে রঘুপতি স্তন চুষছে। তো ঠাকুরবাবা বাতাসের ভাষায় বললেন, বেটা, পঁহুছ গেয়া! ব্যস! মহাপতিয়া ঝুড়ি থেকে কোদাল নিয়ে মাটিতে কোপ দিল। মাটি কি কথা বলল। যাক গে, সে সব বড় পুরনো কথা।

তখন নির্মলা চলে গেছে দহের ঘাটে। গিয়ে হাত তুলে ইশারা করছে ফুলকলিয়াকে। ফুলকলিয়া যায় কেমন করে? ঘোমটা প্রচুর টেনে মাথা দোলাচ্ছে আর দোলাচ্ছে। নতুন বউ। গাঁয়ের মুখিয়ার কথা না ফুরোলে যাওয়া যায় না।

তো বেটি, তেরা শাস—শাশুড়ির কবে না পঞ্চায়েতী হয়। কতবার ওকে বাঁচিয়েছি। গ্রাহ্যই করে না। আজ সকালে গিয়ে মুখে যা না তাই উগরে এল আমার বাড়িতে। বাড়িভরা কুটুম্ব। আমি কিনা মোড়ল মানুষ। শুভ কাজের দিন বলে কান পাতলাম না। বুঝিয়ে-বাঝিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।...বলেই ধনপতি বড়-বড় পা ফেলে পিছনে বাঁধের দিকে দৌড়তে থাকে।

হুঁ, কার একপাল ছাগল ঢুকে পড়েছে। ফুলকলিয়া আরো একটু দাঁড়িয়ে থাকে। শাশুড়ি কী নিয়ে ঝগড়া করতে গিয়েছিল সে খুঁজে পায় না।

আ রী ফুলিয়া! বুঢ়াকা সাথ ক্যা এত্তা বাত রী? নির্মলা চেঁচায়।

দহের ঘাটে ভিড় থই-থই। মোড়লের মেয়ের বিয়ে। তাই অনেকেই আজ গাঁওয়ালে যায়নি। নয় তো খাঁ-খাঁ করে থাকত ঘাট। মাঝে-মাঝে কিছু বাচ্চাকাচ্চার ঝাঁক আসত। বুড়োবুড়িরা এসে তাড়িয়ে নিয়ে যেত। হাঁটতে শিখলেই মানুষ তখন কাজের যন্ত্র। কাজ তাকে করতেই হবে। মেয়ে হও, বা পুরুষ—ন্যাংটা নও কিংবা কাপড় পরার বয়স পাও, গতর না খাটিয়ে পার নেই। একটুখানি বসে থাকলেই তারপর কোন একসময় দেখবে হাঁড়ি খালি। পেটের কুত্তা কুঁইকুঁই করে কাঁদছে। তাই ওঠ, গতর লাগাও। গঙ্গা মা তাঁর দুধারের মাটিতে অমৃত মিশিয়ে রেখেছেন। নরম সাদা জমানো দুধের মতো এই মাটি বড় উর্বর। একটু মেহনত করলেই মুখিয়ে উঠবে একচিলতে জীবন—তার রঙ ঈষৎ হলুদ। সেই হলুদ একদিন গাঢ় সবুজ হবে। তখন তোমার সুদিন। কুমড়ো ফলাও। শকরকন্দ সরবতী আলুর লতা পোঁতো। শশাক্ষেতে শ্মশান থেকে মড়ার মুণ্ডু এনে টাঙিয়ে রাখো। শহর থেকে আনো ইঁদুরমারা বিষ। আর বিষই বা কতরকম আছে। মরশুমে মরশুমে কত সবজি কত শস্য—তেমনি তার কত শত্তুর।

প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্ন সৃষ্টি করলেন। সে এক ঔরত। ঢলো-ঢলো লাবণ্য তার। তো মানুষ বললে, ঠাকুরবাবা! শুধু শুখা অন্ন যে গলায় আটকে যায়! তখন অন্নরানীর দুই পাঁজরের মাংস থেকে ব্রহ্মা ঠাকুর বানালেন দুই ঔরত—ভুরি ঔর ভারি। একজনকে বললেন—তুই থাক বেটি মাটির ওপরে। আরেকজনকে বললেন—তুই চলে যা মাটির তলায়। তো এই দুই ঔরতের জিম্মাদারী দিলেন যাকে—তার থেকেই তাদের জন্ম। মানুষকে তরিতরকারি জোগাতেই তাদের জীবন কাটে।

সেই জীবনের বহুৎ দুখ। মেয়েদের দেখনশোভা চুলের রাশি যায় চেপ্টে, আর পুরুষের কাঁধে ভারবওয়া কালো ছোপ পড়ে যায়। নিষাদবাগের দু-তিনটি মানুষের বরাত—তাদের এই দুঃখ নেই। যেমন নির্মলা আর তার বর শরৎ, আর যেমন ধনপতির লিখাপড়হা জানা ছেলে সূর্য। স্বয়ং ধনপতির কাঁধে কালো ছোপ রয়েছে। তার ছেলে সূর্য হাত ফুল-ফুল পা ফুল-ফুল চেকনচাকন গতর। খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে। কাঁধে ঝোলা অবশ্য থাকে। তাতে কাগজপত্তর এক ছটাকও ওজন নয়।

লখিয়ার মা নাক তুলে সাবানের গন্ধ পেতেই মুখ বাঁকা করেছে। সোডায় সেদ্ধ কাপড় কাচছে সে। আপন মনে গজগজ করছে। তার গায়ে ফুলকলিয়ার ছায়া পড়তেই মুখ তোলে আবার।—শাস মারিস তোকে? কাহে গে?

গা জ্বলে যায় ফুলকলিয়ার। যেন দুনিয়ায় একটা নতুন কাণ্ড ঘটেছে। হু মারিস্! উসকী তাকত বড়ী! গাল দিইস্ দুচারঠো!

লখিয়ার মা কিন্তু-হেসে ফেলে। উ বড়ী হাতউয়ালী ঔরত। ছোড় দে বেটি। তবে কথাটা হচ্ছে, সরস্বতী দিদি যতই দজ্জাল হোক, মনটা খুব নরম। আসার সময় কেঁদেকেটে বলছিল লখিয়ার মাকে—বড় ঘর দেখে বিয়ে দিলাম বেটার। বড় ঘরের বেটি। সারারাত ইদিকে বেটা আমার নিদের ঘোরে গোঁ-গোঁ কবল কুস্বপ্ন দেখে। আমি না থাকলে কে জাগাত, শুনি? বুঝলি দিদি আমার, রাগ কিসের—দুঃখই বা কিসের? আজ যদি আমি মরি, ছেলেটার দুর্দশার চূড়ান্ত হবে! সাদাসিধে গোবেচারা ছেলে। খিদে পেলেও টের পায় না, যদি না মনে করিয়ে দিই। গাঁওয়ালে গিয়ে কী কাণ্ড করে শোন। এখনও বাটখারা চেনে না। দু'সের পটল বেচে একসেরের দাম নেয়। রোজ রোজ এই রকম কাণ্ড। তাই দেখেশুনে ভালঘরের বুদ্ধিমতী মেয়ে আনলাম। ওকে আকেলদারি শেখাক। তো হা ঠাকুরবাবা! এ বেটিও যে তেমনি দুধে ধোওয়া কাপড়!..

এইসব শুনে ফুলকলিয়া নরম না হয়ে পারে না। বলে—কুছ না কাকী, ছোড় দে।

নির্মলা চোখে ঝিলিক তুলে বলে—আয় রী! তোকে সাবান মাখাই।

সরমে মুখ রাঙা হয়ে ওঠে ফুলকলিয়ার। ঘাটে দুচারজন পুরুষ মানুষও আছে। তাদের সামনে এ কী কথা! সে অস্ফুট স্বরে বলে—নেহী রী।

নির্মলা খপ করে তার হাত ধরে টানে। ফুলকলিয়া হুড়মুড় করে জলে পড়ে যায়। আর নির্মলা তার সাদা সাবানটা ওর গলার কাছে ঘষতে-ঘষতে বলে—চুপচাপ বৈঠো থাক। বাত করিলে শাসকা মাফিক মার দেগা।

ঘাটসুদ্ধ লোক ঘুরে দেখছে আর হাসছে। কচিকাঁচাবা হাততালি দিচ্ছে। আজ নিষাদবাগের মোড়লের বাড়ি বিয়ে। এমনদিনে এমনটি তো হবেই। কতজনের কাপড়ে লাল রঙ। কাল রাতে পিচকিরি করে লাল রঙ ছড়িয়েছে ছেলেরা। ফুলকলিয়াকেও রেহাই দেয়নি। সেই লাল রঙ সাবানের ফেনার সঙ্গে মিশে ফুলকলিয়ার গা লালচে হয়ে উঠেছে। লখিয়ার মাও শেষ অব্দি বলে—আচ্ছাসে পাখলা কর বেটিকে। ওর শাস ভাববে—এ যে এক রাজার বেটি রাজকনে। রূপের বাহার খুলবে। তখন কোন সাহসে গায়ে হাত তুলতে যায়?

ফুলকলিয়া হার মেনেছে। চুপচাপ বসে আছে হাঁটু জলে। নির্মলা হাসছে আর তার বুকের কাপড়ের তলায় সাবান ঘষছে নিলাজে। গঙ্গার দহে সূর্যের ঝলমলানি। এখনও দুপুব হয়নি। দূরে বালির চড়ায় শকুন বসে আছে। ওপারে ধূসর কলাবেড়িয়া যেন চোখে খুশি নিয়ে তার এক বেটির কদর দেখে তারিফ করছে।

মুখে ঘষতেই মা রী বলে আর্তনাদ করে ওঠে ফুলকলিয়া। তারপর পিছলে চলে যায় গভীব জলের দিকে। কার সঙ্গে ধাক্কা লাগে, গ্রাহ্য করে না। মুখ তুলে চোখ কচলায়। নির্মলা ততক্ষণ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। ফুলকলিয়া বারবার ডুব দেয়। কতক্ষণ পরে নির্মলা পাশে এসে ফিস-ফিস করে বলে—কিসকা সাথ ধাক্কা খাইস রী? মা গে মা। ধনপতি বুঢঢাকা বেটা সুরুজ!

আ ছি ছি! চমকে দ্রুত ঘোরে ফুলকলিয়া। হ্যাঁ সূর্য। মুখ ফিরিয়ে কোমর জলে দাঁড়িয়ে গায়ে গামছা ঘষছে। ঘাটে সূর্য ছিল, পোড়ার চোখদুটো তাও লক্ষ করেনি। আর নির্মলার কী আক্কেল! ছি ছি! গায়ের মাথা-লোকের বেটা লিখাপড়হা জানা পুরুষ মানুষটার সামনে এ কেলেঙ্কারি হয়ে গেল! মেয়েদের এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। কথা উঠবেই পঞ্চায়েতে।

আর কে কে দেখল ব্যাপারটা—ঘুরে দেখতে-দেখতে আবার আঁতকে ওঠে সে। ঘাটের ওপরে বেড়ার ধারে ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে আছে তার শাশুড়ি। হাতে ছাগলের দড়ি। ছাগলটা এদিক-ওদিক টানাটানি করছে। বুড়ি ঠায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে।

ফুলকলিয়া আপন মনে হিস-হিস করে বলে—ছোড় দে রী! হুঁঃ!

* * *

সমাজের হিসেবে একটু বেশি বয়সেই বিয়ে হয়েছে এতোয়ারির। বেশি মানে কতো, সে-হিসেব এতোয়ারি দিতে পারবে না। সে ওব মা জানে। আর জানে ধনপতি মোড়ল, নয়নসুখ, মেনকা কিংবা আরো জনাকতক বুড়োবুড়ি। সেই যেবার খরায় দিনদুপুবে আগুন লেগে নিষাদবাগ বিলকুল ছাই হয়ে গিয়েছিল, গঙ্গাবাঈজীর দহে একহাঁটু মাত্র জল ছিল, ক্ষেতের শস্য শুকিয়ে চিমসে হয়ে যাচ্ছিল—সেইবার এতোয়ারির মা সরস্বতী তাদের গাবগাছটার তলায় মোটাসোটা একটা বাচ্চা বিইয়েছিল। সেদিন ছিল মহুলার হাটবার। রবিবার। তাই বারের নামে বাচ্চাব নাম হয়েছিল এতোয়ারি। ভাগ্যিস সরস্বতী সেদিন যায়নি।

গেলেই বা কী হত! শরতের বউ নির্মলা বলেছিল এতোয়ারির বিয়েব সময়। গেলে এতোয়ারিদার নাম হত হাটু! আর তাই শুনে যার নাম হাটু, নয়নসুখের ভাগ্নে—সে খামোকা রেগে আগুন। হাটে গিয়ে মায়ের পেটে ব্যথা উঠল আর পাশের স্কুলবাড়ির পিছনে কল্কে ফুলের ঝোপে বাচ্চা বিয়োল—তাতে দোষটা কী হয়েছে? ঠাকুরবাবার এই দুনিয়ায় যেখানে হোক, তুমি জন্মাও, বাঁচো, বিয়ে করে ছেলে-পুলের বাপ হও—এটাই তো নিয়ম। হাঁ গে নির্মলাবউদি, এক হি বাত হামাকে সমঝে দাও দিকি, মানুষ কি আসমানে জন্মায়, নাকি হাওয়া বাতাসে? তুমি কোথায় জন্মেছিলে গে? কোন আসমানে, কোন বাতাসে? হাটুর রাগ দেখে নির্মলা গালে হাত রেখে চোখ বড়ো করে অবাক আর অবাক। আসলে হাটুটা বড্ড রগচটা ছেলে। কম বয়সেই বুড়োর মতো হালচাল। ত্রিভঙ্গ হাড়-মোটা গড়ন। গাঁয়ের রসিক বউরা বলে—হাটুয়া! ভারি-ভুরির পুজো দে। তোকে কেউ বিয়েই করবে না রে! তা করবে না তো করবে না। হাটু তখন কিন্তু বড়ো বড়ো দাঁত খুলে হাসে।

রবিবার, হাটবার, একইদিনে জন্ম, এইগুলো মিলিয়ে হাটুর সঙ্গে এতোয়ারিব গলায় গলায় ভাব। দুজনেই বেশ ভারিক্কি চালের জোয়ান। বয়সের হেরফেরে কিছু যায় আসে না। একদিন গাঁওয়াল সেরে

ফেরার পথে হাটু হঠাৎ বলেছিল-ভাই এতোয়ারি, বিয়ে যদি করি একঘরেই করব দুজনায়। এক বাড়ির দুইবোন। তা শুনে এতোয়ারীর গম্ভীর মুখে যা হাসি ফুটল, ভাবা যায় না। সোনাইতলার মাঠে ঢেলাই চণ্ডীর থান। সেখান দিয়ে আসতে-যেতে সবাইকে একটা করে ঢিল ছুঁড়তেই হয়—নয়তো পাতক লাগে। সেদিন দুই বন্ধু দু'খানা ঢিল ছোঁড়ার সময় মনে মনে কী প্রার্থনা করেছিল, পাথরে মাথা ঠুকে দিলেও বলবে না কাকেও। তখন অবশ্যি বয়স ছিল আরও কম। এতোয়ারী তার বিয়ের পর হাটুকে বলেছিল—মা ঢেলাইচণ্ডী যদি কথা না শোনেন কারও কিছু করার নেই—এই হচ্ছে মুশকিল। হাটু বলেছিল—ছোড় দো। ছেড়ে দাও।

কলাবেড়িয়ার মান্যবর মোড়লের মেয়ে মোটে একটাই। মা ঢেলাইচণ্ডী কী আর করবেন? এ দিকে নয়নসুখের ভাগ্নেটার মা নেই বাবা নেই—মান্যবরের আরেক মেয়ে থাকলেও সে কনে কেনার টাকা কোথায় পাবে? বেচারা নয়নসুখের নিজের ছেলেটার বিয়ে হবে কি না তার ঠিক নেই তো ভাগ্নে! বাপরে বাপ! মান্যবরের যা টাকার খাঁকতি। ফুলকলিয়াকে কিনতে এতোয়ারির মা বা সরস্বতীর সর্বস্ব ঘুচে গেছে। তিন বিঘে ক্ষেতের এক বিঘে বিক্রি, এক বিঘে বন্ধক গেছে মহাজনের ঘরে। মহাজন আবার যে সে নয়, রাধারঘাটের ছোটেলালজি। ফি বছর শহরের সদরঘাটটা ডেকে নেন তিনি। লোকে বলে ঘাটোয়ারিবাবু—কেউ বলে ঘাটবাবু। এলাকায় সুদে টাকাও খাটান। কলাবেড়িয়া-নিষাদবাগ-জীবন্তী থেকে মহুলা অব্দি তাঁর সুদের মধ্যে কারবার ছড়ানো। ইতিমধ্যে গঙ্গার দু'ধারে কত ক্ষেতির মালিক হয়ে বসেছেন, লেখাজোকা নেই। হতভাগা হাটুর নিজের দু'এক টুকরো ক্ষেতি থাকলে তো ছোটেলালজির কিরপা পাবে!

অতএব বিয়ের নামে আপাতত হাত ধুয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় কী হাটুর? কিন্তু মুখে অন্য বুলি—আরে দূর দূর! ঔরত মানেই হরেক ঝামেলা। এই তো এতোয়ারি কলাবেড়িয়া মোড়লবাড়ির মেয়ে ঘরে এনেছে—সুখটা কী পাচ্ছে সমঝে দাও হামাকে। দেমাগ খারাপ করতে হচ্ছে সারাক্ষণ। এতোয়ারির মা কী ছিল, কী হয়েছে দেখে এসো। দিনরাত বকবক ঝকঝক খই ফুটছে মুখের। উঠোনে চিল-শকুন উড়ছে। গিদেরে পা মাটিতে পড়ে না কলাবেড়িয়া মেয়েটার। মরদ, না বলদ এতোয়ারিটা?

এতোয়ারির সামনেও ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথাগুলো বলছে হাটুয়া। শুনে এতোয়ারি একটা বড়োরকমের নিশ্বাস ছেড়েছে। ঠিকই বলছে হাটুয়া। কী দরকার ছিল অমন রাক্ষুসে জেদের? মায়ের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আসলে। জীবন্তীর বেণুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল। পণটন নগদ চায়নি। তবে গয়না-পত্তর দিতে হবে। মহুলার স্যাঁকরাকে বায়না দেওয়াও হয়েছিল। বিয়ের দুদিন আগে বেণুর মেয়েটা ইটভাটার এক কর্মচারী শচীবাবুর সঙ্গে রাতারাতি ভেগে গেল। সখ করে বেণু গাই-গরু পুষত আর যুবতী মেয়েকে পাঠাত দুধ নিয়ে শচীবাবুর ডেরায়। গাঁয়ের বাইরে ইটভাটা। বাঁশবন চারদিকে। ওপাশে পাকা সড়ক। ভাটার একপাশে বাঁশতলায় ইটবাবুদের দরমার ঘর। শচীবাবু বামুনের ছেলে। তার মাথা খারাপ। তবে রূপসী বলতে হবে বেণুর মেয়েকে। গরিবের ঘরেও তো চাঁদের আলো এসে হেসে যায়—এই হচ্ছে ঠাকুরবাবার মহিমা।

এতোয়ারি কতদিন জীবন্তী গাঁয়ের পথে বেণুর বাড়ির পাশ দিয়ে যাতায়াত করেছে। মুখ তুলে দেকতে ভারি লজ্জা করেছে তার। আড়চোখে দেখেছে বেণুর মেয়ে গাইগরুটার দড়ি ধরে দৌড়াচ্ছে। মুখে একশো গালমন্দ। গাইগরুটাই লেজ তুলে দৌড়চ্ছে। আসলে মেয়েটা ভাল নয়। বুঝতে দেরি হয়েছে এতোয়ারির। এই! এই লোকটা ধরো!—ধরো! এতোয়ারি হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। পাশ দিয়ে গরুটা দৌড়ে গেল। দড়ির ধাক্কায় ওর কাঁধের ভার টালমাটাল হল। তখন তার কাছে এসে বেণুর মেয়ে বলেছিল—ভারি হাঁ'করা লোক রে বাবা! বাড়ি কোথায়? এতোয়ারি ওর দিকে তাকাতেই পারেনি। আর মেয়েটার মুখে পরিষ্কার বাংলা বুলি। স্বজাতির মেয়ে, তা বোঝে সাধ্যি কার? যেন বাঙালি বাবুবাড়ির মেয়ে।

আবও কতবার দেখেছে মাথায় গোল করে গামছার বিড়ে বসিয়ে তাতে দুধের ঘটি রেখে দিব্যি নাচনীর মতো হাঁটছে। সঙ্গী হাটুয়া চাপা গলায় বলেছে—তেরা বহু লাগে বে এতোয়ারি! দেখ দেখ! এতোয়াবি লজ্জায় লাল হয়ে বলেছে—ছোড় দে বে!

কিন্তু ছেড়ে দেওয়া সহজ ছিল না। মনে-মনে ঘর বেঁধে ঘরকন্না করে এতোয়ারির মতো চাপা যুবকের দিনকাল খুব ভাল কেটেছিল। তো পরে বিনিপণে বিয়ে দেবার রহস্য ফাঁস হয়ে গেল বলা যায়। বেণু যেভাবে হোক, যত শিগগির হোক, মেয়েকে পর-হাতি করতে চেয়েছিল। অমন বোলচালওয়ালী নিলাজ মেয়ে, অমন জাতনাশা মেয়েকে স্বজাতির কারও ঘাড়ে চাপাতে পারলে খুব বেঁচে যেতে বেণু। জেনেশুনে গাঁয়ের বা পাশের কোন ছেলে ওকে নিতে চাইবে? অতএব তিনক্রোশ দূরে গঙ্গা পেরিয়ে নিষাদবাগে সম্বন্ধ হচ্ছিল।

এতোয়ারির মায়ের কাণ্ডটা দেখ। সে তো গাঁওয়াল-ফেরা পুরুষ-চরানী মেয়ে। কত তার জানাশোনা খোঁজ-খবর। বেণুর মেয়েটা যে খারাপ তাও কি জানত না? হাটুয়া বলেছে—আলবাৎ জানত মাসি। জেনেও তোর গলায় ঝুলিয়ে দিতে যাচ্ছিল। আসলে কী জানিস ভাই এতোয়ারি? ঔরতলোক স্রিফ নাদান—বোকা! বোকার হদ্দ।

ওদিকে রেগে-মেগে সরস্বতী বলেছে—শাসের পাল্লায় পড়লে সব মেয়ে ঠিক হয়ে যায়। সে মওকা যে মিলল না। নয়তো গাঁওয়ালারা দেখত, কী হত। এত যে ঝাঁকে-ঝাঁকে বহু বহুড়ী এসেছে নিষাদবাগে। কার বুকে এত হিম্মত বলুক তো ঠাকুরবাবার থানে হাত রেখে—হামি বিলকুল সাচ্চা মোতি! সব দেখতে-দেখতে হামার চুল পাক গেইলা গে! হামি শ্মশানবাগে পাঁও বাঢ়াইলা গে!

সরস্বতী তার জীবনে দেখেছে, শাসনই হল বউগুলোর মোক্ষম দাওয়াই। যত বেচালের মেয়ে হোক, শাশুড়ি চোখে-চোখে রাখবে আর উঠতে-বসতে শাসন করবে—ব্যাস, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কোনো-কোনো মেয়ে ঘরে অনেককাল আইবুড়ি থাকলে একটু-আধটু বেচালে হাঁটে। ওটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। সংসারে তোমার একজন বহু দরকার, এই হল আসল কথা। বেণুর মেয়েকেও বারকতক চুলের ঝুঁটি ধরে দুচারটে চড়-থাপ্পড় দিলে সব বদখুন নিকলে যেত দেখতে। তারপর গঙ্গামাঈজির বুকে আচ্ছাসে চুবিয়ে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরবাবার থানে মাথাটা ঘষে দিতে। তখন বিলকুল নদী কা পানি নদীমে বয়ে যেত।

তবে ফুলকলিয়ার তেমন কোন বেচাল নেই। তাই অতটা বাড়াবাড়ি সরস্বতী বুড়ি করেনি এতোদিন। সরস্বতী যেন তাকে পেটের বেটির মতো ভেবেছে। খাওয়ার সময় যত্নআত্তি করেছে। প্রথম-প্রথম এতোয়ারি ভেবেছিল, বড়ঘরের মেয়ে বলে এত খাতির। পরে বকুনি, গালমন্দ এবং শাসনতর্জন দেখে সে আশ্বস্ত হয়েছিল। শাস বউকে সবসময় খাতির করে চলছে দেখলে গা ছমছম করে। বউয়ের পাশে শুয়ে মরদটাও ভাবে, খুব ইজ্জতওয়ালী মেয়ে—না জানি কিসে খুঁত ধরে বসবে।

এতোয়ারি সেই সম্ভ্রম দেখিয়েছে গোড়ায়। আজকাল আর এতটা করে না। কিন্তু টের পায়, মান্যবরের মেয়ে যে তাকে মরদ বলে গ্রাহ্যই করে না। শুতে না শুতে ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোয়। গায়ে হাত রাখলে বা কাছে টানলে কোন সাড়াই নেই। অগত্যা অভিমানে সরে আসে এতোয়ারি। চিত হয়ে শুয়ে থাকে। পায়ের ওপর পা, বুকে দুই হাতের আঙুলে আঙুল। চালে ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে-শুনতে ঘুম এসে যায়।...

কিন্তু আজ এতোয়ারির ভাল ঘুম হয়নি। চোখদুটোর জ্বালা বেলা বাড়তে-বাড়তে খর হয়ে উঠেছে। কাঁধের ভার ওজনদার ঠেকছে। হেই হাটুয়া। জেরাসে থাম বে! বুনো ঘোড়ার মতো দৌড়সনে। তুই দৌড়লেই বা কী, না দৌড়লেই বা কী—গাঁগে রাম যেখানকার সেখানেই থাকবে।

হাটুয়া বরাবর আগেই হাঁটে। খালি-খালি হাঁটতে দাও ওকে। মনে হবে একটা কচ্ছপ। দিনভোর হেঁটেও কূল পাবে না। কিন্তু কাঁধে ওজনদার ভার পড়লে সে গুলবাঘার মতো দৌড়বাজ। আর সে কী ছন্দতাল! ত্রিভঙ্গ মোটা হাড়ের গতর তার মটমট করে আওয়াজ দিচ্ছে। মাঠের ধারে বিশাল গাছটার ঘন ছায়া দেখিয়ে সে আঙ্গুল তোলে—হুঁয়া যাকে বিড়ি খাব।

—বাত হ্যায় বে। কথা আছে এতোয়ারির। তার তামাটে মুখে রোদ ধোঁয়াচ্ছে। গলায় নুনের সাদা কণা জমেছে। বাঁ হাতটা ছড়িয়ে দিয়ে শূন্যে কিছু আঁকড়াতে চাইছে যেন। ডানহাতে নাকের ডগা অনেক কষ্টে মুছে ফের বলে বাত আছে। শুন বে!

হাটুয়া দাঁড়ায় অগত্যা। দাঁড়ালে কষ্ট। হাঁসফাঁস করে বুক। ভারবাহী মানুষের এই এক মজা। তালে-

তালে চললে আরাম। থামলে কষ্ট। ক্যা বাত রে ভাতিজাকা বেটা? সে দাঁত বের করে হাসতে-হাসতে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলে। রাতমে বগু তোর গলা ধরে শোয়নি তো কী হয়েছে? আজ শোবে। পঞ্চায়েতজির মেয়ের 'বিভা' বলে কথা।

এই গরমে মাঠের মধ্যিখানে তামাশা ভাল লাগে না এতোয়ারির। সে হাটুয়ার পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যায়। যেতে-যেতে বলে—হরবখত তামাশা রে! তোর বয়স যত বাড়ছে, তত বাচ্চা হয়ে যাচ্ছিস।

হাটুয়া তবু দাঁড়িয়েই থাকে। চেরা গলায় চেঁচিয়ে বলে—বাঃ বাহা রে বাঃ! ইঞ্জিনকা মাফিক চলে যাচ্ছিস যে? হামাকে দাঁড়াতে বলে নিজে টাট্টু বনে যাচ্ছিস! বাহা রে!

তবু এতোয়ারি দুলতে-দুলতে সামনে পা ফেলছে দেখে অগত্যা সে দৌড় শুরু করে। হাটুয়াকে পেছনে ফেলে যাবে, এতোয়ারির অত তাকদ নেই। নিষাদবাগের সবাই জানে, হাটুয়া কাঁধে কতটা ওজন নিয়ে কতটা পথ দৌড়ুতে পারে। তার দুই কাঁধের দগদগে কালো ছোপ দেখলে মনে হবে মোষের কাঁধ। একদমেই এতোয়ারির পাশ কাটিয়ে কচি পাটের ক্ষেত ভেঙে হাটুয়া চেঁচায়—আয় রে দেখি!

এতোয়ারি গুম। আপন বেগে হাঁটে। একটা কথা বলবে ভেবেছিল, হাটুয়া অমন বাজে তামাশা করল—এতে তার দুখ বেজেছে মনে। আসলে এতোয়ারির এই হচ্ছে স্বভাব। মুখ খোলে কম—নেহাত মনে কিছু ভেসে না এলে এমন গলায় বলে ওঠে না—একঠো বাত আছে। তখন যদি বলা না হল তো তার গুরুত্ব ফুরিয়ে গেল এতোয়ারির কাছে। একটু পরে যখন হাটুয়া তিলের ক্ষেত পেরিয়ে সেই বড় গাবতলায় ঢুকেছে, তখন এতোয়ারির মনে কথাটা অনেক ফিকে হয়ে গেছে। বলেই বা কী ফল হত, হাটুয়াটা যা গল্পবাজ আর যা বকবক করা স্বভাব, মুখ ফসকে বলে দিত লোকজনের সামনে। অতএব থাক, ঠাকুরবাবা যা করেন, ভাল সমঝেই করেন।

গাঁওয়াল-করা মানুষদের কাছে নিজের গাঁ-গেরাম বাদেও কত জায়গা, কত রাস্তাঘাট, আঁকাবাঁকা আলপথ, দু'ধারে রাঙাতিতার বেড়া, কত মাঠ, নিঃঝুম বনজঙ্গল যে আপন হয়ে ছড়িয়ে আছে পৃথিবীতে। দূর থেকেই এই গাব গাছের মাথা চোখে পড়লেই মনে হয় আপনজন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এখানে-ওখানে এমন কত জায়গায় সকাল-দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যায় স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ছায়ায় ঢুকতেই মনে হয়, এও এক ঘর। একবুক আরাম নিয়ে ক্লান্ত লোকটার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

—বোল রে এতোয়ারি, ক্যা তেরা বাত?

হাটুয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে এতোয়ারি একটু হাসে। বলার মতো কিছু না রে ভাই। মেচবাত্তিঠো দে। বিলকুল ভুলে গেছি কৌটোটা আনতে। এক বান্ডিল বিড়ি ছিল, একঠো মেচবাতি ছিল। কাল-বিকেলে জীবন্তীর বাজারে কিনেছিলাম। তো এই বিড়িটা কানে গোঁজা ছিল। টানতে-টানতে বুতে গেল, তাই।

এমন ভুল বেশ গুরুতর। এতোয়ারির ভুলো মন নিয়ে অনেক গল্প আছে। কিন্তু বিড়ির বেলা তো খাটে না। বিড়ি না খেলে তার মনে হয় জীবনটা ফাঁকা হয়ে গেছে। চুপ করে বসে আকাশ দেখতে-দেখতে বিড়ি টানা তার অভ্যেস। হুঁ, গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে তার মনে কী যে তোলপাড় চলছে, বলেই বা কী হবে? তারপর রাতের বেলা সেই ভয়ঙ্কর শুয়োরের স্বপ্ন। গঙ্গার তলা থেকে গাঁক-গাঁক করে তেড়ে আসছে মোষের মতো প্রকাণ্ড শুয়োর—এতোয়ারির দিকেই তার লক্ষ। মা ভোরবেলা কুলোয় বাসিচুলোর ছাই নিয়ে দোরগোড়ায় উড়িয়ে দিয়েছে—যে ভঙ্গিতে চৈতালি ফসল ঝাড়া হয়। ওই ছাই কুস্বপ্নের কু-টুকু নষ্ট করে দেবে। কিন্তু এতোয়ারির মনে গণ্ডগোল বাড়ছে আর বাড়ছে—যত বেলা বাড়ছে। কাল সন্ধেবেলা গাঁওয়াল থেকে ফিরে খেয়েদেয়ে গঙ্গার ধারে মাঠ সারতে বেরিয়েছিল সে। ঝোপের আড়ালে বসে কথাটা শুনেছিল। শরৎদার বহু নির্মলা চাপা গলায় অঞ্চলার সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ কানে এল নির্মলা অঞ্চলাকে বলছে—তিশঠো টাকা, সাতভরি চাঁদি। বোল রী বোল্। এত্তা কৌন দেগা, শোচকে বোল্।

এর মানে কী? কিসের টাকা-চাঁদি, কে কাকে দেবে? এতোয়ারি ভেবে কূল পাচ্ছে না সেই থেকে। অঞ্চলা বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি আছে। স্যাঙাব কথা তুললে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। নির্মলা কি

তার বিয়ে লাগাচ্ছে আবার, তাই লোভ দেখাচ্ছে মেয়েটাকে? অঞ্চলা ইদানীং এতোয়ারিকে দেখলে কেমন চোখে তাকায়, কেমন বাঁকা হাসে। এতোয়ারি সাদাসিদে মানুষ। মেয়েদের দিকে পুরো চোখ তুলে তাকাতেই পারে না। তবে কি না ওই বাঁকা হাসি ছুরির ধারে মনের কোনখানটা কেটে যেন ঘা করে দিয়েছে। কেন এমন হাসে তাকে দেখে? এক ছেলের মা অঞ্চলা। ইচ্ছে না করলেও তার বড়বড় স্তনদুটো দেখা হয়ে যাবেই—এমন বেইজ্জতে মেয়ে। সবার সমুখে ছেলেকে মাই দেবে আর ছেলেটা হাত বাড়িয়ে অন্য স্তনটা একেবারে উদোম করে ফেলবে—এ ভাবেই কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে। সেদিন অঞ্চলা এতোয়ারিদের বাড়ি এল ঘুঁটের আগুন নিতে। এসে চুলোর পাশে হাত-পা ছড়িয়ে বসল তো যাবার নাম নেই। এতোয়ারির সেদিন ক্ষেতির কাজ ছিল বলে গাঁওয়ালে বেরোয়নি। অঞ্চলা ফুলকলিয়াকে কী তামাশা না করল! ফুলকলিয়া রেগে কলসি নিয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে বেরোল। একটু পরে সরস্বতী বুড়িও ছোটাকে ফুটন্ত ভাত দেখতে বলে ছাগল বাঁধতে বেরোল। আর ছোটার সামনেই অঞ্চলা এতোয়ারিকে বলে বসল কি না—অ্যাই এতোয়ারিদা! হামি তোমার বিয়েতে কেত্তা নাচ নেচেছিল, তো সুন্দরী বহু পেয়ে হামাকে ভুলেই গেলে! আরে বাবা! হামি না হয় তোমার বহুর মতো সুন্দরী নই, তাবলে মেয়ে তো বটি।

এতোয়ারি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলেছিল—তো?

—তো? অঞ্চলা সেই বাঁকা হাসি ছুঁড়ে বলেছিল—হুঁ, কুছ নেহি। আপনে সমঝো।

ঘুঁটেয় ধোঁয়ানো আগুন নিয়ে যেভাবে সে বেরিয়ে গিয়েছিল, এতোয়ারি ভয়ে সারা—যেন নিষাদবাগে আগুন লেগে তার জন্মের বছরটার মতো সব ছাই হয়ে যাবে। সময়টা শুখার। প্রচণ্ড হাওয়া বইছে। চারপাশে পাটকাঠি বিচালি খড় আর কাঠের গাদা। এক পলকে সব জ্বলে যাবে।...

অঞ্চলার খারাপ মেয়ে বলে গাঁয়ে বদনাম অবিশ্যি নেই। বিয়ে হয়েছিল বেল লাইনের ধারে একটা গাঁয়ে। তার স্বামী রেল লাইনের মাঝবরাবর কাঠে পা ফেলে কাঁধে ভার নিয়ে গান গাইতে-গাইতে আসছিল। এমন সময় পিছন থেকে রেলগাড়ি এসে পড়ে। নিজের গানের আওয়াজে রেলের বাঁশি শুনতে পায়নি। বিধবা হয়ে দিনকতক ছিল ওখানে অঞ্চলা। তারপর আর পোষাল না। সেই শাস-বহুড়ির চিরকেলে কোঁদল! ছেলে কেড়ে নিত—না নেয়ার কারণ মাই টানবার বয়স যায়নি ছেলেটার।

কিন্তু ওইসব কথা, অমন কথার ভঙ্গি, চোখঠার বাঁকা হাসি দেখেশুনে নতুন বহুটার মনে কী ধারণা হবে মরদ সম্পর্কে, অঞ্চলার বোঝা উচিত। ভাগ্যিস শেষ বোলচালটা ফুলকলিয়া শোনেনি! শুনলে ভাবত, বিয়ের আগে থেকে দুজনের মধ্যে একটা 'নটো-ঘটো' ছিল।....

—আবে এতোয়ারি! বাতঠো বলবি, না বসে-বসে বিড়ি ফুঁকবি?

অপ্রস্তুত হাসে এতোয়ারি। না ভাই, ওঠ। খুব আরাম করা গেল। সামনে শঙ্খদহ। বাবুভদ্রলোক আছেন কয়েকঘর। সব মাল ওখানেই খতম হয়ে যাবে। কী বলিস?

হাটুয়া বড়ো-বড়ো দুটো কুমড়ো এনেছে। পেঁপে এনেছে অনেকগুলো। পাকা কলা এনেছে থড়ি পাঁচেক। বাকিটা মুসুর। মুসুরগুলো অন্নদির। মধুকাকার মা অন্নবুড়ি হাটুয়াকে বড্ড স্নেহ করে। হয়তো অ্যাদ্দিন মামার গালমন্দ আর মামাতো ভাইবোনদের চিমটি কাটার জ্বালা থেকে হাটুয়া বাঁচার রাস্তা হাতড়াতো। অন্নদি ইদানীং বলে— হাটুয়ারে! শোচ মাৎ করিস ভাই! তোর বিভা হামি লাগাবই লাগাব। আ ছি ছি! জিভ কেটে হাটুয়া বলেছে—ও কী বাত অন্নদি! হাম বিভা মাৎ কিবে।

আঁকাবাঁকা আলপথ ঘুরে-ঘুরে চলেছে শঙ্খদহের দিকে। মাঠ ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। হাঁফ ধরে যায়। ফুসফুসে চাপ লাগে। মুখ হাঁ হয়ে দম ফেলতে হয়। এইসব সময়ে মনে হয়, জীবনটা মোটেই সুখের নয়। এতোয়ারি ভাবে সে যদি ধনপতির ঘরে জন্ম নিত, তো সাইকেল চেপে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে শহরে যেত। বাবু-মহাজনদের গদিতে গিয়ে বসে-বসে সিগ্রেট ফুঁকত, চা খেত। হাটুয়া ভাবে, সে যদি শরতের বাবা মাধবের বেটা হত, ছোটেলালজির সঙ্গে পাটের দাদান দিতে যেত এখানে-ওখানে। ছোটেলালজী কথায়-কথায় পকেট থেকে খইনির কৌটো বের করে বলতেন—লে বে শরৎলাল, পাকড়া। শরৎ লাল হয়ে গেল দেখতে-দেখতে। ছোটেলাল আর শরৎলাল। লোকের কর্জ দরকার হলে শরতের কাছেই আরজিটা প্রথম পেশ কবতে হয়। আরে, ধনপতির মতো মানুষও বেটির বিয়ে দিতে নাকি শরৎকে

ধরাধরি করেছে। তো বোঝ ব্যাপার। ঘাটের গদিতে গিয়ে টাকার কথা তুললেই ছোটেলালজির ওই এক বাত—শরৎকো বোলো।

আজ আকাশের দশা দেখে বুকে তরাস লাগে। মুখ তোলা কঠিন, তবু মাঝে মাঝে দেখতে ইচ্ছে করে। মানুষের আকাশ দেখাটা একটা স্বভাব। বাজপড়া শিমুলের ডালে দাঁড়কাকটা যা আওয়াজ দিচ্ছে, বোঝা যায় বছরটার গতিক ভাল না।

—এতোয়ারি!

—হুঁ।

—ভার খালি হলে এবাগে আর আসব না ভাই।

—হুঁ।

—আবে, খালি হুঁ হুঁ কারতা! শোন, বাসে চাপব। চেপে রাধারঘাট হয়ে শহবে যাব।

এতোয়ারি ভারটা কাঁধ বদলে বলে—তো?

হাঁটুয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—আবে শালা ভাতিজাকা বেটা! ছেনিমা দেখব— ছেনিমা!

এতোয়ারি খুকখুক করে হেসে ওঠে। কষ্টের মধ্যে হাসি। বিয়ের পব তিন রাতের রাতে মান্যবরের মেয়ে বলেছিল—তুমি ছেনিমা দেখেছ কখনও? নাঃ, দেখা হয়নি এতোয়ারির। ছেনিমা কেমন, তার ধারণাও নেই। শুনেছে, পটের ছবি। মানুষের মতো চলে—বলে, নাচে-গায়। কিন্তু তা দেখলেই নাকি মাথা বিগড়ে যায়। সে অস্বস্তি নিয়ে বলেছিল—তুমি দেখেছ নাকি? কব গে? কাঁহা? কবে কোথায় দেখেছ? স্বস্তির কথা ফুলকলিয়া দেখেনি। দেখতে ইচ্ছে করে বুঝি? ফুলকলিয়া তখন অন্য কথায় চলে গেছে। এতোয়ারি বলেছে—ক্যা ফায়দা? এতকাল ধরে নিষাদবাগের বহুড়ীরা ছেনিমা দেখেনি বলে কী ক্ষতি হয়েছে?

—কী বে? যাবি না? দেখবি না?

এতোয়ারি এবার অবাক হয়ে বলে—তুই দেখেছিস্? সাচ?

—হাঁঃ!

—ঝুট।

—কাহে?

—দেখলে আমাকে না বলে পারতিস না।

হাটুয়া দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ।—বলিনি কেন জানিস ভাই এতোয়ারি? তুই যেমন বহু-লাগড়া, কখন মুখ ফসকে বহুর কানে তুলে দিবি। আর বহু নাহানের ঘাটে গিয়ে বলবে। মামী শুনবে। মামা শুনবে। মামা বলবে—তব তো হাটুয়া আনাজ বেচা পয়সা বেমালুম গাপ করে বরাবর। ভাই এতোয়ারি, আমি শালা চিনিব বলদ, বুঝিস নে?

এতোয়ারি দেখতে পায়, হাটুয়ার নাকের ফুটো ফুলেছে। চোখে জল ঝিকমিক করছে।

এতোয়ারির অবাক লাগে। দুনিয়ার অনেককিছু সে আদতে বোঝে না। বুঝতে গিয়ে কূলকিনারা পায় না বলেই হাল ছেড়ে দেয়। নয়নসুখের ভাগ্নে এমন মন্দজোয়ান ছেলেটার চোখে জল দেখে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। হুঁ, বেশ বোঝা যাচ্ছে, মামা-মামীর সঙ্গে তলায়-তলায় ভাগ্নের বনিবনা বিশ্বাস-অবিশ্বাসে হের-ফের আছে। তাহলে তো অঞ্চলার ব্যাপারটা বলতে গিয়ে চেপে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। হাটুয়া নিজের মামাতো বোনের কোন অজানা চক্রান্ত নিয়ে হইচই পাকাবে বলে মনে হয় না। যাদের সঙ্গে মনের টান নেই, তারা গোল্লায় গেলে ওর কী?

তাই বলে এতোয়ারি ওকে কিছুতেই বলতে পারবে না যে অঞ্চলার দৃষ্টি পড়েছে তার দিকে। হাটুয়া কী ভাববে? হাজার হলেও মামাতো বোন। এতোয়ারি বলে—ছেনিমায় কেত্তা পয়সা লাগে রে?

হাটুয়াব ভিজে চোখ দেখতে-দেখতে শুকনো হয়েছে। পুরু ঠোঁটদুটোয় হাসির ভাঁজ ফুটেছে তক্ষুণি।—দশ-দশ আনা। তোর দশ, হামারভি দশ।

—দশ? এতোয়ারিব চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে গেছে শুনে। দ-ও-শ?

—হাঁ, এত্তা।

—তব আজ না। আজ ছোড় দে। এতোয়ারির মন খারাপ হয়ে গেছে ছেনিমার দরদাম শুনে, সেটা ওর গলার স্বরে বোঝাই যায়। ফের বলে—আজ ধনপতিয়াকা বেটির বিভা। বিকাল-বিকাল পঁহুছতে হবে। না থাকলে মাথা গুনে জানতে পারবে শালা বুঢ়া। বুঝলি তো?

হাটুয়া গোঁ ধরে বলে—হামি আজ ছেনিমা দেখবই দেখব। ঠাকুরকা কিরিয়া। বাসভাড়া লাগবে পাঁচ আনা। ছেনিমা দশআনা। ব্যস, একঠো টাকার খেল! বলেই সে বড়ো-বড়ো দাঁত খুলে হেসে পথের মধ্যেই কোঁচড় থেকে একটা গেঁজে টেনে ধরে। এতোয়ারি দেখে বলে—বহুৎ পয়সা বে! কাঁহা পাইস?

—হামি চুরি না কিসে। হাটুয়া একটু গম্ভীর হয়ে বলে। একঠো-দোঠো কারকে রাখিসে। তুই যদি উধার লিস তো তাও দেবে। লিবি?

এতোয়ারি ভাবতে-ভাবতে হাঁটে। পঞ্চায়েতের মেয়ের বিয়ের সময় আসরে থাক বা না থাক, কিছু যায়-আসে না। তার মতো জোয়ানের কথার দাম কে দেবে যে মজলিসে কথা বলবে? কিন্তু খাবার সময় ঠিক চোখে পড়ে যাবে। সরস্বতী সকালে ঝগড়া-ঝাঁটি করে বহুকে ঘুম থেকে তুলে এনেছে। কাজেই বুড়ি যাবে না। কিন্তু ছোটী আর বহুকে তো যেতেই হবে। দশের ভোজকাজে একটু খাটাখাটুনিও করতে হবে বইকি। ওদের যদি জিজ্ঞেস করে, বলবে এতোয়ারি গাঁওয়ালে গেছে। এমন দিনে এতোয়ারি গাঁওয়ালে চলে গেল? গাঁয়ের কেউ যায়নি, মোড়লের বাড়ির ধুম বলে কথা। ও গেল? কথা একটা উঠবেই। তবে ফিরে গিয়ে ভোজে বসলে সব মাফ। হাটুয়ার কথাও উঠতে পারে। কিন্তু হাটুয়া তো বাড়ির মাথা নয়—মাথা তার মামা। কিন্তু এতোয়ারি যে নিজেই মাথা। তাকে তো দশের কাজে একবার যেতেই হবে। এতোয়ারি শঙ্খদহ ঢোকার মুখে বলে—ছেনিমা দেখে গাঁয়ে ফিরতে রাত লেগে যাবে নাকি বে?

হাটুয়া ঝটপট জবাব দেয়—মুখ আঁধারি হবে।

তার মানে সদ্য আঁধার নেমেছে তখন, মুখ চেনা যাচ্ছে না এমন সময়। সবে তারাগুলো ফুটে উঠেছে। হাওয়া ঘুরেছে এবং গঙ্গার বুক থেকে উঠে আসা সেই হাওয়া ঠাণ্ডা দিচ্ছে। নিষাদবাগে দিনমান ভোগান্তির পর সেই একটা সুসময়। গাছ-গাছালির পাতা দুলে-দুলে ঘুমপাড়ানি গান জুড়েছে। তখনই কারও শুয়ে পড়ার সময় এবং খোলা উঠোনে তালাই পেতে আকাশের তারা দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে গেল। সন্ধ্যা হতে না হতেই অনেক ঘরে লম্ফ নিবল। দু-একটা চাপা কথা ফুটল কোথাও। গাব-গাছে প্যাঁচা ডাকল ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও! দলছুট বগাবগী গঙ্গার আকাশ পেরিয়ে যেতে-যেতে হেঁকে গেল—আঁক্ আঁক! বুড়ো-বুড়িয়া কান পেতে আছে খানাখন্দে ব্যাঙের ডাক শুনতে পায় যদি! শুখার দিনকালে এখন বৃষ্টির শুধু আশা।...

এতোয়ারি হিসেব করে। বিয়ের কাজ চুকতে সেই মুখ-আঁধারি বেলা, তারপর বরযাত্রীরা পেটের বস্তা খুলে পাতে বসবে। খুব হইচই করবে। সূর্য শহরের কোন বাবুর গদি থেকে হ্যাসাগবাত্তি এনেছে নাকি। গতরাতে জ্বালেনি। নাকি কলকব্জা বিগড়ে ছিল। ছোটীর কাছে শোনা কথা। সেটা আজ জ্বলবে। ঢুলিরা ঢ্যাম কুড়াকুড় বাজনা বাজাবে। সানাই পোঁ-পোঁ করে প্রচণ্ড চেঁচাবে। নিষাদবাগে আজ আর কেউ সাতসন্ধ্যায় ঢুলুনি নিয়ে তালাই খুঁজবে না। বরযাত্রীদের হয়ে গেলে গাঁওয়ালাদের পাতে বসার পালা। আগে মরদরা, পরে ঔরত। ফুলকলিয়া আর ছোটী খেতে বসবে। হ্যাসাগবাত্তির উজ্জ্বল আলোয় ননদ-ভাজের খাওয়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এতোয়ারি।

—যাব ভাই হাটুয়া। এতোয়ারি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ছেনিমাটা দেখব—তুই বলছিস যখন, আর কিসের?...

জীবনে মাঝে-মাঝে দু-একটা দিন আসে, যখন এতোয়ারি ভুলেই যায় যে তার দুকাঁধে ভারবাহী জানোয়ারের মতো কালো দাগ আছে। রোদজ্বলা মাঠঘাট, কাঁধের ওজন, ক্ষেতের খাটুনি, বৃষ্টির হাপিত্যেশ—এইসব কষ্টের বোধগুলো একেবারে মুছে যায় মন থেকে। এরকম হয়েছিল সেই বেণুর মেয়ে মালতীর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করে মা যখন ফিরল, তখন। আর হয়েছিল বিয়ের রাতে

ফুলকলিয়ার সঙ্গে 'মুখ-দেখানি'র সময়। এখন মাথার ওপর থেকে সূর্য একটুখানি ঢলেছে। তারপর দুটিতে ভারমুক্ত টাট্টুর মতো। বাস-রাস্তার ধারে ময়রাদার দোকানে বসে ছাতু খাচ্ছে। বাসে চেপে সেনিমা দেখার খুশিতে দুটো মুখ ঝকমক করছে। কোথাও বুঝি চিরকালীন উৎসব আছে। এসব 'নাদান' মানুষের মুখে কদাচিৎ তার আলোর ছটা এসে লাগে। এতোয়ারির এই ধারণা।

টিউবেলের জলে পেতলের সরা আর হাতমুখ ধুয়ে-পাখলে এতোয়ারি বিড়ি কিনে আনে। হাটুয়া চোখ নাচিয়ে বলে—আবে বিড়ি খাচ্ছিস কেন? আয়, সিগ্রেট ফুঁকি! এতোয়ারি দাঁড়িপাল্লার তলা থেকে গোটানো হাফশার্ট বের করে গায়ে দেয়। খুশিতে হাসে। হাঁ। পান ভি খাব। পরক্ষণে চাপাগলায় শুধোয়—হাঁরে হাটুয়া! ছেনিমাঘরে ভার লিয়ে ঢুকতে দেবে তো?

হাটুয়ার কাছে ঝামেলা বলতে কিছু নেই। দেখে লিস—কোথায় থুই। আরে ভাই, হাতের জোরে ভাত, মুখের জোরে কুটুম। তুই শুধু দেখে যা। চুপসে থাক।

চুপচাপ থেকেছে এতোয়ারি। দেখেছে বাসের কন্ডাক্টার ছোকরাটার সঙ্গেও হাটুয়ার কত ভাব। ঘাটে গিয়ে নেমে ছোটেলালজিকে ভাল থাকার খবর পুছতে দেখে তাজ্জব হয়েছে। ছোটেলালজির গদিতে ময়নাপাখি আছে। খাঁচার ধারে দাঁড়িয়ে হাটুয়া বলেছে—ক্যা রী? আচ্ছা তো? এতোয়ারি শুধু চুপচাপ হেসেছে। ছোটেলালজি বলেছেন—আজ তোরা গাঁও ছেড়েছিস যে? আজ ধনপতিয়ার বেটির বিয়ে না? তো হামিও যেত। যাচ্ছি না। কাম পড়েছে জবর। ধনপতি মুখিয়াকে বলিস, পরে গিয়ে বেটিজামাইকে দেখে আসব। বলিস রে হাটুয়া। ভুলিস না যেন।

হাটুয়া জোরে মাথা দোলায়। তারপর কাকে চেঁচিয়ে বলে—শম্ভুয়া! হেই শম্ভুয়া! আবে শুন শুন!

হাটুয়া অপ্রস্তুত। অন্ধকার ঘরে ছিবির খেল দেখে এতোয়ারিটা গাধাকা মাফিক ডাক ছাড়ছে। হিহিহি হা হা হা...ওর বিকট হাসি শুনে মনে হচ্ছে, কেউ বুঝি মাঝে-মাঝে জলের কলসি উবুড় করে দিচ্ছে। আবে বুদ্ধু কাঁহেকা! ইয়ে তামাশা না ছে! হাটুয়া ওকে সামলোতে পারে না। চারপাশ থেকে বাবুরা চাপা গলায় শাসাচ্ছে তখন। খুব কাছেই কে বলে ওঠে—হাসতে হয়, বাইরে গিয়ে হাসুন না মশাই! এইতে হাটুয়া অস্বস্তিতে অস্থির। আলো জ্বললেই ধরা পড়ে যাবে চেয়ারের 'সিটে' কেমন দুটো বসে আছে। বলা যায় না, ঘাড় ধরে বের করেও দিতে পারে। কেন পারে না? শেরের দলে কুত্তা ঘুষে বসে আছে? দশআনার টিকিট না পেয়ে চৌদ্দ আনা খরচ করে এই দুর্গতি। হাটুয়া আগে যদি জানত, গম্ভীর বিষণ্ণ শান্ত গাছকা মাফিক এই এতোয়ারি ছবির খেল দেখে এমন কাছাখোলা হয়ে পড়বে! হাটুয়া গুম হয়ে থাকে। এতোয়ারিকে ঠেসে ধরে। পাঁজরে খোঁচা দেয়। তবু সামলাতে পারে না। ছবির মানুষ যেই কথা বলে উঠে, অমনি এতোয়ারির কলসি উবুড় হয়ে যায়। হি হিহি হি হাহাহা হা।...

এ তামাশা না ছে—বহুৎ দুখোকা খেল ছে! হুঁশ কর ভাই এতোয়ারি। হাটুয়া কাকুতিমিনতি করে। কিরে দেয় কতরকম। আর এইসব ফিসফিস আওয়াজ অন্ধকারে এক ঝাঁক পায়রা ওড়ার মতো হি হি হি হি...হা হা হা হা এবং ছবির মেয়েটি বড় হতে-হতে একেবারে তার গায়ের ওপর এসে পড়বে মনে হতেই এতোয়ারি চুপ করে যায়।

ওপরে মেয়েদের ঝাঁকে সামনে ঝুঁকে বসে ছিল ফুলকলিয়া। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। তার নরম মাখনের মতো শরীর। সে কিনা কলাবেড়িয়ার বড়ঘরের একহি বাত্তি। গতর খাটাতে হয়নি আর সব মেয়ের মতো, তাই এত নমনীয়তা, ফুলের কুঁড়ির মতো, শিমুল তুলাকা মাফিক। তরমুজের শাঁসের মতো কোমল আর রসাল তার মাংস। সেই ফুলকলিয়ার শরীর উত্তেজনায় শক্ত হয়ে উঠেছে। নির্মলার একটা হাত খামচে ধরে সে ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে। আর হঠাৎ ওই হাসি, অন্ধকারে হি হি হি হি...হা হা হা হা ..একেবারে দু'বারে তিনবার, তারপর ফুলকলিয়া আঁতকে উঠেছে। হাসি বড় চেনা লাগে। ওই হাসির সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসের ঝাপটানিতে কী যেন গন্ধও অবিকল সে টের পায়। অন্ধকারেই সে সোজা হয়ে বসে। কান খাড়া করে সতর্ক খরগোসের মতো সন্দেহে মাটির চাঙড় হয়ে অপেক্ষা করে।

তারপর তার মনে হয়, ভুল হতেও তো পারে। গোমড়ামুখো হিসেবি কেজো চুপথাকা মানুষ কোন কারচুপিতে শহরের এই অন্ধকার হলঘরে খামোকা ঢুকে পড়বে? যদি বা ঢোকে, অমন হাসবে কেন? সত্যি বটে, সেদিন ঘরের চালে হনুমান দেখে সরস্বতীয়া যত হাত-পা ছুঁড়েছিল, তার বেটা তত হেসে উঠেছিল। আর আরও একদিন বুধিয়ার মায়ের হাতের দড়ি ছিঁড়ে ধাড়ী ছাগলটা পালিয়ে গেল, বুঝিয়ার মা যত বলে—এই বেটা এতোয়ারি, হামার বেটা, হামার জান, পাকাড় দে না—লোকটা কেন কে জানে হাসতে-হাসতে কুঁজো হয়ে যাচ্ছিল। তার মা তো বলেই—হামার বেটা পাত্থর না থে। অভি পাত্থর হয়ে গেল। কেন হবে না? বড়ঘরের বেটির দেমাগ দেখে পাত্থর না হয়ে উপায় আছে?

তো লোকটা হাসতে না জানে, এমন নয়। ফুলকলিয়ার মন ছবি থেকে সরতে-সরতে নিষাদবাগে গিয়ে ঢোকে। শাস বুড়ি লম্ফ হাতে এতক্ষণ ঘর-বার করছে। ডাগদারের কাছে গেছে বহু—ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন? ওদিকে ধনপতিয়া মোড়লের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়ে গেছে। উঠোনে কলের বাত্তি জ্বলছে। কাল রাতে কেন কলের বাত্তিঠো জ্বালল না ওরা? কালাবেড়িয়ার মেয়ে কেমন নাচ জানে, আরও উজ্জ্বল হয়ে ঝলমলানি দিয়ে দেখিয়ে দিত। ঠিক ওইরকম নাচ। ছবির মেয়েটার মতো। ফুলকলিয়া আবার ফেরে নিষাদবাগ থেকে। ছবির দিকে তাকায়। আবার সেই হাসি শুনতে পায়। হি হি হি হি হা হা হা হা।...

সেই সময় হঠাৎ ছবি হারিয়ে যায়। হলঘরে আলো জ্বলে ওঠে। ফুলকলিয়া হাই তোলে। হাই তুলে নিচের দিকে তাকায়। তাকিয়েই আঁতকে ওঠে। ফিসফিস করে বলে-আরী! হাটুয়া!

নির্মলা ঘোরলাগা চোখে মুখ টিপে হাসে। —ভাগ রী! কাঁহা তেরা হাটুয়া?

ফুলকলিয়া উঠে দাঁড়ায়। নির্মলা তার হাত ধরে টানতে চেষ্টা করে। ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফুলকলিয়া পা বাড়ায়।

পাশের দরজার বাইরে নির্মলা তাকে ধরে ফেলে।—আরী ফুলি! শুন্ শুন্। কী হয়েছে? কোথায় যাচ্ছিস এমন করে? হল কী তোর?

ফুলকলিয়া বড়-বড় চোখে তাকিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে বলে—হাটুয়া ছে। উসকা সাথ ছোটীর দাদা।

—ভাগ্ ভাগ্!

—নেহী রী। বইঠে আছে। হাম দেখা। ...হাঁফাতে-হাঁফাতে ফুলকলিয়া বলে। তাকে ঝড়লাগা ঝোপঝাড়ের মতো আলুথালু দেখায়। কপালে, নাকের ডগায়, চিবুকে ঘামের ফোঁটা জমেছে। ভূতেপাওয়া মেয়ের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে সে।

নির্মলা বুঝতে পারে না এত ভয় পাওয়ার কী আছে। এতোয়ারি যদি এসেই থাকে তো এসেছে সে তো ভালই। নিজের মরদটাকে বশ মানিয়ে রাখতে পারবে না ফুলকলিয়ার মতো মেয়ে? সে তামাশা করে বলে—ঠিক আছে তবে। আমি গিয়ে তোর মরদকে ধরছি। দেখবি, উল্টে সে কেমন হকচকিয়ে যাবে। সরস্বতী বুড়িকে বলে দেব—এতোয়ারিদা ছেনিমা দেখতে এসেছে! ব্যস! শুনে দেখবি মায়ের বেটা কেমন ঘাবড়ে যায়। রসগোল্লা খাইয়ে দেবে। আমার নাম নির্মলা!

ফুলকলিয়া এ কথাও শুনেও শোনে না। লম্বা বারান্দা ধরে হাঁটতে থাকে। ওর পিছন-পিছন নির্মলা এগোয়। সিঁড়িতে গিয়ে গালমন্দ করে। আমারই ভুল হয়েছে তোকে আনা। তুই মুখেই শুধু বড়-বড় কথা বলিস ফুলিয়া! তুই না কলাবেড়িয়ার বেটি! ছি ছি!

না, না। তোকে কিরে লাগে নির্মলাদি। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দে। ...নিচের গলিতে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে ফুলকলিয়া। তার চোখে জলের ছোপ। ...নির্মলাদি, হামি অভি ঘর যাবে! তুমিও সাথ-সাথ চলো। হামি একা বহু-বহুড়ী মানুষ। রাস্তাঘাট চিনি না। দোহাই বহিন! তোমার বেটার কিরিয়া লাগে—ঠাকুরবাবার কিরিয়া লাগে বহিন!

নির্মলা রেগে গিয়েছে। ভুরু কুঁচকে বলে—যাবার ইচ্ছে হলে তুমি চলে যাও বহিন। হামার এত্তা পয়সা নেই যে আধা দেখেই চলে যাব। পয়সা তো এমনি আসে না! তুমি বড়ঘরের বেটি, তোমার আসতে পারে।

পয়সার খোঁটা দিচ্ছে ফুলকলিয়াকে? সে তখুনি আঁচলের গিট খুলতে থাকে। অভিমানে তার বুক ফুলে ওঠে। এ যদি না মানুষজনের জায়গা হত, যদি না হত টাউন-শহর, এ যদি হত নিষাদবাগের গঙ্গার পাড়, শ্মশান, শিমুলতলায় নিরিবিলি 'মাঠ সারা'র জায়গা, এখন ফুলকলিয়া এক নদীর জল চোখ থেকে ঝরিয়ে তার মরা মায়ের নামে কাঁদত। হুঁ, পয়সার খোঁটার মতো দুখ থাকতে নেই সংসারে। আরী নির্মলা, আমাকে পয়সা দেখাচ্ছিস! মনে-মনে কেঁদে-কেটে আবেগময়ী মেয়েটি নিঃশব্দে, শুধু চাহনিতে প্রকাশ করে : ও গে দালালের বউ! মোড়লের চিঠি বাবু লোকের পেছন-পেছন ঘোরে না কুত্তাকা মাফিক! এই লে তোর পয়সা।

বুদ্ধি করে একটা চাঁদির টাকা ভাগ্যিস এনেছিল। সাতটা চাঁদির টাকা আছে ফুলকলিয়ার। প্রথমে রেখেছিল ঘরের পেছনদিকের দেয়ালে একটা ফাটলে—তার ওপর নিজের হাতে গোবর-চাপড়ি দিয়ে ঢেকেছিল। কিন্তু বলা যায় না, কখন শাস নিজে কিংবা ছোটীকে ঘুঁটে তুলতে পাঠায়। পরে এ কথা খেয়াল হলে সে কাঁচা গোবর মাখা টাকাগুলো সেই দেয়ালের উপরকার চালে একটা ন্যাকড়ায় বেঁধে গুঁজেছে। আসার আগে আজ সেই টাকা বের করতে কতবার বুকে খিল ধরার দাখিল। ভাগ্যিস ওদিকটায় বাড়ির মেয়েদের 'জল-সারা'র জায়গা। ওদিকে যাবার সময় শুনিয়ে বলে যেতে হয়—জল সারতে যাচ্ছি গে। ব্যস। তাহলে আর কেউ যাবে না ততক্ষণ।

টাকাটা ঠকাস করে সামনে ফেলে ফুলকলিয়া পিছু ফেরে না। গলিপথটুকু বেরিয়েই সে যখন বড় রাস্তায় উঠেছে, নির্মলা হাসতে-হাসতে তার কাঁধ ধরে ফেলে। —তুই এত্তা রাগ করবি জানলে আমি কি বাত করতুম রী! ঘাট মানছি বহিন। বাত শোন। হাঁ, হাটুয়া আর এতোয়ারি ছেনিমা দেখতে এসেছে, হামি জানি। তোকে বলিনি। হামি ওদের নিচের তলায় দেখতে পেয়েছিলুম। এতোয়ারিদা বেজায় হাসছিল - তাও ভি শুনেছিলুম। তো তুই ডর পাবি বলে বলিনি। ছোড় দে বহিন!

নির্মলা পা বাড়ায়। সেই টাকাটা ওর হাতে গুঁজে দেয়। ফুলকলিয়া নেয়। কিন্তু হাতের মুঠোয় ধরা থাকে রুপোর চাকতিটুকু। রাস্তায় ভিড় আছে। দুধারে অজস্র আলো জ্বলছে। ঝলমল করছে সাতরাজার ধনের মতো দোকানপাট। আসার সময় শহরের শুরু থেকে রিকশো চেপে এসেছিল। তখন ফুলকলিয়া বরাবরকার মতো সব গিলেছে। অভিভূত হয়েছে। কত কী জানতে চেয়েছে। ওই উঁচুতে এতবড় বাকসোর মতো ওটা কী বহিন? জলের টাং। অত উঁচু লম্বা পাঁচিল কিসের? জেহেলখানা। গারদ। ...ময়দানে ওরা দৌড়চ্ছে কেন রী? ...বল খেলছে। ...ভহল? ...নেহী রী! ব-অ-ল। ওই দ্যাখ, গোলমতো—লাথি মারছে। আসমানে উঠে যাচ্ছে।...কুমড়াকা মাফিক রী! খিলখিল করে হেসেছে ফুলকলিয়া।

আর এখন সে কিছু দেখছে না। তার চাহনিতে একটা ভয় পাওয়া ভাব। তার পা ফেলার মধ্যে গাঁওয়ালফেরা মেয়ের ক্লান্তি। নির্মলা বুঝতে পারে না, এত ভয় কেন পেল ফুলকলিয়া। শাশুড়ি আজ সকালে পিট্টি দিয়েছিল—ছেনিমা দেখার কথা জানতে পারলে ভয়ের কারণ একটা স্বাভাবিক। কিন্তু শাশুড়ির কানে তুলছেটা কে? হাটুয়া আর এতোয়ারি নিচের তলায় আছে। তাবা টেরও পেত না কিছু। তারা বেরিয়ে গেলে অনেকটা দেরি করে তারা বেরুত। তারপর গলির মুখে রাধাদার বাড়ি ঢুকত। কিছুক্ষণ গপসপ করত। রাধাদা নির্মলার দূর সম্পর্কের এক দাদা। কোন এক বাবুর আমবাগান দেখাশোনা করে। শহরের গায়ে লাগা অনেক আম-কাঁঠালের বাগান আছে। রাত না লাগলে আর রাধাদা বাড়ি না থাকলে আমবাগানেই থাকত—নির্মলা চলে যেত সেখানে এবং গাছপাকা আম নিয়ে বাড়ি ফিরত। ফুলকলিয়াও পেত বই কি। এ কি তোমার নিষাদবাগের খাট্টা আম? তরমুজের মতো লাল ভেতরটা—স্বাদে পানতুয়া। এইসব বলতে-বলতে নির্মলা হাঁটে। ফুলকলিয়ার কান নেই।

বড়রাস্তায় যেতে-যেতে ডাইনে সরু গলিরাস্তা একটার পর একটা—সোজা গঙ্গার পাড়ে গিয়ে থেমেছে। নির্মলা একটা গলির কাছে হঠাৎ থামে। ফুলকলিয়াব হাত ধরে বলে—বাত শুন। রাত হয়ে গেছে! এমন করে ফিরব বলে তো আসিনি! তোর দাদার সঙ্গে বাবার কথা ছিল। আয়, দেখি সে আছে নাকি।

ফুলকলিয়া অস্ফুট স্বরে বলে—শরৎদা?

—হাঁ রী। তেরা শাসকে ভাতিজা! নির্মলা হাসতে-হাসতে বলে। কথাটা তাই ছিল। আমরা কিছু না জানিয়ে চলে গেলেও বেচারা ভাবনায় পড়বে না? অতখানি পথ বহু-বহুড়ী যাবেই বা কেমন করে?

বিকেলের শোয়ের টিকিট না পেয়েই এতটা ঝামেলা হয়ে গেছে। এসেই দেখেছিল 'হৌস ফুল!' ছবি শুরুও হয়ে গিয়েছিল। বেরোতে দেরি হয়েছিল তো ফুলকলিয়ার জন্যেই। অগত্যা সন্ধ্যার শোয়ের টিকিট কাটতে হয়েছিল। টিকিট কেটে নির্মলা ততক্ষণ বাইরে ঘুরতে চেয়েছিল—ওর মরদের খাতিরে কত জায়গায় জানাশোনা। কিন্তু ফুলকলিয়াকে নড়ানো যায়নি। এসে থেকে সে বড্ড ঘাবড়ে রয়েছে। কলাবেড়িয়ার কারও চোখে পড়লে যে বিপদ। বাবার কানে তুলে দেবে। অগত্যা ওপরে মেয়েদের বসার জায়গায় গুটিসুটি বসে থাকতে হয়েছে। মুখ ঢেকে ঘোমটা টেনেছে। খুব জ্বালান জ্বালাচ্ছে ফুলকলিয়া।

নির্মলা যে নিচে গিয়ে চা খেয়ে আসবে, পান খাবে—তার যো ছিল না। ওকে আঁকড়ে ধরে থেকেছে এতোয়ারির জংলী বউ। অবশ্যি ওপরে চা-ওলা এল। চোখ নাচিয়ে বলল—নির্মলাদি যে! শরৎদা কই? ভাল তো খবর?...

নির্মলার কত চেনা টাউনবাজারে! ফুলকলিয়া তাজ্জব বনে গেছে। তাই বলে চা খেতে রাজি নয় সে। ধুরধুর? এত্তা গরমেব মধ্যে ওই গরম জিনিস খায় মানুষে? নির্মলা তারিয়ে-তারিয়ে খেল বটে। ফুলকলিয়া ভয়ে-ভয়ে ভেবেছে, বাবুবাড়ির মেয়েরা চা খাচ্ছে—নির্মলাও খাচ্ছে। কেউ এসে বলবে না তো—এই মেয়ে! চা খাচ্ছে কেন? কেউ বলল না। আর সবচেয়ে তাজ্জব, নির্মলার চেহারা দিব্যি মিশে গেল বাবুবাড়ির বহু-বহুড়ীর মধ্যে! খুব প্রশংসার চোখে তাকিয়ে থেকেছে এতোয়ারির বউ। হ্যাঁ, তোকেও ভি মানিয়ে যাবে। তোর অমন গড়ন রী ফুলিয়া! শুধু তোর হাবভাবে তুই ধরা পড়ে যাবি। অমন ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিস কেন? আর তোর সারা গতরে রুপোর গয়না নিয়েই মুশকিল। দ্যাখ না, আমি কী পরেছি।

উঁহু, ও তুমি যতই বলো ফুলকলিয়া যা পরার পরে থাকবে। পা ফেলতে, নড়তে, উঠোনে-বসতে এই যে মিঠে ঝুমঝুম আওয়াজ, বড় মন কেমন করা আওয়াজ—এটা বলে বোঝানো যাবে না। যেন গানের সুর নিয়ে সারাক্ষণ চলাফেরা বেঁচে থাকা, রাত কাটানো। দুপুররাতে অন্ধকার ঘরে ঘুমের ঘোরে নড়ে উঠতেই কী মিঠে অওয়াজ জানিয়ে দেয়। এ ঘরে এক যুবতী মেয়ে আছে। তাই বলে এতোয়ারিকে পুছতে যেও না, ওর কান নেই। আদ্ধেক রাতে হঠাৎ তো ওর ঘুম ভাঙে না। ভাঙলেও পাশ ফিরে শোয়। পাথরকা মাফিক। ফুলকলিয়া তো ভাবতেই পারে না সে চলছে, কথা বলছে, বেঁচে আছে অথচ ওই মিঠে আওয়াজ নেই তার। তেমন শব্দহীন যখনই হবে, তখন—ও মা গে! হামি মরেই যাব—তেরা বেটাকা কিরিয়া। তাই এ হচ্ছে কিনা ফুলকলিয়ার থাকার ছন্দ। তার প্রাণেরই ধ্বনিপুঞ্জ। দোহাই ঠাকুরবাবা, তাকে শব্দহীন কোরো না। ফুলকলিয়া থমকে দাঁড়ায়। কোথায় নিয়ে এল তাকে নির্মলা? কয়েকটা একতলা দালানের মধ্যিখানে খোলা চত্বর। সেখানে বিরাট তারাজু ঝুলছে—দুদিকে তিনটে করে আড়াআড়ি বাঁশ দাঁড় করানো। গুড়ের টিন। চারপাশে 'চিরিক-বাত্তি' জ্বলছে। নিষাদবাগের ছেলেমেয়েরা বিজিল বাত্তিকে বলে 'চিরিক-বাত্তি'। কিন্তু এত খন্দের বস্তা, গুড়ের টিন দেখে ফুলকলিয়া অভিভূত। এ যে সাতরাজার ধন! তার বাবা মান্যবরের কথা মনে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। পাঁচ বস্তা খন্দ উঠোনে ভরে লোকটা যখন শান্ত চোখে তাকায়, তখন তার বেটির মনে হয়েছে—ওই এক রাজা। সেই রাজা এখানে স্রেফ প্রজা হয়ে গেল না?

এত্তা রী! নিজের অজানতেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় কথাটা। নির্মলা ফিসফিস করে বলে—সাহাবাবুর আড়ত। ওই দ্যাখ, ওই যে লোকটা বসে কলম চালাচ্ছে—ওই! তোর দাদার সঙ্গে খুব ভাব। আয় না, লজ্জা কিসের গে? আমাকে দেখে সাহাবাবু কত খাতির করে দেখবি!

ফুলকলিয়া গোঁ ধরে দাঁড়ায়। তারাজুতে খন্দের বস্তা ওজন হচ্ছে। কয়াল হাঁক দিচ্ছে—ও তুমি কিছুতেই বুঝবে না। ও একটা 'বোলি।' পেঁক...পেঁক! পেঁক—পেঁক! ন ঠেন ঠে...ন ঠেন ঠে—ঘেঁস—ঘেঁস! চ্ছাঃ—চ্ছাঃ! ব্যাপারী দালাল গাঁয়ের চাষাভূষোর ভিড়ে আড়ত গমগম করছে। খরার

মাস। অনেকটা রাত অব্দি ওজনদারি কেনাবেচা লেনদেন চলবে। গঙ্গার ধারে গরুমোষের গাড়ি রেখে এসেছে ওরা। ট্রাকও দাঁড়িয়ে আছে। সরু গলি দিয়ে বিশাল-বিশাল মুটেরা বস্তা ঘাড়ে বয়ে আনছে—হাতে কাস্তের মতো বাঁকা সুচলো মাকু। ঘাড়ের বস্তা আঁকড়ে ধরেছে মাকু বিঁধিয়ে। গলিতেও চিরিক-বাত্তি ঝুলিয়ে দিয়েছে সাহাবাবু। ওজন শেষ হলে দাম মিটিয়ে গাড়োয়ানরা চলে যাবে গাড়ির ওখানে। রান্নাবান্না করবে। খেয়েদেয়ে গাড়ি ছাড়বে। গাঁয়ে পৌছুতে সকাল হয়ে যাবে—কারও দুপুর।

নির্মলার দিকে চোখ পড়তেই কেউ চেঁচিয়ে ওঠে—শরৎ! ও শরৎ! তোমার গিন্নি এসেছে। গদি থেকে সাহাবাবু মুখ তোলেন। ঠোঁট দুটো লাল। পান চিবুতে-চিবুতে হাসেন।

তিনিও চেঁচিয়ে বলেন—শরৎ! কোথায় গেল হে? শমন এসেছে। শমন। সাহাবাবু হাসেন। এস নির্মলা, চলে এস, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

নির্মলা হ্যাঁচকা টান দিয়ে ফুলকলিয়াকে নিয়ে চত্বরে ওঠে। ফুলকলিয়া আর খানিকটা ঘোমটা টেনে দেয়। আড়তের ওজনদারি দরকষাকষি হট্টগোল চকিতে যেটুকু সময় থেমেছিল, তার মধ্যে ফুলকলিয়ার রুপোর গয়নার মিঠে বাজনা! অলৌকিক সৌন্দর্য বয়ে গেল কয়েক মুহূর্তে। এইসব হাটবাজারী জীবনের খসখসে নীরস মাটি আর খন্দের মেঠো গন্ধ চাপা দিয়ে এল অলীক জেল্লাময় প্রবাহ। অমর্ত্য ঘ্রাণ ছড়িয়ে দিয়ে তক্ষুণি সরে গেল। তারপর কয়াল হেঁকে ওঠে আবার—নঠেন ঠে...নঠেন ঠে! ঘেঁস—ঘেঁস। চ্ছা...ছ্ছা চাক্কা। কালো-কালো পালোয়ান মুটে ভার কাঁধে নিয়ে কুঁজো হয়ে লাল চোখে তাকিয়ে ছিল। আবার মুণ্ডু কাত করে ভার টানে। তাদের পায়ের শব্দে মেদিনী কাঁপে। টালি বাবু গলির মুখে মোড়ায় বসে ছিল। তার হাতে টালিকাঠিগুলো গুনতে কি ভুল হল? সে সংশয়ে ভোগে।

—এটি কে নির্মলা? সাহাবাবু সস্নেহে বলেন। —বসো, বসো। বেঞ্চের দিকে আঙুল তোলেন। নির্মলা কিন্তু ওঁর তক্তপোষের গদিতেই বসে—সাহাবাবুর কাছেই।

ফুলকলিয়া দাঁড়িয়ে অছে দেখে সে তাকে বেঞ্চ দেখিয়ে বলে— বৈঠ্‌গে হুঁয়া।

সাহাবাবু বলেন— বসো, বসো। এই গদি নির্মলারই। বলে আবার হাঁকেন—ও শরৎ!

ফুলকলিয়া শরমে জড়সড় হয়ে বসে। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে ওজনদারি দেখে। ওই বিশাল তারাজু যে তার অচেনা নয়, নির্মলাকে বলবেখন। তার বাবার ক্ষেতের মাঝখানে ওই তারাজু পেতে বেলডাঙ্গার মহাজন আলু ওজন করে।

নির্মলা মুখ টিপে হেসে জানায়—আমাদের গাঁয়ে আছে এতোয়ারি, তার বউ। এতোয়ারিকে আপনি চিনতে পারবেন না বাবু। সে গাঁওয়াল করা মানুষ। টাউন বাজারে আসেই না।

ফুলকলিয়ার রাগ হয়। তার চেয়ে বললেই পারত, কলাবেড়িয়ার মান্যবর মোড়লের মেয়ে। মান্যবর হরবখত টাউন-বাজার করে বেড়ায়। সে কি এই সাহাবাবুকে চেনে না? খুব চেনে।

—শরৎ বুঝি বেরিয়েছে। এসে পড়বেখন। সাহাবাবু কলমবাজি করেন আর বলেন, হুঁ, ভাল কথা। বলছিল যেন, তোমরা আসবে, ও মুকুন্দ! শরতের বউকে চা-বিস্কুট এনে দে : দুজন আছে।

নির্মলাও লজ্জাহীন মুখে বলে—মুকুল! পান আনিস যেন।

পেন্টুলপরা কালো ধেড়ে এক ছোকরা, যার মাথায় বড়-বড় চুল আর গায়ে ময়লা গেঞ্জি দাঁত বের করে। —বলতে হবে না নির্মলাদি। ওই দিদিও খাবেন তো পান?

—খাবে রে ছোঁড়া, খাবে। যা তো শিগগির! নির্মলা চোখ রাঙায়...। সাহাবাবুর অত কাছে বসে দিব্যি আঙুল মটকাতে থাকে। তাই দেখে ফুলকলিয়া আরও তাজ্জব। আর নির্মলার তামাশা-মস্করা চলতে থাকে সমানে। কয়াল, মুটে, খাতাবাবু, এমন কি গাঁয়ের ব্যাপারীদেব সঙ্গেও। কারো নাম ধরে ডাকে। তুই-তোকারি করে। কাকেও খুড়ো, কাকেও শ্বশুর বলে ডাকে। খবরাখবর শুধোয়। এদিকে ফুলকলিয়ার মাথার ঘোমটা অজানতে খসে যেতে থাকে। টের পেলেই সে আবার টেনে দেয়। কিন্তু সবচেয়ে তাজ্জব, নির্মলা অমন বাঙ্গালী বোলি বলতে পারে জেনে।

সাহাবাবু বলেন—-সিনেমা দেখলে না যে?

নির্মলা খিলখিল করে হাসে।—জিগ্যেস করুন না এতোয়ারির বউকে! হলে ঢুকে আদ্ধেক দেখে মেয়ের মাথা-খারাপ। পালিয়ে এল। পয়সাই বরবাদ।

—কেন? মাথাখারাপ হল কেন? সাহাবাবু খাতায় চোখ রেখেই বলেন।

ফুলকলিয়া অমনি তার মল-পাঁয়জোরপরা ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে দেয় নির্মলার পায়ে। নির্মলা টের পেয়ে আরও হাসে। হাসতে-হাসতে বলে—এই প্রথম। চোখে লাগল বুঝি!

—চোখে লাগল মানে?

—আমার মরণ! সাহাবাবু বোঝেন না—চোখে লাগল মানে। চোখে সইল না গো, সইল না। চোখ জ্বলে গেল! নির্মলা আচমকা হাত বাড়িয়ে ফুলকলিয়ার পাঁজরে গুতো মারে। হাসতে-হাসতেই।

বড্ড বেশি বেহায়াপনা করছে নির্মলা। ফুলকলিয়ার মনে সকাল থেকে যে বিদ্রোহের ভাবটুকু ছিল, উবে যেতে বসেছে। মেয়েদের এতখানি কি ভাল? নিষাদবাগে যাই করো সেখানে সবাই আপনজাত আপনজন। মাজা দুলিয়ে যতক্ষণ খুশি নাচো, গান করো—রঙ গুলে পিচকিরিতে ভরে মরদগুলোর কাপড় রাঙিয়ে দাও—রসের কথা বলো। একই গাছে পাতার মতো সেই সব চঞ্চলতা। আর এ যে অন্য জায়গা, অন্য সব মানুষ।

সাহাবাবু খুক-খুক করে হাসলেন। লোকটাকে অবশ্য ভালই লাগছে ফুলকলিয়ার। নয়তো এক্ষুণি উঠে হনহন করে চলে যেত। রাগে গরগর করছে তার মন। আর কখনো আসবে না নির্মলার সঙ্গে। গঙ্গাজল পাতাবে ভেবেছিল, তাও পাতাবে না।

এই অভিমানের সময় শরৎ এসে যায়। এসেই নির্মলার দিকে নয়, এতোয়ারির বউয়ের দিকে তাকিয়ে খুশি প্রকাশ করে। আরে ব্বাস! মেরা বহিন আ গেয়ি গে! ছেনিমা ক্যায়সা লাগা বহিন?

ফুলকলিয়ার কী হয়, সে ঘোমটা সরিয়ে স্বাভাবিক মুখে হাসে। শরৎ গাঁ সম্পর্কে ভাসুর। তার দিকে মুখ তোলা বারণ। কিন্তু এখন সে সেই নিষিদ্ধ গণ্ডি ডিঙিয়ে যায়। যেন নির্মলাকে বিশ্বাস করতে পারছিল না—অচেনা ঠেকছিল। এখন শরৎদা তার বোলিতে কথা বলেছে, বহিন সম্ভাষণ করেছে, নাকি পলকে নিজেদের হারানো জায়গা খুঁজে পেল—এতেই এতোয়ারির বউ গলে যায়। বলে—দাদা, জলদি ঘর যানা। হাঁ—আভি। রাত হুয়ি বহুৎ!

—বইঠো বহিন। জরুর যায়েগা। এক মিনিট। —বলে শরৎ সাহাবাবুর অন্য পাশে বসে। কী সব বলতে থাকে চাপা গলায়। ফুলকলিয়া বোঝে না। অনুমান করে হিসাবনিকাশের কথা চলছে।

সেই মুকুন্দ দুটো চায়ের কাপ প্লেট আর একটা কেটলি হাতে এল এতক্ষণে। তার হাতে রাংতা কাগজের মোড়কে পানও আছে। নির্মলা কাপ কেটলি নিয়ে গদির ওপর রাখে। চা ঢালে। পানের মোড়কটা ফুলকলিয়ার দিকে এগিয়ে মুকুন্দ বলে—ধরো ছোটদিদি।

ফুলকলিয়া কিন্তু হাত বাড়িয়ে নেয়। পান সে কদাচিৎ খায়। সে যখন ছোট, নাকি তার বাবার পানের বরজও ছিল। ঝামেলা বলে পরে আর পানচাষ করত না মান্যবর। শাশুড়ি কিন্তু পানের পোকা। কখনও মনে হলে বউকে বলে—অ রী বহু, পান খাউগি? তব্ লে। ফুলকলিয়া পান হাতে নিয়ে নির্মলার দিকে তাকায়। নির্মলা কাপে চা ঢেলে প্লেটসুদ্ধ এগিয়ে দেয়। —ধরো গে।

এমন করে চা খায় মহাজন আর বাবুমশাইরা: ঘাটে খান ঘাটবাবু। আর মাঝে-মাঝে ধনপতির ছেলে সূর্যর কাছে অফসর লোক আসে, তারা খায়। ধনপতির ঘরে এসব জিনিস আছে। কিন্তু কলাবেড়িয়ার মান্যবরের ছিল না। মান্যবরের বেটির অবশ্যি চা খেতেও ভাল লাগে না। এখন নির্মলা তার সামনে ধরেছে, সে দ্বিধায় ভোগে। তাই দেখে শরৎ বলে—লো গে বহিন। বাবু খাওয়াইস।

সাহাবাবু বলেন—হ্যাঁ, নাও। বলেই চেঁচিয়ে ওঠেন—ওরে মুকুন্দ হতভাগা! বললুম যে বিস্কুট আনবি।

মুকুন্দ মস্তো জিভ বের করে পেন্টুলের পকেটে হাত ভরে। ঠোঙায় ভরা বিস্কুট দিয়ে যায়। শরৎ হেসে বলে—বাঁদর নির্ঘাত মেরে দিত!

বাঁদর শুনেই ফুলকলিয়া লজ্জা ভুলে এতক্ষণে খিলখিল করে হেসে ওঠে। মুকুন্দর চেহারার সঙ্গে বাঁদর বা হনুমানের মিল আছে—সেই হয়তো ওর হাসির কারণ। হাসির চোটে তার ঘোমটা সরে যায়।

হাতের চা পড়ে যায় খানিকটা। নির্মলা পা সরিয়ে নিয়ে তেড়েমেড়ে বলে—এত হাসি এখুনি! শাশুড়ি জানতে পারলে ঠুকনি দেবে রে!

আর চিরিক-বাত্তির আলোয় রুপোর গয়না পরা ফর্সা রঙের যুবতীটি কয়েকটি মুহূর্ত আবার ওজনদারি দর কষাকষি ভুষিগুড়ের এবং ঘামের দুনিয়াকে পায়ের তলায় চেপে রাখে। আবার লোকজনের চোখে রঙের ঘোর লাগে। এতোয়ারি বউ হঠাৎ টের পায়, তার শরীর চেটে খাচ্ছে লম্বা লম্বা জিভ। সে ঘোমটা টানে। গা ঢাকে। তারপর অসহায় চোখে তাকায় শরতের দিকে। শরৎ বলে—চা পিও বহিন। বিস্কুটভি খাও। বাবু দিইস—তেরা খাতির।

অগত্যা ফুলকলিয়া চায়ে চুমুক দেয়—কিন্তু একটু ঘুরে বসে। বিস্কুট কামড়ায়, ইঁদুরের শস্যকণা কুরে খাওয়ার মতো। মন্দ লাগে না। ক্ষিদেও পেয়েছে তো! সেই দুপুরে ঘাট থেকে ফিরে নির্মলার তদ্বিরে শাশুড়ি পাতে ভাত তুলেছে। রাগ-দুঃখ ছিল, পেট খালি রেখে খেয়েছে। তাছাড়া খাবার সময় শাশুড়ির বকবকানি শুনলে কোন বহুর পেটে ভাত ঢুকতে চায়? কি না, ধনপতিয়ার বেটার গায়ে ধাক্কা লেগেছে। লেগেছে তো কী হয়েছে?

নির্মলা বলেছে -চোখে সাবুনের ফেনা ছিল। তাই দেখতে পায়নি গো! ইচ্ছে করে কি গায়ে গা লাগাতে যায় কেউ, আর ও কিনা বড়ঘরের বেটি। মাঝে-মাঝে দু-একখানা সাবুন ওকে দিও কাকী! এখন পেটেকোলে নেই—এখনই তো গা মাজবার সময়। বুড়ি তখন চুপ। পাল্টা কিছু বললে নির্মলা ওকে টাকা ধার দেবে না যে!

চা আর বিস্কুট, আর এই কাপ-প্লেটের মধ্যে আবছা এক দুনিয়ার স্বাদ পায় ফুলকলিয়া। সে পবিত্র কিছু রাখার মতো সাবধানে নিচে কাপ-প্লেটটা রাখে। নির্মলার যেন ওঠবার সময় নেই। সে চোখের ইশারা করে বলে—উঠ গো।

শরৎ হাতের ঘড়ি দেখে বলে—বাস রে! বাবু চলি। কাল সকাল নটায়, তাহলে।

সাহাবাবু ঘাড় নাড়েন। নির্মলা ওঠে। ফুলকলিয়াও। সাহাবাবু বলেন—নির্মলা আবার এসো তাহলে। তুমিও এসো।

ফুলকলিয়া মাথা দোলায়। কেন আসবে এখানে, সে বুঝতে পারে না। কিন্তু তার মনে হয়, নির্মলার যে এত সাহস, গাঁয়ে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা, কাকেও গ্রাহ্য না করা—সবকিছুর ঘাঁটি যেন এখানেই। সে কি নির্মলা হতে পারবে? পারলেও তা চাইবে না। মেয়েদের এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। গদি থেকে নেমে গিয়ে পানটা মুখে ভরে সে। মুহূর্তে মিঠে ঠাণ্ডা স্বাদে সে আপ্লুত...।

শরৎ সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে হাঁটে। সে আগে, পিছনে ফুলকলিয়া আর নির্মলা। নির্মলা ছেনিমার ব্যাপারটা বলতে-বলতে চলে। শরৎ হাসে আর বলে—এতোয়ারি ছেলেটাকে হাটুয়া মজিয়েছে। তা পুরুষ মানুষ একটু-আধটু স্ফূর্তি না করলেও চলে না।

জেলখানা ছাড়িয়ে বাঁধে ওঠে ওরা। আর আলো নেই। বাঁধের ডানদিকে ঝোপঝাড়—তারপর গঙ্গা। বাঁদিকে খোলামেলা ক্ষেত, কখনও বাগান। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। কখনও ঘন্টি বাজিয়ে সাইকেল চলে যায়। ফুলকলিয়া চুপ। সে অন্ধকারেই জিভ বের করে লুকিয়ে রঙ দেখছে। শরৎ বলে—মুখিয়াকা ঘর ভোজ খাতে হামি না যাবে গে বহু, সমঝা? তু যাকে বলিস, বিমারী ছে।

নির্মলা বলে—হামি বি না যাবে। ধনপতিয়ার বেটির গায়ে হলুদের দিনে আমি গেলুম তো মোল্লান কথাই বলল না।

বাঁদিকে বাঁশবন। ডাইনে বাঁধের গা ঘেঁষে বড় একটা গাছ। তার তলায় আগুন জুগজুগ করছে। কেউ বিড়ি টানছে। শরৎ একটু দূর থেকেই বলে— কে?

—শরৎদাদা? হামি হাটুয়া। এতোয়ারি ভি।

—মরণ নেই ছে তেরা বে!

ফুলকলিয়া থমকে দাঁড়িয়েছিল। নির্মলা তাকে টানে। চাপা গলায় বলে—ডর কানে গে? ডাগদার বাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলুম তোকে। আয়।

কাছে গিয়ে শরৎ বলে—আবে এতোয়ারি। তোর বহুর বিমারি হবে আর আমাদের মাগমরদের ঘাড়ে ডাক্তার দেখাবার বোঝা চাপবে? বড় ঘরে বিয়ে করছিস। একটু লক্ষ রাখিস। এখন এই নে—তোর বহু। ...শরৎ হো-হো করে হাসে।

এতোয়ারির জবাব নেই। কিন্তু ফুলকলিয়া আশ্বস্ত হয়।

* * *

শুধু আশ্বস্ত হয়নি—যেন এই প্রথম ফুলকলিয়া তার পাখরকা মাফিক মরদটার জন্যে বুকের তলায় কী টান টের পেয়েছিল। ছেনিমাঘর, অচিনাজান লোকজন আর হল্লাজেল্লা—আর ওই সাহাবাবুর আড়তদারি, হোঁৎকামোটা পালোয়ান মুটেগুলো—যাদের হাতে বড়শির আজব সূচলো অস্তর, আর যাদের চোখে ছিল লকলকে জিভ—তাদের মধ্যে সে হারিয়ে গিয়েছিল কিনা। তার চেয়ে এই লোকটা তার কত আপন। বাঁধের সাঁইবাবলার ঝাড়ে যেমন সোমলতার ঝালর, তেমনি হলুদ রঙের বাহার হয়ে এই মরদটার গায়ে তাকে ঝুলে থাকতে দিয়েছে না ঠাকুরবাবা? শহর থেকে ফেরার পথে সে রাতে ফুলকলিয়ার মন ছিল উথালপাথাল। ইচ্ছে করছিল, সরস্বতী বুড়িয়ার বেটাকে অন্ধকারে ছুঁয়ে থেকে হাঁটে। পাশে যেন সতীন ওই শরৎদালালের বউ। তার তো কথায় কথায় মস্করা। শরৎ যেন পুরুষ মানুষই নয়, আর হাটুয়াটাও ঠাকুরবাবার থানের মানুতে পাঁঠা—ঘোঁত-ঘোঁত করে এগোচ্ছিল। মাঝে-মাঝে নির্মলার গুঁতো খেয়ে কঁক করে ককিয়ে উঠেছিল। আর সেই উথালপাথাল আবেগে আরও ঝড় তুলে নির্মলা বলল কি না, ও এতোয়ারিদা! তোমার বহুর পেটে কাচ্চাবাচ্চা না এলে আমার ছাড়াছাড়ি নেই। কী লজ্জা কী শরম ফুলকলিয়ার! অন্ধকারে ঝাঁকে-ঝাঁকে বকুলতলায় ফুল ছড়াছড়ি তখন। তখন আকাশে তারারা খুশি হয়ে হেসেছে। আর নিষাদবাগের থানের পাশে শিমুল গাছের মাথা থেকে ভারিভুরি আশীর্বাদ করে বলছিল, তোর ক্ষেতে ফলুক মন-মন শকরকন্দ। তোর বাহানে (মাচায়) ঝুলুক থরেবিথরে হরেক ফল। তোর ঘরে গাইগরু হোক দুগ্ধবতী। গঙ্গামাইজির কিরপায় তোর জীবনের দুধারে জাগুক উর্বরতা। কোলে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে দহের ঘাটে তুই কবে নাইতে যাবি গে ফুলকলিয়া!

তো এতোয়ারির যেন হুঁশ ছিল না সে রাতে। নির্মলার কথা শুনে শরম পাচ্ছিল? ফুলকলিয়া চাইছিল, তার মরদটা কিছু বলুক। মুখের পাল্টা মুখ করুক। বলুক— না গে নির্মলাদি, হামরা তোদের মতো বাঁজা-বাঁজিন নই। অথচ এতোয়ারি চুপ। কেন অত চুপ ছিল সে? সে রাতে ধনপতির বাড়ি খাওয়া সেরে এসে উঠোনেই শুল। কেন শুল অমন একা-একা? দাওয়ায় সারারাত ননদ ছোটীর পাশে শুয়ে ফুলকলিয়ার দুচোখে নিঁদ ছিল না। কী সমঝাল বুড়িয়ার বেটা? কেন আজ তাকে নিয়ে শুল না? ভাবতে-ভাবতে ফুলকলিয়ার চোখে জল এল। ফুলকলিয়া চুপিচুপি কেঁদেছিল। ঠাকুরবাবা! তুমি সাক্ষী থাকো! সাক্ষী থাকো গে ভারিভুরি ঠাকরানীরা! আমি কোন গলতি করিনি। আমার মরদ আমাকে বেফয়দা এত্তা দুখ্ দিল! আর শেষ রাতে ফুলকলিয়া স্বপ্ন দেখল। দেখল বাঁধের ওপর গাবগাছ তলায় ধনপতি সরকারের ছেলে সূরযপতি সরকার খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে।...

সূরযপতি এমনি দাঁড়িয়ে থাকে। উত্তর থেকে দক্ষিণে গঙ্গামাইজির কাঁধ বরাবর চলেছে এক নিচু বাঁধ। সেই বাঁধে রোজ সকালবেলা সে দাঁড়িয়ে থাকে। তার হাতে নিমডাল। পাতাগুলো আস্তে আস্তে ছেঁড়ে। তারপর ডালটা কামড়ে তাকায় পুবে। পুবে সকালের রোদজ্বলা মাঠ। সেই মাঠে রুখা-শুখা পাট আর আখের চারা, আউশ ধানের আঁকুর আর ফুলবতী তিল একফোঁটা জলের জন্য ছটফট করে। ফের সূরযপতি তাকায় দক্ষিণে। বাঁধ বরাবর নজর রাখে। এঁকেবেঁকে কতদূর চলেছে আর চলেছে এই বাঁধ। করলহাটি ছাড়িয়ে সুজাপুর চকবাহাদুরপুর মহুলা চন্দ্রপুর গোঁসাইতলা পেরিয়ে অচিন অজান মুল্লুকে। সূরযপতি কী দেখে? দেখে ধরম-পথ। তাঁর বাবা ধনপতি বারোয়ারি বটতলায় হুঁকো খেতে-খেতে বলে, ওই হল গিয়ে ধরমপথ—চলে গেছে ঠাকুরবাবার দেশ। ধরমপথের কিনারায় এই পঞ্চায়েততলা। ধনপতি বলে, দশের কাছারি। তো মুখিয়ার বেটা কি উদাস চোখে তাকিয়ে ধরমপথে চলে যাবার কথা ভাবে? ওর মুখে যেন সেই রকম চাপা ভাব। ফুলকলিয়া হলফ করে বলতে পারে। কেন পারবে না? অমন পুরাভরা জোয়ান বয়সে কেউ কি বিভা না করে থাকতে পারে? ও তো হাটুয়া

নয় যে টাকার জন্যে বিয়ে হয়নি। ও মুখিয়া গাঁওপতির বেটা। লিখাপড়া শিখেছে। দশের কাছারিতে হরবখত তো ধনপতির মুখে ওই এক বাত—সূরযুয়া 'মেট্‌রি' পাস দিয়েছে। 'মেটরি'টা কী, কে বলে দেবে কলাবেড়িয়ার মেয়েকে? কলাবেড়িয়া বড় গাঁও বটে। সেখানে তো ও জিনিস কেউ বোঝে না। আর সূরযপতিয়ার বিয়ে না হবার কারণ কি ওটাই? সে নাকি বলেছে, গায়ে উল্কিদাগা ঔরতকে সে বিভা কিবে না। এত বড় তাজ্জবের কথা। তাদের জালে উল্কিছাড়া মেয়ে কি থাকে নাকি? ভারিভুরির পূজার সময় মাটির নতুন সরায় কলাই গাছ নিয়ে গিয়ে বসলেই তো দুই বাহুতে উল্কি দেগে দেবে ঠ্যাং-কাটা ল্যাংড়া রঘুয়া। ওই তোমার চিহ্ন। পরকালে তোমার দেখলেই ঠাকুরবাবা চিনে নেবেন, আর যমদূতদের হাত থেকে তোমার ইজ্জত বাঁচাবেন। ফুলকলিয়ার ফর্সা দুই বাহুতে কব্জি অব্দি উল্কির কত নকশা। নাহনা করতে-করতে দুই বাহু ছড়িয়ে সে গভীর সুখে দেখে। আর সূরযপতির কিনা উল্কি ছাড়া মেয়ের দিকে পসন্দ! আজীব বাত রী ছোটী! উসকা মাথা বিগাড় গেয়া রী—হাঁ!

ছোটীও শুনে বলে, হাঁ রী বউদি। মহুলার দশরথের বেটির সঙ্গে সূরযুয়ার বিভার কথা তুলেছিল মোড়ল। সব পছন্দ হল ওর, লিখাপড়হা ভি জানে—খালি পছন্দ হল না উল্কির দাগ। সাচ বাত। পুছো না মাকে। না, শাসকে তাই বলে পুছতে যাবে না বহু।

এখন অবশ্য ছোটীরও উল্কি নেই। ঋতুমতী হলেই তাকে ভারিভুরির পুজো দিয়ে উল্কি দেগে নিতে হবে। নতুন কোরা শাড়ি পরবে ছোটী। বাচ্চা মেয়েরা গান গাইবে। সে এক দিনের মত দিন! কুমারী মেয়ের বিয়ের পিঁড়িতে বসার সময় হয়ে এল কি না। ভারিভুরি-অদৃশ্য জামকাঠের পিঁড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে শিমুলগাছের ডগা থেকে। দাঁড়কাক ডাকলেই তা টের পাওয়া যাবে।...

তো কী ভাবতে কী ভেবেছিল ফুলকলিয়া স্বপ্ন ভেঙে! কেন এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল সে? নাহানে গিয়ে চোখে সাবুনের ফেনায় অন্ধ হয়ে গিয়াছিল, তাই না ওর গায়ে গিয়ে একটা ধাক্কা লেগেছিল। ছি ছি, শরমের কথা। বাকি রাত আর ঘুম আসেনি। উঠোনে এতোয়ারির মাথা বালিশ থেকে সরেছে। বালিশটা গেছে মাটিতে। একটুখানি বাঁকা মুখে ফুলকলিয়া চলে যায় ঘরের পিছনে 'জল-সারার' জায়গায়। আর, পাটকাঠির বেড়ায় ঘেরা ঘুপটি জায়গাটায় তখনও অন্ধকার। হঠাৎ মনে হয় কোন মরদ তাকে দেখছে। অস্বস্তি নিয়ে ঝটপট কাজটুকু সেরে চলে আসে সে। ফের শোয়। তখনও পোঁহাতকাল আসেনি। বারোয়ারি বটের মাথায় ঝুঝকি তারা জ্বলজ্বল করছে। একবার কাক-কোকিল ডেকে উঠেই যেন ভুল টের পেয়ে চুপ করে যায়। নিষাদবাগে আবার একটা দিন আসছে। হঠাৎ ফুলকলিয়ার মনে হয়েছিল এ দিনটি অন্যদিনের চেয়ে অনেক আলাদা। এর এক হাতে আছে সুখ অন্য হাতে দুঃখ। সুখের কথা ভেবে ফুলকলিয়া চোখ বোজে, দুখের কথা ভেবে তখনই চোখ খোলে। বুড়িয়ার বেটাকে সে ভালবাসায় ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল।

• হুঁ, একটা কিছু হয়েছে এতোয়ারির। ভোরবেলা আজকাল নয়নসুখের ভাগ্নে হাটুয়া এসে তাকে নিঁদ থেকে ওঠায়। কতরকম ফুসুর-ফাসুর গুপুর-গাপুর ছুপা বাত চলে দুজনে। আর অবাক কাণ্ড, এতোয়ারি ফিকফিক করে হাসে। এতোয়ারি আয়নায় মুখ দেখে। দাঁত্ গোঁটে। চুলে একটু বেশি তেল দেয়। সিঁথা করে চুল আঁচড়ায়! আর বোনকে ডেকে বলে, ছোটীগে! হামার জামাটা জেরা সাফ করে দিবি, বহিন? ছোটী আড়চোখে বউদিদিকে দেখিয়ে চাপা হাসে। ওর তো ওই। কিসে হাসতে হবে, না-হবে সে তার নিজের খেয়াল। শেষ অব্দি ঘাটে গিয়ে কাচতে হবে বহুদিদিকেই। বহুদিদি দু-দুবার ছুঁড়ে দূরের জলে ফেলে দেবে। আর ছোটী আর্তনাদ করে ঝাঁপ দেবে। তারপর শাসিয়ে বলবে, থাম রী থাম্। দাদা আসুক। এবং পাড়ে মাকে দেখতে পেলেই—মা গে। তোর বহু তেরা বেটার পিরান ফেক্ দেইলা গে।...

ধনপতি মুখিয়ার বেটির বিয়ের ক'দিন পরে সন্ধ্যাবেলা এক ঝামেলা হয়ে গেল। বারোয়ারিতলায় পঞ্চায়েত বসেছিল আচানক। ব্যাপারটা কী? বুকে ধুকধুক নিয়ে ফুলকলিয়া বারকতক ঘরবার করে শেষে ছোটীকে নিয়ে 'মাঠ সারবার' ছলে বাঁধের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। ছোটী টানে বারবার। তবু নড়ার নাম নেই। মন চঞ্চল। মামলাটা কিসের না শোনা অব্দি সোয়াস্তি নেই। যেই না শরৎ

দালালের বউ নির্মলার নাম ওঠা, থরথর করে কেঁপে উঠেছিল ফুলকলিয়া। উরু থেকে পায়ের তলা অব্দি অবশ। ছোটী টানে, পেটে ব্যথা বেজেছে—হঁশ নেই বহুদিদির। তারপর সে ফিক করে হেসে উঠেছিল—ও রী। যোমনা কানীর মামলা।

তাহলেও পঞ্চায়েত বসা মানেই অস্বস্তির কথা। একচোখে অন্ধা যমুনাবুড়ি শরতের সৎ মা। সৎবেটার কাছে সে থাকে না। থাকে যার বাড়িতে তার নামই উল্কিদার রঘুয়া। মজার কথা,তার আবার একটা ঠ্যাঙই নেই। সে মন্তর-তন্তর জানে। কবরেজী করে। গরু-মোষেরও বিমারী সারায়। আর নিষাদবাগের বহুবেটিদের তো একসময় সকাল-সন্ধে ভূতে পেত। আজকাল কম পায়। রঘু ল্যাংড়া এইসব ভূত ভাগায়। দাঁত কিড়মিড় করে হেন্তাল কাঠের অষ্টাবক্র লাঠিটার ডগা দিয়ে মাটিতে দাগ টেনে ফুঁ দিয়ে বলে—ছুঃ! যাঃ! ভাগ! গঙ্গা পার হয়ে পালা। ফের যদি গঙ্গার এপারে আসিস সিশিতে ভরে নদ্দিমে ফেক দেগা। যমুনা তার পিসি হয়েই ঝামেলা বেড়েছে বারবার। ওর জন্যেই নাকি রঘুয়ার বউ ভেগেছে। উঠতে-বসতে পিসিকে একশো গালমন্দ শাসানি দুবেলা চালিয়ে যাবে—অথচ শেষমেশ শরতের বাড়ি থেকে কোনদিন চালডালটা না এলে তক্ষুণি মোড়লের বাড়ি সে হাজির হয়ে একথা-ওকথা বলার পর মামলা তুলবে। গাঁয়ে রঘুয়ার দাম আছে। গরিবগুরবো লোক বেশিরভাগই। টাউনে গিয়ে ডাক্তারের ওষুধ খাবার পয়সা সবার নেই। যাদের আছে, তারাও হিসেব করে চলে। এককাঠা কলাই বা চাল দিয়ে খুচ-খুচ বিমারী যদি সারানো যায়, কেন অমূল্য সময় নষ্ট করে টাউনে বেশি পয়সা খরচ করতে যাওয়া? তার ওপর জানোয়ারের বিমারী আছে। এবং সবচেয়ে যা আতঙ্কের, তা হল কি না গাছগাছড়া লতাপাতার বিমারী। গাছলতা ফুল-ফল মূলমাকড় যাদের বেঁচেবত্তে থাকার একমাত্র উপায়, তাদের কাছে ওই ল্যাংড়া মানুষটার দাম কত, বাইরের কেউ বুঝবে না। একমাচান চিকন সবুজ লাউলতার প্রাণচঞ্চল লকলকে এগিয়ে যাওয়া আচানক কোন অদৃশ্য ভয়ঙ্করের হুমকিতে থেমে কুঁকড়ে যায়—কোন চাবুকের ঘা লাগে নরম পাতাগুলোর বুকে—কালো দাগ পড়ে যায়, সবই জানে রঘুয়া। জলপড়া ছিটিয়ে দিলেই আবার বদ্ধ প্রাণধারা ভরা গঙ্গার মতো ছলচ্ছল বয়ে যেতে থাকে। বেগুনক্ষেতে যে মড়ার মাথাগুলো বাঁশের ডগায় আটকানো, তা রঘুয়া ছাড়া কার সাধ্যি জোগাড় করে? যদি বা কেউ অতিসাহসী গঙ্গার আনাচ-কানাচ খুঁজে কুড়িয়ে-কাড়িয়ে আনল, সেই রাত থেকেই তার চালের খচমচানি শুরু হবে। সন্ধেবেলা তার বাড়ির বহু-বহুড়ী ঘাটমে গেলেই মুণ্ডুর খোদ মালিক পিছু ধরবে। জীবনে বাঁচতে হলে এত হরেকরকম দিগদারী আর ঝামেলা আছে। নিষাদবাগে রঘুয়া না থাকলে কী হত, ভাবতে ওই মুখিয়ার মতো লোকের বুক কাঁপে। অতএব তার ডাকে পঞ্চায়েত বসাতেই হয়। ধনপতি সরকারের লোক হয়ে নয়নসুখ জোর হাঁক মেরে আসে—সরকারজি বোলাইছে-এ-এ বটতলামে-এ-এ! সন্ধ্যার খাওয়া-দাওয়া সেরে বিড়ি বা হুঁকো টানতে-টানতে বাড়ির কর্তারা গিয়ে জোটে। নানারকম বাত চলতে থাকে। বছরের গতিক, টাউনের হালচাল, রাধার ঘাটের চৌবেলালজির খবর। তার সঙ্গে প্রচুর রসিকতা। আদালত তামাশা দিয়েই শুরু হয়। হাসিতে তোলপাড় হয় সন্ধ্যারাতের বটতলা। দুএকটা লণ্ঠন বা হেরিকেনও জ্বলে। তবে বারোয়ারি হেরিকেন হাতে সরকারজি এসে পৌঁছুলেই যে যার আলোর দম কমিয়ে দেয়। ভরত—যার ক্ষেতির পরিমাণ মুখিয়াব নিচে, সে তো হেরিকেনটা তুলে ফুঁ দিয়ে বুতিয়েই ফেলে। বড্ড বখিল লোকটা। তারপর কিছুক্ষণ মুখিয়াজির তামাশা। মাঝে-মাঝে সেও কিন্তু অপ্রস্তুত হয়। আজকালকার জোয়ানরা বড্ড বেয়াড়া। ধনপতি টাউনের কথা তুলে নিজের অভিজ্ঞতার দৈর্ঘ্য ঘোষণা করে। গঙ্গামাঈজির কাঁধ বরাবর উত্তরে গিয়ে জঙ্গীপুর এবং দক্ষিণে গিয়ে কাটোয়া—এর মধ্যে তার অচিন-অজান কিছুই নেই। তো হাটুয়া থাকলেই প্রশ্ন করবে—সরকারজি! কাটোয়া গঙ্গার পুরবপাড় নাকি পচ্ছিমপাড়? মুখিয়াজি কিছু না ভেবেই বলবে—পুরব পাড়। অমনি হাটুয়ারা হাসাহাসি করবে। ধনপতি কপট রাগে ধমকায়, হাসতা কাহে গে! হাসবে না? এত্তা ছোটা বয়সে সরকারজি কাটোয়া টাউনে গিয়ে থাকবে, তাই ভুল হয়েছে। উও তো পচ্ছিমপাড়! অগত্যা নয়নসুখ ভাগ্নেকে ধমকে বলে, থাম গে! টাউন হটতে-হটতে আজকাল পচ্ছিমপাড়ে চলে গিয়েছে। আগে পুরবপাড়েই ছিল। হাটুয়া ফিসফিস করে বলে, মামা বিলকুল ঝুট বাত বলছে।

আর এর ফলেই বটতলায় গাম্ভীর্য এসে যায়। রঘুয়া মুখিয়াজির সামনে তার আস্ত পাটা ছড়িয়ে বসে খইনি ডলছে। তার নিজের বুদ্ধিতে তৈরি করা একটা ক্রাচ পাসে পড়ে আছে। সে ফুঁ দিয়ে হাতের তালু থেকে খইনি তুলে মুখিয়াকে এগিয়ে দিয়ে বলে, হাঁ সরকারজি। অর্থাৎ খইনি নিয়ে মামলা তোল। ধনপতি খইনি গালে পুরে হাঁক দেয়—হাঁ। যোমনাদি! বলো বহিন!...

কথায়-কথায় শেষ অব্দি শরতের টাউনবাজ বউয়ের কথা এসে পড়ে। বুড়ির মতে, শরৎ বড় ভাল। শরৎ বেটা চালটা-ডালটা আনাজ-পাতিটা ঠিকই পাঠাতে বলে। ওর বহু না পাঠিয়ে মরদকে ঝুটমুট জানায়, হাঁ—ভেজেছি। তো আজ দুদিন হামি একজেরাভি দানাপানি পাইনি। রঘুয়া ল্যাংড়া মানুষ। কেন তার ঘরের দানায় ভাগ বসাব বলুক গাঁওলারা? গত মাসে শরৎ একটা ছাগলের বাচ্চা দিয়েছিল। সেটা শেয়ালে খেয়ে ফেলল। তো বেটা শরৎ বলল, মাগে! সবুর কর। ফের তোকে আরেকটা ছাগলের বাচ্চা দেব। কেন এলনা সেই ছাগলের বাচ্চাটা? নিশ্চয়ই ওই বহু-মাগী ঝুটমুট বুঝিয়ে অন্য কাউকে পালতে দিয়েছে। শরতের কথা নড়চড় তো হবার নয়।

তাহলে আসামি শরতের বউ নির্মলাই। শরতকে এখন কোথায় পাবে? সে টাউনে ঘুরছে। ফিরতে অনেক রাত হবে। বেরোবেও একেবারে 'ঘোরানি' থাকতে, তখন ঝুঝকো তারা আকাশে জ্বলজ্বল করবে। মুখিয়াজি একবার পুছে নিয়েছে, নির্মলা এখানে আছে কিনা। না থাকলে খবর দিয়ে এস নয়নসুখ! আর নয়নসুখ লণ্ঠনের দম তুলে লাঠি হাতে চলে যেতেই নির্মলার নামে গুচ্চের নালিশ উঠতে থাকল। কার মুখে হাত দেবে সরকারজি?...

ফুলকলিয়া ঠিক এই সময় এসে পড়েছিল। নির্মলা গাঁয়ের বহুবেটিকে আর সাচ্চা থাকতে দেবে না। সবাইকে টাউনবাজ না করে ও ছাড়বেই না। সাবুন মাখার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে ইদানীং, সে তো ওরই কারচুপিতে। ভজুয়ার বউ নাকি সোনার গয়না ছাড়া পরবেই না বলেছে। তাই ভজুয়া—না-মরদ কমজোর বোবা ছোকরা নাকি টাউনে গিয়ে রুপোর নিকারি পঁহুচী মল-বাজু বিলকুল বেচে সোনা কেনার মতলব করেছে। আরে বুদ্ধ কোথাকার! একটুকুন সোনা বহৎ বড়েয়া চীজ। সোনা ঘরে থাকলে সে তো রাজা। কিন্তু তাই বলে বউ যা বায়না ধরবে, তাই করতে হবে?

আর কী করেছে নির্মলা—না, লুকিয়ে বহুবহুড়ীদের অনেককে ডাক্তার দেখাবার নাম করে ছেনিমা দেখিয়ে এনেছে। হা ঠাকুরবাবা! এতকাল ধরে নিষাদবাগ বলতে গেলে টাউনের গা ঘেঁষে বসে আছে—টাউনে আসা-যাওয়া হরবখত তো চলে আসছে, তবু নিষাদবাগের লোক টাউনবাজি শেখেনি। শিখতে চায়নি। মাথাগুনতি পুছে দেখ, কজন টাউনে গিয়ে ছেনিমা দেখেছে! কথাটা হচ্ছে, ছেনিমা দেখাটা কিছু দোষের নয়—অন্তত পুরুষ মানুষের কাছে, কিন্তু বেফায়দা পয়সা খরচ করার কী মানে হয়, হিসেব করে বলো। দুনিয়ার কত ভাল-ভাল চীজ অছে, তা না পেলেও তো মানুষের চলে যায়। নিষাদবাগের মানুষ দুনিয়ার অত বেশি কিছু চায়নি কোনদিন। মেঘ ঠিক-ঠিক সময়ে বর্ষাক, ব্যস! পরনে নেহাত শরম ঢাকার জন্যে একটু কাপড়-চোপড়, বিয়ে করার জন্যে গয়নাগাঁটি, আর সারাবছর তিনবেলা পেটের রুজি! আর কী চাই মানুষের? ক্ষেত আর গাঁওয়ালে ঘোরার জন্যে তারা জন্ম নিয়েছে। তার বাইরে পা বাড়িয়ে কিসের সুখ পাবে!

কিচ্ছু না—কিচ্ছু না! গাঁওলা বুড়োরা একসঙ্গে সায় দেয়। গায়ে ঘাম জমবে, ধুলোকাদা লাগবে—তার জন্যে গাঁয়েই আছে গঙ্গা। ধুয়েমুছে মাফ হয়ে যাও। খেয়েদেয়ে আরামসে নিঁদ যাও।...

হাটুয়া এতোয়ারিকে চিমটি কেটেছে। দুজনই একটু উদ্বিগ্ন। নির্মলার নামে তখন নালিশ উঠেছে পুরোদমে। গাঁকে খারাপ করবে শরতের বউ। বউঝিদের মাথা বিগড়ে দেবে। উঁহু—দেবে নয়, দিয়েছেও। নয়নসুখের বিধবা বেটি অঞ্চলাকে ফুঁস দিয়েছে। টাউনে কার সঙ্গে দুসারা বিভার জোগাড় করেছে গোপনে। লোকটা কে, তাও অনুমান করে ফেলল দু-একজন। রামভগত তামাকওলা ছাড়া আর কেউ নয়। হাঁ, রামভগতই বটে। তামাক আর খইনি বেচতে মাঝে-মাঝে গাঁওয়ালে যায়। শরৎ বাড়ি না থাকলেও ঢোকে সে। দাওয়ায় বসে চাও-ভি পিয়ে। হাসাহাসি ভি করে শরতের বউয়ের সঙ্গে! আর ছো ছো! রামভগত ভিনজাত। অচিন আদমী। ওই যে ঘাটে আছে অত টাকাওলা চৌবেলালজি। সেও

যদি বলে, নিষাদবাগের বেটি বিভা করব—জান গেলেও কোন বাপ বেটি দেবে ওকে? চৌবেলালজির টাকার অভাবে গাঁ শ্মশান হয়ে যাক, তবু না।

ফুলকলিয়া শিউরে উঠেছিল। অঞ্চলা অন্ধকার পাটকাঠির মাচানের দিকে মেয়েদের ভিড়ে কেঁদে উঠেছে। কে শোনে এমন কান্নাকাটি! শতমুখে শত কথা বেরুচ্ছে। আর এতোয়ারি!

এতোয়ারি চমকে উঠে মুখ তুলেছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। ওদিকে ফুলকলিয়ার মুখ সাদা। চোখ বড়ো হয়ে গেছে। কে এমন করে আচানক ডাকল এতোয়ারিকে—যেন স্বয়ং ঠাকুরবাবাই। ভরতের গোঁফটাই দেখতে থাকে মাগ-মরদে, এখানে এতোয়ারি ওখানে বাঁধের কোলে অন্ধকারে ছোটী আর ফুলকলিয়া। ভরত ভরাট গলায় ভর্ৎসনা করে বলে—আর এতোয়ারি! বাত শুন একঠো। খবর্দার বেটা! বহুকে শরতের টাউনবাজ বহুটার সঙ্গে মেলামেশা করতে দিবিনে।

অনেক কষ্টে এতোয়ারি শেষে হাসল। তারপর কোনরকমে বলে, কাহে গে কাকা?

ভরত আরও গম্ভীর হয়ে হুঁকো থেকে কলকে নামায়। খুঁচিয়ে আগুন পরখ করে বলে, বলছি। ব্যস। আর বাত পুছিস নে। যদি ইচ্ছে হয়, মানবি। ইচ্ছে না হয় মানবি না। তুই ঘোড়ার পিঠে খাঁজ কেটে সওয়ার হবি যদি, তো কার বলার কী আছে। ব্যস!

আর হাজার প্রশ্নেও ভরতের জবাব পাওয়া যাবে না, সবাই জানে। অগত্যা এতোয়ারি হাটুয়ার দিকে তাকায়। হাটুয়া চোখ টেপে। ঠোঁটের কোনায় হাসি।

ফুলকলিয়ার তখন বাঘিনীর মতো গর্জে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করছিল না? করছিল তো। সে কি না বড় গাঁও কলাবেড়িয়ার বড় ঘরের বেটি। তার নামও উঠল বটতলায়? ফুলকলিয়ার ইচ্ছে করছিল না ভরতের গাছের বাকলের মাফিক কোঁচকানো চামড়া নখে ফালাফালা করে ফেলে? ওর গোঁফ ওপড়ায়, টাকের বাকি সাদা চুলগুলো ছিঁড়ে পায়ের তলায় ঘষটে দেয়? ইচ্ছে করছিলই তো। কিন্তু সে যে ও গাঁয়ের বহুড়ী। নামী লোকের বেটি। আর শাসবুড়িকে সে রাক্ষুসীর মতো ভয় পায়। এই ব্যর্থতা তার অন্ধকার চোখ জলে ভরে দিচ্ছিল। মা গে! কোথায় চলে এলাম গে, কোন আজব মানুষের দেশে!

সেই সময় নয়নসুখ ফিরে আসে। জানায়, শরতের বউ বলেছে— মেয়ে হয়ে বটতলার ডাকে বাড়ি থেকে একা-একা কেউ যায় নাকি? মরদ আসুক। তখন সে তাকে নিয়ে আসবে।

হ্যাঁ, এর বিপক্ষে কিছু বলার নেই। ধনপতির আবার ওই এক দোষ। গাঁয়ের সব বউঝি ওর সঙ্গে বাবা-মেসো-খুড়ো পাতিয়ে বসে আছে। বটতলা ছাড়লেই তখন অতি সাদাসিদে গোবেচারা মানুষ। পথেঘাটে মেয়েরা ওকে নিয়ে হাসিতামাশা করতে ছাড়ে না। আসলে লোকটা দরকারমতো কড়া নয়। সেদিক থেকে ওর বাবা রঘুপতি সরকার ছিল যোগ্য মোড়ল মুখিয়া মানুষ। ভরাট গলা আর তেমনি চাহনি। ডর পেত লোকে। তার ছেলে ধনপতি একেবারে উল্টো মানুষ। এই দেখ না, নির্মলার বিরুদ্ধে আর যেন বলার কথাই পাচ্ছে না।

একথা-সেকথা এসে গেল। কিন্তু আর নির্মলা নয়। আকাশের গতিক নিয়ে ভয়-ভাবনার কথা। আর কয়েকটা দিন শুখা গেলে নির্ঘাত আকাল পড়বে মুল্লুকে। অমঙ্গলের লক্ষণ কে কী ঝটপট দেখেছে জানাতে থাকে। রঘুয়া ওস্তাদ মানুষ। সে খুবই গম্ভীর হয়ে যায়। কানী যমুনাবুড়ি এক চোখে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার গলার কাছটা গিধনীর মতো ধকধক করে কাঁপে। তারপর রঘুয়া ঘোষণা করে—সমঝে নাও সমঝওয়ালারা, কেন ঠাকুরবাবার কিরপা হচ্ছে না। টাউনবাজির কথা ছেড়ে দাও! এই যে বললে ছেনিমা—উওভি ছেড়ে দাও।

তব? ধনপতিই প্রশ্ন করার অধিকারী। সে পুছ করে—তব ক্যা?

পিছে বলব জি। রঘুয়া বলে। আভি পিসির মামলার ফয়সালা হোক।

স্তব্ধ গম্ভীর বটতলা। হাবভাব দেখে এবং পেটের ব্যথাটা বাড়ায় ছোটী বর্দিদিকে ছেড়ে চলে যায় অকুতোভয়ে বাঁধের ওপাশে কোথাও। ফুলকলিয়া থির—পা আটকে গেছে। চোখ অনেকটা শুকনো হয়েছে। আর হঠাৎ সেই ভাবনা ভরা স্তব্ধতা ভেঙে একটু তফাত থেকে নির্মলার রুষ্ট গলার ঝাঁঝ ছড়িয়ে আসে। হনহন করে পুরুষের সীমানায় ঢুকে কানী সৎ-শাশুড়ীর দিকে আঙুল তুলে বলে, এই

বুঢ়িয়া। সাচ কথা বল। খবর্দার! এক তিল ঝুট বললে তোকে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দেব! আজ সক্কালবেলা হারিয়াকে চাল মসুরকলাই দুটো পাকা কলা একটা আম পাঠাইনি?

রঘুয়া ঘোরে। কিন্তু কিছু বলে না। বুড়ি কুচ্ছিত একটা গাল দিয়ে ওঠে। ধনপতি একবার ধমক দেয়। নির্মলার গলা চড়তে থাকে। গাঁওয়ালারা ফ্যালফ্যাল করে তাকায় শুধু। শরৎ দালালের সঙ্গে কারও না কারও অনেক ব্যাপার-স্যাপার আছেই। কারও কাল-পরশু, কারও আজ রাতেই। ভেতরে-ভেতরে তার টাউন থেকে ফেরার পথ চেয়ে কেউ উদ্বিগ্ন। বুড়ি জবাবে শুধু অস্পষ্ট গাল দিতে থাকে। ধনপতি বা ভরতের শান্ত ধমকে কাজ হয় না। নির্মলা তো নিষাদবাগের কাকেও পরোয়া করে না।

সঙ্গে-সঙ্গে ফুলকলিয়া চাপা খুশিতে ফেটে পড়েছে। নির্মলার ওপর আবছা বিরক্তি যা কিছু জমেছিল মনের কোনায়—সব সাফ হয়ে গেছে। আসলে এজন্যেই তো ওকে ফুলকলিয়ার বরাবর এত পসন্দ। নিষাদবাগে বউ হয়ে আসার পর এই একটা মেয়েকেই তার নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে, তার কারণটা হল এই। সাফ-সাফ বাত করতে আর মরদ-মাগীগুলোকে ঠাণ্ডা করতে নির্মলার জুড়ি নেই। এবছর ভারি-ভুরির পুজোর দিন ওর সঙ্গে গঙ্গাজল পাতাবেই পাতাবে।

ফুলকলিয়া আরও সন্তুষ্ট হয়, কানী বুড়িটাকে তার শাস কল্পনা করতেই। কবে সরস্বতীয়ার মুখের ওপর নির্মলা অমন আঙুল তুলে হাঁকডাক ছাড়বে? কবে তার বেটা এতোয়ারির নাকের ডগা খামচে দিয়ে নির্মলা বলবে, ওগে বলদা, নি-মরদ, বুড়বাক অন্ধার অন্ধা ভোঁসড়িরাম?

রঘুয়া ল্যাংড়া তখন চোখ পিটপিট করে ঘাড় ঘুরিয়েছে। আ রী শুন, শুন্। মেরা বাতাঠো তো শুন ভাই! চেল্লানিতে ফায়দাটা কী? ইজ্জতওয়ালীর ইজ্জত তো নিজের কাছে। শুন রী!

নির্মলা ওর দিকে রুষ্ট চোখে তাকায়। ধনপতিও ফাঁক পেয়ে বলে, বেটি! দশের আদালতে নিষাদবাগের কোন মেয়ে আজ অব্দি এমন বোলচাল করেনি। তো করলহাটির মেয়েরা যেন বাপের গাঁয়ের ইজ্জত ডোবায় না।

ধনপতি মোড়ল একটু হাসেও—তামাশা করে বলল কিনা। তখন নির্মলাও ঠোঁটের কোনায় যেন একটু হাসে। তৃপ্তির হাসি ছাড়া আর কী! আর রঘুয়া হেসে বলে—ছাগল রী বহু, ছাগল! পিসি ছাগলের জন্যে মরার ফুরসত পাচ্ছে না, বুঝলিনে?

—হ্যাঁ, ছাগল, ভরত মনে পডিয়ে দেয় এতক্ষণে। শরৎ সৎ-মাকে আরেকটা ছাগল দেবে বলেছিল না? বটতলায় হাসির ধুম পড়ে গেছে সঙ্গে-সঙ্গে। পাটকাঠির মাচানের দিক থেকে মেয়েরাও খিলখিল করে হেসে উঠেছে।

নির্মলা রঘুয়াকে লক্ষ করে বলে, পিসিকে বলে দাও। ওর বেটারও এখন মরার ফুরসত নেই। ফুরসত হলেই ছাগল বেঁধে দিয়ে আসবে। তারপর সে হনহন করে আলো থেকে সরতে-সরতে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যায়। বটতলার আদালত তার চলে যাওয়া দেখতে থাকে। লাল রঙের তাঁতের শাড়ি, তাতে কালো ডোরা—অন্ধকারে গিয়েও জ্বল-জ্বল করতে থাকে। টাউনবাজ মেয়েটার এভাবে চলে যাওয়ার মধ্যে বাঘিনীর আদল আছে যেন। ভরত হাই তুলে বলতে থাকে, জমানা বদলে গেল। আর কী! এই নিষাদবাগের মেয়েরা কেউ ঘরবন্দী ঔরতও না, বোবাও না। দেখতে-দেখতে চুল পেকে গেল। মুল্লুকে-মুল্লুকে হাটবাজারগঞ্জে টাউনে তারা না ঘোরে এমন নয়। ভিনজাতের মরদের সঙ্গে দরাদরি করে আনাজপাতি বেচে। নিষাদবাগের কেন, তল্লাটে তাদের মেয়েদের মুখরা বলে বদনামও আছে। কেউ এক কথা বললে দশ কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ে না। তো কথা হচ্ছে, সে একরকম টাউনবাজি। লেকিন শরতের বহু? ও তো গাঁওয়ালে হাটবাজার ঘোরে না আনাজপাতি নিয়ে—ওর অন্যরকম টাউনবাজি।...

ভরত কথা শুরু করলে সে এক রামায়ণ! কিন্তু তার মতো ব্যাখ্যাকার আর কেউ নেই নিষাদবাগে। চুলচেরা হিসেবনিকেশ করে সব ব্যাপারের তলাঅব্দি দেখিয়ে দেবার ক্ষমতা তার আছে। বটতলা গোড়ার কথার খেই ফিরে পেয়েছে সঙ্গে-সঙ্গে। আবার নির্মলার নামে একশো নালিশ-শুরু। কেউ উঠেও যায় হায় তুলতে-তুলতে। মেয়েরাও অনেকে ওঠে। কার বাচ্চা কাঁদে। কে ডাকে। ধনপতি সরকার নয়নসুখকে কলকে সাজাতে ফরমাস করে। আর ভাঙা হাটের হাওয়া উঠতেই ফুলকলিয়া

বাঁধে গিয়ে ডেকেছে ছোটীকে। কোথায় গেল ছোকরীটা? বার দুই ছোটী গে বলে ডেকে সে সাড়া পাবার আশা করে। ছোটী কখন রাগ করে ভেগেছে বুঝি। আরও কয়েক পা এগোতেই কী একটা আওয়াজ শোনে ফুলকলিয়া। ঝনঝন খনখন আওয়াজটা যে 'টিপগাড়ি' অর্থাৎ সাইকেলের তাতে ভুল নেই। বাঁধের ওপর রাস্তাটা মোটে হাত দুই বা তারও কম চওড়া। দুধারে ঝোপঝাড় আকন্দ সাইবাবলা কেয়া পিটুলি আর কতরকম ছোট বড় গাছ—হিজল ভাড়ুলে জাম ছাতিম গাব। আকাশ ভরা ডগমগে তারা। ফুলকলিয়ার চোখে বটতলার আলোর ধাঁধা তখনও ঘোচেনি এবং আচানক যেন বুকের ওপর ক্রি রি রি রি রি রিং...

আই মা রী! চাপা আর্তনাদ করে ফুলকলিয়া লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু অন্ধকার রাতের বেহুদা অন্ধা টিপগাড়ি তার ওপর এসে পড়েছে। বাঁধের গায়ে ঝোপের ধারে ফুলকলিয়া বেটাল হয়ে গড়িয়ে গেছে। তাতেও বাঁচোয়া নেই। সাইকেলের চাকা আর লোকটাও তাকে চেপে দিয়েছে।

হঠকারী টিপগাড়িওয়ালা বেহায়া। আবছা খুক-খুক করে হাসতে-হাসতে কীভাবে তার টিপগাড়ি সামলাল, ফুলকলিয়া টের পেল না। তাকে বেজেছে। টিপগাড়ির চাপে নয়, লোকটার একটা পা পড়েছিল উরুতে। ফুলকলিয়া ধুড়মুড় করে উঠে ফুঁসে বলে—কৌন গে? অন্ধা না কানা?

—টর্চকা বেট্‌রিবিগড়ে গিয়েছে রী! চোট বেজেছে নাকি? মাফ্ দিস ভাই।

সঙ্গে-সঙ্গে ফুলকলিয়া গিয়েছে রী! উরুদুটো থরথর করে কাঁপে। বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ে। সূরযপতিয়া! ধনপতি সরকারের বেটা। ছি ছি, কী শরমের বাত! ফুলকলিয়া ঝটপট ঘুরে দাঁড়ায়। অন্ধকার—সেও যথেষ্ট নয়, ঘোমটা টেনে দেয়।

—কৌন রী তুম?

মনে-মনে ফুলকলিয়া তবু ফুঁসতে ছাড়ে না। আমি কে তাতে মুখিয়ার বেটার কী দরকার? সেদিন না হয় চোখে সাবুনের ফেনা ছিল বলে আমি তোমার গায়ে পড়েছিলাম। আজ তুমি এসে হামার গায়ে পড়লে। এ যেন শোধের কারবার।

বাত বোল নেই কাহে রী?

—মোড়লের বেটার অত দিগদারি কেন? ফুলকলিয়া ফুঁসে ওঠে, কাহে? কেন কথা বলব?

সূর্য হাসল।...এতোয়ারিদার বহু! হাঁ। মাফ দিস ভাই।...সাইকেল নিয়ে এগিয়ে যেতে-যেতে সে ফের বলে যায়। তো খালি তোমার সঙ্গেই কেন ধাক্কা লাগছে রী বহু?

ফুলকলিয়ার বুক দুলে ওঠে আচানক এই বাতে। তার কী হয়ে যায় যেন, একশো রকম কথা আর তোলপাড়—অভিভূত। ঘোমটা সরিয়ে অন্ধকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কেউ নেই আর। স্বপ্নটা মনে পড়ে যায়। একটু পরে ভাঙা গলায় সে অকারণ ডাকে—ছোটী! তু কাঁহা রী? নিজের স্বর নিজের কাছেই অচেনা লাগে।

চৌবেলাল ঘাটোয়ারির গন্ধ তুমি অনেক দূর থেকেই পাবে। —নয়নসুখ এই বলে মুখ উঁচু করে গন্ধ শোঁকে। আর তাই দেখে ধনপতি মুখিয়ার মতো গুরুগম্ভীর মানুষও তামাশায় মেতে যান।

—আবে নয়নসুখ! গন্ধটা কেমন পাচ্ছিস? মিঠা, নাকি বদ? বরবাতে আসছে, নাকি পিতে?

নয়নসুখ খিকখিক করে হাসে।—নিষাদবাগের কুত্তা চিল্লাচ্ছে জি! শুনো না! ওই!

সত্যি কথা! চৌবেলালজি এলেই কুকুরগুলো প্রচণ্ড চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। তো চৌবেলালজি না ভালুকওলা মাদাবী ঢুকছে গাঁয়ে, সেটা বুঝতে আচমকা কোন কুকুরের গ্যাঁও করে ককিয়ে ওঠা যথেষ্ট। মাদারী এলে কেউ কুকুর থামাতে ঢিল বা পাবড়া ছোঁড়ে না। জানোয়ার দেখে জানোয়ার চেঁচাচ্ছে, চেঁচাক। তাই তো নিয়ম। লেকিন চৌবেলালজি মানী আদমী। বলেন—কী মুখিয়াজি, গাঁওবালা কুত্তা পুষেছে অনেক?

ধনপতি কথাটা বুঝতে পেরে বলে—আপনি বছরে দো-এক দফা আসেন কি না। অজানা লোক দেখলেই কুত্তা চেঁচায়। হরঘড়ি আসুনি, তাকিয়েও দেখবে না।

চৌবেলালজি তাই বলে মুখিয়ার বাড়ি বসবেন না। ঘাটঘাটে ঘুরবেন।

দাদনখাওয়া পাট আর আউশের চারা খুঁটিয়ে দেখবেন। এবার বড্ডবেশি শুখা পড়েছে। টাকা উসুল হবে কি না সমস্যা। খবর পেয়ে তো বটেই, আকাশের গতিক দেখে আসতে হয়েছে।

তবে মানুষটি বড় ভাল। মুখে মিঠে বুলি। আর তাঁর আসাতে গাঁসুদ্ধ ব্যতিব্যস্ত। দুধের বাচ্চাও মায়ের স্তন থেকে মুখ তুলে ঘাটোয়ারিবাবুকে দেখতে থাকে। ছাগলচরানী আধন্যাংটো ছোকরিটাও প্যাটপ্যাট করে তাকায়। বুধিনী আর সুধিনী দুই যমজ বোন বহরী—বোবাকালা মেয়ে। গাঁয়ের শেষে ঘর তাদের। বহরী ভাষায় তারিফ করে বাবুজির। বাচ্চাওয়ালি তার বাচ্চাকে ফিসফিস করে শেখায়—বোলো, চৌবেজি! তুমি আচ্ছা তো! ভালো তো চৌবেজি! পাখির স্বরে নরম আওয়াজ শুনে চৌবেজি এসে তার গলা টিপে আদর করে। —এ সরবতিয়া! তেরা বাচ্চা বহুৎ দুবলা কাহে গে? জ্বরজ্বালা হচ্ছে নাকি?

সরবতিয়া ঘোমটা আরও টেনে দেয়। তার মাতৃহৃদয় হু-হু করে গলে যায়।—নেহী বাবুজি! খারাপ হাওয়া লেগেছে। অনেক দেখাচ্ছি, সারছে না। হামার নিদ আর আসে না বাবুজি!

তো কার কথায় জবাব দেবে চৌবেজি? ভিড়ে একশো কথা চারদিক থেকে ঘিরেছে তাঁকে। তবে হঠাৎ বড়া আদমীর মেজাজ বিগড়ে যেতে কতক্ষণ। —এ নসু! তেরা মরদ কাঁহা গে!

—জি চৌবেজি, পোঁহাতকালে গাঁওয়ালে গিয়েছে।

—ঝুট বলছিস কেন গে?

—আপনার কিরিয়া বাবুজি...

—এ মেরা ভাতিজাকা বেটা! এ রামলাল! ভেগে যাচ্ছিস কোথায়? শোন।

রামলাল আজ গাঁওয়ালে যায়নি। রাস্তার ধারে গভীর নয়ানজুলি—তার ওপারে ঝোপঝাড়। ছোট গাছপালা। আঁকশি দিয়ে শুকনো ডাল ভাঙতে-ভাঙতে চৌবেজিকে দেখেই হাঁটু ভাজ করেছিল। নজরে পড়ে গেছে। স্রেফ মুখের কথায় তিনটে টাকা ধার পেয়েছিল গতমাসে। আর টাউনেও যায় না—ঘাটের দিকে তো নয়ই।

এইসব আদর আর বকুনি, কখনও শাসানি দিতে-দিতে গাঁয়ের মাঝামাঝি জায়গায় কদম গাছের তলায় দাঁড়ায় চৌবেজি। ধনপতি গতিক বুঝে আকাশের কথা তোলে। চৌবেজি গোঁফে তা দিতে-দিতে আকাশ দেখে। প্লেন যাচ্ছে ঈশান কোণে। ভাগীরথীর ওপর চিল উড়ছে। —হাঁ একফোঁটা বরষানো উচিত ছিল। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

—তা তো হবেই। দার্শনিক নয়নসুখ বলে। বড় বেশি লোভ হয়েছিল যে। তোমরা শাকসবজি ফলমূলটা নিয়ে থাকবে। ভারিভুরির সেবা করবে। ..বড় চাষে হাত বাড়াতে গিয়েছ—বোঝ ঠ্যালা।

গাঁওলারা এর জবাব খুঁজে পায় না। বরং মাঠের ম্রিয়মান ছবি এঁকে চৌবেজিব সামনে ধরে। প্রভুরাম বাবুলাল দয়ারামরা যথাসাধ্য বোঝায়। চৌবেজি গুম হয়ে থাকে। তারপর বলে—তোমাদের কী? আমিই রাস্তায় বসব। এবং একটু পরে—আ বে নয়নসুখ! তোর ভাগ্নে কোথায়? হাটুয়া?

—গাঁওয়ালমে চৌবেজি। নয়নসুখ উদ্বিগ্ন মুখে তাকায়! টাকাকড়ি ধার করেছে নিশ্চয়। পরক্ষণে মুখ ফুটে কোনরকমে শুধোয়—কাহে জি?

হাসে চৌবেলাল।—এমনি। বড় ভাল ছোকরা। কাজের ছেলে আছে। আমার খুব পছন্দ হয়েছে ওকে।

অমনি নয়নসুখ হাতের তালু চিৎ করে একমুখ হেসে বলে—তব্ লিয়ে লিন।

—হুঁ! ওঠা কে? সামনে হিজলতলায় মেয়েদের মধ্যে কাকে দেখছে চৌবেজি।

—বুধিনী।

—উঁহু।

—তব্ সুধিনী।

—আরে না। চৌবেজি তারপরই চিনতে পারেন।—এ বুড়িয়া! এ সরস্বতীয়া পিসি!

এতোয়ারির মা খুশিতে আকুল হয়েই সামনে এল। খবর পেয়ে মাসকলাই পিষতে পিষতে উঠে এসেছে। হাটুয়াকে পছন্দ চৌবেজির আর তার বন্ধু এতোয়ারিকে পছন্দ হতেই বা কী দেরি। অমন সুন্দর ছেলেটা হাল্লাক হচ্ছে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে। এই খরার দিন—তার ওপর জুটেছে এক নচ্ছার বউ। জোয়ান মরদকে ফেলে-ফেলে ননদের গলা ধরে শুয়ে থাকছে অন্য বিছানায়। ছেলেটার মনে কী হচ্ছে সে এক জানে ঠাকুরবাবা আর তার গর্ভধারিনী মা।—আচ্ছা হ্যায় তো ভাতিজা? সব ভাল তো? দেশে যাওনি? বহু-কাচ্চা-বাচ্চা ভাল তো?

চৌবেজি বলে—এতোয়ারিকে পাঠিয়ে দিও একবার। কথা আছে।

—হাঁ হাঁ। জরুর যাবে। কেন যাবে না? বলে দ্রুত বুড়ি হাতের মাষকলাইয়ের আটা সাফ করে।

—আর পিসি, আমার দিনকাল সুবিধে যাচ্ছে না গে! এতোয়ারির বিয়ের সময় বাড়তি ত্রিশঠো রুপেয়া দিয়ে বলেছিলুম, ভাদ্রমাসে আউশ উঠলে শোধ দেবে। তাই না গে?

—হাঁ ভাতিজা। সরস্বতী বুড়ির ভাঙা দাঁতের মধ্যে জিভ নড়বড় করে।

—তো এতোয়ারি আজকাল ভালই কামাচ্ছে শুনি! চৌবেজি ঠোঁটের কোনায় হাসে। হাটুয়ার কাছে শুনেছি তো। দুজনে তো হররোজ ছেনিমা দেখছে। টাউনে ঘুরছে। বোলো পিসি! পয়সা না হলে এত্তা রঙবাজি করে না কেউ। করে?

বুড়ি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে শুধু। জিভটা সমানে নড়বড় করে। কানের বড়বড় রুপোর আংটার গুচ্ছ রোদে ঝিলমিল করে।

—ভেজে দিও বেটাকে। চৌবেজি তাকে শেষ কথা বলে ওঠে।

সরস্বতীর তামাটে কোঁচকানো মুখ। সে এখন বাজপোড়া গাছের গুঁড়ির মতো স্থির। হাঁ—সে রাতে বারোয়ারিতলায় একটুখানি কথা উঠেছিল বটে। লোকের মুখে আভাস পেয়েছিল সে। তো বেটাকে কিছু পুছেনি। বরং মনে হয়েছিল, বেশ করেছে এতোয়ারি। ঠিকই করেছে। মরদজোয়ান একটু রংবাজি করবে না কেন? এতোয়ারি—সাত চড়ে রা নেই, পেড়কা মাফিক পাথ্থর কা টুকরে এতোয়ারি টাউনবাজ হোক। ফুর্তি করুক। গাঁওবালারা মুখে যাই বলুক, মনে-মনে কে না খুশি হবে নিজের-নিজের ছেলেপুলেদের বাবুগিরি দেখে? আর এই এতোয়ারি যদ্দিন থেকে কলাবেড়িয়ার মেয়ের পাশে শুয়েছে, তদ্দিন থেকে শুকিয়ে কালি হচ্ছে না? ডাহিন! ডাইনি মেয়ে! শুষে খাচ্ছে মরদের লোহু। সরস্বতী যদি তার তার বেটার আত্মায় ঢোকার সুযোগ পেত, দেখিয়ে দিত কেমন করে বহুর ডাহিন-পনা খতম করতে হয়। খুব অশ্লীল কথাবার্তা মাথায় এসেছিল বুড়ির। তো বলে কী লাভ! আগের মতো ঝগড়া করার তাকতও নেই। দুচারবার চেঁচালেই বুক ধড়ফড় করে। হাঁপায়। মনে গোপন ইচ্ছে পোষে—পরপর দুবছর যদি আকাশ ভাল বর্ষায় তো আবার বিয়ে দেবে এতোয়ারির। কলাবেড়িয়ার মঙ্গলের তিন-তিনটে বউ। মঙ্গলও গাঁওয়াল করে খায়। তিন বহু তিনদিকে বেচতে যায়, মঙ্গল যায় বাকি দিকটায়। সন্ধ্যাবেলা মাঠের মধ্যিখানে চারজনে দেখা-সাক্ষাত। কথা বলতে-বলতে গাঁয়ে ঢোকে। সরস্বতী নিজের চোখেই দেখেছে। সতীনে-সতীনে কত ভাব! মঙ্গল খাঁটি মরদ বলেই এমনটা হয়েছে।...

সরস্বতী হিজল গাছের তলায় একা হয়ে গেছে কখন। চৌবেজি চলছে ধনপতির বাড়ি পেরিয়ে। সঙ্গের ভিড়টা কমেছে। মাঠের দিকে পা বাড়ালেই এখন ফ্যাসাদ। ফসলের দশা দেখে চৌবেজির খুন টগবগ করে ফুটবে—যেন দাদনখোর চাষারই যত দোষ। আসমান কানা হয়ে গেল তারই পাপে। এইরকম বিদঘুটে নালিশ তুলে চৌবেজি হাতের ছড়ি এদিকে-ওদিকে নাড়বে। চেল্লাচিল্লি করবে। অতএব একা-একা দেখতে যাক। ফিরে যখন গাঁয়ে ঢুকবে, তখন গাঁওবালারা কে কোথায় জরুরি কাজে কেটে পড়েছে। মেয়েরা গেছে গঙ্গার ঘাটে। চৌবেজির সঙ্গে বচসা করার জন্যে গাঁয়ের কুত্তাগুলো রইল—ব্যস!

বাঁধের নিচে দুধারে জামালগোটার ঝোপ। তার মধ্যে দিনদুপুরে অলীক চাঁদের মতো ঝলমলাচ্ছে পেতলের ঘড়া। চৌবেজি ঘাড় ঘুরিয়ে হেসেছে।

—কৌন রী? নির্মলা?

—হাঁ হাঁ! কানা হয়ে গেল না তো বুঢঢাকা বেটা?

—হয়েছে! হাঁ রী নির্মলা তোর বর কোথায় গেল?

নির্মলা ভাঁড়ুলে গাছের তলায় এসে কাঁখ থেকে ঘড়া নামায়। চৌবেজির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঁকা হেসে বলে—বরকে তো তুমিই লুকিয়ে রেখেছ ঘাটোয়ারিবাবু। কাল থেকে বাড়িই এল না। কে জানে দুসরা বহু জুটিয়ে দিয়েছ নাকি!

—বলিস কী রী!...চৌবেজি পানজাবির পকেট থেকে খইনির কৌটো বের করে।—সাহাবাবু থাকতে আমার পছন্দ করা বহু নেবে কেন শরৎ? আজকাল সাহাবাবু ওর মুরুব্বি।

নির্মলা জোরে মাথা দোলায়।

—মুরুব্বি ওর সবাই। টাউনসুদ্ধ।

তামাশা ছেড়ে চৌবেজি বলে—শরৎ থাকবে বলেছিল। তাই এলুম। এসে অব্দি ওর চাঁদমুখ দেখতে পাচ্ছিনে। ঝামেলায় পড়ে গেলুম না?

—কিসের ঝামেলায় গে?

—দাদনী ভুঁইগুলো দেখব, তো আমার কি আর অত মনে আছে। সব ব্যাটা একে-একে কাজের ছলে ভেগে গেল। এখন ভুঁই চেনাবে কে?

নির্মলা মুখ চিপে হাসে।—থামো, থামো। ন্যাকামি কোরো না, নির্মলার সামনে ভুঁই দেখে টাকা দিয়েছ, আর ভুঁই চেন না? সব তোমার মুখস্থ ঘাটোয়ারিবাবু!

খইনি ডলতে-ডলতে ঘাটোয়ারিবাবু চাপা হাসে। হাঁ, শরতের বউ একেবারে মিথ্যে বলেনি। নিষাদবাগের মাঠঘাট—এমন কি সব গাছপালা অব্দি মনের মধ্যে স্পষ্ট গাঁথা আছে চৌবেলালের। কোন ভুঁইয়ের ধারে কোন ঝোপঝাড় কাটা গেলে দূর থেকে দেখেই বলতে পারে—ওখানে একটা সাঁইবাবলার ঝাড় ছিল না? ঠিকই বলেছে শরতের বউ। তবে শরতের হাজির থাকা দরকার ছিল। সে কিনা সুপারিশদার গাঁয়ের।

—নিষাদবাগের হাঁড়ির খবর তোমার জানা গে?

গলা ছেড়ে হাসে চৌবেলাল। —আচ্ছা নির্মলা! বল্‌তো আকাশ কবে বর্ষাবে?

—আমি কি গণক গে! যাও না রঘুয়া ল্যাংড়ার কাছে!

—নির্মলা!

হঠাৎ গলার স্বর শুনে একটু চমকায় নির্মলা। শুধু বলে—উঁ?

—এতোয়ারির ব্যাপার কী বলতো রী!

—এতোয়ারির? কী ব্যাপার? কী করেছে এতোয়ারি?

—এত্তা ঝড় কাহে রী? গাছের মতো ঝাঁকুনি খাচ্ছিস কেন? এতোয়ারি তোর ভালবাসার লোক নাকি?

নির্মলা রেগে যায়। —তামাশা ছাড়ো জি? এই সাতসকালে তামাশা ভাল লাগে না। এতোয়ারি কী করল, তাই বলো। আমার কাজ পড়ে আছে ঘরে।

তাকে জলভরা ঘড়ার দিকে ঝুঁকতে দেখে চৌবেজি বলে—পরশু সন্ধ্যাবেলা আমি টাউনে গিয়েছিলাম। বাগানপাড়ার গলির মধ্যে দেখি ওই হাটুয়া আর এতোয়ারি কুকুরের মতো ঘুরঘুর করছে। তো আমাকে দেখেই ঝটপট কেটে পড়ল। কাল বিকেলে ঘাটে দেখলুম দুই ব্যাটাকে। ডাকলুম। যেন শুনতেই পেল না। ভেগে গেল। ...একটু থেমে চাপা গলায় চৌবেজি ফের বলেন—এতোয়ারির বউটা তো দেখতে-শুনতে ভালই। কলাবেড়িয়ার মান্যবরের মেয়ে। বিয়ের সময়কার বাড়তি তিরিশ টাকা ধার এখনও শোধ করেনি। এতোয়ারি। তাজ্জব রী নির্মলা!

নির্মলা হাঁ করে শুনছিল। হঠাৎ ঘড়াটা তুলে নিয়ে বলে—কে কোথায় কী করেছে—কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তার জবাব আমি জানি নাকি? পুছো তো ওদেরই পুছো। জবাব পেয়ে যাবে খোদ। হুঁঃ, বাগানপাড়ায় লোকে কেন যায় তা নিজে বোঝ না? আমাকে পুছ করছ!

নির্মলা আর ঘুরেও দেখে না চৌবেজিকে। হনহন করে চলে যায় গাঁয়ের দিকে। ভিজে কাপড়ের আওয়াজ কতক্ষণ শোনা যায়। চৌবেজি ভাঁড়ুলেতলায় দাঁড়িয়ে খইনি ডলতে-ডলতে মনে-মন হাসেন। নিষাদবাগ দেখতে-দেখতে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে দিনেদিনে। গাঁওবালাদের অনেককেই ন্যাংটো থেকে

কাপড় পরতে দেখেছেন। বিয়েশাদী কখন হচ্ছে কার, তাও খবর রেখেছেন। চৌবেলাল ঘাটোয়ারির টাকা না পেলে ঘরে বহু-বহুড়ী আসবে না—আবার ভিন গাঁয়েও যাবে না নিষাদবাগের ছোকরি। কনেপণ আছে বলে কনের বাবা কি স্রেফ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে? তারও তো কর্তব্য আছে, মান-ইজ্জত আছে। নইলে জামাইগাঁয়ের খোঁটা খাবে সারাজীবন। অতএব চৌবেজির ঘাটের গদিতে গিয়ে পোষা ময়নার বুলি শুনতে-শুনতে তাজ্জব হওয়ার ছলে কথাটা পাড়তেই হয়।

আবার ছেলেপুলে হলেও চৌবেজির কিরপা আনতে ছোটো। ভারিভুরির পুজোয় পুরুত খরচা আছে, নতুন কাপড়-চোপড় কেনা আছে। মুখিয়ার তহবিলে সিকি-আধুলিটা চাঁদা আছে। তবে এরা বরাবর বড় সরল মানুষ ছিল। চৌবেজির পরিবার থাকলে সারা বছর আনাজপাত্তি বিনিপয়সায় ভেট পাওয়া যেত। একা মানুষ। ভেট গেলে হাতে তুলে না নিয়ে পার নেই। খাতক মানুষ সব। সম্পর্ক বহুকালের। না নিলে মনে দুখ বাজবে। ডর পাবে। এই রে! বুঝ মহাজন বিগড়ে বসে আছে তার ওপর। তাই কলাটা মুলোটা একটু-আধটু রাখতে হয়। ঘাটের মাঝিদের বিলিয়ে দিতে হয় বাড়তি আনাজ ও ফলমূল। এ রেওয়াজ অনেকদিনের। কিন্তু দিনে-দিনে সবকিছু বদলে যাচ্ছে যে! নিষাদবাগে প্রতিদ্বন্দ্বী ঢোকার একটা ভয় ইদানীং হয়েছে চৌবেজির। এতদিনে হয়েছে। সে ওই শরৎ আর ধনপতির বেটা সূর্যের জন্যে। 'গাঁওমে স্রিফ দো এলেমদার!' নয়নসুখ বলে থাকে। এই দুই এলেমদার নানা জায়গায় ওঠাবসা করে। গদিওলাদের সঙ্গে খুব চেনাজানা মুহব্বৎ হয়েছে। ইচ্ছে করলেই নিষাদবাগে নতুন মহাজন বসাতে পারে বইকি। আর সেই আশঙ্কায় চৌবেলাল ঘাটোয়ারি শরৎকে প্রচুর খাতির করেন। শরৎকে বলেন, তুই আমার ভাই, শরৎ। আমার মায়ের বেটা। ওমাসে পূর্ণিয়া গিয়ে তোর কথা বলতেই বুঢ়িয়া তক্ষুণি হুকুম জারি করে বলল—ও-বেটাকে না নিয়ে একা বাড়ি এলে তোমার মুখ দেখব না বনবিহারী! শুনে শরৎ হাসে অবশ্যি। কিন্তু ও বড্ড ঘড়েল পাকা বুদ্ধির লোক।

বনবিহারী চৌবে এদেশে এসে লাল চৌবে অর্থাৎ চৌবেলাল হয়েছেন। লাল মানিক মণিমুক্তা সাতরাজার ধন। পূর্ণিয়া চৌবেকে সবাই বলে বনোয়ারিজি। আর এ খবর পেয়ে শরৎ সেই থেকে ডাকে বনোয়ারিজি বলে।

চৌবে কাঁধ থেকে ছাতা খুলে বাঁধে এগিয়ে যান। মাঝে-মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে নদী বরাবর উত্তর পশ্চিম কোণে নিজের ঘাটটা দেখে নেন। তাজ্জব লাগে। কতদূর অব্দি চলে এসেছেন এখন! হুহু হাওয়া বইছে তোড়ে। পুবের জোরালো হাওয়া শুরু হয়েছে কদিন থেকে। এ হাওয়া ঘুরলেই আকাশ বর্ষাবে। বাঁধবরাবর দুধারে সমানে ঝোপঝাড়। একটু এগিয়ে বাঁয়ে পুবের মাঠটা দেখতে থাকেন। পাটের চারা নেতিয়ে পড়েছে। আর চোখের কোনায় শেয়াকুল ঝোপের পাশে সামনে ঝুঁকে কোন মেয়ে কিছু করছে। দুলে-দুলে টানছে লতাপাতা। হাতে লম্বা হেঁসো। আর তার ডাইনে বাঁধের গায়ে বিশাল-বিশাল গাবগাছের তলায় একটা সাইকেল পড়ে আছে।

ধনপতির ছেলে সূর্য। চৌবেজি হাঁকেন—সূরযুয়া! হেই!

সূর্য ঘুরে দাঁড়ায়। ছায়ার মধ্যে ওর সাদা দাঁতগুলো চকচক করে ওঠে— চৌবেজি!

—হাঁ বেটা। আচ্ছা তো? কোত্থেকে আসছ বেটা?

—মহুলা থেকে কাকাজি। আপনি আচ্ছা তো?

—নেহী বেটা। ...বলে সেই ঝোপটার দিকে ঘোরেন চৌবেজি। —উও কৌন রী?

কথাটা ঝোপ-কাটুনী মেয়েটিকে বলা। সে মস্তো ঘোমটা টেনে তক্ষুণি আবও ঘুরেছে। তার সারা গায়ে রুপোর গয়না ঝলমলাচ্ছে। গায়ের রঙ ফরসা। চমক লাগার কথা। এমন মেয়ে মাঠে গেছে ঝোপঝাড় কাটতে—তার মানে জ্বালানি আনতে? পর মুহূর্তে চৌবেজি টের পান—আরে বাস! এতোয়ারির বহু না? মান্যবরের মেয়েটা না? হাঁ রী বেটি, ইয়ে ক্যায়সা? এ কেমন রী বেটি, এ্যাঁ?

হো-হো করে প্রচুর হাসেন ঘাটোয়ারিবাবু। সূর্য দ্রুত বলে—এতোয়ারির বউ জঙ্গল কাটছে দেখে আমারও তাজ্জব লেগেছে, কাকাজি।

—লাগবার কথা বেটা। ...অকারণ দরদ দেখিয়ে চৌবেজি আবার বলেন—মান্যবর আমার কথা শোনেনি। শুনলে ওর মেয়েটা সুখে থাকত।

ফুলকলিয়া ঘোমটার ভেতর ফোঁস করে উঠেছে সঙ্গে-সঙ্গে—হাঁ নিষাদবাগের বউ ছপ্পরখাটে বসে পাঁও নাচাবে। কাজ-কাম করে খেতে হবে না তো তাকে? আর তাই নিয়ে এত্তা বাত কিসের হবে?

চৌবে ফের জোরালো হাসেন—আ রী বেটি! শুন শুন। ইধার আ। তোকে এই এট্টুকুন দেখেছিলাম, এখন কেত্তা বড় হয়ে গেছিস। হাঁ রী! মনে পড়ে না আমার ঘাটের গদিতে বসে মেঠাই খেতিস আর ময়নার সঙ্গে ঝগড়া করতিস? জানো সূরযুয়া, বড় চটপটে মুখ-বাজ ছিল মান্যবরের এই মেয়ে। এখনও দেখছি তাই আছে।

ফুলকলিয়া ঝোপের ভেতর থেকে বুনোশিমের মস্তো লতা আবার টানাটানি করে যেন এদের দেখিয়েই। আর তক্ষুণি একটা ঢ্যামনা সাপ আঁকাবাঁকা হয়ে বেরিয়ে আসে। মাগে! বলে আর্তনাদ করে এতোয়ারির বউ লাফ দেয়। গাবগাছের তলায় দুটি পুরুষ হো-হো করে হাসে। ফুলকলিয়ার ঘোমটা খসে পিঠে পড়েছে। চুলের ঝাঁপি উপছে পড়েছে সঙ্গে-সঙ্গে। চুল—নাকি অন্ধকার প্রবাহ, দুধারে দুই পাড়ের মতো উজ্জ্বল বাহু, আর আঁটো রুপোর বাজুদানায় রোদের ঝিলিমিলি বিচ্ছুরণ। নিষাদবাগের মাঠে দিনদুপুরে যেন কী অলৌকিক। আর সাপটা পালাচ্ছে নড়বড় করে। দেখতে-দেখতে শুকনো ব্যানার ঝোপে সে লুকিয়ে পড়ে। চৌবেজি বলেন—বাপরে বাপ! তোর ডরে ভেগে গেল দেখলি তো? খুব তেজওয়ালী মেয়ে তুই!

ফুলকলিয়া করুণ চোখে লতাটার দিকে তাকায়।

সূর্য ফিসফিস করে বলে—আর সাহস পাচ্ছে না। বুঝলেন কাকাজি?

—আ রী বেটি! ঢ্যামনা সাপ। বিষ নেই একফোঁটাও। ডর করিস না।—চৌবেজি মুখের খইনিটা ফেলে দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে ঝোপটার কাছে যান। ঝোপে ছড়িয়ে বাড়ি মারেন বারকতক। তারপর বলেন—ওই একটাই ছিল।

সূর্য বলে—বাঁধের ধারে ঝোপঝাড়ে সাপ আছে অনেক। মাঝে-মাঝে প্রায়ই দেখতে পাই। সেদিন রাত্তিরে টর্চ না থাকলে চন্দ্রবোড়ার ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে দিতুম। একটু আগে এতোয়ারির বউকে তাই সাবধান করে দিচ্ছিলুম, আনাড়ি কি না!

বলে সে সাইকেল ওঠায়।—কাকাজি যাই। দেখা হবে পরে।

চৌবেজি ঘুরে বলেন—আরে বাবা, থামো না। যাচ্ছটা কোথায়? এলুম তোমাদের কাছে—তো সবাই দেখছি ভেগে পড়ল। তোমার সাথে দেখা হল তো তুমিও ভেগে যাচ্ছ। কথা বলবটা কার সঙ্গে?

সূর্য হাসে। —তবে চলুন আমাদের বাড়ি। চা খাবেন। মাঠে আর কী দেখবেন? অবস্থা তো টের পাচ্ছেন—সব বরবাদ এবারকার মতো।

চৌবে বলেন—এক মিনিট। তারপর ফুলকলিয়ার কাটা লতাটা টেনে বের করেন।—এই নে বেটি। কিন্তু ও দিয়ে কী হবে? এ্যাঁ? তোর শাস এই দিয়ে গলার ফাঁস করে ঝুলবে নাকি?

ফুলকলিয়ার মুখে হাসি ফুটেছে। বড় ভাল মানুষ এই ঘাটোয়ারিবাবু। তার বাবার সঙ্গে কত ভাব, তা তো ভালই জানে। আহা, বাবা যদি এ সময় থাকত, কত খুশি না হত। তবে রাগ করত সন্দেহ নেই। কোন দুঃখে তার মেয়েকে ঝোপঝাড় কাটতে পাঠিয়েছে বেহান? বেহানের সঙ্গে জোর বচসা বাধিয়ে দিত না কি? আলবৎ দিত। এ্যাদ্দিন ছোটাই জ্বালানি কেটে এনেছে। কখনও বুড়ি নিজেই বেরিয়েছে। ছাগল বেঁধে দিয়ে কাছাকাছি ঝোপগুলো কেটেছে। রোদে দু-একদিন পড়ে থেকেছে সেগুলো। তারপর বেটাকে হুকুম করেছে নয়তো নিজেই দড়ি বেঁধে টানতে-টানতে নিয়ে গেছে বাড়ি। আর কাঁটাঝোপ হলে পেছন-পেছন আসতে হবে ছোটকে। ছোট পথের ধুলোমাটিতে কড়া নজর রেখে হাঁটবে কাঁটা খসে পড়ছে কিনা। কাঁটাগুলো তুলে সে ফেলে দেবে একধারে। এই হল গাঁয়ের রেওয়াজ। রাস্তা দিয়ে মানুষ আসছে-যাচ্ছে সবসময়। কাঁটা ফুঁড়ে যাবে যে পায়ে! নিষাদবাগের রাস্তায় কাঁটা পড়ে থাকা দেখলে তুমি মুখিয়াই হও বা তার ছেলে হও, তোমাকে তুলে ফেলে দিতেই হবে। না দিলে পাপ। শুধু পাপ নয়। ওই পড়ে-থাকা কাঁটা মনে খচ-খচ করে বিঁধবে তোমারই।...

আজ সকালে উঠে শাস হুকুম করেছিল—জ্বালানি আনতে হবে। গোবরের চাবড়া দিয়ে পাটকাঠির গোছা আর ঢেলা শুকনো কাঠ অনেক জমানো আছে। সে তো বর্ষার সময়ের জন্য। এখন কয়েকদিন

অন্তর সবাই কাঁচা ঝোপঝাড় কেটে বা উপড়ে রাখছে। তাই বলে একজনের কাটা ঝোপ অন্যজন পরের দিন দাবি করে বসবে না। করলে খুব ঝগড়াঝাঁটি লেগে যাবে অবশ্য! ধনপতিকে আসতে হবে। ধনপতিকে আনা মানেই জরিমানা। ঠাকুরবাবার পৃথিবীতে অঢেল গাছগাছড়া যখন তখন কেন আর ঝুটঝামেলা করতে যাওয়া।

কিন্তু জ্বালানি কি কখনও জীবনে এনেছে মান্যবরের বেটি? হঠাৎ হুকুমটা শুনে ধরে ফেলেছিল, শাসের আরেক নতুন জুলুম শুরু হল। মনে-মনে প্রায় কেঁদে ফেলতে গিয়ে হঠাৎ কাজটা ভাল লেগে যায় ফুলকলিয়ার। ছোটকে ডেকেছিল। ছোট বলল—চাকিতে মাষকলাই ভাঙতে বসব মায়ের সঙ্গে। মাষকলাইয়ের রুটি হবে এবেলা। পুছো না মাকে। মা গে! ও মা! তেরা বহুকে বাতলে দে না।

ছোটীও আজকাল কেমন বিগড়েছে! তবে বুড়ির হাতের তলায় হাতের মুঠি দিয়ে চাকির মুঠো ধরে ঘোরানো এবং তার দুই হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে থাকা ফুলকলিয়ার নরকবাস। বুড়ির মুখে খইনির পচা গন্ধ তো আছেই। তার ওপর লিকলিকে শুকনো ডালের মতো পা সামনে চড়িয়ে দেবে। সেই পা যদি ফুলকলিয়ার উরুর উপর উঠে যায় তার হুঁশ হবে না। চাকিটাও খুব ছোট। দুধারে দুজন পা ছড়িয়ে বসা মুশকিল। একটু ঝুঁকে-ঝুঁকে দুলনি দিয়ে ঘোরাতে মাথায়-মাথায় ঠোক্কর লাগবেই। ওধারের মেয়েটি ছোটী হলে সওয়া যায়। ছোটী আবার কমজোর মেয়ে, যে একটুতেই কাহিল হয়ে যায়। কারণ ছোট হলেও চাকিটা খুব ভারী। ঘোড়া-গাধা খচ্চরের পিঠে চাকি চাপিয়ে পাহাড়দেশের চাকিওয়ালারা ইদানীং নিষাদবাগের দিকে আসছেই না। এলে শাস কথা দিয়েছে, হাল্কামতো চাকি কিনবে। ওটা ঘোরাতে তার নিজের কষ্ট হয় কি না।..

হুঁ, আজ ছোটী বসেছে মাষকলাই পিষতে। মা আর বেটি হাল্লাক হোক না। ফুলকলিয়া মাঠে একা কতক্ষণ ঘুরবে গায়ে হাওয়া দিয়ে। ছাড়া-পাখির সুখে উড়ে বেড়াবে।

তো খানিক বাদে সাইকেলের ঘন্টি বেজেছিল, আর এতোয়ারির বউ ঘুরেই বুকের রক্ত ছলকে কয়েক মুহূর্ত কাঠ। নিরিবিলি মাঠঘাট জায়গা। গাবগাছের তলায় এসে ধনপতির বেটা থেমে গেল। এতোয়ারির ঘরওলী এখানে কী করছে গে?

মাঠঘাটের খোলামেলায় কী যেন আছে। তুমি লাগামছাড়া—স্রিফ বুনো ঘোড়া, কী পাখি হয়ে যাও না! কে দেখছে? শরম করেই আর কী ফল? ফুলকলিয়া মন খুলে দু-চার কথা আবোল-তাবোল বলেছে। সে রাতের ধাক্কাধাক্কি নিয়ে হাসাহাসি করতেও বাধেনি। ধনপতির ছেলেকে কেন এত ভাল লেগে গেছে তার, তাও বলতে দ্বিধা করেনি। কারু সাতে-পাঁচে থাকে না, লেখাপড়া জানে, সবার সঙ্গে ভাব—তাই। তবে কী রকম ভাল লাগা, তা যদি পুছত, ফুলকলিয়া মুশকিলে পড়ে যেত। ও সরল মনেই যা বলার বলেছে। আর তাই শুনে সূর্য উল্টে কেমন মেয়েদের মতো রাঙা হয়ে গেল কেন?

চৌবেজি হেঁকে বসল ঠিক এই সময়। লোকটার আর সময় ছিল না আসার?

ধনপতির বৈঠকখানা বলতে একটা চওড়া দাওয়া। ওপরে খড়ের চাল। চৌপায়ায় বসে চৌবেজি কাঁসার গেলাসে চা খায়। ধনপতি গরুকে খড় কেটে দিতে-দিতে উঠে এসে বসেছে। বুকের সাদা লোমে খড়কুটো লেগে আছে। খইনিটা ভালমতন ডলছে। সূর্য জামা-কাপড় বদলে তাঁতের লুঙ্গি পরে দাঁড়িয়ে আছে খুঁটিতে হেলান দিয়ে। নয়নসুখ ট্যাঙস-ট্যাঙস করে ঠিকই হাজির হয়েছে। সে দেয়ালে পিঠ রেখে চৌবেজির মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছে।

কথাটা তো ভালই। বেটির বিয়ে ভালয়-ভালয় চুকে গেল। এবার বেটার বিয়ের আর দেরি কিসের? সামনে আষাঢ়ে লাগিয়ে দিক না মুখিয়া। ভাল কনে আছে। তার বাবা কিনা চৌবেজির হাতের বশ। দেখতে চাইলে কালপরশুর মধ্যে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এই সব কথাবার্তা চলছে।

তবে এমন কথা খুব একটা নতুন নয়! আগেও বলেছে চৌবেজি। সূর্য আসলে উড়িয়ে দেয়। কেন উড়িয়ে দেয় তা সবাই আন্দাজ করে। লেখাপড়া-জানা ছেলের চোখে খুলে গেছে। বাবু-বাড়ির বহু-বহুড়ীর মতো মেয়ে চাই এদের। চাঁই-কুলে তেমন মেয়ে কি আছে? ধনপতি মহুলার সম্পর্কটা ছেড়ে দিয়েছে। অনেক রকম বদনাম শোনা যাচ্ছিল। তো চৌবেজি যখন বলছেন, যাবে।

নয়নসুখ সূর্যের দিকে মুখ টিপে হেসে বলে—জরুর যাবে। সূরযুয়াভি যাবে। নিজের চোখে দেখে আসবে।

সূর্য বলে—কাকাজি, ব্রিজের কথা বলুন। ঘাটের দিকে মাপজোক তো কবে হয়ে গেছে। ডিসট্রিকট ইনজিনিয়ার কী বলল বলছিলেন?

চৌবেজি হাসেন। —আরে বাবা! আগে তোমার ব্রিজটা বানাতে দাও। তবে না।

নয়নসুখ বলে—বিরিজ, কোন বিরিজ?

সূর্য হাসতে থাকে, জবাব দেয়—কাকাজির ঘাটোয়ারি উঠে যাবে এমন ব্রিজ।

—কাঁহা?

—রানীর ঘাটমে।

ঘাটোয়ারিজী খইনি নিতে হাত বাড়ান। —ছোড়ো। আমার ঘাটোয়ারি ওঠায় কে? ব্রিজ হলে অন্য কোথাও হবে। ধনপতিয়াদা? তাহলে কথা বলতে ডেকে পাঠাই।

ধনপতি খুশি হয়ে বলে—হুঁউ।

—পূরণের বেটির জন্যে কত বড়-বড় মোড়ল ঘুরঘুর করছে। অবহেলা কোরো না। নয়নসুখ বলে—কৌন পূরণ? কাপাসীর পূরণ মুখিয়া?...

—ধনপতির বাড়ির পিছনের দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে ছিল ফুলকলিয়া—হাতে হেঁসো। কখন থেকে কথা শুনছিল। পারলে হেঁসোর কোপ মারে ঘাটোয়ারির গলায়। হঠাৎ হনহন করে চোখে জল নিয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে গঙ্গার ধারে চলে যায় সে।

দৌড়ে বালির চড়া পেরিয়ে জলে হুড়মুড় করে নামে হেঁসোসুদ্ধ। মুখিয়ার বেটার জন্যে তোমার ঘুম নেই কেন ঘাটোয়ারিবাবু? আসলে মুখিয়ার ওই জোয়ান ছেলেটার—অত সুন্দর চোখওয়ালা ছেলেটার একটা বউ থাকার কথা ভাবাও যায় না। কেন ও গেরস্থর মতো বউয়ের মরদ হবে? ও যে সূর্য!

ছোটীর মুখে খবর পেয়েই ফুলকলিয়া ছোটে। হাতের কাজ ফেলে তার আলুথালু চুল নিয়ে ছোটা দেখে সরবতিয়ার মা কুঁদুলি বুড়িটাও বলে ওঠে—যে গাছের বাকল সেই গাছে লাগাতে যাচ্ছে গে! ভাগীরথীর পাড়ে বাঁধ বরাবর নজর করে এতোয়ারির মা ছাগল খুঁজছে। সে দেখতে পায় বহু লাগামছাড়া টাট্টুর মতো ছুট লাগিয়েছে। তরাসে তার বুক আচানক কেঁপে ওঠে। বেটা এতোয়ারির কিছু মন্দ টন্দ হল নাকি? পরক্ষণেই কে চেঁচিয়ে বলে—লোত্‌নী (নতুন বউ)! অমন করে যাচ্ছিস কোথায়? নদীর চড়ায় নামতে-নামতে এতোয়ারির বউ দেমাক দেখিয়ে তেমনি জোর গলায় ঘোষণা করে—বাবা আসছে রী! বাবা—বাবা আসছে!

সরস্বতী ঠসী-বহরী নয়। কানে চমৎকার শুনতে পায়। আর তক্ষুণি নিজের অজানতে তার ঘোমটা উঠে যায় শনচুলের মাঝবরাবর। বেয়াই আসছে! মানী লোক কলাবেড়িয়ার মান্যবর—যার পদবি কিনা মণ্ডল। সেও কিনা ধনপতির মতো সরকার। অগত্যা ছাগল খোঁজ বরবাদ করে সরস্বতীকে বাড়ির দিকে পা চালাতে হল। ওদিকে নদীর পাড়ের নিচে বেমক্কা জমে থাকা বালির চড়ায় দাঁড়িয়ে ফুলকলিয়া অপেক্ষা করছে। মুখে ঝলমল করছে খুশির হাসি। ওই হাসি বাবা-দাদাকে দেখে নিষাদবাগের কোন বহুড়ীর মুখে না ফোটে। উত্তর-পশ্চিম দিকে দূর কলাবেড়িয়ার নিচে জল এখন জাং-ভর বড়জোর। মান্যবর সেই জল পেরিয়ে মধ্যিখানে চড়ায় উঠতেই দূর থেকে ছোটী দেখতে পেয়েছিল। ফুলকলিয়ার বুক উথাল-পাথাল। ওই তার বাবা আসছে! ইচ্ছে করে, বুকের কলজে ফেটে যায় তো যাক—ডুকরে কেঁদেই তার খুশিকে প্রকাশ করে। পারে না বলেই এই হাসি। আর যেন বুকের ভেতর কোন গভীর গাছের ওপর এসে পড়েছে মত্তমাতাল হাওয়া, পাতাগুলো থরথর করে কাঁপে, সে এক আওয়াজ।...

ওপাশে একটু দূরে ঘাটের মেয়েগুলো আর বাচ্চাগুলো হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কলাবেড়িয়ার মান্যবরকে দেখছে। ফুলকলিয়া তা টের পেয়ে আবার নিষাদবাগকে শুনিয়ে-শুনিয়ে ঘোষণ করে—হামাবী বাবা! বাবা আসছে গে!

তো মান্যবর আর যাই হোক, রাধার ঘাটের চৌবেলালজি নয় যে গাঁসুদ্ধু হুলস্থুল পড়ে যাবে। একা

পরেই যে-যার কাজে মন দেয়! ছোটীও ছাগল খুঁজতে বাঁধের দিকে যায়। তার কমবয়সী চোখের নজর বরাবর এরকম। আধাক্রোশ দূরের মানুষটিকে ঠাহর করে বলে দেবে কৌন। গাঁয়ের—না, ভিন গাঁয়ের। স্বজাতের—না বেজাতের। ফুলকলিয়া ছোটীর প্রতি কৃতজ্ঞ। লুকানো একটা চাঁদির টাকা তার জন্যে খরচ করতে আপত্তি করবে না। চাই কী, তাকে সঙ্গে নিয়েই টাউনে যাবে একদিন।

মান্যবর নদীর মধ্যিখানের চড়াটা পেরুতে অসম্ভব দেরি করে। তারপর আবার খানিকটা জল। দূরে কোথায় পদ্মার মুখে চড়া। খরার মরশুমে ভাগীরথীকে তাই ভিখারিনী দেখায়—কাজলবরণ শাড়ি ছেঁড়া-খোঁড়া। রুপোলি শরীর জায়গায়-জায়গায় উদোম হয়ে আছে। হাঁটু-জলের ফালিটায় এসে মান্যবর ডাইনে-বাঁয়ে মুখ ঘুরিয়ে কিছু দেখে। তারপর মুখ নামিয়ে জলের তলায় রোদ্দুরের প্রতিফলন, আর কালচে সবুজ শ্যাওলার ঝাঁপির দিকে তাকায়। ফুলকলিয়া ঠোঁট কামড়ে লক্ষ করে। এতসব কী দেখছে গো কলাবেড়িয়ার মোড়ল মানুষটা? তারপর মান্যবর মাথা ঝাঁকিয়ে কুঁজো হয় এবং কী যেন কুড়িয়ে নেয় জলের তলা থেকে। লোকটার স্বভাব বরাবর ওইরকম। রাস্তায় হাঁটতে একশোবার দাঁড়াবে—এদিকে-ওদিকে কী দেখবে, কাগজের টুকরো হোক কিংবা এক-চিলতে ফসলের শীষ হোক, কুড়িয়ে সযত্নে হাতে নেবে। কাঠকুটো হলে তো কথাই নেই। ঠাকুরবাবার দুনিয়ার ফেলনা সবকিছুই ওর কাছে কুড়িয়ে রাখার ধন। ফুলকলিয়ার ধৈর্য টুটে যায়। মান্যবর যেন বেটির ধৈর্য পরীক্ষা করতে-করতে আসছে। ফুলকলিয়া চেরা গলায় না ডেকে পারে না— বাবা! ও বাবা!

এ তার অস্তিত্ব ঘোষণা। যেন মান্যবর মেয়েকে দেখতেই পাচ্ছে না তাই। বড় অভিমান এই ডাকে। এ ডাক দুনিয়ার তাবৎ শ্বশুরঘরবাসিনী অবমানিতা তরুণী বহুড়ীর গলা ছাড়া আর কোথাও শোনা যাবে না। এ ডাকে হারিয়ে ফিরে পাবার খুশি আছে—আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা অছে। অসহনীয় দুঃখের খবর ঘোষণা আছে। স্মৃতির জন্য হাহাকার আছে। ফুলকলিয়ার সব হাসি, ব্যাকুলতা আর প্রতীক্ষা দ্রুত একাকার হয়ে অলীক প্রবাহে ভরে দেয় শুকনো ভাগীরথী। ফুলকলিয়ার চোখের জলে ভরা নদী টলটল ছলছল উথাল-পাথাল উত্তরঙ্গ। —বাবা গে! এক গোপন নির্জন সঞ্চিত কান্না দমকে বেরিয়ে আসে। —বাবা গে!

আর মান্যবর এতক্ষণে যেন দেখতে পায়। হাত তুলে সাড়া দেয়—বেটিয়া! দহের দমকে ঘাট থেকে সবাই দৃশ্যটা দেখে। বুধিনী সুধিনী বোবা-কালা যমজ বোনও ফুলো গাল আর ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থাকে। বহুৎ ছোকড়ির বিভা হয়েছে নিষাদবাগে—স্বামীর ঘর করতে-করতে বুড়ি হয়ে গেল, এমন তো কেউ করেনি। নদীর চড়ায় বাপ-বেটি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। ছাড়া বাকল গাছের গায়ে যেন সেঁটে গেছে। বাঁকা হেসে দার্শনিক নয়নসুখের বিধবা মেয়ে অঞ্চলা বলে—ঢঙ! আমাদের যেন ভিন গাঁয়ে বিভা হয়নি! আমরা যেন কেউ স্বামীর ঘর করিনি! আর সরবতিয়ার মতো কিশোরীও বলতে থাকে—কলাবেড়িয়ার মোড়ল ভাববে নিষাদবাগওলা জুলুমবাজ। বলবে না রী অঞ্চলা দিদি? তা তো বলবেই। অঞ্চলা কাপড় কাচে পিঁড়িতে। তালে-তালে বলে—এতোয়ারিদা আজ অব্দি একবার ভুলেও গায়ে হাত তোলেনি। বহুর দিকে অমন টান কোন মরদের থাকে রী? আর বহু কি না আলাদা বিছানায় শোয়। তোরা জানিস সে কথা? কেউ জানে না। সবাই অবাক। এ তো বড় শরমের কথা! বহু মরদের সঙ্গে শোয় না তো কাচ্চাবাচ্চা হবে কী করে? কাচ্চাবাচ্চা না হলে ভারিভুরির শাপ লাগবে না? হয়ত লেগেছে। আসমান তাই বর্ষাচ্ছে না। সবজিখন্দ ধানপাট শুকিয়ে যাচ্ছে। পবন দেওতা হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। সূরয দেওতা দিনকে দিন রেগে যাচ্ছে। ল্যাংড়া রঘুয়া ভরের সময় নাকি বলেছে, পাপ এসেছে নদীর পচ্ছিম পাড়েই তো! উত্তর-পশ্চিম মানেই পচ্ছিম পাড়! এ হিসেব অঞ্চলার।

এই সময় শরতের বউ নির্মলা এসে বলে—ক্যা রী! সব মুখ গোমড়া করে ভাম-বিল্লির মতো কী বুকনি ঝাড়ছিস?

অঞ্চলা বাঁকা হেসে চোখের ইশারায় ব্যাপারটা দেখিয়ে দেয়। নির্মলা বলে—বাপের এক বেটি। দুখ বাজবে না? বুড়ো বয়সে লোকটা হাত পুড়িয়ে খাচ্ছে। জ্বর-জ্বারি হলে মাথা টিপবে কে? হঠাৎ ভালমন্দ হলে পয়সাকড়ি লুঠে নেবে না গাঁওবালারা? এক বেটি যার, সে বোঝে— আর বোঝে ওই

বেটি। যেমন আমি। করলহাটি আর কদ্মারেড়িয়ার একহি দুখ—এ দুখ বুঝবে নিষাদবাগের কোন মানুষ গে?..

ওখানে মেয়ের কাঁধ পাকড়ে বাবা হাঁটে। ফুলকলিয়া টের পায়, খুব শিগগির তার বাবা বুড়ো হয়ে গেছে যেন। পাড়টুকু উঠতে দম আটকে যাচ্ছে। আর মুখটাও কেমন গম্ভীর হয়ে গেল ক্রমশ। কালকাসুন্দে নিশিন্দা ঝোপের মধ্যে ফালি রাস্তায় গিয়ে সে বলে—জামাই আছে রী ফুলি?

-নেই। বিহানেই তো গাঁওয়ালে যায়।

—হুঁ! ...মান্যবর বাকি পথটুকু আর কথা বলে না। বাড়ির উঠোনে বেয়ান দাঁড়িয়ে আছে। মুখে হাসি। অগত্যা মান্যবর হাসে।

ফুলকলিয়া কিছু তাজ্জব হয়ে শাশুড়ির হাসি দেখল। শাশুড়িকে কখনও কি হাসতে দেখেছে? হয়তো দেখেছে—লক্ষ করেনি। তবে হাসিটা সত্যি তাজ্জব করছে। বেয়াইকে যেন বরণ করার জন্যে সরস্বতী তৈরি। অথচ এর আগে মান্যবর বার দুই এসেছে। মেয়েকে দেখতে। সরস্বতী কাজ ফেলে এমন করে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়নি। হাঁ—ফুলকলিয়া বুঝেছে। তাকে পিট্টি দিয়েছিল—পয়সাওলা লোকের বেটির ওপর জুলুম করেছিল, পাছে বাবার কানে তোলে। শাশুড়ি সেই ভয়েই শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হাসিটি হাসছে এবং মান্যবরকে খাতির দেখাচ্ছে। ফুলকলিয়া তাই বলে কিছু চেপে রাখবে না। বাবার কানে তুলবেই।

—সূরয পশ্চিম থেকে এল গে বহু! বহুর দিকেই সরস্বতী হাসিমুখে কথাটা তাক করে। এটাই নিয়ম। সরাসরি বেয়াইয়ের সঙ্গে কথা বলার আগে—এই হল কি না ভূমিকা।

মান্যবরও সেই নিয়ম মেনে বলে-নে হী রী বেটিয়া। সূরয নেহি। হামি কাওয়া। কাওয়া সব দিকে থেকেই আসে ডাকতে-ডাকতে। ...মান্যবর একটু হাসে।

কাওয়া—কাক। এই উপমাটা সন্দেহজনক। সরস্বতী তবু হাসে। বহুই বলুক, কাওয়া কভি-কভি সুখ ডাক ডাকে।

সে পাটকাঠির বেড়া ছেড়ে উঠোনে যায়। সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের ভঙ্গিতে ফের বলে—বহু, বাবাকে বসতে দাও।

তা আর বলতে? ফুলকলিয়া ঘরে ঢুকে চৌপায়া বের করে। এতোয়ারি শ্বশুর এসে বসবে বলে এই চৌপায়াটা তৈরি করেছিল। বাবুইদড়ির বুনুনিতে লাল নীল নকশা তুলে দিতে বলেছিল বউকে। মান্যবর দাওয়ার চালের ঠোক্কর থেকে মাথা বাঁচাতে কুঁজো হয়। তারপর চৌপায়ায় বসে বলে—বেয়ানের খবর ভাল তো?

—আমার আর ভাল বেয়াই? বটতলার ডাক শুনতে-শুনতে দিন কাটাচ্ছি। বেয়াইএর খবর ভাল কি না, তাই শুনি। সরস্বতী একটু তফাতে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসল।

ফুলকলিয়া ঠোঁটে আঁচল কামড়ে চৌকাঠে হেলান দিয়েছে। মান্যবর বলে—আঁচল কামড়াতে নেই, বেটি।

হুঁ, বাবার এই অভ্যাস বরাবর। ফুলকলিয়া অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে আঁচল ঠিকঠাক করে। সরস্বতী শান্তভাবে বলে—বহু! বাবাকে পা ধোবার জল দাও। আর ছোটী কোথায় গেল, দেখ।

থাক। মান্যবর হাত তোলে। তারপর রসিকতা করে। —গাঁওয়ালে এক মজার কথা আছে। 'এস কুটুম বসো খাটে, পা ধোওগে ডোবার ঘাটে!' আমি গঙ্গায় পা ধুয়ে এসেছি বেয়ান! ফুলি, চুপসে বৈঠ্ মা।

সরস্বতী বুড়ি হেসে ওঠে। ফুলকলিয়াও হাসে। হঠাৎ তার মনে হয়, শাশুড়িকে যতটা খারাপ মেয়ে ভেবেছে, হয়তো ততটা খারাপ নয়। আসলে হয়তো তার নিজেরই কিছু দোষ-ঘাট আছে। শাশুড়ির সঙ্গে বাবার এরকম একটা বোঝাপড়া দেখে নিজের ওপর দুঃখিত হওয়া ছাড়া উপায় কি? এখন যদি শাশুড়ি তার নামে বাবাকে লাগায়, ফুলকলিয়া অপ্রস্তুত হবে ঠিকই—কিন্তু মুখটি খুলবে না। এমনকি, ভেবেছিল বাবাকে ফেরার পথে এগিয়ে দিতে যখন ঘাট অব্দি যাবে, তখন মারখাওয়ার কথাটা তুলবে—তাও মন থেকে মুছে দেয়। নালিশ তুলে হবেটা কী? সে তো আজেবাজে ঘরের মেয়ে নয়,

তার বাবা নয়নসুখের মতো কোন সরকারজির ডাকের লোকও নয়, যে বেটিকে আর স্বামীর ভাত খেতে দেবে না। ওসব কেলেঙ্কারী বড় ঘরে বড় একটা শোনা যায় না। ছি ছি, দেশ জুড়ে ঢি ঢি পড়ে যাবে! ফুলকলিয়া শাশুড়িকে ক্ষমা করে দেয়। বাবার জন্য পা ধোবার জল আনতে বলেছে, আর কী চাই? তবে একটু চা-পানি খেতে বলা তো চাই। মানী বেয়াইকে আর কীভাবে খাতির করে, দেখতে ফুলকলিয়া উৎসুক হয়। শাশুড়ির মুখের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে সে। মেঠাই না খেতে বলুক অন্তত এক গেলাস চা। এতোয়ারি আজকাল দুবেলা চা খাচ্ছে এবং বাড়িতে চায়ের কারবারটা আছে, এটা বাবাকে জানাতে পারলে ভাল হত। কিন্তু বেয়াই-বেয়ান এখন কী যে সব বাত-চিত জুড়ে দিয়েছে। ক্ষেত-খামারের কথা, আসমান কানা হবার কথা, মঙ্গলাব হাটে জামাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই কথা...

—বেয়াই এবারে ছোটীর জন্যে ঘর দেখুক। সামনের ছটপরবে ছোটী গায়ে উল্কি চড়াবে। দেখতে-দেখতে যবের শিষের মতো লকলক করে উঠল মেয়েটা। এতোয়ারি ন'হেতে ডুরে শাড়ি এনে দিল সেদিন। পরল যখন, চোখে তাকানো যায় না। এ পোড়া চোখে কেত্তা বড় কেত্তা জওয়ানী লাগে জি!

—হাঁ জি। আজকাল ওই হয়েছে। ছোকড়া-ছোকড়ি সব দেখতে-দেখতে ঝটঝট বেড়ে যাচ্ছে। তো খোঁজখবর করে দেখি।

—তুমি বড়া আদমী বেয়াইজি। সব ভুলে যাবে বিলকুল। সরস্বতীয়া হাসে। ঘোমটা আরও টেনে দেয়। —বহু। কাওয়া তাড়িয়ে দে গে।

এতোয়ারি সেদিন কেত্থেকে সরু ধান এনেছে সের পনের। সরু চালের ভাত খাবে। ওর সাধ আহ্লাদ দিনে দিনে বাড়ছে। জেরা টাউনবাজ ভি হয়েছে। তার মা ইতিমধ্যে এ কথাও জানিয়েছে বেয়াইকে।

ফুলকলিয়া কাক তাড়ায়। কাকে ধান খাক, না খাক। তবু শাশুড়ির হুকুম। ফুলকলিয়া বাবার সামনে নিজের সংসার পাওয়া এবং সেই সংসারকে ভালবাসার নমুনা দেখাতে চায়। উঠোনময় ঘুরে এটা নাড়ে, ওটা সরায়, রান্নাশালে যায়। আবার ফিরে গিয়ে দাওয়ায় ওঠে। চৌকাঠ ধরে দাঁড়ায়। কেমন চেয়েছিল, কেমন বদলে গেল মনটা ক্রমশ। নিজেকে সে অত বোঝে না। শুধু আবছা মনে হয়—কী হবে ঝকমারির? সব বাবাই মেয়েকে সুখে থাকা দেখতে চায়। না দেখলে বাবার মনে কষ্ট হবে যে।

মান্যবর এই গম্ভীর, এই হাসিমুখ। বরাবর এই রকম। —ছোটীর জন্যে কিছু আনা হল না। দোষ নিও না বেয়ান। হঠাৎ চলে এলুম আর কী। তো জামাই—

সরস্বতী বলে কী?

—জামাইকে কাল দেখলাম টাউনে সন্ধেবেলা। আমাকে দেখল কী না বলতে পারি না। সাহাবাবুর আড়তে গেলুম, তো উনি নেই। বলল, রাতের গাড়িতে কলকাত্তা চলে যাবেন। এদিকে মুশকিল, দেড়মন খ্যাসারি দিয়েছিলুম। টাকাটা নিইনি তখন।

সরস্বতী আঙুলে আঙুল জড়িয়ে বলে—হাঁ। অনেকগুলো টাকা!

—সাহাবাবুর সঙ্গে অনেক কালের কারবার। মান্যবর কথাটা গলা একটু চাপা করে। . হাঁ গে বেয়ান, জামাইয়ের সঙ্গে গাঁওয়াল করে, ওই ছোকড়াটা কে?

সরস্বতী আর ফুলকলিয়া দুজনেই ভাবে, এই রে! কলাবেড়িয়ার মোড়লকে কেউ মেয়ের জন্যে বর ঢুড়তে বলেছে। দুজনেই তাই শব্দ করে হাসে। ফুলকলিয়া হাসি ঢাকতে মুখে আঁচল চাপা দেয় এবং বলে—হাটুয়া? নিষাদবাগওলা ওকে তামাশা করে বলে—গড়নটা পিটিয়ে ঠিকঠাক করে আয়, তবে বিভা হবে।

·আর সরস্বতী বলে—নয়নসুখের ভাগ্নে! ছোড়ো জি! ও বিভা করবে কী দিয়ে?

নয়নসুখের ঘরে তিন এত্তা-এত্তা ছোকড়ি। অঞ্চলা যার নাম, সে বিধবা। চঞ্চলা সঞ্চলার জন্যে বর পছন্দ হচ্ছে না—নাকি সরকারজি বলেছে বুঝেসুঝে ভাল ঘরে পাঠাব। আমার ওপর ছেড়ে দে। এখন হাটুয়া—নয়নসুখের ভাগ্নে—তার বিভার পয়সাকড়ি আগে দুই ক্ষেত কুড়িয়ে ঘরে আনুক বেয়াই।

সঙ্গে ফুলকলিয়া টিপ্পনি কাটে—অঞ্চলা তো ভকতরামকে স্যাঙা করবে।

মান্যবর বলে—কোন ভকতরাম?

—সেই যে চানা-ডালমুট বেচে-বেচে বেড়ায় গাঁওয়ালে।

—হাঁ, হাঁ। ভালই তো।

বিরক্ত সরস্বতী বলে—লেকিন ও তো ভিনজাত আছে জি! 'মুসহর' না 'দাহিলা' নাকি 'গেঁও'।

হাঁ। তা ভি আছে...বলে মান্যবর কিছু ভাবতে থাকে। ভাবনার মধ্যেই সে ছিটের ফতুয়ার পকেট থেকে খইনি বের করে এতক্ষণে। আপন মনে বলে—টাউনবাজরা আজকাল জাত মানছে না।

ফুলকলিয়া ভাবে, তাই যেন এতক্ষণ মনে হচ্ছিল বাবা কী একটা করছে না। খইনি ডলতে দেখে তার এখন কী যেন ভাল লাগে। এসময় যদি হুট করে বুড়ির বেটাটা এসে পড়ত—বেশ হত। সে এলে নিশ্চয় শ্বশুরের জন্যে চা-পানির ফরমাস দিত।....উহু, ফরমাস সে দিত না। চা তৈরি কারু হাতে পছন্দ নয় তার। নিজেই বানাতে বসত। আর হয়তো শ্বশুরকে একটা সিগারেটও দু'হাত জোড় করে তার মধ্যে রেখে এগিয়ে দিত। জামাই আজ-কাল সিগারেট খায় শ্বশুর কি জানে? ফুলকলিয়ার মনটা আসলে সরল—নিজেও টের পায়, তাই না এসব ভাবে? অন্য মেয়ে হলে ভাবত? মনে মনে বলে শাশুড়িকে, তেরা বহু বড়ী ঘরকি লডকী। সমঝালিনা এখনও? টের পাচ্ছিস গো তোর বউ-মা কী সব ভাবছে এখন? শাসবুড়ির প্রতি অনুকম্পা ও করুণার দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ফুলকলিয়া! আহা বেচারি! বড় ঘরের বেটিদের মন কেমন হয়, ওর তো বোঝার সুযোগ নেই।...

ওদিকে সরস্বতী হাটুয়ার কথা তুলে বেয়াইকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে। বেয়াই চুপচাপ খইনি ডলছে আর ডলছে। শেষে আরও বিরক্ত হয়ে ঘোরে বউমার দিকে। —বহু গে! দরজায় গিয়ে ছোটীকে দেখ তো বেটি। ডেকে বল কাম আছে। তাই বলে রাস্তায় ঘুরতে যেও না যেন।...

ফুলকলিয়া বাচ্চা মেয়ের মতো প্রায় দৌড়ে নামে। পাটকাঠির বেড়ার ওপাশে গিয়ে গলা ছেড়ে ডাকবে কি না ভাবে। গাঁয়ের বউ, এ কথাটা এখন তীব্র হয়ে উঠেছে মনের মধ্যে। মুখিয়াজির বটতলার ওপাশে বাঁধে ছোটী দাঁড়িয়ে আছে। মুখ তুলে রামলালের শুকনো লকড়ি ভাঙা দেখছে। ওই এক লোক নিষাদবাগে। আস্ত হনুমান। আগে নাকি হনুমানের উৎপাতে নিষাদবাগ তটস্থ থাকত। এই রামলালই ল্যাংড়া রঘুয়ার কাছে কী মন্তর-তন্তর পেয়ে গেল। হনুমানের দল এলে তাকে দেখেই ভেগে যায়। শেষঅব্দি ভেগেই গেল। রামলাল গাছতলায় গিয়ে দু'হাঁটুতে হাত রেখে মুখ কাতর করে ওপর দিকে তাকাত নাকি। তারপর বলত—কাঁহা গে? আর ব্যস। লেজ তুলে প্রভু রামচন্দ্রজির চেলারা ভেগে যেত।

ও, ছোটী সেই মজাই দেখছে। রামলাল গাছে চড়ে লকড়ি ভাঙলে ছেলেমেয়েরা ভিড় করে চ্যাঁচায়। —একবার হনুমান সাজো না রামুয়া কাকা! ও কাকা! কাকা গে!

ফুলকলিয়ার সামনে দিয়ে অঞ্চলা গেল কার বাড়ি থেকে ঘুঁটেতে আগুন নিয়ে। ফুলকলিয়া তাকিয়েই মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। অঞ্চলা বাঁ হাতের তালুতে ঘুঁটে নিয়েছে। ধোঁয়া উঠছে গলগল করে। ছাতিমতলায় শনের দড়ি পাকাতে-পাকাতে ভরত হুঁশিয়ারী দেয়। অঞ্চলা যেন দেবতাকে ধুনো দিচ্ছে, এমনি ভঙ্গি করে হাত চিতিয়ে এগোচ্ছে। নাক কুঁচকে চোখ পিটপিট করে ঠোঁটে বাঁকা হাসি রেখে এবং যথারীতি একটা স্তন উদোম করে বাড়ি ঢুকতেই ফুলকলিয়া বলে ওঠে—বেশরম! বাগান-পাড়ার কুত্তীন! খরাব রোদে সব শুকনো খটখটে। দুপুর হতে না হতে লু হাওয়া উঠছে। আগুন ধরে গেলে নিষাদবাগ পলকে ছাই হবে না? ধুমসি মেয়েটার আক্কেলটা দেখছ? যত শিগগির রামভকতের ঝোপড়িতে গিয়ে ঢোকে, তত মঙ্গল। বাবা সেটা বোঝে বলেই তো জাতের কথার আমল দিল না।

—ও গে ভারতীর মা! ও রী দিদি। জেরা ছোটীকো বোলা দে না রী। বলবি কলাবেড়িয়ার শুনবাবা এসেছে, তাহলে এক্ষুণি এসে যাবে।

ভারতীর মা খুশি হয়েছে ফুলকলিয়ার বাবা এসেছে শুনে।—কখন এল রী? খবর ভাল তো বহিন? তারপরই সে যথারীতি রসিকতা করে! কী করে এল রী ফুলিবউ? ধন-ধান লুঠ হয়ে যাবে না? কই, দেখি আমার মোড়লের বেটাকে!

ভারতীর মা ওদিকে যাবে কী, ফুলকলিয়ার পাশ দিয়ে বাড়ি ঢোকে। খুব রসিক মেয়ে। পরকে আপন করতে জুড়ি নেই। তবে সেটার চেয়ে গোপন কথা, গাঁয়ের বহু-বহুড়ীর গোপন সম্পদের

জিম্মাদার সে। এক কাঠা চাল কিংবা খন্দ, হয়তো দুআনা এক আনা পয়সা হাতিয়ে বউগুলো ওর কাছে জিম্মা দেবে। তা নিয়ে ঝামেলাও কম হয় না অবশ্য। আগে থেকে বলে রাখলে ছলছুতো করে ভাবতীর মা বাড়ি আসবে ঠিকঠিক সময়ে। বমালটি বুকের তলায় লুকিয়ে ফেলতে ওর জুড়ি নেই। ফুলকলিয়া তাই বলে ওকে কিছু জিম্মা দিতে যাচ্ছে না। বাবা পয়সাওলা যার—তার মান চলে যাবে না?...

আর একটু দাঁড়িয়ে ছোটীর জন্যে অপেক্ষা করে। তারপর বিরক্তি ধরে যায়। তার ওপর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মানেই রাস্তায় যারা যাচ্ছে, তাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া। কী করছিস রী বহু? ছোটীর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। তোর বাবা এসেছে শুনলাম? হ্যাঁ। কেউ এসে গয়না টিপেও দেখতে ছাড়ে না। ওজন কত ভারী, কোথায় বানিয়েছে, সে নিয়েও বাতচিত হচ্ছে। অতএব ফুলকলিয়া বাড়ি ঢোকে। ..ছোটী আসবে না গে মা! হনুমানের খেলা দেখছে। বলে সে দাওয়ার দিকে এগিয়েই অবাক হয়। শাশুড়ির গলার স্বর বদলে গেছে। বাবার মুখটাও খুব গম্ভীর। ভারতীর মাকে সরস্বতী ধমক দেয় সেইসময়—কী শুনছিস গে? আপনা কাম কর গিয়ে। ভারতীর মা ঠোঁট উল্টে হাত নাড়া দিয়ে তক্ষুণি বেরিয়ে গেল।

তারপর বুড়ি ভাঙাগলায় বলে—তুমি ঝুঠমুট বেটাকে দোষ দিচ্ছ বেয়াই। বিলকুল ঝুট। টাউন জায়গা। কাকে দেখতে কাকে দেখছ। হায় ঠাকুরবাবা। হায় ভগবান, আমার বেটা সিধাসাদা মানুষ। পাথরের মতো, গাছের মতো চুপচাপ থাকা ছেলে। ক্ষিদে পেলে ভি বলবে না, মা গে, ক্ষিদে পেয়েছে। এখনও ভি কাছে শুলে মায়ের গলা ধরে শোবে। তবে হাঁ, জেরা টাউনবাজ হয়েছে আজকাল। পয়সা-কড়ি যে কামাবে, সেই টাউনবাজ হবে। ভাল জামাকাপড় পরবে, ছেনিমাবাজি দেখবে, চা-পানি ভি পিবে। সিগারেট ভি ফুঁকবে।

মান্যবর খইনি ফেলে দেয় মুখ থেকে। থুথু ফেলে দাওয়ার নিচে। তারপর মাথা নেড়ে বলে—দেখ বেয়ান! আমি তোমার বেটার হাতে মেয়েকে দিয়েছিলাম—কেন? না, পছন্দ হয়েছিল। কেন পছন্দ হয়েছিল, না দেখন-সুরত ছেলে পাঁচটার একটা। বুদ্ধিসুদ্ধি ভাল। হুঁশিয়ার। হিসেবি। কারু সাতে-পাঁচে থাকে না। কোন ঝুটঝামেলায় নেই। পয়সা নেই বা কম আছে, তাতে কী? মান্যবর মেয়ে বেচে খেতে চায়নি। নয়তো তার বেটিকে বিয়ে করতে মা গঙ্গার দক্ষিণে ওই কাটোয়া টাউন থেকে উত্তরে জঙ্গীপুর টাউন পর্যন্ত যত স্বজাতের বড়-বড় ঘরের ছেলে আছে, একদম লাইন ভি লেগে যেত। তো আমি তা চাইনি। এতোয়ারিকে বরাবর আমার পছন্দ ছিল। এসব কথা কখনও বলার ফুরসৎ পাইনি বেয়ান, এখন বলছি। আমার মনে না ধরলে তুমি কখনো ভেব না যে আমি তোমার ঘরে বেটি দিতাম! আরে ভাই! তারপর থেকে যার যার সঙ্গে দেখা, সেই বলে—মোড়লজি এ কি করলে? হ্যাঁ সব্বাই বলে। নিষাদবাগের লোকও বলেছিল। জানতে না বিয়ান, জেনে রাখো, তোমার গাঁওবালা ভি বারণ করেছিল। শুনিনি।...

মান্যবর দম নিতে একটু থামে। সরস্বতীর দৃষ্টি নিষ্পলক। তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। জিভটা ভেতরে নড়ছে। ঘোলাটে চোখ, তোবড়ানো মুখ, গাছের বাকলের মতো খস্‌খসে ভাঁজপড়া দুই হাত—বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওকে। আর আকাশ গনগনে নীল—যেন ঘোর স্তব্ধতার ওই চেহারা। বাতাসও বন্ধ। পাটকাঠির বেড়ার ওপরে চড়ুইয়ের ঝাঁক চ্যাচামেচি করছিল। পালিয়ে গেছে কখন। শুধু ওপাশের পাকা আমের গাছে ঝিঁঝি পোকাটা বিকট স্বরে করাতের মতো স্তব্ধতা চিরে ফেলেছে। তারপর গঙ্গার ধারে হয়তো শিমুলগাছ থেকে ভেসে এল ফটিকজলের ডাক। ফ-টি-ক্ জ-ল! ফ-টি-ক্ জ-ল!

—কেন শুনিনি? না—ছেলে আমার পছন্দ। গাঁওয়াল করে বেড়াচ্ছে মান্যবরের জামাই—লোকে টিপ্পনি কাটে। বাঃ রে বাঃ! পিঁপড়ে ভি বসে খায় না জামাই বসে খাবে কেন? চোট্টামি ফেরেববাজি করে না। দালালি করে না। গতর খাটিয়ে খায়। আমার এই পছন্দ। কেন? না—আমার ঘরে ওই একহি বাত্তি। আরে ভাই? আর কে পাবে আমার ক্ষেতি-ভুঁই ঘরবাড়ি গরুবাছুর? আরে! আর কদিন বাদেই তো ওসবের মালিক হবে এতোয়ারি।

সরস্বতী কিছু বলবে যেন। কিন্তু বলে না। হঠাৎ ফোঁস-ফোঁস করে কেঁদে ওঠে। ফুলকলিয়া ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। মান্যবর গ্রাহ্য করে না।

—এমাসেই ভাবছিলাম, এসে ওদের নিয়ে যাব। পরে ভাবলাম, বেয়ানের বুড়ো বয়সে কষ্ট হবে। তার ওপর ছোটীর বিভা দিতে হবে। হাঁ বেয়ান, এইসব সাধ আমার ছিল।

সরস্বতী চোখ মুছে বলে—হাঁ। গাঁওবালা ভি তাই বলে। এতোয়ারিকে তামাশা করে। তো এতোয়ারি বলে নিষাদবাগ ছেড়ে কোথাও যাব না। বেয়াই, বেটার আমার সে সব লোভ নাই। তা থাকলে এ্যাদ্দিন তোমার কাছ-লাগড়া হয়ে ঘুরত। বলো? সেই আটমঙ্গলার পর কবার গেছে তোমার বাড়ি? হা ভগবান! বেটাকে আজ তুমি বদনাম দিতে এলে? কী মতলবে এলে গে? কী তোমার মনে আছে গে? বেটিকে ভাত খাওয়াবে না? ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বড়ঘরে স্যাঙ দেবে? কেউ লোভ দেখিয়েছে?

হাঁ—সরস্বতী জেগেছে। সেই কুঁদুলি দজ্জাল মেয়ের ঘুম এবার আচানক ভেঙেছে। ফুলকলিয়া বিব্রত বোধ করে। আর বেয়ানের এই স্বর বদলানো এবং তেজ দেখে এবার মান্যবর থ। হাঁ করে তাকায়।

সরস্বতী হাউমাউ করে ওঠে রাক্ষুসীর মতো। —আমার বেটাকে তুমি বাগানপাড়ার গলিতে দেখেছ? আমার বেটা বেশ্যার ঘরে যায়? বেয়াই! পয়সাকড়ি না থাক, এতোয়ারি কার বেটা মনে সমঝে নিও একবার। মা গে, মা গে! হঠাৎ সে কপাল চাপড়ায়! চেরা গলায় বলতে থাকে—এতোয়ারি যদি এ বাত শোনে কী হবে গে—পাথর ফেটে আগুন গিরবে গে! খুনখারাবি হয়ে যাবে গে। গঙ্গামে বান ছুটবে গে!

সুর ধরে আওড়ায় সরস্বতী। মান্যবর অস্ফুট গর্জায়—বেয়ান! হুঁস রেখে বলো।

সরস্বতী ঘোরে ফুলকলিয়ার দিকে। তারপর উঠোনে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে চ্যাচায়—ওই জানের বেটিকে পুছ করো আগে। কেন তোমার বেট্টি আমার বেটার পাশে শুতে চায় না? সনঝেবেলায় ছোটীর গলা ধরে থাকে তো থাকেই—আয় রী ছোটী আয়। কেন? পুছ করো জানের বেটিকে। কেন মুখিয়ার বেটার গায়ে ধাক্কা লাগায়—রাতবিরেতে বাঁধের ধারে জঙ্গলে গড়াগড়ি খেতে এত সাধ—কেন পাড়ার বহুবেটিকে বলে বেড়ায়—মুখিয়ার বেটার যেখানে বিভা লাগাবে, আমি ভাংচি দেব...আমি ভাংচি দেব...আমি ভাংচি দেব..

সরস্বতীর এবার নাচ শুরু হল। হাততালি দিয়ে বারবার বহুর কথাটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলে। মান্যবর মানী লোক। এত অবাক হয়েছে যে কী করবে ভেবে পায় না। উঠে পড়ে। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে বেয়ান মুখে ফেনা তুলে বলে—তুমি না মোড়ল? তুমি না কলাবেড়িয়ার মুখিয়া সরকারজি? বেটির বিচার করে যাও। আমার বেটা যদি খানকিপাড়া গিয়েই থাকে, কেন যায়—কোন দুঃখে পুছো সুরতওয়ালীকে! এই বড় ঘরের বেটি! বল —বাবার সামনে বল এবার!

মান্যবর যেতে-যেতে উঠোনের মধ্যিখানে দাঁড়ায়। ফুলকলিয়ার দিকে ঘোরে। ফুলকলিয়া চৌকাঠে মাথা রেখে হু হু করে কাঁদছে।

মান্যবর কিছু ভাবে। ঠোঁট কামড়ায়। সরস্বতী সমানে চেঁচাচ্ছে। এখন অনেকটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে তার কথাগুলো। গলা ভেঙে গেছে। বুড়ো আঙুল নেড়ে হাঁসফাঁস করে কিছু বলছে—হয়তো বলছে : এতোয়ারি কাঁধে ভার নিয়ে সারাজীবন ঘুরবে গাঁওয়ালে, তবু তোমার মতো বখিল লোকের পায়ের তলায় থাকতে যাবে না। দুনিয়াসুদ্ধ দেখছে এ্যাদ্দিন জামাইকে কখানা জামা দিয়েছ—কখানা ধুতি দিয়েছ—জুতো দিয়েছ। ভুলেও তো হাতে একটু মিঠাই আনো না এ বাড়ি। মেয়ের নাম করেও লোকে তা আনে। শরম করে না জি? ওই ছোটী, শুন-বাবার জন্যে কত গল্প করে। কত পথ তাকায়! থাক থাক। আর বড়াই কোরো না। তিন গাঁয়ের মুখিয়া আছ, এ গাঁয়ে বড়াই করতে এসো না। বলে—ছেলে পসন্দ বলে বিভা দিয়েছে। তো কুড়ি ভরি চাঁদি, সাত কুড়ি টাকা কে নিল জি? চাঁদির বদলে এতোয়ারির ভুঁইটুকুন যে চলে গেল—মনে ভাবলে না মেয়ে গিয়ে কী খাবে? ধিক! শতধিক! ঝুটবাজ! ফন্দিবাজ! আমার বেটাকে বাগানপাড়ায় দেখেছ, থামো থামো—তোমার এই দুলালী সুরতওয়ালী বেটি ভি সেখানে যাবে! না যায় তো আমার মুখে চুনকালি লাগিয়ে বেগুন ক্ষেতে আমাকে খাড়া করে রেখো!...

ওতক্ষণে আনাচে-কানাচে নিষাদবাগের বহুবেটিরা জড়ো হয়েছে। পাটকাঠির বেড়ার ফাঁকে

জোড়ায়-জোড়ায় ড্যাবডেবে চোখ। ছাতিমতলা থেকে ভরত শনের দাঁড় পাকাতে-পাকাতে ঢ্যারা হাতে চলে এসেছে। মান্যবর ধরা গলায় বলে—শুনছ শুনছ বেয়ানের বাতচিত? আমি এলুম দটো হককথা বলতে—আর উল্টে মুখখিস্তি।

ভরত এগিয়ে যায় সরস্বতীর দিকে। ধমক দিয়ে বলে—এই বুঢ়িয়া। এ্যাই গে সরস্বতীয়া! কার সঙ্গে কী রকম কথা বলছিস খেয়াল আছে গে? চিরটাকাল একরকম থেকে যাবি তুই?

সরস্বতী এতে আরও ক্ষেপে যায়। হাততালি দিয়ে নাচতে-নাচতে বলে—পুছো ভাল মানুষ বড়ঘরী ভুঁইক্ষেতিওয়ালা লোকটাকে! পুছো ওই বখিল কলাবেড়িয়াওলাকে! আমার বেটার বদনাম গাইতে নদী পার হয়ে কে এল, তাকেই পুছো। আর পুছো ওই ঢলানি সাবুনমাখানী পাওডারওয়ালী দুবেলা ঘাটে নাহানেওয়ালী ওই ছোকড়ীকে। নিষাদবাগে বহু-বহুড়ী আর নাই? ছেলে-পুলের জন্ম দিয়ে চুল পাকিয়ে আমার মতো বুড়ি হয়ে গেল না?

ভরত গতিক বুঝে নরম সুরে বলে—আ বহিন, চুপ চুপ। নিযাদবাগের ইজ্জত রেখে কথা বল। তুই কি না আক্কেলওয়ালী ঔরত! ছি, ছিঃ!

এবার সরস্বতী একটু শান্ত হয়। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলে—বেটির বাপ, জামাইয়ের শ্বশুর এসেছে গে জামাইকে শাসন করতে। এদিকে বেটির জন্যেই যে জামাইয়ের কলজে পচে যাচ্ছে, সে হিসেব ওর আছে? তোমরা নিষাদবাগওয়ালারা দেখছে না এতোয়ারির কী হাল হচ্ছে?

মান্যবর ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বাইরের দরজার দিকে পা বাড়ায়। ভরত বলে—দাদা, এক বাত শুনো। বেটা-বেটিব জন্ম দেওয়া যত সুখের, তত দুঃখের। তো আমি বলি কী, মাথা ঠাণ্ডা রেখে একটুখানি বসো। বেয়ানের হাতের জলটল খাও।

মান্যবর হঠাৎ ঘুরে দাওয়ার দিকে তাকায়। মেয়েকে দেখে। তারপর কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলে—আমার বেটিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। ফুলিয়া চলে আয়।

অমনি সরস্বতী উঠোনের উনুনের পাশ থেকে ছাগলের খুঁটি বসানো দুরমুষটা তুলে কোমরে আঁচল জড়ায়।—নিয়ে গেলেই হল? গায়ের জোরে নিয়ে যাবে তো যাও না দেখি। সাতকুড়ি টাকা ফেলো, বেটিকে বলো গয়না খুলে দিক। তারপর নিয়ে যেও।

ভরত তার দুরমুষটা কেড়ে নিয়ে বলে—আহা! মুখে বলছে বলেই কি নিয়ে যাচ্ছে?

এবার মান্যবর একটু গলা চড়িয়ে ডাকে—ফুলিয়া। চলে আয়! এ্যাই ফুলিয়া!

সরস্বতী চিলচিৎকার করে দাওয়ায় উঠে ফুলকলিয়াকে ঘরের ভেতর ঠেলতে থাকে। এই সময় শরতের বউ নির্মলা এসেছে ঘাট থেকে। কাঁখে পেতলের ঘড়া। ঘাড় থেকে বুক অব্দি গামছা জড়ানো রয়েছে। সদ্য নেয়েছে। ভিজে কাপড় সেঁটে গেছে শরীরে। টুপটাপ জল ঝরে শুকনো উঠোনে কাদা হচ্ছে। সে কলসি নামিয়ে রেখে হাসিমুখে দাওয়ায় যায়। বুড়িকে সরিয়ে দিয়ে হাসতে-হাসতে বলে—আসমান কানা। বর্ষাচ্ছে না। তাই তোমরা বুঝি এমনি করে বর্ষাচ্ছ গে? ছোড়, ছোড়। দুনিয়া একদিকে, এরা অন্যদিকে হাঁটবেই। ও বুড়োর বেটা, ও কলাবেড়িয়ার মোড়ল! তোমার বেটি আছে, আমি আছি। চলো, বেয়ান তো গুড়জল করাবে না। আমি ছাগলের ঘন দুধ দিয়ে চা খাওয়াব।

মান্যবর কিছু না বলে ঝটপট ঘোরে এবং বেরিয়ে যায়। ফুলকলিয়া বুক ফাটানো চিৎকার করে ওঠে—বাবা!

নির্মলা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে—চুপ রী! বাবা কি তোর একা আছে?

* * *

সবাই জানে শ্বশুরের সামনে এতোয়ারি 'চুহা' হয়ে 'গাঢ়া'য় ঢুকতে পারলে বাঁচে। শ্বশুরের দেওয়া বদনামের বিরুদ্ধে যা বলার তা তার মা'ই বলেছে নিষাদবাগওয়ালীদের সামনে। সবাই বিশ্বাসও করে নিয়েছে যুক্তিটা। এতোয়ারি টাউনবাজ হয়ে উঠেছে কিছুটা। তাই বলে বাগানপাড়ার ছোকড়ি নিয়ে মজবে, একথা ওই গাছটাকেও জিজ্ঞেস করো—মানবে না। অতএব কলাবেড়িয়ার মোড়ল মেয়েকে এতোয়ারির ভাত-ছাড়ানোর মতলব দিয়েছে। আর মেয়েও সেইমতো রাস্তা ধরেছে। মরদের পাশে শোয় না। তাকে গ্রাহ্যও করে না। নিষাদবাগওয়ালারা বেচারা এতোয়ারির জন্যে দুঃখিত। বরং আরও

স্নেহের চোখে লোকে তার দিকে তাকাচ্ছে। বউকে কী কী পদ্ধতিতে এসব সংকটের সময় মুঠোয় রাখতে হয়, তারও ফন্দিফিকির বাতলাচ্ছে অনেকে। আর সরস্বতী বুড়ি তো বউয়ের ওপর আরও দখলদারি দেখাতে শুরু করেছে। একটু চোখের আড়াল হবার যো নেই ফুলকলিয়ার। সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস করে ওঠে বুড়ি। —কাঁহা গেইলা গে ধরমওয়ালার বেটি? ওধারে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস? চোখ গেলে দেব। এদিকে আয়!

ফুলকলিয়া তাই বলে ভড়কে যাবার মেয়ে নয়। পাল্টা ফোঁস করে বলে—তোমার মরা বাবাকে দেখছি গে! গঙ্গায় দাঁত ছরকুটে ভেসে যাচ্ছে কি না। তাই দেখছি।

বুড়ি ছাগলের খুঁটিপোতা দুরমুষ তুলে গর্জায়—মুখ ভেঙে দেব আবাগীর বেটির।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। বুড়ি মনে-মনে বেজায় ভড়কে গেছে। গোলমালটা যে অন্যখানে। এতোয়ারির সায় পাচ্ছে না শাসন-তর্জনে। সে রাতে বুড়ি জোর করে বউকে ছেলের পাশে পাঠিয়েছিল শুতে। এতোয়ারি রেগে আগুন। তালের পাটি আর বালিশ তুলে নিয়ে বলল—বারোয়ারিতলায় মাচায় শুতে চললাম। তুই তোর বউ নিয়ে আরামসে নিদ যা গে মা।

গতিক বুঝে বেশি হইচই করেনি সরস্বতী। পরে বলেছিল—বহু নিবি না তাহলে? আচ্ছাসে শোচ করে দ্যাখ এতোয়ারি। যদি না লিস এখনই বল। গয়না কাপড় কেড়ে নিয়ে গাঙ পার করে দিই মোড়লের বেটিকে।

—দে না। আমি কি বলছি দু'বেলা ধূপ-চন্দন দিয়ে পুজো কর? এই বলে এতোয়ারি গাঁওয়ালে বেরিয়ে গিয়েছিল।

এ এক সমস্যা সরস্বতীর। বলতে গেলে বউ হচ্ছে কিনা চৌবেলালজির মতো এককাঁড়ি নগদ টাকা দাদনের কারবার। এতোয়ারি এখনও সেই নাবালক থেকে গেছে বলে তো তার মা তা নয়। বউ তো একটা লাগবেই। গয়না যদি বা কেড়ে নেওয়া গেল, পণের নগদ টাকা আবার কী বেচে জোগাড় করবে? জেদের মাথায় তাও না হয় করা গেল। কিন্তু ওদিকে কলাবেড়িয়ার মোড়ল আবার মেয়ে বেচে কোন না আরও সাত-আট-কুড়ি টাকা নাফা করবে! এটাই বড্ড মনে বিঁধছে বুড়ির। এ নিয়ে সে জ্ঞানী ভরত, দার্শনিক নয়নসুখ আর সুবিচারক ধনপতি মুখিয়ার কাছে গোপনে পরামর্শ চেয়েছে। সবাই বলেছে, এতোয়ারির গোস্বা হয়েছে বউয়ের ওপর। পুরুষ মানুষের ব্যাপার। বেশিদিন থাকবে না গে বহিন! বউ যদি উল্টোপাল্টা বুলি না বলে, তুই চুপসে বৈঠা থাক। ছেলে-বউয়ের মধ্যে মিল হয় কিনা দ্যাখ্। দার্শনিক নয়নসুখ বলেছে—আরে! গাইবাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়ে দুধ দেয়। তো কলাবেড়িয়ার মোড়ল মতলব করুক, তার বেটির যদি নিষাদবাগে ভাত খাবার ইচ্ছে থাকে, সে কিছু করতে পারবে না।

ধনপতি বলেছে—হাঁ। উও ঠিক, লেবা বহুর হালচাল বুঝছিস তো?

সরস্বতী ফিসফিস করে বলেছে—বুঝতেই তো পারছি না দাদা। সে রাতে শুতে বললুম তো বহু শুতে গেল। লেকিন বেটা শুতে নিল না। তারপর থেকে আমি আর ছোটী দুপাশে, মধ্যিখানে বহু নিয়ে শুচ্ছি। সারারাত ঘুমোতে পারিনে। কখন ভেগে যায় নাকি! তোমরা বলবে ঘরে বহুকে ঢুকিয়ে শেকল আটকে দিইনে কেন? সেও ডর লাগে। কাহে? কী, মনুয়ার বহুর মতো রাগের চোটে গলায় দড়ি দেয় যদি!

হ্যাঁ, এটাও ভাববার কথা। মানাবরের চেনাজানা খাতির ধনপতির চেয়ে বেশি। থানাপুলিশ করবে। মনুয়ার শ্বশুর মোড়ল না হয়েও হুলস্থূল বাধিয়ে বসেছিল। ধনপতি আর তার ছেলে 'এলেমদার' সূরযপতি অনেক কষ্টে বাঁচিয়েছিল মনুয়াকে। তবে মনুয়া আর গাঁয়ে রইল না। বেলডাঙায় চলে গেল তার বাবুর আড়তে। এখন কয়াল হয়ে তারাজু মাপে। ছে ছে...ঘেঁষ ঘেঁষ ন্ঠেন্ ন্ ঠেন ঠে...! ওর চোখেমুখে আজকাল রোশনাই ঠিকরে বেরুচ্ছে। বাবু হয়ে গেছে সে। দেখলে কে বলবে এই সেই নিষাদবাগের মনুয়া—কাঁধে ভার বয়ে গাঁওয়ালে যেত! জামা খুললেই কিন্তু কাঁধের কালচে ছোপ বেরিয়ে পড়বে। ওই তোমার জন্মদাগ। ঠাকুরবাবা ব্রহ্মাজি দেগে দিয়েছেন। তাঁর দুই কন্যা ভারি আর ভূরিকে বহন করতেই তোমার জন্ম হয়েছিল যে।

তো ফুলকলিয়ার আচরণে অবশ্য এদের ভাত না খাবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পান্টা মুখ করার জোরটাই যা বেড়েছে শুধু। কিন্তু আর সব ঠিকই আছে। ছোটীর সঙ্গে ভাব গপসপ হাসি তামাশা তেমনি বজায় আছে। কাজেও মন আগের মতো লাগাচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে পশ্চিমের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে নদীর ওপারে দূরের কলাবেড়িয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে— এটাই কেমন লাগে যেন। আর সেদিন থেকে শরতের বউ নির্মলার আনাগোনাটাও বড্ড বেড়েছে। নির্মলাকে সরস্বতীর খাতির করে চলতেই হয়। এভাবে টাকাকড়ি আর কে দেবে মুখের কথায় ওই নির্মলা ছাড়া? মুখে খুন উঠে মরে যাও, গাঁয়ে চার আনা হাওলাত পাবে না কারও কাছে। তাই নির্মলা যখন এসে বউকে ডাকে—আয় রী বহু নাহান করতে যাই! সরস্বতী মানা করতে পারে না। শুধু ছোটীকে ইশারায় লেলিয়ে দেয় পেছনে। ছোটী মায়ের কথা মেনে ওদের পিছু ধরে। কিন্তু ঘাটোয়ারিতলায় গিয়েই সে কেটে পড়ে।...

এই সময় এক পড়ন্ত বিকেলে নদীর ওপারে আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে গেল। বাতাস থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণ কারো খেয়ালে হয়নি ব্যাপারটা। ল্যাংড়া রঘুয়া ক্রাচে ভর করে বাঁধে শিমুলতলায় দাঁড়িয়ে একটি ডাক ছাড়তেই সারা নিষাদবাগ সচকিত সঙ্গে-সঙ্গে। ঠাকুরবাবা কালা ভঁইসা ছেড়ে দিয়েছেন। ওই দ্যাখ তার শিঙ থেকে রোশনি ঠিকরোচ্ছে! ওই দ্যাখ তার কপালে সিঁদুর। আর তারপর সেই অন্ধকারবর্ণ বিশাল মহিষ গর্জন করল পশ্চিমের নীলবর্ণ বাথানে। ল্যাংড়া রঘুয়া হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল হা হা হা হা! হা হা হা হা! বহু-বহুড়ী বাচ্চা কাচ্চা বুড়োবুড়ি গাঁয়ে যারা ছিল, দৌড়ে চলে এল বাঁধে। বুধিনী-সুধিনী বোবো-কালা যমজ বেনের চোখগুলো বড়ো হয়ে গেল। আবার গর্জে উঠল ঠাকুরবাবার কালো মোষ। চাপচাপ সিঁদুর। সোনালি রুপোলি বিচ্ছুরণ। গর্জন। ধনপতিয়ার ঠোঁট কাঁপতে থাকল। নয়নসুখ বিড়বিড় করে বলল— ঠাকুরবাবা! ঠাকুরবাবা! ল্যাংড়া রঘুয়া হাত তুলে কালান্তক ভঁইসাকে ডাকতে ডাকতে আবার হাসল হা হা হা হা! তারপর ঠাকুরবাবা ভঁইসা দেখছে নিষাদবাগকে। শিঙ নেড়ে তেড়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। গাছপালা কেঁপে উঠল। গঙ্গার শুকনো চড়ায় ধুলোবালি উড়ল। চোখের পলকে এসে পড়ল দুরন্ত কালো মহিষ। নিষাদবাগ থরথর করে কেঁপে উঠল। ল্যাংড়া রঘুয়া দু'হাত তুলে এক ঠ্যাংয়ে নাচতে থাকল। তার জটা-চুল দুলতে থাকল। সেই দুলুনির তালে-তালে হাওয়ার গতি বাড়ছে আর বাড়ছে। তারপর বাঁধের তাল গাছ থেকে শুকনো বাগড়াখানা খসিয়েই চুল নাড়া দিল বছরের প্রথম কাল-বোশেখি। খুব দেরি করেই এল এবার। আর প্রচণ্ড ঝড়ের পিছনে-পিছনে দ্রুত চলে এল বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে অল্পসল্প সিল পড়া। গরু-ছাগল চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে গাঁয়ের দিকে দৌড়াল। বাঁধ থেকে হইহল্লা করে সবাই গাঁয়ে ফিরে আসছে। সরস্বতীবুড়ি বাড়ি ঢুকেই চ্যাঁচায়—বহু গে! লকড়ি তুলেছিস? ও ছোটী! তোর দাদার জামা তুলেছিস? সব তোলা হয়েছে দেখে সে খুশি হয়। ছাগলটাও দাওয়ার কোণে লেজ নাড়ছে।

ছোটী ডাকে—আয় তো বহুদিদি! শিল কুড়োই।

ফুলকলিয়া লাফ দিয়ে নামে দাওয়া থেকে। ননদ-ভাজে উঠোনে শিল কুড়োতে থাকে। আঁচলে রাখে। চড়চড়ে বৃষ্টির ফোঁটায় দুজনে ভিজে ঝুপসি হয়ে যায়। সরস্বতী দাওয়ায় বসে পড়েছে চারপায়াটা নিয়ে। তার মুখেও হাসি। মাঝে-মাঝে কপট ধমকাচ্ছে---ছটা গিরবে রী ছোটী! বহু, উঠে আয়।

ওরা শোনে না। উঠোনে পায়ের ছাপ পড়তে না পড়তে ধুয়ে যাচ্ছে। কুচি-কুচি এট্টুকুন শিল। ছোটী পিঠে হাত দিয়ে মিছেমিছি কঁকিয়ে উঠেছে—ইঃ মা গে। ফুলকলিয়া খিলখিল করে হাসে।

ততক্ষণে সরস্বতীর মনে ছেলের জন্যে ভাবনা এসেছে। এখন কোথায় আছে এতোয়ারি? যদি কোন মাঠের মধ্যিখানে থাকে? যদি কোন গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকে? ভয়ঙ্কর গর্জন করে বাজ পড়ছে। কানে তালা ধরে যাচ্ছে। ননদ-ভাজ সঙ্গে-সঙ্গে চুপ করে বসে পড়ছে। আওয়াজ থামলে আবার হাসি আর শিল কুড়ানো। কিন্তু আর শিল পড়া কমে গেল। বৃষ্টি আর মেঘের ডাক বারবার। সরস্বতী এতোয়ারির জন্যে মনে-মনে ঠাকুরবাবাকে ডাকছে। চোখ বুজে একমনে ডাকছে। হেই ঠাকুরবাবা! ওই আমার একটি মোটে! আর তো নেই! তাকে যেন কিরপা করো, বাবা। সরস্বতীর খালি মনে হচ্ছে, এতোয়ারি নয়নসুখের ভাগ্যের পাল্লায় পড়ে ঠিকই কোন মাঠের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছেছে। ফিরে আসুক ভালয় ভালয়, ওই ছোকরার সঙ্গ ছাড়াবে। হাটুয়া কেন এতোয়ারিকে মাঠের মাঝখানে এসময়

নিয়ে যাচ্ছে তা সে জানে না কেবল এমনি ধারণা হচ্ছে। হাটুয়ার হাবভাব আজকাল কেমনধারা যেন! আরও চালিয়াৎ আরও পাকা লাগে। মুখে বড় বড় বুলি। সব বুলির মানে সরস্বতী বোঝেও না।

ফুলকলিয়ার মনের ময়লা কি কেটে গেল বৃষ্টিতে? সে উঠে আসতে চায় না। শিল চুষতে-চুষতে ছোটীকে বলে—আ রী ছোকড়ি! মুখিয়ার মেয়ে সন্ধ্যামণির বিয়েতে নেচেছিলাম।—তার ফল এতদিন ফলল রী! ছোটী সায় দিয়ে বলে—ঠিক বলেছিস রী বহুদিদি!

সরস্বতী ধরা গলায় ডাকে—উঠ যা, উঠ তো, খুব হয়েছে। আর ভিজিস না!

ফুলকলিয়া বলে—আ রী ছোটী! বাত লেগে গেল এরই মধ্যে? এত্তা আঁধার!

ছোটী বলে—হাঁ বহুদিদি! সেও শিল মুখে পুরে দেয় টপাটপ। খুশিতে চোষে। অবেলায় যেন সন্ধ্যারাতের অন্ধকার নেমেছে। কালো ছায়া ঘিরে আছে নিষাদবাগকে। উঠোনে সবুজ ছেঁড়া পাতা আর ছোট ছোট ডালপালা এসে পড়েছে। হাওয়ার বেগটা কমেছে। বর্ষণ বেড়েছে। জল গড়াচ্ছে নর্দমায়। দুটো কাঁসার গেলাসে ননদ-ভাজ নিজের নিজের শিলগুলি ঢেলেছে। ঠাণ্ডায় কাঁপুনিও শুরু হয়েছে দুজনের। শিল চুষে দাঁত-জিভ গলা থেকে বুক অব্দি হিম ভাব।

সরস্বতী বলে—কাপড় ছাড়্‌গে বহু! ছোটী, মরবি গে? কাপড় ছাড়!

আর দু'জনে অবাক হয়ে দেখে বুড়ির দু'চোখে জলের ধারা নেমেছে। ঠোঁট কাঁপছে। ছোটী চোখের ঝিলিক তোলে, বউদির দিকে তাকায়। ঠোঁটে চাপা হাসি। ছোটী জানে, মা এবার বাবার জন্যে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে, তারই পূর্বাভাস। ফুলকলিয়া কিন্তু অবাক হয়।

সরস্বতী একটু পরে গুন-গুন করে কাঁদতে থাকে। ননদ-ভাজ কাপড় ছাড়ে দাওয়ায়। চুল মোছে। দুজনেরই মনে বিরক্তি। দিলে তো খুশি মাটি করে। বৃষ্টির দিনে সরস্বতী বরাবর এমনি ঝিম মেরে যায় এবং তারপর কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। বৃষ্টি হলে কাঁদবার কী আছে?

হঠাৎ ছোটী বলে—এই যাঃ বহুদিদি গে। ও বহুদিদি।

—কী রী?

—আম কুড়োতে গেলাম না যে। ও মা! বহুৎ ডালপালা গিরে গেছে—কুড়িয়ে আনলাম না কাহে গে?

সরস্বতী কান্নার মধ্যে হুকুম দেয়—না। চুপ করে বসে থাকে।

ফুলকলিয়া নিষাদবাগে এই প্রথম ঝড়বৃষ্টি দেখল। ছোটীর কথায় সে একটু আগ্রহী হয়েছিল। কিন্তু সরস্বতীর কান্নায় মনটা খারাপ হয়ে গেছে। সে চুলে ন্যাকড়া জড়িয়ে ঘরে ঢোকে। ঘর অন্ধকার একেবারে। লম্ফ না জ্বাললে কিছু দেখা যাবে না।

ছোটী বাইরে তখনও আফসোস করছে। আম না পাক, একগাছা লকড়ি তো পেত! বুধিনী-সুধিনীরা এতক্ষণ বাড়ির উঠোন ভার্ত করে ফেলেছে। শিল কুড়োবার সময় এ কথাটা কীভাবে ভুলে গেল সে?

ফুলকলিয়া ভেতর থেকে বলে—ছোটী! লম্ফ জ্বাল না রী!

—তুই জ্বাল রী।

—তোর দাদার মেচ—বাত্তিটা কোথায় জানিস?

—মেচবাতি কি তোমার জন্যে রেখে গেছে? আমার বহু লম্ফ জ্বালবে গে! সরস্বতী ফের গুনগুনানি থামিয়ে বলে—চুলায় আগুন আছে!

ছোটী হেসে খুন সঙ্গে-সঙ্গে। উঠোনের চুলোয় আজকাল রান্না হয়। জলে ভর্তি হয়ে গেছে।

রাতে যদি কিছু রাঁধবার থাকে, দাওয়ার চুলো জ্বালতে হবে। সে হাসতে-হাসতে বলে—যা রী বহুদিদি! চুলার কলে লম্ফের শিষ ধর গে। ফুরুৎ করে জ্বলে উঠবে।

সরস্বতী বুঝতে পেরে করুণ সুরে বলে—ছোটী! মালতীদের ঘর থেকে লম্ফ জ্বেলে আন্ মা!

—হুঁ, বরষাচ্ছে দেখছ না আভি? লম্ফ বুঁতে যাবে না? আমি ভিজে যাব না ফির? ছোটী আপত্তি জানায়। আর বহুদিদির কী হল রী? লম্ফ জ্বেলে কি সুরত দেখবি এখন!

ইঃ! কলাবেড়িয়ার বেটির সুরত বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে কি না দেখবে গে!

—ছোটী! তোর বড্ড কথা হয়েছে রী আজকাল। ফুলকলিয়া চাপা গলায় বলে। আঁচলের তলায় লম্ফ জ্বেলে না আনতে পারলে কী হবে জানিস?

—কী হবে শুনি?

—বহু হতে পারবিনে কোনদিন!

—ভাগ ভাগ! আমি তোর মতো বহু হবো ভাবছিস বুঝি? ছোটী মরে যাবে, বহু হবে না।

সন্ধ্যাবেলা অলক্ষুণে কথা শুনে সরস্বতী কান্নাটা পুরো মুলতবি রাখে। বাগ দেখিয়ে বলে—আলো না জ্বাললে আঁধারে গিলবি তোরা। পোকামাকড়সুদ্ধ গিলবি যে।

বৃষ্টি একটু কমেছে। ফুলকলিয়া লম্ফ নিয়ে বেরোয়। শাশুড়ি কী বলবে না-বলবে গ্রাহ্য করে না। উঠোনে নামে। ছোটী খিলখিল করে হেসে ওঠে। —শুকনো কাপড় আবার ভেজাতে যাচ্ছে মোড়লের বেটি! ও মা! তোর বহু লম্ফ জ্বালতে যাচ্ছে গে।

সরস্বতী গর্জায়—বহু! এ্যাই বহু!

বহু ততক্ষণে বাড়ির বাইরে চলে গেছে। সরস্বতী একটু ভাবনায় পড়ে যায়। পালিয়ে যাবার ছল নয় তো? কিন্তু তাই বলে সে এই বৃষ্টিকাদায় বহুর পেছনে ছুটতে পারবে না। সে ব্যস্তভাবে বলে—ছোটী! দ্যাখ তো, কোথায় গেল?

—তুমি যাও না তোমার বহুর সঙ্গে। আমার কাঁপুনি ধরেছে। ছোটী নির্বিকার বলে দেয়। আবার ভিজব? তুমি যতই তড়পাও, ছোটী নড়বে না।

সিকনিপড়া রোগা মেয়েটা কবে-কবে সাবালিকা হয়ে গেছে যেন। কথাবার্তার রকমসকম দেখে থ বনে যায় সরস্বতী। সে অগত্যা বারবার চেরা গালায় ডাকতে থাকে—বহু গে! এ্যাই বহু! ও রী আবাগীর বেটী!

বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যায় তখন অন্য একটা ব্যাপার ঘটছে নিযাদবাগে। কোটি-কোটি পোকামাকড় দারুণ চ্যাচামেচি করে গান জুড়ে দিয়েছে। বেয়াড়া গলায় ব্যাঙ আর সোনাগদি ডাকছে কোথায়। ঝিরঝিরানি তুচ্ছ করে জোনাকি বেরিয়ে পড়েছে দুচারটে। আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে না। মাঝে-মাঝে শুধু বিজলির ঝিলিক আর মেঘের ডাক বাজছে। আবার এতোয়ারির কথা ভেবে বুড়ি আনমনা হয়ে যায়।

পাশের বাড়িতে তখন ফুলকলিয়া লম্ফ জ্বেলেছে। মালতীর মা বলে—তোর মরদ ফিরেছে তো?

—না রী কাকী!

—মালতীরা এখনও ফিরল না রী! জামাইয়ের সঙ্গে গোকরনের হাটে গেছে। এত্তা দেরি কাহে?

গাঁওয়ালে যাওয়া মেয়ে-মরদের জন্যে এখন নিষাদবাগ উদ্বিগ্ন। সবাই এমন দিনে বাড়িতে থাকলে বৃষ্টির সুখটা তারিয়ে ভোগ করতে পারত।

—চলি কাকী। বুড়িয়া চিল্লাচ্ছে শুনছ না?

—তুমি বড়ঘরের মেয়ে বলেই সব সইছ মা। আর কোন মেয়ে সইত না। আমার মালতী তো মরদকে লিয়েই চলে এল। আমি বললাম, তা ভালই হল একরকম। আমার তো বেটা নেই। জামাই বেটা হয়ে দাঁড়াল।...বলে মালতীর মা ফিসফিস করে ওঠে।. এতোয়ারিকে লিয়ে আপনা বাপের ঘরে চলা যা না রী! তোর বাপের কেত্তা ধন-ধান। এত বড় বাড়ি। টিনের চাল। গরুর গোহাইল ভি আছে। আমি তো দেখেছি। কাহে ঝামেলা করে আছিস রী? আমি হলে এ্যাদ্দিন...

সরস্বতীর ডাক ভেসে এলে মালতীর মা চুপ করে। ফুলকলিয়া, চলি কাকী, বলে পা বাড়ায়। বৃষ্টির ফোঁটা খুব হালকা এখন। হাওয়াটা আবার উঠছে। ঠাণ্ডা লাগছে। আঁচলের আড়ালে লম্ফ নিয়ে রাস্তায় নামে ফুলকলিয়া। তারপর শোনে অন্ধকারে ক্রিং ক্রিং ক্রিররররর রিং। রক্ত ছলকে ওঠে বুকে। আলো কোথায় টিপগাড়ির? রাস্তার মাঝখানে গিয়ে বুক পেতে দাঁড়াতে পারে কি কলাবেড়িয়ার বেটি? একটু দাঁড়ায় সে—সাবধানে একপাশে। লম্ফ দেখতে পেয়েছে টিপগাড়িওয়ালা। কাছে এসে বলে ওঠে—কৌন গে? কাপড়ে আগ্ ধরে যাচ্ছে যে! হুঁশ করে ধর্ না লম্ফঠো।

হকচকিয়ে ফুলকলিয়া লম্ফ সামলায়। ধরেনি। ধরে যেত আরেকটুতে। সে চাপা হেসে ওঠে। —মুখিয়ার বেটার টরচবাত্তির কল কি আবার বিগড়েছে?

টিপগাড়ি থেমে যায়। সূরযপতি বলে—কৌন বী? এতোয়ারির বহু? আরে ভাই! ভুল করে নিয়ে বেরোইনি টর্চ বাত্তিঠো। গাঁয়ে ঢুকে তোমার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হল, তোমাকেই পুছি। এদিকে বরষাল কেমন?

—বহুৎ জোর বর্ষেছে। উধার ক্যায়সা জি?

—আমি তো ছিলাম টাউনে। ওখানেও জোর বর্ষেছে। কম বর্ষালে বাঁধের রাস্তার কাতা ওঠে। সাইকেল কাঁধে নিতে হত। ...সূর্য হাসতে-হাসতে পা বাড়ায়। আর সাইকেলে চাপে না সে।

হঠাৎ ফুলকলিয়া ডাকে -- মুখিয়ার বেটাকে একহি বাত বলব জি!

—বাত? আমাকে? ক্যা রী বহু? বোলো।

—বাবার সঙ্গে শাসের ঝগড়া হয়েছিল সেদিন। মুখিয়ার বেটা শোনেনি?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ।

ফুলকলিয়া ভাঙা গলায় বলে—সেই থেকে খুব জুলুম হচ্ছে আমার ওপর! এমন এলেমদার গাঁয়ে থাকতে আমার ওপর জুলুম হবে জি? আমি...আমি নিষাদবাগে আর থাকব না জি। হাঁ, মুখিয়ার বেটা যদি এর ফায়সালা না করে, আমি পালিয়ে যাব।

কথাটা বলেই সে কান্না চেপে বাড়ি ঢুকে পড়ে! সূর্য অবাক হয়ে একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সাইকেল ঠেলে এগোয়। ঘণ্টা বাজায় আবার। বলা যায় না কে এসে পড়বে—মানুষ বা জানোয়ার! এতোয়ারির বউয়ের কথাগুলো মনে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু কী করতে পারে সে? সে তো বাপের মতো গাঁওপতি মুখিয়া নয়। আর নিষাদবাগের কোন শাশুড়ি না বহুর ওপর জুলুম করে? সূর্য মনে-মনে হাসে। কিন্তু মনের মধ্যে ফুলকলিয়ার কণ্ঠস্বর থামে না। এ এক উপদ্রব! সূর্য যেতে-যেতে ঘুরে অন্ধকারে এতোয়ারির বাড়িটা দেখবার চেষ্টা করে। কলাবেড়িয়ার মেয়েটা কেমন অদ্ভুত যেন--নিষাদবাগের মেয়েদের মতো নয়।

পরক্ষণে সূর্যের ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফোটে। আবে দূর দূর! গায়ে উল্কিদাগা লেখাপড়া না জানা বোকার হদ্দ একটা মেয়ে! ওর সঙ্গে যদি সূর্যের দৈবাৎ বিয়ে হত, কী লজ্জার ব্যাপার না হত! শহরের বন্ধু-বান্ধব বা চেনাজানা সব ভদ্রলোকের কথা ভেবেই সূর্য তার বউয়ের একটা চেহারা-চরিত্র খাড়া করেছে। সে বউ কোথাও না কোথাও আছে। শুধু খুঁজে বের করতে হবে—এই যা!

ধনপতি হেরিকেন হাতে বেরিয়েছে ঘণ্টা শুনে। —এলি বেটা? এতক্ষণ তো ভাবনায় সারা হচ্ছিলাম। খুব বাজ-বিজলি হচ্ছিল কিনা। কোথায় ছিলি তখন?

—টাউনে। এদিকে খুব বর্ষেছে মনে হল!

—খুউব। ঠাকুরবাবার কিরপা হল এ্যাদ্দিনে।

—হুঁ। তোমাব চৌবেজি দেখবে কাল ভোর হতে না হতে এসে পড়বে। ওর ধড়ে তো জান এল!...সূর্য হাসতে-হাসতে সাইকেল ঢোকায় দরজায়। ধনপতি হেরিকেন তুলে আলো দেখায় ছেলেকে।

ওদিকে ফুলকলিয়া বাড়ি ঢুকতেই সরস্বতী ধরেছে। —কার সঙ্গে বাত করছিলি গে রাস্তায়?

—ভূতের সঙ্গে।

ছোটী খিলখিল করে হেসে বলে—হাঁ। ভূতের টিপগাড়ি ছিল। ঘণ্টি বাজছিল।

সরস্বতী গর্জন করে ওঠে—এ্যাই বহু! সূরযুয়ার সঙ্গে কী বাত করছিলি?

ফুলকলিয়া পাল্টা চেঁচিয়ে বলে—দুনিয়া ঠাণ্ডা হল। তুমি আর ঠাণ্ডা হবে না গে! খালি বহু বহু আর বহু! বহু তো কখনও বাবার কালে দেখনি--খালি বহু বহু বহু। বহু পেয়েছ যার জন্যে, সেই বেটার কথাটা ভাবো ততক্ষণ। ঝড়বিষ্টিতে কে কোথায় থাকল, সেই কথাটা ভাবো। তা নয় খালি বহু বহু।

এইতে বুড়ি শান্ত হয়। বলে—হাঁ গে, হাঁ। ওহি ভাবছি।

ছোটী বলে—মা, ভুখ বাজছে। খেতে দে না গে।

—দিই বেটি ..বলে বিষণ্ণ সরস্বতী আস্তে-আস্তে ওঠে চারপায়া থেকে।—

শরতের ঘড়ির হিসেবে সময় মাপা। সাহাবাবুর আড়ত থেকে বেরিয়েছে রাত এগারোটায় কাঁটায়-কাঁটায়। থাকতে বলেছিলেন সাহাবাবু। শরতের উপায় নেই যে। বউ একলা থাকবে। ঘুমাতে পারবে না চিন্তাভাবনায়। টর্চ আব সাইকেল নিয়ে সে নিষাদবাগে ফিরে আসছে। কলেজের পর পর্তুগীজ চার্চ

অব্দি গঙ্গার ধারে-ধারে বাঁধের কাঁধ বরাবর রাস্তাটুকু পীচের। তারপর বাঁধে উঠতে হবে। মাঠজঙ্গল নিয়ে গাঁয়ের এলাকা শুরু সেখানে। যত বৃষ্টিই হোক, এ মাটিতে জল দাঁড়ায় না, কাদাও হয় না। সাইকেল বারোমাস চলে। পোয়াটাক এসেই শরতের টর্চের আলো কাঁধে ভারওয়ালা একটা লোককে ধরে ফেলে। ভারের দুধারে খালি দুটো ঝুড়ি ঝুলছে আর এদিক-ওদিক দুলছে। কারণ লোকটা টলছে। টলতে-টলতে বাঁধের গায়ে গড়িয়ে পড়তে গিয়ে ঝোঁক সামলে নিচ্ছে। শরত মুচকি হাসে। টর্চ নেভায় না। যেভাবে ওর ভারটা এদিকে ওদিকে ঘুরে যাচ্ছে, সংকীর্ণ রাস্তায় সাইকেলের পাশ কাটিয়ে যাওয়া কঠিন। হাত দশেক তফাতে পৌঁছে শরত বলে—কৌন রে?

লোকটা ঘোরে না। গায়ের হাফ-সার্ট কাদায় বিচিত্তির। ধুতিটা হাঁটু অব্দি যথারীতি তোলা। এমন বেশে গাঁওয়ালে কিংবা টাউনে সবজি খন্দ-আনাজপাতি বেচতে যায় যে, সে নিশ্চয় সৌখিন। পরক্ষণে শরত চিনতে পারে—এতোয়ারি বে? এ্যাই এতোয়ারি!

এতোয়ারি কথা বলে না। টলতে-টলতে একই ভাবে হাঁটে। তখন শরত সাইকেল থেকে নামে। পিছনে যেতে-যেতে চাপা হেসে বলে—তুই বাঞ্চোতও ধরলি শেষে বে? এঁ্যা? আমি ভাবতাম, তুই মাটির ঢিবি। তুই দেখছি একেবারে জ্যান্ত দেবতা। এতোয়ারি!

কী একটা অস্পষ্ট শব্দ করে এতোয়ারি।

শরত বলে—হাটুয়া কোথায় বে? তোর প্রাণের ইয়ারকে কোথায় ফেলে এলি?

এতোয়ারি কিছু বলে না। শরত টর্চ নিভিয়ে পিছু-পিছু চলতে থাকে। দুধারে মাঠ ঝোপঝাড় বাঁশবন আর গাছপালায় পোকামাকড়রা জোরালো আওয়াজ দিচ্ছে। ব্যাঙ ডাকছে খাল-ডোবায়। কোথাও দূরে গঙ্গার তলায় শেয়াল ডাকল। গাছের পাতা থেকে টুপটাপ জল ঝরছে। পাখির ডানা নাড়ার শব্দ কোথাও। শরত সিগারেট ধরায়। ফের ডাকে—এতোয়ারি!

—হুঁ।

—কোথায় খেলি বে? হাঁড়ি, না বোতল বে?

এতোয়ারি গলার ভেতর থেকে জবাব দেয়—বোতল! তাড়ি নে ছে। হাঁ—বোত্তল।

--বোত্তল! এত পয়সা কোথায় পেলি রে এতোয়ারি?

—তুমি কোথা পাও? এহি বাতঠোর জবাব দাও, হাঁ!

শরত খিলখিল করে হাসে। —হাঁ রে এতোয়ারি! বাড়ি ঢুকবি কী করে রে? সরস্বতী পিসি তোর পিঠে খ্যাংরা ঝাঁটা মুড়ো করে দেবে যে?

এতোয়ারি হা-হা করে হাসতে-হাসতে প্রায় আছাড় খায়। সামলে নিয়ে বলে—মা জানতে পারলে তো! আমি চুপসে শুয়ে পড়ব উঠোনে। আমি তো রোজ..

হিক্কা ওঠে ওর। শরত বলে—রোজ কী করিস?

সে কথার জবাব আর দেয় না এতোয়ারি। আবার অস্পষ্ট কী শব্দ করে শুধু।

—আজ তো উঠোনে কাদা বে! আজ ঘরে শুতে হবে।

—হুঃ! তো ঘরেই শোব।

—বহু যে জানবে বে?

—শ্বশুরশালার বেটিশালীকে হামি থোড়া পরোয়া করি জি! হামি তো রোজ পিই। হাঁ—রোজ।

—রোজ বোতল?

—নাঃ। আজ বোত্তল পিইস্। পরশু—না তরশু বোত্তল। ঔর-ঔর দিন তাড়ি। গাঁজা ভি। শরৎদা, তুমি কী পিয়েছ গে?

শরত জবাব দেয় না কথাটার। হ্যাঁ, সেও মাঝে-মাঝে একটু-আধটু খায়। মদ-তাড়ি গাঁজা নিষাদবাগে কেউ-কেউ না খায় এমন নয়। আগে কড়া শাসন ছিল ধনপতির বাবার আমলে। ধনপতি ঢিলে মুখিয়া। আর দিনে-দিনে লোকেরা টাউনবাজ হয়ে গেল। কে কাকে শোধরাবে? নয়নসুখের ভাই মোহনসুখ তো উঠোনের তালগাছে তাড়ির ভাঁড় ঝুলিয়েছিল। ওই গাছ থেকে পড়েই কলজে ফেটে মারা যায়। সেই একটা ডর ঢুকে গেল নিষাদবাগে। নয় তো এ্যাদিন অনেক গাছে ভাঁড় ঝুলতে দেখা যেত এই খরার মাসে। শরত বলে কোথায় খাস বে এতোয়ারি? বল না, আমিও বসব একদিন।

এতোয়ারি জোরে মাথা নাড়ে? —নেহি জি।

—বল্ না ভাই! শরত কথাটা জেনে নিতে চায়। ফুঁসলিয়ে বারবার বলে—এই ভাই এতোয়ারি! তোদের সব খরচা আমার। বল না বে!

এতোয়ারি খিকখিক করে হাসে। —বাগানপাড়ায় জি বাগানপাড়ায়।

শরত চমকে ওঠে। তাহলে নির্মলাকে ঘাটোয়ারিবাবু যা বলেছিল, আর ওই ছোঁড়াটার শ্বশুর কলাবেড়িয়ার মোড়ল যা বলে গেছে, সব সত্যি! এতোয়ারি বেশ্যাবাড়ি মদ খেতে যায়! শরত এতটা বিশ্বাসই করেনি। আরে, এতোয়ারি একটা অখদ্যে গেঁয়ো মাটির ঢেলা! কে চেনালে বল্ তো? তোর প্রাণের ইয়ার হাটুয়া বুঝি? হুঁ। সে ছাড়া আর কে হবে? ও ছোকরার তো হাড়ে-হাড়ে বদবুদ্ধি বরাবর। ওরে এতোয়ারি! মরে যাবি—বুঝলি? খবর্দার।

এতোয়ারি! টলে পড়ে হাসির চোটে। অন্ধকারে পা পিছলে আছাড় খায়। তবু হাসি থামে না তার। তারপর উঠে বলে—হাটুয়া পড়ে আছে নাটমন্দিরে। আমি চলে এলাম। তো শরৎদা! টর্চবাত্তিঠো জ্বালো না! দেখো না হামি ঠিকসে যাচ্ছি, নাকি বেহুঁশ যাচ্ছি?

—চুপ শালা মাতাল!

—তুমি গাল দিচ্ছ জি?

—হ্যাঁ, দিচ্ছি। আরে শালা গিদ্ধড়! ঘরে তোর অমন বহু। তুই কোন দুঃখে বাগানপাড়া যাচ্ছিস, এ্যাঁ? যখন খারাপ ঘা হয়ে জ্বলেপুড়ে মরবি, তখন বুঝবি শালা।

এতোয়ারি দাঁড়িয়ে বলে—ক্যা? ঘা হবে?

—হ্যাঁ। গামময় চাকা চাকা ঘা হবে। বিছুটির মতো জ্বলবে!

এতোয়ারি দাঁড়িয়েই থাকে। টলুনি সামলায়। ভারটা অন্ধকারে দোলে এদিক-ওদিক। ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে।

—কী হল বে? চল। পাঁও বাঢা। এ্যাই শালা মাতাল খানকিবাজ!

এতোয়ারি ডুকরে কেঁদে ওঠে। ভাঙা গলায় কাঁদতে-কাঁদতে বলে—হাটুয়া হামাকে লিয়ে যায় শরৎদা। ওই শালা হামাকে রুপেয়াভি ধার করাইস গে। তিশঠো রুপেয়া উধার লিস হাম ঘাটোয়ারিসে।

শরতের মায়া হয়। ওর কাঁধে হাত রেখে বলে—যা করেছিস, আর করিসনে। নাক-কান মুলে বল আর কখনো করব না।

—না। আর কভি না কিরে। সত্যি নাক-কান মুচড়ে এতোয়ারি ভাঙা গলায় কিরে করে। হামার মরা বাপের কিরিয়া। হামার বেটাবেটির কিরিয়া।

মাতালের কাণ্ড। শরত ধমকায়। —বেটাবেটি হোক বে। তারপর কিরে খাস। চল্।...

বাকি পথটুকু এতোয়ারি আর কথা বলে না। গাঁয়ে ঢুকে শরত সাইকেলে চাপে। রাস্তা এরই মধ্যে শুকিয়ে গেছে। —যেতে পারবি তো এতোয়ারি? বলে এতোয়ারির জবাব শোনার অপেক্ষা না করেই সে বাঁদিকে মোড় নেয়। এতোয়ারি ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে তৈরি হয়। নেশা ততটা আর নেই। কিন্তু মনটা কেমন করছে। আতঙ্কে শরীর শিউরে উঠছে। বাগানপাড়া গেলে গায়ে চাকা-চাকা ঘা হবে? অনুশোচনায় তার গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। হাটুয়া—ওই শালা ভালুকের মতো গড়ন শুয়োরের মতো নাক আর মুখ—ওই শালাকে কাল মাঠে গিয়ে পুঁতে ফেলবেই ফেলবে।...

ছোকড়িটা বৃষ্টির মধ্যেই দুজনকে ঠেসে বের করে দিয়েছিল কি? এতোয়ারি হঠাৎ ধাঁধায় পড়ে যায়। নাকি হাটুয়া তাকে ঠেলে দিল? মনে পড়ছে না। শুধু মনে পড়ছে দুজনে অনেক কষ্টে নাটমন্দিরের আটচালায় ঢুকে পড়েছিল। তারপর?

—হুঁ। তারপর একসময় এতোয়ারি উঠে পড়ল। কোথায় শুয়ে আছে সে? হাটুয়াকে ডাকল। ওর সাড়া নেই। তারপর কেমন করে জেলখানার পাঁচিলের পাশ দিয়ে কলেজ আর গীর্জা ছাড়িয়ে নিষাদবাগের রাস্তা ধরেছে, কে জানে? ঠাকুরবাবার দয়া না করলে এমন হয় না। শরতদাদা ভি এসে পড়ল হঠাৎ। নয়তো রাস্তা ভুলে মঙ্গলার দিকে চলে যেত।

ফোঁসফোঁস করে নাক ঝাড়ে এতোয়ারি। মনে-মনে ঠাকুরবাবার উদ্দেশে মাথা কোটে। রক্ষা করো বাবা! হাম এক নাদান ছোকড়া! হামি তোমার থানে কুমড়ো দেব। ভারিভুরির জন্যে দেব দুসের

মাসকলাই আর একছড়ি পাকা কলা। হামার যেন ঘা ফোট না হয় ঠাকুরবাবা! হেই গে বহিন ভারি ওঁর ভূরি! বাগানপাড়ায় যাবার সময় হামার ভার খালি ছিল, তোরা ছিলিস না গে। এ বাতঠো তো বলবি ঠাকুরবাবাকে।

এভাবে তৈরি হয়ে এতোয়ারি বাড়ি ঢোকে। দাওয়ায় মিটমিটে লম্ফ জ্বলছে জাঁতার আড়ালে। মা শুয়ে আছে একা। এতোয়ারি ঠাহর করে দেখে ঘরের দরজা বন্ধ। দাওয়ার কাছে গিয়ে সাবধানে ডাকে,—মা! মা গে!

—বেটা! সরস্বতী হুড়মুড় করে ওঠে। কাঁহা ছিলি বেটা? ঝড়জলের সময়?

—গাঁওমে।

বুড়ি লম্ফের দম বাড়িয়ে দেয় বন্ধ দরজায় ধাক্কা মারে। —বহু! বহু গে। সাড়া না পেয়ে ছোটীকেও ডাকে। ছোটীর ঘুম দুনিয়া ওলটপালট হলেও ভাঙবার নয়। অতএব—বহু! এ্যাই বহু! ওগে রাজার বেটি রানী! ওগে আবাগী নিদওয়ালী।

এতোয়ারি অন্য রাতের মতো হুঁশিয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখনই শুতে পেলে বেঁচে যায়। সেও ডাকে— দরজাটা খুল না গে। লাথ মারকে তোড় দেখা!

দরজা খুলে যায় অবশেষে। এতোয়ারি মোষের মতো ঘরে ঢোকে! ফুলকলিয়া সঙ্গে-সঙ্গে বদ-গন্ধটা টের পেয়েছে। নাকে কাপড় ঢেকে বেরিয়ে আসে সে। শাশুড়ির অত খেয়াল নেই। দাওয়ার কোনায় সিকেয় তোলা হাঁড়ি নামাচ্ছে। ছেলে খাবে। কিন্তু এতোয়ারি জানায় ঘরের ভেতর থেকে—হাম খাকে আয়। তু শো যা, মা। আর ছোটীকে লিয়ে যা! ছোটী! উঠ্ রী উঠ্। ছোটী ওঠে না দেখে সে অতবড় মেয়েটাকে দুহাতে তুলে বাইরে নিয়ে যায়। দাঁড় করিয়ে দেয়। ছোটী ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সরস্বতী খুশি হয়ে ডাকে—ইধার আ বেটি মেরা পাশ। যাক গে, বেটা আজ বহুর পাশে শোবে। আজ খুব ঘুম হবে মায়ের।

দাওয়ায় ফুলকলিয়া নাকে কাপড় ঢাকা দিয়ে অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে। তাজ্জব, আতঙ্কিত।

* * *

যে মদ খায়, সেই তো মাতাল। ফুলকলিয়ার মাতালকে বড ডর। ডর—আবার তীব্র আগ্রহও বরাবর। আবছা মনে পড়ে, মান্যবর একবার তাড়ি খেয়ে বাড়ি ঢুকেছিল। ফুলকলিয়ার মা তো উনুন থেকে জ্বলন্ত কাঠ বের করে মারতে গেল। ফুলকলিয়া খড়-কাটা খোপড়িতে সেঁধিয়ে থরথর কাঁপে। উঠোনে দাঁড়িয়ে মান্যবর দুলছে আর হি হি করে হাসছে। ফুলকলিয়ার মা জ্বলন্ত কাঠ তুলে শাসাচ্ছে। একরাত একদিন ফুলকলিয়া বাপের কাছ ঘেঁষেনি। তার বাবা—সেই চিরচেনা অমায়িক হাসিখুশি মোড়ল বাবাটা হঠাৎ কেমন করে অজান-অচিন হয়ে পড়েছিল, ভাবতে অবাক লাগে। পরে শুনেছিল কোথায় কোন বাবুর পাল্লায় পড়ে একটুখানি খেয়ে ফেলেছিল মান্যবর—স্রিফ্ বাবুকা খাতিরসে। ব্যস, ওতেই নেশাব চূড়ান্ত। মুখিয়া মানুষের পক্ষে এটা বদনাম বইকি। তারপর থেকে আর কখনও বাবাকে নেশা গিলতে দেখেনি ফুলকলিয়া।

সেই রাতটা কীভাবে যাবে, মাতাল একটা লোকের পাশে শোয়া! এতোয়ারি কাদা মাখানো ধুতি জামা গেঞ্জি পটাপট খুলে লুঙ্গি পরে নিল। তারপর কেমন হেসে ডাকল বউকে। —দ্যাখ তো রী! হামার গায়ে কোথাও ঘা-ফোট নিকলাচ্ছে নাকি! ফুলকলিয়া পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বার দুই তিন ডাকলে যেতেই হল। এতোয়ারির মুখের হাসিটা করুণ। আর কী যেন ছটফটানি ভাব। —দ্যাখ রী! লম্ফ তুলে পিঠটা দ্যাখ। এতোয়ারি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। অগত্যা লম্ফ তুলে ফুলকলিয়া পিঠ দেখার ছলে হিসহিস করে উঠল। —তুমি মদ পিয়েছ জি?

—হাঁ। পিয়েছি তো তোরই বা কী তাতে, তোর বাবারই বা কী? পিয়েছি—হামি পিয়েছি। তোর বাবার কাছে তো হাত পাততে যাইনি। তোকে যা বলছি, সেই কর।

ফুলকলিয়া লম্ফ রেখে ফের হিসহিস করে উঠল। —মাতালের কাছে আমার নিদ হবে না। আমি শাসকে বলে দিচ্ছি, তোমার বেটা দারু পিয়েছে!

—ক্যা? দারু? ...এতোয়ারি হেসে উঠল। তারপর কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গান জুড়ে দিল। 'ঢালো ঢালো সঁইয়া, পিও পিও দারু, চমচমাচম চম...।' বাগানপাড়ার প্রসিদ্ধ গীত।

দাওয়ায় পাটকাঠির বেড়াঘেরা ঘুপটি জায়গাটা সরস্বতী বেটার ব্যাপার-স্যাপার দেখে ছোটীকে চিমটি কেটেছিল—ছোটী পরে সেটা বলেছে বহুদিদিরে। বুড়ি কিছু ধরতেই পারেনি। বহু বেটার মিলন হচ্ছে ভেবে তার নাকি প্রবল ছটফটানি।

ফুলকলিয়ার নাকে তখনও আঁচল ঢাকা। এতোয়ারিকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে দেখছিল। একি সেই ঝিমধরা চুপচাপ থাকা মানুষটা? দাঁত বের করে হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। তারপর আর কথা নেই। একটু পরে নাক ডাকতে লাগল। তখন উঠে দরজায় খিল দিয়ে ফুলকলিয়া বিছানা থেকে দূরে মেঝেয় একটা চট বিছিয়ে শুল। ফুঁ দিয়ে লম্ফ নিভিয়ে দিল। ঘরে উৎকট গন্ধ। নাকে আঁচল চাপা দিয়ে সে অন্ধকারে সেইরকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এতোয়ারির বিছানার দিকে তাকিয়ে রইল। নাক ডাকা থামলেই সে চমকে উঠছিল। এই বুঝি মাতাল লোকটা তাকে ডাকবে। কে বলতে পারে অন্ধকারে তার বুকে আচানক চেপে গলা টিপে ধরবে না! আতঙ্কে দুঃখে ফুলকলিয়া কী ভাবে রাতটা কাটাল, কেউ জানবে না। যদি জানে, সে ওই ঠাকুরবাবা আর তার দুই মেয়ে ভারিভুরি। ফুলকলিয়া সারারাত তাদের প্রতি করুণ প্রার্থনা করেছে। মেঘ সরে তখন আকাশে যে সব নক্ষত্র ঝিকমিক করছিল তাদের সবচেয়ে উজ্জ্বল তিনটি নক্ষত্র থেকে ঠাকুরবাবা, ভারি আর ভুরি ফুলকলিয়াকে দেখছিল—সে টের পেয়েছে।

ওদিকে নয়নসুখের ভাগ্নে রাতে বাড়ি ফেরেনি। নয়নসুখ বারোয়ারি লণ্ঠনটি জ্বেলে রাতদুপুরে এতোয়ারির বাড়ি এসেছিল। ডাকাডাকি করতেই সরস্বতী বেজার হয়ে বলেছে—এতোয়ারি এখন উঠবে না। পোঁহাতকালে এসে যা শুধোবার শুধিও। নয়নসুখ ক্রুদ্ধ হয়ে গজগজ করে গেছে। তার উৎকণ্ঠা ভাগ্নের জন্য নয়। আনাজখন্দ বেচা টাকাকড়ি সঙ্গে আছে। রোজই তো নয় ছয় করে আসছে। রোজই নাকি টাউন হয়ে বাড়ি ফিরছে। নিজের ছেলে হলে নয়নসুখ মেরে হাড় ভেঙে দিত। মারধর করলে লোকে বলবে ভাগ্নে তো? তাই সইতে পারছে না। বলবে নয়নসুখের কাঁধে ভারবাওয়া থেকে ছোঁড়াটা নিষ্কৃতি দিয়েছে। অথচ তার ওপর অত্যাচার! অতএব নয়নসুখের হাতমুখ বন্ধ—বিশেষ করে মুখিয়ার ডাকের লোক সে। বদনাম দিলেই হল। তার ওপর মুখিয়ারও বড় পক্ষপাত ওর ওপর। নয়নসুখ মরে গেলে হাটুয়া যে ডাকের লোক হবে, সবাই জানে। ওদিকে ঘাটোয়ারি চৌবেলালজি তো সেদিন সবার সামনে বলে গেলেন—ওকে আমার খুব পছন্দ সুতরাং হাটুয়ার কিছু গুণ আছে, অস্বীকার করার উপায় নেই।

নয়নসুখেরও সে-রাতে ঘুমটা বরবাদ। ভোরবেলা সে আবার হাজির হয়েছে। তখনও এতোয়ারি বেদম ঘুমোচ্ছে। ফুলকলিয়ার ওঠা অভ্যাস ঘোরানি থাকতেই। ছোটীকে সঙ্গে নিয়ে মাঠ সারতে যায়। তারপর দহের ঘাট থেকে মুখ ধুয়ে বাড়ি ফেরে। আজ ফুলকলিয়াও ঘুমোচ্ছে। অগত্যা নয়নসুখ সরস্বতীর কাছে বসল। সরস্বতী সারাদিনে বারতিনেক হুঁকো খায়। এখন তার হুঁকো খাবার সময়। আগুন পাবে কোথায়? নয়নসুখের কাছে মেচবাত্তি থাকবেই সে জানে। সে কারণে এক গাল হেসে বসতে বলেছে। ছোটী পিচুটিপড়া চোখে ঘরের দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর মাঝে-মাঝে কপাটের জোড়ে মুখ রেখে ডাকছে—বহুদিদি গে! ও বহুদিদি!

সরস্বতী দাওয়ার চুলোটা ধরাতে ব্যস্ত হয়েছে। উঠোনের জল শুকিয়েছে, কিন্তু কাদাভাবটি ঘোচেনি। বৃষ্টি জোর হয়ে গেছে বটে। উঠোনের চুলোর একটা ঝিক ধসে গেছে। শিরিসের ভাঙ্গা ডাল এসে পড়েছে একটুকরো। উঠোনময় ছেঁড়া পাতা আর ডালের টুকরো ছড়ানো রয়েছে। ছাগলটা মহানন্দে চিবুচ্ছে। ঝড়টাও জোর হয়েছিল। পাটকাঠির বেড়া কয়েক জায়গায় নেতিয়ে গেছে। এতোয়ারি উঠুক। আজ আর গাঁওয়ালে নয়, এসব কাজ তো আছেই, তার ওপর মাঠে যাওয়া আছে। পাশের সবজি ক্ষেতের অবস্থা এখনও সরস্বতী দেখে আসেনি। হুঁকো না খেয়ে সে বেরুচ্ছে না যত ক্ষতিই হোক।

—আমার দুতিনটে কলাগাছ ভেঙেছে। নয়নসুখ জানায়। বুড়ির কলকের দিকে তার দৃষ্টি। মাটির হুঁকো বকবক শব্দ করছে। তোবড়ানো গালে এতোয়ারির মা হুঁকো টানছে আর জাল ঠেলছে।

স্ত্রীলোকের হুঁকোয় তো মুখ দেওয়া যায় না। নয়নসুখ কলকে টানবে। —ওর এক মাচা করেলা ছিল, বহিন। মাথা মুচড়ে গেছে। অনেক কাজ পড়ে গেল।

—তোমার বেটিয়া আছে। এত ভাবনা কিসের গে?

—তা পার বলতে। নয়নসুখ হাসে। এতক্ষণ কোমরে আঁচল জড়িয়ে তিন বহিন কাজে লেগেছে বই কি?

—হাঁ গে নয়নসুখ দাদা! অঞ্চলার দুসরা বিভা লেগেছিল—সাচ না ঝুট?

নয়নসুখ গম্ভীর হয়ে যায়। —ছোড় দে রী বহিন! গাঁওকা কুত্তা যেইসা খামাকা চিল্লায়, এ হল তেইসা! অঞ্চলা তো কেঁদেকেটে খুন সেই থেকে। কিরে খেয়ে বলছে—আমাব বাবা বেঁচে আছে না বটতলায় গেছে? বাবা থাকতে বিভা নিজে ঠিক করব কাহে গে?

—হাঁ। আপনা জাত ছোড়কে।

সরস্বতীর অস্ফুট মন্তব্যে নয়নসুখ জ্বলে উঠে। কিন্তু ভাব গোপন করে এতোয়ারির দরজার দিকে তাকায়। —ছোটী, ডাক না মা। সূরযের ছটা দেখা যাচ্ছে। কেত্তা বেলা বেড়ে গেল!

বুড়ি এবার কলকে এগিয়ে দেয়।

—লো জি!

নয়নসুখ দু'হাতে ধরে বারকতক টেনে ফেরত দেয়। —হাঁ রী বহিন! এতোয়ারি রাতমে হাটুয়ার কথা কিছু বলেনি?

—নাঃ!

দরজা খুলে ফুলকলিয়া হাই তুলতে-তুলতে বেরোয়। মুখটা গম্ভীর। ছোটীর চোখের হাসিটা তার অশ্লীল লাগে। এতটুকু মেয়ে! ন্যাকামি দেখ না। নিঃশব্দে ছোটীর কাঁধ খামচে দাওয়া থেকে নামে। বেরিয়ে যায়। সরস্বতীর ঠোঁটে হাসি খেলা করে তাই দেখে। ফিসফিস করে বলে—তোমাকেই বলছি, দাদা। রাত থেকে বহু আর বেটা মিলে গেছে। আর নিষাদবাগওলারা কী বদনাম রটাবে? সবার মুখে বাসিচুলোর ছাই পড়ল কি না বলো।

নয়নসুখ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে উঠে যায় ঘরের দরজায়। তার আর ধৈর্য ধরে না। —এতোয়ারি! আই এতোয়ারি! বেটা, উঠ, উঠ যা। অনেক বেলা হয়ে গেল।

ডাকাডাকিতে সাড়া না পেয়ে নয়নসুখ ভেতরে ঢোকে। এতোয়ারির গায়ে হাত রেখে ঠেলে। আবার ডাকে।

—উঁ! কৌন বে?

—আমি নয়নসুখ রে এতোয়ারি বেটা!

—হাঁ।

—বেটা! হাটুয়া এখনও বাড়ি ফিরল না? কোথায় সে?

—উঁ? ..বলে এতোয়ারি হুড়মুড় করে উঠে বসে। একটু হাসে—যেন নয়নসুখকে দেখে লজ্জা পেয়েছে।

হাটুয়াকে কোথায় ছেড়ে এলি বেটা এতোয়ারি?

—হাটুয়া? এতোয়ারি একটু ভেবে নেয়। তারপর বলে—বৃষ্টির সময় লাটমন্দিরে ঢুকেছিলাম। হাটুয়া এল না। আমি চলে এলাম।

—লাটমন্দির টাউনমে?

—হাঁ জি।

নয়নসুখ একটু আশ্বস্ত হয়। আবার উদ্বিগ্নও। ভাগ্নের কাছে পায়সাকড়ি আছে। চোট্টারা মেরে দেয়নি তো? ওর যা ঘুম? আস্তে-আস্তে বেরিয়ে আসে সে।

বারোয়ারিতলার কাছাকাছি গিয়ে নয়নসুখ দেখে চঞ্চলা আসছে। —বাবা! বাবা! তোমার গুণের ভাগ্নে বাড়ি ফিরেছে!

নয়নসুখ বলে—তা তুই হাঁফাচ্ছিস কেন?

দশ-এগারো বছরের চঞ্চলা চোখ বড়ো করে বলে—হাটুয়া দাদা বাড়ি ঢুকেই জোর কান্নাকাটি করছে।

—কাহে? হুয়া ক্যা?

—যাকে পুছো না! ...নয়নসুখের পাশে-পাশে চঞ্চলা হাঁটে। নয়নসুখ হন্তদন্ত হয়ে যেন ছুটছে। চঞ্চলা ফের জানায় —ভার ঔর ঝুড়ি, তারাজু, উসকা জামা সব ছিনে লিয়েছে ডাকু।

—ক্যা?

—চলো না। উসকো মারভি দিয়েছে!

নয়নসুখ আর্তনাদ করে উঠে। —মেরেছে হাটুয়াকে?

—হাঁ। খুন নিকলেছে দো জায়গায়।

চঞ্চলা কনুইয়ের কাছে এবং কপাল দেখায়। নয়ানসুখ এবার দৌড়তে থাকে।

নিষাদবাগে—শুধু নিষাদবাগ কেন এ জেলায় ভাগীরথীর দু'ধারে যত চাঁই-সম্প্রদায়ের বসতি আছে, সবখানেই এমন ঘটনা নতুন কিছু নয়। ঠাকুরবাবার দুনিয়াটা হরেক আজব মানুষে ভরা। ভাল আছে, মন্দভি আছে। মন্দের গায়ের জোর সব সময় বেশি। হাট-বাজার বা গাঁওয়ালফেরা গরিব মানুষটির যা দু'পাঁচ টাকা সম্বল, একলা পেলে কেড়ে নেবার লোকের অভাব নেই। তাই পারতপক্ষে একাদোকা যেতে নেই। বোকা না হলে কেউ যাবেও না—কিংবা কোথাও অজানা জায়গায় রাত কাটাবেও না। ধনপতির মত লোক—কাটোয়া স্টেশনে একরাতে গুণ্ডা তাকে প্রায় ন্যাংটো করে ছেড়েছিল। ধনপতি আর জীবনে কাটোয়া-মুখো হয়নি কি সাধে? গত বছর জীবন্তীর মাঠে সন্ধ্যাবেলা পাঁচ-পাঁচজন নিষাদবাগওয়ালীকে তিনচারজন মন্দলোক ঘিরে ধরেছিল। কী সাহস! জানে না, এসব মেয়ে দরকার হলে বাঘিনী হয়ে ঘাড় মটকে খুন পিয়ে নেয়। কুমড়ো কাটার জন্যে হেঁসো ছিল মালতীর। একা মালতী ওদের ভাগিয়ে দিলো। শুধু ভাগিয়ে নয়, কাঁধে হাতে এলোপাথাড়ি কোপ বসিয়ে। তারপর কিছুদিন ওপথে সবাই যাওয়া বন্ধ করল। তখন জীবন্তীর হাট একেবারে কানা। এদের মধ্যে এই একজোট হবার ক্ষমতা এখনও ঠাকুরবাবার কৃপায় আছে। জীবন্তীর বাবুরা বাধ্য হয়ে পঞ্চগেবামী করলেন। মুখিয়ারা গেল। মিটমাট হল। চোট খাওয়া ডাকুদের ধরে ফেলতে অসুবিধে হল না। মণ্ডলার দশরথবাবুদের সামনে হাত-মুখ নেড়ে বলেছিল—আমাদের জন্য পাহারা বসাতে বলছিলেন বাবুমশাইরা। শুধু হুকুম দেন, রাস্তা আটকে দাঁড়ালে আমাদের ছোকড়া-ছোকড়ীরা হেঁসোর কোপ ঝাড়বে। তখন যেন উল্টে আমাদের জেল খাটাবার চেষ্টা করবেন না।

নয়ানসুখ বাড়ি ঢুকেই যেন সব জোর ফুরিয়ে ফেলল। দাওয়ায় হাটুয়া বসে আছে খালি গায়ে। কপালে একটু কাটা দাগ। মুখটা কালো। চোখদুটো লাল। মামাকে দেখেই হাঁউমাউ করে ওঠে সে। সে কী কান্না! অতবড় জোয়ান ছেলের হেঁড়ে গলার কান্না বিচ্ছিরি লাগে। নয়ানসুখ ধরা গলায় বলে—থাম, থাম্। চুপ যা বেটা। যা হবার হয়েছে—কেঁদে কী হবে এখন? কেত্তা পয়সা থা তেরা পাশ, তাই বল্।

—সাড়ে তিন রুপেয়া। এক আধুলি, তিন একটাকিয়া লোট।

—সব লে লিয়া?

—হাঁ।

—লাটমন্দিরমে?

—লাটমন্দিরমে। শালা এতোয়ারির জন্যে এমন হল গে মামা! ওই শালা বলল, এখানে শুত যা। রাস্তায় জলকাদা হবে। আঁধার ভি হবে। পৌহাতে উঠে চলে যাব।

—তারপর কিনা সরস্বতীয়ার বেটা চলে এল তোকে ফেলে?

—হাঁ। হাম তখন নিদমে শুত করে আছে। শালা ভাগ গেছে কখন!

নয়ানসুখের বড় মেয়ে অঞ্চলা মাচানের কাছ থেকে মন্তব্য করে—কৌন লিয়া, হাটুয়া তো দেখা নেহি গে! এতোয়াবিভি লিতে পারে।

হাটুয়া বলে—এতোয়ারি নেয় নি। বাজে কথা বলিস না রী দিদি!

—মার দেইলা তো পোঁহাতেমে!

—কৌন?

—লাটমন্দিরের লোক। বললে, তুই বেটা ছোটা জাত হয়ে এখানে শুয়ে আছিস কেন? খুব ঝামেলা বাধল। ছোট জাত বললে শুনব কেন, বলো না মামা?

—হুঁ। তব?

—শালারা মার দিল খামোকা। এই দেখ না।

—ভার ঝুড়ি, তোর জামা কেড়ে ভি লিলে?

—না জি। উও সব তো রাতমে চোরে লিয়ে পালিয়েছে!

নয়ানসুখ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—ছোড় দে বেটা! আর কভি টাউন হয়ে বাড়ি ফিরিস না। হাঁ রে! খাওয়া-দাওয়া?

হাটুয়া ফের কাঁদবার জন্যে প্রকাণ্ড হাঁ করতেই মেজবোন সঞ্চলা বলে—বাসি ভাত আছে। কলাইয়ের ছাতু আছে।

অঞ্চলা বলে—আগে নাহান করে আয় গে! কোন গুয়ে-মুতে শুয়েছিলিস!

তা আর বলতে? হাটুয়া উঠে পড়ে। বলে—জেরা তেল দে রী সঞ্চলা!

বেলা বাড়লে এতোয়ারি গেছে মাঠে। তিনকাঠা পাট, দুকাঠায় তিল আছে। বৃষ্টিতে রাতারাতি চেকনাই ফুটছে। মাঠ থেকে বাঁধে এসে দাঁড়িয়েছে। নিচে ওর পটলক্ষেত গঙ্গার ঢালু পাড়ে। এখন কদিন জল বওয়ার হাত থেকে ছাড়ান পেল। ক্ষেতের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে মড়ার মাথাটা খোঁজে সে। ঝড়ের চোটে বাঁশটা কাত হয়ে পড়ে গেছে। মাথাটা খুঁজে বের করে সে। বাঁশটা সোজা করে মাথাটা বসিয়ে দেয়। তারপর কাঁটার বেড়া গলিয়ে নিচে নেমে যায়। দহের জলে দু-হাত কচলে ধুয়ে কিছুক্ষণ উজ্জ্বল রোদে নিজের শরীর খুঁটিয়ে দেখে। জাংয়ে একটা ফুস্কুড়ি দেখেই সে শিউরে ওঠে। বারবার নখে চেপাচিপি করে। শরীরের ভেতরটা হিম হয়ে গেছে যেন। জাংদুটো ওজনদার হয়ে গেছে। সে সন্দেহাকুল দৃষ্টে ফুস্কুড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চাহনি ভয়ার্ত। একটু পরে ফোঁস-ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে-ফেলতে সে দহের কিনারা দিয়ে গাঁয়ের দিকে হাঁটতে থাকে। সামনে ঘাট। ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে। থালা-হাঁড়ি মাজছে। কলকলাচ্ছে পাখির ঝাঁকের মতো। ঘাট এড়িয়ে সে ওপরে উঠে যায়। ভরতের বেগুনক্ষেত আর ধনপতির কুমড়ো খেতের মাঝামাঝি সরু আলে গিয়ে চোখ পড়ে একটু তফাতে হিজলগাছের দিকে। ঝড়ে একটা ডাল ভেঙে ঝুলছে। সেই ডাল ধরে হনুমানের মতো লাফাচ্ছে নয়নসুখের বেটি অঞ্চলা। এতোয়ারি ফুস্কুড়ির কথা ভুলে আনমনা হয়। বাগানপাড়ায় না গেলেও তার চলত। অঞ্চলার সঙ্গে ভাব জমালেই ভাল ছিল। শরীরের ক্ষিদে মিটানো নিয়ে কথা! হুঁ—কাচ্চাবাচ্চা পেটে আসার একটা ঝামেলা আছে। এলে আসত। বরং অঞ্চলাকে বিভা করে নিত। দুই বহু থাকতো ঘরে। আপসোসে এতোয়ারির বুকে দুখ বাজে।

—এতোয়ারিদা! ও এতোয়ারিদা!

অঞ্চলা দেখতে পেয়ে ডাকছে। ওর তো এত লজ্জাশরম নেই—এই যা খারাপ লাগে। এতোয়ারি তামাশা করে বলে—হনুমানের মতো গাছে উঠেছিস কেন রী?

—এ দাদা! ডালঠো নিচেমে টেনে ধর না দাদা! আয় দাদা গে!

এতোয়ারি অগত্যা যায়। অঞ্চলা ওপরে, সে নিচে। বেহায়া মেয়েটা কাপড় সামলায় না তলায় লোক দেখেও। এতোয়ারির তাই বলে লজ্জাশরম আছে সে তাকায় না ওপর দিকে। অঞ্চলা পায়ের চাপ দিতে থাকে। সে ডালটা ধরে জোরে হ্যাঁচকা টান মারতেই ভেঙে পড়ে। অঞ্চলা কাঠবেড়ালির মত নেমে আসে। তারপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখ নাচিয়ে বলে—কাল রাতে হাটুয়াকে ফেলে এসেছিলে কোথা গে?

—লাটমন্দিরে। ওর যা নিদ। ডাকলাম—উঠল না।

—এসে জোব বেঁচে গেছ! হাঁটুয়ার সবকুছ কেড়ে লিয়েছে ডাকুরা। পৌঁহাতে লাটমন্দিরওয়ালা ওকে মার ভি দিয়েছে!

—এ্যয়সা?

—হাঁ। তো হাটুয়া তোমার ওপর খুব রেগেছে!

—কাহে?

অঞ্চলা চোখ নাচিয়ে কেমন হাসে। —উও বাত ছোড়। কাল রাতমে বহুকী পাশ শুত্ করেছ। তাই না গে? খুউব মজা উড়ায়া! খু-উব ফায়দা উঠায়া শ্বশুরের বেটির ওপর।

—ভাগ রী!

—হাঁ, হাঁ সবাই শুনেছে। তো বাতাও, ..

—কী বাতাব?

—ক্যায়সা হুয়া?

—কী হবে? অঞ্চলা, তুই খুব ফাজিল মেয়ে রী! ...এতোয়ারি বিরক্ত হয়ে পা বাড়ায়। তোর ভকতরামেব সঙ্গে বিভা হচ্ছে না কেন? হলে সেই ভাল ছিল।

—কা বোলা? শুনো—শুনো! কা বোলা?

এতোয়ারি একটু ঘাবড়ে যায়। হাসবাব চেষ্টা করে বলে—হামি আপনা কানসে শুনেছে। বহুত দিন আগে ওইখানটায় শরতদার বহুর সঙ্গে তোমার বাত হচ্ছিল। বোলো, হাম ঝুট বলছে?

শরতের বউয়ের নামে অশ্লীল গাল দিয়ে অঞ্চলা চোখ মোছে। এতোয়ারি অবাক। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। অঞ্চলা ফুঁসতে-ফুঁসতে বলে—নির্মলার চুল পাকড়ে হামি মার লাগাব, দেখে লিও। ও হামাকে লোভ দেখায়। গহনা দেখায়। ভকতরাম না ঘোড়ারামের মুখে হামি...আবার অশ্লীল কথা বলে ওঠে অঞ্চলা।

এতোয়ারি হাসতে-হাসতে বলে—আমি ভাবতাম, তোমার ভি সায় আছে।

অঞ্চলা হিস্‌হিস করে বলে—না। তারপর দ্রুত এদিক-ওদিক তাকিয়ে নেয়। ফিসফিস করে বলে—সাঁঝমে শিমুলতলায় আসতে পারবে এতোয়ারিদাদা?

—কাহে?

—তোমাকে একহি বাত বলব। জরুরি বাত।

—আভি বোলো।

—না জি। বাত অনেক লম্বা। সময় লাগবে তো এতোয়ারিদাদা!

এতোয়ারি একটু ভেবে বলে—আচ্ছা। তারপব তক্ষুণি হনহন করে চলে যায় বাঁধের দিকে। আর পিছু ফেরে না। একবারও। বাঁধে গিয়ে দেখে, উত্তরে বাঁধের নিচে গাঁয়ের বারোয়ারিতলায় ঘাটোয়ারিবাবু দাঁড়িয়ে আছে। সাইকেলও আছে সঙ্গে। গাঁওবালাদের ভিড় জমেছে। বৃষ্টি হয়ে গেছে। চৌবেলালজি না এসে পারে? এতোয়ারির বিয়ের সময ধার ছিল তিরিশ টাকা। ইদানীং আরো ধার হয়েছে তিরিশ টাকা। তার মানে তিনকুড়ি। তার ওপর দেড়কুড়ি সুদ না দিয়ে পার নেই। এতোয়ারি বাঁধের ধারে ঝোপের আড়াল দিয়ে পুবের মাঠে নামে।

পুব-উত্তর কোণে আমবাগানের দিকে হেঁটে যায় সে। ল্যাংড়া রঘুয়ার সঙ্গে দেখা করার মতলব আছে। আজ পৌঁহাতকালে নয়নসুখ গিয়ে তাকে ওঠাবার পরই আচানক ল্যাংড়া রঘুয়ার কথা মাথায় এসেছিল। এ তো আর জ্বর-জ্বারি সর্দি-'খাসি' ডাগদারি বেমারী নয়। এ এক আজীব কারবার। কাহে আজীব? না—এ তোমার খারাপ কাজের জন্যে ঠাকুরবাবার জবিমানা। তুমি অজান-অচিন ভিনজাতের সঙ্গে 'আঙে আঙ' (অঙ্গে অঙ্গ) মিশিয়ে খেল করেছ। এ খেল বহুৎ বুরা খেল। নিষিদ্ধ খেলা। আর শুধু ঠাকুরবাবা কেন, ভারিভুরিও খুব রেগে গেছে। কাল রাতে গাঁয়ে ঢোকার মুখে গঙ্গার ধারে ঢ্যাঙা শিমুল গাছটা থেকে জোড়া পেঁচার ডাক শুনতে পেয়েছিল না এতোয়ারি? এতোয়ারি ভোলেনি, তার

যখন বিয়ের কথা বলতে মা, নয়নসুখ, ভরত আর কানাইয়া ওপারে কলাবেড়িয়া গিয়েছিল, একপহর রাততক ফিরল না দেখে সে শিমুলতলায় গিয়ে দাঁড়াতেই জোড়া পাঁচার ডাক শুনেছিল। এসবের মানে ল্যাংড়া ওস্তাদ ছাড়া আর কে বলতে পারবে? তারপর ধনপতির বেটির বিভার রাতে শুয়োরের স্বপ্ন। স্বপ্নের কথাটা ভেতরে চাপা ছিল এতদিন। সেদিন শ্বশুর নদীর মাঝবরাবর এসে বাড়ি ঢুকে যা করে গেছে, তাতে স্বপ্নের ব্যাপারটা অবিকল ফলে গেল! মানাবরই সেই স্বপ্নের শুয়োর।

ল্যাংড়া ওস্তাদের কাছে এসব ছুপা কথা মন খুলে বলতেই হবে। তবে ঘা হওয়াটা রুখতে হলে বাগানপাড়ার কথাটাও যে বলতে হবে! এতোয়ারি মুষড়ে পড়ে। রঘুয়ার চোখের সামনে মিছে কথা বলা অসম্ভব। সব ধরে ফেলবে। এতোয়ারির শরীর অবশ লাগে। জাং-দুটো আবার ভারি লাগে। আমবাগানটা পেরিয়ে যেতে যেতে এতোয়ারি এত বেখেয়াল হয় যে পায়ের কাছে একটা পাকা আম সে দেখতেও পায় না। শুধু পায়ের কাছে কেন, কালকের ঝড়ে বাগানের আম পড়েছিল অনেক, আর সব আম কুড়োন হয়নি এখনও। এখানে-ওখানে পড়ে আছে। বাগানটার মালিক ভরত। আমগুলোর ওপর টাকা খেয়েছে শরতের। শরত নিজেও ছোট-খাট দাদন দেয় আজকাল। এতোয়ারি অন্য সময় হলে চেঁচিয়ে নির্মলাকে ডাকত। এখন হুঁস নেই। বাগানের পর নিচু ভুট্টার ক্ষেতের আল দিয়ে জঙ্গলে ঢোকে সে। ঘন জঙ্গল বটে! বেত আশশেওড়া কেয়া কুল বৈঁচির জটপাকানো অবস্থা। তার মধ্যে সব হিজল ভাঁড়ুলে আর কামরাঙা গাছ। একসময় বাঘ ডাকত নিষাদবাগের জঙ্গলে। সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একফালি হাঁটা পথ। তার শেষে 'হাড় মুটমুটির' নালা। এক প্রেতিনী থাকে ওখানে—চলতে যার পায়ের হাড় মুট মুট করে করে আওয়াজ দেয়। নালার ওপারে ল্যাংড়া রঘুয়ার বাড়ি। গাঁয়ের পথে এলে তো রশিভর রাস্তা। চৌবেলালজি এতখানি ঘুরিয়ে মারলেন বেচারা এতোয়ারিকে।

ছেলেবেলা থেকেই এই বাড়িটার প্রতি এতোয়ারির ভয়-চমক আছে। কার বা নেই? রঘুয়া সন্ধ্যাবেলা উঠোনে বসে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে হাড় মুটমুটি প্রেতনীর সঙ্গে গপসপ করে, সবাই দেখেছে। বর্ষায় যখন এই নালা দিয়ে ভাগীরথীর জল ঢোকে, গাঁয়ের উত্তরে শহর থেকে আসা বাঁধের সাঁকোতে জাল ফেলে মাছ ধরে জেলেরা। তারা ভিন গাঁয়ের লোক। সরকারের কাছে ইজারা নেয়। কিন্তু যা মাছ ধরার, দিনেই ধরে। রাতের সব মাছ হাড় মুটমুটি নিয়ে পালায়। পুবের বিলে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসে মচমচ করে কাঁটাসুদ্ধ খায়। আর যাবার সময় রঘুয়াকে তো দুচারটে ছুঁড়ে দিয়ে যাবেই। এখন খাল বিলকুল শুখা। কালকের এত বৃষ্টি কোথায় গেল কে জানে! শুধু গরু-মোষের পাওটে খাবলা-খাবলা জল জমে আছে। শরতের মা যমুনাকানী খালের ওপর দিকে ছাগলের খুঁটি পুঁতছে। কানী হয়েও এ ক্ষমতা তার আছে। আরও আছে ভাইপো রঘুয়ার মত কিছু অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার। যত ছুপা হয়ে যাও, সে টের পেয়ে যাবে। এতোয়ারি খাল পেরিয়ে পাড়ে উঠতেই আওয়াজ দেয় বুড়ি—কৌন গে?

—হামি এতোয়ারি, পিসি।

—হাঁ। সরস্বতীয়ার বেটা তুই।

—রঘুয়াদাদার কাছে যাচ্ছি, পিসি।

বুড়ির মুখ ফেড়ে লম্বাটে হাসি রোদ্দুরে ঝকমক করে বেরিয়ে পড়ে। —হাঁ। কাল তেরা মা এসেছিল। পরশুভি এসেছিল। তার আগেও ভি এসেছিল। যা যা। রঘুয়া ঘরমে বৈঠা আছে।

—হাস গেইলা কাহে গে পিসি?

—এক বাত শুন বেটা। হাম্মার কাছে আয়। আয়, আয়।

এতোয়ারি অবাক হয়ে কাছে যায়। —বোলো পিসি।

—বেটা, তুই বুদ্ধ আছিস না কী আছিস?

—কাহে গে?

—বহু কাছ-লাগড়া করতে কি মন্তর লাগে, না তাবিজ লাগে, না জড়-বুট-অক্কড়-মক্কড় লাগে? ক্যায়সা মরদ হি তু? ক্যায়সা তেরা জোরভি? ছোঃ! ছোঃ!

বুড়ির মুখটা কুচ্ছিত দেখায়। সে থুথু ফেলে দুবার। এতোয়ারি বেগে গুম। সেই সময় ঝোপের ওধার থেকে ল্যাংড়ার মুণ্ডু উঁকি মারে। —আরে এতোয়ারি। ওখানে কী করছিস? এখানে চলে আয়

বুডবাক কাঁহেকা! আর পিসি! তোকে সাফ মানা কবে দিচ্ছি, হামার কাছে কেউ এলে কখনো তাকে বুরা বাত বলবিনে, হাঁ!

যমুনাবুড়ি কাঁচুমাচু মুখে বলে—ও গে না, না! হামি কুছ বলিনি। পুছ করছিলাম কী...

—পুছ করবি না।

—করব না?

—না।

—বেশ। করব না...অভিমানে বুড়ি হেঁট হয়ে খুঁটিতে দুরমুষ ঠুকতে থাকে।

খালের ধারে আওয়াজটা প্রতিধ্বনি তোলে খট খট খট খট। রঘুয়ার মুণ্ডুতেই দুরমুষ ঠুকছে, এতোয়ারির এমন লাগে।

বাড়িটা গাঁয়ের একটেরে। ধারে কাছে আর কোন বাড়ি নেই। ক্ষেত আর জঙ্গল চারদিকে। উঠোনে একটা মস্তো গাবগাছ আছে। তার ডগায় একফালি লাল কাপড় উড়ছে। ল্যাংড়া ওস্তাদের নিশান। যদি পুছো, তুমি তো ঠ্যাং কাটা মানুষ, কে টাঙাল ওটা? রঘুয়া গম্ভীর হয়ে জবাব দেবে—তালবেতাল। ওর হাতে জোড়া প্রেত আছে—তাল, ঔর বেতাল। তবে ঘরদোর বেশ ঝকমকে তকতকে রঘুয়ার। পিসি কুঁড়ের হদ্দ। এতোয়ারি গিয়ে দেখে, ওস্তাদ পাছা ঘষ্‌টে-ঘষ্‌টে এতক্ষণ দাওয়া নিকোচ্ছিল। মেয়েদের মতো এ সব কাজে সে পটু। উঠোনে কুটো পড়লে নজরে আসবে! দেয়ালে সাদা লাল নীল হলুদ, কত রঙের আজীব নকশা এঁকেছে। ওসব তার তন্তরের ব্যাপার। দেখতে ছবির মতো সুন্দর। নিচু চালটা মোলায়েম কাশখড়ের। এ খরাতেই ছাউনি দেওয়া হয়েছে। মন্ডলার দশরথ ছ'পণ কাশখড় উপহার দিয়েছিল। বাড়ুই—যে চাল ছেয়ে দেয়, সে কবলহাটির জাফর। রঘুয়ার কাছে সে ছোকরা মন্তর শিখছে। ফুঁ দিয়ে দুধ নীল করাটা সে শিখে নিয়েছে। তো রঘুয়া ওস্তাদের সবতাতেই ওস্তাদী হাতের ছাপ রয়েছে। পাশে কুল গাছের গা ঘেঁষে চালা আর গোয়ালঘরও দেখার মত। পাটকাঠির বেড়ার দেয়াল। তাতে মাটির লেপন দিয়ে মানুষ থাকার মত চমৎকার করে তুলেছে। তবে গাইগরুটা মারা গেছে। নালার ওপারে জঙ্গলে সাপে ছুঁয়ে দিয়েছিল। পোয়াতি ছিল গাইটা। তালবেতাল বাঁচাতে পারেনি। থাক গে, সে অনেক ছুপা কাণ্ডকারখানা। অলৌকিককে সবসময় বাগ মানাতে পারলে মানুষ তো দেওতা হয়ে যেত। তবে শরতের দেওয়া দুসরা ছাগলটা একা গোয়াল দখল করেছে।

রঘুয়া ঝটপট হাত ধুয়ে বলে—বইঠ্‌।

গাবগাছের ছায়ায় বসে পড়ে এতোয়ারি। ফুস্কুড়িতে আর কিসের ডর? সাহস রক্তে চনমন করে উঠেছে তার। তালপাতার চাটাই পেতে ছায়ার আরাম গায়ে সে আফসোসের ভঙ্গিতে বলে—সিগারেট ছিল জি ওস্তাদ! ঘরমে ফেলে এসেছি। পকিটমে।

—হামি তোকে সিগারেট খাওয়াচ্ছি। বোস্‌ না বে। রঘুয়া রান্নাশাল থেকে হাসিমুখে জানায়। ওর ক্ষমতা আছে বটে। গামছার খুঁটে এনামেলের ছোট্ট হাঁড়ি নামাচ্ছে। আরে ব্বাস। কয়লার চুলা যে! পেতলের ঘটিতে দুধ। দুধ চুলায় চড়িয়ে রঘুয়া বলে—ইনজিলকা বয়লার বে এতোয়ারি!

—হাঁ কৈলা!

—হাঁ। শরতের বাড়ি থেকে লিয়ে আসি। শরতের কয়লার চুলা, তুই জানিস না?

ঘাড় নাড়ে এতোয়ারি। সে গাঁয়ের খবর রাখবে কখন? ভোরে বেরোয়, ফেরে রাতে। তাছাড়া কোন সাত-পাঁচ খবরদারিতে কান দেওয়ার অভ্যেস তো তার নেই। একটু পরে সে আবার বলে—বেফায়দা পয়সা খরচ কৈলামে। এত্তা জ্বালানি থাকতে কৈলা কাহে জি?

রঘুয়া খ্যাক খ্যাক করে হাসে। —আভি সমঝে গেলাম কেন তোর বহু বশ হয় না। আবে এতোয়ারি, শুনি তুই বহুৎ টাউনবাজ হয়েছিস। এ্যাঁ? তো টাউনে গিয়ে কী শিখলি?

এতোয়ারি গোমড়ামুখে বলে—হামি আর টাউনে যাব না জি।

—কাহে?

এতোয়ারি চুপ। মুখ নামিয়ে পায়ের আঙুল খোঁটে।

—কাহে। রে?

তারপরই রঘুয়া হা হা হা হা করে তার প্রসিদ্ধ ভুতুড়ে হাসিটা হাসে। এতোয়ারির বুক কাঁপে। এই হাসির সময় রঘুয়া একেবারে বদলে যায়। তরাস লাগে ওকে দেখে। এতোয়ারি তাকিয়েই মুখ নামায় ফের।

রঘুয়া হাসি থামিয়ে ডাকে—এ্যাই এতোয়ারি! চা লিয়ে যা। চা পিয়ে তারপর থানে বসব। আয় ধর। বহুৎ গরম আছে। যেন হাত পোড়াস না!

গাবতলায় একটা মাটির বেদি। তার ওপর ত্রিশূলের ডগায় মড়ার মাথা। সিঁদুরে দগদগে মাথাটা। বেদিটা একটু আগে নিকিয়েছে। ওখানে একটুকরো ছেঁড়া কম্বল পেতে রঘুয়া বসলেই ভর উঠবে। সব ছুপা কথা সাফ-সাফ বলে দেবে। এতোয়ারি চা খাবে কী, দ্বিধায় পড়ে যায়। সে আড়চোখে বেদি, মড়ার মাথা তারপর রঘুয়াকে দেখতে থাকে। রঘুয়া গোঁফ ভিজিয়ে চা খাচ্ছে। জটা নড়ছে। খোঁচা-খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়িতে মুখটা কী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। শেষঅব্দি এতোয়ারি মন ঠিক করে ফেলে। গোপন কথাগুলো বলবে। ফুস্কুড়িটা দেখাবে। কলাবেড়িয়া মেয়েটার দিকে তার কিছুতেই টান বাজছে না—সেই বাসরের রাত থেকেই ওকে তার কেন পছন্দ হচ্ছে না এসবের কারণ জেনে নেবে। ওই সুরতওয়ালীর গায়ে গা দিলেই সে কেমন বরফের মত ঠাণ্ডা বনে যায়? মড়ার মত লাগে শরীরটা। খালি মনে হয়, ও তাকে ঠকাচ্ছে। এতোয়ারি যেন ওর কাছে তামাশা—যেন খেলনা। এতোয়ারি যে পুরুষ—জোয়ান মরদ, ও যেন তা মানেই না। তাই এতোয়ারির মনেও টান বাজছে না। এই তো? এতোয়ারি মনে-মনে ভেবে বলে—হাঁ এহি বাত।..

সবে রঘুয়া চা শেষ করেছে, এতোয়ারির তখন ও আধ গেলাস, ছোটীর ডাক শোনা যায় কোথায়। ওর যা আওয়াজ! চেরা গলায় দাদাকে ডাকছে। রেলের ইনজিল। —দাদা। দা-আ-দা!

এতোয়ারি ঝটপট উঠে দাঁড়ায়! ডাকবার আর সময় পেল না! কিন্তু ওই ডাকে কী খবর আছে যেন। এতোয়ারি উঠোনের ধারে গিয়ে সাড়া দেয়—এই ছোটী! ছোটী রী!

তিনচারটে জমির ওধারে বাঁধে দাঁড়িয়ে ছোটী চেঁচাচ্ছে—দা-আ-দা! দাদার সাড়া পেয়ে পটল বেগুন কুমড়োর ক্ষেত ডিঙিয়ে চলে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—ও দাদা! দাদাগে! জলদি ঘর চল। বহুদিদি ভেগেছে! বহুদিদি সুটকেস লেকে ভেগেছে গে!

মেয়েটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। রঘুয়া হতভম্ব। এতোয়ারি ভাঙাগলায় খামোকা শুধোয়—ক্যা?

হুঁঃ, কলাবেড়িয়ার বেটি ভেগেছে তো কী হয়েছে! এর জন্যে বুক চাপড়ে কাঁদার কী আছে, এতোয়ারি যেন বুঝতে পারে না। মায়ের দিকে তেড়ে যায় সে। ছোটীকে থাপ্পড় তোলে। উঠোনে গাঁওবালাদের ভিড় হটিয়ে বলে—কিছু হয়নি। যে-যার কামে যাও না গে!

আর এদিনই কিনা ঘাটোয়ারিবাবু আসবার সময় হল! গাঁওবালারা যাবে কোনদিকে? এতোয়ারির খবর নিতে আসবে, না চৌবেলালজির সঙ্গে ঘুরবে? এদিন নিষাদবাগ ছেড়ে কেউ গাঁওয়ালে যায়নি। বৃষ্টি হয়েছে। ঝড়ে সবজির বাগান তছনছ হয়েছে। বেলা যত বেড়েছে, চারদিকে তত লোক। চৌবেলালজি মাঠ ঘুরতে গেছেন। খুশি হয়ে আবার গাঁয়ে ফিরেছেন। ধনপতির বাড়িতে চা খেয়েছেন। তারপর এতোয়ারির দরজায় সাইকেলের ঘণ্টি বাজল। এতোয়ারি কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে হাসিমুখে বেরোয়। চৌবেলালজি জিভে চুকচুক আওয়াজ দিয়ে বলেন—এ ক্যায়সা বাত রে এতোয়ারি? মোড়লের বেটির পাখা গজাল কেমন করে? রাতে মারধোর করেছিলি নাকি?

এতোয়ারি গম্ভীর হয়ে বলে—উসকী বাত ছোড় দো বাবু! যদি রুপেয়ার কথা তোলো, বলব—সামনে সপ্তায় গোকরণ হাট থেকে ফেরার পথে দেখা করব।

চৌবেলালজি স্তম্ভিত। রাগ চেপে বলেন—আমাকে কী ভাবলি বে? আমি টাকার জন্যে তোর দুয়ারে এলাম? ঠিক আছে। যখন ভাবলি টাকার কথা তুলতে এলাম, তখন তাই।

সরস্বতী বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছিল। ছুটে বেরিয়ে হাউমাউ করে বলে—এ বাবু! এ লালজি! ওরে

আমার জানের বেটা! ওর মাথা বিগড়ে গিয়েছে। ওর কথায় কান দিস্ না বাবা! আমি যা বলছি, তাই শোন্। লহরওয়ালী পটওয়ালী ঢপওয়ালীর কাণ্ডটা শোন্। চুট্টিনের বদমাইসির কথা শোন্।..

এরপর বুড়ি পাঁচমুখে একশো কথায় ঘটনাটা বলতে থাকে। মাথামুণ্ড কিছু বোঝা যায় না। চৌবেলালজির মুখে অবশ্য হাসি ফোটে। শেষমেশ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—হাঁ গে হাঁ। সব বুঝেছি। তো আমার কথা শোন্। মানাবরকে পুছ করে দেখি, এতোয়ারি গিয়ে তার বউকে আনবে, নাকি সে নিজে বেটিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রেখে যাবে।

এতোয়ারি প্রতিবাদ করে—আমি যাব? সূরয উধার উঠবে। সে আঙুল তুলে পশ্চিমের আকাশ দেখায়।

চৌবেলালজি হো-হো করে হাসেন। —তুই এত্তা রাগী ছিলিস না তো এতোয়ারি। আজকাল খুব মেজাজি হয়েছিস দেখছি।

সরস্বতী যুক্তি দেখায়।—মেজাজ হবে না জি? উন্নিশ ভরি গয়না গায়ে ছিল ঃ সব নিয়ে ভেগেছে বাপের বেটি যদি গেল ওগুলো রেখে তো গেল না। চুট্টিন! ডাহিন! ঝুটবাজ!

চৌবেলালজি থামিয়ে দেন আবার। —চুপ রী, চুপ্। আমি এতোয়ারির শ্বশুরকে বলব। তুই কিছু ভাবিস না। ও বেটি যদি নিষাদবাগের ভাত না খায়, জোর করার কী আছে? হাঁ—গহনা ফেরত দিতে হবে। এতোয়ারির দুসরা বিভার খরচ ভি দিতে হবে।

এতোয়ারি বাঁকা মুখে বলে—ছোড় জি! ফির্ বিভা?

এই সময় ধনপতি এল। নয়ানসুখও এল। অমনি সরস্বতী তাদের নিয়ে পড়ল—গাঁওপতির বুঝি এতক্ষণে নিদ টুটল? সেই পোঁহাতকাল থেকে এত হইচই হচ্ছে, কানে কি কালা হয়ে গেছে ধনপতিয়া? কেমন মোড়ল হয়েছে যে গাঁ থেকে ভিন গাঁয়ের বেটি ভেগে যায়? গেছে যদি, এখনও কোন বিহিতই বা করছে না কেন?

ধনপতি বিব্রত। নয়নসুখ তার প্রতিনিধি। সেই বলে—এই তো এসেছে গে! না এসে পারে? গাঁয়ের ইজ্জত নিয়ে কাণ্ড। নিষাদবাগওলা তো বুড়বাক নয়। এটা যে অপমান, সে কথা বোঝার বুদ্ধি আমাদের আছে।

ধনপতি সায় দিয়ে বলে—জরুর। তবে আগে এতোয়ারিকেই যেতে হবে। যদি বহু না আসে, তখন আমরা যাব। কী বলেন চৌবেলালজি?

চৌবেলালজি বলেন—ঠিক ঠিক। মুখিয়ার মত কথা।

সরস্বতী আশ্বস্ত হয়েছে। ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে মুখগুলো দেখছে। তারপর ঘরে আচমকা চিলচিৎকার করে উঠে বেটার দিকে আঙুল তুলে বলে—এ বুদ্ধু ভড়ুয়াকে আর কী বলব গে? নিজের বহুকে বাগ মানাতে পারল না! ও আমার বেটি না বেটা গে? একটুও শরম হয় না গে ওর?

এতোয়ারি পাল্টা চেঁচায়—এ্যাই বুঢ়িয়া! তুই থামবি?

সরস্বতী দশের সাহসে চড তুলে এগোয় ছেলের দিকে। নয়ানসুখ সামনে দাঁড়িয়ে বলে—বহিন! চুপ যা। এতোয়ারির কোন দোষ নেই। কলাবেড়িয়ার মেয়েরা বরাবর এমনি। চাঁদের বহু ঠিক এমনি করে ভেগেছিল, মনে পড়ছে না? সেই থেকে আমরা তো ঠিক করেছিলাম কখনও ও গাঁয়ের বেটি আনব না, লেকিন তোমার কথায় আবার যেতে হল। তো, তখনই আমার মনে হয়েছিল, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। মুখিয়া জি! সন্ধ্যাবেলা নদীর মাঝ বরাবর এসে তোমাকে বলিনি কথাটা? বলিনি, এ বেটি এতোয়ারির ভাত খাবে না? তুমি রেগে গেলে তাই শুনে।

এসব কথার কোন শেষ নেই। ছাতিমগাছের ছায়াটা সরতে-সরতে এতোয়ারির দরজার সামনে কড়া রোদ এসে গেছে। চৌবেলালজির টাক ফুটে ঘামের ফোঁটা নিকলেছে। ধনপতি গাছতলায় সরে গেছে। নয়ানসুখ খইনি ডলছে আর বকবক করে যাচ্ছে। সরস্বতীও থেমে নেই। এতোয়ারি বাড়ি ঢুকেছে একসময়। নিষাদবাগের দুপুরের রান্না শুরু হয়েছে। ছাতিমতলায় ক্রমে আড্ডা জমে উঠছে। দু'একজন করে এসে হাজির হচ্ছে আর আপন আপন মতামত জানাচ্ছে। চৌবেলালজি যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণ এরকম হবেই। এতোয়ারি বহুর কথাটা কোথায় তলিয়ে যায় এবার।

এতোয়ারি ঘরে ঢুকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। ঘরটা এত ফাঁকা লাগছে কেন গে? ওইখানে বাঁশের বাতা দিয়ে বানানো বেঞ্চিমতো জায়গায় নীল রঙের ঝকমকে সুটকেসটা ছিল। এখন নেই। এতোয়ারির বিয়ের ধুতি আর জামাটা পড়ে অছে নিচে। বেঞ্চিটার তলায় আলু, পেঁয়াজ আর বালির মধ্যে আদা রাখা আছে। সেখানে একটা চুলের কাঁটা গিরে গেছে। কাঁটাটার দিকে তাকিয়ে এতোয়ারির চমক লেগেছে।

দড়িতে এতোয়ারির জাঙ্গিয়া, ছেঁড়া লুঙ্গি আর গামছা ঝুলছে। আর একটাও শাড়ি নেই। তার তলায় কাঠের সিন্দুক। সিন্দুকের ওপর সিঁদুরের দাগ জ্বলজ্বল করছে। সিন্দুকের ওপর দিকে তাক। তাকে আয়না কাঁখই আছে। হিমানীর কৌটোটা নেই। চুলের ফিতে নেই। আলতার শিশিও নেই। কী ভয়ঙ্কর শূন্যতা ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে পালাল মান্যবরের বেটি! এতোয়ারি নিষ্পলক চোখে সব খুঁটিয়ে দেখে। যেখানে যাক, যা কিছু করুক মনের তলায় ছিল এই ঘরখানা। মেয়েলি জিনিসে ভরা, একটুকরো শক্তমাটির মতো। শেষ আশ্রয়ের মতো। সেই ঘরটা এখন আর ঘর বলেই মনে হচ্ছে না। ঘরে ঢুকেই পেত একটা আবছা মেয়েলি ঘ্রাণ। চুল আঁচড়াতে গিয়ে চিরুনিতে নাক ঠেকিয়ে শুঁকত এতোয়ারি। অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। আর কি পাবে?

ছোটী দাওয়ার উনুনে ভাত চড়িয়ে জ্বাল ঠেলছে। দুচোখের তলায় কালি পড়ে গেছে। খুব কেঁদেছে মেয়েটা। এখনও চোখ মুছছে হাঁটুতে। ওগো বহু দিদি গে! বুক ফাটা কান্না কেঁদে এখন মেয়েটা ক্লান্ত। কলাবেড়িয়াওয়ালী এ কী করে গেল!

এতোয়ারি মাদুর টেনে শুয়ে পড়ে। সিগারেট ধরায়। চোখ বুজে টানতে থাকে।...

কতক্ষণ পরে হাড় মটমটানি শুনে সে টের পায় হাটুয়া এল এতক্ষণে। কিন্তু চোখ খোলে না। হাটুয়া ঘরে ঢুকে তার পাশে বসে পড়ে—এতোয়ারি!

—উঁ?

—যা বলেছিলাম, হল তো বে?

এতোয়ারি জবাব দেয় না। হাটুয়া খিকখিক করে হাসে। তারপর হাত বাড়িয়ে এতোয়ারির সিগারেটটা কেড়ে নেয়। এতোয়ারি বাধা দেয় না। টানতে-টানতে হাটুয়া বলে—ঠিক হয়েছে, বউ পালিয়েছে, শালা! কাল রাতে তুই আমাকে ফেলে পালিয়ে এলি। তার ফল!

—ভাগ বে! এতোয়ারি তেতোমুখে বলে। শুতবার জায়গা পেলি না, লাটমন্দিরে শুলি! বেশ করেছে, মেরেছে!

হাটুয়া আবার হেসে ওঠে। —কোন মারবে বে? কোন শালার এত ক্ষমতা?

—থাম। মাথা তো ফাটিয়ে দিয়েছে!

—নাঃ!

—নাঃ? এতোয়ারি কনুই-ভর দিয়ে ওর দিকে তাকায়।

—চুপ বে। কাল নয়া ছোকড়িটা আমার পকেট থেকে সব পয়সাকড়ি কেড়ে নিলে না? খুব নেশা হয়েছিল বটে, লেকিন বুঝতে পারছিলাম তো পয়সা নিচ্ছে। শালা বরষাতের মধ্যে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে! কপালে চোট লাগল। পোহাতে কপাল চির্নচিন করতেই টের পেলাম।

এতোয়ারি একটু হাসে।—তাই বল।

—ও শালীর ঘরে আর যাব না বে এতোয়ারি? পাশের ঘরে...

—তুই যাস। আমি আর যাব না।

—কেন যাবি না বে? এখন তো বহু নেই। বেশি-বেশি যাবি।

—ভাগ। গায়ে চাক্কা-চাক্কা ঘা-ফোট নিকলাবে।

হাটুয়া একটু ভড়কে যায়। বলে—কেত্তা আদমী যাচ্ছে, দেখলি তো?

ঘা-ফোট হলে যাবে কেন বল তো?

—তুই যাস। অমি যাব না। বলে দিলাম, ব্যস!

—বহুর জন্যে আসলে মন খারাপ, তাই বল! আবে শালা! নিজেই তো দেখলি, তোর বহুর চেয়ে কেত্তা সুরতওয়ালা ছোকড়ি তোকে কেত্তা আদর করল। চুমা ভি খেল। আর তুই বলেছিলি, বহুকে চুমা খেতে গিয়েছিলি তো বহু মুখ হঠিয়ে নিল।

এতোয়ারি চাপা গর্জে বলে—হাটুয়া! ওসব বাত করলে আমি তোর সাথে আর কথা বলব না।

হাটুয়া হাসে। —বহু পালিয়ে শালা সাধু হয়ে গেলি বে! বেশ—দিনকতক সাধু হয়ে থাক। তারপর দেখব। আমি তো ওবেলা চলে যাচ্ছি চৌবেলালজির ঘাটে। তাই তোকে বলতে এলাম, কখন কী করতে হবে। সিগারেট লে।

—আর পিব না। এতোয়ারি খবরটা শুনে চমকেছে। ফের বলে—তুই ঘাটে কী করবি?

—চৌবেজীর ফরমাস খাটব। কত কাজ ওর। —হাটুয়া গর্বে সুখটান দিয়ে সিগারেট ঘষে নেভায়।

—তোর মামা যেতে দেবে তোকে?

—হুঃ, দেবে মানে কী বলছিস বে? মামা আমার কাঁধের চামড়া পাথর করে দিল না? এবার অঞ্চলাদের গাঁওয়াল পাঠাক। দেখুক, কেমন কষ্ট!

—তাহলে ওবেলা তুই ঘাটে যাচ্ছিস? সাচ বলছিস?

—সাচ না তো ঝুট বলছি?

—হুঁ। বলে চুপ করে থাকে এতোয়ারি। ঠাকুরবাবার এ কেমন বিচার সে বুঝতে পারছে না। হাটুয়াও তো পাপের কাজ করেছে। তার বেলা এই বখশিস আর এতোয়ারির কপালে বউ পালালো?

হাটুয়া ডাকে—আয়। তোর সঙ্গে শেষ দফা নাহান করে আসি। উঠ্ উঠ্।

এতোয়ারির কথা বলতে ইচ্ছে করে না। বহু পালাল, পালাল। হাটুয়াও ভি ভেগে যাচ্ছে! তাকে একলা করে ফেলছেন ঠাকুরবাবা! গাঁওয়ালে আর কার সঙ্গে যেতে-যেতে সুখদুঃখ রঙ্গবসের কথা বলতে পারবে মন খুলে? তেমন তো কেউ নেই। থাকলেও তার পছন্দ-অপছন্দ ব্যাপার আছে। হাটুয়া আর সে ন্যাংটো হয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতে লজ্জা থাকে না। বাগানপাড়ার ঘরে—একই ঘরে সে আর হাটুয়া একই ছোকড়ির সঙ্গে খেলেছে, কেউ কারও মুখ চেয়ে লজ্জা পায়নি। ভাবতে গেলে হাটুয়া তার নিজেরই অন্য একটা চেহারা হয়ে উঠেছিল। এখন হাটুয়াও খসে পড়ছে।

অভিমানে কাতর এতোয়ারি গোঁ ধরে বলে—তুই যা। আমি এখন নাহান করব না।

—বহুর দুঃখে সাধু হয়ে যাবি নাকি? হাটুয়া ওর হাত ধরে টানে। ওঠ। যদি দুখ বেজেছে তো কথা শোন। কাল ঘাটে গিয়ে আমাব সঙ্গে দেখা করিস। ওখান থেকে কলাবেড়িয়া রশিভর রাস্তা। আমি লোক ঠিক করে রাখব। বহুর চুল পাকড়ে লিয়ে আসবি। কেমন?

এতোয়ারি বলে—ভাগ বে।

—যাবি না?

—না।

—যাবি না?

—না।

—যাবি না?

—না।

হাটুয়া তক্ষুণি বেরিয়ে যায়। এতোয়াবি চোখ বোজে। পা তুলে দেয় সিন্দুকের ওপর। কত কী ভাবে। টের পায়, বাইরে ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্যে মেশা দুনিয়ার দুনিয়াদারি গঙ্গার স্রোত হয়ে বয়ে যাচ্ছে। সে পাড়ে কোথাও বাঁকের মুখে মড়াব মতো আটকে আর কোথাও একটা শেয়াল নীল জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছে। এতোযারি অবশ হয়ে পড়ে থাকে।...

এদিনও ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ের আকাশে ঠাকুরবাবা কালা ভঁইষ টো ছেড়ে দিলেন। নিষাদবাগ শ্মশানের ওদিকে ঢাঙা শিমুলগাছের ডগা নেড়ে ভারিভুরি দুই বহিন তাকে ডাকল আয় আয়। কানহাইয়াদের তালগাছের শুকনো বাগড়াগুলো থেকে ভূতিনী-প্রেতিনীরা চামচিকে হয়ে উড়ল আব শকরকন্দের ক্ষেতে আছাড় খেয়ে মাবা পড়ল। বুধিনী সুধিনীর এক পাশে ছাগল ম্যা-ম্যা করে চ্যাঁচাতে-

চ্যাঁচাতে দিশেহারা হয়ে দৌড় দিল। ভরতের দামড়া গরু লেজ তুলে লাফ দিতেই দড়ি ছিঁড়ল। রামলালের ঘরের একগোছা খড় উড়ে ছেদীরামের গাব গাছে গিয়ে আটকে গেল। সারা নিষাদবাগ জুড়ে হই-হই আজ। ঝড়ের সঙ্গে জোরালো বৃষ্টি—দুচার কুচি শিল পড়তে না পড়তে মাটির ওপর জল গড়াচ্ছে। যাদের ঘরের দেয়ালে পাটকাঠির বেড়া তারা তো আঁতকে কাঠ। ভজুয়াদের তালগাছের ডগায় চড়াৎ করে বাজ পড়ে বাগড়া জ্বালিয়ে দিয়েছে। দাউদাউ জ্বলছে পাতাগুলো। বৃষ্টির মোটা ফোঁটা দেখতে-দেখতে সরু আর ঘন হয়ে গেল। তারপর এ যেন আশ্বিন-কার্তিকের ঝড়বাদলা। বর্ষাচ্ছিল না তো বর্ষাচ্ছিল না—বর্ষাল তো একেবারে চুবিয়ে ছাড়ল গো। ভরত রাস্তায় দৌড়তে দৌড়তে মালতীর মায়ের উদ্দেশে কথাটা বলে গেল। ভরতের অনেকগুলো আমগাছ আছে। না দৌড়ে উপায় নেই। নয়ানসুখের তিন বেটি এতক্ষণ গাছতলা সাফ করে ফেলেছে! ওদের কাছে বাজবিজুলি কী, বৃষ্টিই বা কী! তিনবোনে আজও ভাঙা ডাল কুড়িয়ে বছরের জ্বালানি মজুত করবে। কিন্তু ল্যাংড়া রঘুয়া আজও ভাঙা ডাল কুড়িয়ে বছরের জ্বালানি মজুত করবে। কিন্তু ল্যাংড়া রঘুয়া আজ বেরোয়নি। আসলে বেরুবার ফুরসতই পায়নি। মেঘ জমতে না জমতে আচানক এই তুমল কাণ্ড যে। ল্যাংড়া মানুষ। গাছ চাপা পড়ে খুন হয়ে যেন। কিন্তু বাড়ি থেকে তার কাঁপা-কাঁপা চেরা গলায় আওয়াজ ঠিকই শোনা যেতে থাকে। বহুদিদি নির্মলাকে ডাকছে। তিন বিঘে পটল আর সরবতী আলুর ক্ষেত পেরিয়ে বৃষ্টি ঠেলে সেই আওয়াজ ছুটেছে মন্তরের জোরে। ভরতের বাগানের তিনটে আমগাছ শরতকে ইজারা দিয়েছে। শরতের বউকে এখন যেতেই হবে। নয়ানসুখের বেটিদের ঠিকই দেখতে পাচ্ছে রঘুয়া। সে কিনা ত্রিকালদর্শী পুরুষ। বহুদিদি গে-এ-এ-এ-এ...অদ্ভুত লাগে এই তুলকালাম ধূসরতার মধ্যে তীব্র কাঁপা-কাঁপা ভুতুড়ে চিৎকার। মাঝে-মাঝে আচানক চোখ ধাঁধানো বিজলির ঝিলিক, তারপর কানফাটানো মেঘের আওয়াজ বারোশো জাঁতা পেষা হতে থাকে, আবার—বহুদিদি গে-এ-এ-এ-এ...। আবার কড় কড় কড়াৎ। মড়-মড় করে ডাল ভাঙে। হিজল ভাড়ুলে গাব জাম শিমুল টলতে থাকে। বাঁশবনে সাতশো ভূতিনী নাচে গায়। ছেঁড়া সবুজ পাতায় ঢেকে যায় রাস্তাঘাট উঠোন ক্ষেত। আর ওই কাঁপা-কাঁপা তীক্ষ্ণ, মন্ত্রপূত, হিংসুটে, চেরা গলার ডাক—বহুদিদি গে-এ-এ-এ-এ!

এতোয়ারি চারপায়ায় বসে সিগারেট টানছে তখন। সরস্বতী ছাগলের গলা ধরে চুলার কাছে বসে আতঙ্কে কাঠ হয়ে আছে। ছোটী ঘরের চৌকাঠে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। আজ আর শিল কুড়োতে গা ভিজায়নি। বেচারির মুখ চুন, চাউনি করুণ। বহুদিদি থাকলে আজ আম কুড়োতে যেত! কিছু ভাল লাগে না, মন মানে না। আজ নাইতে গিয়ে কলাবেড়িয়ার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে এসেছে। নির্জন চড়ায় ঝাঁঝাল রোদ্দুরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে। বহুদিদি অমন করে পালাল কেন, জানবার জন্যে তার ছোট্ট কলজে মুচড়ে গেছে। মা যদি না মালতীর মাকে রাতে বহুর লম্ফ জ্বালতে যাওয়ার ব্যাপারটা পুছতে যেত, আর ছোটীকে না পাঠাত ছাগল বাঁধতে, বহুদিদি পালাতে পারত না। বাঁধে দাঁড়িয়ে নজরওয়ালী ছোটীই দেখতে পেয়েছিল, গাঙের চড়ায় স্যুটকেস হাতে বহুদিদি হন হন করে চলেছে। কেন যে সে দৌড়ে গাঙে নামল না ছাই! কেন দিশেহারা হয়ে দৌড়ে বাড়িতে গেল! সরস্বতী তখনও মালতীর মায়ের কাছে গপ করছে। শোনামাত্র খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে ঝোপ-ঝাড় ঠেলে মা-বেটি গঙ্গার কিনারায় গেল। বুড়ির নজর চলে না অতদূর। নিচে খাড়া নেমে গেছে পাড়টা। নামতে গেলে পা হড়কে গড়িয়ে বিশ হাত নিচে গিয়ে পড়বে। তখনও বহুদিদি ওপারে পৌঁছাতে পারেনি। তারপর দেখতে-দেখতে সে মুছে গেল চোখের সামনে। ছোটী সেই দৃশ্যটাই ভাবছে এখন। চেনা মানুষ অচিন-অজান হয়ে যায় কীভাবে, ভেবে কূল পায় না। ছোট্ট কলজে মোচড় দেয় আবার। চড়বড় করে বৃষ্টি পড়ে। জমানো দুধের মতো মাটি কালো হয়ে যায়। জলের ধারা গড়াতে থাকে। বাড়িটাও কি বহুদিদির জন্যে কেঁদে সারা হচ্ছে? ভজুয়াদের তালগাছের মাথাটা জ্বলেপুড়ে কালো হয়ে গেল। ধোঁয়াটাও ফুরল। ধূসরতা ঘন হতে-হতে জমে উঠছে কালো রঙের ছোপ, তারপর নিষাদবাগ ক্রমশ ঝিম মেরে যাচ্ছে। আর কোথাও কেউ ডাকাডাকি করছে না। বৃষ্টিটা ধরে আসছে। হাওয়ার তোলপাড় কমে যাচ্ছে। গা শিরশির করছে মৃদু হিমে। এতোয়ারিদের বাড়িতে বিষাদ এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

—মা গে! চুলা জ্বালাবিনে?

—জ্বালি বেটা!

—ছোটী গে। মালতীদের বাড়ি থেকে জেরাসে দুধ এনে দে বহিন।

—পানি গিরছে, দাদা।

—ছাতা লেকে যা। পয়সা ভি লে?

এতোয়ারির বাবা কবে একটা ছাতা কিনেছিল। অনেকদিন পরে ছাতাটা বেরল। ছোটী দাদা বেচারার জন্যে দুধ না এনে পারে? দাদার জন্যেও তার বুকে বাজছে না? একটা পেতলের আনি হাতের মুঠোয় নিয়ে ছাতার তলায় সে বেরিয়ে যায়। হায় আজ তাকে দাদা ছাতা দিল বৃষ্টির সময়। কত গরব করে হাঁটতে পারত ছোটী—শুধু বহুদিদিটা থাকলেই।

সরস্বতীর ওঠার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এতোয়ারি ফের ডাকে—মা গে?

—হুঁ।

—চুলা জ্বাল গে।

—জ্বালি বেটা।...

হুঁ, কাজে মন লাগছে না কারও। বাড়িটার হালচাল অন্যরকম ঠেকছে। এই শূন্যতা, এই হটমেনে বুড়বাক বনে থাকা, এই অপমান আর গাঁয়ে কেলেঙ্কারি—কী করবে এতোয়ারি? এতোয়ারি তুই কী করবি? একটা কিছু কর। তুই তো মরদ বেটাছেলে বে এতোয়ারি। এতোয়ারি মনে মনে ছটফট করে। দেখতে পায় অবিকল ওইখানে নীলচোখো শেয়াল দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। বিলকুল মড়া হয়ে জলে ভাসছে এতোয়ারি।

চা খেয়েই এতোয়ারি বেরিয়ে পড়ে, বৃষ্টি থেমে গেছে। এখনই ঘুরঘুটি, অন্ধকার। সুনসান গাঁয়ের পথ। খানাখন্দে জল জমেছে। এতোয়ারি যায় নয়ানসুখের বাড়ি। বাইরে একটু দাঁড়ায়। অঞ্চলা বলেছিল না আজ শিমুলতলায় একহি বাত বলবে একটু বিব্রত বোধ করে সে। কিন্তু নয়নসুখ রাতের খাওয়া সেরে বারোয়ারি লণ্ঠন নিয়ে বেরুচ্ছে। ধনপতির বৈঠকঘরে যাবে। এতোয়ারিকে দেখতে পেয়ে বলে—কৌন বে?

—হামি এতোয়ারি কাকা। হাটুয়া ছে?

—না বেটা। ঝড়ের আগেই তো বেরিয়েছে। চৌবেলালজির সঙ্গে দেখা করতে গেছে। উনহি তখন ওকে ডেকে গেলেন কিনা। তাই খেয়েদেয়ে চলে গেল তখন।

—অঞ্চলা দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে খাচ্ছিল। চোখ বড় করে তাকায়। এতোয়ারি পা বাড়ায় তক্ষুণি। নয়ানসুখের সঙ্গে ধনপতির বাড়ি অব্দি এসে বলে—হাটুয়া ঘাটমে নোকরি করবে, কাকা?

নয়ানসুখ হাসে। —নোকরি! নোকরি কৌন দেগা উসকো? কৈ কাম হ্যায়!

—না কাকা। হাটুয়া আর নিষাদবাগে আসবে না।

নয়ানসুখ হাঁ করে তাকায়—তুঝে বোলা?

—হাঁ।

নয়ানসুখ ভারি গলায় বলে—আচ্ছা। তারপর ধনপতির বাড়ি ঢুকে যায়। এতোয়ারি একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকে। কী করবে সে? তুই কী করবি এতোয়ারি? একটা কিছু কর। তুই মরদ না ঔরৎ। ঝোঁকের বশে অন্ধকারে আবার হাঁটতে থাকে। গাঁ পেরিয়ে তবে বাঁধে ওঠে। খালের সাঁকোয় দাঁড়িয়ে একবার ভাবে ল্যাংড়া রঘুয়ার কাছে যাবে নাকি? অমনি হাড়মুটমুটির কথা মনে পড়ে যায়। ভয় পায় এতোয়ারি। এই নালাতেই তো ভুতিনী মোল্লানের চলাফেরা। সে খকখক করে বারবার কেশে সাহস আনতে চেষ্টা করে। তারপর প্রায় দৌড়ে বাঁধ থেকে নেমে গাঁয়ের রাস্তায় যায়। কুকুরের ডাকে সাহস আসে এবার। একটা লাঠি থাকা দরকার মনে হয়। তখন সে বাড়ি ফেবে।

লম্ফের দম কমিয়ে সরস্বতী সবে শুচ্ছে, ছোটী শুয়ে পড়েছে। —এতোয়ারি।

—হাঁ গে মা।

—কোথা গিয়েছিলি বেটা? ভাত খেয়ে নে। শুত যা।

—ভাত খুলে ঢেকে রাখ, মা। আর, তোরা ঘরে শো গিয়ে।

—তুই?

—হামি ভি শুতব।...বলে এতোয়ারি চালের বাতা থেকে একটা লাঠি টেনে নেয়। সরস্বতী হাঁ হাঁ করে ওঠে। —এাই এতোয়ারি। লাঠি নিয়ে কোথায় যাবি?

—চেল্লাস কাহে গে? আন্ধার হয়ে আছে দেখছিস নে? পোকামাকড় থাকতে পারে, তাই লাঠি নিচ্ছি।

—কোথা? যাচ্ছিস কোথা বেটা? ও এতোয়ারি।

—আসছি।

এতোয়ারি আবার বেরোয়। লাঠি হাতে থাকলে সাহস দুনো হয় মানুষের। সে ধনপতির বাড়ির পাশের সরু আলপথ দিয়ে সোজা গঙ্গার ধারে যায় ঃ ঢালু পাড় পেয়ে দৌড়ে নামে। বালির চড়া ভিজে হয়ে আছে। হাঁটতে আরাম লাগে। কিছুটা গিয়ে সে পকেট থেকে মেচবাত্তি আর বিড়ি বের করে। আর সিগারেট নেই।

অল্প-অল্প হাওয়া বইছে ভাগীরথীর বুকে। উত্তরপুরে দূরে টাউনের আলো ঝিকমিক করছে। তার পশ্চিম বরাবর রাধারঘাটে চৌবেলালজির গদিতে হেজাকবাত্তি জ্বলা দেখা যাচ্ছে! বাদ-বাকি সব অন্ধকার। আকাশ পরিষ্কার। নক্ষত্র ঝকমক করছে। উত্তর-পশ্চিমে ওপারে কলাবেড়িয়ার একটা আলোর ফুলকি নড়েচড়ে হারিয়ে গেল আবার। চোখের কোনায় ঘাটোয়ারির হেজাকবাত্তির রশ্মি কলাবেড়িয়া অব্দি আনাগোনা করতে দেখে এতোয়ারি। ঘাটে যাবে হাটুয়ার কাছে? সে মন ঠিক করতে পারে না। তবু কোনাকুনি হাঁটতে থাকে। আশেপাশে শেয়াল দৌড়ে যায় কোথায়। মাঝে-মাঝে হাঁটুজল খানিকটা, আবার চড়া। কোথায় জল, কোথায় চড়া, এতোয়ারি কেন, সবারই জানা। সামনাসামনি পশ্চিমে এগোলে শিয়ালমারার নিচে দহ পড়বে—যেমন দহ পুবধারে নিষাদবাগের কাছে। সে দহ এড়িয়ে উত্তর-পশ্চিমে চলতে থাকে।

কলাবেড়িয়াব সামনাসামনি গিয়ে এতোয়ারি থমকে দাঁড়ায়। হাটুয়ার কাছে যাবে, নাকি...আবার বিড়ি ধরায়। লাঠিতে এক পা জড়িয়ে চুপচাপ বিড়ি টানতে থাকে। সেই চৈত-সংক্রান্তিতে কলাবেড়িয়া এসেছিল বউয়ের সঙ্গে। রাধারঘাটে হোম আর চড়কের মেলা বসেছিল। সেই উপলক্ষে শ্বশুরের ডাক। বাপের গাঁয়ে বহুর চলনবলনই আলাদা। সারক্ষণ একশো কথা। এতোয়ারিকেই এটা দেখায় ওটা বোঝায়—যেন এতোয়ারি বাচ্চা ছেলে। মান্যবরের বহিন ছিল সেবার। দাদার জামাইকে খুব আদর করে খাইয়েছিল। ফুলকলিয়াকে বকাবকি করছিল। চিরকাল অমনি খুকি হয়ে থাকবি গে? জোয়ান মেয়ে হয়েছিস, বহু হয়ে গেছিস—মরদের সেবাযত্ন করতে শিখবি কবে? ফুলকলিয়া ঠোঁট বাঁকা করে বলেছিল—তুই কী করতে আছিস রী পিসী? বাবা তোকে এনেছে কী জন্যে তাহলে? এতোয়ারি জানে, তার পিসিশাশুড়ি গরিব। জীবন্তীর কাছে চাঁইপাড়ায় তার বাড়ি। বাড়ির পাশ দিয়ে আনাগোনা করতেই হয়। তাই বলে এতোয়ারি বাড়ি ঢোকে না, পিসিশাশুড়িও তেমন ডাকে না। জামাইকে খাতির করবে কী দিয়ে? দেখা হলে শুধু মুখে কিছুক্ষণ বাতচিত, ওই পর্যন্ত। পিসেশ্বশুর হাঁফকাশের রুগী। জীবন্তী হাসপাতালে মাঝে-মাঝে তাকে দেখতে পায় এতোয়ারি। বারান্দার কোথায় শিশি হাতে নিয়ে বসে আছে। এতোয়ারি পীচের রাস্তা থেকে একবার সাড়া দেবো ভাবে—শেষ অব্দি দ্যায় না। হাটুয়া টেনে নিয়ে যায়। আয় রে! খামোকা দেরি করিয়ে দেবে!

জ্বলন্ত বিড়িটা সামনে জলে ছুঁড়ে ফেলল এতোয়ারি। জলের তলায় নক্ষত্র ঝিকমিক করছে। সেই নক্ষত্রপুঞ্জ তছনছ করে এতোয়ারি এগোয়। লাঠি ডুবিয়ে জল ঠাহর করে সাবধানে পা বাড়ায়। এতটুকু শব্দ যেন না ওঠে।

আবার হাত দশেক চড়ার পর ঢালু পাড়। আকন্দ সাঁইবাবলার ঝাড়ে ভরা। ওপরে বাঁশবন। এতোয়ারি বাঁশবনে ঢুকে যায়। মোড়লের বাড়িতে আলো জ্বলছে। ভিজে বাঁশপাতায় সাবধানে পা

ফেলে সে পাঁচিলেব ধারে পৌঁছয়। মাটির পাঁচিল। পয়সাওলা লোক কি না। ঘরে টিনের চাল। সে অবশ্য মোড়লের বাবার আমলে চাপানো। মরচে ধরে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। জায়গায়-জায়গায় খড়ও চাপাতে হয়েছে। এতোয়ারি উঠোনের কদম গাছটার দিকে তাকায়। তার দিকে যেন চোখ কটমট করে তাকাচ্ছে। তারপরই বাড়ির মধ্যে কুকুর ডেকে ওঠে। —এতোয়ারি ঘাবড়ে যায়। কুকুরটা মস্তো। হাঁক-ডাকও প্রচণ্ড রকমের। মান্যবরের আওয়াজ শোনা যায়—এ্যাই! কুকুরটা একটু চুপ করে থাকে। তারপর আবার ডাকে। এতোয়ারি বহুর গলা শোনার জন্যে কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটু পরে কুকুরটা ডাকতে-ডাকতে বেরিয়ে আসে। পেছন দিকে এসেই প্রচণ্ড হাঁকডাক শুরু করে। ভেতর থেকে মান্যবর ডাকে—এ্যাই কালুয়া! কালুয়া!

এবার ফুলকলিয়ার গলা ভেসে আসে। —শেয়াল দেখেছে আবার কী? তোমাদের গাঁয়ে যা শেয়াল!

—চুপ্ গে! তোর শাশুড়ির গাঁয়ে শেয়াল নেই? মড়াখেকো শেয়াল সব।

খিলখিল কবে হাসে ফুলকলিয়া—থাকলে আছে! তো ভালই তো! শাসবুড়িকে খেয়ে ফেলবে!

—শুত যা বী বেটি। আব বক-বক করিস না।

—আজ আমি শুতব না জি।

—শুতবি না তো কী করবি?

একটু পরে ফুলকলিয়ার জবাব শোনা যায়। —হামি তারা গিনব!

—ক্যা?

—তারা গিনব, তারা। আবার খিলখিল হাসি ফুলকলিয়ার। দেখছো কেত্তা তারা ঝিলমিলাচ্ছে?

—তোর শাশুড়ির গাঁয়ে তারা দেখা যায় না রী বেটি?

—নাঃ! তারা না, চাঁদ ভি না? সূরুয ভি...উঁহু, এক সূরুয আছে। ধনপতিয়ার বেটা।

কুকুরটার ডাকে যে সন্দিগ্ধ ভাব ছিল, ততক্ষণে কমেছে। থেমে-থেমে নিচু গলায় ডাকছে। কখনো গরগব কবে উঠছে। একটু দূবে এসে পেছনের ঠ্যাঙ দুটো মুড়ে সামনের ঠ্যাঙ সিধে রেখে অদ্ভুত আওয়াজ করছে। হুঁ, বাড়ির জামাইকে চিনেছে বেটা। এতোয়ারি অনেক দুঃখে হাসে। হাসে আর বাপ-বেটির কথাবার্তা নিয়ে ধাঁধায় পড়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপচাপের পর হাই তুলে ঘুমজড়ানো গলায় ফুলকলিয়া কিছু বলে। বোঝা যায় না। এই সময় ওদিকে কেউ ডাকে মান্যবরকে। —মান্য, আছ নাকি? হেই মান্যবব।—

এ গলা ভিনজাতের মানুষের। এতোয়ারি তা বোঝে। মান্যবরও দিশী বোলিতে সাড়া দিয়েছে তখন—আছি। হৈদ্দর নাকি? এস, এস।

—তুমিই এস হে মান্য!

মান্যবর বুঝি গেল। ওধারে গাঁয়ের রাস্তা। কুকুরটা এতোয়ারিকে ছেড়ে তক্ষুণি ওই হৈদরকে নিয়ে পড়েছে। ধমকও খেল। তারপর কেঁউ করে থেমে গেল। — বলো ভাই হৈদর!

হেরিকেনের আলো ওদিক থেকে এসে কদমগাছের গুঁড়িতে পড়েছে। গোল মাছধরা জালিটা ঝুলছে সেখানে। মান্যবর ওই নিয়ে সন্ধ্যাবেলা গঙ্গায় চিংড়ি ধরতে যায়। এতোয়ারির সেইসব কথা মনে পড়ছে দাওযার নিচে লম্ফের আলোয় চিংড়ির ছটফটানি। ফুলকলিয়া নতুন বরের সামনে শরম মানছে না। নাচছে আব সুর ধবে ছড়া বলছে। আলোর ছটায় নাকছাবি ঝিলমিলাচ্ছে। সব মনে পড়ে এতোয়ারির।

—পরশু আমার বেটির বিয়ে ভাই মান্য। মণদুই কুমড়ো লাগবে!

—অত তো দিতে পারব না স্যাখভাই। মণটাক হবে।

—সে আমি জানিনে। তুমি মোড়ল হয়েছ ক্যানে হে মান্য? জোগাড়যন্তর কবে দেবে। এই নাও বায়না।

—দর জানো তো?—

হৈদর আর মান্যবর এইসব নিয়ে প্রচুর বাতচিত চালিয়ে যায়। এতোয়ারি চঞ্চল। গিয়ে হাজির হবে এক্ষুণি, চমক পড়ে যায় তো যাক, এমনি ভাব নিয়ে পা বাড়াতে গিয়ে কাঁটায় পড়ে সে। তক্ষুণি মনে পড়ে যায়, বাড়ির পিছন বরাবর ঘন কাঁটা ঘেরা। চোরের ভয়ে শ্বশুর সবসময় হুঁশিয়ার। শেয়াকুল আর বাবলার কাঁটায় এতোয়ারি আটকে গেছে। কাপড়ে আস্ত একটা ঝোপও আটকেছে। ছাড়াতে গিয়ে খসখস আওয়াজ ওঠে। ওদিক থেকে কুকুরটা আবার চ্যাঁচায়। মান্যবর বাড়ি ঢুকতেই ফুলকলিয়া বলে ওঠে—কিস্‌কা বল্‌দা নিকলে এসেছে, বাবা। কানটামে (পিছনের ছাঁচতলায়) খড় খেয়ে লিচ্ছে।

ভেতরে মান্যবর আওয়াজ দেয়—হৈঃ হৈঃ। হাঃ হাঃ। কুকুরটাও জোর চ্যাঁচায়।

অমনি এতোয়ারি কাঁটার ঝোপসুদ্ধ টেনে বাঁশবনে ঢোকে। আরও আওয়াজ ওঠে। মান্যবর হেরিকেন হাতে ঘাটে যাবার খিড়কি দিয়ে বেরোচ্ছে—হাতে হেরিকেন। এতোয়ারি দিশেহারা হয়ে পালাতে থাকে। বাঁশবনে হেরিকেনটা উঁচুতে দুলছে। হৈঃ হৈঃ হাঃ হাঃ। কুকুরটাও চ্যাঁচাচ্ছে।

গঙ্গায় নেমে ঝোপটা ছাড়ায় এতক্ষণে। দুই পা জাং অব্দি জ্বলে যাচ্ছে কাঁটার ঘায়ে। কাপড়ও ছিঁড়েছে! পায়ের তলায় কাঁটা কতগুলো ফুটছে বোঝা যাচ্ছে না। জ্বলুনিতে এতোয়ারি কাহিল। জলটুকু পেরিয়ে চড়ায় যায় সে। ভিজে বালিতে বসে পড়ে। অন্ধকারে ঠাহর করে কাঁটা তুলতে থাকে পায়ের তলা থেকে। রাগে-দুঃখে অস্থির। বিড়বিড় করে গাল দেয় শ্বশুরকে, বহুকে, নিজেকেও।...

সরস্বতী ঘুমোয়নি। দরজা খুলে রেখে সামনে দাওয়াতেই তালাই পেতে শুয়েছিল। ছোটা ভেতরে এক কোনায় বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। এতোয়ারির বিছানা কাছে পাতা রয়েছে। মাথার কাছে ভাতের থালার ওপর মস্তো পেতলের সরা। মিটমিটে লম্ফ জ্বলছে। তার চাবপাশে এক গুচ্ছের পিঁপড়ে। সন্ধ্যায় বৃষ্টির পর পিঁপড়ের ডানা গজিয়েছিল। ঝাঁকে-ঝাঁকে বেরিয়ে পড়েছিল। এরা তারাই। সরস্বতী বারদুই জিজ্ঞেস করে জবাব পেল না। তখন চুপ করে শুল। আব ভাতের থালা ঠেলে সরিয়ে এতোয়ারি কাঁটা তুলতে বসল। পা দুটো ছড়িয়ে দিল।

আর সারাক্ষণ চোখের কোনা দিয়ে দেখতে থাকল, বিছানায় কলাবেড়িয়ার মেয়েটার একটা স্থায়ী ছাপ পড়ে রয়েছে। মুখ নামিয়ে শুঁকলে মেয়েলি গন্ধটা পাবেই।...

* * *

হাঁ এতোয়ারিদা, তুমি যে একেবারে সাধু হয়ে গেলে? নয়ানসুখের বিধবা বেটি অঞ্চলা কতবার বলে একথা। এতোয়ারি কখনও হাসে। এখনও গুম হয়ে মাথা দোলায়। মনে-মনে জবাব দেয়—তাই বইকি! দুনিয়াদারির সুখ তো দেখে নিয়েছি রী অঞ্চলা! কিন্তু অঞ্চলা যেন তাকে একলা পেয়ে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ক্ষেতে, জঙ্গলে, নদীতে যেখানেই কাজে বা অকাজে সে যাবে, আচানক মাটি ফুঁড়ে হাজির হবে নয়ানসুখের মেয়ে। এমনকি একদিন এতোয়ারি গাঁওয়ালে যাচ্ছে, অঞ্চলা তার সঙ্গ নিয়েছিল। সারাপথ শুধু রঙ্গরসের কথা। পালিয়ে যাওয়া বহু নিয়ে কতরকম টিপ্পনি। মোড়লের বেটিকে ভুলতে দেবে না যেন, এমন একটা ফিকির নিয়ে পিছনে লেগেছে মেয়েটা। সেদিন এতোয়ারি একফাঁকে কেটে পড়েছিল। পরে অঞ্চলা ঠোঁট ফুলিয়ে কত অভিমান দেখাল। বলতে ছাড়ল না—বুঝি গে বুঝি। লুকিয়ে লুকিয়ে কলাবেড়িয়ার ঘাটে পানি পিয়ে আসছ! এতোয়ারি এই মিথ্যে কথা শুনে রেগে লাল। মোড়লের বেটির মুখে সে পেচ্ছাপ করে দেয়। এমন সাংঘাতিক কথাও বলে বসল। অঞ্চলা হি হি করে হাসে। তার প্রকাণ্ড স্তনদুটি নির্লজ্জ রকমের দুলতে থাকে। সে হাততালি দিয়ে বলে—ও গে তোরা শোন শোন! বুড়ির বেটা কী বলছে শোন তোরা। আচ্ছা জি আচ্ছা। দেখা যায়গা পিছে যিস পেড়কী পক্ষী সেই পেড়ের ডালে গিয়ে উঠে না কী, সময় হলে দেখবে সবাই।

আরও পরে এতোয়ারি বুঝেছে, অঞ্চলা যেন তাকে যাচাই করে নিচ্ছে। মোড়লের বেটির জন্যে সত্যি-সত্যি শোক বেজেছে। নাকি শুধু বাইরে-বাইরে সে গোঁ ধরে আছে—এটাই সমঝে নিতে চায় নয়ানসুখের মেয়ে। কিন্তু শোক বাজুক কিংবা না বাজুক, তাতে ওর লাভটা কী হচ্ছে? এতোয়ারি কি

অঞ্চলাকে স্যাঙা করে বসবে? দূর দূর নয়ানসুখ যদি এতোয়ারিকে রাজা করে দেয়, তার ঘর-বাড়িটা সোনা দিয়েও মুড়ে দেয়—এতোয়ারি তার বিধবা বেটিকে নেবে না। এতোয়ারি ভাবে এ ব্যাপারটা ওকে পাল্টা-পালটি সমঝে দেওয়ার দরকার হয়েছে।

কিন্তু ওই এক স্বভাব এতোয়ারির। মনের সাচ কথাটা মরে গেলেও তো মুখ ফুটে বলতে পারবে না। ওদিকে সরস্বতীর ক্রমশ ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেছে। দিনরাত উনিশ ভরি রুপোর গয়না বাজুপৈঠা নিকড়িমল হাঁসুলির জন্যে উঠতে-বসতে মাথা ভাঙছে। গাঁওবালাকে শাপমন্যি করছে। ছেলেকে অকথা কুকথা বলছে। ছেলে শুধু বলে দেখছি গে দেখছি। ধনপতিজিরও ওই এক বাত। আরও কয়েকটা দিন সবুর করো বহিন। মান্যবর ভাল লোক। দেশে তার সুনাম আছে। নিজেই এসে মেয়েকে রেখে যাবে। এসব শুনে বুড়ি উঠোনে দাঁড়িয়ে চেল্লাচিল্লি করে গাঁয়ের আকাশে চিড় ধরিয়ে দেয়। ঠাকুরবাবার উদ্দেশে বলে—মুখিয়াজি মোটা টাকা খেয়েছে। মুখিয়াজির বেটাটা ধড়ফড় করে মরছে না কেন ঠাকুরবাবা? কেন মুখে খুন নিকলাচ্ছে না এখনও? মুখিয়াজি এই ভয়ঙ্কর প্রার্থনার খবর পেয়েই যেন রাগের বসে মামলাটাই খারিজ করে দিয়েছে। বুড়ি শেষটা গয়নার শোকে পাগল না হয়ে যায়! গাঁওবালাদের অনেকেরই মত—এত্তা বড়া বেটা। তারই কি না বন্ধ! সেই বেটাই যদি গ্রাহ্য না করে, লোকের কী?

এতোয়ারি নিজে গয়না দাবি করতে কেন যাচ্ছে না, এটা কেউ বুঝতে পারে না। আর, ওকে তো আবার স্যাঙা করতে হবেই। বুড়ি মায়ের আর কতদিন? বটতলার দিকে পাঁও বাড়িয়ে বসে আছে! ছোটীরও বিয়ের সময় হয়ে এল। তারপর কি হবে? এতোয়ারি তো ল্যাংড়া রঘুয়া নয়, সাধুও নয়। পাকা সংসারী লোক।

সাধু নয়। কিন্তু হয়ে গেলেই হল। এই তো মুখে দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে গেছে। কাটবার নামই করে না। চুল বড় রাখতে শুরু করেছিল, এখন কাঁধ ছুঁয়ে ফেলেছে। কেউ-কেউ বলে মানত মেনেছে এতোয়ারি। সময় হলে কাটবে। শহর থেকে নাপিত আসে, ভগীরথ। প্রতি শনিবার তার নিষাদবাগে রোজ। সকাল থেকে প্রায় সন্ধ্যা তাকে কামাতে হয়। দুপুরের খাওয়াটা মুখিয়ার বাড়ি বাঁধা। তিন মাস অন্তর আধমণ খন্দ-ধান, কলাই মাকড় কিছু গম নিয়েই আধমণ সে 'ঠিকা' পায়। তবে রোজের দিন লোকেরা ভালবেসে তাকে এটা-ওটা দিতে ভোলে না। ভগীরথের হপ্তার আনাজপাতি কয়েকরকম ডাল ইত্যাদি 'সিধা' ভালই হয়। এই ভগীরথ একদিন এতোয়ারিকে পাকড়ে ফেলল। বড় রসিক লোক ভগীরথ। এতোয়ারির লম্বা চুল আচমকা খামচে ধরে মাথার ওপর শূন্যে কচাকচ কাঁচি চালায়, আর এতোয়ারি চ্যাঁচামেচি করে, যেন ওকে খুন করা হচ্ছে। ছেড়ে দিয়ে ভগীরথ বলে, হাঁ রে এতোয়ারি, তোর ব্যাপারটা কী বলতো খুলে? মোড়লের বেটির জন্যে তুই কি সাধু হয়ে যাবি ভেবেছিস। এতোয়ারি সরল হেসে জবাব দেয়—না জি না। ভাল লাগছে, তাই রাখছি। যখন আর ভাল লাগবে না, তখন তোমার সামনে এসে বসে যাব। ব্যস।

এতোয়ারি আজকাল আগের চেয়ে অনেক সাদাসিধে হয়ে গেছে। মধ্যে হাটুয়ার পাল্লায় পড়ে খুব শহরবাজ আর সৌখিন হয়ে উঠেছিল। ক্রমে-ক্রমে সব ছেড়েছে। এখন ধুতিও কদাচিৎ পরে। বেশির ভাগ সময় গামছা পরে থাকে, গায়ে গেঞ্জিও চড়ায় না। কথাবার্তা কম বলত বরাবরই। এখন তো তাও কমে গেছে। আগের পাথ্থর আবার পাথ্থর হয়ে গেছে এবং আগের শ্যাওলাটুকু আর নেই। স্রেফ ন্যাড়া পাথ্থর।

ভগীরথ বলল—উঁহু। ভাল লাগালাগি নয় বে এতোয়ারি। আমি বুঝেছি তোর কী হয়েছে।

এতোয়ারি মনে-মনে চমকায়। কী বুঝেছে ওর? কিন্তু মুখে জোর করে হেসে বলে—ভাগো জি! হবেটা কী আবার? আমার কিছু হয়নি।

—থাম্ থাম্। আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে চুপসে বৈঠে থাক। আমি তোর বহু এনে দিচ্ছি। এই বলে ভগীরথ তার পিঁড়িতে ফিরে যায়। হরিয়ার বেটা মাথা আধখানা ন্যাড়া করে বসে ঢুলছিল। ভগীরথ গিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে—আবে দেখ দেখ! ছোকড়া মুতে ভাসিয়ে দিয়েছে! আবে, এ কী করেছিস?

জোর হাসাহাসি পড়ে যায় বারোয়ারিতলায়। হরিয়ার বউ তার অপ্রস্তুত ছেলের হয়ে বলে—দশের সামনে বেটাকে অপমান কোরোনা তো দাদা! তাই শুনে ছেলেটার কী হল, আচমকা ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে। আবার হাসির ঝড় ওঠে। ধনপতিজিও এমন হাসে যে কলকে থেকে আগুন গিরে যায় এবং কাশতে থাকে। নয়ানসুখ ব্যস্ত হয়ে আগুন নেভায়। ধুলোয় দাপাদাপি করে। একটু অসাবধান হলেই তো রক্ষে নেই। গাঁ ছাই হয়ে যাবে।...

ভগীরথ নাপিত। নাপিত ধূর্ত হবেই, এটা জানা কথা। আর আশেপাশের সব চাঁইবস্তিতে সে বাঁধা 'হাজাম'। সবার সঙ্গে ভাব। সে যখন বলল, এতোয়ারির বউ এনে দেবে। তখন যেন সারা গাঁ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বিবেকের দায়ে নিষাদবাগ ভেতর-ভেতর কষ্ট পাচ্ছিল বইকি। কুঁদুলি সরস্বতীর গঞ্জনা শাপমন্যি কোন ব্যাপার নয়। স্ত্রীলোক তো নাদান! ওদের হিসেবের মধ্যে আনে না নিষাদবাগ। আসলে কলাবেড়িয়ার মোড়ল যে স্বয়ং প্রতিপক্ষ সেটাই মুশকিল। মান্যবর না হয়ে যদি মামুলি আদমী হত, এতদিন কবে কোমর বেঁধে ছেলেছোকরারাই চলে যেত এবং বেটির চুল পাকড়ে নিয়ে আসত। মান্যবরকে বড় ডর নিষাদবাগওলার। গঙ্গার সারা পশ্চিমপাড় জুড়ে মান্যবরের যেন রবরবা। অন্তত ওপাড়ের গাঁওয়ালে গিয়ে এতকাল সেটাই আঁচ করেছে এরা।

ভগীরথের কথা শুনে এতোয়ারিও মনে-মনে আসার নিবুনিবু সলতেটা উসকে দিয়েছিল। মাঝে-মাঝে কাজের ফাঁকে হঠাৎ যখনই ভগীরথকে মনে পড়ে, একটা চাপা সুখের অস্থিরতা কয়েক মুহূর্ত তাকে আচ্ছাসে ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। গাছ যেমন ঝাঁকুনি খেয়ে শুকনো পাতাগুলো ঝরিয়ে ফেলার মওকা পায় তারও তেমনি। নিরাশা, অভিমান, দুঃখ, প্রায়শ্চিত্তবোধ এইসব জিনিস শুকিয়ে গিয়েছিল। এরপর ওগুলো নেই। মোড়লের বেটি ফিরে এসে যেন নতুন বৃক্ষ পেয়ে নতুন মুখে তার ডালে বাসা বাঁধে। এভাবেই তৈয়ার হয় এতোয়ারি।

আর সেই প্রস্তুতির সময় নয়ানসুখের বিধবা মেয়ে এক সন্ধ্যায় নিরালা বাঁধের নিচে চূড়ান্ত বেহায়াপনা করে বসল।

এতোয়ারি গাঁওয়াল থেকে ফিরেছে। ফিরে ঘাটে গেছে নাইতে। নাইতে গিয়ে হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছে মুখ-আঁধারি বেলাটুকু থাকতে-থাকতে একনজর ঝিঙে-ক্ষেতে চোখ বুলিয়ে আসবে।

ঘাটের বেশ কিছুটা দূরে পাড় বরাবর ধারের নিচে তার ওই দেড়কাঠা ক্ষেত। বাঁধের দিকটায় সারবেঁধে ভাঁড়ুলে গাছ গজিয়েছে। আবছা আঁধার হলেও খোলামেলা গঙ্গার আকাশ পশ্চিম দিকে একটা ছটা পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে। এতোয়ারি দেখলো, ক্ষেতের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে কে বসে আছে। নিষাদবাগে চোর-চুট্টিনের শাস্তি খুব কড়া। চুরি-চামারী একেবারেই হয় না, তা নয়। ইদানিং মুখিয়াজির ঢিলেমিতে চুরিটা হচ্ছে প্রায়ই। এতোয়ারি হাতেনাতে ধরবে বলে গুঁড়ি মেরে এগোল। কাঁটার বেড়া দিয়েছিল একসময়। এখন বেড়াটা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে কতকটা সে একটু ঘুরে কচি পাটের ক্ষেতটা পেরিয়ে বাঁধের দিকে গেল। তারপর ভাঁড়ুলে গাছের ফাঁকে মাথা বের করে চারপেয়ে জন্তুর মতো ওত পেতে রইল। কাজ শেষ করে পা বাড়ালেই ধরবে।

তার আগে ধরবে না কেন? অন্য কেউ হলে তো অনেক আগেই ধরে ফেলত। না ধরুক, দূর থেকে চোখে পড়া মাত্র চেঁচিয়ে উঠত। দৌড়ুত। এতোয়ারি আসলে এতোয়ারিই। ওর স্বভাবচরিত্র এরকমই। মানুষের মধ্যে পাথরের গুণ থাকলে যা হয়।

তো এতোয়ারি আচানক গিয়ে শেষমুহূর্তে তাকে ধরল, যখন গুটিসুটি ক্ষেত পেরিয়ে পালাবার তাল করেছে। ধরেই দেখল, চোর নয়—চুট্টিন। তারপরই টের পেল আর কেউ নয়, নয়ানসুখের মেয়ে অঞ্চলা। খুব জোরে সামনাসামনি জাপটে ধরেছিল এতোয়ারি। অঞ্চলা আই রী বলে অস্ফুটে চেঁচিয়েও উঠেছিল। হাত দুটো অবশ হয়ে গেছে একেবারে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে বাতই আসে না।

অঞ্চলা তার বুকে খুঁচিয়ে দিল আঙুলের ডগায়। —কী ক্ষেতের মালিক! চুপচাপ হয়ে গেলে যে? ভেবেছিলে না জানি কোন চোর কী চুট্টিন পাকড়ে ফেলেছ, তাই না? আমি গে আমি, তোমার অঞ্চলা। অঞ্চলা আধো-আধো স্বরে বলতে থাকে এসব কথা। আব তুমি ভাবলে কি না অঞ্চলা তোমার ক্ষেতে

ঝিঙে চুরি করতে এসেছে? মা গে মা। সোনা না, দানা না—ঝিঙে! আঁচল থেকে একটা ঝিঙে তুলে সে খিলখিল করে হাসে আবার। তারপর মাথা দোলায়। নেহি জি নেহি। কভি নেহি। অঞ্চলা তোমার ঝিঙে চুরি করতেই আসেনি, লেকিন তোমার ক্ষেতের ঝিঙে দিয়ে উল্টে তোমাকেই পাকড়াবার মতলব করেছে।

ঝিঙে দিয়ে এতোয়ারির বুকে মৃদু আদর দিলে এতোয়ারির এতক্ষণে হুঁশ ফেরে। সে ধাঁধায় পড়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এবার বলে—কী বলছিস রী! সমঝ হয় না আমার।

অঞ্চলা ওর বুকের দিকে হটে এল একেবারে। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের ঝাপটানি লাগছে এতোয়ারির নাকে। এতে ফুলকলিয়ার সেই সৌরভ নেই—তবু সৌরভ আছে। অন্য ফুলের। অন্য আউরতের। এতোয়ারি আরও কাবু হয়ে পড়ে ভেতর-ভেতর। অঞ্চলা বলে—দেখলাম, বুড়ির বেটা নাইতে যাচ্ছে। তো একবার ভাবলাম ঘাটে গিয়েই ধরি। ভাবতে ভাবতে দেখলাম সে এদিক বাগে আসছে। অমনি ফিকির এল মাথায়। আমি ডাকলেই তো ডর পেয়ে পালাবে—বাঘ আছি ভালুক আছি, খেয়ে ফেলব। তাই চুট্টিন সাজলাম। চুন্নি হলাম। ডাকলে যদি ভেগে যায়, তো না ডেকে ফাঁদ বানাই নিজের হাতে। নিজের ফাঁদে নিজেই পড়ি। পড়লাম।

এতোয়ারি বলবেটা কী? তাই বিশ্বাস করে বসেছে। অঞ্চলার একটু-আধটু চুরির বদনাম না আছে এমন নয়। তাই বলে তার ক্ষেতের ঝিঙে চুরি করবে, এটা এতোয়ারি ভাবতেই পারে না। যে মেয়ে তাকে গোপন খেলায় ঠারেঠোরে আসতে ডাকে, সে তারই ক্ষেতে চুরি করবে কেন? হুঁ, নয়ানসুখের বিধবা মেয়ের এ একটা ফাঁদই বটে। এ মেয়েকে এখন চুট্টিন সাব্যস্ত করলেও এতোয়ারির লজ্জা, সঙ্গে গোপন খেলায় যোগ দিতেও এতোয়ারির লজ্জা। এতোয়ারি ঘেমে ওঠে। ফাঁদে অঞ্চলা পড়েনি, পড়েছে এতোয়ারিই। ঝিঙেগুলো নিয়ে অঞ্চলা চলে যায় তো যাক। কিছু বলবে না সে।

আর তার এই চুপচাপ থাকার সময় অঞ্চলা তার বুকে গলায় বাহুর ওপর হাত বুলোয়। সেই অদ্ভুত আধো-আধো করে বলে—আমি এখনও জওয়ানী আছি। একটা ছেলে হয়েছে তো কী হয়েছে? আমার বাবা মোড়ল নয়, তাতেই বা কী ক্ষতি? ও এতোয়ারি, আমি শরতের বহুর কথায় পটিনি। কেন পটিনি তুমি শোন। আমি তোমার জন্যে ভারিভুরির কাছে মানত দিয়েছি। তুমি মোড়লের বেটির আশা কেন করবে, গাঁয়ে আমার মতো জওয়ান মেয়ে থাকতে?

তারপর অঞ্চলা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে। কাঁদতে-কাঁদতে দুঁহাতে এতোয়ারিকে জড়িয়ে ধরে। আর এই করতে গিয়ে আঁচলের ঝিঙেগুলো ছড়িয়ে পড়ে। পায়ের তলায় পটাপট ভেঙে অঞ্চলা তার বুকে মাথা কোটে।—আমাকে নাও তুমি, ও এতোয়ারি! আমার খুব কষ্টে দিন কাটছে, তুমি বোঝ না? গরিব বাপের বাড়ি এ বয়সে আর কতদিন কাটাবো। গাঁয়ের সেরা সমঝদার হয়েও তুমি আমার কষ্ট দেখবে? তার চেয়ে বলো, গাছে ঝুলে মরি। গলায় শিল বেঁধে গঙ্গায় ডুবি। হাতে তুলে বিষ দাও, খাই।...

আর কী সব বলেছিল, পরে আর একটুও মনে নেই এতোয়ারির। তখনকার মতো বাঁচতে শুধু বলেছিল—ঠিক আছে। হপ্তাদুই টাইম দে অঞ্চলা। হামি শোচ কারি।

না বললে অঞ্চলা যেভাবে তাকে টানছিল ভুঁইয়ের মাটিতে শুইয়ে ছাড়ত। এতোয়ারির তখন পবিত্রতার সাধনা চলছে যে! ভগীরথের কথায় আশার সলতে দ্বিগুণ জ্বলছে। হাটুয়ার সঙ্গে গিয়ে পাপ করে ফেলেছে, সেজন্যেই তো ভারিভুরি চটে গিয়ে মোড়লের বেটিকে দূরে সরিয়ে রাখল। ভারিভুরি কি প্রকারান্তরে বলল না, শওদকা ওই আঙ (অঙ্গ) মাগঙ্গার পবিত্র জলে ধুয়ে নাও, তারপরে কথা? তাই এতোয়ারির চালচলন এখন সাধুর মতো। চুলদাড়িগোঁফ হাতপায়ের নখ কাটছে না। দুবেলা নাহান করছে। প্রায়শ্চিত্তের সাধনা চলছে। মুখে খারাপ বাত এলে জিভ কেটে আটকাচ্ছে।

নয়ানসুখের বেটি এসব জানত না। জানলে পা বাড়াবার সাহসই পেত না। অবশ্য অতগুলো ঝিঙে তুলে ফেলেছিল। ঔরৎলোকের বুদ্ধিসুদ্ধি এমনি হয়। ঝিঙেগুলো কোন মুখে এতোয়ারি নেবে? বাড়ি গেলেও বিপদ। হঠাৎ এই সন্ধেবেলা এত ঝিঙে তোলাব কৈফিয়ত কী দেবে মাকে? ঝিঙে তোলার তো কথাই ছিল না আজ। যদি বা লায়েক ছেলে ঝোঁকের বশে তুলেই ফেলে, ছোটীকে চেঁচিয়ে ডাকবে।

এই তো নজদিগের ব্যাপার। সরস্বতী বা ছোটী ঠমী বাউরান (কালাবোবা) নয় যে এতোয়ারির গলা বুঝতে ভুল করবে। এইসব সাতপাঁচ ভেবে এতোয়ারি জোব করে অঞ্চলাকেই নিতে বলোছিল। অঞ্চলা দু'চারবার না-না করে শেষে অন্ধকাবে হাতড়ে-হাতড়ে আঁচলে ভরেছিল। কিছু এতোয়ারিও কুড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু পরদিন ভোরবেলা সরস্বতী ক্ষেতে গিয়ে কয়েকটা ভাঙা টুকবো পেয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। তারপর ক্ষেতময় ঘুরে টের পায়, তোলার মতো ডাগর হয়েছিল যেগুলো, একটাও নেই। তখন সে চেরাগলায় আকাশ এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। প্রথমে গলাটা খেল ধনপতি মুখিয়া, তারপব নিজের বেটা এতোয়ারি। ক্রমে-ক্রমে নিষাদবাগের মেয়ে-মরদ কেউ বাদ পড়ল না। শেষে ক্লান্ত বুড়ি পা ছড়িয়ে ক্ষেতের কোনায় বসল যেখানে মড়ার মাথাটা বাঁশের লাঠির ডগায় পোঁতা আছে। বুক ফেটে কাঁদল। মাথাটাকে গালমন্দ করার সাহস নেই। তাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে কাঁদল। কেঁদেকেটে টুকরোগুলো নিয়ে গঙ্গায় গিয়ে নামল। নাহান করে বাড়ি যাচ্ছে, তখন তাকে দেখে সবার মনে হয়েছে, বেটা এতোয়ারিকে শ্মশানে পুড়িয়ে শোককাতর বুড়ি বাড়ি ফিরছে।

নির্মলা ছোটীকে বলেছিল—মাকে ধরগে না রী! মরে যাবে যে কাঁদতে-কাঁদতে।

ছোটী বলেছিল—মরুক। মরলে নিষাদবাগের হাড় জুড়োবে জানো না?...

এই নির্মলার ব্যাপারটা এখন ভাল চোখে পড়ছে এতোয়ারির। ফুলকলিয়া থাকতে কত ছলে কতবার এসেছে তার বাড়ি। আশ্চর্য, ফুলকলিয়া পালাল, সেও বাড়ি ছাড়ল। এমনকি তার মায়ের কাছে কিছু টাকাকড়ি পাওনা আছে, তাও চাইতে আসে না। এতোয়ারিকে দেখে আগের মতো ঠাট্টাতামাশাও করে না। বহুটা যে পালাল সবাই এসে খোঁজখবব নিল, আহা-উহু করে গেল। নির্মলা তো আসেনি। তার স্বামী শরৎ অবশ্য পথঘাটে দেখা হলে প্রসঙ্গটা তোলে। বলে—বলব তোর শ্বশুরকে। দেখা হয় না যে আজকাল। আমিও খুব ঝামেলায় আছি রে এতোয়ারি। কিন্তু সে ওই মুখেরই কথা এতোয়ারি এমন বেহায়া নয় যে শরৎকে গিয়ে সাধাসাধি করবে।

কিন্তু নির্মলা যেন এতোয়ারিকে দেখলে এড়িয়ে যায়। ঠাট্টাতামাশা তো দূরের কথা। এতোয়ারি হাটুয়ার পাল্লায় পড়ে শহরের বাগানপাড়ায় গিয়েছিল বটে। কিন্তু তাই বলে মেয়েদের আঁচলে মুখ মোছার সাধও নেই, লোভও নেই তার। আর নির্মলা তো নিষাদবাগে থেকেও নিষাদবাগের কেউ নয়। গাঁওবালার সুখ-দুঃখে ওর দৃকপাতই নেই। নির্মলা এতোয়ারির জন্য দুখ দেখাক না দেখাক এতোয়ারির কিছু যায় আসে না। বরং তার এখন সন্দ হয়, শবতের বউই মোড়লের বেটির কানে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল কিনা। ওকে তো শহরে নিয়েও গিয়েছিল। এখন থাকলে আরও যেত। কে বলতে পারে, মন্ত্রপড়া খাবার, নয় তো জড়িবুটি খাইয়ে ফুলকলিয়ার মনটাকে বদলে দিয়েছিল কি না। তা যদি না দিল, তাহলে মানী লোকের বেটি অমন করে স্বামীর ঘর ছেড়ে পালায় কে কোথায় শুনেছে?

এতোয়ারি আবার ল্যাংড়া রঘুয়ার কথা ভেবে রেখেছে। কিন্তু ওদিকে পা বাড়াতেই তার ডর লাগে। একদিন গিয়েই তো বউ ভেগে গেল। রঘুয়া মহা ধড়িবাজ যে। ও কার ভাল করবে, কার মন্দ করবে—সে ওর ইচ্ছে। এটাই মুশকিল।

ছোটীকে চুপিচুপি শাসন করে দিয়েছে—খবরদার রী! শরতের বহুর সঙ্গে কথা মাৎ বলবি। ও আসছে দেখলে রাস্তা থেকে ভেগে ভিন রাস্তায় হাঁটবি।

—কাহে গে দাদা!

—উও দুশমন ঔরৎ আছে রী বহিন!

—কাহে গে?

ছোটীকে ইশারায় কিছু বোঝানো যায় না। এতোয়ারি অগত্যা বলেছিল—তেরা ভাভকো তো ওহি ভাগা দিয়া রী!

—সাচ?

—হাঁ। সাচ!

ছোটী আজকাল যেন ঝটপট পেকে উঠেছে। চোখেমুখে বুদ্ধিমতী ঔরতের হাবভাব দেখতে-দেখতে ফুটে গেল? সে একটু ভেবে বলেছে—ঠিক বলেছ গে দাদা! উও বহৎ হারামী মৌগি আছে। বহুদিদির সাথ দিনরাত ফুসুর ফাসুর করত!

রাগে দুঃখে অতটুকু মেয়ে শেষটা প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা। বিড়বিড় করে গালও দিল অনেক। তারপর চোখ মুছতে-মুছতে ছোট্ট পেতলের ঘড়াটা কাঁখে নিয়ে নদীতে গেল। এতোয়ারি জানে, তার বোন বড্ড একা হয়ে হয়ে গেছে। কিছুদিন বহুদিদির জন্যে তো খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। বুক ফেটে-ফেটে কাঁদত। ঠায় বসে থাকত কলাবেড়িয়ার দিকে চেয়ে। চোখ দিয়ে জল ঝরত। এখন হয়তো অনেকটা সয়ে গেছে। কিন্তু এই যে গেল চোখ মুছতে-মুছতে, এতোয়ারি হলফ করে বলতে পারে, ঘড়া বুকে চেপে কলাবেড়িয়ার দিকে তাকিয়ে তেমনি নিঃশব্দে কাঁদবে।

ছোটীর দিকে তাকালেই এতোয়ারির মন নরম হয়ে যায়। মনের তলায় বুদ্বুদ কাটার মতো অস্পষ্ট দ্বিধাজড়িত একটা প্রার্থনা উঠে আসতে চেষ্টা করে বুঝি। মোড়লের বেটি, হামার ঘাট হয়েছে রী! হামি নাদান। মাফ করে দে ভাই!...

পরের শনিবার এতোয়ারি ভগীরথের আশায় গাঁওয়ালে গেল না। সে ঘর-বার করছিল। তার বাড়ির সামনে গাঁয়ের রাস্তা ওপাশে উঁচু জমির ওপর হরেক গাছালি। বিশাল জামগাছের গুঁড়ির মাথায় উঁচুতে একটা ডাল গত বছর ঝড়ে ভেঙেছিল। সেটা ভবত কাজে লাগিয়েছে। এখন যে কাটা মুড়োটুকু বেরিয়ে আছে তার খোঁদলে পেঁচা থাকে। সূর্য ওখান অবধি উঠলে বোঝা যাবে ভগীরথের আসার সময় হয়েছে। সে সেই ডালটার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। সূর্য যেন বড় দেরি করছে আজ। হাঁ ঠাকুরবাবা। তুমিও কভি-কভি নাদান লোকের সঙ্গে তামাশা করো!

সূর্য সেই কাটা ডালের ওপর হাতখানেক উঠে গেছে। তবু ভগীরথের দেখা নেই। বাঁদিকে উত্তরে বাঁধের স্লুইসগেটের মাথা অবধি নজর চলে। তেমন কেউ আসছে না। এতোয়ারি ব্যাকুল। এমন তো হবার কথা নয়। ছেলেবেলা থেকে দেখছে, ভগীরথ একদিনও রোজ-কামাই করেনি। আজ তার জন্যেই কি রোজ কামাই হয়ে যাচ্ছে?

এতোয়ারি থাকতে না পেরে বেরিয়ে পড়ে। স্লুইসগেটের দিকে হাঁটতে থাকে। শহরের শেষ দিকটায় মিলের পাশে বস্তিতে থাকে ভগীরথ। ওখানে দাঁড়ালে ক্রোশটাক পথ বাঁধ বরাবর নজর হবে।

মালতীর মা বাঁদিকে একটা ক্ষেতে করেলার মাচান বাঁধছিল। দেখতে পেয়ে ডাকে —এতোয়ারি! আজ গাঁওয়ালে যাওনি বেটা?

—না মোসি, যাইনি।

—জামাই বলছিল, তোমার সঙ্গে 'জোট' বেঁধে যাবে। ভাবলাম বুঝি, তাই গেল।

—আমার শরীর ভাল না, মোসি। তোমার জামাই ডেকেছিল, যাওয়া হয়নি।

এতোয়ারি বিরক্ত। হাটুয়ার সঙ্গে জোট বেঁধেছিল। তার ফলটা যা হবার হয়েছে। আর জোট বাঁধার মধ্যে সে নেই। মালতীর মরদটাকে সে পছন্দও করে না। যে গাঁয়ের লোক, সে-গাঁয়ের নানান বদনাম আছে। মামলামোকদ্দমা খুনোখুনি হিংসে-হিংসি লেগেই আছে নাকি। নিষাদবাগে তো সেদিক থেকে কোন ঝামেলাই নেই। আজ অব্দি গ্রামে পুলিশ ঢোকেনি, এ নিয়ে নিষাদবাগের গর্ব আছে। মালতীর মরদের সঙ্গে তাই কেউ মিশতে চায় না। লোকটারও কেমন যেন বাঁকাটেরা চালচলন। যেমন সৌখিন তেমনি কথায়-কথায় ফচকেমি।

—ও এতোয়ারি! কোথা যাচ্ছিস অমন করে?

মালতীর মা কি কিছু বলবে? ছোট্ট কাটারিখানা দিয়ে পিঠের ঘামাচি চুলকোতে-চুলকোতে সে বেড়ার ধারে এল, তাই দেখে অগত্যা এতোয়ারি দাঁড়ায়। বলে—আসছি মোসি। এমনি যাচ্ছি।

—শুন গে শুন। আ না মেরা পাশ!

সস্নেহ ডাক শুনে এতোয়ারিকে আসতেই হয়। বেড়ার কাছে গিয়ে বলে—বোলো মোসি ফিসফিস করে মালতীর মা বলে—মালতীর সঙ্গে তোর বহুর দেখা হয়েছে কাল।

এটুকু শুনেই এতোয়ারি চঞ্চল।

—কাঁহা গে?

—ঘাটমে। রাধার ঘাটমে।

পরমুহূর্তে এতোয়ারি টের পায়, সে মালতীর মায়ের সামনে বড় বেশি আগ্রহ দেখিয়ে ফেলেছে। তাই পা বাড়াবার ভঙ্গি করে বলে ছোড় দে রী মোসি!

—আরে শুন শুন! মালতী তোকে বলবে কী করে? আমাকে বলেছে। আমি বলছি, বাতঠো শুন।

—কী শুনব রী?

—তোর বহু হাটুয়ার সঙ্গে ঘাটে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এমন সময় মালতী যেয়ে বলল—কেমন আছিস রী বহুদিদি? তোর বহু মালতীকে যেন চিনতেই পারল না। খুব দেমাগ হয়েছে মোড়লের বেটির।

—হয়েছে তো হয়েছে! আমার কী?

—আরে ছোকড়া, আসল বাতঠো তো শুন!

—কী, বলো!

—একটু পরে শরতের বহু এল।

এতোয়ারি চমকে ওঠে। —শরতদার বউ কোত্থেকে এল?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে মালতীর মা আরও চাপা গলায় বলে—ঘাট পেরিয়ে নৌকো থেকে নামল নির্মলা। নেমে মোড়লের বেটিকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল—ও রী ছোকড়ি, তোর কাছেই তো যাচ্ছি। মালতী একটু আড়ালে সরে গেছে তক্ষুণি। দেখল দুই ছোকড়িতে কী ফুসুর-ফাসুর হল। তারপর দুটিতে নৌকোয় উঠে শহরে চলে গেল।

এতোয়ারি দম আটকানো গলায় বলে—আর হাটুয়া?

মালতীর মা বলে—হাটুয়ার কথা আর তো বলেনি মালতী। হাটুয়া যায়নি, ওরা দুজনেই গেল।

এরপর মালতীর মা গলা চড়িয়ে পিছনে গঙ্গার দিকে অদৃশ্য ছাগল খেদাতে থাকল—লিঃ লিঃ কাটকে খায়ে গা। খুন পিয়ে গা। ভাগ ভাগ।

এতোয়ারি ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে পা বাড়ায়। কিন্তু যেদিকে যাচ্ছিল, আর সেদিকে নয়—গাঁয়ের দিকে ঘোরে। চোয়াল আঁটো হয়ে যায়। রাগে সে ছটফট করতে করতে শেষঅব্দি বাড়ি ঢুকেই পড়ে।

সরস্বতী উদুখল বের করেছে আবার। বউ যাবার পর কাত করে ঢুকিয়ে রেখেছিল রান্নাশালের কোনায়। বুড়ো হাড়ে কষ্ট হচ্ছে ধান ভানতে। তবু যেন জেদ করেই জোয়ানীর খাটুনি খাটা চাই। এতোয়ারি তেতো হয়েই ছিল। আর তেতো হয়ে বলল—ছোটী কাঁহা গে মা? তুই কেন ঝামেলা করতে গেলি?

সরস্বতী গ্রাহ্য করল না বেটার কথা। বেটার ওপর মনে মনে আজকাল রেগেই থাকে সে। জবাবও দিল না। তখন এতোয়ারি সেই রাগ চঞ্চলতাসুদ্ধ উঠোনের বেড়ার ধারে গিয়ে হাঁক দিতে থাকল—হেই ছোটী! ছোটী-ই-ই! হেই হারামী লড়কি-ই-ই-ই!

ছেলের এমন আচানক গর্জন শুনে বুড়ি অবাক। গজগজ করে বলে—এত্তা ফাড়ছিল কাহে গে? ছোটীকে আমি কামে পাঠিয়েছি। শরীর খারাপ বলে গাঁওয়ালে গেলি না, গেলি না। আবার মেজাজ করছিস কাহে?

ছোটী গিয়েছিল বুধিনী-সুধিনীকে ডাকতে। ভোরবেলা ক'সের যব ভেজে রেখেছে। ছাতু পিষতে হবে। ছাতুটা সরস্বতী নিজেই বেচতে যাবে শহরে। অনেকদিন শহরমে যায়নি। কাল রাতে খেয়াল হয়েছে হঠাৎ। এতোয়ারি তো সেসব জানে না। মায়ের ধমক খেয়ে গুম হয়ে দাওয়ায় বসে গেছে। কী করি-কী করি হাবভাব। হাতদুটো অবশ লাগছে।

ছোটী শিগগির এল। বুধিনী-সুধিনীকে সঙ্গে নিয়েই এল। বোবা-কালা দুই বোন এতোয়ারিকে দেখে

হাসল। এতোয়ারি গুম। ছোটী বলল দাদা, ভগীরথ হাজাম তোকে ডাকছে। বারোয়ারিতলায় কামাচ্ছে দ্যাখ গে।

কিছুক্ষণ আগে হলে এতোয়ারি পাখির মতো উড়ত। রেলগাড়ির মতো দৌড়ুত। এখন যেন শুনেও শুনল না কানে। কানের পাশ থেকে আধখানা বিড়ি খুঁজে বের করল সে। চুলোয় সাতসকালে ভাত রান্না হচ্ছে। এতোয়ারি বাড়ি থাকলে তাই হয়। সে বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে উঠোনে একটু দাঁড়ায়। কয়েকটা টান দিয়ে ফেলে দেয় অসাবধানে। ছোটীর চোখ সবসময় দাদার দিকে। চেঁচিয়ে ওঠে—আগ গিরল যে গে! তারপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

এতোয়ারি হনহন করে বেরিয়ে যায়।

রাস্তায় সে আনমনে হাঁটে। কখন এল ভাগীরথ? ওই দেখা যাচ্ছে সে বারোয়ারিতলায় পিঁড়ে পেতে বসে ভরতের দাড়ি কামাচ্ছে। মনের ঝড় চেপে রাখে এতোয়ারি। ভগীরথ সুখবর আনুক, নাই আনুক, তাকে এবার থেকে এমনি করে সব ঝড় সামলাতে হবে।

—আও এতোয়ারি, বইঠো! ভগীরথ তাকে দেখতে পেয়ে ডাকে। এতোয়ারি ভাঙা গলায় বলে—কতক্ষণ এসেছ দাদা?

—ঠিক টাইমে। আমার টাইম এদিক-ওদিক হবে না—ঝড় হোক, বরষাক।

এতোয়ারি হাসবার চেষ্টা করে। —ঝুট্! আমি তো রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম। ভগীরথ হাসে। দাঁড়ালে কী করে দেখবে? রাস্তায় আমি এলাম গঙ্গা পেরিয়ে—তোমার শ্বশুরগাঁ থেকে।

শ্বশুরগাঁ নিয়ে রসিকতায় বারোয়ারিতলায় হাসাহাসি পড়ে যায়। ধনপতি এখনও বাড়ি থেকে বেরোয়নি। তাই নয়ানসুখেরও দেখা নেই। রামলাল প্রভুরাম দাদারাম বসে আছে। সুখলাল আছে। এতোয়ারি বিব্রত। এদের সামনেই কি ভগীরথ তার সঙ্গে কথা বলবে?

এতোয়ারি দাঁড়িয়ে থাকে। কী বলবে তাকে ভগীরথ?

—সাচ্। তোমার শ্বশুর গাঁ হয়ে এলাম, এতোয়ারি। ভগীরথ কামাতে-কামাতে বলতে থাকে। কদিন ধরে কলাবেড়িয়ার মোড়লের সঙ্গে দেখাই হচ্ছে না। তো আজ নিষাদবাগের রোজ। ভাবলাম ভোরবেলা গিয়ে ওকে ধরব। বাত করব। তারপর নিষাদবাগে আসব।

ভরত বলল—দেখা হল কি না, সেটাই বলো শুনি।

—হুঁ। হল।

—কী বলল মোড়ল?

ভগীরথ ক্ষুরটা হাঁটুর নিচের মাংসে ঘষে নিয়ে বলে—যা বলল, তা ভালই বলল। ও তো মামুলি লোক নয় যে যা-তা বলবে।

ভরত অধৈর্য হয়ে বলে—আহা, বলল কী?

—প্রথমে বলল, আমার বেটি নিষাদবাগে আর যাবে না। তারপর বলল, তবে আমার বংশে কোন বেটি কখনও ছাড় নেয়নি মরদের কাছে—আমার বেটিও ছাড় নেবে না।

এতোয়ারি হাঁ করে শুনছিল। সুখলাল বলল—এ কথার মানেটা কী?

ভগীরথ হাসে। —মানে বহুৎ সিধা। এতোয়ারিকে ওর বাড়ি গিয়ে থাকতে হবে। বিয়ের আগে নাকি এরকম কথা হয়েছিল, বলল!

ভরত বলে—হুঁ। হয়েছিল। তবে সেটা অবস্থা বুঝলে, মোড়ল যখন বেমারিতে পড়বে, কী কমজোর হবে—তখন। এখন তো সে কথা ওঠে না।

ভগীরথ তার গালে ক্ষুরের শেষ টান দিতে থাকে। —সে তোমরা জানো দাদা, কী কথা হয়েছিল তখন। আমি সাফসুফ বুঝলাম, এতোয়ারিকে ঘরজামাই হয়ে থাকতে হবে।

রামলাল ফুঁসে ওঠে। বাঃ রে বাঃ। এতোয়ারির বোনের বিভা হবে, তবে না? কী বলো ভরত?

ভরত নিজেকে ভগীরথের হাত থেকে মুক্ত করে বলে—হাঁ হাঁ। ওহি বাত। ভূলে গিয়েছিলাম তাই বটে। ছোটীর বিভা হবে, তবে।

সুখলাল বলে—ঠিক আছে তাহলে ছোটীর বিভা দিক মোড়ল। তারপর জামাই নিয়ে চলে যাক।

প্রভুরাম মুখ খোলে। —সরস্বতী দিদি বুড়ি হয়েছে। ওকে কে দেখবে?

আসল সমস্যায় এতক্ষণে হাত পড়েছে। বেটার মা বেটার সঙ্গে বেয়াইবাড়ি গিয়ে থাকবে না, কিছুতেই থাকবে না, এটাই কড়া লোকাচার। দেশজুড়ে চাঁইসমাজে খিটকেলের চূড়ান্ত হবে। সরস্বতী কোন মুখে কলাবেড়িয়ার মোড়লের বাড়ি উঠবে? মোড়ল যদি মরে যায় তাও না। তখন এতোয়ারিই তো মালিক। সে ইচ্ছে করলে সব বেচে-খুচে মায়ের কাছে চলে আসতে পারে। কিন্তু মোড়লের মেয়ে যদি বেঁকে বসে, পঞ্চগেরামী করে, তাহলে? সে যদি বলে, বাপের ভিটে ছেড়ে নড়বে না?

এইসব আলোচনা চলতে থাকে বারোয়ারিতলায়। ধনপতি আর নয়ানসুখও এসে পড়ে আরও গম্ভীর হয় আলোচনা। এতোয়ারি একইভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

ধনপতি শেষে ডাকে—এতোয়ারি!

—বলো মুখিয়াজি!

—আমি বলি, তুই যা বেটা। দেখতে গেলে এতো ভালই। পয়সাওয়ালা হবি। শ্বশুরের মানে মান পাবি। গাঁওয়াল করতে হবে না। সুখেই থাকবি। চেহারা ভি খুলে যাবে!

—হুঁ, মা? ছোটী?

—ওরা আছে, আমরা আছি। আরে বাবা এই তো নদীর ওপার আর এপার। তুই নিজেও দেখাশুনা করতে পারবি। এ আর ঝামেলা কিসের?

ভরত বলল—লেকিন একহি বাত! মান্যবর মোড়ল তাহলে এসে জামাইকে নিয়ে যাক। নিষাদবাগের বেটারও তো একটা ইজ্জত আছে। গাঁয়েরভি আছে।

ভগীরথ মাথা দোলায়। —আমি বলেছিলাম সেকথা। মোড়ল আসবে না। বলল সেদিন গিয়ে খুব অপমান হয়ে এসেছে নাকি। আর এপারে আসবে না।

—আসবে না?

—না।

—এতোয়ারিকে যেতে হবে?

—হাঁ।

বারোয়ারিতলায় স্তব্ধতা নামল কিছুক্ষণ। একটু পরে ধনপতি ডাকে।

—এতোয়ারি!

—হাঁ?

—কী করবি বেটা?

এতোয়ারি কী বলতে যাচ্ছিল, কখন ধনপতির খড়ের পাঁজার পেছনে সরস্বতী এসে দাঁড়িয়ে আছে—তার হাতে ছাগলের দড়ি এবং ছাগল আর ছোট্ট দুরমুষ—সে চিলচেঁচানি চেঁচিয়ে উঠেছে আচানক—গহনা! উন্নিশভরি গহনা! ডাকুর বেটা ডাকু উও বাত নেহি বোলা? হারামখোরকা বেটা, বাটপাড়কা বেটা, দাগাবাজকা বেটা!...

ধনপতি একবার থামাতে চেষ্টা করে—বহিন!

সরস্বতী ছাগলটাকে হ্যাঁচকা টানে টেনে নড়বড় করে এতোয়ারির সামনে এল। দুরমুষ তুলে চেরা গলায় চেঁচায়—আমার পেটে তোর জন্ম হয়েও কলাবেড়িয়ার মোড়লের বেটিকে যদি তুই লিতে যাস, তবে আমি তোর মা নই—কলাবেড়িয়ার মোড়লের বেটি তোর মা—তোর মা—তোর মা—তোর মা...

বুড়ি দুরমুষটা নিজের মাথায় ঠুকতে শুরু করছে। নয়ানসুখ তাকে ধরে।

জষ্ঠি মাসের সংক্রান্তির দিন গঙ্গাপুজো। ওই দিন বিকেলে বা সন্ধ্যায় বিষ্টি-বাদলা হবেই। ঝড়ঝাপটাও আসতে ছাড়বে না। দেখতে-দেখতে লোকের এমন সলগুণ (অভ্যাস) হয়েছে যে ওদিন আকাশ তকতকে দেখলে বলবে, দূর! এবার জমবেই না। কিন্তু ও তো সকাল বেলার আকাশ। পুজোর মেলা সেই বিকেলে শুরু। তখন কিন্তু আকাশের হাবভাব বদলে গেছে। বাঁশবন, সাধুর শ্মশান আর পালিতবাবুর চিমনিভাটার পিছনের জঙ্গল থেকে শিবের চেলারা কাঁইরে-মাইরে করে বেরিয়ে আসছে। মা গঙ্গার পুজো। বাবা মহাদেবের ওই এক মজা করার স্বভাব। দিয়েছে ভূতনী-প্রেতিনীদের লেলিয়ে। ল্যাংড়া রঘুয়া সেদিন ক্রাচে ভর দিয়ে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে গঙ্গার চড়া পেরিয়ে এসেছে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে সবাই যখন মাথা বাঁচাতে ছত্রভঙ্গ হয়েছে, সে নড়ছেই না আসন ছেড়ে। মড়ার খুলিতে কারণ ঢেলে খাচ্ছে, আর চেঁচাচ্ছে—হো হো হো! বহুৎ আচ্ছা! হো হো হো! ভাবখানা এই, মায়ের গেরস্থালি বাবার চেলারা পণ্ড করে দিচ্ছে—এবার দেখা যাক গঙ্গাবেটি তুই কী করিস!

শুধু রঘুয়া ল্যাংড়া কেন, নিষাদবাগের জোয়ান-জোয়ানী ছোকড়া-ছোকড়ী সব্বাই এসেছে। ফিবছর এই দিনটির মুখ তাকিয়ে থাকে ওরা। কেবল ওরাই বা কেন, কাছের ও দূরের কে না প্রতীক্ষা করে গঙ্গাপুজোর? হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, জাত-ধর্ম যাইহোক, সবাই এসে জুটবে এ মেলায়। পশ্চিমপাড়ে ওদিকে উত্তরে রাধারঘাট, এদিকে দক্ষিণে কলাবেড়িয়া, তার মাঝামাঝি সাধুর শ্মশান। শ্মশানের লাগোয়া ঢালু পোড়ো জমিটায় মেলা বসে। দেখতে-দেখতে সেই মেলা গঙ্গার বুকঅব্দি ছড়িয়ে যায়। শুকনো বালির চড়া ধু-ধু করে এখন। ওই দূরে পূর্বপাড়ে নিষাদবাগের পায়ের নিচে একফালি স্রোত বইছে কি বইছে না। চড়ার মধ্যে এখানে-ওখানে আটকে পড়া ছোটবড় পুকুরের মতো যা জল ছিল, শুকিয়ে গেছে খরায়। তাই অঢেল খোলামেলা জায়গা। যত লোক জুটুক, ভিড় ঘিঞ্জি হয়ে ওঠে না। আর মেলার পরমায়ু তো সন্ধ্যাঅব্দি। অন্ধকার ঘন হতে-হতে সব ফাঁকা হয়ে যাবে। হয়তো তখনও জুগজুগ করবে দু'একটা লণ্ঠন। দু'একটা চেরা গলার ডাক। বাড়ি ফেরার। হারানো মানুষ খোঁজার। মড়াখেকো কয়েকটা কুকুর ঘুরঘুর করে। শালপাতার টুকরো, কাগজ, উনুনের ছাই, আর কড়া দুর্গন্ধ। যে যেখানে পেরেছে, কুকম্মটি করে গেছে। বৃষ্টিতেও সে-ঝাঁজ যায়নি।

তাহলেও এ একটা বিকেলের মতো বিকেল। সন্ধ্যা। মেলা থেকে নিঃঝুম সন্ধ্যায় ভিজে জবুথবু হয়ে যদি না বাড়ি ফিরল, কিসের সুখ?

জীবনে এই প্রথম এতোয়ারি মেলায় এল না। ছোটী মাথা ভেঙে-ভেঙে অবশেষে অঞ্চলার সঙ্গ ধরেছিল। তার ফলে কোনাকোনি আধক্রোশ বালির চড়া ভাঙতে অঞ্চলার কোলের ছেলেটা যা জ্বালাল, মাগো মা! ছোটীকে বার-বার কোলে নিতে হয়েছে। হয়তো অঞ্চলা থল-থলে গতর নিয়ে যেভাবে পা ফেলেছিল, পৌঁছবার আগেই মেলা ভেঙে যেত। তার ওপর সামনে কালো মেঘ। চড়ায় বালি উড়তে শুরু হলে সে এক বিপদ। ভূত হয়ে যাবে বলে নয়, চোখ বুজে বসে থাকতে হবে—নয়তো কানা হয়ে যাবে। কিন্তু বরাত ভাল যে ঝড়টা উঠল মেলায় গিয়ে এবং ঝড় প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টি নিয়ে এল। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে লাগতে না লাগতে অঞ্চলার বেটা ভাঁ-ভাঁ করে বিকট কান্না জুড়ে দিল। তখন অঞ্চলা তাকে দুমদাম পেটাতে-পেটাতে সাধুবাবার আখড়ায় মাথা বাঁচাতে দৌড়ল। সেই ফাঁকে ক্রুদ্ধ ছোটী কেটে পড়েছে। অনেকেই যখন ভিজছে, ভিজে-ভিজে পুজো দিচ্ছে, 'মানসা' করছে—সেই বা ভিজবে না কেন? এমনকি দুআনা দিয়ে গঙ্গামায়ের পুতুলও কিনে ফেলেছে। তালের ছাতার তলায় আগলে নিয়ে বসেছিল লোকটা। কিনে আঁচলের তলায় লুকিয়ে পুরুতঠাকুর বেছে নিয়েছে। অনেক পুরুতঠাকুর এখন মেলে। বেছে-বেছে বেশ মোটাসোটা একজনকে পছন্দ হয়েছে ছোটীর। চার আনা দক্ষিণা, আর এক আনা ফুল বেলপাতা দুব্বোঘাস সিঁদুর ইত্যাদির দাম। দাদা তাকে আজ বড়মুখে একটা টাকা দিয়েছে। ছোটী তা ভালকাজেই খরচ করতে চেয়েছিল। এর চেয়ে ভাল কাজ আর কী হতে পারে? আগের-আগের বছর তার দাদা কিংবা মা এসে পুজো দেবে। এবার সে বড় হয়ে গেছে না? শাড়ি পরা ধরেছে। ছোকড়িরা শাড়ি পেলেই বহুড়ী হবার মওকা এসে গেল জীবনে। শাসের কথা ভেবে একটু-আধটু ডর মনের কোনায় থাকবে না, এমন নয়, কিন্তু বহুড়ী হবার যে আরও কত মজা! গায়ে গহনা উঠবে, সিঁথায় সিঁদুব। ঝমর ঝমর মল বাজিয়ে কাঁখে ঘড়া নিয়ে গঙ্গামে নাহানে

যাবে, সঙ্গে ননদ-জায়ের দল। বুড়িরা ঘোমটা তুলে চিবুকে আঙুল রেখে মুখখানা দেখবে। তার দিকে তখন গাঁয়ের সবারই নজর। আর শাস যত মন্দই হোক গাছগাছালি লতাপাতার প্রথম ফসলটি নতুন বহুড়ীকেই তুলতে বলবে। ছোটীর কত সাফ-সাফ মনে আছে, প্রথম কলার কাঁদিটি তার মা কলাবেড়িয়ার মোড়লের বেটিকেই কাটতে বলেছিল। আনাড়ি বহুদিদির নতুন কাপড়ে কষ লেগে দাগ পড়ে গিয়েছিল। দাগগুলো আর ওঠেনি। চোখ বুজলেই ছোটী দেখতে পায়, ঘোমটার ফাঁকে বহুদিদি কলার সবুজ কাঁদির দিকে তাকিয়ে আছে এক হাতে কাটারি, ঠোঁটে আধফোটা হাসি, কেমন করে এক পাঁচে কাটবে তাই ভাবছে। আর কলাগাছটাও যেন ডর পাচ্ছে না। সেও হাসিমুখে আরেক বহুড়ী সেজে মিষ্টি হেসে তাকিয়ে আছে। যেন বলছে—তোর জন্যেই তো দিন গুনছিলাম রী। কী ভাবছিস অত? ভারিভুরির নাম নিয়েছিস তো? তাহলেই সব ঠিক আছে।

তবু যদি ডর করো, হাত কাঁপে, তোমার বিপদ। শাস বিগড়ে তো যাবেই, গাছগাছালি লতাপাতা ভি রেগে যাবে। ফলমূল খন্দে 'বরকত' হবে না। এমনকি তোমার বিপদ আরও বাড়িয়ে শুকোতে-শুকোতে মরে ভি যাবে। ছেদীলালের বউয়ের বেলা তো তাই হয়েছিল। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার চোটে মেয়েটা কঞ্চে-ফুলের বিচি ছেঁচে খেতে গিয়েছিল। ধরা পড়ে লাঞ্ছনা আরও বাড়ত। নেহাৎ ছেদীরাম মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে 'আলগ' হয়ে গেল, তাই বাঁচোয়া। কিন্তু দেখবে, ওই বছর জন্যে ছেদীরামের দুবেলাও ভাত জোটানো মুশকিল। কোন পয় নেই। বরকত নেই। গাছের গোড়ার ইঁদুর লাগে। ফল-ফলারি পাখ পাখালিতে খেয়ে ফেলে। কতরকম উপদ্রব—ভারিভুরির পুজো দিয়েও কিচ্ছু হয় না।

ভাগ্যিস, ছোটীর বহুদিদির হাত কাঁপেনি। ডরায়নি। ফল-মূল-খন্দ সবজির ফলন বেড়ে গিয়েছিল। খুব পয়মন্ত বরকতওয়ালী বহুড়ী ছিল মোড়লের বেটি। সে তো জানে না, শাস মুখে যতই গালমন্দ করুক আড়ালে কত প্রশংসা করেছে ছোটীর সামনে। আবার ছোটীকেও চোখ টিপে শাসিয়েছে, তুই যেন আবার বলে দিসনে রী। তাহলে গুমোরওয়ালী হয়ে যাবে। একে তো বড়ঘরের বেটি।

ছোটী অনেক লুকিয়েছে, অনেক মুখ ফসকে বেরিয়েও গেছে কিন্তু বহুদিদি এক আজব মেয়ে। শাশুড়ির প্রশংসায় ওর দৃকপাতই ছিল না। সব কথাতেই খালি—ছোড় দো রী!...

বৃষ্টির মধ্যে পুজো দিতে-দিতে ছোটীর মনে এইসব কত ভাবনাচিন্তা এল, চলে গেল। পুরুতঠাকুর মন্তর পড়ার আগে বলে দিল, মানসা করবি মন খুলে। কেমন? আমি পুজো করি। তারপর ঢুলিকে ঢোল বাজাতে ইশারা দিল। এদিকে সবাই যা করে, ছোটী তাই করল। হাঁটু দুমড়ে বসে মাথা ঠেকিয়ে রইল কতক্ষণ। যতক্ষণ না পুরুত বলল, ওঠ, ওঠ হয়ে গেছে। প্রসাদ নে। উঁহু, আঁচল পাত্। একটা গেরো দিয়ে বাঁধবি যেন।

তখন ছোটী কাঁপছে। কেমন অবশ লাগছে নিজের ছোট্ট শরীরখানা। চোখে বৃষ্টির ঘোরের চেয়ে গভীর একটা ঘোর লেগেছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না পষ্টাপষ্টি। কাঁপতে-কাঁপতে আঁচলে প্রসাদ বেঁধে যখন উঠল, মনে হল—ওই যাঃ! চোখ বুজে মাথা ঠেকিয়ে শুধু চুপচাপ পড়েই ছিল যে। 'মানসা' তো করেনি সে! কত কী চাইতে হয় গঙ্গামাইজিকে। কিচ্ছু চাওয়া তো হল না।

একটুখানি দুঃখের পর ছোটীর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তারপর ভাবল, কী—কী বলার ছিল মানসার সময়, গঙ্গামাইজি কি জানে না সে খবর? নিশ্চয়ই জানে। সে পয়মন্ত বরকতওয়ালী বহুড়ী হতে চেয়েছিল। তার দুঃখী এবং বোকার হদ্দ দাদার জন্যে সুখ আর 'জেরাসে আক্কেল' প্রার্থনা করতে চেয়েছিল। আর চেয়েছিল কলাবেড়িয়ার মোড়লের বেটি যেন নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিবাদবাগে ফিরে আসে!...

ততক্ষণে সে ভিজে কুঁকড়ে গেছে। গঙ্গার বুকে বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়া বইছে তুলকালাম। সে পাড় ঘেঁষে ওঠা বিরাট বটগাছটার দিকে দৌড়ুল। পাড়ের ওপর থেকে নিচে গঙ্গা অব্দি গিজগিজ ঘুলিয়ে গেছে। ভিড়ের ফাঁকে যেই না সে ঢুকেছে কে তাকে দুহাতে টেনে নিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছে।

ঘুরে দেখেই ছোটী থ। নিজের চোখকে কয়েকমুহূর্ত বিশ্বাস করতে পারে না। তারপরই সে সবাইকে অবাক করে বুক ফেটে কেঁদে ওঠে—বহুদিদি গে!

তারপর দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে ছোটী মুখ গুঁজে দেয় ওর বুকে। হু হু করে কাঁদে। ফুলকলিয়া ছাড়াতে চেষ্টা করে তাকে। —ছোটী! শুন্ রী, শুন! আঃ! কী করছিস রী তুই? মেলা খোলা জায়গা! এই ছোটী! চাপা গলায় সে ধমকের সুরে বলতে থাকে এসব কথা।

ছোটী হঠাৎ ওকে খামচাতে শুরু করে। গোঙিয়ে-গোঙিয়ে নাকের জলে চোখের জলে করে শুধু বলে—কাহে? কাহে? কাহে? কেন কেন কেন?

ফুলকলিয়ার কাতুকুতু লাগে। সে হাসতে হাসতে ওর হাত দুটো ধরে ফেলে। তারপর বলে—তুই একেবারে পাগলী রী ছোটী! সিরফ পাগলী! আয়, আমার সঙ্গে—আয় তো! আয়!

সে ছোটীকে টানতে-টানতে নিয়ে যায় বৃষ্টির মধ্যে। ফাঁকায় গিয়ে খোলামেলা ঢালু পাড়ে ওঠে। পাড়টা পিছল হয়ে গেছে। বার-বার পা পিছলে যায় দু'জনেরই এবং আছাড়ও খায়। আছাড় খেয়ে ফুলকলিয়া খিলখিল করে হাসে। ছোটী তখন গুম হয়ে গেছে। ওপরে আসল মেলা। ছাউনি বেঁধে দোকানপাট বসেছে। সে-ছাউনি তেরপল, করগেট শিট, কিংবা খড়ের টাট—নেহাত চট। ফুলকলিয়া মেঠাইয়ের দোকানের সামনে গিয়ে বলে—বোল রী, কী খাবি? মোণ্ডা খাবি, না রসগুল্লা? জিলিপি খাবি? আমার জিলিপি খেতে খুব ভাল লাগে!

ছোটী মাথাটা জোরে দোলায়। তার দৃষ্টি ফুলকলিয়ার কাপড়ের দিকে এখন। সে অবাক হয়ে গেছে। এমন রঙচঙে ফুলকাটা শাড়ি পরেছে বহুদিদি! এতো ভদ্দরলোকের বউ-ঝিরা পরে। ছোটী মায়ের সঙ্গে শহরে গিয়ে ভদ্দরলোকের বউ-ঝি দেখে এসেছে। শরতের বউ নির্মলারও এমন একটা শাড়ি আছে। কখনও-কখনও পরতে দেখেছে তাকে। কিন্তু তার বহুদিদি এমন শাড়ি পরবে, সে ভাবতেই পারেনি। হুঁ মোড়লের অনেক টাকাকড়ি আছে বটে, কিন্তু এমন শাড়ি তো এতদিন মোড়ল মেয়েকে কিনে দ্যায়নি।

ছোটীর মন নিরাশায় ভরে গেল। মনে হল, বহুদিদির সঙ্গে তাদের একটা আকাশ-পাতাল ফারাক এনে দিয়েছে এই শাড়িটা। নিষাদবাগে থাকতে কেন এমন শাড়ি পরেনি বহুদিদি? আর বহুদিদির চেহারায়, চোখে-মুখে হাবভাবেও অন্য এক মেয়েকে দেখতে পাচ্ছে সে। সেই চেনা বহুদিদির সঙ্গে একটুও মিলছে না। কত সুন্দর লাগছে মোড়লের বেটিকে। এখন যদি ওকে কেউ ভদ্দরলোকের বউঝি ভেবে বসে, তার দোষ নেই। ওদের ভিড়ে ঢুকিয়ে দাও, তুমি খুঁজে বের করতেই পারবে না।

—ক্যা রী? হাঁ করে তাকাচ্ছিস কেন? বল না, কী খাবি?

ছোটী মাথাটা আরও জোরে দোলায়। কিচ্ছু খাবে না। তার মন খারাপ হয়ে গেছে। আর বৃষ্টিতে ভিজতে তার ভাল লাগছে না। কষ্ট হচ্ছে। শীত করছে। সে অসহায় চাউনিতে এদিকে-ওদিকে তাকায় আর মাথাটা দোলায়।

ফুলকলিয়ার একটু রাগ হয়। সে বলে—আমি দুশমন হয়ে গেছি রী, তাই তো? বল্ না, তোর মা বারণ করেছে। বেশ, খাসনে!

ছোটীর কাঁধে বাঁ হাত রেখেছিল ফুলকলিয়া। হাতটা উঠে যাচ্ছে টের পেয়ে ছোটী নড়ে উঠে। ফুলকলিয়ার কাপড় আঁকড়ে ধরে সে। তারপর অস্ফুট স্বরে বলে—হামার জাড় লাগে বহুদিদি গে!

বৃষ্টি ধরে এসেছে। লোকেরা গাছপালার আশ্রয় থেকে একদু'জন করে বেরিয়ে আসছে। আবার ঢোলে কাঠি পড়েছে। যেসব সাবধানী ঢুলী জল বাঁচাতে ঢোলে কাপড় মুড়ে রেখেছিল, তারা এবার নাচতে-নাচতে গঙ্গায় নেমে যাচ্ছে। ফুলকলিয়া বলল—জাড় লেগেছে, তাই খাবিনে? বোকা মেয়ে! এ দাদা, এক পোয়া জিলিপি দাও!

জিলিপি ঠোঙায় ভরে ওজন করছে মেঠাইওয়ালা। ফুলকলিয়া তারপর ব্লাউসের ভেতর হাত পুরে যা বের করেছে, দেখে তো ছোটী আবার থ। ছোট্ট চামড়ার থলিয়া—থলিয়া না খাপ, কী একটা বটে। ছোটী জিনিসটা দেখেছে। কোথায় দেখেছে মনে নেই, কিন্তু দেখেছে। ধর না রী, হাঁ করে কী দেখছিস? বলে সেই জিনিসটা থেকে ফুলকলিয়া একটা একটাকিয়া নোট বের করল।

ছোটী ঠোঙাটা নিল। পরক্ষণে মনে পড়ল, হ্যাঁ—অমন জিনিস শরতের কাছে দেখেছে। চৌবেজির

কাছেও দেখেছে! আরে! হাটুয়ার কাছেও তো দেখেছিল! হাটুয়া তার দাদাকে কিনতেও বলেছিল বটে। হাঁ হাঁ—'বেক' বলে ওটাকে। উঁহু শুধু বেক নয়. কী বেক যেন! ছোটী আবও হুতাশ হল বহুদিদি সম্পর্কে। কিন্তু একটু হাসল সে। হেসে ফিসফিস করে বলে—কেক রী বহুদিদি?

ফুলকলিয়া ভাঙানি শুনতে বেশ সময় নিল। তারপর ছোটীর কাঁধে আবার হাত রেখে বলে—বিষ্টি ছেড়ে গেল রী! মেলা খুব জমবে। আয়, সাধুবাবার ওখানে যাই। টিউবেল আছে।

পেছনে বাঁশবনের ওপর এইসময় মেঘ ভেঙে সূর্যের ঝিলিক দেখা দিয়েছে। ঝলমলে সোনালী রোদ পড়ল কতদূর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। নিষাদবাগের দিকে তখন বৃষ্টির রেখাগুলোও দেখা যাচ্ছে। ফুলকলিয়া হাসতে-হাসতে বলে—উ দেখ! খেঁকশিয়ালের বিভা হচ্ছে! রোদমে বর্ষালে খেঁকশিয়ালের বিভা হয় জানিস তো?

ছোটী ঘাড় নেড়ে বলে—বেক কিনেছিস বহুদিদি?

ফুলকলিয়া বলে—মনিবেক? হাঁ রী সেদিন শহরমে গেলাম। গিয়ে কিনলাম।

—শহরমে? কিসকা সাথ গেলি বহুদিদি?

ফুলকলিয়া দুষ্টুমির ভঙ্গিতে হেসে বলে তোর মাকে গিয়ে সব বলবি তো! বলিস! হামি রোজ শহরমে যাই। সেনিমা দেখি!

ছোটীর এখন মুখ ফুটে গেছে। ওকে সবাই বলে 'কটকটি' মেয়ে। কটরকটর করে কথা বলতে ওস্তাদ। এখন সে সেই কটর-কটর শুরু করেছে।—রোজ যাস! সেনিমা দেখিস?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলিস তোর মাকে।

—একেলা যাস, বহুদিদি?

—হুউ।

—ঝুট।

—কাহে ঝুট? শহর তো হুউ নজদিগমে। এ তো তোদের নিষাদবাগ না। রাধার ঘাটে গেলাম, না নৌকোয় চাপলাম। নৌকোয় চাপলাম না শহরমে পঁহুছেলাম।.... বলে ফুলকলিয়া ছোটীর মুখটা খামছে ধরে।—মায়ের হয়ে বেটি এসেছে বাত করতে!

সাধুবাবার আখড়ার গেটে ঢুকতে-ঢুকতে ছোটী বলে—হামাকে ছেনিমা দেখাস বহুদিদি।

—দেখাব। আসিস।.... বলে ফুলকলিয়া টিউবলের দিকে এগিয়ে যায়। গাঁদাফুলের বাগান করেছে সাধুবাবা। বাগানের কোনায় টিউবেল। তার পিছনে গোড়াবাঁধানো ঝাঁকড়া বটগাছ—যার শেকড়বাকড় ওপাশে গঙ্গায় নেমে গেছে। বাঁধানো চত্বরে বসে কেউ-কেউ মেঠাই খাচ্ছে। আখড়ার মঠের সামনে সামিয়ানার তলায় খোলকরতাল বাজিয়ে কীর্তন হচ্ছে। অন্যপাশে ঢোলকাঁসি বাজছে। পুজো হচ্ছে গঙ্গামাইজির। ফুলকলিয়া গিয়ে বসে পড়ে। ছোটীকেও বসায়। তারপর জিলিপি তুলে নিয়ে বলে—খা রী!

খেতে ইচ্ছে করছে না, অথচ জিলিপি বড় লোভের খাবার। আজকাল তো আর মেঠাই খাওয়াই হয় না ছোটীর। আগে দাদা গাঁওয়াল থেকে ফেরার সময় তার জন্যে কিছু না কিছু আনতই। মোণ্ডা হোক, কদমা হোক, জিলিপি হোক কিংবা অগত্যা তেলেভাজার 'মেঠাই'। আজকাল আনতে ভুলে যায়। ছোটীর মনে হয়েছে, আসলে বহুদিদির জন্যেই আনত যেন।

তা হোক, তার দাদা খুব ভালমানুষ। বোকার হদ্দ, এই যা। ছোটীর আবার মন খারাপ করে। আহা, কতদিন ধরে গঙ্গাপুজোর মুখ তাকিয়ে ছিল। পুজো দেখে রাতে যদি গানের আসর বসে, গান শুনবে। শুনে বাড়ি নাই বা ফিরল। পাশেই তো বহুদিদির বাপের বাড়ি।

—তুই খাচ্ছিস না কাহে রী? খা বলছি! ফুলকলিয়া জোর করে ওর মুখে জিলিপি গুঁজে দেয়। আবার বলে—মা বারণ করেছে, এই তো?

ছোটী মাথা দোলায়। কেন যে খেতে ভাল লাগছে না, বুঝিয়ে বলা ওর পক্ষে মুশকিল। সে অন্য কথা বলে—মেলায় তুই একেলা এসেছিস বহুদিদি?

—হ্যাঁ। একেলা আসব না কেন? ওই তো নারকেল গাছের ডগা দেখতে পাচ্ছিস, ওই তো আমাদের বাড়ির গাছ।

গাছটা দেখে ছোটীর কত কথা মনে পড়েছে। পয়সাওলা বড় বাড়িতে কুটুম্বিতে করার কত যে আনন্দ আছে। ছোটার সখ ছিল, কয়েকটা দিন কলাবেড়িয়ায় যেন তার বেড়াতে যাওয়ার বরাত হয়। শনবাবা তাকে কত ভালবাসে। কতবার যেতে বলেছে। কত বেশিদিন থাকতে বলেছে। মায়ের জন্যে সে সাধ মেটেনি। মা কিছুতেই ওকে যেতে দেবে না। যদি বা দেয়, একবেলার বেশি থাকতেও বারণ। এখন যদি তাকে বহুদিদি তাদের বাড়ি নিয়ে যায়, সে যাবে, না যাবে না? খুব ভাবনায় পড়ে গেল ছোটী। নিয়ে গেলে সে খুবই খুশি হবে। কিন্তু তার যাওয়া কি উচিত হবে?

জিলিপিগুলোর বেশিটাই খেল ফুলকলিয়া। তারপর টিউবেলে জল খেল। জল খেয়ে ফুলকলিয়া বলল—সাধুবাবাকে দেখবি রী?

ছোটীর দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তক্ষুণি বহুদিদির মত বদলেছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে গাঁদাগাছের কাছ ঘেঁষে যেতে যেতে সে পটাপট দুটো ফুল ছিঁড়ে মুঠোয় লুকোয়। তারপর গেট পেরিয়ে মেলায় ঢোকে। একখানে ভিড় জমেছে। ভৈরবীর ভর উঠেছে। জটা নেড়ে ভীষণ দুলছে। ফুলকলিয়া উঁকি মেরে দেখতে থাকে। ছোটী তার কাঁধ ধরে দু'পায়ে বুড়ো আঙুলে ভর দেয়। কিন্তু লোকগুলো যা উঁচু। এই সময় ফুলকলিয়া কাকে ধমকায়—চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? দেখতে পাচ্ছ না। খালি গায়ের ওপর পড়ছ?

বহুদিদির মুখে চাঁই-বোলিতে কথা শুনতে অভ্যস্ত ছোটী। এখন পরিষ্কার দেশোয়ালি বোলিতে কথা বলতে শুনে অবাক হয়। ফুলকলিয়া একেবারে দালালবউ নির্মলা হয়ে গেছে যেন। সে তার হাত ধরে সরে আসে ভিড় থেকে। মুখে বিরক্তির ভাব। চাপা গলায় বলে—যেখানে যাচ্ছি, গায়ের ওপর এসে পড়ছে মরদগুলো। আর চোখের নজর দেখছিস? যেন গিলে খাবে।

গঙ্গার চড়ায় গিয়ে পুজো দেখতে-দেখতে 'ঘোরানি' এসে গেল। সূর্য বাঁশবনের ওধারে ডুবে গেছে। ঘন কালো মেঘের মাথায় লাল হলুদ রঙ খাপচাখাপচা লেগে আছে। হাওয়া দিচ্ছে জোরে। বৃষ্টি আবার হয়তো আসবে। কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে ফুলকলিয়া বলে—কাপড় শুকিয়ে গেছে আমার। দেখি, তোর শুকিয়েছে নাকি?

ছোটী তার ডুরে তাঁতের শাড়ি পরখ করে বলে—হাঁ রী বহুদিদি।

—আমার শাড়িটা কেমন হয়েছে বলতো ছোটী,

—খুব ভাল বহুদিদি! কেত্তা দাম রী?

—এগারোরুপেয়া।

—এগারো কেত্তা রী?

—আধমণ ছোলার দাম। ফুলকলিয়া গর্বের সঙ্গে বলে।

ফুলকলিয়া ননদের অজ্ঞতায় হাসে। হেসে বলে—তোদের বাড়িতে যে বেতের কাঠা আছে, তার বিশ কাঠা।

ছোটী কি বিশ গুনতে শিখেছে এখনও? সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তখন ফুলকলিয়া হাসতে-হাসতে হাঁটু দুমড়ে বসে বালি জড়ো করতে থাকে। বলে—দেখ বিশ কাঠা কেত্তা ছোলা।

বালির স্তূপ দেখে কিশোরী ননদ অবাক।—ওত্তা রী বহুদিদি! মা গে মা ওত্তা খন্দ দেকে শাড়ি কিনেছিস?

বালি ঝাড়তে-ঝাড়তে ফুলকলিয়া উঠে দাঁড়ায়। বলে ভাল লেগেছে, কিনেছি। তোরা তো কিনে দিতিস নে। থাম, থাম। এ শাড়ি কিনতে হলে তোর মায়ের কোঠি ভি (মাটির জালা) বেচতে হত!

হাসতে-হাসতেই বলে! কিন্তু ছোটী খোঁটা দেওয়া হচ্ছে ভেবে দুঃখিত হয়ে জবাব দেয়—তোর বাবা বড়া আদমী। আমরা কি বড়া আদমী? আমার দাদা গাঁওয়াল করে খায়। সেতো মুখিয়ার বেটা সূরয নয়!

ফুলকলিয়া ভুরু কুঁচকে দুষ্টুমি করে তাকিয়ে শুনছিল। এবার ওর মুখ খামচে ধরে বলে—হয়েছে, হয়েছে। হয়েছে। থাম। সূরযের কথা তুলছিস কেন? হাঁ রী ছোটী, সূরযের বিভার কথা শুনে এসেছিলাম, কী হল?

ছোটী বলে—বিভা নেহি দিবে রী বহুদিদি। কাপাসীর পূরমের বেটিকেও পসন্দ হয়নি। মালতীর মা বলছিল, সূরযুয়া ভিনজাতে বিভা করবে।

—বলিস কী!

—হাঁ রী বহুদিদি। লিখাপড়হা ভদ্দরলোকের বেটি ওর পছন্দ। মালতীর মা বলছিল। ফুলকলিয়াকে একটু আনমনা দেখায়। আবছা অন্ধকারে ওর মুখের রেখা বোঝা যায় না। একটু পরে বলে—কোন দেগা উসকো? ছোড় বড়া-বড়া বাত! বাঙ্গালী লোকে ওকে বেটি দেবে?

—বাঙ্গালী কৌন রী বহুদিদি?

তুই বড্ড বোকা ছোটী। কিচ্ছু জানিস নে।

—ছোটী অপ্রস্তুত হয়ে বলে—শুনেছি, শুনেছি। সবাই তো বাঙ্গালীঠো বলে। লেকিন বহুদ্দি, আমি ভেবেই পাই না, কৌন বাঙ্গালী!

—দেশোয়ালি লোকদের বাঙ্গালী বলে। বুঝেছিস?

—হো গা।

—হো গা নেহি রী ছোকড়ি! উ দেখ, উও সব বাঙ্গালী।...বলেই হঠাৎ ফুলকলিয়া ছোটী কে টানে। টেনে পাড়ের দিকে হনহন করে এগিয়ে যায়।

ছোটীর মনে হয়, বহুদিদি যেন ভেগে যাচ্ছে হঠাৎ। ওপরে গিয়েও ফুলকলিয়া দাঁড়ায় না। মেলার শেষদিকটায় বাঁশবনের ধারে কাঁচা রাস্তা। রাস্তায় গিয়ে ফিসফিস করে বলে—তোদের গাঁওবালারাও এসেছে দেখলাম!

—এসেছে। আসবেই তো। কাহে ওকথা বলছিস বহুদিদি?

—তুই কার সঙ্গে এসেছিস?

—অঞ্চলার সঙ্গে। বিষ্টির সময় অঞ্চলাকে আর খুঁজেই পেলাম না। ছোটী অবাক হয়েছে অবশ্য। হঠাৎ কেন একথা বলছে মোড়লের বেটি, সে বুঝতে পারে না। তাই ফের বলে—কাহে পুছ করছিস বহুদিদি?

—ছোটী, একবাত শুন। ...ফুলকলিয়া ফিসফিস করে বলতে থাকে। বাবা বারণ করে একেলা ঘুরে বেড়াতে। নিষাদবাগওলা দেখলে পাকড়ে নিয়ে যাবে নাকি। আমি ডর পাই না, জানিস তো? ছোটী তাকায় মুখের দিকে। কিছু বলে না।

—চড়ায় তোদের গাঁওবালা দুতিনজনকে দেখলাম। আমার দিকে তাকিয়ে ফুসুর-ফুসুর করছে। ...বলে ফুলকলিয়া একটা ভঙ্গি করল কাঁধ আর হাত নেড়ে।

হুঁঃ! এপারে আমার গায়ে কেউ হাত দেবে, এত তাকত কারুর নেই। ওই তো দেখছিস। কলাবেড়িয়ার কত লোক রয়েছে মেলায়।

ছোটী এবার ফোঁস করে ওঠে—ওসব কথা আমাকে শোনাচ্ছিস কেন রী বহুদিদি? আমি ওসবের কী জানি?

—সাচ্ বল্ ছোটী, নিষাদবাগওয়ালা কোন মতলবে আসেনি তো মেলায়?

ছোটী জোরে মাথা দোলায়।—না রী, না। ভারিভুরির কসম। ঠাকুরবাবার কসম। গঙ্গামাইজির কসম।

—খুব হয়েছে। আর কসম খেতে হবে না। ফুলকলিয়া এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে—তুই এখন কী করবি? বাড়ি যাবি তো?

—তুই কী করবি?

—আমার কেমন যেন লাগছে। আমি বাড়ি চলে যাই, ছোটী।

ছোটী ভেবে পায় না, কী করবে। বহুদিদির সঙ্গ ছাড়া হবার কথা সে ভাবতেই পারছে না। সে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকার একটু ঘন হয়েছে। মেলায় ভিড় কমতে লেগেছে। আলোও জ্বলেছে এখানে-ওখানে। একটু পরেই তো মেলা ভেঙে যাবে। ছোটী দেখে, ফুলকলিয়া চলে যেতে পা বাড়িয়েছে। অমনি সে কেঁদে ওঠে প্রায়। বহুদ্দি! বহুদ্দি!

—কী হল রী?

—আমি একা বাড়ি যাব কেমন করে?

—তবে আমার সঙ্গে আয়।...

ননদকে এতদিন পরে পেয়ে ফুলকলিয়ারও ইচ্ছে করছিল না সঙ্গ ছাড়ে। নিষাদবাগের জীবনে দুটি মেয়ের সঙ্গ তাকে ভাল লেগেছিল। শরত দালালের বউ, আর এই ছোটী। তবে নির্মলাকে তার তখন যত ভালই লাগুক, একটু-আধটু গা ছমছম ভাব ছিলই। ছোটীর বেলায় তা নয়। এই মেয়েটিকে মাঝে-মাঝে মনের কথা খুলে বলেছে। সে কিন্তু মুখ ফসকে সেগুলো তার মায়ের কানে তোলেনি। তার চেয়ে বড় কথা, ছোটী কথায়-কথায় ফচকেমি করে দুঃখের মধ্যেও তাকে হাসিয়ে নাকাল করেছে। বাপের বাড়ি চলে এসেছে বটে, ছোটীর কথা তার মাঝে-মাঝে মনে পড়েছে। একটু মন কেমনও করেছে। তাই আজ ছোটীকে কাছে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে টেনে নিয়েছে।

রাস্তায় মেলা থেকে যাওয়া লোকের ভিড় আছে। কাচ্চাবাচ্চারা বাঁশিতে ফুঁ দিতে দিতে মনের সুখে বাড়ি ফিরছে। কলবলিয়ে কথা বলছে মুখরা মেয়েরা। কার বাচ্চা বেজায় কান্নাকাটি করছে। সে থাপ্পড় মারতে-মারতে নিয়ে যাচ্ছে। শাসাচ্ছে, ফের যদি মেলায় আনে! অন্ধকার রাস্তায় এইসব শুনতে শুনতে ননদ-ভাজে বেশ জোরে এগোচ্ছিলো। বাঁদিকে কিছুদূর ফাঁকা—নিচেই গঙ্গা, ডাইনে ক্ষেতখামার, তারপর তারা কলাবেড়িয়া ঢুকল। সামনেই মান্যবরের বাড়ি। আর ডর কিসের ফুলকলিয়ার? হাঁটল। ওইরকম আচমকা ডর পেয়ে ভেগেছে মনে পড়ে ছোটীকে দু'হাতে পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে খুব হাসল। ছোটী বলল—হাস গেইলা কাহে রী বহুদিদি?

ফুলকলিয়া তার জবাব দিল না। ছোটীর চুল শুঁকে বলল—তোর মা তোকে আর নিমের তেল মাখায় না?

—না রী। পরশু আমলাবাঁটা দিয়েছিলাম। গন্ধ পাচ্ছিস না?

—আমার চুলে আবার উকুন ধরাস নে, বলে দিচ্ছি।

—ভাগ্! আর উকুন কোথায়? সব মরে গেছে কবে।...বলে ছোটী দুহাতে বহুদিদির মাথা ধরে টেনে শুঁকতে থাকে। তারপর বলে—ও রী বহুদিদি! তুই গন্ধতেল মেখেছিস শরতের বহুর মতন! তাই ভাবছি তখন থেকে, কিসের গন্ধ? বহুদিদি, ও গে! আমাকে একটু গন্ধতেল দিবি?

মান্যবরের কুকুর কালুয়া দরজার সামনে দুঠ্যাং খাড়া রেখে পেছনের ঠ্যাং দু'টো ভাঁজ করে বসে ছিল। চাপা গরগর শব্দ করল। সে ওই ছোটীর জন্যে। ছোটী কুকুরটা চেনে। বলল—কালুয়া না রী?

উঠোনে আলোর ছটা পড়েছে। দরজা খোলা। ফুলকলিয়ার সাড়া পেয়ে মান্যবর বলল—হয়ে গেল মেলা দেখা? সরযুয়া হই? ওটা কে রে? বুঁচি নাকি? না চামেলী?

ছোটী চুপ। ফুলকলিয়া ওর কাঁধে হাত রেখে বলল—না। ছোটী।

—ছোটী? নিষাদবাগের?

—হাঁ গে বাবা। মেলা দেখতে এসেছিল একেলা। ধরে আনলাম।

—আয়, বেটি আয়। মান্যবর খুশি হয়ে ডাকে। তোর মা ভাল আছে?

ছোটী টের পায়, জামাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করছে না মোড়ল। সে একটু হেসে বলে—শুন্ বাবা আমি বহুদিদিকে নিতে এসেছি।

মান্যবর হো-হো করে হেসে ওঠে। ফুলকলিয়া তাকে ছেড়ে দাওয়ায় উঠেছে সবে, ঘুরে দাঁড়ায়। মান্যবর হাসতে-হাসতে বলে—ওরে হামার বুঢ়িয়া বেটি রে! ওরে হামার কটকটিয়া বে। বহুদিদিকে নিতে এসেছে রে! তো কুটুমতালি কর। ভোজ-পানি খা।

ছোটী দেখে, বহুদিদি কেমন চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আবার কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করতেই রুষ্ট ফুলকলিয়া বলে—হুঁ আঁধারে ছেড়ে দিয়ে এলেই ভাল হত রী! ভূতপেরতে ছিঁড়ে খেত, সেটাই ভাল হত। এসেই আপন রূপ ধরেছে নিষাদবাগের বেটি!

ছোটী কথাটা বলেই বুঝেছে, ঠিক করে নি। কেনই বা বলল? সে অপ্রস্তুত হয়ে উঠোনের কাদায় পা ঘষে। মান্যবর ধমক দিয়ে বেটিকে বলে—চুপ তো বাবা। পা ধোবার জলটল দে বেচারীকে। ওর কি কিছু বোঝবার বয়েস হয়েছে? বলেছে, বলেছে। মা ছোটী, যাও। পা ধোও গে।

ছোটী যাচ্ছে না দেখে মান্যবর ওর কাঁধ ধরে ঠেলে দাওয়ার দিকে নিয়ে যায়।...

* * *

একটু পরেই ছোটীর মন খারাপটুকু কেটে যায়। বহুদিদি তাকে এমন সুরে কথা কি এই নতুন বলল নাকি? এর চেয়ে কত খারাপ-খারাপ খোঁটা দিয়েছে নিষাদবাগে থাকতে! তাতে ছোটী যখন রাগ করেনি, এখন তার রাগ করা সাজে না। তবে এ তো নিষাদবাগ নয়, কলাবেড়িয়া। সে জন্যেও একটু দুখ বেজেছিল। তারপর বহুদিদি যখন তার পায়ে জল ঢেলে দিতে-দিতে একটু জল আঙুলের ডগা থেকে মাথাতেও ফেলল, তখন ছোটীর মুখে হাসি ফুটল। মুখ তুলে দেখল, বহুদিদি ঠোঁটের কোনায় হাসছে। আহা, এই হাসিতে না জানি কী আছে গে, ছোটী তার ছোট্ট দুনিয়া ঢুঁড়ে তো কোথাও পাবে না। বীজ থেকে আঁকুর মুখিয়ে উঠলে ছোটীর যে খুশি আর বিস্ময় প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা ঠোঁটে পড়লে যে বুকের ভেতর দুলে ওঠা, ওই হাসিতে তাই আছে।

কুটুমের খাতিরে রাতে ভাত চাপল হাঁড়িতে, এও কম কথা নয়। ফুলকলিয়া বাপের বাড়ি এসে এবার বেশিরকমের আলসে হয়েছে। দুপুরের ভাতে জল দিয়ে রাখে। রাতে বাপবেটিতে খায়। তরকারিও থেকে যায়। আজ ছোটীর জন্যে রান্নাশালে রাতের বেলা উনুন ধরেছে। এনামেলের হাঁড়িতে টগবগ করে ভাত ফুটছে। ফুলকলিয়া পিঁড়িতে বসে ঘুঁটে মাখানো পাটকাঠির আঁটি ঠেলে দিচ্ছে উনুনে আর ছোটী তার কাছে দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে। কালুয়া দাওয়ার ওকোনায় বসে আছে চুপচাপ। মান্যবর মোড়ায় বসেছে শনের দড়ি পাকাতে। হেরিকেন জ্বলছে তার পায়ের কাছে। আর লম্ফ জ্বলছে উনুনের পাশের দেয়ালের তাকে। তাকটা তিনকোনা। কালি জমে আছে চাপচাপ। তা হোক। এই তো হল গিয়ে বড়লোকী! নিষাদবাগে সরস্বতী বুড়িতো খুব বেশি দরকার না হলে লম্ফ জ্বালবেই না। দিনের আলো থাকতে থাকতেই রাতের খাওয়া ঝটপট খাইয়ে দেবে। আর আঁধার আসতে-আসতেই শুয়ে পড়ার হুকুম। অথচ এ বাড়িতে রাতের বেলা যে চুলা জ্বলে, তার প্রমাণ ওই তিনকোনা তাকের কালি। আরও প্রমাণ ওই হেরিকেনটা। ঝকঝকে কাচ। একটুও টুটা-ফাটা নয়। কত বড় বাড়ি, যেন ছোট্ট একটা চাঁদ। ছোটীদের একটা হেরিকেন অবশ্য আছে। সেটা এমন পেট চাঁছা নয়। বেঁটে আর জালার মতো পেট। ছোটীর বাবা নাকি কিনেছিল কবে সুখের বছরে। তার আদত কাচটা এখনও আছে। বার দুই আছাড় খেয়ে কাচ ফেটেছিল। একবার ছোটীর বাবা নাকছেদী সাপ দেখে ঝটপট জ্বালতে গিয়ে ধাক্কা লেগেছিল ঘরের চৌকাঠে, আরেকবার তার ছেলে এতোয়ারি বর্ষার রাতে পাকা তাল কুড়োতে গিয়ে আছাড় খেয়েছিল। তবু ঘাট, কাচ টিকে আছে এই খুব। আরও ভাঙার ভয়ে সরস্বতী লণ্ঠনটা জ্বালতেও দেবে না, কাচও মুছতে বারণ করবে। তাই যদি বা কখনও জ্বলে—যেমন বিয়ের সময় জ্বালতে হয়েছিল, বাত্তিঠো কালির তলায় আধমরা হয়ে থাকবে।

তাল কুড়োবার কথা মনে আসতেই ছোটীর মনে আচমকা একটা সাধ গরগর করে উঠেছিল। বর্ষা আসছে। বাঁধের তালগাছগুলোতে তাল ফলেছে প্রচুর। বহুদিদিকে নিয়ে বৃষ্টির রাতে পাকা তাল কুড়োবার কথা ছিল যে! সেই কত সন্ধ্যারাতে বাঁধের ওদিকে 'মাঠ সারতে' গিয়ে ননদভাজে কত জল্পনাও তো হয়ে গেছে। বহুদিদিকে মনে করিয়ে দেবে কথাটা?

কিন্তু সাহস পেল না মোটে। বহুদিদি আর আগের মতো নেই, সে কতভাবে টের পেয়েছে। আর এতো ওর বাপের বাড়ি! শাস নেই মাথার ওপর, মরদও নেই। মাথার ঘোমটা নেই। পড়শীদের নজর নেই। চেহারা বর্ষার নদীর মতো জোরালো চনচনে ভাব। ছোটী আড়চোখে বহুদিদিকে দেখতে থাকে।

খুশি হয়। নিজেরই বহুদিদি বলে গরব জাগে। আবার তক্ষুণি মনে পড়ে যায়, কেমন করে সুটকেস হাতে নিয়ে চড়ায় ভেগে যাচ্ছিল দিনদুপুরে! ভেগে যাওয়া বহুগুলোকেই তো 'হুড়কি' বলে! এই মেয়েটি যে একজন হুড়কি, ভাবতেই পারছে না।

এইসময় মান্যবর ডাকে—বেটি ছোটী রী!

ছোটী আনমনে সাড়া দেয়—উঁ?

—বাড়িতে বলে আসিসনি! খুব শোচ করবে। বুঝলি তো? খোঁজখবর করবে।...বলেই মান্যবর একটু হাসে। করুক না খোঁজখবর। বুড়ির বেটিকে আমরা কুঠিতে (মাটির জালায়) লুকিয়ে রাখব।

ফুলকলিয়া বলে—ওর মায়ের যা মুখৌড়া! গালমন্দ করবে।

মান্যবর তক্ষুণি গম্ভীর হয়। —হুঁ তা করবে। খুব পোঁহাতে আমি এগিয়ে দিয়ে আসব। মেলাখোলা জায়গা কি না। শোচ করবে না কেন? লেকিন ছোটী তুই কিছু শোচ করিসনে বেটি। তুই খাওয়াদাওয়া করে আচ্ছাসে নিদ যা। কেমন?

ছোটী মাথা দোলায়। হুঁ, এটা সে এতক্ষণ ভাবেইনি। এবার ভাবনায় পড়ে যায়। ফুলকলিয়া একটু পরে ঘুরে ওকে দেখে। তারপব খুঁচিয়ে দিয়ে বলে—ক্যা রী? কেঁদে ফেললি নাকি বুড়িয়ার ডরে? জোয়ান মেয়ে হয়েছিস, ঔরৎ বনে গেছিস। আর কিসের ডর রী?

তখন ছোটী হাসে। বহুদিদির কথায়, চোখের দৃষ্টিতে কত যে সাহস আছে, তুমি চাইলেই কুড়িয়ে নিতে পারো। সে বলে—ভাগ্, ভাগ্! আমার ডর লাগে না।...

বড়ঘরের সবকিছু সে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল। তারিয়ে-তারিয়ে স্বাদ নিচ্ছিল। রান্নাশাল, দাওয়ার তাকে রাখা কত শিশিবোতল, উঠোনের মরাই, চালের ভেতরদিকে বাতায় গুঁজে রাখা পাঁচনবাড়ি, ছোট্ট খুরপি, কাস্তে, একটা মাছধরা জাল, মাথালি, কী পাখির একগোছা রঙিন পলক—এইরকম কত কী জিনিস! লাল হলুদ নীল চুলের ফিতে পর্যন্ত! মান্যবর দুবার গোয়ালঘর ঘুরে এল। ছোটীর দেখতে ইচ্ছে করছিল, কতগুলো গরু আছে। নিষাদবাগের মুখিয়ার চেয়ে বেশি, না কম। আর এইসব দেখতে-দেখতে মনের তলায় সরম জড়ানো আবছা সাধ নড়ে উঠছিল, ঘাসের মধ্যে ঘাসফড়িংটা যেমন নড়ে-চড়ে। এমন বাড়িতে যদি তার বিভা হয়, কত ভাল হয়! শাস নেই, এমন ভালমানুষ শ্বশুর, আর এমন দেখনসরুত ফর্সা চিকনচাকন ননদ। আর কী চাই রী? সাতবেটার মা হোক না হোক, হেসেখেলে দিনগুলো রাতগুলো কীভাবে যে কেটে যাবে!

ছোটীর এই চুপচাপ ভাব ফুলকলিয়ার চোখে পড়েছে। বলে—বাড়ির জন্য মন খারাপ করে তো বল রী, বাবা তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবে!

ছোটী অমনি ব্যস্তভাবে বলে—না, না।

—তব শোচ করছিস এত্তা?

—কুছ নেহি বহুদিদি!

মান্যবরের এক স্বভাব। খেয়েদেয়ে কালুয়াকে নিয়ে গঙ্গার ওদিকে 'মাঠ সারতে' গেল। দু'জনে মুখোমুখি হাত-পা ছড়িয়ে খেতে বসল। পাবদা মাছ, ছোলার ডালে ঝিঙে, বিশেষ পদহিসেবে পটল পুড়িয়ে 'ভত্তা'। ছোটী ভেবেছিল দারুণরকম খাবে। কিন্তু পারল না। বারবার তার মুখের তাল কেটে-কেটে যাচ্ছে। খালি মনে হচ্ছে, তলায় কোথায় একটা বড় ফাঁক আছে। মন ভরেও ভরছে না। ফুলকলিয়া ধমক দিয়েও তেমন কিছু খাওয়াতে পারল না। সে তো অবাকই হল বরং। এই মেয়েটার খাওয়া সে নিষাদবাগে দেখেছে। তার দুগুণ খায়! আর খাওয়াটাই বা কী? একটুখানি ডাল সেদ্ধ, একটা-দুটো ছ্যাঁচড়া তরকারি। মাছ তো রাজার ভোগ সেখানে। মেছুনী গাঁয়ে এলে সরস্বতীর বাড়ি ঢুকবেই না। আর যদি বা বুড়ি মাছ কেনে, গুনে-গুনে গোটাকতক খলসেপুঁটি, নয়তো চিংড়ি। তার বদলে কাঁচকলা, একফালি কুমড়ো কিংবা কিছু ঝিঙে দেবে। দেবে কি সহজে? বচসা হবে। তকরার চলবে আধঘণ্টাতক। তারপর ফয়সালা হবে। কেন মেছুনী ওকে লুকিয়ে অন্য বাড়ি ঢুকবে না? অবশ্য এতোয়ারি কোন-কোনদিন গঙ্গার দহে কুঁড়োজালি পেতে সন্ধ্যাবেলায় চিংড়ি ধরে আনে...

খাওয়ার পর ফুলকলিয়া ঘরে ঢুকল ছোটীকে নিয়ে। ঘরের ভেতর কেমন একটা গন্ধ। ছোটীর কাছে এই হল গিয়ে গেরস্থ-গেরস্থ গন্ধ। ধনপতির বাড়ি গিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রাণভরে এই গন্ধ সে শোঁকে। এ গন্ধে তার মতো সব ছোটঘরের মেয়েরই মন কেমন করার কথা। ঘরে অনেক খন্দ-বোঝাই কুঠি, গুড়ের জালা, মুড়ির টিন, সিন্দুক, মেঝেয় বালি বিছিয়ে রেখে তার ওপর আলু আর পেঁয়াজ রসুন, ঝুলন্ত রঙিন সিকেয় নকসাকাটা হাঁড়ি—না জানি কী মোণ্ডামেঠাইয়ে ভরা। বাঁশের আলনায় কত কাপড়চোপড়। তাকে অত বড় একটা আয়না। ছোটী লম্ফের আলোয় মুগ্ধ দৃষ্টে দেখতে থাকে। এই ঘরের কথা তার আবছা মনে ছিল। কিছু মনে থাকা ঘর এবং তার জিনিসপত্তর এখন একপলকেই তুচ্ছ হয়ে গেছে আসলের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। দাদাটা বোকার হদ্দ। ছোটী ভাবে। এমন ঘরে কেন সে আসতে চাইছে না! ফিরে গিয়ে দাদাকে বলবেই বলবে—এ দাদা, তুই কারও বাত কানে নিসনে। চলে যা কলাবেড়িয়ায়।

সবচেয়ে খুশির ব্যাপার, তক্তাপোষ। তক্তাপোষে শোবে ছোটী! সুজনী কাঁথায় বিছানা। লাল নকশা আঁকা ধবধবে বালিশ। এ কি স্বপ্ন! যে মেয়ে এমন বিছানায় শুয়েছে, নিষাদবাগে মেঝেয় আজেবাজে ধক্কড় কাঁথায় কিংবা খালি চাটাইয়ে কত কষ্টে না কাটিয়েছে।

বালিশের ওয়াড়দুটো ছোটী নির্লজ্জ হয়ে শুঁকল। ফুলকলিয়া বলে—সেদিন টাউন থেকে কিনে এনেছি, বুঝলি ছোটী?

—কেত্তা দাম রী বহুদিদি?

—দাম শুনলে তো তুই আবার ঝামেলা করবি। ফুলকলিয়া হাসতে হাসতে বলে। দশ আনা চাইছিল। নিম্মলাদিদি আঠ আনায় ফয়সালা করল। দো আঠ আনা কিত্তা বোল তো? এক রুপেয়া।

ছোটী অবাক হয়ে বলে—শরতের বহুকে কোথায় পেলি আবার?

—কেন? সে তো হরঘড়ি যানা-আনা করে টাউনে। গেলেই দেখা হয়।

—তুই একেলা টাউনে যাস, বহুদিদি?

—ফের ওই কথা! যাই যাই যাই। হয়েছে তো?

ছোটী ওর ভঙ্গি দেখে আবার ঘাবড়ে যায়। একটু পরে বলে—বহুদিদি!

ফুলকলিয়া ওকে চেপে ধরে শুইয়ে দেয় বিছানায়। —খালি বহুদিদি আর বহুদিদি! শুত্ যা। ছেনিমার গপ্ শুন।

ছোটী চুপচাপ শুয়ে পড়ে। ফুলকলিয়া ওর পাশে বসে গুন-গুন করে ওঠে। ছোটীর মনে পড়ে মুখিয়ার বেটির বিয়েতে বহুদিদি বেপরোয়া নেচেছিল। গলা কাঁপিয়ে কতরাত অব্দি গান গেয়েছিল। নতুন বউ বলে এতটুকু শরম করেনি। ছোটীর ঘুম পাচ্ছিল। মায়ের ভয়ে চলে এসেছিল। বহুদিদি আর সেরাতে বাড়িই ফেরেনি। তা নিয়ে কত ঝামেলা। মা ওকে চুল ধরে মার লাগিয়েছিল। স্পষ্ট মনে পড়ে বলেই এখন খারাপ লাগে। কার গায়ে হাত তুলেছিল তার মা!

তারপর আর নিরিবিলি জায়গাতেও গান গাওয়াতে পারেনি। অত ভাল গান নিষাদবাগের মেয়েরা জানেই না। নাচতেও পারে না অমন করে। এতদিন পরে আবার গান গাইছে ও। ছোটীর খুব ভাল লাগল।

কিন্তু এ গান কী গান! এর সুর যে অন্যরকম। কলের গানের মতো। এর কথা সে বুঝতেই পারছে না। ছোটী অবাক, একশো অবাক। দু'কলি গেয়েই ফুলকলিয়া বলে—ছেনিমার গান। বুঝলি তো? এবার গপ্টা শুন।

শুনতে-শুনতে কখন ঘুমে কাঠ হয়ে গেছে ছোটী। ফুলকলিয়া দুবার ডেকে বাইরে যায়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে দাওয়ায় খুঁটি ধরে। আপনমনে গুন-গুন করে আবার গান গায়। তারপর খেয়াল হয়—ওই যাঃ! দুধ খাওয়া হয়নি।

সে রান্নাশালে লম্ফ হাতে যায়। বাবার জন্যে গেলাসে দুধ ঢেলে রাখে। বাকিটুকু খেতে গিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ে। ছোটীকে খাওয়ানো হল না। কিন্তু ওর যা ঘুম, আর মাথা ভেঙেও ওঠানো যাবে না।

দুধটা চোঁ-চোঁ করে গিলে ফেলে সে। জল খায়। তখন মান্যবর ফিরে আসে কালুয়াকে নিয়ে। —ছোটী নিদ গেল বুঝি?

—হাঁ জি। শুত করতে না করতে ও পাথর। দুধঠো দিতে ভুলে গেছি।

মান্যবর গম্ভীর। ওই তার স্বভাব। কখন গম্ভীর, কখন হাসিখুশি। বলে—শুত যা বেটি। পোঁহাতে মেয়েটাকে রেখে আসতে হবে।

ফুলকলিয়া ঘরের দিকে ঘুরে বলে—তুমি ওবাড়ি ঢুকবে জি? ঢুকো না।

—নেহি। একটু পরে মান্যবর বলে—কভি নেহি।...

জীবনে এমন একটা রাত এল, অথচ জেগে থাকতে পারল না। পরে ছোটীর মনে এ জন্যে একটা কাঁটা বিঁধে থেকেছে। সে-রাতে অমন ঘুমিয়ে পড়াটা ঠিক হয়নি। রাতচরা পাখিটা ডাকতে শুরু করেছিল। দূরে রেলগাড়ি যাচ্ছিল ঝমরঝম। বাঁশের বনে শেয়াল ডাকতে না ডাকতে বুঝি কালুয়াই বাইরে কোথায় ঘেউ-ঘেউ করে উঠেছিল। আর কানে মুখ রেখে বহুদিদি একটা দুর্বোধ্য গপ্ শোনাচ্ছিল চাপা গলায়। ছোটীর চোখের পাতা বন্ধ করে দিয়েছিল এইসব ঘটনাই। বরং সে নিজে যদি কথা বলত বহুদিদির সঙ্গে! বলত বহুদিদি চলে আসার পর নিষাদবাগের দিনকালের কথা। কত কী সব ঘটেছে! অঞ্চলার সঙ্গে কেন তামুকওলা ভগতরামের বিয়ে হচ্ছে না, ক্ষেতের ঝিঙে চুরি, মালতীর বরের সঙ্গে ছেদিরামের কেন ঝগড়া হয়েছে, আর একটা বড় সুখবর—মুখিয়ার বেটা সূরয বলেছে, আর সব গাঁয়ের মতো নিষাদবাগেও লক্ষ্মীপুজো দেবে। গাঁওবালারা বলেছে, যত পুজো দেবে দাও, তবে ছটপরব, ভারিভুরির পুজো, ঠাকুরবাবার 'পাঁছোটি' পরবগুলো বাদ গেলে চলবে না। মেয়েরা উল্কি দাগবেই। তাতে বারণ করা চলবে না। আর বলার মতো ঘটনা এতোয়ারির সন্নেসীর মতো দাড়িগোঁফ চুল রাখা। এতে উদ্বেগ আছে, হাসির ব্যাপারও আছে। আর বহুদিদি গে, তুই যে লেবুচারা লালিয়েছিলি—শুনলে অবাক হবি, সেটা শুকিয়ে যায়নি। পর-পর কয়েকটা বৃষ্টির পর খুব রঙ চাগিয়ে উঠেছে। হুঁ, মেনিদের ছাগলটা শেয়ালে ধরেছিল সেদিন দুপুরবেলা। গলার ঘায়ে হলুদবাটা দিয়েছিল। কিন্তু রাতারাতি মরে পড়ে ছিল। খবর পেয়ে টাউন থেকে ভেঁটুয়া ডোম এসে নিয়ে গেল। ভেঁটুয়ার সঙ্গে মেনির দাদা সুখলালের বড্ড ভাব। সুখলাল আজকাল খুব গাঁজা খাচ্ছে। ল্যাংড়া রঘুয়ার বাড়ি ভেঁটুয়া আর সুখলাল খুব যাওয়া-আসা করে। ভেঁটুয়ার আবার স্বভাব খারাপ। ভরত আর নয়নসুখ বলাবলি করছিল, ভেঁটুয়া নিষাদবাগের কোন ছোকড়ি নিয়ে ভেগে না যায়। বহুদিদি গে, দাদা বলেছে—গঙ্গায় শীগগির যখন ঢল নামবে, আর কদিনই বা—টাউন থেকে জাল কিনে আনবে। আর দাদা কী বলে জানিস? গাঁয়ের বাইরে গিয়ে ক্ষেতের এককোনায় ঘর বানাবে। হিজলগাছটার কাছে। সেই হিজল গাছটা—যার তলায় শীষফুল কুড়োচ্ছিলুম, মনে পড়ছে? ওখানে থাকবে দাদা। একেলা থাকবে। শুনে তো ডর লাগে বড্ড, কেন ওকথা বলছে দাদা? শ্মশান জায়গা। শিমুল গাছটাও কাছে। কোন শিমুল গাছ বল্ তো? সেই যে—যার ডালে জোড়া পেঁচার রূপ ধরে ভারিভুরি থাকে! একরাতে ওরা এমন জোরে ডাকছিল যে মুখিয়াজিও নাকি বেরিয়ে পড়েছিল ঘর ছেড়ে। বাঁধে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে—চুপ্ চুপ্। চিল্লাস কাহে গে খামোশ? কেউ তো কোন দোষ করেনি। মিছা রাগ করেছিস, বহিন!...ঔর শুন বহুদিদি, নিষাদবাগে আবার খুব হনুমানের উপদ্রব হচ্ছে। লোকে বলছে, কাপাসীর পূরণ 'বন্দুক' কিনেছে। বন্দুকের আওয়াজে ডর পেয়ে ওদিককার হনুমান ভেগে এদিকে আসছে। কেউ-কেউ বলছে তা নয়। টাউনের হনুমান। টাউনে জোর তাড়া খেয়ে গাঁয়ে ভেগে আসছে। কিন্তু এ বড্ড ভয়ের কথা। বটতলায় এ নিয়ে কথাও হয়েছে। ভরত বলেছে, ছেলেছোকড়ারা তৈয়ার থাকো। টিন বাজিয়ে হইহল্লা করে খেদিয়ে দেবে। বাড়ি-বাড়ি টিন তৈয়ার রাখা হচ্ছে। ছোটীর দাদাও রেখেছে। কোনঠো? কেন— পেয়ারাগাছে বাদুড় তাড়াতে মা যেটা ঝুলিয়ে রেখেছিল। রাতে শুয়ে-শুয়ে ঘুমের ঘোরেও দড়িটা টানত। ঢঙ ঢঙ করে বাজত। ও, সেটা তুই দেখিসনি গে। তখনও তুই নিষাদবাগের বহুড়ী হোসনি। টিনটা ঘরের পিছনদিকের দেয়ালের মাথায় চালের সঙ্গে আটকানো ছিল। এ বছর বর্ষার পর পেয়ারা গাছে ফল পাকন্ত হলে আবার টাঙানো হবে।

এইসব কত জরুরি কথা, একশো কথা, ভালমন্দ কথা বলার ছিল বহুদিদিকে। ভোরবেলা তখন আকাশ শালিখ পাখির ডিমের মতো নীলচে ধূসর আর টানটান হয়ে রয়েছে। মান্যবরের সঙ্গে গঙ্গার চড়া দিয়ে কোনাকুনি নিষাদবাগের দিকে যেতে-যেতে ছোটী উথাল-পাথাল হচ্ছে। এই গঙ্গায়ও এত কথা ধরবে না! তার ছোট্ট মনে এত কথা ছিল, বুঝতেই পারেনি।

ভোরবেলা বহুদিদি তাকে হিমানী-পৌডার মাখিয়ে দিয়েছে। চুলে গন্ধ তেল ঢেলে বেণী বেঁধে দিয়েছে—একটা নয়, দুটো। ফিতেও দিয়েছে। কপালে টিপ পরিয়ে দিয়েছে। গরবিনি মেয়ের মতো ছোটী পা ফেলেছে উঠোনে। তারপর সব গরব ধুয়ে-মুছে গেছে চোখের জলে। বাঁশবনের সরু রাস্তায় ঢুকে সামনে দেখা গেছে ভোরের নদী। দূরের নিষাদবাগ। অমনি হু হু করে কেঁদে উঠেছে সে। বহুদিদি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে—যখন খুশি, চলে আসবি রী! কাঁদিস কেন?

—বহুদিদি, ওগে! তুই যাবিনে কেন?

ফুলকলিয়া হেসেছে শুধু। মান্যবর বলেছে—যাবে রে বেটি, যাবে। আয়, বেলা বেড়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ তোর জন্যে নিষাদবাগে হইহল্লা লেগে গেছে।

মান্যবরের হাতে একটা পুঁটুলি ছিল। ছোটী জাগবার আগেই পুঁটুলিটা বাঁধা হয়েছে। ওর মধ্যে কী থাকতে পারে? ছোটী ভেবেই পায়নি। পরে মনে হয়েছে, কুটুমবাড়ির রেওয়াজ। খন্দ আছে। আটা আছে। ছাতু আছে। এসব ছাড়া আর কী থাকবে?

মান্যবরের সঙ্গে কালুয়াও গিয়েছিল ছোটীকে পৌঁছে দিতে। চড়ার ওপর সে খুব ছুটোছুটি করছিল। মাঝে মাঝে বালি শুঁকছিল আর লাফালাফি করছিল। মান্যবর বলছিল—শেয়ালের মুত শুঁকছে হারামজাদা! সারা পথ মোড়ল ছোটীকে হাসাবার চেষ্টা করছিল। স্রোতের জায়গায় গিয়ে জল দেখে বলেছিল—রঙ বদলেছে পানির। ঢল এল বলে। আজ যদি ফের বিষ্টি হয়, কাল পোঁহাত হতে-হতে ঢল এসে যাবে। তখন এক লদী বিশ কোশ হয়ে যাবে।

তখন কলাবেড়িয়াও অনেক-অনেক দূরের গাঁ হয়ে যাবে ভেবে ছোটীর বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। তখন উত্তরে টাউন ঘুরে রাধার ঘাটে নৌকো পেরিয়ে যেতে হবে। নয়তো দক্ষিণে আধক্রোশ দূরে মহুলার ঘাট। নিষাদবাগে কারও যে নৌকো নেই।

পাড়ের ওপর নিষাদবাগ—ডাইনে দহ। এত ভোরে দহের ঘাটে কে কাপড় কাচছে। সামনে একফালি জল। মান্যবর বলেছিল—এবার আসি বেটি। এটা নে, মাকে দিস।

পুঁটুলিটা আনমনে নিয়েছিল ছোটী। যতটা ওজন হবে ভেবেছিল, ততটা নয়। সে কিছু বলার আগেই মান্যবর হনহন করে চলে যাচ্ছে। কালুয়া চলে গিয়েছিল ঘাটের ওদিকে। সে তাকে ডাকছিল—হুই কালুয়া! কুকুরটা যাবার সময় ছোটীর হাঁটুর কাছটা শুঁকে গেল।

একটুখানি মন খারাপ। তারপর খুশি হয়ে উঠেছিল ছোটী। কুটুমবাড়ির পুঁটুলি, আর তার খাতির, রাতে গরম ভাত রান্না. বড়বাড়ির ঘরে কতসব জিনিসপত্র, বহুদিদি কত সুন্দর হয়েছে, কত বোলচাল তার মুখে, এইসব কথা এবার মনে একনদী জলের তোড় নিয়ে কলকল করে উঠেছে। ছোটী চনমন করে এগোল পাড়ের দিকে। পাড়ের সাঁইবাবলার ঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল মালতীর মা। তাকে দেখেই ছোটী বলে উঠল—কলাবেড়িয়ার মোড়ল পঁহুচ দেইলা্ গে! উও দেখ! হাম্ বহুদিদিকী সাথ মেলা দেখলা গে! হাঁ—কেত্তা ঘুমলা! ঔর ইয়ে দ্যাখ, ক্যা দিছে। কেত্তা চিজ দিছে শনবাবা!...

মালতীর মা তো বরাবর হিংসুটে। এসব শুনেও শুধু কেমন চাহনি আর কেমন একটু হাসি? ছোটীর রাগ হয়েছে। জঙ্গল পেরিয়ে গাঁয়ে ঢুকে ছেদিরামকে দেখে সে বলে উঠল—আমি কলাবেড়িয়ায় ছিলাম কাকা!

ছেদিরাম বলল—এতোয়ারি তোকে ঢুঁড়েছে রী! শিগগির ঘর যা।

আরও দুচারজনের সঙ্গে দেখা হল। ছোটী তাদেরও শুনিয়ে দিল ব্যাপারটা। নিজের হিমানী-পৌডার মাখা টিপপরা চেহারার 'সুরতে' নিজেই গরবিণী এবার। নিষাদবাগওলা কি দেখতে পাচ্ছে না সে কেমন রাতারাতি সুরতওয়ালী হয়ে গেছে?

—মা! মা গে! বলে বাড়ি ঢোকার সঙ্গে ওঁৎ পেতে থাকা শেয়ালের মতো তাকে ধরেছে এতোয়ারি। আর সরস্বতী বুড়ির হাতে ছিল ঝাড়ু। সেই ঝাড়ু এসে পড়েছে মাথায়। পুঁটুলিটা ছিটকে গেছে উঠোনে। আরেক ঝাড়ু মারতে গিয়ে বুড়ির চোখ পুঁটুলির দিকে পড়ল। অমনি সে থমকে দাঁড়াল।

এতোয়ারি জীবনে কখনও একটা চুহার গায়েও হাত তোলেনি। আজ বোনের গায়ে হাত তুলেছে। বুড়ির মাথায় এ ব্যাপারটাও তক্ষুণি কীভাবে এসে পড়েছে। অতএব সে বেটার উদ্দেশে চেঁচিয়ে ওঠে—জেরা থাম গে!

এতোয়ারি অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গে থামল না। চড়-থাপ্পড়-কিল চালিয়ে যেতে-যেতে পুঁটুলিতেও একটা লাথি মারল। অমনি বুড়ি প্রতিবাদ করে উঠল—হুঁউ-উ! দেখো, দেখো! এবং সেটা সযত্নে তুলে নিল। ছোটী তখন দুহাতে মাথা বাঁচাচ্ছে এবং মাটিতে বসে অদ্ভুত আওয়াজ দিচ্ছে।

পড়শীরা এমন ঘটনায় চুপচাপ থাকতে পারে না। দুজন-একজন করে এসে পড়ছে। তারাই এসে এতোয়ারিকে ধরল। দাওয়ার দিকে সরিয়ে নিয়ে গেল তাকে। কেউ ছোটীকে ওঠাল। সে এবার গলা ছেড়ে বিকট কান্নাকাটি জুড়ে দিল। মালতীর মা রাগ করে বলল—আভি পোঁহাতমে কাওয়াও জেরা সে দানা খায়নি। আর তোরা এ কী শুরু করলি গে? ছো ছো ছো!

সরস্বতী পুঁটুলিটা দাওয়ায় নিয়ে গিয়ে খুলতে থাকে। প্রথমে বেরিয়ে আসে একটা ঝলমলে রঙিন শাড়ি আর নকশাদার বেলাউজ। সারা নিষাদবাগের আর্তনাদ শোনা যায় কয়েক পড়শীর গলায়—বিভার সাজ গে! বিভার সাজ!

হুঁ, বিয়ের শাড়ি-জামা ফেরত দিয়েছে কলাবেড়িয়ার মোড়ল। বুড়ির কাঁপাকাঁপা হাত আরো একটা তাঁতের শাড়ি তুলে ধরে। তার তলা থেকে আরো একটা হলদে রঙের লালপাড় শাড়িও—। যেন ফুটন্ত সোডা-জলে সিদ্ধ হওয়া কাপড় একে-একে খড়িপরা আঙুলে তুলে ধরছে বুড়ি। ছ্যাঁকা লাগবে বলে হুঁশিয়ারও বটে। গায়েহলুদের শাড়িটাও ফেরত দিয়েছে। তারপর বেরিয়ে পড়ে আরেক ছোট্ট পুঁটলি। তার ভেতর রুপোর গয়না এক গুচ্ছের। হাঁসুলি, পৈঁঠা, নিকাড়ি, বাজু, চুড়ি, ছ'গাছা, ঝুমকো জোড়া, আর বিছেটাও।

নিষাদবাগ আবার চেঁচায়—উন্নিশ ভরি ভরি গে! উন্নিশ!

এবার সবাই ছোটীকে জেরা শুরু করে। ছোটী সব কথার জবাবেই শুধু মাথাটা দোলায়। অত যত্নে সাজানো চুল আর মুখের সাজখানা বেইমান দাদাটা তছনছ করে ফেলল। এই দুঃখ-রাগ অভিমান কি ভুলতে পারবে কখনও?

এতোয়ারির দিকে তাকিয়ে রামলালের বউ সুমতি বলে—বেঁচে গেছিস বাবা এতোয়ারি! খুব বেঁচেছিস! এবার যেমন পনছী, তেমনি ডালে বাসা কর। আমি তখনই বলেছিলাম গে, কুটুম কবলে সমানে-সমানে।

এইসব কথাবার্তা চলতে থাকে অনর্গল। যার কাজ আছে, সে চলে যায়। আবার একজন আসে। ভিড় কমতে দেয় না কেউ। পুরুষলোকেরাও এসে যায়। ভরত সুখলাল, ছেদিরাম, কানিকুর, তারপর নয়ানসুখও। নয়ানসুখ বলে, এতোয়ারি মুখিয়াজির সঙ্গে আভি দেখা কর বাবা।

এতোয়ারি চুপ। সরস্বতী পা ছড়িয়ে বসে প্রবল সুখে দুঃখের ছিটেফোঁটা ছড়িয়ে গুন-গুন করছে। গাঁওবালার কথারও জবাব দিতে ছাড়ছে না। আর নিষাদবাগে আবার একটা স্মরণীয় দিন তো বটেই। যারা আজ গাঁওয়ালে যাবে কি না, তাই নিয়ে ভোরবেলা উঠে দোনামনা করছিল, তারা ভাল অছিলাই পেল। কানিকুরু হাই তুলে আড়ামোড়া দিয়ে জানিয়েও দিল কথাটা। তার বউ নিশাচরী রাগ দেখিয়ে বলল--তবে তুমি বাচ্চা সামলিও। আমি দফরপুর ঘুরে আসি। ন'বাবুর বাড়ি ভোজকাজ। টিপগাড়ি চালিয়ে পাঁচদফা এল না বাবু? এইকথা শুনে হাসি পড়ে গেল ভিড়ে। নিশাচরীর ননদ কসিলা হাসতে-হাসতে বলল--আধামন পটল আর দশ সের কুমড়ো ভারে ঝুলিয়ে আমার ভাজ যাবে হেলতে দুলতে দফরপুর। তোরা দেখিস গে! ভাজের কেমন তাকদ! আবার হাসি। তারপর কানিকুরু বলল—আরে,

ন'বাবুকে বাকিতে মাল দেবে কৌন গে? ওহি তো বাত। দশ-বিশ রোজ ঘোরাঘুরি করে কে তখন? নিশাচরী আরও রেগে বলল—মরদকা বাত হাথিকা দাঁত! বাত দেইলা কাহে গে? তারপর সে বেরিয়ে গেল!...

কতক্ষণ পরে ভিড় সরেছে এতোয়ারির বাড়ি থেকে। এতোয়ারি লাল চোখে বিড়ি টানছে। ছোটী বড়-বড় চোখে বহুদিদির কাপড়-চোপড় গয়নাগাঁটি দেখছে। বিশ্বাস করতেই পারছে না—এগুলো পুঁটুলির মধ্যে ছিল। কখন পুঁটুলি বাঁধাছাদা করেছিল বাপ-বেটিতে—সে জানে না। হয়তো অনেক রাতে—যখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তখন। হায় রে হায়, কেন যে অমন ঘুম এল তার!

আর বহুদিদি—অমন সুন্দর ভালমনের মেয়ে! সে কোন মুখে নিষাদবাগের দেওয়া জিনিস ফেরত দিল? না না। তার মোড়ল-বাবাটাই যত বদমাইসির গোড়া। দেখা হলে ছোটী তাকে ছেড়ে কথা কইবে না!

তাকে ফুঁপিয়ে উঠতে দেখে সরস্বতী সান্ত্বনা দেয় এবার। —চুপ গে, রো মাৎ। কাঁদিস নে। ভালই করেছিস। কাঁদবি কেন? ওই মরদ লোকটা যা পারেনি, তুই তা পেরেছিস। ওই ভড়ুয়া মাগীমুখো বেহদ্দ গিদ্ধড় যা পারেনি বেটি তুই তা করেছিস। যা—গঙ্গামে নাহান করে আয়। গরম-গরম ভাত চাপাচ্ছি।

সরস্বতী জিনিসপত্তর সামলাতে থাকে। আর এতক্ষণ বাদে অঞ্চলা এসে ঢোকে। ঠোঁটের কোনায় কেমন হাসি। প্রথমে ছোটীকে তেড়ে যায়—হাঁ গে কুট্রিন! হাঁ গে হুড়াক! কাল তোকে টুঁড়ে-টুঁড়ে হয়রান হলাম গে! আর তুই কি-না গুণবতী রূপবতীর সাথে মজা লুটে বেড়াতে গেলি? ওই টৌনবাজ বাজারীর মুখে মুখ দিয়ে বেড়াচ্ছিলি গে! ছি ছি ছি!

তারপর সরস্বতীর কাছে যায়। বুড়ি ঝটপট গয়নাগাটি ঢেকে ফেলে। অঞ্চলা বলে—ও পিসি, সবকুছ চাপস দিস তো? গিনকে দেখ্ পিসি। ঝুমকাঠো দিস্ তো?

ঝুমকোজোড়ার ওপর অঞ্চলার লোভ ছিল। এতোয়ারির মা মাথা নাড়লে সে খুশি হয়। এতোয়ারির দিকে চোখ নাচিয়ে বলে—কী গো বুড়ির ছেলে? এবার স্বপন টুটনিদ ভাঙল তো? আমি বিভার দিনই কী বলেছিলাম, মনে পড়ছে এখন?

একথায় এতোয়ারির কী হয়, সে একটু হাসে! চোখের দৃষ্টি শূন্য, অথচ ওই হাসি তার দাড়িগোঁফ-লম্বাচুলওলা সন্নেসী চেহারাকে রূপবান করে তোলে অঞ্চলার চোখে। এতোয়ারি বিড়িটা মুচড়ে নেভায়। তারপর আস্তে-আস্তে বেরিয়ে যায়।

আর অঞ্চলা ওইটুকু হাসি পেয়েই মনের জোর বাড়িয়ে নিয়ে দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে পড়ে। বলতে থাকে—আর কেউ হলে এমন সংসার, এমন শাস আর ননদ, এমন ভালমানুষ মরদ পেয়ে ভাবত আমি সাতকপালীর বেটি। হুঁ, তাও তো বাঁজিন (বন্ধ্যা) ঔরত! এতদিন মরদের সঙ্গে শুতল, বেটাবেটি মা বলে ডাকত এল না। আর দেখ্ গে, পয়মন্ত মেয়ে না হলে গাছ ফলে না, লতাপাতায় ফুল ফোটে না। কেন—কাহে? কী, নিজেই যখন বাঁজিন, তখন সবকে বাঁজিন করে ছাড়বে না? এতোয়ারিদার ভুঁইভি কমজোর হয়ে গিয়েছিল। যায়নি গে?

সরস্বতী জিনিসপত্তর নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। সিন্দুকের তালা খুলেছে। অঞ্চলা ছোটীকে ফিসফিস করে বলে—সাফ-সাফ ছাড় বলে দিয়েছে গে? নাকি আবার পঞ্চায়েত ডাকবে বলেছে?

বিরক্ত ছোটী বলে—পুছ্ গে ক্যা বোলা! বলে সেও ঘরে ঢোকে।

অঞ্চলা আর একটু বসে থাকার পর উঠে পড়ে। —পিসি, চললাম গে। কোন জবাব আসে না। রাস্তায় গিয়ে সে এতোয়ারিকে খোঁজে। ব্যাকুল হয়ে তাকায় চঞ্চল চাউনিতে। কয়েক-পা এগিয়ে দেখতে পায়, এতোয়ারি আস্তে-আস্তে বারোয়ারিতলা পেরিয়ে বাঁধে গিয়ে উঠল। অঞ্চলা সেদিকেই চলতে থাকে। শিকারের দিকে বাঘিনী যেভাবে যায়।

বাঁধে পৌঁছে এতোয়ারিকে আর দেখতে পায় না সে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কোথায় গেল এতোয়ারি? আহা, বেচারার মন খারাপ হয়ে গেছে। এমন সময় ওকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলার দরকার ছিল। হঠাৎ চোখ যায় শ্মশানের বটগাছটার তলায়, ওই তো বসে আছে এতোয়ারি! অঞ্চলা

ঝোপ-ঝাড় ভেঙে, কিন্তু সাবধানে পা টিপে-টিপে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে লোকেরা তাকে দেখছে নাকি বুঝে নিয়ে বটতলায় যায়।

একদিন ঠিক ওই শেকড়েই পা ঝুলিয়ে বসেছিল কলাবেড়িয়ার অপমানিতা মোড়লকন্যাও। শাস তার চুল ধরে থাপ্পড় মেরেছিল। শ্মশানে দুঃখ ভুলতে এসেছিল।

অঞ্চলা চাপা গলায় ডাকে—এতোয়ারিদা!

এতোয়ারি চমকে ওঠে। তাকায়। কিন্তু কিছু বলে না।

—মনে দুখ বেজেছে মোড়লের বেটির জন্যে? অঞ্চলা হাসে। হাসতে-হাসতে ওর পায়ের কাছে বসে পড়ে। তো দুখ বেজেছে যখন, যাও পাঁও পাকড়ে কেঁদে-কেটে নিয়ে এসো। যাও! বসে কেন?

এবার এতোয়ারি এদিক-ওদিক তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বলে—কেন এলি অঞ্চলা? তোর আক্কেল নেই রী? লোকে এক্ষুণি দেখবে আর গাঁ জুড়ে হি-হি পড়বে। তোর বাবা মুখিয়ার লোক। পঞ্চায়েত ডাকবে। যা—যা! ভাগ এখান থেকে।

অঞ্চলা জেদ ধরে বলে—হাঁ। আমি গাঁওবালার ধারি কি না! গাঁওবালা আমাকে খেতে-পরতে দিচ্ছে কি-না!

তবে তুই থাক। আমি যাই। বলে এতোয়ারি উঠে দাঁড়ায়।

অঞ্চলা অমনি তার পা-দুটো ধরে ফেলে। তারপর সেই পায়ের ওপর, অবিকল এতোয়ারির মা যেমন করে মাথা ঠোকে, তেমনি করে মাথা ঠুকতে-ঠুকতে ফুঁপিয়ে কাঁদে।—আমাকে নাও এতোয়ারি! তোমার খুব ভাল হবে। ভারিভুরি আর ঠাকুরবাবার কিরপা হবে। ওগে এতোয়ারি, তোমার জন্যেই তো আমাকে আবার নিষাদবাগে ফিরে আসতে হল! একটু সমঝে দেখবে না তুমি? ও এতোয়ারি! আমি বাঁজিন নই, ছেলেপুলের মা। তোমার কি ছেলেপুলের বাবা হবার সাধ নেই এতটুকু?

অঞ্চলা আরও কত কী বলতে থাকে। বিব্রত এতোয়ারি বেকায়দায় পড়ে ধুপ করে বসে অগত্যা। ওর দুকাঁধে ধরে ওকে ওঠায়। বলে—শুন রী, শুন! খিটকেল করিসনে। আর কয়েকটা দিন শোচ করতে দে! তুই এখান থেকে চলে যা অঞ্চলা! আমি কতক্ষণ শোচ করি। তুই যা অঞ্চলা, চলে যা রী!

আর শ্মশানের ওপাশে দহের ঘাটে নামার রাস্তা। সেখানে ধনপতি মুখিয়ার ক্ষেত। ধনপতি হুঁকো হাতে উঠে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণে। তারপর রাস্তায় পা ফেলেই নজর গেছে বটতলার দিকে। হেঁড়ে গলায় বলল—কৌন গে?

এতোয়ারি শরমে—কিছুটা আতঙ্কেও কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণে অঞ্চলা উঠে দাঁড়িয়েছে। নির্লজ্জা মেয়েটা দাঁত বের করে বলে—আমি অঞ্চলা মুখিয়াকাকা। এতোয়ারিদার সঙ্গে বাত করছি!

ধনপতি সরকার গম্ভীর মুখে বলে—বাত করবার জায়গা পেলিনে? ওখানে কী বাত করছিস রী? এতোয়ারির সঙ্গে কী বাত আছে তোর? এ্যা?

অঞ্চলা এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলে—মুখিয়াকাকা, হামরা বিভা কিবে!

—ক্যা? মুখিয়া কয়েক পা এগিয়ে যায়।

—বিভা, বিভা! সরস্বতী বুঢ়িয়া হামার শাস হবে জী, সমঝা?

এতোয়ারি হতভম্ব। ধনপতি সরকারও তাই হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণে সরল মানুষটি হো-হো করে হেসে বলে—ভাল। বহৎ ভালো। তারপর হাসতে-হাসতে বাঁধের দিকে এগিয়ে যায়।

আর বটতলায় দুটি মেয়ে-মরদ আবার পরস্পরের দিকে ঘুরে তাকায়। এখন দুটি মুখেই যে ভাব—তা হিংসার। যেন পরস্পরের ওপর তারা এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে।

* * *

গঙ্গাপুজোর পর কয়েকটা দিন যেতে না যেতে উত্তর থেকে গাঢ় গেরুয়াজল আসতে শুরু করেছিল। কলাবেড়িয়ার বাঁশবনের ঘাটে সেই জল আসবার খবর মান্যবর বেটিকে দিয়েছিল। বলেছিল—নিষাদবাগের ঘাটেও ভি এসেছে!

কেন বলেছিল, ফুলকলিয়া বোঝেনি যেন। বুঝল নাহানে গিয়ে। এখন আর ইচ্ছে থাকলেও তার একদমে নিষাদবাগে ফিরা যাবে না। চোখের সামনে শ্বশুরাল অনেক দূর হয়ে গেল। অচিন-অজানা হয়ে গেল। বুকে একটু দুখ বাজল মোড়লের বেটির? ভুরু কুঁচকে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। ছোটীর হাতে উনিশ ভরি গয়না ফেরত পাঠাবার দিন তো কই এমন দুখ বাজেনি!

বাপের বাড়ি এসে যত বেপরোয়া ঘুরুক, সাবানপৌডার মাখুক, টাউনে গিয়ে ছেনিমা দেখুক—মনের তলায় আবছা ভেসে উঠত, সে তো এখনও নিষাদবাগের বহু ছাড়া কিছু নয়—ইমানসে ধরমেসে। তেমন চাপাচাপি করলে আবার শ্বশুরাল যেতে আপত্তি করবে না।

কিন্তু কোথায় চাপ, কার চাপ! মান্যবর বরাবর ওইরকম আলাভোলা এবং চলছে-চলুক ভাবের মানুষ। গহনাগুলো সে ফেরত পাঠাল ছোটীকে পেয়ে, সে শুধু বেহানের খোঁটার চোটে। জামাই যা গোঁয়ার, শ্বশুরের ঘরে কিছুতেই আসবে না এতো জানা কথাই। তাই যেন শেষঅব্দি ফুলকলিয়ার মনে কোথাও একটু ক্ষীণ আশা ছিল তাকে কোন-না-কোনদিন পাকেচক্রে নিষাদবাগে ফিরতেই হবে।

অথচ দেখতে-দেখতে মা'গঙ্গার বুক দামাল সোনালি জলে ভরে গেল। আর বৃষ্টিও এবার তালে তাল দিয়ে দুগাঁয়ে ফারাক আরও বাড়িয়ে দিল। আগাম বর্ষা পড়ল এবছর। সারাদিন ঝিরঝির বর্ষায় ঠাকুরবাবার বাহনগুলো আসমানের বাথানে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনও দুষ্টু কলা ভুঁইসা শিঙ নেড়ে গাঁক করে উঠল। বেতমিজির সাজা দিতে ঝিলিক দেয় ঠাকুরবাবার হাতের পাঁচনবাড়ি। এসব সময়ে ফুলকলিয়ার মতো মেয়ে চুপচাপ দাওয়ায় বসে থাকা ছাড়া আর কী করবে! মোড়লের ভয়ে শরতের বউ বাড়ি অব্দি আসে না কোনদিন। তার সঙ্গে দেখা হবার কথা ঘাটে। বড়জোর সে টাউন হয়ে নদী পেরিয়ে রাধারঘাটে চৌবেজির গদিতে এসে অপেক্ষা করবে। হাসিমস্করা করবে হাটুয়া আর চৌবেজির সঙ্গে। ফুলকলিয়া কথামতো গিয়ে হাজির হবে। ফিরে এসে যদি বা বাপের মুখোমুখি হয়, বলবে সরযূর সঙ্গে গিয়েছিল ওপারে। কেন গিয়েছিল—না, সাবান কিনতে, গন্ধতেল কিনতে। মান্যবরের তাতে আপত্তি নেই।...

কিন্তু দিনরাত এই বৃষ্টি সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছে। মান্যবর যে বাড়ি থেকে কোথাও নড়ছে না আর। না যাচ্ছে বেলডাঙার আড়তে, না যাচ্ছে ইস্টিশানে আড্ডা দিতে। ফুলকলিয়া বরাবর বাপকে লুকিয়ে নির্মলার সঙ্গে গেছে। বর্ষায় তা একেবারে বন্ধ। অতএব খালি বসে-বসে আবোল-তাবোল ভাবো। ভাবতে-ভাবতে নিষাদবাগ এসে পড়বেই।

আর নিষাদবাগের কথাও গাঁওবালাদের কথা। গাঁওবালাদের কথা এলে ধনপতি মুখিয়ার বেটার কথা। প্রথম-প্রথম যেটুকু শরম ছিল নিজের কাছে, এখন তা ঘুচে গেছে অনেকটা। ফুলকলিয়া সূর্যের কথা ভাবতে-ভাবতে আপন মনে হাসে। টিপগাড়ির চাকার তলায় চাপা দিয়েছিল, হায় রে হায়! ফুলকলিয়া এখনও চাপা পড়ে রইল যে! হাত ধরে তাকে ওঠায় কে এখন? নিজেকে বলে—হাঁ রী ছোকড়ি! নিষাদবাগে যদি ফেরার এত ইচ্ছে, গঙ্গাপুজোর মেলায় নিষাদবাগের লোক দেখে কেন তাহলে ডর পেয়ে ভেগে এসেছিলি?

বৃষ্টি একদিন জিরান নিল, ক্ষেত থেকে ক্লান্ত মুনিশ উঠে গিয়ে যেমন আলোর হিজল তলায় বসে থাকে। আর রোদ্দুর ফুটল। ঝকমকে ধারাল হেঁসোর মতো রোদ্দুর। সেদিনই শরতের বউ নির্মলা সোজা রাধারঘাট হয়ে কল্যাবেড়িয়া ঢুকল।

বাইরে কাকে জিজ্ঞেস করছে মোড়লের বাড়ি, কানে যেতেই ফুলকলিয়া বেরিয়ে পড়েছে। দৌড়ে গিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। —কোথায় ছিলি গে এতদিন? ভাবলাম বুঝি বটতলায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছিস! আয় গে দিদি, ঘরে আয়।

নির্মলাকে দেখে মান্যবর বলে কৌন গে? দালালের বহু না? এস, এস বেটি। খবর ভাল তো?

দাওয়ায় শীতলপাটি বিছিয়ে খাতির করে ফুলকলিয়া। বাবার উদ্দেশে বলে—দিদি খুব চা খেতে ভালবাসে, বাবা! তা জানো তো? জলদি চা-পাত্তি এনে দাও।

মান্যবর খুব হাসে। —হাঁ, হাঁ বেটি বহুৎ টাউনবাজ আছে। উওভি আমি জানি। তো বৈঠ তোরা।

আমি চা-পাত্তি আনছি ঘাট থেকে। আর এ বেলা ঘর যেতে হবে না, এসেছিস যখন। খাওয়া-দাওয়া কর।

বেরোবার মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফের সে বলে—হাঁ গে! শরৎ কি সাহাবাবুর কাম ছেড়ে দিল? আর তো দেখি না আড়তে!

নির্মলা বলে—কবে ছেড়ে দিয়েছে, কাকা। গঙ্গাপুজোর আগেই। এখন নিজের দাদনের কারবার করছে যে! টাউনে বাসা নিচ্ছে। আমরা গাঁ ছেড়ে চলে আসছি।

মান্যবর আরও একচোট হেসে বলে যায়—বাস রে! কোথায় অত টাকা পেল রী শরৎ? এ্যাঁ! তাজ্জব!

এই সময় কোত্থেকে কালুয়া এসে নির্মলাকে দেখে হাঁকডাক শুরু করে। তারপর মান্যবরের ডাকে লেজ গুটিয়ে চলে যায়। অপ্রস্তুত ফুলকলিয়া বলে—তোকে কোথাও দেখেনি কালুয়া। তাই। খুব ভাল কুকুর দিদি। ওর জন্যেই তো চুরিচামারি হয় না! নির্মলা ফুলকলিয়াকে দেখছিল। এবার চাপা গলায় বলে—একটা খবর নিয়ে এলাম রী ফুলের কলি! খুব ভাল খবর। কী খাওয়াবি, বল!

ফুলকলিয়ার বুক ছাঁৎ করে উঠেছিল। কাঁপা গলায় বলে—কী খবর রী দিদি?

—তোর ভাতার বিভা করেছে।

ফুলকলিয়া নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর জোর করে হাসে। হাসতে গিয়ে দম আটকানো গলায় শুধু বলে ওঠে—ছোড় রী।

—সত্যি বলছি। নয়ানসুখের বেটি অঞ্চলাকে বিয়ে করেছে এতোয়ারি। নির্মলা বলতে থাকে। ওরা ধরা পড়েছিল তা জানিস? মুখিয়া হাতে-হাতে ধরে ফেলেছিল। তারপর তো এতোয়ারিকে সবাই চেপে ধরল। বিধবা মেয়ের ধরম লিয়েছ, তখন স্যাঙা করতেই হবে। আর তোর শাস বুড়িকে তো জানিস! শুনে খুব আকাশ-পাতাল করল কদিন। অঞ্চলাকে ঘরে জায়গা দেবে না কিছুতেই। শেষে এতোয়ারি নয়ানসুখের বাড়িতে ঢুকেছে। এ হল পরশুরোজের কথা। কাল সারাদিন এতোয়ারি কী করেছে জানিস? নদীর পাড়ে বাঁধের গায়ে ওর একটা ভুঁই ছিল না? ঝিঙে লাগিয়েছিল। সেই ভুঁইয়ে বড়সড় একটা কুঁড়ে বানিয়ে ফেলেছে। ওখানে নতুন বউ নিয়ে থাকবে। তো বউভি পেল, বাচ্চাও ভি পেল। অঞ্চলার একটা বাচ্চা আছে দেখেছিস তো?

ঘাড় নাড়ে ফুলকলিয়া। দেখেছে।

নির্মলা হঠাৎ ফুঁসে ওঠে—এখন আমার হয়েছে জ্বালা। ভকতরামকে কেমন করে মুখ দেখাব, তাই ভাবছি। অতগুলো টাকা দিয়েছিল। অঞ্চলাকে শাড়ি কিনে দিয়েছিল! নয়ানসুখকেও নগদ হাওলাত দিয়েছিল। নয়ানসুখ কেমন হারামিলোক দ্যাখ! কাল সকালে গিয়ে ধরলাম—তো বেলকুল জবাব দিলে। সাফ জবাব। টাকা? কিসের টাকা?

ফুলকলিয়া শুধু তাকিয়ে থাকে। নিষ্পলক চোখ।

—ভকতরাম আমার মারফত এত টাকা দিয়েছে। আমাকে তো ছাড়বে না। নির্মলা ক্ষুব্ধভাবে বলে। তো, আমিও সহজ মেয়ে নই। ফিরে গিয়ে মুখিয়াকে ধরব। পঞ্চায়েত ডাকো! নয়তো ওই গিদ্ধড় নয়ানসুখকে টানতে-টানতে ভরাগঙ্গায় না ফেলিতো আমি বেজম্মা বেটি। দেখবি কী করি বুড়োর!

তারপর নির্মলা ফুলকলিয়ার মুখের ভাব বুঝতে চেষ্টা করে। কী? খবরগুলো কানে ঢুকল তো? বলে সে তার গাল ধরে একটু নাড়া দেয়।

ফুলকলিয়ার ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। সে বুঝতে পারছিল না এ খবর সুখের, না দুখের—খুশি হবে, না হুহু করে কাঁদবে! সে কী বলবে ভেবেই পায় না। ঠোঁটে একটু কাঁচুমাচু হাসি ফুটে থাকে শুধু! শেষে বলে—আমি কী বলব? আমি তো চলেই এসেছি নিষাদবাগ ছেড়ে!

—এসেছিস! কিন্তু এখনও তো তোর ছাড় হয়নি রী! তুই যে এখনও এতোয়ারির বহু হয়ে আছিস! নির্মলা একটু হাসে। ফের বলে—কী? করবি সতীনের ঘর?

ফুলকলিয়া চৌকাঠে বসে ছিল। উঠে দাঁড়ায়। রাখাল এসেছে। গোয়াল থেকে গরু খুলে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে মুড়ি দিতে হবে। সে ঘরে ঢোকে।

নির্মলা বাইরে থেকে বলে—যাক গে। যা হয় তা ভালর জন্যেই হয়। চলে এসে ভালই করেছিলি। আবার এতোয়ারি যে অঞ্চলাকে স্যাঙা করল তাও তোর ভাল। এবার তোর বাবা গিয়ে নিষাদবাগে মুখিয়াকে ধরুক। ছাড় লিয়ে আসুক। ব্যস! তোর ছুটি!

কোন কথাই বলে না ফুলকলিয়া। রাখাল-ছেলেটাকে মুড়ি দেয়। গিন্নির মতো এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে। সরিয়ে রাখে। ঘরে ঢোকে। আবার বেরোয়। তারপর মান্যবর ফিরে আসে রাধারামের বাজার থেকে। চায়ের জন্যে তখনও উনুন ধরানো হয়নি দেখে সে অবাক হয়।

মান্যবর একবার নির্মলার দিকে একবার মেয়ের দিকে তাকায়। কুকুরটা দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে নির্মলাকে জ্বলজ্বলে চোখে দেখছে আর লেজ নাড়ছে। মান্যবর বলে—কী? তোদের হলটা কী গে? হাঁড়ির মতো মুখ করে চুপচাপ বসে আছিস যে?

নির্মলা ঘোমটা আরেকটু টেনে দিয়ে হাসে। —আমি এমনি-এমনি আসিনি কাকা। তো বলতে দুখভি বাজে, শরমভি লাগে। তোমার জামাইয়ের খবর শোননি?

মান্যবর উনুনের কাছে চা-পাত্তি আর চিনির প্যাকেট রেখে নিজেই উনুন ধরাতে যাচ্ছিল। ফুলকলিয়া এসে পাটকাঠির গোছা গুঁজে দেয়। তেতো মুখে বলে—হটো জি। এত তাড়া কিসের? দিদি এক্ষুণি পালিয়ে যাচ্ছে না।

নির্মলা কথাটা বলেই তক্ষুণি মোড়লের গতিক আঁচ করতে ব্যস্ত। তাকিয়ে আছে তার দিকে। মান্যবর যেন শুনেও শোনেনি এভাবে আস্তে-সুস্থে উঠোনে নামে। তারপর অন্যদিকে ঘুরে বলে জামাইয়ের খবরে আমার কাজ কী রে বেটি? আর খবর বলছিস—জানলেও জেনেছি, শুনলেও শুনেছি। আমার বেটিকে লিয়ে বুড়ির বেটা সুখ পায়নি। নয়ানসুখের বেটিকে নিয়ে সুখ পায় তো পাক। আমার যা মনে আছে করব। ব্যস। উওবাত ছোড়।

ফুলকলিয়া চমকে উঠেছিল। ভাঙা গলায় ডেকে ওঠে—বাবা!

—হ্যাঁ বেটি। চৌবেজির কাছে আমি কাল সন্ধেবেলাতেই সব শুনেছি। তোকে বলিনি।

ফুলকলিয়া চেঁচিয়ে ওঠে—কাহে?

—ও শুনে তুই কী করবি?

ফুলকলিয়া মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। বোঝাই যায় তার চোখ ফেটে আঁশু নিকলাচ্ছে। মমতা দেখিয়ে নির্মলা বলে—আহা তাহলেও তো এখনও ইমানসে ধরমসে তোমার বেটি এতোয়ারির বহু, কাকা! এখনও তো ছাড় লিয়ে আসেনি!

ব্যাপারটা যে অতি সামান্য এভাবে মান্যবর উড়িয়ে দেয়। —ছাড়? আজ হোক কাল হোক আনলেই হল। আসল ছাড় তো হয়েই গেছে কবে। ধনপতিয়ার বাড়ি যাব। দশ বিশ তিশ রুপেয়া যা লাগে, দেব। ব্যস!

নির্মলা তর্কের ছলে বলে—এতোয়ারি যদি সহজে ছাড় না দেয়? বদমাইসির মতলব থাকে যদি ওর মনে?

ঘাড় নাড়ে মান্যবর। —দেবে না কেন ছাড়? গহনা ফেরত দিয়েছি। বিয়ের খরচও ফেরত দেব।

—এত ভাল মানুষ এতোয়ারি নয়।...নির্মলা চাপা স্বরে বলে। চৌবেজির কাছে তিনকুড়ি টাকা দেনা আছে। শুধতে পারছে না। সুদই তো এখন আরও তিনকুড়ি হয়ে গেছে। তার ওপর পাটি বুনবে বলেও শুনছি, টাকা নিয়েছিল। পাটগুলো গরু-ছাগলে মুড়িয়ে কবে শেষ করে দিয়েছে। চৌবেজি আমাকে তো কিছু লুকোয় না, কাকা। চৌবেজি ওকে এত টাকা কেন দিয়েছিল, তা জানো তো? তোমার দালাল বেটার মুখ দেখে নয়।

—হুঁ, আমার মুখ দেখে! বলে মান্যবর হো হো করে হেসে ওঠে। তার হাসিতে কালুয়াও যেন হাসি মেলায়। ঘেউ করে ওঠে আচমকা।

নির্মলা বলে—মোড়ল-শ্বশুরের দিকে তাকিয়েই ঘাটোয়ারিজির টাকা দেওয়া। এখন গতিক বুঝে সে দু'বেলা নিষাদবাগে দৌড়া-দৌড়ি করছে। এতোয়ারি পড়েছে বিপদে।

বলে ফের সে কণ্ঠস্বর চাপা করে। —সে জন্যে বলছি, কাকা। বদমাইসি করবে ছাড় দিতে। খুব ভেবেচিন্তে যেও।

মান্যবর বলে—অনেক টাকা চাইবে, এই তো? দেখা যাক।...

এসব বৈষয়িক আলোচনায় কান নেই ফুলকলিয়ার। সে চুপিচুপি কাঁদছে, পাটকাঠির ধোঁয়ার ছলে কাঁদা। কিন্তু কেন তার কান্না আসছে সে বুঝতে পারছে না। এমন কান্না নিষাদবাগে তার বিয়ের সময় সে কেঁদেছিল।

আর তার চেয়েও দুঃখ, বাবা তাকে এমন একটা খবর জানায়নি। বাবা অমন আলাভোলা মানুষ কেন? নিষাদবাগে মেয়ের বিয়ে দেবার সময় কত লোকে বারণ করেছিল। কানে নেয়নি। এখন কলাবেড়িয়াবালা বলছে—আমাদের কথা ফলল তো? আরে ছো ছো। নিষাদবাগ হল একটা জংলী জায়গা। সেখানকার লোকগুলোর চেহারা দেখেই তো বোঝা যায় কুকুর শেয়াল ছাড়া কিছু নয়। তবে শুধু ওই একটা বাদে—ধনপতি মুখিয়ার লিখাপড়হা বেটা সূরযপতিয়া। মোড়ল, দিলে বটে মেয়ের বিয়ে সেই নিষাদবাগে—সূরযপতিয়াকে জামাই করতে পারলে না! তা যদি পারতে তাহলে এ কেলেঙ্কারি, বড়ঘরের এ বেইজ্জতি কখনো হত না।

মান্যবর এর অদ্ভুত জবাব দিয়েছে—হাঁ, সূরযপতি ছেলে তো ভালই। তবে সে চেষ্টাও কি করিনি আমি? ধনপতি তো রাজিই ছিল। ওর বেটা যে রাজি হয়নি। চোখমুখওলা এলেমদার ছোকড়া গায়ে উল্কিপরা ছোকড়িকে বিভা করবে না। সাফ বলে দিয়েছিল। তো আমার মাথায় গোঁ চেপে গেল। নিষাদবাগেই সম্বন্ধ করব তো করব। তোমার চোখের সামনে—হাঁ।

এ ব্যাপারটা ফুলকলিয়া জানত না। শুনে অব্দি মনটা কেমন করেছে। সূর্যের কথা আরও বেশি করে ভেবেছে। ভাবতে-ভাবতে চুপিচুপি ইচ্ছে জেগেছে, নিষাদবাগে যদি কোনদিন ফেরা হয়, মুখোমুখি বোঝাপড়া করবে মুখিয়ার ছেলের সঙ্গে।

তো সব ইচ্ছে এবার বরবাদ। আর নিষাদবাগ ফেরার কোন আশাই রইল না। সতীনের ঘর করাটা কোন কথা নয়, কত মেয়েতো সতীন নিয়ে স্বামীর ঘর করছে—মান্যবর কী এক আজব মানুষ। যা গোঁ ধরবে, তাই করবে। ছাড় সে নিয়ে আসবেই।...

চা-পানি খেয়ে নির্মলা একটু পরেই চলে গেল। ভাত খাবার ইচ্ছে থাকলেও সময় নেই। টাউনে শরৎ তার অপেক্ষা করবে। যাবার সময় চুপিচুপি ফুলকলিয়াকে বলে গেল খুব ভাল ছেনিমা এসেছে। কাল দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে সেজেগুজে ফুলকলিয়া যেন ছেনিমাঘরের সামনে যায়। আর তো তার অজান-অচিন নয় কিছু। নির্মলা আর কষ্ট করে নদী পেরিয়ে ঘাটে এসে তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারবে না। লোকের চোখে পড়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা? একদিন হয়, দুদিন হয়, সেটা সম্ভব। বরাবর তো হয় না। ফুলকলিয়াকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে না?

সেদিন বেলা পড়ে এলে মান্যবর বেরিয়ে যায়। ঘাটে গিয়ে চৌবেজিকে ধরবে। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে নিষাদবাগে। ফুলকলিয়া বাবাকে সিন্দুক খুলতে দেখল। কত টাকা নিল কে জানে। কদ্দিন আগে একগাদা মসুরী বেচেছিল। টাকাগুলো কোন গুপ্ত স্থানে রাখা হয়নি, তখনও সিন্দুকে ছিল। ফুলকলিয়া এটুকু অন্তত বরাবর জানে, বাবা কোথাও একটা গোপন জায়গায় নগদ টাকা-কড়ি লুকিয়ে রাখে। প্রথমে টাকাটা হাতে এলে সিন্দুকেই রাখে। তারপর কখন চলে যায় সেই অজ্ঞাত গুপ্তস্থানে।

আর এ সব কথায় ফুলকলিয়ার মনে পড়ে যায়—ওই যাঃ! নিষাদবাগ থেকে পালিয়ে আসার সময় ঘরের পেছনে চালের বাতা থেকে চাঁদির টাকাগুলো তো আনতে ভুলেছে! ছোটী যখন গঙ্গাপুজোর সময় এল, একবার ভেবেছিল তাকে বলবে টাকাগুলো বের করে নিতে। নিয়ে ছোটী নিজেই তার মালিক হোক না! ওতেও ফুলকলিয়ার সুখ। কিন্তু বলা হয়নি কথাটা। ছোটী হয়তো টাকাগুলো শেষটা তার রাক্ষুসী মাকেই দিয়ে বসবে। তার চেয়ে লুকানোই থাক।

আসলে ফুলকলিয়ার মনে ক্ষীণ আশা ছিল, নিষাদবাগে আবার কোন-না-কোনদিন হয়তো তাকে ফিরতেই হবে! তাই নিজের স্বাধীনতাটা মেপেজুপে খরচ করছিল।

বাবা গেল নিষাদবাগে তার ছাড় আনতে। কালুয়া ঘাট অব্দি গিয়ে তাড়া খেয়ে একটু পরে ফিরে এল। তখন বাঁশবনে বউ-কথা-কও পাখিটা থেমেছে। অজস্র শালিখ এসে তুমুল হল্লা জুড়েছে। ওপাশের বাড়িতে পবনের বউ শাঁখে ফুঁ দিল। ফুলকলিয়া লম্ফ জ্বালল। বাবা হেরিকেন আর ছোট্ট একটা লাঠি সঙ্গে নিয়ে গেছে। ফিরতে কত রাত হবে কে জানে। রাখাল ছেলেটা দাওয়ায় বসে চবচবে করে তেল মাখছে গায়ে। ফুলকলিয়া তাকে ভাত বেড়ে দিতে রান্নাশালে ঢোকে।

একটু পরে নবীনের মেয়ে সরযু আসে।—ক্যা রী ফুলি, একেলা আছিস?

—হাঁ বহিন। আয়, বৈঠ।

রাখালটার ভাত খাওয়া দেখতে-দেখতে সরযু হাসতে হাসতে বলে—ইস্? ওকে বাবু করে দিয়েছিস রী! আলো জ্বেলে ভাত খাওয়াচ্ছিস। দেখবি এরপর কোলে চেপে ভাত খেতে চাইবে।

রাখালটার নাম ফটিক। সে অমনি গম্ভীর হয়ে বলে—লম্ফ লিয়ে যাও দিদি। পোকা পড়ছে ভাতে। তারপর পা বাড়িয়ে লম্ফটা ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়।

ফুলকলিয়া বলে—এসেই ফটিকের পেছনে লাগলি তো? সরযু বলে—মোড়ল কাঁহা রী? ঘাটে গেছে নাকি?

—হাঁ।

—তোর কী হয়েছে বল তো? মুখখানা পেঁচার মতো করে আছিস কেন?

—কিচ্ছু হয়নি।

—হয়েছে, হয়েছে। মরদ দুসরা বিভা করলে সব মেয়ের মুখ পেঁচার মতো হয়। সরযু তামাশা করে বলে। তো বলবি, আমি কোথায় খবর পেলাম? হাঁ—তুই আমার কতদিনের পুরনো 'দেখনহাসি।' তোর সঙ্গে গঙ্গাজল ছুঁয়ে দেখনহাসি পাতিয়েছিলাম, মনে পড়ে? লেকিন এমন একটা খবর তোর কাছে পাইনি রী! পেলাম কি না অন্যের কাছে।

—উওবাত ছোড়! বলে ফুলকলিয়া দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দেয়।

সরযু বলে—ঘাটে হাটুয়ার সঙ্গে দেখা হল জানিস? হাটুয়াই বলল, এতোয়ারি একটা খারাপ কাজ করে ফেলেছে। সব শুনে তক্ষুণি তোর কাছে চলে এলাম। তো আমার কথা শোন, এ নিয়ে মন খারাপ করবিনে। মরদ লোকদের স্বভাব এই-ই। দেখ না, আমার মরদ কী করল? সতীনের ঘর দেখেও তো বাবা বিভা দিয়েছিল। আমাকে ছেড়ে দিল। কেন? না—আমার খাওয়া বেশি। আমার নাকি এত্তা বড়া পেট!

বলে সরযু হাতদুটো দুপাশে ছড়িয়ে পেটের আকার দেখিয়ে খিলখিল করে হাসতে থাকে। আশ্চর্য এই মেয়েটা। ফুলকলিয়ার চেয়ে বয়সে একটু বড়। গতবছর ওর ছাড় হয়েছে। এখনও আর বিয়ে করেনি। বাবার বাড়িতে মাথা গোঁজার জায়গা একটুখানি পেয়েছে। কিন্তু আলাদা থাকে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা তো হাঁফকাশের রুগী। দাদারা ভাল হলে কী হবে? তাদের বউগুলো বড্ড ঝগড়াটে। সরযু পৃথক হয়ে যাবার পর মান্যবর তাকে কিছু পুঁজি দিয়েছিল। ফুলকলিয়ার সই বলেই স্নেহের বশে দিয়েছিল। সে পুঁজি অবশ্য নগদ টাকাকড়ি নয়—কিছু খন্দ। তাই বেচে সরযুর আসল পুঁজি। এর-ওর ক্ষেত থেকে বা মাচা থেকে আনাজপাতি কেনে, আর গাঁওয়ালে বেচে আসে। ফুলকলিয়া জানে সরযুকে কোন মরদ পছন্দ করে না। ওর চেহারা পেত্নীর মত যে! দাঁতগুলো বেরিয়ে থাকে। নাকটা বেজায় বোঁচা। আরও কত খুঁত আছে শরীরে তার লেখাজোখা নেই। এ মেয়ের শরীরে কবে যে যৌবন এসেছিল, নাকি আদতে আসেইনি—এসব বোঝা ভারি কঠিন। এটুখানি চিমসে বুক, হাড়গিলে গড়ন। অথচ তাই বলে ওকে ঘেন্না করতে পারে না ফুলকলিয়া। কত কাজে লাগে সরযু কতজনের। এই যে এতদিন ধরে নির্মলার সঙ্গে শহরে যাওয়া-আসা করছে, সে তো সরযুর নামে। মান্যবর সরযুকে খুব বিশ্বাস করে। স্নেহযত্ন তো করেই। ওর সঙ্গে ফুলকলিয়াকে বাইরে যেতে দিতে তার আপত্তি হয় না।

একটু পরে ফটিক খাওয়া শেষ করে এঁটো ভাতগুলো কালুয়াকে উঠোনের কোনায় খাওয়াতে গেছে, তখন ফুলকলিয়া চাপা গলায় বলে—দেখনহাসি, কাল আমি টাউনে যাব রী। দুপুর খাওয়ার পব বেরুব। তুই আসিস বহিন। আসবি তো? সরযু চোখ নাচিয়ে বলে—হুঁ। তো আমিও ভি তোর সাথ-সাথ যাব কাল। ছেনিমা দেখাবি তো?

—দেখাব। কেন দেখাব না? আনমনে জবাব দেয় ফুলকলিয়া। তার মন পড়ে আছে নিষাদবাগে। এতক্ষণ কী হচ্ছে কে জানে!

মান্যবর ফিরল অনেক রাতে। সরযুকে আটকে রেখেছিল ফুলকলিয়া। এতদিন একলা কাটাচ্ছে, একটুও ভয়ডর লাগেনি। এই বাড়ি, ওইসব গাছগাছালি আর এই গাঁ—এসবের সঙ্গে তার কতকালের চেনা-জানা। ভয় করার কী আছে? অথচ এতদিন বাদে আজ এই রাতটার কেমন ভয়জাগানো গা-ছমছম ভাব। যেন হাজারটা চোখ দিয়ে কারা ফুলকলিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। তাই সরযুকে ছাড়েনি। মান্যবরের সাড়া পেয়ে কালুয়া গরগর করে উঠতেই ফুলকলিয়া লাফিয়ে উঠেছিল। এমন রাতে কি ঘুম হয়?

মান্যবরের মুখটা বেজায় গম্ভীর। লাঠি ও লণ্ঠন রেখে উঠোনের কোনায় হাত-পা ধুতে থাকে। সরযুকে ঠেলে তুলিয়ে দিয়েছে ফুলকলিয়া। —সেও মান্যবরের দিকে তাকিযে আছে ঘুমঘুম চোখে।

মান্যবর দাওয়ায় উঠে গামছায় হাত-পা মুছে বলে—ভাত বেড়ে দে বেটি!

খবর কী, সেটা জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না দুটি মেয়ে। কখন নিজে থেকে বলবে, তার অপেক্ষা করে। লণ্ঠনের আলোয় দাওয়ায় বসে ভাত খেতে-খেতে মোড়লের এতক্ষণে কথা বলার সময় হল। —বেটি সরযু! থাকবি, না ঘর যাবি গে?

সরযু গতিক বুঝে বলে—ঘর যাই কাকা। নিদ লাগে বড্ড।

তাই যা! ভাত খেয়েছিস তো? ফুলি, ওকে ভাত খেতে বলেছিলি? একটু হেসে সরযু বলে—হাঁ হাঁ বলেছিল। অনেক ভাত খেয়েছি দেখনহাসির হাতে।

—তাহলে ঘরে গিয়ে ঝটপট শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে।

সরযু বেজার হয়ে বেরিয়ে যায়। ফুলকলিয়া তার পিছন-পিছন গিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে। সরযু ফিসফিস করেও কিছু বলে না, এতে ফুলকলিয়ার ভাবনা হয়, কাল ও তাকে টাউনে নিয়ে যাবার জন্যে মোড়লকে বলতে আসবে তো? নয়তো বাবা তাকে একা যেতেই দেবে না। সকাল তো হোক। নিষাদবাগের খবর ফুলকলিয়া জানিয়ে দেবে সরযুকে। তখন নিশ্চয় ওর আর রাগ থাকবে না।

মোড়লমানুষের বাড়ি। হিসেব করে ভাতের চাল দেওয়া হয় না; তাতে ফুলকলিয়ার মতো গিন্নি। প্রতি বেলা গাদাগাদা ভাত গরুর জাবনায় ঢালতে হয়। মান্যবর চুপচাপ খেল রোজকার মতোই। বাকি ভাতে ফুলকলিয়া জল ঢালল। সিকেয় তুলে রাখল হাঁড়িটা। তারপর চৌকাঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলল।

মান্যবর একটা দোমড়ানো সিগারেট বের করেছে ফতুয়ার পকেট থেকে। হেরিকেনের কাচ তুলে ধরিয়ে জোর টান দিল। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে—হারামি বাচ্চা ছাড় দিলে না। নগদ ছ'কুড়ি টাকা দিতে চাইলাম—ওর বাপ কখনও এতগুলো দেখেনি। তাও না। সাতকাঠা ভুঁই দিতে চাইলাম। বলল—ভুঁইয়ে পেচ্ছাপ করে দেয়। চৌবেজি খুব শাসাল আমার হয়ে! শালার বেটার একহি বাত। শেষে বলল—মোড়লের বেটি নিজে এসে যদি ছাড় চায় নিজের মুখে, তাহলে ছাড় দেবে। এক পয়সাও চাইবে না। হাতির পাঁচ-পা দেখেছে। দিন আসমানের তারা দেখেছে আমার নাম মান্যবর। কালই কোটকাছারি করব। মামলা ঢোকাব শালার কুঁড়েঘরে।

ফুলকলিয়া গরম শ্বাসপ্রশ্বাস ছেড়ে বলে—না! ফের বলে—না!

মান্যবর গর্জন করে ওঠে—চুপসে শুত যা। দুনিয়াদারির তুই কী বুঝিস?

অঞ্চলার বাচ্চাটার বয়স আড়াই বছর মোটে। এতোয়ারি ডাকে গেঁদুয়া! বাচ্চাটা হাঁটতে পারে। দুহাত তুলে টলতে-টলতে এসে সামনে দাঁড়ায়। এতোয়ারি কোল দেয়। ভরা গঙ্গা দেখিয়ে বলে—আবে গেঁদুয়া! পাড়ে যাবি? গাঁওয়ালে যাবি? কুমড়া বেচবি, না সোনা বেচবি বে?

অঞ্চলা শিখিয়ে দেয়—বল সোনা!

তার ছেলে তক্ষুণি বলে—ছোনা! এতোয়ারি খিটখিট করে হাসে। তার দাড়ি ধরে টানাটানি করে গেঁদুয়া। দুষ্টুমিতে পাকা। এই মাঠের মধ্যে কুঁড়েঘর, এক টুকরো উঠোনের শেষে বেড়া, তার নিচে নদীর জল। বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে টুপটাপ ঢিল ছোঁড়ে জলে। অঞ্চলা তাকিয়েও দেখে না। এতোয়ারির সবসময় সামাল-সামাল রব। আস্ত কয়েকঝাড় গেঁদাগাছ তুলে এনে লাগিয়েছিল অঞ্চলা, সেগুলো ভাঙচুর করে খেলা করেছিল বলেই এতোয়ারি বাচ্চাটার নাম দিয়েছে গেঁদা। আদর করে ডাকে—গেঁদুয়া। গাঁওয়ালে যাবার সময় ওর সম্পর্কে অঞ্চলাকে পই-পই করে সাবধান করে দেয়।

ছোট্ট ঝিঙেক্ষেতের আর্ধেকটা জুড়ে নতুন সংসার এতোয়ারির। অঞ্চলাও খুব কাজের মেয়ে। একটু করে উঠোন। সারাদিন কতবার গোবর দিয়ে নিকোয়। নিকিয়ে সাধ মেটে না। বৃষ্টি তো লেগেই আছে। ধুয়ে যায়। আবার নিকোয়। তুলসী গাছও পুঁতেছে বাঙালি গেরস্থবাড়ির দেখাদেখি। সন্ধেবেলায় গড় করে। এসব কাজে একটা শাঁখও চাই বই কি। এতোয়ারি টাউনে গিয়ে এনে দেবে। অঞ্চলা বলে—আর সব গাঁয়ে গাঁওবালারা একরকম, নিষাদবাগে অন্যরকম। দেখে এস করলহাটি, মহলা, জীবন্তীতে। আর কেউ ছটপরব করে না। ভারিভুরির মানত করে না। ঠাকুরবাবার থানে যায় না। দুর্গাপুজো কালীপুজো লক্ষ্মীপুজো করছে। যত ঢং নিষাদবাগের! যেকালের যা ধরম সেকালে তা মেনে চলতে হবে।

এতোয়ারি বলে—মুখিয়ার বেটা এবার লক্ষ্মীপুজো দেবে বলেছে। তবে এতটা ঠিক না। ঠাকুরবাবা, ভারিভুরিকেও মানতে হবে বইকি। ছটপরবটাও তো মন্দ নয়।

এসব ধর্মকর্মে অঞ্চলার নিজের মতামত আছে। সে নানান নজির দেখাবে এগাঁয়ের ওগাঁয়ের। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে কথাই বলে না। এতোয়ারিকেও বলতে বারণ করেছে। গাঁওবালারা ওদের দুশমন নয় কি? কলাবেড়িয়া মোড়লের পক্ষ থেকে এতোয়ারির লাঞ্ছনার একশেষ করল না সে-রাতে? অঞ্চলার পরামর্শেই চলেছে এতোয়ারি। বলেছে, মোড়লের বেটি এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলুক, তখন এককথায় ছাড় দেবে।

আসলে অঞ্চলার টাকার লোভ যতই থাক, রূপের ডালি গুমোরওলী ছোকড়িটার চোখের সামনে দেখিয়ে দেবে, দ্যাখ গে দ্যাখ! ভাতারের সংসার কেমন করে করতে হয়। খুব তো বাপের পয়সার গরম। এবার দ্যাখ্, ও দিয়ে দুনিয়ার সুখ হয় না। সুখ কিসে হয় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে যা অঞ্চলার উঠোনে।

তবে হ্যাঁ, টাকার দাবিও ছাড়লে হবে না এতোয়ারিকে। টাকা চাই। অন্তত এতোয়ারির স্যাঙার দরুন গাঁ খাওয়াতে যে খরচ হত, তা লাগবে। আর লাগবে অঞ্চলার গয়নার খরচা। মোটমাট দশ কুড়ি টাকা তো চাই! অগত্যা সাত-আট কুড়ি।

অঞ্চলার মতে, ফুলকলিয়া ছাড় নিতে আসবে এবং সে ওই খেসারতটাও দিয়ে যাবে। ব্যস ছুট্টি। তাতে আর এতোয়ারির অন্যমত কী?

মান্যবর মোড়ল শাসিয়ে গিয়েছিল মামলা করবে। এতোয়ারির মনে দুরু-দুরু ভয় ছিল যথেষ্ট। অঞ্চলা সাহস দিয়েছে—করুক না মামলা। বেটিকে কাছারিতে তুলুক না। বড় ঘরের মুখ হাসুক না। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল। কোথায় কী? গেঁদুয়াকে কোলে নিয়ে আনমনে বাঁধে ঘোরাঘুরি করে এতোয়ারি। অঞ্চলা বাপের কাছে একটা ছাগল পেয়েছে। বিয়ের যৌতুক। এতোয়ারি বাড়ি থাকলে ওভাবে ছাগলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পাতা ভেঙে দেয় গাছ থেকে। গেঁদুয়া নিচে খেলা করে। সে নিচ থেকে আধো-আধো বুলিতে বাবা ডাকলেই এতোয়ারির দুনিয়া এখন সুখে দুলে ওঠে। অঞ্চলা শিখিয়ে দিয়েছে বাবা বলতে। ছেলের মুখে বাবা ডাক শুনে প্রথম প্রথম কেমন লাগত। এখন কী যে ভাল লাগে এতোয়ারির।

সেই সময় একদিন—এতদিন পরে রাধারঘাট থেকে হাটুয়া এল।

চেনাই যায় না আর। ধোপায় কাচা ধুতি, পায়ে সানডিল, গায়ে ফুলহাতা কামিজ ভি। বাঁধ থেকে ডাক দেয়—এতোয়ারি!

এতোয়ারি লাউ গাছের গোড়া খুঁড়ে দিচ্ছিল। খুরপি হাতে উঠে দাঁড়ায়। দুই পুরনো দোস্ত পরস্পরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কয়েকটা মুহূর্ত। হাটুয়ার বাবুর চেহারা আর এতোয়ারির সাধুসন্নেসীর মতো গোঁফদাড়ি লম্বা চুল।

—আরে এতোয়ারি। একী করেছিস? হাটুয়া অবাক হয়ে বলে।

অঞ্চলা কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে বলে—এ্যাদ্দিনে মনে পড়ল রে? দিদির ভালমন্দে খবর নিলি কী নাই নিলি, বুড়ো মামাটার কথাও ভুলে গিয়েছিলি?

হাটুয়া বলে—চুপ, চুপ গে। তুই কী জানিস তার? মামা তো হরঘড়ি ঘাটে গিয়ে বসে থাকে। টাকাকড়িও নিয়ে আসে। পুছ করে দেখিস।

অঞ্চলা হাসে। —বেশ, বেশ। তাই হল। তো দিদির বিভাতে আসিসনি। তুই!

—এই তো এলাম গে। তোদের বিভার সময় আমি পূর্ণিয়া গিয়েছিলাম না চৌবেজির সঙ্গে?

হাটুয়া কত কী এনেছে। অঞ্চলার জন্যে রঙিন শাড়ি, গেঁদুয়ার জন্যে জামাপেন্টুল আর এতোয়ারির জন্যে একটা গেঞ্জি আর এক প্যাকেট সিগারেট। তার ওপর শালপাতার ঠোঙা ভর্তি মেঠাইও আনতে ভোলেনি। খুশির ধুম পড়ে যায় বাড়িতে। গেঁদুয়াকে কোলে নিয়ে মেঠাই খাওয়াতে গিয়ে হাটুয়ার চোখে জল এসে যায়।

—তোর খুব ভাল হবে এতোয়ারি! মা-গঙ্গা তোকে দেখবেন। দিদি খুব কষ্টে ছিল!

এতোয়ারি লজ্জা পায় মনে। ছি, ছি! এই হাটুয়ার সঙ্গে টাউনে বাগানপাড়ায় গলিতে...আঃ! সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে হবে, কে জানে!

—তা সাধুর চেহারা ধরেছিস কেন বে এতোয়ারি?

এতোয়ারি হাসে। —সামনে মাসে কাটব। বনমালী কখন আসে গাঁয়ে, তখন থাকি না।

অঞ্চলা সুযোগ পেয়ে ফোঁস করে ওঠে—সমঝে দে তোর পুরনো বন্ধুকে। আচ্ছাসে সমঝে দে! ও কি মানুষের চেহারা, না ভূতের? কখন দেখবে, পাটকাঠির আগুন ধরিয়ে দেব।

দুই বন্ধু প্রচুর হাসতে থাকে। সিগারেট ধরায়। তারপর বাঁধের দিকে যায়। দুজনে অনেক পুরনো কথা বলাবলি করে। তারপর ঘরের খবর, টাউনের খবর। শেষে হাটুয়া কলাবেড়িয়ার কথা আনে। এতোয়ারি বলে—থাক। হাটুয়া বলে—শোন না বে!

মামলা করবে বলে শাসিয়ে গিয়েছিল মান্যবর। এখনও না করার কারণ, ওর অসুখ। অসুখটা খুব খারাপ। ওদের বাড়ির পিছনে বাঁশবন। বাঁশবনের নিচে গঙ্গার পাড়ের একটা ফোকরে মড়া আটকেছিল। গন্ধে বাড়িতে টেকা দায়। তখন মোড়ল করেছে কী, বাঁশ দিয়ে মড়াটা স্রোতের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। ওই হল বিপদ। কে জানে কার মড়া। যাবার সময় মান্যবরের নাকে একখাবলা গন্ধ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। আর ব্যস। মোড়লের খাওয়াদাওয়া বন্ধ। বেটির কাছে ফুলেল তেল নিয়ে মেখেছে। তাতেও গন্ধ ঘোচেনি। তখন ঘাটে গিয়ে চৌবেজির কাছে আতর নিয়েছে। তাও ঘোচেনি। খাওয়া-দাওয়া একেবারে বন্ধ। শেষে ডাক্তার-কবরেজ করেছে, তাও কিছু না। যা খায়, হড়হড় করে বমি করে ফেলে। মোড়লের অবস্থা কাহিল। বিছানায় ধুঁকছে। পাগলের মতো কী সব বকছে আবোল-তাবোল। মড়ার ভূতটাও ওকে ধরে ফেলেছিল হয়তো। চৌবেজির সঙ্গে সকালে হাটুয়া দেখে এসেছে। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। অমন মোটাসোটা মানুষটা হাড়গিলে হয়ে গেছে। চিঁ চিঁ করে কথা বলছে। জলও খেতে পারে না। বলে—গন্ধ লাগছে। থু থু করে ফেলে দিচ্ছে।

আর তার বেটি তো সারাক্ষণ বিছানার পাশে বসে আছে কান্নাকাটি করছে। কুটুম এসেছে এ-গাঁ সে-গাঁ থেকে। আর বোধহয় রাতটাও কাটবে না।

এইসব বলে হাটুয়া এতোয়ারির দিকে তাকায়। ওর মতামত জানতে চায়। এতোয়ারি একবার ঘুরে এদিক-ওদিক দেখে বলে—গেঁদুয়া কোথা গেল? গেঁদুয়া? গেঁদুয়া?

হাটুয়া বলে—ছোড় বে! বাত শোন। এই ব্যাপারটা দেখেই আমার এখানে আসা। তা নইলে আর নিষাদবাগে আসতাম ভেবেছিস? এ শালা জংলী-ভূতের গাঁ! ভদ্দরলোক আছে নাকি? তো শোন ভাই এতোয়ারি, তুই আমার মামাতো বহিনকে স্যাঙা করেছিস, খুশি হয়েছি। মরদের দুচারটে বউ থাকা খারাপ না। তোর মোড়ল শ্বশুর মারা গেলে সব সম্পত্তি তো তোর বহুর হাতে যাবে। তুই এই সুযোগ ছাড়বিনে।

এতোয়ারি বলে—না।

—না কেন? এতোয়ারি তুই চিরকাল বোকা থেকে যাবি? চৌবেজির অত দেনা শুধবি কিসে বে?

—শুধব।

—নিজেকে বেচতে হবে রে বুদ্ধু! হাটুয়া চাপা গলায় বলতে থাকে। তুই কলাবেড়িয়া চল আমার সঙ্গে। গিয়ে খুব দরদ দেখাবি—ডাক্তার-হাসপাতালের কথা তুলবি। এ সময় তুই গেলে রাজা হয়ে যাবি। মোড়লের ঘরভর্তি খন্দ, গুড়, হরেক জিনিস। অতগুলো গরু। তুই তো এখনও ওবাড়ির জামাই। গিয়ে একটু ফন্দি-ফিকির করতে হবে এই যা।

এতোয়ারি গোঁ ধরে বলে—ভাগ। ভাগ! তুই বড্ড ফিকিরবাজ বে।

হাটুয়া হতাশভাবে বলে—ভুল করছিস, এতোয়ারি।...

এতোয়ারি যা সমঝাবার সমঝে নিয়েছে। এতোয়ারি মোড়লের বাড়ি গিয়ে থাকলে অঢেল পয়সাকড়ির মালিক হবে। হাটুয়া ভেবেছে, সেই সুযোগে এতোয়ারির ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙে খাবে। ছেনিমা দেখবে রোজ। বাগানপাড়ায় ভি যাবে। দারু ভি পিবে। এতোয়ারি কোন মুখে না সব খরচ যুগিয়ে যাবে এইসব ফুর্তিবাজির!

মনে মনে তাই রেগেছে এতোয়ারি। ইচ্ছে করছে, হাটুয়া যা সব এনেছে, এক্ষুণি ওকে ফেরত দিয়ে দেব। এই আচানক উটকো কুটুম্বিতের পেছনে কী আছে, বেশ বোঝা গেছে। কিন্তু মুশকিল অঞ্চলাকে নিয়ে। পিসতুতো ভাইয়ের উপহার ফেরত দেওয়ার কথা তুললে মার-মার কাট-কাট আওয়াজ তুলবে। সত্যি বলতে কী, অঞ্চলাকে এতোয়ারি ভয় করে চলে। মেয়েটার কোথায় একটা মস্তো জোর আছে, এতোয়ারি ওকে ঘেন্না করতে-করতেই তো আদর দিয়ে বুকে তুলে নিয়েছে। বুকে বুক মিশিয়ে শুচ্ছে। শেষরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে আজকাল তার হঠাৎ মনে হয়, খুব কাছে এমন কেউ আছে—দুনিয়াদারির একটা মজবুত ঠাঁইয়ের মতো এবং একটা উঁচু শক্ত জলটুঙির মতো যেখানে দাঁড়িয়ে চারপাশের বানবন্যার জলকে তুচ্ছ লাগে। আশ্চর্য, পয়সাওলা মোড়লের একমাত্র বেটিকে বিয়ে করেও এই জোরটা মনে পায়নি।

অঞ্চলা সাধাসাধি করল ভাইকে। সে খাবার জন্যে আর দেরি করল না। সূর্য ডোবার আগেই চলে গেল। যাবার সময় এতোয়ারিকে আরও বারকতক ভাবতেও বলে গেল।

একটু পরে সন্ধ্যা হতে না হতে পুবের বাঁধের ওদিকে বিরাট চাঁদ উঠেছে। এতোয়ারি গেঁদুয়াকে কোলে নিয়ে চাঁদ দেখাচ্ছে। —উও দেখ, তোর মামা যাচ্ছে চাঁদের মধ্যে। দেখতে পাচ্ছিস তো?

হুঁ, বাগানপাড়ায় আজকাল হাটুয়া যায় কি না জিজ্ঞেস করা হল না। তার গায়ে ঘাফোট নিকলেছিল কি না, তাও একটা জানার মতো কথা।

—আ বে গেঁদুয়া। তোর মামা চাঁদ ধরতে যাচ্ছে, বুঝলি তো। এতোয়ারি প্রবল হাসে। বাচ্চাটাও খিটখিট করে হাসে। থামলে কাতুকুতু খায়।

অঞ্চলা চকচকে ছোট্ট উঠোনে ভাত বাড়তে-বাড়তে বলে—এত্তো হাসি কাহে জি।

হাটুয়া যাবার দুদিন পরে চৌবেজি নিষাদবাগে এল। বটতলায় বসে এতোয়ারিকে ডাক পাঠাল। এতোয়ারি গাঁওয়ালে গেছে। সরস্বতী তার বাড়ির সীমানায় লাগানো আনাজ-পাতির এক চিলতেও দেয়

না বেটাকে। ছোটী মালতীদের সঙ্গে ঝুড়ি ভর্তি করে গাঁওয়ালে বেচে আসে। কখনও টাউনেও বেচতে যায়। কিন্তু টাউনে 'তোলা'র পয়সাটা বেশি দিতে হয়। তাই গাঁওয়ালে বেচতেই আগ্রহী সবাই। এদিকে এতোয়ারি শুধু মাঠের দু'টুকরো ক্ষেতের ফসল নিয়ে নতুন দুনিয়াদারিতে মেতেছে।

এতোয়ারির মাঠের ঘরে শেষ অব্দি চৌবেজি এসে হাঁক পাড়ে।—নয়ানসুখের বেটি! তোর মরদ তো গাঁওয়াল করে বেড়াচ্ছে। এলে বলবি টাকাগুলো তো খেলাং পাত্তি নয়। যদি এ মাসের মধ্যে না শুধে দেয়, ভুঁইক্ষেত যেটুকু আছে দখল লিয়ে ফেলব, হাঁ। বলিস বুড়ির বেটাকে।

অঞ্চলা ছেলেকে মাই দিচ্ছিল দুই ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসে। উঠোনের খোলামেলায় উনুনে আউশ ধান সেদ্ধ হচ্ছে। লকড়ি ঠেলে দিয়ে আস্তে বলে—হাঁ, গাঁয়ে লোক নেই, আসমানে চাঁদসূরয ভি নেই। দিন রাত হয়ে গেছে। ভুঁইয়ের দখল নেবে। পারলে নেবে।

চৌবেজি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তার ময়ূরমুখো ছড়িটা তুলে বলে—নয়ানসুখের বেটির বড় বড বাত হয়েছে রী। তো মরদকে বলিস, বাগানপাড়ায় দারু আর রাণ্ডীবাজি করার সময় হুঁশ ছিল না কেন?

অর্থাৎ এতোয়ারির টাকা নেওয়ার গূঢ় কারণ ওকে জানিয়ে দেওয়া। অঞ্চলা জ্বলন্ত লকড়ি তুলে চেরা গলায় চেঁচায়—খবর্দার! মুখ সামলে বাত করো ঘাটোয়ারিজি।

চৌবেজি আরও খাপ্পা। —দেখ অঞ্চলা, তুইভি ছোট মুখে বড় বাত করবিনে। ঔরত বলে খাতির করব না। বনবিহারী এমনিতে খুব ভাল-মানুষ, কিন্তু রেগে গেলে কিছু পরোয়া করে না।

পাল্টা অঞ্চলার চেঁচামেচিতে এদিক-ওদিক থেকে নিষাদবাগওলারা এসে যায় অনেক। ভরতও আসে। অঞ্চলাকে ধমক দেয়। বোঝায়। অঞ্চলার বাচ্চাটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এমন কান্নাকাটি জুড়ে দেয় যে তখন তাকে না সামলালে আর বাত করাই মুশকিল। চৌবেজি বলে এতোয়ারি তো ইচ্ছে করলেই দেনা শুধতে পারত। এখনও ভি পারে। কলাবেড়িয়ার মোড়ল ছাড় নিতে এসে অতগুলো টাকা দিতে চাইলে, তাতেও বাবুর মন উঠল না। তখনই তো আমার ওর ওপর দয়ামায়া চলে গেল। বলো, যায়, না যায় না?

ভরত সায় দেয়—আলবাৎ! যাবে বইকি।

—তো ফির ভি হাটুয়াকে ভেজলাম। যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এতোয়ারিকে কলাবেড়িয়া নিয়ে যেতে পারে।

বাধা দিয়ে অঞ্চলা প্রায় আর্তনাদ করে—ভাল মতলব দিয়েছিল জি আমার দুশমনী করতে পাঠিয়েছিল।

চৌবেজি বলে—কাহে! তুই যেমন আছিস এখন থাকতিস এখানে। পরে এতোয়ারি তোকে লিয়ে যেত কলাবেড়িয়া। মোড়লের বেটিকে আমি চিনিনে? বয়স কম। আর মনটাও খুব ভাল। কোন ফেরেববাজি জানে না। দুনিয়াদারিতে একদম আনাড়ি। তোর মতো মেয়ে গিয়ে ওর ঘরসংসারে ঝক্কি মাথায় নিলে ও খুশি হত! এমনকি সেদিন মেয়েটাকে আমি এসব বুঝিয়েছিলাম? একেবারে রাজি না হলেও নিমরাজি হয়েছিল ও। কোন হ্যাঁ না করেনি। তার মানেটা কী? তার মানে, এ বিপদের দিনে কেউ মাথার উপর দাঁড়ালে ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলবি, ওদের কুটুমসোদর তো এসেছিল! আরে দূর দূর! সব মড়াখেকো শেয়ালশকুন! সম্পত্তি টাকাকড়ির লোভে হামলে পড়েছিল। এতোয়ারি গিয়ে পড়লে তক্ষুণি ভেগে যেত।

এই কথাটা এবার অঞ্চলার মনে ধরে। সত্যি তো! পরে যা হবার হত, একবার কলাবেড়িয়ার সংসারে ঢুকে পড়তে পারলে ছুরতওয়ালীকে কীভাবে জব্দ করতে হয় অঞ্চলা জানে। কিন্তু তার অবাক লাগে হাটুয়া এসব কথা বলতেই এসেছিল সেদিন। অথচ এতোয়ারি তার কাছে সব গোপন করে রেখেছে।

অভিমানে দুঃখে অঞ্চলা সবার সামনে সুর ধরে কাঁদতে থাকে। তার কপালটাই এই।...

কিন্তু এত গোলমালের মধ্যেও নয়ানসুখ এলো না একবারও। ধনপতিয়া পাশে বাঁধ দিয়ে আস্তে-সুস্থে হেঁটে দূরের ক্ষেত দেখতে গেল। সেও একবার ব্যাপারটা জানতে এল না। আসলে এতোয়ারির

রকম-সকম দেখে সমঝদার লোকেরা মনে মনে বিরক্ত। শুধু ভরতের ব্যাপারটা আলাদা। সবতাতে তার নাক গলানো অভ্যাস, তাই এসেছে।

সামান্য দূরে ছোটী শ্মশানবটের শিকড়ে বসে গঙ্গার জলে পা ডুবিয়েছিল। ছাগলটা ছায়ায় দাঁড়িয়ে বটের পাতা চিবুচ্ছে। গাছভর্তি লাল গুটিফল পেকে রয়েছে। পাখপাখালি কলরব করে খাচ্ছে। ছোটী কলাবেড়িয়ার দিকে নজর রেখে বসেছিল। রোজ ওই অভ্যাস। দাদার ঘরের দিকে গণ্ডগোল শুনে সে উঠে এসেছিল। গাবগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সবটা শুনল আগাগোড়া। তারপর দৌড়ে মায়ের কাছে গিয়ে খবরটা দিল।

শুনে সরস্বতী বলে—হুঁ, এ কী গে! আরও কত হবে দেখবি।

ছোটী আজ গাঁওয়ালে যায়নি। মালতীর জ্বর। আব কারও সঙ্গে বিশ্বাস করে তাকে পাঠায় না বুড়ি। উঠতি বয়েস। কোথাও কি বিপদে পড়ে যায়।

ছোটী মায়ের কথা শুনে ক্ষুব্ধভাবে বলে—মা গে! ঘাটোয়ারিজি যদি ভুঁইগুলো কেড়ে নেয় দাদার কাছে!

সরস্বতী রেগে যায়। —আমি কী করব গে? যাস না তুই, দাদার বহিন তো আছিস!

ছোটী মাকে ইদানীং আগের মতো ভয় করে না। নিজে গাঁওয়াল করে পয়সা আনছে যে! সে পাল্টা রাগ দেখিয়ে বলে—তোর জন্যেই তো এমন হল মা গে!

তোবড়ানো মুখ আরও ভয়ঙ্কর করে বুড়ি বলে—কাহে।

—কলাবেড়িয়ার বহুদিদিকে নিলে তোর কিরে লাগবে বলেই তো দাদা নিতে গেল না। ছোটী অকুতোভয়ে বলে ওঠে। তুই তো দাদাকে কিরে দিয়ে বলেছিলি গে, ও বহু তোর মা হয়! দাদা আর কোন মুখে বহুদিদিকে নিতে যাবে?

সরস্বতী মেয়ের স্পর্ধা দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মুখে কথা সরে না।

ছোটী ফের বলে—তুই মা না গে, তুই শকুন। নিজের বেটার মাথা নিজেই কামড়ে-কামড়ে খেয়েছিস। দাদাকো তু গাঙমে ফেক দেইলা গে!

বলেই সে কান্না চেপে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। শ্মশানবটের ছায়ায় ছাগলটা একলা আছে। আজকাল গঙ্গার পাড়ে ঝোপঝাড়ে সবসময় মড়ার খোঁজে শেয়াল ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। ছোটী দূর থেকে ছাগলটা দেখতে পেয়ে আশ্বাস দেয়—মুংলি হেই মুংলি। আমি যাচ্ছি রী!

আওয়াজটায় কান্না ঠেলে বেরুচ্ছে।

নিষাদবাগের লোক চৌবেজির কাছে টাকা নিচ্ছে কতকাল থেকে। সুদে-আসলে শোধ করতে সর্বস্বান্ত হয়েছে, তবু গণ্ডগোল করেনি। মুখ বুজে মেনে নিয়েছে সব। কিন্তু এতোয়ারির বেলায় অন্যরকম ঘটল। কাপাসী থেকে লাঠিয়াল এনে চৌবেজি এতোয়ারির দু'টুকরো জমিই দখল করে নিল। এতোয়ারি গাঁওয়াল থেকে ফিরে দেখে তার পটল আর করেলার সবুজ ভুঁই এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলেছে লাঙলের ফলা। অন্য ভুঁইয়ে পাট লাগিয়েছিল চৌবেজির দাদন খেয়ে। খরায় মরে-হেজে গিয়ে কিছু পাট টিকে গিয়েছিল শেষমেশ। সে পাটও মাটির চাঙড়ে দলা পাকিয়ে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে চাঙড়গুলোতে লাথি মেরে-মেরে এতোয়ারি কিছুক্ষণ রাগ দেখায়। ওখানে কুঁড়েঘরে অঞ্জলা সমানে চেঁচানি জুড়েছে তো জুড়েছে। বনবিহারী ঘাটোয়ারির চোদ্দ পুরুষকে ভরা গঙ্গায় চুবিয়ে নাকাল করছে। বর্ষার ভেজা আর বাতাসে উর্বর গাঙ্গেয় মাটির গন্ধে এতোয়ারির দম তখন আটকে যাচ্ছে। তার মাও এমন নিষ্ঠুর হয়ে গেছে! উনিশ ভরি গয়না কোথায় যে সামলে রেখেছে বুড়ি, প্রাণ গেলেও তা বলবে না। বেহায়ার মতো এতোয়ারি মায়ের কাছে গিয়েছিল। খুব সাধ্যসাধনা করেছিল। বুড়ি দেয়নি। দিলে সেগুলো বেচে এই বিপদ ঠেকাতে পারতো।

অন্ধকারে মাঠের হাওয়ায় ওল্টানো মাটির কড়া গন্ধ আর পাশের গঙ্গার জলের চাপা ছলছল শব্দ এতোয়ারিকে হঠাৎ একটু বেকায়দায় ফেলে দেয়। হঠাৎ তার মনে হয়, যাবে নাকি কলাবেড়িয়ার

মোড়লের বেটির কাছে নিশুতি রাতে, যখন দুনিয়া ঘুমিয়ে থাকবে, কেউ টের পাবে না, চুপিচুপি? বলবে—তোর তো অনেক টাকাকড়ি আছে বহু গে, আমি তো এখনও তোর মরদ আছি—

যেন সাপের ছোবল খায় বুকের ভেতর থেকে। অন্ধকারে ভূতের মতো নড়াচড়া করে এতোয়ারি। ...বলতে চায়—না, না, না।—

বাঁধের দিকে সাইকেলের ঘণ্টি বাজে এবং একচিলতে আলো দেখা যায়। মুখিয়ার বেটা বাড়ি ফিরছে। কী ভেবে এতোয়ারি বাঁধের দিকে পা বাড়ায়। চেঁচিয়ে ডাকে—সূরয! সূরযুয়া।

সূর্য সাড়া দেয়—কে? এতোয়ারিদা নাকি?

—হাঁ ভাই সূরয। এতোয়ারি হাঁফাতে-হাঁফাতে গিয়ে তার সাইকেলের হ্যান্ডিলে হাত রাখে—সূরয! চৌবেজি আমার ভুঁই কেড়ে লিয়েছে। আমাকে খতম করে দিয়েছে ভাই।

সূর্য সাইকেল থেকে নেমে ভারী গলায় বলে—হুঁ। শুনেছি।

এতোয়ারি ব্যাকুল হয়ে বলে—তুমি লিখাপড়াহ আদমী। আমি নাদান। একটা কিছু তো বাৎলাও ভাই! সুদে-আসলে ছকুড়ি টাকার জায়গায় বারোকুড়ি দাবি করেছিল ঘাটোয়ারি। আর দেড়কুড়ি পাটের দাদন। আমার ভুঁই দুখানার দাম আরও বেশি।

সূর্য বলে—কাগজে টিপছাপ দিয়েছিলে এতোয়ারিদা?

—হাঁ হাঁ। আমি দিয়েছিলাম। মা ভি দিয়েছিল।

—তাহলে তো মুশকিলের কথা। আচ্ছা, আমি দেখছি। .. বলে সূর্য পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে। এতোয়ারিকে দেয়। নিজে নেয়। দেশলাই জ্বালে হাওয়া বাঁচিয়ে।

এতোয়ারি সিগারেটটা হাতে ধরে থাকে। বলে—পরে খাব সূরয।

সূর্য কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগারেট টানার পর বলে—ঘাটোয়ারির জুলুমবাজির কথা আমি অনেকদিন থেকে ভেবেছি এতোয়ারিদা। ভেবেছি একটা কিছু করা দরকার। তো এতোয়ারিদা, দেশে এতদিন ব্রিটিশ রাজ্য, আমরা পরাধীন ছিলাম। এবার স্বাধীন হচ্ছি। আর কিছুদিন পরেই আমরা স্বাধীন হয়ে যাব। তখন আর কারও জুলুম চলবে না। তখন গাঁওবালাদের আর কষ্ট হবে না।...

এতোয়ারি কিছু বোঝে না। সে কথা কেড়ে বলে—তুমি লিখাপড়াহ ছোকড়া। সূরয, তুমি আর কিছুদিন পরে গাঁয়ের মুখিয়া হবে। আমার ভুঁই-দুটো কেড়ে নিল ঘাটোয়ারি—তুমি আমাকে একটা ফিকির তো বাৎলাও ভাই!

সূর্য একটু হাসে। স্বাধীনতার ব্যাপারটা নিষাদবাগওয়ালারা বোঝেই না। তার বাবা ধনপতি সরকারও বোঝে না। আর ওই ভরত তো অবিশ্বাসের হাসি হেসে উড়িয়ে দেয়—গরিবের ভালো হবে? ছোড় জি! ঠাকুরবাবা যদি ভাল করেন তো হবে নয়তো ওই যে বলছে 'কাঁকরেস' (কংগ্রেস) না কী যেন—

সূর্য বলে—কিন্তু ভুলটা তো তোমারই এতোয়ারিদা! কলাবেড়িয়ার মেয়েকে ছাড় দিলেই তো অনেক টাকা পেয়ে যেতে! মান্যবর কাকা এসেছিল পর্যন্ত! তুমি গোঁ ধরে রইলে। এখন তো মান্যবর কাকা নেই যে আমি গিয়ে টাকার কথা তুলব।

এতোয়ারি আস্তে-আস্তে বলে—আমি তোমাকে তা বলিনি গে!

পরক্ষণে সে তার কুঁড়েঘরের দিকে এগিয়ে যায়। সূর্য ডাকে—এতোয়ারিদা শোন, শোন। কথা আছে।

এতোয়ারি জবাব দেয় না। সূর্য বোঝে, রাগ হয়েছে এতোয়ারির। কলাবেড়িয়ার মেয়েটির ব্যাপারে কেন তার এমন অদ্ভুত রাগ? নিষাদবাগের লোকেরা যেমন ব্যাপারটা বোঝে না, সূর্যও তাই। মোড়লের বেটি বেচারিকে বড় বেশি শাস্তি দিচ্ছে এতোয়ারি।

আজ টাউনে অনেকদিন পরে হঠাৎ দেখা হয়েছিল। সূর্যের সঙ্গে শরম না মেনে কত কথা যে বলল। সূর্য অবাক হয়েছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর কলাবেড়িয়ার মেয়ে যেন কোত্থেকে প্রচণ্ড জোর

পেয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়েছে বলেই কি? এতোয়ারিকে এই ব্যাপারটাই বলতে চাইছিল।

ফুলকলিয়া সূর্যকে একবার যেতে বলেছে। খুব জরুরি বাত আছে। যাবে সূর্য? আজ সারাক্ষণ মনে সেই তোলপাড় চলেছে। যাবে, না যাবে না?

* * *

ভোররাতে ঘুম ভেঙে এতোয়ারি টের পেয়েছিল আবার আসমান জোর বর্ষাচ্ছে। তিনদিন থেকে এই বাদলার উপদ্রব। সেদিন হাটবার মহুলায়। মা গঙ্গার বুকের কাছে বড় যত্নে অঞ্চলা যে মাচান বেঁধেছিল শশা আর শিমের, অঢেল ফলেছে ভারিভুরির দয়ায়। এই টুকরো উঠোনের কোনায় এককাঠা ক্ষেতটুকু ছাড়া আর তো ভুঁই নেই এতোয়ারির। ওখানেই মাগ-মরদে খেটেছে সকালসন্ধ্যা। ক্ষেতের শেষে বেড়ার নিচে জল ছলছল করে সারাক্ষণ। পুরুষ-পুরুষানুক্রম দেখে আসছে, তত কিছু বানবন্যা হয় না এ নদীতে। সেই বিশ্বাসেই এতোয়ারির এমন কিনারায় ঘর বেঁধে থাকা এবং আনাজপাতির মাচান। রাতে ভেবেছিল, ভোরবেলা উঠে মাগ-মরদে শশাগুলো তুলবে। শিম তুলবে। তারপর জামবাটিভরা ছাতু খেয়ে এতোয়ারি যাবে মহুলার হাটে। বাবুদের পুজো এসে গেছে। তাই অঞ্চলাও ছেলেকে কোলে নিয়ে সঙ্গে যাবে ঠাকুর দেখিয়ে আনবে। হঠাৎ ভোরে এই তুলকালাম বিষ্টি। আসমান কি ফুটো হয়ে গেল রী? বলে এতোয়ারি বাইরে উঁকি দিয়েছিল। তারপর অবাক হল। সারারাতের পচা গন্ধটা আর পাচ্ছে না।

বর্ষায় ভাগীরথী আর তার দুই কূলে বড় শোভা। ভরা গঙ্গায় পচাগলা মড়া বুকে শকুন কী দাঁড়কাক নিয়ে ভেসে যাওয়াও তো সেই শোভার এক শোভা। এ নদী কিনা দেবদেবতা! যার শিয়রে বসে আছে স্বয়ং ঠাকুরবাবা দুই কাঁধে দুই কন্যা ভারি ঔর ভুরি। কিছু অপবিত্র লাগবেই না তোমার। যদি লাগে তবে জানবে মনে তোমার পাপের বাসা। তোমার চোখ পাপের চোখ। পাপের নাক বদগন্ধ শোঁকে। ওই জন্যেই তো মান্যবর মোড়লের ওই ভয়ঙ্কর শাস্তি হল। এতোয়ারির বেড়ার নিচে আগের সন্ধ্যায় একটা গরুর লাশ এসে ঠেকেছিল। সারারাত সেই পচা গন্ধ। তবু ভয়ে লাশটা ঠেলে সরিয়ে দেয়নি। এখন গন্ধটা পাচ্ছিল না। তার মানে স্রোত হাত বাড়িয়ে টেনে দিয়ে গেছে। এতোয়ারি খুশি হল। কলাবেড়িয়ার মোড়লের পয়সা ছিল! কিন্তু ভক্তি ছিল না। এতোয়ারির আজকাল বড় ভক্তি।

একটানা বর্ষাচ্ছে আসমান। অঞ্চলা আবছা অন্ধকারে চোখ খুলে অস্পষ্ট কিছু বলল। এতোয়ারি তালপাতার ছাতাটা খুঁজে নিয়ে বলে—উঠ্‌যা রী বহু।

সে ছাতা মাথায় কয়েক পা গিয়ে দেখে মাচানের তলায় জল এসেছে। আসুক। এর বেশি বাড়ে না। সে শশাগুলো তুলতে শুরু করে এবং মাঝে-মাঝে অঞ্চলাকে ডাকে। চারদিকে ধূসর। গঙ্গায় কেমন চাপা গম্ভীর একটা শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে সেই আজব আওয়াজ এতোয়ারিকে একটু ডর পাইয়ে দেয়। কিন্তু অঞ্চলা আসছে না দেখে সে বিরক্ত হয়ে চেঁচায়—ও রী গতরওয়ালী! খুব রানী হয়ে গেলি নাকি! হাটের বেলা বয়ে যাবে সমঝাচ্ছিস না?

তখন অঞ্চলা বেরিয়ে আসে। মাথা থেকে পিঠের দিকটা ঢেকে রাখার মতো একটা তালপাতার 'খোপড়ি' বানিয়েছিল নিজে। সেইটা চাপিয়ে বেরিয়েছে সে। ঝুড়িও নিতে ভোলেনি। মাচার কাছে এসে আঁতকে ওঠে। —মা গে! এত্তা পানি কাঁহে গে!

এতোয়ারি বলে—পানি জেরাসে বেড়েছে গাঙমে। বাড়ুক না। ঝটপট শিমগুলো তুলে ফেল।

—তো এত্তা বিষ্টির মধ্যে হাট কি বসবে জি?

—বাত মাৎ কর রী! বিরক্ত এতোয়ারি শশা তুলতে-তুলতে বলে। কমসে কম তিরিশটি ফলেছে। মন্দ কী! কোনার দিকে প্রথম জন্মানো শশাটা রেখে দেবার রেওয়াজ আছে। ওটা ভারিভুরির নামে চালের বাতায় ঝুলিয়ে রাখা হবে বীজের জন্যে।

এইসব বিষ্টির নাম 'গাজল'। গাজলের ফোঁটা হাল্কা এবং দিনভর-রাতভর চললে তখন 'ডাত্তর'।

ডাক্তরের সঙ্গে উত্তাল হাওয়া বইতে থাকলে 'ফাঁপি'। ফাঁপি বাড়লে 'তুফান'। একটু পরে পিছনে নিচু বাঁধের দিক থেকে যে হাওয়া এল, তাব গতিক ভাল নয়। উত্তর-পূর্ব কোণের এই হাওয়া ফাঁপির আভাস কিনা কে জানে! দু'ঝুড়ি শশা আর শিম দাওয়ায় রেখে এতোয়ারি যখন ছাতু খাচ্ছে, হাওয়াটা বেড়ে গেল। অঞ্চলা একটু হেসে বলল—মহুলার হাটে কেমন করে যাবে জি? ছাত্তি তো তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে গাঙমে ফেলবে।

এতোয়ারিও একটু হাসে। ঢকঢক করে জল খেয়ে মুখ মোছে। বিড়ি ধরায় চকমকি ঠুকে। আজকাল আর দেশলাই কিনে বাজে খরচ করে না সে। খরার সময়কার সেই টাউনবাজি সৌখিনতা এখন স্বপ্নের মতো লাগে।

বেচারী অঞ্চলা ছেলেকে নিয়ে মহুলায় ঠাকুর দেখতে চেয়েছিল। হল না। এতোয়ারি ঘুমন্ত গেঁদুয়াকে খুব আদর করতে গিয়ে জাগিয়ে ফেলল। একটু পবে যখন বেরুল, তখন গেঁদুয়া কাঁদছে। বাঁধে হাওয়া আর বিষ্টির মধ্যে টলতে-টলতে ভার কাঁধে নিয়ে এতোয়ারি চলল। গেঁদুয়ার কান্নার আওয়াজ কানে আবছা ভেসে আসছিল। অঞ্চলা বেটাকে মাই দিয়ে সামলাবার চেষ্টা করছে। গেঁদুয়া এতোয়ারির এতো কোললাগড়া হয়ে গেছে যে গাঁওয়ালে বেরুলেই সঙ্গে যাবার জন্যে কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। বাঁধের পথে অতি কষ্টে যতদূর যায় এতোয়ারি, ওর জন্যে মনটা কেমন করে।

আধাআধি রাস্তা যেতেই হাওয়া আরও বেড়ে গেল। তারপর অঞ্চলা যা বলেছিল, ঠিক তাই হল। তালপাতার ছাতাটা ছেড়ে না দিলে এতোয়ারি গিয়ে নির্ঘাত গঙ্গায় পড়ত। ছাতাটা ছেড়ে দিল সে। উড়ে গিয়ে ঝুপ করে স্রোতে পড়ল হাতবিশেক দূরে। তারপর বোকার মতো ভার কাঁধে নিয়ে এতোয়ারি কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। ছাতাটা বৃষ্টির ধূসরতায় আবছা হতে-হতে যখন জলের তলায় হারিয়ে গেল, সে রেগে গেল হঠাৎ। জেদ চড়ে গেলে মাথায়। যা কিছু ঘটুক, মহুলার হাটে যাবেই সে। ঘা খাওয়া জানোয়ারের মতো চাপা গর্জন করে কুঁজো হয়ে দুলেদুলে চলল এতোয়ারি। পিছল মাটিতে পা রাখা মুশকিল। বারবার টলে আছাড় খাবার উপক্রম, তবু সে অন্ধ জেদে ফুঁসে ওঠে। চাপা গলায় হুঙ্কার দেয়। আর চলতে থাকে।

এই সেই এতোয়ারি, যে কলাবেড়িয়া মোড়লের ঘরজামাই হতে চায়নি—তার টাকার লোভে একটুকু টলেনি। এত অপমান আর দারিদ্র্যের দুঃখকষ্টের মধ্যে মাথা উঁচু করে চলতে চেয়েছে, তবু ইমানসে ধরমসে যে পয়সাওয়ালী মেয়ে তার এখনও বহু, তার কাছে হাত বাড়াতে যায়নি।

সারাপথ কোথাও কোন লোক নেই। এই দুর্যোগে কেউ তার মতো গোঁয়ার্তুমি করে বেরোয়নি। বাঁয়ে করলহাটি, ডাইনে গঙ্গার পাড়ে ঘোড়ামারার বস্তি ফেলে মাঠের আলপথে নামে সে। তখনও কারো সঙ্গে দেখা হয় না। সামনে মহুলার 'বানুক' দেখা যাচ্ছে—সে আমলের এক রেশমকুঠিব পোড়ো দালানবাড়িতে ইটের উঁচু মিনারের মতো একটা স্তম্ভ। বানুকটা তাকে হাতছানি দেয়। সাহস জোগায়।

ছোটী সেদিন মনমরা। আগের দিন সন্ধ্যায় শহর থেকে মালতীর সঙ্গে আনাজ বেচে ফেরার সময় একখানা সাবুন আর ছোট্ট এক শিশি আমলা তেল কিনেছিল। সাবুনের দাম ছয় আনা, গন্ধ তেলটার দাম দশ আনা। তার জন্যে মা তাকে চুল ধরে মার দিয়েছে। এ বাজারে একটা টাকা ওই কিনে কোন্ আক্কেলে খরচ করল হারামজাদী মেয়ে! এক্ষুণি টাউনবাজ হয়ে গেল? এদিকে দুবেলা পেটের খাবার জোটে না! আর ঘরে জোয়ান বেটা নেই—ভুঁইক্ষেত নেই, শুধু এই ভিটে। উঠোনের দুটো-চারটে ফলের গাছ আর মাচান সম্বল।

অকথ্য গাল দিয়েছে সরস্বতী। শরৎ দালালের বহুর পাল্লায় পড়েছে বলে সন্দেহ করেছে। মালতীর নামেও কুচ্ছো করেছে। তাই শুনে মালতীর মা-বেটিরা এসে ঝগড়া করেও গেছে। রাতে রাগে-দুঃখে খায়নি ছোটী। সারারাত হঠাৎ ঘুম এসেছে, স্বপ্ন দেখেছে আর হঠাৎ ভেঙে কতক্ষণ মনে ছটফটানি। আজ কী হল। খালি কলাবেড়িয়া বহুদিদির স্বপ্ন। গঙ্গাপুজোর মেলায় হাত ধরাধরি করে বেড়ানো আর জিলিপি খাওয়া। মধুব আশ্রমে বড়-বড় লাল-হলুদ গাঁদা ফুল তুলতে গিয়ে সে কী বিপদ! সাধু রাক্ষুসে

মূর্তি নিয়ে এগিয়ে আসে, পালানো যায় না। ও বহুদিদি, তুঁ কাহা রী! ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না। চোখের জলে বালিশ ভেজানো।...

ভোরে বৃষ্টি। তারপর 'ফাঁপি' শুরু হলে সরস্বতী বলেছে—ওঠ্ : উঠে মুখ ধুয়ে দানাপানিগুলো খা। খুব হয়েছে। আর রাগ দেখাতে হবে না।

যদ্দিন বটতলায় না যাই তদ্দিন বকব। তারপর যা করবি তা তো জানি।

এইসব শুনে মায়ের চাপা দুঃখটা টের পেয়েছে ছোটী। মনটা ভাল হয়ে গেছে তার। আহা, মা তো বটে। দাদা নিদয়া হয়ে ফেলে গেল। বুড়ি মা আর কদিনই বা বাঁচবে? এখন তার মাকে কোনভাবে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। সত্যি তো, পরের ঘরে চলে যেতে হবে ছোটীকে। তখন কত সাবুন মাখবে, কত গন্ধ তেল চুলে ঢালবে! আজকালকার বরগুলো সবাই টাউনবাজ হয় কি না।

সাবুন আর তেলটা কাকেও বেচে দেবে বরং দু-আনা কম পেলেও চলবে। কিন্তু যা 'ফাঁপি' লেগে গেল, বাড়ি থেকে বেরুনোই মুশকিল। ছোটী মুখ ধুল। রাতের পান্তাগুলো খেতেও ছাড়ল না। তারপর খুব গিন্নিপানা দেখাতে শুরু করল। ভরতের বাড়ি থেকে সরস্বতী পাঁচসের ছোলা এনেছে। ভেজে ছাতু করে দেবে। তার বদলে ভরত দেবে দেড়কাঠা আউশ চাল। চালটা না পেলে পরদিন আর ভাত খাওয়া যাবে না। গাঁয়ে চাল কোথায় কিনবে? কিনতে হলে সেই টাউনে। 'ফাঁপি' যখন লেগেছে, কয়েকটা দিন থাকবেই।

এসব ভেবে ছোটী ঘরের পিছনে শুকনো ঘুঁটে ছাড়াতে গেল। বৃষ্টির ঝাপটানিতে সব ভিজে যাবে একে-একে। আর ঘুঁটে ছাড়াতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল পিছনের চালের বাতায়। খড়ের এক জায়গায় উঁকি মেরে আছে একটুখানি ন্যাকড়া। একটু অবাক হল। বহুদিদির কীর্তি! ছি ছি, ওখানে কেউ গোঁজে নাকি? ওই খারাপ স্বভাবের জন্যেই তো এ বাড়িতে ওর থাকা হল না—বাপের বাড়ি পালিয়েও কি সুখ পেল? বাপটা আচানক মারা পড়ল ভূতের হাতে।

ঘুঁটে ছাড়ানো বন্ধ রেখে কাস্তের খোঁচায় ন্যাকড়াটা টেনে সে ফেলে দিতে চাইল চালের বাতা থেকে। আর তারপরই চমকে উঠল।

ন্যাকড়াটা নোংরা নয় এবং ওটা একটা 'উরমাল' অর্থাৎ রুমাল। বহুদিদির কাছে উরমাল থাকতে দেখেছে ছোটী। এবং ওই উরমালে কিছু গিট দিয়ে বাঁধা রয়েছে।

ওজনে ভারী। ধুপ করে গড়িয়ে পড়ছে ছাঁচতলায়। চালগড়ানো বৃষ্টিতে ভিজতে লেগেছে। ছোটী ঝটপট কুড়িয়ে নিল। তারপর কাঁপা-কাঁপা আঙুলে খুলতে থাকল। খুলতে কষ্টই হচ্ছিল। জলে গিটটা আঁটো হয়ে গেছে। তখন সে কাস্তের ডগা দিয়ে ফেড়ে ফেলল। অমনি বুক ছাৎ করে উঠল তার। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এক গুচ্ছের রুপোর টাকা!

কার এ টাকা, তা বোঝাই যাচ্ছে। বড়লোকের বেটি বাপের বাড়ি থেকে টাকা এনে লুকিয়ে রেখেছিল এবং পালিয়ে যাবার সময় নিয়ে যাবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু গঙ্গাপুজোর সময় তো ছোটীর সঙ্গে দেখা হল, কথাটা বলল না কেন? নাকি ভুলেই গেছে? এতগুলো টাকার কথা মানুষ ভুলে থাকতে পারে?

হয়তো পারে। ওর বাপের যে অনেক টাকা।

ছোটী টাকাগুলো নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মাকে দেখালে কী করবে, সে জানে না। মা হয়তো আনাজপাতির ব্যবসা করতেই চাইবে। হয়তো ছাগল কিনে ফেলবে আরেকটা। ছোটী খুশি, দ্বিধা, ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়ে। শেষে ভাবে, লুকোনোই থাক্ এখন। পরে ভেবেচিন্তে দেখা যাবে। তবে একটা টাকা নিতেই বা দোষ কী? বহুদিদি তাকে ভালবাসে, একথা তো মিথ্যে নয়। একটা টাকা বাজে খরচ করেছে বলে রাতে কত লাঞ্ছনা হল। এখন মায়ের মুখের সামনে ঝলমলিয়ে একটা রুপোর টাকা ঠকাস করে ফেলে দেবে। —লো গে, তেরা রূপেয়া! হাম খরচা কিইলে, হাম ফেরত ভি দেইলে! আঃ! মায়ের মুখের যা ভাব হবে!

ছোটী শুনে দেখল—এখন সে শুনতে শিখেছে। সাতটা টাকা রয়েছে। টাকাগুলো রুমালের ছেঁড়া অংশটা বাঁচিয়ে ভাল করে বেঁধে রাখে এবং একটা টাকা কোমরের কাপড়ে গোঁজে। তারপর টাকার রুমালটা অন্য এক জায়গায় চালের খড়ের মাধ্যে সাবধানে গুঁজে দেয়।

—ছোটী রী। ওখানে কী করছিস।

ছোটী চমকে উঠে দেয়ালের উঁচু ভিত থেকে আচাড় খায়। এদিকে মালতীদের বাড়ির পিছনকার সবজিক্ষেত। বৃষ্টির মধ্যে মালতীর মা কলার কাঁদি কাটতে বেরিয়েছে। দেখে ফেলল না তো? ছোটী সন্দিগ্ধদৃষ্টে তাকিয়ে বলে—ঘুঁটে তুলছি গে মোসি! কলা কাটবার আর সময় পেলিনে তুই?

মালতীর মা বলে—ফাঁপি উঠেছে। পাকন্ত কাঁদিটা গিরে গেলে বরবাদ হবে রী। তাই কেটে নিই। গোড়ার মধ্যে জাগ দিয়ে রাখব।

শুকনো ঘুঁটেগুলো আঁচলে নিয়ে ছোটী তক্ষুণি চলে আসে। মা উনুন ধরিয়েছে দাওয়ায়। ছোলাগুলো বের করেছে বাঁশের টুকরিতে। ঘুঁটে দেখে খুশি হয়ে বলে—আয় বেটি। বালি গরম হয়েছে। ভাজতে পারবি কিনা দ্যাখ। আমি ছাগলটাকে আমানি দিই।

একে আনাড়ি হাত। তাতে টাকার ভাবনচিন্তা মনে। ছোটীর হাত কাঁপে। ছোলাগুলো পুড়ে যাবার দাখিল। সরস্বতী এসে দেখে হাঁ হাঁ করে ওঠে। কেড়ে নেয় মেয়ের হাত থেকে। কিন্তু মুখে হাসি রেখে বলে—শ্বশুরাল গিয়ে তুই কী যে করবি বেটি, ভেবেই পাইনে। তাই তো অত করে বলি, কাজকাম মন দিয়ে শিখে নে, যদ্দিন বেঁচে আছি।

ছোটী মিষ্টি হেসে ডাকে—মা।

—উঁ?

—কাল একঠো রুপেয়া হামি খরচা কিইলে। তো ইয়ে লে গে তেরা রুপেয়া। বলে সে ট্যাঁক থেকে চাঁদির টাকাটা মায়ের পেটের কাছে ফেলে দেয়। খিলখিল করে হাসতে থাকে। যেন ভোজবাজি জাদুর খেল দেখিয়ে দিয়েছে।

সরস্বতী বাঁ হাতে পেটের কাছটায় কাপড়ের ভাঁজ খুঁজে টাকাটা তোলে। দেখে উল্টেপাল্টে কয়েক মুহূর্ত। তারপর ছোটীর দিকে তাকায়। ফোকলা মুখটা ফাঁক হয়ে গেছে। ভেতরে আধা-অন্ধকারে জিভটা দেখা যাচ্ছে। ঘোলাটে দৃষ্টি নিষ্পলক। ভুরু কোঁচকানো। কড়াইয়ে বালি পুড়ে কালো। ধোঁয়াচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি আর উত্তাল হাওয়ার একটানা শব্দ। গাছপালা দুলছে। বাহানে শিম করেলা শশার লতা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। তারপর সে শ্বাসপ্রশ্বাস মিশানো স্বরে আস্তে বলে—কোথায় পেলি?

ছোটী হাসতে-হাসতে বলে—বোঁলু কাঁহে গে? নেহি বোঁলু। শোধ তো হল—ঔর ক্যা?

কালো বালির ধোঁয়া বাড়ছে। সরস্বতী ফের বলে—কোথায় পেলি?

ছোটী রাগ করে বলে—পেয়েছি। এত বাত কাঁহে গে? পেলি—ব্যস!

সরস্বতী কড়াই নামিয়ে রাখে! তারপর ঘুরে বসে বলে—মালতীর বর দিয়েছে তোকে?

ছোটী চমকে ওঠে জোরে মাথা দোলায়।

—ঘুঁটে আনতে গিয়ে মালতীর বরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আর তোকে রুপেয়াঠো দিলে? সরস্বতী হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করে একথা।

ছোটী চেঁচিয়ে ওঠে— না। না!

—হরঘড়ি মালতীর বরের নজর তোর দিকে। টৌন যাচ্ছিস, হাট যাচ্ছিস। আর আমি অন্ধ রী? আমি কি কিছু সমঝাইনে রী? ও রী বলি, কুত্তিন, বাজারওয়ালী খানকি! তুই ওর কাছে রুপেয়া লিয়ে এলি। আ থু থু। আ ছেঃ ছেঃ। ওয়াক থু। বলতে-বলতে সরস্বতী মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আবার রাতের মতো হামলা। ছোটী এখন রাতের মতো চেঁচিয়ে ওঠে না। বোবা হয়ে গেছে। মা তাকে গরম বালিতে পুড়ে যাওয়া কুচির গোছা দিয়ে মুখে মারছে। দুহাতে ঢাকে ছোটী। নিঃশব্দে মার হজম করে।

টাকাটা সরস্বতী কাদায় ভরা উঠোনে কোথায় ছুঁড়ে ফেলেছে। হাওয়া ততক্ষণ গেছে বেড়ে। দাওয়ায় বৃষ্টির ছাট আসছে। হঠাৎ সরস্বতী গরম বালির কড়াইটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে—গরম ঢালব কুত্তিনের মুখে।...

সঙ্গে-সঙ্গে ছোটী আর্ত চিৎকার করে লাফ দিয়ে উঠোনে নামে। দিশেহারা হয়ে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে যায়। পালাতে থাকে।...

মহুলার হাট সেই দুর্যোগে প্রায় খাঁ-খাঁ। দুপুর নাগাদ ঝড়বৃষ্টি বাড়লে আটচালাগুলোয় যে সব মরিয়া হাটুরে এসে জুটেছিল দোকানপাটের দাওয়ায় গিয়ে আশ্রয় নিল। কেউ-কেউ বাড়ি ফেরার চেষ্টা করল। তারাই মাঠ থেকে ফিরে এসে খবরটা দিল। বাঁধ ভেঙে জল ঢুকেছে মাঠে। অথৈ সমুদ্দুর চারদিকে। হইচই পড়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

এতোয়ারি হাটের অবস্থা দেখে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে শশা আর শিমগুলো নয়ছয় করে বেচেছে। তারপর বাজারে এসেছে গেঁদুয়ার জন্যে মেঠাই কিনতে। আর কেনা হল না। হাটতলায় তখন জল ঢুকে গেছে। সেইসঙ্গে বেড়ে গেছে ঝড়। মড়মড় করে চোখের সামনে হাটের পুরনো বটগাছটা একপাশে কাত হয়ে পড়ল। আটচালাগুলো ডালপালার তলায় চাপা পড়ল। ব্যস্ততা হইচই পালাই-পালাই হট্টগোল চারদিকে। হাঁটুজল ভেঙে এতোয়ারি 'বাঁইকটা' লাঠির মতো ডুবিয়ে-ডুবিয়ে চলতে থাকে। ঝুড়ি দুটো ঝুলিয়ে রাখে। গাঁয়ের লোকেরা উঁচু জায়গার দিকে চলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ঝড়ের শব্দের মধ্যে আবছা হাঁকা-হাঁকির শব্দ। এতোয়ারি জল ভেঙে মাঠের ধারে এসে ভয়ে-বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

যতদূর চোখ যায় জল, শুধু জল। সেই জল দুলে উঠছে। গাছপালা ভেঙে পড়ছে। 'মা' ভৈরবী সন্ন্যাসিনীর মতো আলুথালু জটা দুলিয়ে নাচছে। এতোয়ারির বুকের ভেতর একটা তীব্র চিৎকার ওঠে—গেঁদুয়া-আ-আ-আ! কিন্তু জিভ নিঃসাড়। বুকে একটুকু দম নেই।

এতোয়ারি বাঁইকটা ফেলে দেয়। ঝুড়িদুটো ফেলে দেয়। মাঠে হুড়মুড় করে নামে। সাঁতার কাটতে থাকে। ঠাকুরবাবা! এতদিনেই কি এতোয়ারির পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে? এ যে অনেক বেশি হয়ে গেল ঠাকুরবাবা!

সে বাঁধের ভাঙনের ওপারে পৌঁছতে চেষ্টা করে। বাঁধটা ওদিকে ডুবু-ডুবু হয়ে জেগে আছে কিছুদূর। জলের তোড়ে বারবার দূরে যায় সে। একসময় হাঁচড়-পাঁচড় করে বাঁধের মাটি আঁকড়ে ধরে। টলতে-টলতে হাঁটে। দুধারে জল। বাঁয়ে নদী, ডাইনে মাঠ দুদিকেই অতল জল। বাঁধটা শিগগির তলিয়ে যাবে মনে হয় তার। দৌড়তে থাকে নিষাদবাগের দিকে।

মধ্যে-মধ্যে ভাঙন! তীব্র স্রোত ঢুকছে নদী থেকে। অনেক কষ্টে ওপারে ওঠে—আবার কিছুটা ভাঙা, আবার ভাঙন। নিষাদবাগের কাছাকাছি গিয়ে সে তার কুঁড়েঘরটা খুঁজতে চেষ্টা করে। এ কি চোখের ভুল? ওই তো শ্মশানবট, ওই ধনপতি মুখিয়ার বাড়ি! সবখানে জল। কিন্তু তার কুঁড়েঘরটা কই? এতোয়ারি গর্জন করে ডাকে —অঞ্চলা আ-আ! ঝড়-বৃষ্টি আর বন্যার শব্দের মধ্যে কোথায় তলিয়ে যায় সেই ভাঙাগলার চিৎকার।

বাঁধের ভাঁড়ুলের গাছের নিচেই ছিল তার ঘর আর ক্ষেতটুকু—গঙ্গার পাড় বরাবর। ভাঁড়ুলে গাছটা কাত হয়ে জলে পড়ে আছে। স্রোতে তাকে মূলসুদ্ধ টানছে। এতোয়ারির কুঁড়ে ঘর নেই। বিশাল ধসের দাগ বাঁধের কিনারায়। টের পাওয়ামাত্র এতোয়ারি জ্ঞানশূন্য হয়ে বিকট চেঁচিয়ে ঝাঁপ দেয়।

তারপর বুঝতে পারে মা'গঙ্গা তাকে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে। চিত হয়ে ভাসতে-ভাসতে চোখ খোলে সে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে তাকানো যায় না। তখন চোখ বোজে। হেই ঠাকুরবাবা। যেখানে নিয়ে যাবি, নিয়ে চল না, এতোয়ারির পরোয়া নেই।...

শেষরাতের দিকে ঝড়-বৃষ্টি থেমেছিল। নিষাদবাগের লোকেরা তখন উত্তরের স্লুইসগেট পেরিয়ে শহরের কাছাকাছি বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়েছে। ওদিকটা যথেষ্ট উঁচু। যে যে-অবস্থায় ছিল পালিয়ে বেঁচেছে। ল্যাংড়া রঘুয়ার পিসী অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছে। কদিন আগে শরৎ তাকে শহরে নিজের নতুন ডেরায় নিয়ে গিয়েছিল। নির্মলার গালমন্দে বুড়ির গেরাহ্যি কখনও ছিল না। কানে কালা। চাট্টি খেতে পেলেই ও খুশি। শুধু ল্যাংড়া গুনিনের বিপদ হল। তাকেও যেতে বলেছিল শরৎ। দেমাক দেখিয়ে যায় নি। ঝড়বৃষ্টি থামলে সকালে আকাশে মেঘের কুটোটি নেই, খাঁ খাঁ উজ্জ্বল নীল। কিন্তু বাঁধে ল্যাংড়া রঘুয়া নেই। ঠ্যাঙ ভাঙা একটা দাঁড়কাক অশত্থ গাছে ডাকছে দেখে অনেকেই ধরে নেয়, গুনিন এখন গতিক বুঝে দাঁড়কাক হয়ে গেছে। তার দুধের গরু আর বাছুরটা এসে অবশ্য আশ্রয় নিয়েছে। শরতের দেওয়া ছাগলটা বুড়ি তক্ষুনি নিয়ে যায়নি, পরে শরতের এসে নিয়ে যাবার কথা ছিল। ছাগলটাও বুদ্ধিমতীর মতো ঠিক সময়ে বাঁধে গিয়ে জুটেছিল। সকালে একমাইল অটুট উঁচু বাঁধের ওপর নানা বয়সী মানুষ আর হরেক জন্তু-জানোয়ারের ভিড় জমে গেছে। আর বুকফাটা কান্না, বিলাপ। ঠাকুরবাবার ভারিভুরির উদ্দেশে করুণ অনুযোগ। নয়ানসুখ বুক চাপড়ায় আর বলে—পাপ ঢুকেছিল গে! পাপ নিষাদবাগের ধরম হরণ করেছিল সে। আর ধনপতি গুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার বউ—সূরযের মা হিজলগাছের তলায় মড়াকান্না কাঁদছে। ধনপতির মা—যাকে কতবার চিতেয় পোড়ানোর আয়োজন হয়েছে, সে বহুকে গম্ভীরমুখে ঠাকুরবাবার লীলা সমঝাচ্ছে। পৌঢ়া বহুকে সমঝানো সহজ হয়।

আর সূর্য গেছে টৌনে। এমন বিপদের দিনে লিখাপড়হা ছেলে টৌনে কি রঙবাজি করতে গিয়েছিল? মোটেও না। সকাল হতে-হতে রিলিফের নৌকো সারসার বেরিয়ে পড়েছে শহরের ঘাট থেকে। কয়েকটা নিষাদবাগের দিকে চলেছে। সেই দলে সূর্য। চিনতে পেরে এরা চেঁচিয়ে ওঠে—হেই সূরযপতিয়া। সূর্য হাত নাড়ে। কিন্তু কোথায় নিষাদবাগ? অতল জল।

রাধারঘাটে ঘাটোয়াবী চৌবেজির সব নৌকো রিলিফে নেমেছে। ওদিকটা উঁচু। কলাবেড়িয়ার বাঁশবনের তলা দিয়ে জল বইছে আগের মতোই। এতটুকু জল ওঠেনি পাড়ের ওপর। চৌবেজির নৌকায় সেই খবর এল। শহরের বাবুরা ভি এসেছেন। নিষাদবাগওয়ালাদের জন্যে শহরে স্কুলবাড়ি খুলে দেওয়া হয়েছে। বিকেলে মানুষ আর গৃহপালিত পশুপাখির মিছিল স্তব্ধভাবে শহরের দিকে এগিয়ে যায়।

ভিড়ের মধ্যে সরস্বতী কুঁজো হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে চলে। হঠাৎ পাশের লোকটার হাত ছুঁয়ে চুপিচুপি বলে বেটা! আমার ছোটীর পাত্তা মিলেছে?

—নেহি রী মোসি।

শান্ত কণ্ঠস্বরে কখনও বলে—বেটা। আমার এতোয়ারিকে দেখছিনে কাঁহে গে?

—এতোয়ারি? সে তো কাল মণ্ডলার হাটে গিয়েছিল।..

জবাব শুনে সরস্বতী শুধু মাথাটা দোলায়। ছাগলটা টেনে আনতে ভোলেনি সে। দড়ি টানতেও হয় না। ছাগলটা তার পিছন-পিছন আস্তে-আস্তে হেঁটে যায়।

পরদিন দুপুরে স্কুলবাড়ির লঙ্গরখানায় বিরাট-বিরাট ডেকচিতে খিচুড়ি চেপেছে। ক্ষুধার্ত নিষাদবাগওয়ালা ছোঁক-ছোঁক করছে সেদিকে তাকিয়ে। মাথায় গামছা জড়িয়ে সূর্য ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। সরস্বতী বুড়ি ছাগলের দড়ি হাতে বারান্দার কোনায় বসে একে-ওকে মিনতি করছে, সামনের ওই গাছ থেকে একটা ডাল অন্তত ভেঙে দিক, ছাগলটা মারা পড়বে যে। সেই সময় হাটুয়াকে দেখা গেল। তার সঙ্গে ছোটী। ভিড় জমে গেল তাকে ঘিরে। হাটুয়া একশো মুখে জানায় ছোটীকে কোথায় পেল। বাজারে থামের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিল বেচারী। ভাগিস হাটুয়া একটা কাজে আজ শহরে এসেছিল। না-খাওয়া মুখ দেখে সে এতোয়ারির বোনকে পেটভরে ভাত খাইয়েছে হোটেলে। পান ভি খেতে চেয়েছে ছোটী। ঠোঁটে এখনও লাল রঙ। রাঙা ঠোঁটে মায়ের দিকে তাকিয়েই সে কেঁদে ওঠে। মা তার পিঠে শান্ত হাত রেখে বলে—দাদার খবর জানিস গে?

ছোটী জানে না। ফুঁপিয়ে কাঁদে—দাদা রে! ওরে আমার সোনার চাঁদি দাদা!...

বিকেলে ইস্কুলবাড়িতে এক অদ্ভুত দৃশ্য। কলাবেড়িয়া থেকে দুটো ছোট্ট নৌকো এসেছে। দু'বস্তা চাল, একবস্তা ডাল আর একগাদা আনাজপাতি বাঁধে বয়ে আনছে লোকেরা। তারপর বাঁধ থেকে নিচে ইস্কুল বাড়ির লঙ্গরখানায় এনে ধনপতির ছেলে সূর্য বলে—তোমাদেব গাঁওবালারা পাঠিয়েছে বুঝি? খুব খুশি হলাম দাদা! নিষাদবাগবালা একথা ভুলবে না। নতুন মোড়লকে বোলো। বোলো, নিষাদবাগের মুখিয়ার বেটা বলেছে একথা।

লোকটা বলে—নেহি জি। গাঁওবালারা এখনও চাঁদা তুলছে। এসে যাবে সাঁঝতক। এগুলো নিয়ে এসেছে—ওই যে, পুরান মোড়লের বেটি। ...তারপর একটু হেসে ফের বলে—নিষাদবাগের বহু। শ্বশুরগাঁয়ের বিপদে সে কি চুপ করে থাকবে জি? কলাবেড়িয়ার বেটির মনটা নিষাদবাগের বেটার মতো পাথরকা মাফিক নয় ভাই সূরযপতিয়া।

সূর্য তাকায়। হ্যাঁ, ওই তো এতোয়ারির সেই রূপসী বহু। নিষাদবাগেব মেয়েরা তাকে ঘিরে ভিড় জমিয়েছে। এতোয়ারির বোন তার কোমর জড়িয়ে ধরে পিঠে মুখ গুঁজেছে। সূর্য আবও অবাক হয়। ফুলকলিয়ার চোখে জল ছলছল করছে। তারপর ভিড় ঠেলে এতোয়ারির মা ঢোকে। যে-বহুর চুল ধবে পিট্টি দিয়েছিল, উঠতে-বসতে যার হাজার নিন্দামন্দ করেছে—এখন তাকে বুকে ধরে আকাশ ফাটিয়ে কেঁদে ওঠে—ও গো হামার সোনাচাঁদির বহু গে! হামার এতোয়ারি কাঁহা গেইলে, ঢূড়কে আন গে।

তারপর সরস্বতী আবার দম নিয়ে চেঁচায়—হারামি নয়ানসুখ! ওই হারামির বেটি রাক্ষুসী আমার জানের বেটার জান খেয়ে ফেলেছে বহু গে। নিজে ভি গেছে, বালবাচ্চা ভি সঙ্গে লিয়ে গেছে—ঔর হামার বেটাকো ভি খা লিছে বহু গে!

কোথায় ছিল নির্মলা, ভিড় ঠেলে ঢুকে বলে—চুপ তো বুড়ি। তোর বেটাকে কেউ খায়নি। আমার মরদ রিলিফের নৌকায় গিয়েছিল। এতোয়ারিকে তুলে এনে হাসপাতালে দিয়েছে। চৌরিগাছির ওদিকে বিলের মধ্যে ভাসতে-ভাসতে জলটুঙ্গিতে উঠেছিল এতোয়ারি। তিনদিন না খাওয়া। মড়ার মত কাহিল। গাছের ডালে-ডালে সাপ ঝুলছে। তার মধ্যে বেচারা ধুঁকছে। ভাগ্যিস চোখে পড়েছিল ওদের!...

ধবধবে সাদা নরম বিছানা। এমন বিছানায় শোয়া ভাগ্যের কথা বইকি। এতোয়ারি বারবার হাত বুলিয়েছে। বিশ্বাস হয়নি। ঠাকুরবাবা তাকে এখনও স্বপ্ন দেখাচ্ছে। তবে স্বপ্নের একটা অংশ এখনও ভারি খারাপ—যখন তাকে ওষুধ গেলানো হয়। জোর কবে ধরে সুঁইভি ফুটিয়ে দেয়। কাবোর পায়ের শব্দ পেলেই সে ভয়ে চোখ বোজে।

—এতোয়ারি! ও গে এতোয়ারি। উঠ, উঠ। দেখ কৌন আয়া।

নির্মলার কণ্ঠস্বর শুনে চোখ খোলে এতোয়ারি। আশ্বস্ত হয়ে একটু হাসে।— বহুদিদি।

—ইধার দেখ না, ভেড়ুয়া কাঁহেকো!

এতোয়াবি ঘুরতে গিয়ে চমকে ওঠে। ফ্যালফ্যাল করে তাকায় কয়েকমুহূর্ত। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নেয়। নির্মলা তার পাশে বসে ফের বলে—ভেড়ুয়া কাঁহেকো! এতদিন বাদে দেখছিস, মুখে কি সেলাই পড়েছে? বাত বলছিস না কেন গে?

পরম অভিমানে এতোয়ারি আস্তে বলে—কী বলব? বড়ঘরের বেটি। হামি এক নাদান। আর এখন তো হামি ভিখিরি বনে গেছি বহুদিদি গে! হামার ভুঁই নাই। ঘর বানাবার মাটিভি একটুকুন নাই!

নির্মলা ফুলকলিয়ার হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে এতোয়ারির পাশে বসিয়ে দেয়। তারপর বলে—এলি তো একেবারে আকাশ পাতাল করতে-করতে! এখন তোর মুখেও বোবা ধরল বহরি-কালী মেয়ে কোথাকার? বাত তো বলবি মরদকে।

অস্ফুটস্বরে ফুলকলিয়া অভিমানে বলে—কী বলব রী দিদি! পাথর! বরাবর পাথর যে, তাকে কী বলব?

এতোয়ারি বলে—বলেছিলাম, কলাবেড়িয়ার মোড়লের বেটি যদি এসে নিজ মুখে ছাড় চায়, একঠো রুপেয়া ভি নেব না—ছাড় দেব। তো আজ কলাবেড়িয়ার মোড়লের বেটি এসেছে। বেশ। মরদকা বাত, হাঁতিকা দাঁত। হামি ওকে...

ফুলকলিয়ার রেশমি চুড়ি পরা ডানহাতটা গিয়ে পড়ে গোঁফ দাড়িওলা জঙ্গুলে মুখে। সে অস্ফুট আর্তস্বরে বলে—না! না! হামি ছাড় লিতে আসিনি জি!

—তবে কেন এসেছে মোড়লের বেটি? হাতটা সরিয়ে দিয়ে এতোয়ারি একটু হাসে। হামার দশা দেখতে? হামি নকছেদীর বেটা এতোয়ারি। হামি আবার বিভা করব। আবার মহাজনের কাছে রুপেয়া ধার করব। মাগঙ্গার পাড়ে ডেরা বাঁধব। হাঁ—হামি নাকছেদীর বেটা।

নির্মলা চোখ পাকিয়ে বলে—তুই বীরের বেটা মহাবীর! বুদ্ধু কোথাকার! চোখ আছে তোর? গিদ্ধড় বুড়বাক বেকুফ। বহুটা কাঁদছে, আর বড়বড় বাত ফোটাচ্ছে মুখে!

এতোয়ারি অবাক হয়। সঙ্গে-সঙ্গে উঠে বসে। ফুলকলিয়ার দু'কাঁধে হাত রেখে বলে—কাঁদছিস বহু? কাঁহে গে? হামাকে তোর এত্তা পসন্দ? তো কভি এমন কথা বলিসনি, কাহে বলিসনি বহু? হামি নয়ানসুখের বেটিকে ভাসিয়ে দিলাম। যদি ও কথা জানতাম, বেচারীকে বিভা করতাম না। আর বিভা না করলে সে হামার সঙ্গে গঙ্গার পাড়ে ঘরভি করতে যেত না। না গেলে বেচারী জানে বেঁচে যেত। ওর বাচ্চাটাও বেঁচে যেত। আমি কী করি, তুই-ই বল বহু।

হাসতে-হাসতে নির্মলা বলে—তো একটা বাচ্চা হলেই সে পাপ চলে যাবে ভাই এতোয়ারি। তোরা তো বাঁজাবাঁজিন নোস।

এতোয়ারি চুপ করে আছে দেখে সে ফের বলে—হামার বাতঠো সমঝালি?

এতোয়ারি তাকায়।

নির্মলা ওর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে—জষ্টিমাসে যখন তোর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি যায়, তখনই ওর পেটে তোর বাচ্চা ছিল, জানিস? মোড়ল মরার পর একদিন গিয়ে দেখি, উঠোনের কোনায় বসে ওয়াক তুলছে। তারপর আর কোন মুখে ছাড়ের কথা ভাবে, বল্ না তুই?

এতোয়ারি শুধু ঘন-ঘন মাথা দোলায়। নিষাদবাগে তার ঘরের সেই পুরনো সুন্দর মেয়েলি গন্ধটা আবার সে ফিরে পেয়েছে। তন্ময় হয়ে শোঁকে সে। খালি মনে হয়, তার খুব কাছেই আরেক শান্ত নির্জন গঙ্গা বয়ে চলেছে।

রেশমির আত্মচরিত



দলিজঘরে জাপানি ঘড়িতে দশটা বাজল। তারপর ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি এল। ঘড়িটা ও-মাসে বাবা কলকাতা থেকে কিনে এনেছেন। ঘণ্টা বাজার আগে চারবার পিয়ানোর টুং টাং সুর শোনা যায়। তবে ঘণ্টার শব্দটাকে ধ্বনি বলা উচিত। কী মিষ্টি আর চাপা ধ্বনি! ঘুম ঘুম ধ্বনি। তার সঙ্গে এই রাতের ঝিরঝিরে বৃষ্টিও অনেক ধ্বনিতে অর্কেস্ট্রা হয়ে ওঠে। এতোল-বেতোল ভাবনার জাল ছিঁড়ে অতল ঘুমের দিকে নিয়ে যায়। ঘড়িটার কিন্তু দায়িত্ববান মানুষের স্বভাব। রাত দশটার পর আর বেজে ঘুম ভাঙিয়ে দেবে না। চুপচাপ সময়ের সঙ্গে হাঁটবে। তারপর ঠিক ভোর ছটায় চারবার পিয়ানোর সুর এবং ছ'বার তেমনি চাপা ঘণ্টার ধ্বনি। তখনও ওই ঘুম-ঘুম ভাবটা থেকে যায়। আমার ঘুম ঠিকই ভাঙে। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করে না। কী কী স্বপ্ন দেখেছি স্মরণ করি। প্রায়ই এটা কষ্টকর স্বপ্ন। পরীক্ষা দিতে বসেছি কিন্তু লিখতে পারছি না। কাঁদতে ইচ্ছে করছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে টের পাই, কান্নার আবেগটা থেকে গেছে। তারপর মনে পড়ে যায়, আর তো আমাকে ক্লাসের পরীক্ষা দিতে হবে না! বড় করে শ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরে শুই।

ঘুমের মুহূর্তেও হঠাৎ কোনও দৃশ্য একটা ঘটনা এনে ফেলে। ঘুমের রেশটুকু ছিঁড়ে যায়। আমাদের বাড়ির পুবদিকটায় বাগান। তারপর একটা ঘাস আর আগাছায় ঢাকা জমি। তার নিচে ঝিল। এখন ঝিলে কত সাদা আর লাল শালুক ফুল ফুটেছে। মায়ের হিসেবে যতদিন 'ছোট' ছিলাম, তত দিন ওই ঝিলের ধারে হিজল গাছটার তলায় দাঁড়ানো মানা ছিল না। এখন বাগানের দিকে পা বাড়ালেই মা বকাবকি করবেন। মায়ের এই অদ্ভুত আচরণের মানে খুঁজে পাই না। মা তত পর্দানসীন নন। আমি তো নই-ই। বাসে চেপে স্কুল আর কলেজে যাতায়াত করেছি। এখনও মহকুমাশহরে একা-একা কোনও বন্ধুর বাড়ি ঘুরে আসি। পাড়াতেও এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘোরাঘুরি করি। এসবে মায়ের এতটুকু আপত্তি নেই। কিন্তু বাগান আর ঝিলের দিকে একা যাওয়া মানা। 'কেন? ভূতে ধরবে?' আমার কথা শুনে মা গম্ভীর হয়ে বলেন, 'মেয়েদের সুনসান নিরিবিলি জায়গায় এক যেতে নেই।' পরে মনে হয়েছে, মা হয়তো 'নেচার'-এর কথাই বলছেন। অধ্যাপিকা জয়ন্তীদি এক দিন কথায়-কথায় বলেছিলেন, 'তুমি তো গ্রামে থাক, রেশমি! খুব সবুজ সুন্দর পরিবেশ না? বেশ নির্জনতা। কোনও শব্দ নেই। তুমি নেচারের মধ্যে থাক, জানো তো? আমাকে একবার নিয়ে যাবে তোমাদের বাড়ি?' জয়ন্তীদির কোনও দিনই আসা হয়ে ওঠেনি। কথাটা তুললে বলতেন, 'রেশমি! আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। নেচারের মধ্যে গেলে কী একটা স্ট্রেইঞ্জ ফিলিংস হয়! হুঁ, থরো ঠিক এই লাইনটা লিখেছেন : আই গো টু নেচার অ্যান্ড কাম ব্যাক উইদ আ স্ট্রেইঞ্জ ফিলিং। ফিলিং অব লোনলিনেস। তাই না? তোমার কি এই ফিলিং হয় না রেশমি?' জয়ন্তীদির একটু ছিটগ্রস্ত স্বভাব ছিল। আমরা আড়ালে হাসাহাসি করতাম, ব্যর্থ প্রেম-ট্রেম নিশ্চয়। আহ! জীবনের ওই একটা সুসময় গেছে।

তো ঠিক এই ব্যাপারটাই হঠাৎ ঘুমের রেশ ছিঁড়ে নাড়া দেয়। ফ্রকপরা বয়সে ঝিলের ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে একসময় চমকে উঠে চারদিকে তাকাতাম। কী এক অদ্ভুত ভয়ে গা ছমছম করত। কেউ যেন আড়াল থেকে আমাকে দেখছে। আর চারদিকে পোকামাকড়ের ডাক, পাখির ডাক, বাতাসের আর জলের শব্দ মিলে-মিশে কী এক ভাষায় কথা বলাবলি হচ্ছে। এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে বাড়ি চলে আসতাম। যখন শাড়ি পরা ধরলাম, তখন থেকেই ওদিকে যেতে মানা। তার ওপর আমাদের বাড়ির কাজের মেয়ে কালুর মা-বুড়ির মারাত্মক সব ভূতপেত্নীর গল্প (কালুর মায়ের নামটা কিছুতেই মনে থাকে না)! কালু আমাদের মাহিন্দার। তার প্রথম বউটা যে-নিমগাছের ডালে ঝুলে

আত্মহত্যা করেছিল, সেটা এই ঘরের দক্ষিণ দিকে এখনও দাঁড়িয়ে আছে আরও অনেক গাছের ভেতর। রাতে ওদিকের জানালা বন্ধ রাখি। মা পুবের জানালাও বন্ধ রাখতে বলেন, যেদিকে জয়ন্তীদির 'নেচার'। কিন্তু আমার দম আটকে আসে। পুবের জানালাটা খুলে রাখি। এ সময় মশার প্রচণ্ড উপদ্রব। সিলিং ফ্যানের হাওয়া ওদের তাড়াতে পারে না। মশারির ভেতর শুয়ে থাকি পশ্চিমে মাথা দিয়ে। পশ্চিম দিকে পবিত্র কাবা মসজিদ। তাই সে-দিকে পা করে শুতে নেই। কে জানে বাবা! আসলে আমি যতক্ষণ জেগে থাকি, পুবের জানালাটা আমার চোখে-চোখে থাকে। আর, আমার বাবা কাজি মোতাহার হোসেন নামকরা উকিল। তাঁর বাড়ির আনাচে-কানাচে কেউ উঁকি দেবে সাধ্যি কী? এখানেই একটা বড় সাহস আমার। বাবা আমার সাহস। সাহস আর শক্তি। এলাকায় বাবার কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। অথচ এমন একজন বাবা আমাকে এম-এ পড়ার জন্য কলকাতায় পাঠাতে পারেননি শুধু আমার মায়ের জেদে। মা কিছুতেই একা কলকাতায় আমাকে থাকতে দেবেন না। মায়ের একটা দিক আমি বুঝতে পারি। আমিই একমাত্র সন্তান। আমাকে চোখের আড়ালে বেশিক্ষণ রাখা মায়ের পক্ষে কষ্টকর। আমি জানি, মা একজন ঘরজামাই চান। তাই আমার এখনও বিয়ে হচ্ছে না। এই আশ্বিনে দোসরা আমি একুশটা আশ্বিন পেরিয়েছি। এ-কু-শটা! ভাবতে কেমন অবাক লাগে। গা শির শির করে। এই গ্রামে আমার বয়সী আর একটাও আইবুড়ো মেয়ে নেই। কালুর মা-বুড়ি আমার মাকে সাহস দিয়ে গজরায়, 'চোখ টাটাক মুখপোড়া-মুখপুড়িদের। উকিলসায়েবের বাগান আলো করে ফুল ফুটে আছে। থাউক। একদিন-না-একদিন কোন গুখেকোর ব্যাটা জজ-বেলেস্টার গাছতলায় এসে উপুড় হয়ে মাথা ঠুকবে। আহা, বড় সোগন্ধ তোমার ফুলটি মা! বড় দর্শনধারী। হ্যাঁ গো, আগে দর্শনধারী, তা'পরে গুণবিচারি কি না বল তুমি?' আমি এত জোরে হেসে উঠি যে মা চমকে ওঠেন। আমার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে বলেন,'এ কী হাসি বাবা! ছিঃ! হাসে না। রেকর্ড প্লেয়ার বাজিয়ে গান শোনো গে।' মা আমাকে কখনও-কখনও 'বাবা' বলেন। মেয়েরা কি পুত্রলোভী? এবং পুরুষরাও? বাবাকে বলতে শুনেছি, 'রেশমি আমার ছেলেকে ছেলে, মেয়েকে মেয়ে। আমি বেঁচে না থাকলে রেশমিই কালুকে নিয়ে মাঠে গিয়ে মুনিশদের ওপর তম্বি করবে। কী রেশমি? পারি না?' বাবা অট্টহাসি হাসেন। আমার অদ্ভুতভাবে মনে হয়, ওই হাসির মধ্যে একটা গভীর কষ্ট আছে। এক রাতে কানে এল, বাবা মাকে বলছেন, 'প্রব্লেম কী জানো? বি এ অনার্স মেয়ে। অন্তত এম এ পাত্র চাই। মেয়ে সুন্দরী। তার যোগ্য হওয়া চাই। তো যতগুলো হারামজাদা এম এ দেখলাম, কেউ ঘরজামাই থাকতে রাজি নয়। আজকাল সব প্রেস্টিজওয়ালা হয়েছে। কী গরিব কী বড়লোক। দেখি!' দেখি কথাটির সঙ্গে বাবার শ্বাসের শব্দ শুনেছিলাম এবং উষ্ণতাও অনুভব করেছিলাম।

বৃষ্টিটা বেড়ে গেল এতক্ষণে। ঘুমের মুখে এত সব কথা, তাদের চারপাশে অনুচ্চারিত আরও কত কথা আমার চেতনাকে জ্বরোজ্বরো করে ফেলল। বাইরে বৃষ্টির জোরালো শব্দ। পুবের জানালা দিয়ে মশারির বাইরে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখতে পেলাম। তারপর মেঘ ডাকল। পাশ ফিরে শুলাম। আমার ঠিক সে রাতের মতই কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কাঁদব না, কিছুতেই কাঁদব না, কেন কাঁদব ভাবতে ভাবতে ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। আবার প্রচণ্ড জোরে মেঘ ডেকে উঠল। তারপরই দলিজঘরের ওধারে কেউ চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'মোতাহাব! মোতাহার! মতু!' সেইসঙ্গে কড়া নাড়ার শব্দ।

মুখ তুলে পশ্চিমের জানালার দিকে তাকালাম। বারান্দার আলোটা জ্বলে উঠল। বাবাকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম দলিজঘরের দিকে। কোনও খারাপ খবর এনেছে কেউ? কান করে আছি। তারপর বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে দলিজঘরে বাবার হাসির শব্দ শুনতে পেলাম।

বাঁচা গেল, বাবা! মামুজির অসুখের কথা শুনেছি। তাঁর মৃত্যুর খবর এলে এই বৃষ্টিরাতে আমাকেও বিচ্ছিরি কান্নাকাটি করতে হত। চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজে ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম। দেখেছি, প্রথমে কিছুক্ষণ চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজে থাকলে ঘুমের টান এসে যায়। তখন পাশ ফিরে শুই।

চোখ বুজে ঝিলের জলের শালুকফুলগুলো দেখতে দেখতে ঠিক করলাম, সকালে কোনও মানা মানব না। ঝিলের ধারে হিজলতলায় দাঁড়িয়ে শালুকফুল দেখব। একটা জিয়ালার ডালে ছোটবেলায় যে মাছরাঙাটা দেখতাম সে কি আজও বেঁচে আছে? পাখিরা কত দিন বাঁচে? কিন্তু ঝিল যখন আছে,

মাছরাঙা থাকবেই। তারই কোনও ছেলে কি মেয়ে কি নাতি-নাতনি। আচ্ছা, জয়ন্তীদির বদলে কোনও পুরুষমানুষ অধ্যাপক যদি আমাদের বাড়িতে আসতেন (গার্লস কলেজে একসময় তাঁরাও ছিলেন), তাঁকে কি ঝিলটা দেখাতে নিয়ে যেতাম? গেলে মা রাগ করতেন? একা তো যাচ্ছি না রে বাবা!

নিরিবিলি সুনসান 'নেচারে' রেশমি নামে একুশ বছর বয়সী একটি মেয়ের পাশে একজন পুরুষমানুষ। আমার চেতনায় একটা স্বপ্নদৃশ্য ভেসে এলে। ঠিক যেমনটি হিন্দি ফিল্মে দেখেছি। তবে না বাপু! আমি অমন ন্যাকা-ন্যাকা গান গাইতে পারব না। ঘাসজমিতে গড়াগড়ি খেতেও পারব না। আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে 'নেচার' দেখব। কোনও স্ট্রেইঞ্জ ফিলিংস যদি...

কালুর মায়ের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে দেখি, পুবের জানালায় ঝলমলে রোদ। এ রাতে তাহলে অনেক বেশি ঘুমিয়েছি। কী কী স্বপ্ন দেখেছি, হুঁ, একটা সবুজ রঙের ট্রেন আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে বাগানের ওদিকের মাঠে চলে যাচ্ছে, আর একটা...কী যেন, হুঁ, এটা ভারি অদ্ভুত স্বপ্ন তো! ঝিলের ধারে হিজলের একটা ডাল কেন যেন কাত হয়ে নেমেছে, আর কে একজন সেই ডালে শুয়ে আছে, বুকের কাছে একটা বন্দুক। তারপর মনে হল, মানুষ নয়। শিকারিও না। মমির মত কিছু।... বোঝাতে পারব না কাকেও। কিন্তু মনে পড়ছে, আমি তাকে ডাকছিলাম, 'শুনুন, শুনুন! এই যে! শুনছেন?' আমার রাগ হচ্ছিল। দুঃখ হচ্ছিল। কেন কেউ অমন করে বন্দুক বুকে নিয়ে শুয়ে থাকবে হিজলগাছের ডালে?

কালুর মায়ের সাড়া এল। 'এ কী ঘুম বাবা মেয়ে মানুষের! দুনিয়া ডুবলে এক হেঁটো পানি! অ রেশমি! ওঠ, ওঠ!'

রাগ করে বললাম, 'কী হয়েছে কী?'

বুড়ি হাসল। 'শোনো কথা! বেরিয়ে দেখ, কত বেলা হয়েছে। এদিকে ঘরে মেহমান।'

মশারি থেকে বেরিয়ে কাপড় গুছিয়ে পরে এবং ভাঙা খোঁপা যেমন-তেমন করে বেঁধে প্রথমে পুবের জানালায় উঁকি দিলাম। ঝকঝকে নীল আকাশ। নরম গোলাপি রোদে বাগানের ভিজে ঘাসের ওপর হলুদ প্রজাপতি উড়ছে। কাঞ্চনফুলের গাছটার গোড়া সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। সেখানে দুটো দোয়েল লাফালাফি করছে। হুঁ, আজ আমি ঝিলের ধারে যাবই কারও মানা মানব না।

দরজা খুলে বেরুলে মা বললেন, 'জ্বরজ্বালা নয় তো বাবা? দেখিস! আজকাল সিজন চেঞ্জের সময়।'

আমার মা টেনেটুনে ক্লাস সিক্স। ব্রিটিশ আমলের খানবাহাদুরের মেয়ে। সেই দেমাকটুকু ভীষণ আছে। ক্লাস সিক্সে আমি মায়ের মত ইংরেজি শব্দ বলতে পারতাম কি না মনে পড়ে না। তবে আমার ধারণা, বাবার সঙ্গগুণে মা প্রচুর ইংরেজি শিখেছেন। বেশি কি, আজকাল আমাদের গ্রামের চাষীমজুরের বউদের মুখেও ইংরেজি শুনতে পাই নির্ভুল উচ্চারণে। কালুর বউ সেদিন বলছিল, 'হাঁসগুলান আমার প্রেস্টিজ পাংচার করে দিলে গো! যতবার ঝিলের পানিতে ফেলি, ততবার কখন চলে যায় ধানের ভুঁয়ে।'...

হাই তুলে বারান্দা থেকে জলভরা একটা বদনা নিলাম। উঠোনের কোনায় বাথরুম-ল্যাট্রিনের দিকে যেতে যেতে বললাম, 'কে মেহমান এসেছে, মা?'

মা হঠাৎ মুখে রহস্য ফুটিয়ে চাপাস্বরে বললেন, 'তোর আব্বার বন্ধু। সেই চিনুবাবু।'

ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। ভুরু কুঁচকে বললাম, 'কে চিনুবাবু?'

মা একটু হাসলেন। মুখে ভর্ৎসনার ভাবও ছিল। বললেন, 'কেন? তোর আব্বার মুখে কত গল্প শুনিসনি? ওই যে কী বলে ছাই...' মা স্মরণ করার চেষ্টা করলেন। 'ওই যে গো, যারা স্কুল কলেজ পড়াত। তোদের কলেজেও তো...'

শ্বাসপ্রশ্বাস বেরিয়ে গেল কথাটা বলতে, 'চিনু সামন্ত?' আমার মনে একটা দমকা উত্তেজনা এসে গিয়েছিল। বাথরুমে ঢুকে সামলে নিলাম। এক বছর আগেও চিন্ময় সামন্ত কিংবদন্তীর নায়ক ছিলেন। লোকের মুখে-মুখে শুনেছি আর খবরের কাগজেও তাঁর নাম কতবার দেখেছি, যখন কলেজে পড়তাম।

এক দিন গার্লস কলেজের গেটের সামনে বোমা ফাটিয়ে একদল ছেলে স্লোগান দিচ্ছিল তাঁর নামে। জানতাম, বাবা একসময় তাঁর ক্লাসফ্রেন্ড ছিলেন। অনেক গল্প শুনতাম বাবার মুখে। অদ্ভুত-অদ্ভুত সাংঘাতিক সব গল্প। গল্পের শেষে বাবা মাথা নেড়ে বলতেন, 'বোকা! ফুলিশ! এ সব করে কি কিছু হয়? একটা হিমালয় মাউন্টেন? তাকে ওপড়াবে বোমপটকা মেরে' তা, যারা যা করছে করুক গে! চিনুটা কেন গেল ওসব করতে? ওসব বড়লোকের ছেলেরা করবে। শুনছি, তারাই নেমেছে—নাকি হীরের টুকরো সব জিনিয়াস ছেলে! তুই চিনু, তোর বাবা হোমিওপ্যাথির ডাক্তার ছিলেন...ধুস! কোনও মানে হয়?'

বিপ্লবী চিনু সামন্ত আমাদের বাড়িতে মেহমান! অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। ঝটপট বাথরুমে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এলাম। রান্নাঘরের বারান্দায় মা বসেছিলেন। ডাকলেন, 'আয় বাবা। চা জুড়িয়ে গেল। তুই তো আবার ফুটোনো চায়ে মুখ দিবিনে!'

'এক মিনিট, মা!' বলে ঘরে গেলাম। রাতের শাড়িটা বদলে একটা সুন্দর শাড়ি পরছিলাম। টের পাচ্ছিলাম, আমার হাত কাঁপছে। বুকের ভেতর কী শব্দ। কেন? অবাক চোখে আয়নায় নিজেকে দেখতে থাকলাম। আমি কি আমার নিয়তির মুখোমুখি দাঁড়াতে তৈরি হচ্ছি? .. তারপর শান্ত হয়ে গেলাম। হেসে ফেললাম। একটা গল্প মনে পড়ে গিয়েছিল। বাবার কাছে বারবার সেই মজার গল্পটা শুনতে চাইতাম। আমি বলতাম, নেই-পায়ের গল্প।' একবার পুলিশ নাকি চিনু সামন্তকে তাড়া করেছে। উনি পাটখেতের ভেতর ঢুকেছেন। তারপর বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন, একদল মুনিশ জমিতে ধান পুঁতছে। নিয়ম হল, একেকজন মুনিশ সার বেঁধে পাঁচটা-ছটা ধানের গুছি পুঁততে পুঁততে পিছু হটবে। প্রত্যেকের একটা করে সারি। তাকেই স্থানীয় ভাষায় বলে 'পাই'। পাইয়ের কেউ এগিয়ে কেউ একটু সামান্য পেছিয়ে যায়। তো চিনু সামন্ত জামাকাপড় আলে গুটিয়ে রেখে একজন মুনিশের মাথা থেকে এক ঝটকায় গামছা টেনে নিলেন। ওরা অবাক। আন্ডারওয়্যারের ওপর গামছা জড়িয়ে চিনুবাবু ধমক দিলেন, 'হাঁ করে থেকো না। গুছি পোঁতো।' বলে উনিও গুছি পুঁততে শুরু করলেন। গায়ে কাদা, মুখে কাদা। পুলিশরা পাটক্ষেতের এধারে এসে মুনিশদের জিগ্যেস করল, কাকেও পালাতে দেখেছে কি না। চিনুবাবুই অবিকল স্থানীয় চাষাড়ে ভাবভঙ্গিতে গুছি তুলে পাটক্ষেতের অন্যদিকটা দেখিয়ে বললেন,. .

ঠিক এইখানে বাবা অনবদ্য সংলাপটি আওড়াতেন। 'হুই দিক্‌হে ডারোগাবাবু। হুঁই দিক্‌হে টোল্‌হে টোল্‌হে ফ্যালো বাবু গো..দ্যাখ্‌হেন! দ্যাখ্‌হেন। পাটগাছগুলান লহড়্‌ছেঁ-এঁ-এঁ!'

হাসতে হাসতে বাবা বলতেন, উপসংহারটুকু। কিন্তু সেটাই আসলে ক্লাইম্যাক্স। পুলিশরা সেদিকে চলে যাওয়ার পর একজন মুনিশ একগাল হেসে বলল, ও বাবু! আপনার যে পাই নেই! পুলিশরা যদি দেখত, ধরে ফেলত। তবে পুলিশরা পাই বোঝে না হয় তো।

চিনুবাবু তখন একটু হেসে বলেছিলেন, হ্যাঁ ভাই! সত্যি আমার কোনও 'পাই' নেই।

বাবা গল্প শেষ করে বলতেন, 'এটাই চিনুর প্রব্লেম। ওর কোনও পাই, আই মিন, সারি নেই। ভুল জায়গায় ধানের গুছি পুঁতছে।'....

রান্নাঘরের বারান্দায় গেলে মা আমাকে দেখে নিয়ে আস্তে বললেন, 'ইদে কেনা সেই নীল শাড়িখানা পরলেই পারতিস।'

অমনি চটে গিয়ে বললাম, 'কেন? কেউ কনে দেখতে এসেছে নাকি?'

মা হকচকিয়ে বললেন, 'আজ তোর হল কী বাবা? সক্কালবেলায়...'

হেসে ফেললাম। 'বাবা-বাবা ছাড় তো! শুনতে খারাপ লাগে।'

মা হাসবার চেষ্টা করে কাপে চা ঢাললেন। কাপ-প্লেট আমার দিকে বাড়িয়ে চাপা স্বরে বললেন, 'চিনুবাবু এসেছে শুনে আমি তো ভয়ে সারা। তোর আব্বা বললেন, চিনু জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ওর আর কোনও ঝামেলা নেই। কিন্তু বেচারাকে রোজ দশ মাইল ছুটোছুটি করে থানায় হাজরে দিতে হয়। পায়ে গুলি লেগে খোঁড়া। ছড়িতে ভর করে কষ্টে হাঁটে। তাই আমার কাছে এসেছে। যদি হাজরে দেওয়া থেকে ওকে বাঁচাতে পারি।'

মায়ের কথা কান করে শুনছিলাম। একটু খারাপ লাগল। বিপ্লবী মানুষের এই পরিণতি! এ তো একটা অধঃপতন। কিংবদন্তির নায়ক তাঁর এক সময়ের বন্ধু এক আইনবাজ মানুষের কাছে সাহায্য

চাইতে এসেছেন! আস্তে শ্বাসপ্রশ্বাসে মিশিয়ে বললাম, 'হাজরে দেন কেন? দূরে কোথাও চলে গেলেই পারেন। আগের মত লুকিয়ে থাকলে অসুবিধে কী?'

মা জিভ কেটে মাথা নেড়ে শুধু বললেন, 'আহা, খোঁড়া মানুষ!'...

হিরোওয়রশিপ? হয়ত তাই! কিংবদন্তির নায়ককে মুখোমুখি দেখতে ইচ্ছে করছিল। জানতে ইচ্ছে করছিল, কেন উনি খুনখারাপি আগুন জ্বালানোতে মেতে উঠেছিলেন? বিপ্লব কি ওইরকম? কেন মানুষ বিপ্লবী হয়? আমার কাগজ পড়া অভ্যাস নেই। রাজনীতি ব্যাপারটাও তত বুঝি না। টেক্সট বইয়ের বাইরে খুব কম বই আমি পড়েছি। আসলে বই-টই পড়তে আমার ইচ্ছে করে না। শুধু ভাবি এতোল-বেতোল সব ভাবনা। কখনও রেকর্ড প্লেয়ারে কয়েকখানা গান শুনি। আনমনে এক কলি কোনও গান চুপিচুপি গুনগুন করে গাই। যতক্ষণ গান বাজে, পুবের জানালার কাছে বসে সেই গান শুনতে শুনতে কী সব অস্পষ্ট ছবি মনে ভাসে; কোনও দৃশ্য বা ঘটনা ছোটবেলার। অথবা যা আদপে ঘটেনি, আবছা ঘটতে দেখছি। এইসব আমার সময় কাটানো খেলা।

একটা অদ্ভুত নিয়ম, দলিজঘরে কোন অতিথি এলে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে না। আমি নিজে থেকেই যাই, তাতে মায়ের চাপা আর্তনাদ শুনে মনে হবে, সাংঘাতিক একটা সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। অথচ বাইরে রাস্তায়, কি বাসস্টপের ছোট্ট বাজারে যার সঙ্গে খুশি, আমি কথা বলতে পারি। মজার কথা, নিয়মটা আমি মেনেই চলি। যত কৌতূহল থাক, দলিজঘরে গিয়ে অতিথিকে দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। নিয়মটা মানতে মানতে কালক্রমে নিয়মে আটকে গেছি।

এ দিন রবিবার ছিল। তাই বাবা সারা দিন বাড়িতে। অন্য দিন ভোর ছটায় বাসে শহরে গিয়ে তাঁর চেম্বারে ঢোকেন। বাড়ি ফেরেন রাত নটার বাসে। বাবা আজ দলিজঘরে বন্ধুর সঙ্গেই সময় কাটাচ্ছিলেন। একটু বেলা হলে মায়ের কাছে জানলাম, চিনুবাবু দু-তিনটে দিন আমাদের মেহমান থাকছেন। চাপা উত্তেজনা জাগল আমার ভেতর। তা হলে বিপ্লবী মানুষটিকে আমি দেখার সুযোগ পাব। হয়ত কথা বলারও।

তাঁকে দেখতে পেলাম দুপুরবেলায়। বাবা তাঁকে স্নানের জন্য উঠোনের বাথরুমে নিয়ে আসছিলেন। মা ঘোমটাটা অনেকখানি টেনে দিলেন। আমি নিয়মাধীন, আমার ঘরে ঢুকে গেলাম। জানালা দিয়ে দেখলাম বাবার বন্ধুকে। খালি পা, পরনে বাবার একটা লুঙ্গি। আর কাঁধে যে তোয়ালে, সেটাও চিনতে পারলাম। আমার গা ছমছম করছিল ওঁকে দেখে। তামাটে রঙের মানুষ। মাঝারি গড়ন। কিন্তু সমস্ত শরীরে পেশী ও শিরা ফুলে আছে। হাত দুটো অসাধারণ লম্বা মনে হল। মাথায় একরাশ এলোমেলো কালো চুল। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গোঁফ। একটা পুরনো রঙচটা মোটা ছড়ি হাতে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। বারান্দা থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠোনে নেমে বললেন, 'মন্তু! তোমার বউ দেখছি পর্দানসিনা মহিলা। তুমি এসব মানো-টানো?'

বাবা হাসলেন। 'নেভার! ওই তো ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তোমাকে দেখছে!'

চিনুবাবু মায়ের দিকে ঘুরে বললেন, 'সেলাম বেগমসায়েবা! বান্দাকে একবার মুখখানা দেখানো হোক।'

মায়ের অবস্থা দেখে হাসি পাচ্ছিল। বাবা বললেন, 'তুমি কিন্তু আগের মত লাল সেলাম বললে না চিনু!'

চিনুবাবু হাসলেন। মনে হল শিশুর হাসি। 'হুঁ, বজ্রমুষ্টিতে লাল সেলাম! তবে বাহু বড্ড দুর্বল হে মন্তু! থার্ড ডিগ্রিতে চড়িয়েছিল ওরা। আমার অস্তিত্বকেই নড়বড়ে করে দিয়েছে। যাই হোক, বেগমসায়েবাকে ভাবিজি বলতে চাই। কারণ মন্তু, তুমি সম্ভবত আমার চেয়ে দু'তিন বছরের বড়। আমার তো ফর্টিসেভেন। তোমার?'

বাবা বললেন, 'ফর্টিনাইন। কাজেই তুমি ভাবি বলে ডাকতে পারো।'

'ভাবিজি কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলছেন না।'

বাবা অট্টহাসি হেসে বললেন, 'তুমি যে খুনি মানুষ। তাই ভয় পাচ্ছে।'

চিনুবাবু উঠোনে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'ভাবিজিকে খুন করে কোন মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না।

তবে ভাবিজি। আপনাব স্বামীর কথা বিশ্বাস করবেন না। আমি বিষদাঁত-ভাঙা নির্জীব সাপ। গর্ত খুঁজে বেড়াচ্ছি।' তারপর বাবার দিকে ঘুরলেন। 'তোমার মেয়ে কোথায়? ডাকো। তাকে দেখি। অনার্স গ্রাজুয়েট বলছিলে। আশা করি, সে পর্দানসিনা নয়। কী নাম যেন তোমার মেয়ের?'

'রেশমি।'

'বাঃ! ভারি সুন্দর! ডাকনাম?'

'না ওর মামা পুলিশের এস ডি পি ও ছিলেন। এখন রিটায়ার্ড। উনিই রেশমি বেগম নাম দিয়েছিলেন।'

চিনুবাবু হাসলেন। ক্লান্ত মানুষের হাসি। 'পুলিশও এত সুন্দর নামের কথা ভাবতে পারে, যখন তখন বুঝতে হবে তোমার মেয়ে অবিশ্বাস্য সুন্দর। রেশমি! কোথায় তুমি?'

আমার লজ্জা করছিল। 'অবিশ্বাস্য সুন্দর' কথাটি আমাকে নাড়া দিয়েছিল। আমি বেরুচ্ছি না দেখে বাবা বললেন, 'রেশমি! আয়। তোর বিপ্লবী কাকুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। চিনু! রেশমি তোমার গল্প শুনতে কী ভালবাসত, জানো না। কোথাও কিছু শুনে এলেই বলত, জানেন আব্বু? এক সাংঘাতিক কাণ্ড...'

চিনুবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ডাকলেন, 'রেশমি! এস, তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, সত্যি তুমি রেশমি কি না।'

আমি আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম। বাবা কয়েকবার ডাকাডাকি করে বললেন, 'বেলা বেড়েছে। তুমি স্নান করে নাও। আছো যখন, দেখা হবে। কাল থেকে আমি তো তোমাকে সঙ্গ দিতে পারব না। রেশমি তোমাকে সঙ্গ দেবে। ও তোমার দারুণ ভক্ত। বিলিভ মি!'

চিনুবাবু আবার সেই শিশুর হাসি হাসতে হাসতে বাথরুমে ঢুকলেন।

বাড়িতে মাঝে মাঝে বাবার হিন্দু বন্ধুবান্ধব বা নেতাগোছের মানুষ কখনও-কখনও আসেন। তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা দলিজঘরেই হয়। একবার কলকাতা থেকে বাবার এক হিন্দু অধ্যাপক বন্ধু এসেছিলেন। বাবা তাঁকে নিয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় খেতে বসেছিলেন। তখন আমি বালিকা। এদিন চিনুবাবুকে সেখানেই খাওয়ানো হল। ডাইনিং চেয়ার-টেবিলটা এত দিনে যেন চমৎকার কাজে লাগল। অনেক সৌন্দর্য অনেক মূল্যে ঝলমলে হয়ে উঠল। কিন্তু আমি সামনে গেলাম না। মা ঘোমটা টেনে মৃদুস্বরে চিনুবাবুর কৌতুকমাখানো কথাবার্তার কুণ্ঠিত জবাব দিচ্ছিলেন। একবার মাকে বলতে শুনলাম, 'এত কম খেয়ে মানুষ বাঁচে?'

চিনুবাবু বললেন, 'আপনি হিন্দু মহিলা হলে বলতাম সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। মতু, তোমাদের শাস্ত্রে অন্নপূর্ণার কোনও বিকল্প নেই?'

বাবা বললেন, 'নাহ্। আমাদের ওই এক আল্লা। তিনিই মানুষের মুখে আহার যোগান।'

'তোমাদেব সেমেটিক ধারণায় ঈশ্বর পার্সোনাল গড। হিন্দু কনসেপশন অন্যরকম। ব্রহ্মা—তিনি নিরাকার। আবার দেবদেবীরা সাকার। তবে ভেবে দেখ, যিনি অন্নপূর্ণা, তিনিই নাকি সর্বনাশা মহাকালী। নাহ্, তুমি ভেবো না যে আমি এত দিনে আস্তিক হয়েছি। কিন্তু কল্পনা করে দেখলে একটু চমক জাগে। মেয়েদেব সম্পর্কে ভাবনাটা ভারি আশ্চর্য না? বিশেষ করে সর্বনাশী কালীর কনসেপশনটা। আমি কিন্তু মেয়েদের এই রূপটা দেখেছি। আমার সঙ্গে অনেক মেয়ে অ্যাকশনে থেকেছে। একজন ছিল বীণা রায়। মেধাবী ছাত্রী। তুমি ভাবতে পারবে না, সে...'

বাবা বাধা দিয়ে বললেন, 'গল্প পরে হবে। খাওয়ার সময় গল্প নয়।'

'গল্প নয়, মতু! বীণা একজন...'

'আবার?' বাবা ফুঁসে ওঠার ভঙ্গি করলেন।...

গল্পটা শোনা হল না। আমি খুব মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিলাম। হিন্দু দেব-দেবীর ব্যাপারটা আমি কখনও এমন করে ভাবিনি। 'সর্বনাশী মহাকালী' কথাটা আমার চেতনায় আছড়ে পড়েছিল। স্কুল-কলেজে সরস্বতী পুজোয় হিন্দু সহপাঠিনীদের সঙ্গে আমিও হইচই করেছি। প্রসাদ খেয়েছি। মাকে এ সব কথা বলিনি। বললে খুব বকাবকি করতেন জানি। কিন্তু দেবী না দেবী, একটা মূর্তি খড়মাটি দিয়ে

বানানো। চিনুবাবুর কথা শুনে মনে হল, এটা যেন বিশেষ একটা ভাষায় কিছু বলার ব্যাপার। সেই ভাষাটি আমার জানা হয়ে গেল তা হলে। মানুষের মনের কথা মূর্তির ভাষায় বলা। কী আশ্চর্য!

এ দিন অন্য-অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি আনমনা ছিলাম। দুপুরে খাওয়ার পর রেকর্ডপ্লেয়ার চালিয়ে শুয়ে থাকা আমার অভ্যাস। গ্রামে অনেক বছর আগে বিদ্যুৎ এসেছে। শরতকালে বিচ্ছিরি গরম। ফ্যানটা হঠাৎ-হঠাৎ থেমে যায় লোডশেডিংয়ে। ঘুম-ঘুম ভাবটা কেটে যায়। দক্ষিণের জানালার কাছে বসে বাতাস নিই শরীরে। এ দিন লোডশেডিং একবারও হয়নি। তাই আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মায়ের ডাকাডাকিতে উঠে দেখি বিকেল হয়ে গেছে। মা বললেন, 'কালুর মা এখনও আসছে না। তোর আব্বু তো বেশ হুকুম দিয়ে গেল, দু'কাপ চা পাঠিয়ে দাও। তুই বরং যা বাবা! ওঁরা বাগানে বসে গল্প করছেন।'

কপট ঝাঁঝে বললাম, 'আমার না বাগানের দিকে যাওয়া মানা?'

মা মিষ্টি হাসলেন। 'আহা, তোর আব্বু আছেন ওখানে। তুই ওঠ। আমি চায়ের ট্রে নিয়ে আসি।'

শাড়ি গুছিয়ে পরে চুল ঠিকঠাক করে আয়নায় নিজেকে দেখে নিলাম। পলকের জন্য মনে ভেসে এল 'অবিশ্বাস্য সুন্দর' কথাটা। একটু আড়ষ্ট বোধ করলাম। সত্যিই কি আমি.... ভ্যাট্!

বাগানে যেতে আমার অনিচ্ছা। অথচ মনে কী এক বিহ্বলতা। গোড়া-বাঁধানো কাঞ্চনগাছের তলায় চায়ের ট্রে রেখে চলে আসব বলে ঘুরেছি, চিনুবাবু খপ করে আমার হাত টেনে বেদিতে বসিয়ে দিলেন। বাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন। 'পড়লি তো বিপ্লবীর পাল্লায়!'

নিঃসংকোচে চিনুবাবু আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'প্রাক্তন বিপ্লবী বল! অথবা মৃত। বিপ্লব এমন একটা ঘটনা, যা অনেক সময় মৃত্যুতেও আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সেটা ব্যর্থতা নয়। কারণ সেই ধাক্কার আবেগটা থেকে যায়। এক সময় সেই আবেগ আবার আরও বড় একটা বিপ্লবের...হুঁ, তোমার মেয়ে রেশমি দেখছি রেশমের চেয়ে নরম। মুঠোর মধ্যে গুটিয়ে রাখা যায়। রেশমি! মুখ তোলো। তাকাও আমার দিকে।'

আমি মুসলিম মেয়ে। আমার অঙ্গ স্পর্শ করা যায় না, শুধু স্বামী বাদে। আমি সাবালিকা হওয়ার পর বাবাও আর আমাকে স্পর্শ করেন না। কিন্তু এও যেন একটা বিপ্লব। আমার কাঁধে পর-পুরুষের হাত। আমার শরীর থরথর করে কাঁপছে। মনে মনে ভাবছি, উনি তো আমার বাবার বন্ধু। আমার কাকু বলে ডাকার নিয়ম। অথচ উনি যে পরপুরুষ, এটা ভুলে যাই কী করে? আমার দ্বিগুণ বয়সী এক পুরুষ আমার কাঁধে যে হাতটা রেখেছেন, সেই হাত দিয়ে এক সময় বিপ্লব খুনখারাপি আগুন জ্বালানো...আচ্ছা, হাতের মধ্যেও কি বিপ্লবের সেই আবেগটা থেকে যায়, যেটার কথা উনি বলছিলেন? আবেগটা সঞ্চারিত হচ্ছে কি না টের পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। এই থরথর কাঁপুনি কি সেটাই?

বাবা বললেন, 'কী রেশমি! কাকুকে লজ্জা কিসের? এডুকেটেড মেয়ে তুই। কথা বল্ কাকুর সঙ্গে। কত গল্প শুনতে চাইতিস তোর বিপ্লবীকাকুর।'

লজ্জা কাটিয়ে মুখ তুলে বললাম, 'চা খান!' তারপর একটু সরে বসে চায়ের কাপ তুলে দিলাম চিনুবাবুর হাতে। শিরাবহুল কঠিন হাত। একজন বিপ্লবীর হাত! কিংবদন্তির নায়কের ওই হাত। কী অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল আমার জীবনে!

চিনুবাবু বললেন, 'মতু! তোমার কথাটা আজ বিশ্বাস করলাম।'

'কোন কথাটা?'

'তুমি বলতে, তোমার পূর্বপুরুষ নাকি পার্সিয়া থেকে এসেছিলেন। তোমার মেয়ের মধ্যে সেইরকম আদল। আমি অবশ্য যাযাবর ইরানি মেয়েদের দেখেছি।'

'রেশমি কিন্তু আমার কিছু পায়নি। সবটাই ওর মায়ের।'

চিনুবাবু আমার চিবুক ধরে মুখটা তুলে দিয়ে বললেন, 'তুমি সেন্ট পার্সেন্ট কারেক্ট। তাই একে আমার এত চেনা লাগছিল। আসলে একবার যাকে দেখি, জীবনে ভুলি না। তোমার বেগমসায়েবার মুখ কিন্তু ভুলব না। এবং তাঁর কন্যারও।'

চিবুক থেকে আঙুল সরে গেলে আমি শ্বাস ফেললাম। বাবা হাসতে হাসতে বললেন, 'রেশমির

একটা অদ্ভুত স্বভাব লক্ষ করেছি। বাইরে গেলে ও দারুণ স্মার্ট। একেবারে অন্যরকম। অথচ বাড়িতে থাকলে অতিরিক্ত মুসলমান হয়ে যায়।'

চিনুবাবু বললেন, 'খুব নামাজ পড়ে বুঝি?'

'না, না—নট ইন দ্যাট সেন্স চিনু! আমি বলতে চাইছি...'

'তুমি চুপ কর। রেশমি, তুমি নামাজ পড়?'

আস্তে বললাম, 'কখনও-কখনও। মা জোর করে...'

চিনুবাবু আমার কথার ওপর বললেন, 'তার মানে তোমার খোদাতালায় ভক্তি নেই?'

একটু পরে জবাব দিলাম, 'কখনও ভেবে দেখিনি।'

'মতু! তোমার মেয়ে অ্যাগনিস্টিক। কাজেই কাফের!'

চিনুবাবু সেই শিশুর হাসি হাসতে থাকলেন। বাবা বললেন, 'ওর মা ওকে মাঝে মাঝে কাফের বলে বকাবকি করে। আমি ওকে বেপর্দা করে স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখিয়েছি, তাই আমারও অনন্ত দোজখ। আমি বলি, ওয়েট অ্যান্ড সি। রেশমির বিয়েটা হয়ে গেলেই দাড়ি রেখে টুপি পরে মক্কা গিয়ে হাজি হয়ে আসব। সব বেকসুর মাফ হয়ে যাবে।'

হাজি হওয়ার কথা বলার সময় কালু এসে গেল। বলল, 'দানেশ হাজি এসেছে। দলিজে বসে আছে।' অদ্ভুত যোগাযোগ! বাবা বললেন, 'তোমরা গল্প কব। আসছি।' বাবা কালুর সঙ্গে চলে গেলেন।

চিনুবাবু বললেন, 'তাহলে রেশমি! ঘরে-বাইরে তুমি দুরকম। দ্বৈত সত্তা! তবে এটা হয়ত সব মানুষের ক্ষেত্রেই সত্য। এখন বুঝতে পারি এটা। আমিও এর বাইরে নই। আমাদের নেতা অরুণ মজুমদার বলতেন, একমাত্র সাচ্চা বিপ্লবীই সত্যিকার প্রেমিক হতে পারে। অথবা সত্যিকার প্রেমিকই সাচ্চা বিপ্লবী। অবশ্য এটা নিছক সম্ভাবনা। সম্ভাবনাকে বাস্তব করে ফেলতে হয়। দেখ, প্রেম জিনিসটার মধ্যে মানবোচিত সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণ উপাদানের মত মিশে আছে। স্নেহ, প্রীতি, মমতা, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা-ভক্তি সমস্ত কিছু মিলেমিশে প্রেম। কাজেই এই সব মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা হলেই মানবিকতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। মুক্ত মানুষ হওয়া যায়। আমাদের আসল লক্ষ্য ছিল এইটে। এখানে পৌঁছুনোর জন্যই বিপ্লব দরকার। তবে দেখ, বিপ্লবে হঠকারিতা স্বাভাবিক নিয়ম। আর বিপ্লব যে কখন কী ভাবে আসবে আমরা তো জানি না। ট্রট্স্কি? আজকাল আমার স্মৃতি জটপাকানো। এলোমেলো হয়ে যায় সব। সম্ভবত ট্রট্স্কির বইতে পড়েছিলাম। কসাক সৈনিকরা বন্দুক তাক করে আছে যাদের দিকে, তারাও কসাক চাষীমানুষ। কারও ভাই, কারও ছেলে, পরস্পর রক্তের সম্পর্ক। দৃশ্যটা কল্পনা কর। ঘোড়সওয়ার কসাক সৈনিকেরা বন্দুক তাক করেছে। এখনই অর্ডার উচ্চারিত হবে. ফায়ার! হঠাৎ এক বৃদ্ধা কসাক মহিলা ঘোড়াগুলোর পেটের তলা দিয়ে গিয়ে এক জনের বন্দুকের নল উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিল: চূড়ান্ত মুহূর্তে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বন্দুকের নল উল্টো দিকে ঘুরে গেল।'

দম ফেলতে চিনুবাবু একটু থামলেন। আমি ওঁর মুখে আশ্চর্য লাবণ্য দেখছিলাম। ওঁকে যুবক দেখাচ্ছিল। কণ্ঠস্বর ভরাট, অথচ দূর থেকে ভেসে আসার মত। একটু হেসে বললেন, 'এই ঘটনা উল্লেখ করে ট্রট্স্কি বলেছিলেন, বিপ্লব কখনও-কখনও ঘোড়ার পেটের তলা থেকে উঠে আসে।'

আস্তে বললাম, 'আপনার চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

'হুঁ, খাচ্ছি।' চিনুবাবু কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'এখনও কোনও-কোনও মুহূর্তে খুব এমোশনাল হয়ে পড়ি। কিন্তু ভেবে দেখ, এমোশন—আবেগ না থাকলে কিছু সৃষ্টি করা যায় না। আমি বা আমরা অনেকে আজ ব্যর্থ। বিস্তর ভুল-ভ্রান্তি আমাদের বা আমাকে ব্যর্থতার খাদে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের সেই আবেগটা এখনও সারা দেশে থেকে গেছে। অ্যাডভেঞ্চারিজম? হোক না। এগুলোই একটা করে ধাক্কা। এ ভাবেই ক্রমশ বড় ধাক্কাটা থাকবে। রেশমি? তোমাকে বোর করছি। অন্য কথা বলি। নাহ্—এবার তুমি বল!'

'আমার খুব ভাল লাগছে শুনতে। আপনি বলুন।... আচ্ছা, সেই নেই-পায়ের গল্পটা কি সত্যি? আপনি মুনিশদের সঙ্গে ধান পুঁতেছিলেন...'

চিনুবাবু হাসলেন। 'গল্পটা খুব রটেছিল বটে। সেই লোকগুলোই রটিয়ে থাকবে।'

'আপনার পায়ে গুলি লেগেছিল কী করে?'

চিনুবাবু হঠাৎ আঙুল তুলে বললেন, 'ওটা কি নদী নাকি?'

দেখে নিয়ে বললাম, 'নাহ্। ঝিল।'

'ভারি সুন্দর ন্যাচারাল স্পট তো! জলের ধারে বসে থাকতে আমার ভাল লাগে। চল, যাই ওখানে।'

আমার বুকের ভেতর রক্ত ছলকে উঠল। আস্তে বললাম, 'আপনার কষ্ট হবে। বনবাদাড় জায়গা।'

'কী হলো! বনবাদাড়ে এতকাল কাটিয়ে...চলো।' বলে উনি উঠে দাঁড়ালেন। ছড়িতে ভর করে হাঁটতে হাঁটতে আমার একটা কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন।

আমি বিব্রত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলাম। আসলে উনি চলার গতি বাড়াতে আমার কাঁধের সাহায্য নিচ্ছিলেন। অস্বস্তি হচ্ছিল। হিজলতলায় পৌঁছে উনি কাঁধ থেকে হাত তুলে নিলেন। ঝিলটা দেখতে দেখতে বললেন, 'ওই ফুলগুলো শালুক, জানো তো?

হেসে ফেললাম। একেই হয়ত বলে, শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর।

চিনুবাবু বললেন, 'আমি কিন্তু যে কোনও গ্রামবাসীব চেয়ে এ দেশের সয়েলটার নাড়িনক্ষত্র অনেক বেশি চিনি। আচ্ছা, বল তো, শালুক কোন দেশের জাতীয় ফুল?'

হকচকিয়ে গেলাম। সত্যিই এটা আমি জানি না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে চিনুবাবু সেইরকম শিশুর হাসির হেসে বললেন, 'তুমি অনার্স গ্রাজুয়েট মেয়ে, রেশমি! এটা তোমার জানা উচিত ছিল। শালুক বাংলাদেশের জাতীয় ফুল। তুমি এখনও ও-দেশে গেছ?'

'নাহ্।'

'ও-দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে আমাদের একসময় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ওদের মুক্তিযুদ্ধের সময় সেটা ছিঁড়ে যায়। তারপর তে.. আচ্ছা, এই ঝিলের জলে মাছ নেই?'

'আছে। ছোট মাছ। পুঁটি কই মাগুর এইসব। কালু বড়শি ফেলে ধরে।'

চিনুবাবু নেচে উঠলেন। 'কালুর ছিপ নিয়ে আমি মাছ ধরব। এখানে চমৎকার ঘাস। তুমি চা সাপ্লাই দেবে। কেমন?'

খুব ভাল লাগল প্রস্তাবটা। বললাম, 'আজ তো বেলা ফুরিয়ে গেছে। বরং কাল বিকেলে বসবেন। বিকেলেই মাছ টোপ খায় বেশি।'

'একটু দাঁড়াই এখানে। নাকি বসব? বসাই যাক।' বলে উনি বসলেন। দূর্বাঘাসে হাত বুলিয়ে বললেন, 'কার্পেট অব নেচার! তাই না? এ কি রেশমি! তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বস। আমার পাশে বস। দেখছ? যেন ঝিলের জল, শালুক ফুলগুলো আমাদের দিকে কেমন প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আছে। এই ফিলিংসটা ভারি অদ্ভুত!'

চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। সামান্য দূরত্ব রেখে বসে বললাম, 'আমাদের কলেজের এক অধ্যাপিকা জয়ন্তীদিও বলতেন। থরো নাকি লিখেছেন, আই গো টু নেচার অ্যান্ড কাম ব্যাক উইদ আ স্ট্রেইঞ্জ ফিলিং।'

কথাটা মুখস্থ ছিল। আমার কথা ফুরোতেই চিনুবাবু বলে উঠলেন, 'থরো? তুমি কি হেনরি ডেভিড থরোর কথা বলছ? তুমি জানো থরো বিশ্বের প্রথম সত্যাগ্রহী?'

'সত্যাগ্রহী ব্যাপারটা কী বলুন তো? পড়েছি। কিন্তু তত বুঝতে পারিনি। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ..'

আমার কথার ওপর চিনুবাবু বললেন, 'সোজা কথায় অহিংস আইনঅমান্য আন্দোলন। আজকাল প্যাসিভ রেভোলিউশনের তত্ত্বও শোনা যায়। সত্যাগ্রহও এ ধরনের বৈপ্লবিক পথ। কিন্তু অসম্ভবের পথ। স্বপ্নবিলাসিতা। তুমি বলবে, সব বিপ্লবীই স্বপ্নবিলাসী। কিন্তু মানুষের জন্মের সঙ্গে যেমন রক্তের নিবিড় সম্পর্ক আছে, তেমনি নতুন সমাজ সৃষ্টির সঙ্গেও রক্তের সম্পর্ক আছে।...'

বাবা এসে গেলেন হন্তদন্ত। বললেন, 'কী কাণ্ড! তোমরা এই বনবাদাড়ে সাপখোপের মধ্যে এসেছ? এই সে দিন কালু একটা কেউটে সাপ মেরেছে এখানে। ওঠ, ওঠ।'

চিনুবাবু উঠে বললেন, 'রেশমি! আমার বরাবর এই বরাত। সুন্দর কিছু, মহৎ কিছু, সৎ আর প্রণম্য—আমার সয় না। চল!'

বাবার সাহায্যের হাত উনি নিলেন না। তেমনি নিঃসংকোচে আমার কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে থাকলেন। বাবার দিকে লক্ষ্য রেখেছিলাম। দেখলাম, বাবার মুখে হাসি। আমার জড়তাটা কেটে গেল।..

এ রাতে খাওয়ার টেবিলে আমরা তিন জন। গ্রামীণ মুসলিম পরিবারে এ একটা বৈপ্লবিক ঘটনা বলা যায়। মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে খাবে পাশাপাশি বসে বিশেষ করে পরপুরুষের সঙ্গে, এটা অকল্পনীয় ছিল। বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। এত দিন পরে বুঝতে পারলাম, আমার বাবা কত উদার আধুনিকমনের মানুষ। এক বিপ্লবী অতর্কিতে এসে আমার মনের বন্ধ একটা দরজাও খুলে দিলেন। বুঝলাম, ছোটবেলা থেকে এ পর্যন্ত বাবা আমাকে কত অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। সমাজের তোয়াক্কা করেননি। আমি যখন যেখানে খুশি যেতে পেরেছি। এ সবই বাবার প্রশ্রয়ে। বাবা যদি আমার মায়ের মত হতেন, আমার কী অবস্থা হত ভেবে শিউরে উঠলাম।

খেতে খেতে মনে পড়ল ঘোড়ার পেটের তলা দিয়ে বিপ্লব উঠে আসার কথা। তা হলে এবার একটা ছোট্ট বিপ্লব উঠে এল টেবিলের তলা দিয়ে। হেসে ফেললাম। বাবা বললেন, 'কী হল? হাসছিস যে?'

মিথ্যা করে বললাম, 'কাকাবাবুর নেই-পায়ের গপ্পটা মনে পড়ল, আব্বু!'

বাবা হাসলেন। চিনুবাবু বললেন, 'মতু! তোমার মেয়ে ঘটনাটা বিশ্বাস করেনি মনে হচ্ছে।'

দ্রুত বললাম, 'কক্ষনো না। আমি ভীষণ বিশ্বাস করেছি।'

বাবা একটা মুর্গির ঠ্যাং কামড়ে বললেন, 'দেখছ চিনু? রেশমি নিজের ফর্মে এসে গেছে। সম্ভবত তোমারই কারচুপিতে। দেখো ভাই, আমাদের দম্পতির ওই একটি মোটে সলতে। ওর মধ্যে তোমার বিপ্লবের আগুন জ্বেলে দিও না যেন।'

'সম্ভবত দিয়েছি।' চিনুবাবু বললেন। 'ভাবিজি কি ভয় পেলেন?'

মা রান্নাঘরের দরজার কাছে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'শিক্ষিত মেয়ে। নিজের জ্ঞানবুদ্ধিতে চলবে। আমার ভয় পাওয়া না-পাওয়ায় কী এসে যায়?'

'এটা কিন্তু রাগের কথা হল ভাবিজি!'

এখন শরৎকালে বড্ড পোকার উপদ্রব। মাথার ওপর ফ্যান চলছে। তবু দেয়ালের বাল্ব ঘিরে পোকা থকথক করছে। একটা সবুজ ঘাসফড়িং উড়ে গিয়ে মায়ের ঘোমটার ভেতর ঢুকে গেল। মা ব্যস্ত হয়ে সেটা খুঁজতে গেলেন। ঘোমটা পুরো খসে গেল। আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম। বাবা বললেন, 'চিনু! বস্ত্রহরণ পালা কেমন জমেছে, বল!'

চিনুবাবু বললেন, 'কিন্তু আমার সমস্যা, কে মেয়ে কে মা ঘুলিয়ে যাচ্ছে।'

বাবা ওঁর চুল বাঁহাতে টেনে দিয়ে বললেন, 'খবর্দার! নজর দেবে না। গর্দান যাবে।'

মা সামলে নিয়েছেন ততক্ষণে। এবার অত বেশি ঘোমটা নেই। বললেন, 'ওঁকে খেতে দাও তো! খালি কথায়-কথায় তামাসা! গলায় ভাত আটকে যাবে দেখবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ খাওয়া চলল। তারপর চিনুবাবু বললেন, 'ভাবিজি! একটা নালিশ আছে। রেশমির পড়াশোনা আটকে দিলেন কেন? কলকাতায় দিব্যি হোস্টেলে থেকে, কি কোনও আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে...'

মা ওঁর কথার ওপর বললেন, 'সব মরে হেজে গিয়ে ওই একটি মোটে। চোখছাড়া করতে পারি না। তা ছাড়া মেয়েছেলে। যা শিখেছে, তা-ই বা এ তল্লাটে ক'জন শিখেছে? ওই যথেষ্ট ভাই!'

বাবা বললেন, 'ব্যস! এবার চিনু তুমি আমার শ্যালক হয়ে গেলে। তোমাকে শালা বলে ডাকতে পারি। কী রেশমি? বল্ পারি কি না?'

বললাম, 'তা হলে আমার এক মামা পুলিশ, অন্য মামা পুলিশমারা বিপ্লবী।'

আমরা সবাই হাসছিলাম। মাও হাসি চাপতে দরজার আড়ালে গেলেন। দলিজঘরের জাপানি ঘড়িতে রাত নটা বাজল। খাওয়া শেষ করে বাবা চিনুবাবুকে নিয়ে দলিজঘরে গেলেন। বলে গেলেন, 'রেশমি! মুখশুদ্ধি নিয়ে আয়। বৃষ্টি এসে গেলে আড্ডাটা জমে যাবে।'

ছোট্ট রেকাবে সুপুরি কুচি, এলাচ, ভাজা মৌরী নিয়ে গেলাম। চিনুবাবু বললেন, 'আহ্! কত বছর

পরে ফ্যামিলি লাইফের স্বাদ পেলাম। মতু, তুমি আমার ওই কাজটা করে দাও বা না দাও, আমার এ বাড়ি থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না। এই ঝাঁঝরা শরীর নিয়ে যে কটা দিন বাঁচি, ভাবিজির অন্ন আর রেশমির সঙ্গ নিয়ে কাটিয়ে দিই। ডেডবডির জন্য ভেব না। ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আসবে। রেশমি! দাঁড়িয়ে কেন? বস।'

একটা চেয়ার টেনে বসলাম। বাবা চুপচাপ সিগারেট টানার পর বললেন, 'তোমার থানায় হাজিরার ব্যাপারটা আস্কারা করে দেব। ও নিয়ে তুমি ভেব না। একটা কড়া মেডিক্যাল সার্টিফিকেট চাই শুধু। সে-ও হয়ে যাবে। কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছি। আজ তুমি হাজরে দিতে যাওনি। আগামীকাল কি পরশুও যদি না যাও, পুলিশ কী করে বসবে কে জানে!'

'সে আমি ম্যানেজ করে এসেছি। ওসি ইয়ং ম্যান। অধ্যাপনা ছেড়ে পুলিশে ঢুকেছিল। আরে, সে-ই তো পরামর্শ দিল কোনও অ্যাডভোকেটের মারফত কোর্টে এ ব্যাপারটা ডিস[illegible] অফ্ করে নিতে।'

বাবা ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, 'ডোন্ট ওয়ারি! লোক্যাল এম এল এ আমার দূরসম্পর্কের ভাই। মুসলিমদের সামাজিক সম্পর্ক বড্ড জটপাকানো। খুঁজতে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে কে কার মাসতুতো ভাইয়ের ভগ্নিপতির শালার....' বাবা হাসতে থাকলেন। 'ডোন্ট ওয়ারি! এবার তুমি রেশমিকে নিজের মুখে তোমাদের সাংঘাতিক কোনও অ্যাকশনের গল্প শোনাও। আমি একটু খুচরো কাজ সেরে নিই। কাল ভোরে আমাকে পাবে না তুমি—রাত নটা পর্যন্ত। ততক্ষণে তুমি রেশমির জিম্মায়।'

বাবা এ ঘরের একটা কাঠের আলমারি থেকে ফাইল-নথিপত্তর বের করে টেবিলে ঝুঁকে বসলেন। চিনুবাবু চোখ বুজে গোঁফের একটা পাশ টানছিলেন। চোখ খুলে বললেন, 'রেশমি! মুড আসছে না। অনেকদিন পরে অনেক বেশি কথা বলে একটু ক্লান্তি আসছে যেন। বরং কাল বিকেলে ঝিলের ধারে ছিপ ফেলে বসে থাকব আর সাংঘাতিক-সাংঘাতিক গল্প শোনাব। কেমন?'....

ঝাঁঝরা শরীর। ডেডবডি। ভাগাড়।

তিনটি কথা তিনটি ছুরির ফলার মত আমাকে বিঁধছিল। কাল রাতের মত ঝিরঝিরে বৃষ্টিটাও এসে গেল। জাপানি ঘড়ির রাতের শেষ বাজনা কখন বেজে গেছে। আমার কেন কান্না আসছে, বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ মনে হল, চিনুবাবুর বাড়ি কোথায়, বাড়িতে কারা আছে, এ সব কথা তো জানি না। জানাটা দরকার ছিল। উনি যদি একলা মানুষ হন, তা হলে তো...

গা শিউরে উঠল। বিকেলে ঝিলের ধারে শোনা কথাগুলো মনে ভেসে এল। আমার স্বপ্নে যে বন্দুকবাজ মানুষটিকে হিজলের ডালে চিত হয়ে মমির মত শুয়ে থাকতে দেখেছি, সে-ই কি সত্যিকার জীবনে এসে গেল এত দিনে? কোনও-কোনও স্বপ্ন স্মৃতিতে থেকে যায়। স্পষ্ট মনে পড়ছে, তার বুকে বন্দুকটাও ঘুমন্ত মনে হয়েছিল। কোনও ঘুমন্ত বন্দুক থেকে গুলি বের হয় না। সেই লোকটির জন্য খুব কষ্ট হয়েছিল, তাও মনে পড়ছে।

ঝাঁঝরা শরীর। ডেডবডি। ভাগাড়।

অসহ্য। কেন তুমি এমন সব কথা ভাববে, বিপ্লবী? তুমি তো জান, বিপ্লব কখনও ঘোড়ার পেটের তলা দিয়ে উঠে আসে। কেন তুমি তৈরি থাকবে না আর?

চোখ বুজে অবিকল দেখতে পেলাম, পাজামা-পাঞ্জাবি পরা শক্ত কাঠামোর রুক্ষ একটা শরীর, দুটি উজ্জ্বল চোখের দূরে তাকিয়ে থাকা, মট মট করে ভেঙে পড়ছে খড়মাটি পুতুলের মত। না, না। এমন হওয়া উচিত না। তোমার স্বাস্থ্য দরকার। পরমায়ু দরকার। সত্যিই যদি বিপ্লব উঠে আসে অতর্কিতে তোমারই পায়ের ফাঁক দিয়ে?

কিন্তু বিপ্লব জিনিসটা কী? প্রেমের জন্য, মুক্তির জন্য বিপ্লব। প্রেমেই কি মুক্তি? কিন্তু আমার একুশ বছরের জীবনে এখনও তো প্রেমের দেখা নেই। কে জানে বাবা, প্রেমটাই বা কী জিনিস!

বিদ্যুৎ চমকাল। মেঘ ডাকল। বৃষ্টিটা তীব্র হল। আস্তে আস্তে আমি খুব শান্ত হয়ে গেলাম।....

২

ঘুম ভেঙে গেল। মসজিদের মাইক্রোফোনে আজান শুনতে পেলাম। মসজিদটা দূরে, পাড়ার ভেতর দিকে। একটু অবাক লাগল। তাহলে পাঁচটা বাজে। এখনও ঘরের ভেতরে আবছা আঁধার। পুবের জানালাটা চৌকো একটা ঘষা কাচের মত ধূসর। পাখিগুলো ঘুমঘুম গলায় ডাকাডাকি করছে। ছাত্রী-জীবনে রোজ ভোরের আজান শুনতে পেতাম। কারণ টেবিল-ঘড়িতে চারটের অ্যালার্ম দেওয়া থাকত। টেবিলল্যাম্প জ্বেলে পড়তে বসতাম। তারপর আমার জীবন থেকে ভোরের আজানটা মুছে গিয়েছিল। এত দিনে আবার ফিরে এল। বাইরে মায়ের সাড়া পাচ্ছিলাম। বাবার কাশির শব্দ বাথরুমের দিকে। ততক্ষণে মা নামাজ পড়ে নেবেন। তারপর বাবার জন্য তাড়াতাড়ি কিছু নাশতা আর চা তৈরি করবেন। বাবা চা-নাশতা খেতে খেতে চাপা গলায় কিছু সাংসারিক নির্দেশ দেবেন। তারপর সাদা প্যান্ট, কালো কোট পরে ফোলিও ব্যাগ হাতে বেরিয়ে যাবেন বাস স্ট্যান্ডের দিকে। এ অবশ্য আমার ছাত্রীজীবনের স্মৃতি। এই একটা বছর ভোরের ওইসব ঘটনা আমার অজ্ঞাতে ঠিকঠাক ঘটে। ছটায় ঘুম ভেঙে জাপানি ঘড়ির মিষ্টি ধ্বনি শোনা আমার নিজস্ব প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজ আগের মত এখনই তাড়াহুড়ো করে উঠব না। উঠলেই মায়ের সঙ্গে নামাজ পড়তে হবে। এমন কি, কোরান পড়তে হবে মায়ের তাগিদে। আমার মাথায় থাকবে ঘোমটা। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগে। খোদা কেন তাঁর বান্দাদের চুল দেখতে চান না? তবু তো পুরুষ মানুষদের টুপি সব চুলটা ঢাকতে পারে না। মেয়েদের চুলের সবটাই ঢাকতে হয়। কী আছে মেয়েদের চুলে? ছোটবেলায় যে-মৌলবি আমাকে ধর্ম শিক্ষা দিতেন, কেন তাঁর কাছে কথাটা জেনে নিইনি? মজার কথা, তখন ঘণ্টাটাক আমাকে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরতে হত। আর মাথায় মায়ের মতই ঘোমটা। তখন গ্রামে বিদ্যুৎ আসেনি। গরমে কষ্ট হত। কিন্তু উপায় ছিল না। মুসলিম হয়ে জন্মালেই ধর্মশিক্ষা নিতে হবে। আরবি হরফ চেনার পর প্রথমে পবিত্র কোরানের একটা অংশ 'আমপারা', তারপর মূল কেতাবটি পড়তে হবে। পুরো কেতাব হরফ আর বাক্য চিনে শেষ করতে আমার পনের দিনও লাগেনি। মৌলবিসায়েব খুব তারিফ করেছিলেন। একে বলে 'কোরান খতম করা'। এ উপলক্ষে রীতিমত 'মিলাদ' নামে অনুষ্ঠান হয়েছিল। আমি ঐশী বাণীগুলো পুরোটাই পড়তে পেরেছি, এ একটা মহৎ গৌরব। মা বলতেন, 'আমার কোরান খতম করতে তিন মাস লেগেছিল।' মাকে তা নিয়ে খোঁচা দিতাম। মা করুণ হেসে বলতেন, 'তোরা একালের মেয়ে। তোদের মত মাথা আমাদের?'

পাশ ফিরে শুলাম। আরও একটু ঘুমিয়ে নিই। এ রাতে আমি কী স্বপ্ন দেখেছি? স্বপ্নের কথা ভাবতে গিয়ে চমকে উঠলাম। তাই তো! বিপ্লবী এক মানুষের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কী সর্বনাশা রাত্রি রে বাবা! আমার অনুভূতিগুলো কী এক সুখের স্বাদে চঞ্চল হয়ে উঠল। আবার চিত হয়ে শুলাম। বুঝলাম আবিষ্কারই করলাম, মনের ভেতর আরও মন থাকে। সেই ভেতরকার মন থেকে বেরিয়ে এসেছেন একটি মাত্র দিনের এক স্মৃতির মানুষ। তা বলে তিনিই কি আমার এত আগে ঘুম ভাঙার কারণ? ঝাঁঝরা শরীর। ডেডবডি। ভাগাড়। অসহ্য এক আবেগ আমাকে নাড়া দিল। গার্লস কলেজের বড় গেট বন্ধ ছিল। মেয়েদের মুরগির বাচ্চার মত আগলে নিয়ে দোতলায় অধ্যাপিকারা পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রিন্সিপ্যাল রত্না সেন বারবার ডায়াল করে থানায় ফোন করছেন। গেটের দিকে বারবার প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটছে। ছেলেগুলো লাল পতাকা উড়িয়ে আমাদের বেরিয়ে আসতে বলছে স্লোগানের ভাষায়। মাঝে মাঝে 'আমাদের চিনু সামন্ত...জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ! ... ইনকিলাব! জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!...' সেই চিনু সামন্ত আমাদের বাড়িতে! বিপ্লবীর বিপ্লবের রক্তাক্ত পথ অবশেষে আমাদের দলিজঘরে এসে শেষ হল! আশ্চর্য. আশ্চর্য এবং আশ্চর্য! ঠাণ্ডা মাথায় ঘটনাটা বুঝতে চেষ্টা করলাম। রবিবারের সমস্ত স্মৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ, আগের বৃষ্টিরাতের ডাক থেকে শুরু করে মনে এল। কিন্তু চিনু সামন্তের এই অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত পরিণতিকে কেন কাল সকালে শাড়ি বদলানোর সময় নিজের নিয়তির মুখোমুখি দাঁড়াতে যাওয়া মনে হয়েছিল আমার? সেই কবে কলেজের গেটে ভয়ঙ্কর গর্জনে নামটি শুনেছি। তখনই কি নামটি আমার চেতনার অনেক গভীরে প্রচণ্ড জোরে গিয়ে বিঁধেছিল?

এটাই হয়ত হিরোওয়রশিপ। এই ইংরেজি কথাটি অবশ্য জয়ন্তীদির। এত দিন বাদে মনে পড়ল, জয়ন্তীদির টুকরো-টুকরো কথাবার্তায় আভাস পেতাম, চিনু সামন্তকে তিনি চেনেন। জয়ন্তীদির কথা শুনে মনে হত, ওই বোমা ফাটানো ঘটনায় তাঁর যেন প্রচ্ছন্ন সায়ও আছে। চিনুবাবুকে জিজ্ঞেস করব, জয়ন্তীদিকে চেনেন কি না। আচ্ছা, জয়ন্তীদির যদি ওইসব ঘটনায় সায় ছিল, কেন হঠাৎ-হঠাৎ বাঁকা মুখে বলতেন।, 'হিরোওয়রশিপ মানুষের সহজাত এবং এটা একটা ফাঁদের মত'? সেই ফাঁদে পড়ে যাইনি তো? বাইরে কালুর মায়ের সাড়া পেলাম। তা হলে বাবা চলে গেছেন বাস স্ট্যান্ডে। কিন্তু জাপানি ঘড়ির বাজনা কি শুনেছি? হয় ঘড়িটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে, নয় তো বাজনাটা আমি শুনতে পাইনি তন্ময় ভাবনার দরুন। পুবের জানালায় চৌকো জায়গাটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। কালো দেখাচ্ছে আঁকাবাঁকা গ্রিলগুলোকে। মশারির ফাঁকে মাথা বের করে পশ্চিমের জানালায় বাড়ির উঠোনটা দেখতে থাকলাম। কালুর মা শিউলিতলায় সান বাঁধানো একটুকরো চত্বরে বাসনকোসন নিয়ে সবে বসল। ওখানে পাঁচিলের নীচে একটা ড্রেন আছে। সব নোংরা জল বেরিয়ে গিয়ে দক্ষিণের একটা ডোবায় পড়ে। ওদিকটায় কোন এক হাসু মিয়ার পোড়ো ভিটে। গাছপালা আর যথেচ্ছ জঙ্গল। তার ভেতর কালুর প্রথম বউয়ের ভীষণ মৃত্যুর স্মৃতি নিয়ে একটা নিমগাছ দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের বাড়িটা গ্রামের একটেরে একানড়ের মত আলাদা। উত্তরে পাকা রাস্তা অবধি ধানক্ষেত। পশ্চিমে একটুকরো খোলা মাটি, তার নীচে গ্রামের রাস্তা। ওই খোলা মাটিটা আমাদের ধান মাড়াইয়ের খলিয়ান। মাটিটার কোথাও খাবলা-খাবলা ঘাস। কোথাও একেবারে ন্যাড়া। ধান ওঠার আগে পুরোটা ন্যাড়া করে ফেলবে কালু। দমাদ্দম পিটুনি দিয়ে পিটিয়ে শক্ত করবে। তারপর কালুর বউ এসে গোবরছড়া দেবে। দলিজঘরের বাইরের বারান্দায় বসে এই ব্যাপারটা দেখতে দেখতে আমার ভাল লাগে। মাঠ থেকে ধানের পাঁজা এনে জড়ো করা হয় খলিয়ানে। মুনিরা তক্তায় ধানের আঁটিগুলো তালে তালে আছড়ে ফেলে, যতক্ষণ না শেষ ধানটি খসে যায়। মানুষের সমস্ত কাজের মধ্যে দিনরাত্রির মত একটা ছন্দে বাঁধা নিয়ম আছে। আমার অবাক লাগে, বছরের পর বছর একই কাজের পুনরাবৃত্তি, মুনিশদের বিরক্তি জাগে না? একঘেয়ে লাগে না? আমার তো লাগে। পড়াশোনা শেষ। ছকে বাঁধা দিনগুলো রাতগুলো। রোজ একই রকম। কেন অন্য কিছু ঘটে না?

আবার চমকে উঠলাম। ঘটেছে এত দিনে। এক আশ্চর্য মানুষ হঠাৎ এসে আমার দিনগুলো রাতগুলোকে নাড়া দিয়েছেন। নিয়মগুলো ধীরে বদলাতে শুরু করেছে। কাল শেষ বিকেলে কত দিন বাদে ঝিলের ধারে হিজলতলায় গিয়ে ঘাসে বসেছি। আজ বিকেলেও বসব। হুঁ, কালুকে বলে রাখা দরকার, ওর ছিপ দিয়ে যাবে। সকালে না বললে ওকে সারা দিনের মধ্যে পাওয়া অনিশ্চিত। মাঠে কোথায় কী কাজ করবে। কখন বাড়ি ফিরবে, বলা কঠিন।

বিছানা ছেড়ে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লাম। মশারির চারদিক খাটের মাথার ওপর তুলে গুঁজে দিয়ে শাড়িটা গুছিয়ে পরলাম। ভাঙা খোঁপা বেঁধে নিলাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বাসি চেহারার দিকে তাকালাম। আমি কি সত্যিই 'অবিশ্বাস্য সুন্দর'? কিছু তো বুঝতে পারি না। আমি রেশমের মত নরম কি না কী করে নিজে টের পাব? নিজেকে একবার ভেংচি কেটে মনে মনে বললাম, তুই ভারি কুৎসিত, রেশমি! সত্যিকার সুন্দর বন্ধুদের মত নোস।

এটা পাগলামি। একা ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়ালে কী এক পাগলামি আমাকে ভর করে। আমি আইবুড়ি মুসলিম মেয়ে। আমার সাজতে-টাজতে মানা। বড় জোর ছোট্ট একটা টিপ। একটু ক্রিম কখনও-সখনও। আমার বন্ধু ঝর্না ঠাট্টা করে বলত, তোদের মুসলিম মেয়েদের দেখলে কেমন বিধবা-বিধবা লাগে। হ্যাঁ রে, রেশমি, বিয়ে হলে তুই সিঁদুর পরবিনে? পরিস। দারুণ লাগবে তোকে। নাহ্, একদাদা সিঁদুর নয়, জাস্ট এক ইঞ্চি লম্বা সরু একাট স্ট্রেট লাইন। বাসন্তীদি কেমন পরেন, দেখেছিস তো? ঠিক ওইরকম। আর দুই ভ্রূর মধিখ্যানে একটা লাল মোটা টিপ পরবি। খবর্দার, বেশি গয়না-টয়না না। কানে দুটো ছোট্ট পাথর বসানো দুল, হাতে দুগাছা কাঁকন। ব্যস। নো নেকলেস।' ঝর্নার বিয়ে হয়ে গেছে কলেজ থেকে বেরিয়েই। ও ব্যবসায়ীর মেয়ে। আমি উকিলের। ঝর্না দিব্যি

শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। আমি যাচ্ছি না বাবা! ভাগ্যিস আমি একমাত্র সন্তান এ বাড়ির। আমার বিয়ে হলে...ভ্যাট্! কী বাজে ব্যাপার, এই বিয়েটিয়ে।

বাইরে থেকে 'রেশমি' ডাক ভেসে এল অচেনা গলায়। চিনুকাকু আমাকে ডাকছেন? বাড়ির ভেতরে চলে এসেছেন, বাবা নেই! সত্যিই মানুষটির কোনও কিছুতে সংকোচ নেই। বিপ্লবীরা কি এমনি হন? নাকি চিনুকাকু মানুষটিই, এমন? কিছু লোক থাকে। তারা স্বার্থের জন্য হোক, কী স্বভাববশে গায়ে পড়া আত্মীয়তা করতে আসে। চিনুকাকুর একটা স্বার্থ তো আছেই। তাই বলে উনি যেমনটি করছেন, এমন কথা কিছুতেই ভাবা যায় না।

কিন্তু আমার বাসিমুখ বাইরের কাকেও দেখাতে আমার অস্বস্তি লাগছে। শাড়ির আঁচলে মুখ ঘষে নিলাম। আবার 'রেশমি' ডাকটা ভেসে এল যেন বাইরের পৃথিবী থেকে। তখন দরজা খুলে বেরোলাম। চিনুকাকু বাথরুম থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে গেঞ্জি আর বাবার সেই লুঙ্গি। কাঁধে তোয়ালে। এক হাতে দাঁতমাজা ব্রাশ। অন্য হাতে ছড়ি। আমাকে দেখে উজ্জ্বল হাসলেন। 'তুমি বিরক্ত হলে না তো, রেশমি? তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম হয়ত। তা হোক। সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে ওঠা উচিত। কেন জান? এই সময়টা ফ্রেশ এয়ার থাকে। মর্নিং ওয়াক না হোক, অন্তত কিছুক্ষণ তোমাদের বাগানে হাঁটাহাঁটি করতে পার।'

কিছু বলা উচিত। তাই বললাম, 'বাবার সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?'

চিনুকাকা ভুরু কুঁচকে একটা ভঙ্গি করে বললেন, 'তুমি আব্বা বা আব্বু বল লক্ষ করেছি। এখন তুমি বাবা বলছ। তার মানে তুমি আমাকে ধর্মের দৃষ্টিতে দেখছ।'

বিব্রতভাবে বললাম, 'নাহ্। আপনাকে যে কাকু বলেছি, চাচা বলিনি!' শেষ বাক্যটায় আমার বিব্রত ভাবটা আর রইল না।

'হুঁ তবে আমি শুনেছি, কাকা শব্দটা বিদেশি। সম্ভবত তুর্কি-টুর্কি হবে। যাক গে। এখন এত সবকথা বলার সময় নয়।' চিনুকাকু পা বাড়িয়ে ফের বললেন, 'আসল কথাটা হল, ভাবিজির আড়ষ্টতা কাটেনি এখনও। তোমাদের অন্দরমহলে অনুপ্রবেশ করেছি। দেখছি, শুধু ওই বৃদ্ধা ছাড়া কেউ নেই। কেমন ফাঁকা-ফাঁকা মনে হল। তাই তোমাকে ডাকছিলাম। দেখ, আমি বাগানে গিয়ে বসছি। সম্ভব হলে এক কাপ চা...' বলে উনি আমার দিকে অনুরোধের ভঙ্গিতে তাকালেন।

উঠোনে নেমে বললাম, 'আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

বাগানের দিকের দরজাটা খোলা। কালু এসে ভোরবেলায় খোলে। বেরুলে বাঁ দিকটায় বাগানের কোণে গোয়াল ঘর। বলদ দুটো আর গাইবাছুরকে বের করে খুঁটিতে বেঁধে ফেলে। এ সময় বাছুরটার জন্য আমার কষ্ট হয়। সে দুধ খেয়ে ফেলবে বলে তার মায়ের কাছ থেকে খানিকটা দূরে বেঁধে রাখা হয়। আমি দেখেছি ওরা পরস্পরের দিকে যেতে চায় বলে দড়ি টানটান। এটা মানুষের একটা নিষ্ঠুরতা। কিন্তু কী করে মানুষের অসংখ্য নিষ্ঠুরতা দিয়ে দুনিয়া জুড়ে ঘর গেরস্থালি সুন্দর সাজানো ভাবতে গেলে অবাক লাগে। নিষ্ঠুরতাগুলো না থাকলে মানুষ কি টিকে থাকতে পারত না?

রান্নাঘরের বারান্দায় এতক্ষণে মাকে দেখতে পেলাম, হাসতে হাসতে বললাম, 'তুমি চিনুকাকুর ভয়ে গর্তে লুকিয়েছিলে বুঝি? আশ্চর্য!'

মা গম্ভীর অথচ একটু কাতর মুখে বললেন, 'বেগানা মরদলোক হঠাৎ করে বাড়ি ঢুকছে, সাড়া শব্দ না দিয়েই।'

'ওসব বদ অভ্যাস ছাড়ো তো! এখুনি চা চাই!'

'কেটলিতে পানি ফুটছে। তুই মুখ ধুয়ে আয় না! মেহমানকে চা-নাশতা দিতে হবে, তোকে শেখাতে হবে না বাবা!'

বাড়িতে অতিথি-কুটুম্ব এলে বরাবর দেখেছি মায়ের কেমন আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। বড় বেশি আড়ষ্ট হয়ে পড়েন। অন্য সময় মা একেবারে অন্য রকম। মাথায় ঘোমটা থাকে না। চড়া গলায় কথা বলেন। খানিকটা ঝাঁঝ থাকে কথাবার্তায়। বুঝতে পারি, মা আজীবন ঘরবন্দী বলেই বাইরে দুনিয়া

সম্পর্কে মনে একটা ভয়-ভয় ভাব এবং সন্দেহপ্রবণতা থেকে গেছে। বাইরে থেকে এ বাড়িতে যারা আসে, তাদের প্রতি অদ্ভুত একটা সংশয় মাকে আড়ষ্ট করে ফেলে। এমন কি মামুজি এলেও মাথায় যথেষ্ট ঘোমটা, নম্র আচরণ, নিচু গলায় কথা। অথচ মায়ের উনি সহোদর ভাই।

একবার মামুজি পুলিশের পোশাকে জিপ হাঁকিয়ে বোনের বাড়ি এসেছিলেন। মা তো কেঁপে অস্থির। অবস্থা লক্ষ করে বাবা বলেছিলেন, ভাইজান, আপনি শিগগির পোশাক বদলান। নৈলে আমি বউ হারাব।' মামুজি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'কাজিসায়েব! তুমি উকিলমানুষ। তহমিনাকে শেখাতে পার না, পুলিশ উকিলের কাছেই জব্দ হয়? তুমি তো পুলিশ জব্দ করা মহা আইনবাজ হে! তহমিনা! আমার কথাগুলো মনে রাখিস। কাজিসায়েবের কালো কোট আমার খাকি পোশাকের চেয়ে সাংঘাতিক। কালো কোট আমিরকে ফকির আর ফকিরকে আমির বানিয়ে ছাড়ে, বুঝলি?'....

শিগগির বাথরুম সেরে বেরিয়ে এলাম। রান্নাঘরের বারান্দার ডাইনিং টেবিলে ট্রে সাজিয়ে মা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটু অবাক হয়ে দেখলাম, আজ পুরনো দামী টি-সেট বের করেছেন মা। চায়ের পট দুধের পট, চিনির পট, আর চামচ। কাপ প্লেটগুলোও ঝকঝক করছে। বললাম, 'ওয়ান্ডারফুল! মা, মনে পড়ছে তো, মামুজি এলে এই সেটটা বের করতে? কিন্তু ভেবে দেখ, পুলিশের কাপে চা খাবেন একজন পুলিশমারা বিপ্লবী! আশ্চর্য হচ্ছ না?

মা একটু চটে গেলেন। 'তোর বড্ড মুখ ফুটেছে কাল থেকে।'

ট্রে তুলে নিয়ে বললাম, 'চিনুকাকা আমার কানে ফুসমন্তর দিয়েছেন।' কাঞ্চনগাছের তলার বেদিতে চিনুকাকু বসেছিলেন। ওখানে একটা ঝাঁকড়া আমগাছের ছায়া পড়েছে। সূর্য সবে উঠেছে ঝলমলে লাল হয়ে। চিনুকাকু বললেন, 'আরে! এক কাপ চায়ের জন্য এলাহি কারবার! আমি এমন কিছু আমিরওমরা নই। এত সাংঘাতিক-সাংঘাতিক আপ্যায়ন করলে আমার অস্বস্তি লাগে।'

চা তৈরি করে দিয়ে বললাম, 'আপনার ভাবিজির কীর্তি! জানেন? এই টি সেট আমার পুলিশ মামুজি এলে মা বের করতেন। আমার দাদুসায়েবের আমলের জিনিস। মাকে বলে এলাম, পুলিশের কাপে চা খাবেন পুলিশমারা বিপ্লবী। মা ভড়কে গেছেন!'

চিনুকাকা সেইরকম শিশু হাসি হাসতে লাগলেন। তারপর একটা বিস্কুট কাপে চুবিয়ে মুখে ভরলেন। একটু পরে বললেন, 'পুলিশমারা বিপ্লবী বললে তুমি!'

একটু চমকে উঠে বললাম, 'রাগ করলেন কাকু?'

'নাহ্' চিনুকাকা একটু হাসলেন। কাতর হাসি। বললেন, 'বিপ্লবের থেকে ছিটকে দূরে এসে পড়েছি। কাজেই আমি হয়ত আর বিপ্লবী নই। তবে পুলিশ মারা ব্যাপারটা তোমাকে বোঝান উচিত।'

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে ওঁর দিকে তাকালাম। দেখলাম, উনি দূরের দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে আছেন। বললাম, 'থাক এসব কথা।'

'কল্পনা কর, একটা বিশাল মেসিন। লক্ষ লক্ষ নাটবোল্টে জোড়া দেওয়া। এটা হল রাষ্ট্র। তার ভেতরে, অনেক ভেতরে আড়াল থেকে কেউ মেসিনটা চালাচ্ছে। সে হল সরকার। নাটবোল্টগুলো ধর পুলিশ আর মিলিটারি। ছোটগুলো পুলিশ, বড়গুলো মিলিটারি। কেমন তো? তুমি নিশ্চয় জান, কোনও মেসিনের কয়েকটা নাটবোল্ট ঢিলে হয়ে গেলে মেসিনটার কাজ ব্যাহত হবে। একটার পর একটা নাটবোল্ট খুলে ফেললে একসময় মেসিনটাই মুখ থুবড়ে পড়বে। কাজেই ছোট নাটবোল্টে হাত লাগাও। জ্যাম ধরে আছে। হাতুড়ি মার। উপড়ে ফেল। শব্দ হবে। মেসিনটা কেঁপে উঠবে থরথর করে। টেরর-সন্ত্রাস! আর রেশমি, পুলিশ তো মানুষ। আমাদেরই মত মানুষ। তার গায়ে ঘা লাগলে ভয় পাবে।' একটু চুপ করে থাকার পর কাপে চুমুক দিয়ে ফের বললেন, 'তুমি জান, কী সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলাম আমরা? আমাদের কাছে খবর আসত। পুলিশ অফিসার বাড়ি থেকে ডিউটিতে বেরুচ্ছেন। ঠাকুর দেবতাদের ছবিতে নমস্কার করে বেরুচ্ছেন। দরজার বাইবে তাঁর ভীত স্ত্রী পুত্র কন্যা তাঁকে দেখছে। মানুষটা বাড়ি ফিরবেন তো?... এরকম একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। রেশমি, তুমি আফটার অল গ্রামের মেয়ে। নিশ্চয় জান, বিষাক্ত সাপ ভয় পেয়েই কামড়ায়। অসংখ্য নানা বয়সের নিরীহ মানুষ যুবক-যুবতী, এমন কি কিশোর-কিশোরীকে ওই ভয় পাওয়া সাপের কামড়ে ছটফট করে মরতে

হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের কোথাও একটা প্রচণ্ড ভুল হয়েছিল। কিন্তু পথটা ঠিকই ছিল। আমরা গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে চেয়েছিলাম। এই পয়েন্টটা কারেক্ট। কিন্তু সেজন্য গ্রামের জনগণকে আমাদের সঙ্গে পাওয়া দরকার ছিল। একটা বড় ভুল এখানে। আর একটা মারাত্মক ভুল, আমরা ভাবিনি যে আমাদের এইসব কাজের সুযোগ অ্যান্টিসোস্যালরাও নেবে। নিছক ডাকাতি, কোনও প্রতিহিংসা, আরও সব স্বার্থে তারা ছদ্মবিপ্লবী থাকবে। ফলে আমরা জনগণের চোখে হেয় হব। জনগণই আমাদের ভয় পাবে। এইটেও সাংঘাতিক ভুল। আর এইসব ভুল শোধরাতে গিয়ে আমাদের ভেতর দলাদলি শুরু হয়েছিল। বাস্তব সংকটগুলো তাত্ত্বিক সংকটের চেহারা নিল।'

চিনুকাকু শ্বাস ছাড়লেন। আমার দিকে তাকালেন। বললাম, 'পটে এখনও চা আছে।'

'দাও।' চিনুকাকু কাপটা দিলেন। বললেন, 'তুমি আমার সব কথা চুপচাপ শুনছ। কোনও প্রশ্ন জাগছে না তোমার মনে? প্রশ্ন কর।'

'আমার কোনও প্রশ্ন নেই।'

'তাহলে বলব, তুমি আমার কথা মন দিয়ে শুনছ না।'

'শুনছি তো।'

'বুঝতে পারছ না!'

'পারছি।'

'পারলে তুমি তর্ক করতে। আমি অনেক দিন তর্ক করিনি। তর্ক করতে চাই বলেই...' চিনুকাকু হঠাৎ কথাটা বন্ধ করে আঙুল তুলে বললেন, 'এতখানি খোলা জমি পড়ে আছে। তুমি ফুলবাগান কর না কেন? নার্সারি থেকে বীজ বা চারা এনে... তুমি কি ফুলটুল ভালবাস না?'

'বাসি। আসলে...'

'বল, বল!'

'আপনি আছেন, তাই মা আমার বাগানে আসা নিয়ে আপত্তি করছেন না। নইলে এখানে আমি পা বাড়ালেই মা এমন হইচই বাধান, যেন সাংঘাতিক কী পাপ করতে যাচ্ছি!'

চিনুকাকু খুব অবাক হয়ে গেছেন। 'কেন? এখানে এলে তোমার পাপ হবে কেন?'

হাসি চেপে বললাম, 'এদিকটা নিরিবিলি। আর ও দিকে ওই নিম গাছটা দেখছেন, কালুর বউ স্যুইসাইড করেছিল। আর ওই ঝিলের ধারে একটা পেত্নী থাকে নাকি। আচ্ছা কাকু, আপনি কখনও জিনপরি দেখেছেন?'

চিনুকাকু একটু হেসে বললেন, 'নাহ্। তুমি দেখেছ বুঝি?'

'ভ্যাট্!' হেসে ফেললাম। 'মায়ের নিজস্ব একটা পৃথিবী আছে। সেখানে ওইসব মারাত্মক-মারাত্মক প্রাণী থাকে। কোরানে আল্লা বলেছেন, আমি ইনসান আর জিন সৃষ্টি করেছি। ইনসান মানে মানুষ। প্রথম মানুষ নাকি মাটি দিয়ে গড়া। তাই মানুষের মাটির দেহ। জিনরা কিন্তু আগুন দিয়ে গড়া।'

'তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস কর?'

'জানি না। তবে আমার মামাতো ভাই সানু বলে, জিন সম্ভবত অন্য গ্রহের প্রাণী।'

'সানু কী করে?'

'সে কলকাতায় ডাক্তারি পড়ছে।'

চিনুকাকু দ্বিতীয় কাপ শেষ করে বললেন, 'একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখ। পুলিশের সন্তান ডাক্তার হয়। অথবা ডাক্তারের সন্তান পুলিশ কিন্তু হিন্দুর সন্তান হিন্দু, মুসলমানের সন্তান মুসলমান হবেই। উদ্ভট নয়? তুমি নিশ্চয় কার্ল মার্কসের নাম শুনেছ। মার্ক্স বলেছেন, শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই বলে না আমি হচ্ছি আমি। তার আমি-বোধটা গড়ে উঠতে সময় লাগে। অথচ তুমি মুসলমান, আমি হিন্দু, এটা মাতৃগর্ভে ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু আরও অদ্ভুত ব্যাপার। ধর, জন্মের পর কোনও মুসলিম মা লালনপালন করলে আমি নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিয়ে আইডেন্টিফাই করতাম। আবার তোমার ক্ষেত্রে হিন্দু মা.. তুমি রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসটা পড়েছ?'

'নাহ্।'

'কথা বল, রেশমি! তর্ক কর আমার সঙ্গে।'

'কী নিয়ে তর্ক করব? আপনি সত্যি কথাই বলছেন।'

চিনুকাকু আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'রেশমি! এভাবে সব কিছু বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে নেই। প্রতিবাদ করতে শেখ। প্রথমে নিছক প্রতিবাদের জন্য প্রতিবাদ। ক্রমশ পয়েন্ট খুঁজে নিয়ে প্রতিবাদ। দেখ, একটা পাথরে ঘা দিলে সে-ও প্রতিহত করে পাল্টা আঘাত। প্রতিবাদী মানুষই খাঁটি মানুষ। সবকিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে করতে বিদ্রোহী সত্তা জাগে মানুষের মধ্যে। বিদ্রোহী সত্তাই মানুষকে সভ্য করতে পারে।.... নাহ্! এই সুন্দর সকালবেলাটা কথা দিয়ে ঢেকে ফেলা উচিত হচ্ছে না। ওটা কী গাছ বল তো?'

কাঁধ থেকে হাতটা উঠে গেলে আমার চাপা শ্বাস বেরিয়ে গেল। গাছটা দেখে বললাম, 'জানি না। সব গাছের নাম জানতেই হবে কেন?'

'বাঃ! এই তো তর্কের একটা পয়েন্ট তুলেছ।' চিনুকাকু হাসলেন। 'সব গাছের নাম জানতে হবে কেন? আমার মতে, জানা উচিত। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, আমরা যে যেখানে আছি, তার সবকিছু জেনে রাখা দরকার। প্রথমে ছোটগুলো জানা। ক্রমশ বড়গুলো। তবে এ তো বাইরের দিকটা জানা। এর পর ভেতরের দিকটা জানা দরকার। একজন মানুষ কী, অন্য-অন্য মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী, এভাবে ক্রমশ সমাজ, রাষ্ট্র.. ওটা ছাতিম গাছ।'

দ্রুত বললাম, 'ভুলে গিয়েছিলাম। জানতাম। রাতে সুন্দর গন্ধ ছড়ায় ছাতিম ফুলের।'

চিনুকাকু ছড়ি ভর করে উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক পা এগিয়ে বললেন, 'তুমি শিগগির ফুলবাগান কর। এস। দেখিয়ে দিই, কোথায় কী ফুলগাছ লাগালে সৌন্দর্য ফুটবে। তবে আগে ওই খিড়কির দরজার মাথায় বুগানভিলিয়া চাই। তারপর ইটের কেয়ারি করে এইখান পর্যন্ত দুধারে রঙ্গনার ঝোপ। কেমন তো? ওখানে চৌকো একটা জায়গায় সিজন ফ্লাওয়ার।'

উনি ভিজে ঘাসের ওপর এদিক থেকে সেদিকে হাঁটছিলেন। ওঁকে লক্ষ্য করছিলাম। এমন কোনও মানুষ আমি এই নতুন দেখছি। এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বলছেন, মনে হচ্ছে সত্যিই আটপৌরে বাগানটা ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে যাচ্ছে। তিনি এই বাগানটার বুকে একটা সুন্দর অভাবিত দৃশ্যপট বিছিয়ে দিচ্ছেন। এই সম্ভাবনার দিকটা এতকাল কেন আমার মাথায় আসেনি? ঝর্না বলেছিল, 'তোদের মুসলিম মেয়েদের দেখতে কেমন বিধবা-বিধবা লাগে।' এত দিনে বাগানটা দেখতে দেখতে তেমনি বিধবা-বিধবা লাগছিল। চিনুকাকু ডাকছেন, 'দাঁড়িয়ে কেন রেশমি? আমার কাছে এস। আইডিয়াটা বুঝে নাও।'

কাছে গেলাম। উত্তর-পশ্চিম কোণে একটুকরো সবজিক্ষেত। শশা, পুঁইশাক, শিম, লাউয়ের মাচান। কিছু বেগুন আর লঙ্কাঝাড়। চিনুকাকু বললেন, 'এগুলো কার কীর্তি?'

বললাম, 'কালুর।'

'বাঃ! রেশমি, এ থেকে একটা চিন্তা মাথায় আসে না তোমার? ওই কালু এবং তার মতো কোটি-কোটি মানুষের হাত দিয়ে পৃথিবীর একটা চেহারা গড়ে ওঠে। সেই চেহারাকেই আমরা সভ্যতা বলি। কিন্তু ওরা যারা সভ্যতা গড়ে, তারা কতটুকু পায়? ধর, তোমাদের এই বাড়িটা...'

ওঁর কথার ওপর বললাম, 'বাড়িটা দাদুসায়েব করেছিলেন।'

'এই তো! তুমি ভীষণ ভুল করলে।'

'কী ভুল?'

'বাড়িটা তৈরি করেছিল আসলে রাজমিস্ত্রিরা, মজুরেরা। ইট আর যে সব জিনিস দরকার, তাও তৈরি করেছিল তারাই। তোমার দাদুসায়েব নন।'

'কিন্তু দাদুসায়েবের টাকা...'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে চিনুকাকা বললেন, 'টাকাকে হুকুম করলে টাকা কোনও বাড়ি বানাতে পারে না। মানুষ পারে। এখানেই এসে যাচ্ছে মানুষে-মানুষে একটা সম্পর্কের কথা। একজন মানুষ হুকুম করে আর অজস্র মানুষ সেই হুকুম পালন করে। এটা একটা অদ্ভুত সম্পর্ক নয়?'

চুপ করে থাকলাম। চিনুকাকু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তারপর বাগানের বেড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। আস্তে বললেন, 'তোমার সব চেয়ে প্রিয় ঋতু কী?'

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'বর্ষা।'

'বোঝা যাচ্ছে তুমি অন্তর্মুখী মেয়ে।'

'কে জানে আমি কী।'

'নিজেকে জানবার বোঝবার চেষ্টা করা উচিত। তোমার বয়স কত? নাহ্, থাক্, শুনেছি, বয়স জানতে চাইলে মেয়েরা রেগে যায়।'

চিনুকাকুর মুখে কৌতুক ঝলমল করছিল। বললাম, 'দোসরা আশ্বিন একুশ পেরিয়েছিল।'

'এবার বুঝলাম তুমি শক্ত মনের মেয়ে। অকপট, স্পষ্টভাষী।'

একটু হেসে বললাম, 'মা উল্টো কথা বলেন। আমি খুব ছিচকাঁদুনি।'

'তুমি খুব কাঁদো-টাদো নাকি?'

আমি হাসছিলাম। কথাটার জবাব দিলাম না। বললাম, 'আপনার প্রিয় ঋতু নেই?'

'বাঃ! এই তো তুমি প্রশ্ন করতে পারছ! আমার প্রিয় ঋতু শরৎ। কাজেই আমি বহির্মুখী মনের মানুষ। তোমার একেবারেই উল্টো।'

এই সময় কালুর মা এল দুধ দুইতে। তার মাথায় ঘোমটা। সে ডাকল, 'অ রেশমি! একবারটি এদিকে আসবে? বাছুরটাকে একটু ধরতে হবে।'

বললাম, 'কেন? বাছুর তো বাঁধা আছে।'

কালুর মা হাসল। 'বড্ড শয়তান। আমি দুধ দুইতে বসলেই খুঁটি ওপড়াবে। হারামজাদার গায়ে যা জোর।'

অন্য দিন মা বাছুরটার দুই কান ধরে গাইগরুটাকে আড়াল করে থাকেন। লক্ষ করেছি, বাছুরটা ভীষণ ছটফট করে। চিনুকাকু আছেন বলেই হয়ত মা আসছেন না। চিনুকাকুকে বললাম, 'চলুন, ঘরে গিয়ে বসবেন। রোদে ঘেমে গেছেন। আজ একটুও বাতাস নেই।'

চিনুকাকু ঘুরে পা বাড়ালেন। বললেন, 'চল, তোমার ঘরটা দেখি। আপত্তি নেই তো?'

'কিসের আপত্তি।'

'আসুন!'

একটু হেসে চাপা স্বরে ফের বললাম, 'আপনি আছেন বলে মা বাছুর ধরতে আসছেন না।' চিনুকাকু চমকে ওঠা গলায় বললেন, 'আমার ভুল হয়ে গেছে। সব পরিবারেরই কিছু প্রাইভেসি থাকে। বিশেষ করে মুসলিম পরিবারে। আমার বেশ খানিকটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'

'কিচ্ছু হয়নি।' বলে ট্রেটা কাঞ্চনতলা থেকে নিয়ে এলাম। চিনুকাকু ততক্ষণে খিড়কির দরজায় পৌঁছে গেছেন। হঠাৎ লক্ষ করলাম, মা ছিটকে সরে গেলেন দরজার আড়াল থেকে। বাড়ি ঢুকে বারান্দায় থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা মায়ের উদ্দেশে বললাম, 'তোমার একটা বোরখা আছে মা! মনে পড়ছে? সেইটে পরে এস।'

চিনুকাকু বললেন, 'ছিঃ রেশমি!'

বললাম, 'আমার ঘরে চলুন। আমি ট্রে-ফ্রে রেখে আসি।'

বুঝতে পারছিলাম, মা খুব চটে গেছেন আমার ওপরে। কিন্তু কেন যেন আমি এতকাল পরে নিজেদের সংসারের কিছু-কিছু দোষত্রুটি খুঁজে বের করতে পারছি। অনেক প্রশ্ন মনের ভেতর গভীর জলের মাছের মত ঘাই মারছে।

রান্নাঘরের বারান্দার মেঝেয় বসে কালু রোজকার মত পান্তা খাচ্ছিল। আমাকে দেখে হাসল। বললাম, 'হঠাৎ হাসির কী হল? শোন, তোমার ছিপটা চাই। কাকু বিকেলে ঝিলে মাছ ধরবেন। বড়শিতে টোপ লাগবে। টোপ চাই। এসব দিয়ে তবে তুমি যেখানে যাবে, যেও।'

কালু বাঁ হাতে মাথা চুলকে বলল, 'সমিস্যে।'

'কী সমিস্যে তোমার? সব সময় খালি খালি সমিস্যে আর সমিস্যে!'

'না গো। সায়েব বলে গেলেন, পীরপুকুরে জেলে ডেকে মাছ ধরতে। ঘরে মেহমান।'

'বেশ তো। কিন্তু আমার ছিপ আর টোপ চাই।'

কালু ফের বলল, 'সমিস্যে।'

ধমক দিয়ে বললাম, 'উঃ! তোমাকে নিয়ে পারা যায় না কালুচাচা!'

কালু ফিক করে হাসল। 'ঝিলে ট্যাংরা পুঁটি কী টোপ খায় জান তো? কেঁচো।'

ভড়কে গিয়ে বললাম, 'ছি ছি! কেঁচো দিয়ে তুমি মাছ ধর। সেই মাছ আমাকেও খাইয়েছ? তুমি ময়দার টোপ তৈরি করে দেবে।'

কালু জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'খাবেই না। ঝিলের মাছ কি বাবুভদ্দলোক ভাবছ? আমার মত চাষাভুষো।' সে হাসল। 'মেহমানবাবুকে জিগ্যেস করে এস দিকি, কেঁচো ঘাঁটতে পারবেন নাকি।'

উঁচু বারান্দা থেকে প্রায় লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে আছাড় খাচ্ছিলাম। সামলে নিলাম। আমার ঘরে গিয়ে দেখি, চিনুকাকু দেয়ালে টাঙানো পবিত্র কাবা মসজিদের ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'ছবিটা থ্রি ডাইমেনশন্যাল। কোথায় কিনেছ?'

'বলছি। তার আগে বলুন, কেঁচোর টোপ দিয়ে মাছ ধরবেন নাকি। কালুচাচা বলল, কেঁচোর টোপ ছাড়া ঝিলের মাছ বড়শি ছোঁবে না।'

চিনুকাকু হাসলেন। 'তুমি নেই-পায়ের গল্পটা জান। হাতে-কেঁচোর গল্পটা জানো না। একবার একটা গ্রামে আন্ডারগ্রাউন্ডে আছি। হঠাৎ খবর পেলাম, পুলিশ আসছে। বাড়ির পেছনে একটা পুকুর। বেরিয়ে দেখি, এখানে-ওখানে কয়েকজন লোক ছিপ ফেলে বসে আছে। একজনের ছিপের কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। লোকটা আমাকে চিনত—আমাদেরই একজন সিম্প্যাথাইজার। তার ছিপটা নিলাম। সে হকচকিয়ে গিয়েছিলে। শুধু বললাম, পুলিশ। অমনি সে তার ময়লা গামছাটা আমার মাথায় জড়াতে বলল। তারপর বললে, আমি দেখে আসি। আপনি শুধু ফাতনার দিকে লক্ষ রাখবেন।'

'পুলিশ এল?'

'হুঁ। দূর থেকে দেখল, আমি তখন বড়শিতে কেঁচো গাঁথছি। মজাটা হল, কেঁচোঘাঁটা লোক, পুলিশের মতে, বিপ্লবী হতে পারে না।'

'কিন্তু আমার যে কেঁচো দেখলে ভয় করে।'

'যখন কেঁচো গাঁথব, তুমি মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে থাকবে।' বলে চিনুকাকা আবার কাবার ছবিটার দিকে তাকালেন। 'ছবিটা কিসের আমি জানি। বোঝা যাচ্ছে, ধর্ম সম্পর্কে তোমার একই দ্বৈত মানসিকতা থেকে গেছে।'

দরজায় গিয়ে কালুর উদ্দেশে বললাম, 'কালুচাচা, কেঁচোর টোপ।'

সে ঘাড় নাড়ল। ভেতরে এসে বললাম, 'ছবিটা আমার ফুফুজি—মানে পিসিমার উপহার। তিনি মক্কায় ফুফাজি—মানে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে হজ করে হাজিবিবি হয়েছেন।'

'তোমার মধ্যে যথেষ্ট ধর্মভাব নেই, এটা সম্ভবত ওঁর চোখে পড়েছিল। তাই না?'

হেসে ফেলাম। 'আমি বাড়ির নিরিবিলি দিকটায় থাকি এবং বাইরে নেচারে গিজগিজ করছে ভূতপেত্নী জিনপরি। ঘরে এই ছবিটা থাকলে আমি নাকি নিরাপদ।'

চিনুকাকু ঘরের ভেতরটা দেখতে দেখতে বললেন, 'নিজের ঘর সম্পর্কে তুমি অমনোযোগী। একটু এদিক-ওদিক করে সাজালে ঘরটার সৌন্দর্য বেরিয়ে আসবে। বইগুলো গুছিয়ে রাখো না কেন? ওটা রেকর্ডপ্লেয়ার? এখানে রাখবে। আলনাটা এলোমেলো কাপড়ে বিশ্রী দেখাচ্ছে। সরিয়ে দেয়ালের ওদিকটায় রাখবে। আর দেখ, খাটটা উত্তর-দক্ষিণ করে পেতে নিও। তাহলে দক্ষিণে ড্রেসিং টেবিলটা রাখার স্পেস পাবে। আয়না দক্ষিণে রাখলে প্রতিবিম্ব বেশি স্পষ্ট হয়। সিলিং ফ্যানের নিচে শুতে নেই। একটু দূরত্ব চাই। শুভস্য শীঘ্রম। তুমি তোমার কালুচাচাকে ডাকো।'

বিব্রতভাবে বললাম, 'ওকে এখনই বেরোতে হবে। বরং অন্য এক সময়....'

চিনুকাকু একটা চেয়ারে বসলেন। ক্লান্তভাবে বললেন, 'বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। ভেতরটা ওরা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। তুমিও বস। এবার তোমার কথা বলার পালা। আমি শ্রোতা।'

বাইরে থেকে কালুর মা বলল, 'অ রেশমি! এত বেলা হয়ে গেল। মেহমানের নাস্তা দেবে না?'

টেবিলঘড়ির দিকে তাকিয়ে চিনুকাকু বললেন, 'মোটে সাড়ে সাতটা। নাস্তা-টাস্তা একটু পরে খাওয়া যাবে। আর শোন, তোমার মায়ের কাছে পারমিশন নিয়ে এস। বাথরুমে একটু সময় নেব। জামাকাপড়গুলো কাচা দরকার।'

'ভাববেন না। কালুর মা কেচে দেবে'খন।'

জিভ কেটে মাথা দোলালেন চিনুকাকা। 'না, না। আমার নিজের কাজ নিজে করা আমার স্বভাব। ভেব না আমি অকর্মা। সব পারি। রান্নাবান্না—এভরিথিং আমি নিজে করি।'

'কেন? কাকিমা....'

চিনুকাকু সেই শিশুহাসি হেসে বললেন, 'এটা নেই-কাকিমার গল্প হয়ে আছে। তোমার কোনও কাকিমা-টাকিমা নেই। কী করে থাকবে? বিয়ে করব, না সমাজ বদলানোর লড়াই করব? পেছনে দায়দায়িত্ব সংসারের বোঝা একটা পিছুটানে টেনে রাখে মানুষকে। গতি ব্যাহত হয়। আমি একজন একলা মানুষ। ছোট্ট একটা মাটির ঘর আছে। বাবা ভাগ্যিস বুদ্ধি করে করোগেট শিট চাপিয়েছিলেন। তাই মাথার ওপর শক্ত আচ্ছাদন আছে। ঘরে চুরি করার মত কোনও জিনিস নেই। থাকলেও চোরেরা নিত বলে মনে করি না। চোরেরা জানত যাতে তাদের আর চুরি করে খেতে না হয়, সে জন্য আমি লড়ছি। মানুষ তো! ওরাও বুঝে গেছে সবকিছু।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার বুক থেকে একটা যন্ত্রণা ঠেলে আসছিল। বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। ঝাঁঝরা শরীর। ডেডবডি। ভাগাড়। এবার একটা কথা তার পাশে বসল, একলা মানুষ...

বাবা এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ছাড়া জীবনে কোনও বাইরের পুরুষমানুষকে আমি এ বাড়িতে এত কাছে থেকে খুঁটিয়ে দেখিনি। দেখতেও ইচ্ছে করেনি। তা ছাড়া হয়ত তাদের মধ্যে খুঁটিয়ে দেখার বা বোঝবার মত কিছু ছিল না। হোন না বাবার বন্ধু, এই প্রথম একজন বাইরের পুরুষ মানুষের খুব কাছে চলে এসেছি এবং সেই পুরুষমানুষটি একেবারে অন্য ধরনের মানুষ।

অত্যন্ত নতুন মানুষ তো বটেই, উপরন্তু রহস্যময়। তাঁর জীবনটাই অন্যরকমের। তার চেয়ে বড় কথা, তিনি মুসলিম নন, হিন্দু! অবশ্য হিন্দু-মুসলিম নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। বৃক্ষলতা, চাঁদ-সূর্য, কিংবা অন্যান্য সমস্ত কিছুর মত হিন্দু-মুসলিম ব্যাপারটা আমার কাছে স্বাভাবিকই ছিল। আমার ছাত্রী জীবনের বন্ধুদের অনেকেই হিন্দু। তাদের বাড়িতেও কতবার গেছি। কিন্তু ধর্মের প্রশ্ন কখনও মনে আসেনি। কখনও তাদের কেউ-কেউ ঠাট্টার ছলে বলত, 'তোরা গরু খাস কেন রে?' কখনও হেসে উড়িয়ে দিতাম। কখনও চটে গিয়ে বলতাম, 'খাই তো খাই। বেশ করি।' বাবা বলতেন, 'এদেশে এই একটা অদ্ভুত ঘটনা। চার ঠেঙে একটি প্রাণীকে কেন্দ্র করে দু'ঠেঙে মানুষদের মধ্যে মামলা। প্রব্লেম হল, এ মামলায় বাদী-বিবাদী দুই পক্ষের উকিল আছে, কিন্তু কোনও হাকিম নেই। খোদা-ভগবানকে যদি হাকিম ধরি, তিনি তো সাত আসমান ওপরে। দুনিয়ার মামলার বিচার আসমানে হবে কী করে?'

হিন্দুত্ব নামে একটা ব্যাপার আবছা মনে ভেসে আসত। পুজো, ঢাকঢোল, মাইকের বাজনা মিলেমিশে একটা দূরত্ব কখনও-কখনও অনুভব করতাম। চিনুকাকুকে হাতের কাছে পেয়ে সেই দূরত্বটা বুঝতে যদি বা চাইলাম, অন্য এক দূরত্ব সেটা মুছে দিল। এই দূরত্বটা রহস্যের অন্ধকারে ভরা। সে দিকে যত পা বাড়াচ্ছি, গা ছমছম করছে। অথচ কী এক জেদ মাথায় চড়ে বসেছে। অন্ধকার ঠেলে এগিয়ে যেতে হবেই, খুব কাছাকাছি এবং মুখোমুখি।

সেদিন দুপুরে চিনুকাকু নিজের কাপড়চোপড় নিজেই কাচলেন। শুধু কিছু ওয়াশিং পাউডার আর জলটা আমাদের। টিউবেলের হাতল টিপে জলটা দিচ্ছিলাম। বাথরুমের কোনও ছাদ নেই। এক কোনায় উঁচুতে স্যানিটারি ল্যাট্রিন। ওঁর কাপড় কাচার কাচার ভঙ্গি খুঁটিয়ে দেখছিলাম। কোনও কথা বলছিলেন না। মনে হল উনি সব কাজই খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করেন। একটুও হেলাফেলা করার যেন ইচ্ছা নেই। কাচা হয়ে গেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই আমার দিকে তাকালেন। একটু হেসে বললেন, 'টিউবেলের হাতল ধরার অভ্যাস তোমার নেই। তোমার হাতের তালু লাল হয়ে গেছে। প্রচুর ঘেমেছ। তোমাকে এই কষ্টটা কিন্তু ইচ্ছে করেই দিয়েছি।'

বললাম,'ভ্যাট্! আমার কিচ্ছু কষ্ট হয়নি!'

'সত্যি কথাটা স্বীকার কর রেশমি! তোমাকে বাড়ির কোনও কাজই করতে দেওয়া হয় না। ঠিক বলছি?'

আস্তে বললাম, 'দিলেও আমি করি না।'

'কেন কর না?'

'আমার ভাল লাগে না।'

'দেখ, কাজ—মানে, শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করলে এই পৃথিবীর অনেকগুলো ব্যাপার জানা হয়ে যায়। শ্রম—মেহনত মানুষকে শক্তিশালীও করে। তুমি, আমি, আমরা সবাই অসংখ্য-অসংখ্য মেহনতি মানুষের শ্রম ভোগ করি। যখন আমি জামা গায়ে দিই, আমার মনে পড়ে যায় তুলোচাষীর কথা। যারা সুতো তৈরি করে, যারা কাপড় বোনে, সেই কাপড় বয়ে নিয়ে যায় যারা... তুমি এই খেই ধরে এগোলে দেখবে কত রকম মেহনতি মানুষের কতরকম কাজের ফলাফল তুমি ভোগ করছ।'

'ওগুলো দিন। তারে মেলে দিই গে!'

'দাও।' চিনুকাকু হাসতে হাসতে বললেন। 'তোমাকে আমি শ্রমিক বানিয়ে তবে যাব। আগে শুরু করব ফুলবাগান দিয়ে। যদি বেঁচেবর্তে থাকি, পরে কোনও সময় এসে যেন দেখি, তোমার হাতে গড়া ফুলবাগান ঝলমল করছে!'

কাচা কাপড়গুলো নিয়ে বললাম, 'আপনি চান করে নিন!'

'কেন? গোসল করলে তোমার আপত্তি আছে?

হঠাৎ একটু লজ্জা পেলাম। বাড়িতে আমি তো গোসলই বলি। তা হলে দেখছি, ধর্মীয় দূরত্বটা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিচ্ছে। পরস্পর দু'জনেই এর জন্য দায়ী। উনিই বা গোসল বলবেন কেন? মুসলিমবাড়িতে আছেন বলেই তো!

জবাবটা তখনই দিলাম না। উঠোনের তারে ধুতি পাঞ্জাবি পাজামা গেঞ্জি মেলে দেওয়ার পর ঘুরে দেখি মা গম্ভীর মুখে রান্নাঘরের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে গিয়ে বললাম, 'কাকুর খাওয়া রেডি কর।'

মা চাপা স্বরে বললেন, 'করছি। কিন্তু তুই বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছিল বাবা। রহিম ডাক্তারের বিবি এসেছিল। ওকে তো জানিস। বাড়িতে কে মেহমান এসেছে, রেশমি কার সঙ্গে কথা বলছে... কালুর মাকে কী বলব? বলে দিল, হিঁদু, মেহমান এসেছে। ডাক্তারের বিবি চোখ কপালে তুলে বলে কি, যোয়ান মেয়ে গোসলখানার ভেতর পরপুরুষের সঙ্গে বাতচিত করছে, এটা ঠিক নয়। কলেজে পাস দিয়েছে বলেই কি...'

খাপ্পা হয়ে বললাম, 'আমি শুনলে জুতো মারতাম ওর মুখে।'

'ছি ছি! তুই কী বলছিস? লজ্জাশরম থাকতে নেই, শিক্ষিত হয়েছিস বলে?' মা বিরক্ত হয়ে বললেন। ডাক্তারের বিবি তোকে আপন বেটির মত ভালবাসে। আদবকায়দাও ভুলে গেলি?'

'আদবকায়দা শেখাতে এস না আমাকে। গুরুজন হয়ে ওর আদবকায়দা থাকতে নেই? এ কী অদ্ভুত কথাবার্তা!'

রাগে আমার চোখে জল এসে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। বাথরুম থেকে জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে টিউবেলের হাতলের শব্দ। হঠাৎ মন হল, চিনুকাকুর স্নান করার মধ্যে কী একটা ছটফটানি আছে, অথবা আমার মনের ভুল। ফ্যানটা ফুল ফোর্সে চালিয়ে দিলাম। খাটে পা ঝুলিয়ে বসে রইলাম। রহিম ডাক্তারের বউ জরিনা বেগমকে সামনে দাঁড় করিয়ে বারবার মনে মনে বললাম, 'বেশ করেছি। আরও করব। তোমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে করব।'

একটু পরে চিনুকাকার ডাক শুনলাম, 'রেশমি! অল ক্লিয়ার। মাকে বল, বাথরুমের দখল ছেড়ে দিয়েছি।'

বেরিয়ে গিয়ে দেখলাম চিনুকাকু বাবার লুঙ্গি পরে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর উনি সামনেকার তারে ভিজে তোয়ালে মেলে দিতেই চমকে উঠলাম। শক্ত কাঠামোর শরীরে এখানে-

ওখানে দাগড়া-দাগড়া কয়েকটা ক্ষতচিহ্ন। আমি চুপচাপ তাকিয়ে আছি দেখে বললেন, 'যাও। স্নান করে নাও। আজ আমাদের ঝিলে ছিপ ফেরার প্রোগাম। খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নিয়েই শিকারে বেরুব।'

রান্নাঘরের বারান্দার ডাইনিং টেবিলে সবুজ প্ল্যাস্টিকেব 'সরপোসে' সম্ভবত চিনুকাকুর খাবার ঢাকা। ছোটবেলা দেখেছি সরপোসগুলো খেজুর পাতা জড়ানো নরম কাশের বেড় দিয়ে তৈরি হত। তিনকোনা গড়ন এবং মাথায় একটা খোঁপাব মত ঝুঁটি। আজকাল প্ল্যাস্টিকের সরপোস হয়েছে। কিন্তু আমার যে ইচ্ছে ছিল, চিনুকাকুর সঙ্গে বসে খাব।

মা বারান্দা থেকে চাপা স্বরে বললেন, 'রেশমি, তোর কাকাবাবুর খানা রেডি।'

চিনুকাকু হেসে উঠলেন। 'ভাবিজি রেশমির থ্রু দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছেন! না ভাবিজি! আপনি না ডাকলে আমি খেতে যাব না।'

মা তেমনি আস্তে বললেন, 'আসুন।'

'তৌবা, তৌবা! খালি গায়ে খান্দানি মহিলাদের সামনে বসে কি খাওয়া যায়?' বলে আমার দিকে ঘুরলেন চিনুকাকু। 'রেশমি, ততক্ষণ তুমি গোসল করে নাও। আমরা একসঙ্গে খাব। ভাবিজিকেও সঙ্গে ডাকতাম। কিন্তু ওঁর ঘোমটা একটা বড় বাধা। রেশমি! দেরি কোরো না।'

মা প্রায় আর্তনাদের সুরে বললেন, 'রেশমি দেরি করে খায়। আপনি খেয়ে নিন।'

চিনুকাকু নিশ্চয় একটা কিছু আঁচ করলেন। ওঁর হাতে এখন ছড়িটি নেই। খোঁড়া পায়ে আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে দলিজঘরের দিকে চলে গেলেন। লক্ষ করলাম, থামগুলোতে হাত রেখে হাঁটছিলেন। আবছা ভাবে মনে হল, মানুষটি বড় অসহায়। আর, ওই ভঙ্গিতে চলে যাওয়ার মধ্যে একলা মনুষের একটি ছবিও আঁকা হয়ে গেল।

সাবান, তোয়ালে এবং ইদে কেনা সেই আসমানি নীল সিল্কের শাড়িটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। দরজাটা ইচ্ছে করেই জোরে বন্ধ করলাম। যেন বাড়িটা থরথর করে করে কেঁপে উঠল।..

হয় তো জলের একটা গোপন শক্তি আছে, যা শুধু শরীরের নয়, মনের উষ্ণতাকে ধুয়ে ফেলতে পারে। সেদিন উজ্জ্বল রোদের জল দুপুরে আমার অভিমান ধুয়ে দিয়েছিল। একটু পরেই মনে হয়েছিল, নিজের বিদ্রোহের ইচ্ছা দিয়ে মায়ের কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা ঢেকে ফেলছি। এটা অন্যায় হচ্ছে না কি? এই যে আমার পর্দানসিনা, খান্দানি গর্বে সবসময় গর্বিতা মা বাবার একজন হিন্দু বন্ধুকে বাবার অনুপস্থিতিতে রান্নাঘরের বারান্দায় খেতে ডেকেছেন, এ তো একটা বড় ঘটনা আমাদের পরিবারে! মা তো চিনুকাকুর খাবার দলিজঘরে পাঠিয়ে দিতে পারতেন এবং সেটাই চিরাচরিত প্রথা মুসলিম সমাজে। বাবার সাহচর্যে মা দিনে দিনে এক-পা-দু-পা করে শরিয়তি নিয়মকানুন ভাঙতে পেরেছেন, এতদিন আমার সেটা লক্ষ করা উচিত ছিল।

মায়ের ওপর অভিমানটুকু চলে গেল। সেদিন দুপুরে অনেকটা সময় নিয়েই স্নান করলাম। কতক্ষণ পরে বাথরুমের দরজার বাইরে মায়ের সাড়া পেলাম। 'অ রেশমি! রেশমি!'

বললাম, 'যাচ্ছি আম্মি!'

কথাটা বলেই একটু চমকে উঠলাম। মাকে আমি ছোটবেলার মত 'আম্মি' বলছি! বাবাকে 'আব্বু' বললেও মাকে 'আম্মি'র বদলে মা বলতে শুরু করেছিলাম কবে, মনে পড়ে না। সম্ভবত কলেজ-জীবনের শুরু থেকে এবং আমার সহপাঠিনী হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গ গুণেই।

অথচ বাবাকে তো আব্বু বলি! বাবা বললেই যেন একটা কিছু উল্টোপাল্টা ঘটে যাবে। অথবা বাবা কথা কৃত্রিম শোনাবে, একটা দূরত্ব সৃষ্টি হবে কি? পরে অনেক চিন্তাভাবনা করে মনে হয়েছিল, বাবা আমার যতখানি কাছের মানুষ, মা যেন ততখানি নন। মায়ের জীবন আর আচার-আচরণের সঙ্গে আমার অনেক তফাত। তাঁর চিন্তাভাবনা রুচি বাবা আশা-আকাঙক্ষার সঙ্গে আমার কোনও মিল নেই। এতদিন ধরে মাকে যেন আমার প্রতিপক্ষ ভেবে এসেছি।

মায়ের গলার স্বরে কাকুতি ছিল। 'অতক্ষণ ধরে পানি ঘাঁটতে নেই, বাবা। সিজন চেঞ্জের সময়।'

সেই 'সিজন চেঞ্জ' আমাকে হাসিয়ে ছাড়ল। কথাটা বাবার প্রতিধ্বনি। আসমানি নীল শাড়ি যেমন-তেমন করে পরে নিয়ে দরজা খুললাম। মায়ের মুখে বিব্রত ভাব লক্ষ করলাম। বললেন, 'মাঝে মাঝে তুই বড্ড ভয় পাইয়ে দিস, বাবা!

অবাক হয়ে বললাম, 'কিসের ভয়?'

মা প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে ক্লান্তভাবে একটু হাসলেন। 'চল্, বেলা গড়িয়ে গেছে। আজ আমার গোসল করতে ইচ্ছে করছে না। তবিয়ত ঠিক নেই। মায়ে-ঝিয়ে একসঙ্গে খাব।'

'কাকুর খাওয়া হয়ে গেছে আম্মি?'

'কতক্ষণ।' মা ফিসফিসিয়ে বললেন, 'মানুষটা বড় দুখি রে! এই দিন-দুনিয়ায় এই করে মানুষের বেঁচে থাকতে আছে? কত কথা বললেন। যেন মায়ের পেটের ভাই। এমন হিঁদু, মানুষ আছে, ভাবিনি।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'হিঁদু-মানুষ বুঝি মানুষ নয়!'

৩

বিলের ধারে আশ্বিনের সেই আশ্চর্য সুন্দর বিকেলটা যে আসলে আমারই নিয়তির পেতে রাখা ফাঁদ, এটা বুঝতে আমার অনেক দেরি হয়েছিল। কিন্তু এও তো ঠিক, আমি কাজি মোতাহার হোসেনের মেয়ে না হয়ে রহিম ডাক্তারের মেয়ে বেবি হলে কখনই ফাঁদে পা দিতাম না। আবছাভাবে টের পেতাম আমার মধ্যে কী একটা ছটফটানি আছে। কারণ কিসের যে একটা শূন্যতা থেকে গেছে আমার জীবনে। মনে হয় না, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতাম মেধাবী ছাত্রী বলে। মেধা নয়, শূন্যতাবোধের ছটফটানি থেকে বাঁচতেই টেক্সটবইয়ের ভেতর আত্মগোপন করতাম! আমি বলব, অভ্যাস। একটা অভ্যাসের শেকলে নিজেকে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে রাখা। তারপর যখনই এই শেকলটার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল, তখন অন্য একটা অভ্যাসের শেকল খুঁজে হন্যে হচ্ছিলাম। সেই কবে শাড়ি ধরার বয়স থেকে মা আমাকে রান্নাবান্না শেখানোর জন্য তাগিদ দিতেন। বলতেন, 'একটা কুটো ভেঙে দুটো করে না গো! এ কী মেয়ে! ঘরকন্নার কাজ এখন থেকে না শিখলে চলে? যতই পাশ দে আর মোটামোটা বই পড়, তুই মেয়ে। যেটা তোর আসল কাজ, সেটা না শিখলে পরে পস্তে কূল পাবি নে।' যদি বা কখনও রান্নাঘরে গেছি, উনুনের তাপ, ভ্যাপসা গরম, লঙ্কার ফোড়নের বিকট ঝাঁঝ, সব মিলিয়ে একটা অসহ্য পরিবেশ। তখনই পালিয়ে এসেছি। ভেবেছি, বছরের পর বছর মাসের পর মাস দিনের পর দিন মা কেমন করে ওর মধ্যে দিব্যি আছেন! কখনও কোনও কারণে রাগ করে মা বলতেন, 'দোজখ! দুনিয়ার দোজখে ঢুকে হাড়মাস ভাজাভাজা হয়ে গেল। ইচ্ছে হয়, লাথি মেরে যেদিকে দুচোখ যায়, পালিয়ে যাই।' কিন্তু তারপরই দেখতাম, একাগ্র নিষ্ঠায় তরকারির নুন চাখছেন। তা হলে মাও একটা অভ্যাসের শেকলে নিজেকে বেঁধে ফেলেছেন। মায়েরও কি কোনও শূন্যতার বোধ এবং ছটফটানি আছে। ঘরকন্নার খাঁচায় ভরা পাখি। আকাশে ডানা মেলতে ইচ্ছে করে নাকি? তবে বাবার কাছে একটা মজার গল্প শুনেছি। একবার মাকে নিয়ে কলকাতা বেড়াতে গিয়েছিলেন। হাওড়া স্টেশনে নেমেই নাকি মা অস্থির। কেঁদেকেটে খালি বলেন, 'ওগো! আমাকে ফেরত নিয়ে চলো। আমার এ হুলস্থুলুস সহ্য হচ্ছে না। এত মানুষ এত গোলমাল.... এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে গো!' বাবা অন্যের কথার ভঙ্গি চমৎকার নকল করতে পারেন। মা চটে গিয়ে বলতেন, 'ঢঙ করো না তো! যার জ্বালা সে বোঝে। মেয়ে হয়ে জন্মালে বুঝতে।' বাবা আমাকে দেখিয়ে বলতেন, 'খান বাহাদুরের মেয়ে আর কাজির মেয়ে। এও তো মেয়ে। হ্যাঁ, তুমি পেটে ধরেছ, তা ঠিক। তবে রেশমি কক্ষনো বলবে না মেয়ে হয়ে জন্মান খারাব। কী রেশমি? বলবি নাকি? কক্ষনো বলবিনে। যাতে ও কথা না বলতে হয়, সেজন্যই তোকে তালিম দিচ্ছি। সেদিন বাঁকামিয়া আমাকে ইসলামের তরিকা বোঝাচ্ছিল। আমি বললাম, ইসলাম বলছে আল্লার চোখে নারী-পুরুষ সমান। কেউ কারও চেয়ে ছোট-বড় নয়। কোরানে মেয়েদের জন্য 'হিজাব' বরাদ্দ। হিজাব মানে বোরখা নয়, পর্দা নয়। সেরফ ওড়না বা ঘোমটা। মিয়া তবু তর্ক করে। বলে কি, আমি নাকি হিঁদুয়ানি শেখাচ্ছি রেশমিকে। সেই যে ফাংশনে রেশমি কবিতা রিশাইট করেছিল, তাতে বড্ড গোনাহ হয়ে গেছে। যোয়ান মেয়ে ডায়াসে উঠে মাইকের সামনে

কবিতা আওড়াচ্ছে, মিয়ার দাড়ি তাতেই পেকে গেছে।' বাবা খুব হাসতেন। মা আস্তে বলতেন, 'চোখ টাটাচ্ছে সবার। টাটাক। মাথার ওপর খোদা আছেন। সব দেখছেন।'

লেখাপড়ার পাট চুকে গেলে আমি বারকয়েক ঘরকন্নায় পা বাড়াতে গিয়েছিলাম। রান্না করতে গিয়ে একদিন পায়ে গরম ডাল পড়েছিল। একদিন হাতে ছ্যাঁকা খেয়েছিলাম। আর একদিন শাড়ির আঁচলে আগুন ধরে পুড়ে মরি আর কী! ভাগ্যিস শাড়িটা সুতির ছিল। সেইদিন থেকে মা আমাকে আর রান্নাঘরে উনুনের ধারে কাছে যেতে দিতেন না। বলতেন, 'দরজার কাছে চেয়ার পেতে বস। বসে দ্যাখ, কেমন করে রাঁধতে হয়। গরম লাগে তো ফ্যানটা চালিয়ে দে।' ভ্যাট! একখানে বসে থাকা যায় না কি? ঘরে গিয়ে রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে পুবের জানালা দিয়ে ঝিল দেখব।

সেই একটা বছরে ছটফটানি তীব্র হয়ে উঠেছিল। তেমন কোনও শেকল খুঁজে পাচ্ছিলাম না যে নিজেকে শক্ত করে বাঁধি। চিনুকাকু আমার ঘরে যে বিশৃঙ্খলা আবিষ্কার করেছিলেন, তা আমার অমনোযোগিতার একটা চেহারা। আত্মস্থ না থাকলে যা হয়। কিছু ভাল লাগে না। সবসময় সেই শূন্যতার বোধটা খচখচ করে বেঁধে। আমার কী যেন নেই, অথচ থাকা উচিত ছিল এবং যা থাকলে আমি আত্মস্থ ও শান্ত হতে পারতাম। আমার হিন্দু বন্ধুরা প্রেম নিয়ে তর্কাতর্কি করত। কখনও সেটা অশ্লীলতার দিকে চলে যেত। তখনই সরে আসতাম। কে কার সঙ্গে প্রেম করছে, কথা শুরু হত এই নিয়ে। প্রেমিক থাকাটা যেন গর্বের ব্যাপার। আর প্রেমিকের যদি মোটরবাইক থাকে, তা হলে তো কথাই নেই। চৈতিকে নাকি তার প্রেমিক মোটরবাইকে চাপিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেয়। তাই চৈতি অমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে। সব কথাতেই ওর 'বোগাস'। কখনও 'আই ডোন্ট বদার'। ভাবতাম এটাই কি প্রেমের শক্তি?

কে জানে আমি ওরকম কিছু চাইছিলাম কি না! অথচ ব্যাপারটা ভাবতেই কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠতাম। সিনেমায় প্রেমট্রেম দেখে মনে হত, ন্যাকামি আর বোকামি। কলেজ পালিয়ে নুন শো বা কখনও ম্যানিটি শো দেখার সুযোগটা সেই একটা বছর আর ছিল না। মায়ের অদ্ভুত স্বভাব। সিনেমা দেখে কিছু বুঝতে পারেন না। কার সঙ্গে যাব সিনেমা দেখতে ছ'মাইল বাসে চেপে? বেবির বিয়ে হয়ে গেছে। স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত আমার সঙ্গে পড়ত সে। গ্রামে আর কোনও বন্ধু নেই আমার।

প্রথম একটা অস্থির সময়ে চিনুকাকুর অতর্কিত আবির্ভাব। আমার চেনাজানা পৃথিবীটা অন্যরকম করে দিয়েছিলেন চিনুকাকু। কী এক অবেচতন বিহ্বলতায় তাঁর কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। তখনও বুঝিনি নিয়তি আমার জন্য একটা ফাঁদ পেতে রেখেছে।...

একটা ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম। ছোট্ট মাটির ভাঁড়ে কেঁচো রেখে গিয়েছিল কালু। ওপরে গুঁড়ো কালচে মাটি। ল্যাট্রিনের পেছনে স্যানিটারি চেম্বার। তার পাশেই আবর্জনার গাদা। কালু ওই নোংরা গাদা থেকে কেঁচো তোলে দেখেছি। একে তো কেঁচো দেখলেই আমার গা শিরশির করে আতঙ্কে তাতে ওই নোংরা মাটি। চিনুকাকু খোঁড়া মানুষ এবং বাড়ির সম্মানিত অতিথি। উনি ওই ভাঁড়টা বয়ে নিয়ে যাবেন ভাবতে খারাপ লাগছিল, ছিপখানা না হয় আমিই নিয়ে গেলাম। কিন্তু কালুর দায়িত্বজ্ঞান আছে বলতে হবে। তার বউকে বলে রেখেছিল। ঠিক সময়ে সে এল। কোলে একটা বাচ্চা। ছিপ, কেঁচোর ভাঁড় আর একটা রঙচটা জীর্ণ সতরঞ্চি গুটিয়ে সে ঝিলের ধারে হিজলতলায় রেখে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রইল। অমনি মনে হল মা কি ওকে পাহারা দিতে পাঠিয়েছেন? বললাম, 'তুমি আবার ঠাকুর সেজে দাঁড়ালে কেন? কাজ নেই তোমার?'

কালুর বউ আসমানি কাঁচুমাচু হেসে বলল, 'বাবুর হাতের পয় দেখব গো!'

'ঝামেলা কর না তো। ভিড় করলে মাছ বড়শি খাবে না। বরং মাকে বল গে চা করতে।'

কালুর এই বউটি একবারে সাদাসিধে মেয়ে। বয়স আমার কাছকাছি বলে মনে হয়। আমার ধমক খেয়ে বিব্রত মুখে বলল, 'বাবুকে বলে দিও পলিতে নামে না যেন। জোঁক কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। সেই ভয়ে তো কেউ ঝিলের পলিতে নামে না।'

'ঠিক আছে। তুমি মাকে চা করতে বলো গে। আমি গিয়ে নিয়ে আসব।'

কালুর বউ চলে গেলে চিনুকাকু বললেন, 'ঠিক তাই ভাবছিলাম। এমন সুন্দর কালো জল। অথচ গ্রামের মানুষ কোথাও ঘাট করেনি কেন? অবশ্য সমস্ত জলটাই দাম আর শালুকে ঢাকা। এখানে একটু ফাঁকা জায়গা। সম্ভবত তোমাদের কালুর কীর্তি। তাই না?'

'হ্যাঁ। ছিপ ফেলার জন্য কালু এখানটা পরিষ্কার করেছে।' একটু হেসে ফের বললাম, 'একটা অদ্ভুত মানুষ।'

চিনুকাকু ছিপ থেকে সুতো খুলতে খুলতে বলতেন, 'কেন অদ্ভুত মানুষ?'

'ওর কোনও ভয় নেই। ঘেন্না নেই। কেঁচো, জোঁক সাপ ..'

আমার কথার ওপর চিনুকাকু বললেন, 'আমাদের দেশের একটা বড় অংশ এখনও প্রিমিটিভ স্তরে থেকে গেছে। এই স্তরে যারা আছে, তাদের প্রিমিটিভ মানুষের মতই সাহসী হতে হয়—নিতান্ত বাধ্য হয়েই। নৈলে তারা মারা পড়বে।'

'কালু কিন্তু নিষ্ঠুর বড্ড।'

'হ্যাঁ। নিষ্ঠুর না হলেও যে চলে না ওদের।'

একটু অবাক হয়ে বললাম, 'জানেন? ওর বউ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। তারপর দিব্যি আরেকটা বউ যোগাড় করে ফেলল।'

চিনুকাকু হাসলেন। 'তাহলে তোমার মতে, বাকি জীবন ওর কেঁদেকেটে কাটানোই উচিত ছিল? দেখ রেশমি, এটা আমাদের মত লেখাপড়া জানা মানুষদের একটা মেকি মূল্যবোধ। আমরা বাস্তব জীবনে কিন্তু সবাই কালুর মত নির্বিকার। অথচ দোকানের বঙচঙে সাইনবোর্ডের মত কিছু মূল্যবোধ মাথার ওপর ঝুলিয়ে রাখি। কালুরা তা রাখে না, এই যা তফাত?'

সাতরঞ্চিটা বিছিয়ে দিতে গেলাম। চিনুকাকু প্রায় হইচই করে বাধা দিলেন। 'ঘাসে বসে ছিপ ফেলার একটা আলাদা মাধুর্য আছে। সারা শরীরে মাটির স্বাদ পাব। তুমি খাবার কথা বলছিলে—আ স্ট্রেঞ্জ ফিলিং! তাই না? আরও দেখ, আমিও এখন কালুর মত নিষ্ঠুর মনুষ। কেঁচোগুলো আর ঝিলের মাছগুলোকে যন্ত্রণা দেব।'

ঘাসে বসে কেঁচোর ভাঁড়ে উনি হাত দিতেই আমার গা ঘিন ঘিন করে উঠল। তফাতে সরে গেলাম। চিনুকাকু তা লক্ষ করে একটু হেসে বললেন, 'ঘৃণা জিনিসটা আসে ভয় থেকে। যাকে তুমি ভয় পাচ্ছ, তার মধ্যে অনেকসময়ই ভয়ের কিছু থাকে না। তাই ভয়কে জয় করতে হলে যাকে ভয়, তাকে খুঁটিয়ে দেখে নিতে হয়, বা জেনে ও বুঝে দিতে হয়। তুমি এদিকে তাকিয়ে থাকা।'

'ভ্যাট! আমার খারাপ লাগছে। কেঁচোগুলো কেমন কিলবিল করে।' চোখ বুজে কাঁধে ঝাঁকুনি দিলাম।'

'লক্ষ কর, রেশমি। ভয়কে জয় কর।'

'না, না!'

'মনে কর, রেশমি। এই ছোট্ট জয় অ আ ক খ শেখার মত। এখন থেকে শুরু করে জীবনের আরও সব ছোট ও বড় ভয়কে জয় করতে হবে।'

চিনুকাকুর কথাগুলো কিংবা কথাবলার ভঙ্গিতে কী একটা ছিল, প্রথমে চোখের কোনা দিয়ে তারপর সামনা সামনি কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাকালাম। ছিপের সুতো জলের ওপর সন্তর্পণে ছড়িয়ে গেল। সাদা ফাতনাটা ভেসে রইল। একটু পরে লাল নীল সাদা শালুক ফুলগুলো যখন দেখছি,তখন চিনুকাকু ছিপে খ্যাঁচ মেরে একটা পুঁটিমাছ তুললেন। অমনি খুশিতে ফেটে পড়লাম। 'অসাধারণ! আমি সত্যিই ভাবতে পারিনি আপনি মাছ ধরতে পারবেন।' বলে ঘাসের ওপর ছটফট করা পুঁটি মাছটার কাছে চলে গেলাম। মাছটা ভালভাবে বড়শিতে বেঁধেনি। তাই একটু তফাতে ছিটকে পড়েছিল। কুড়িয়ে নিলাম।

চিনুকাকু আবার কেঁচো গাঁথতে গাঁথতে বললেন, 'কালুর বউকে তুমি তাড়িয়ে দিলে। সে বাবুর হাতের পয় দেখে যেত। কিন্তু মাছটা কি তুমি হাতে ধরে রাখবে? একটা খালুই দরকার ছিল ।'

'খালুই কী?'

চিনুকাকু অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য তুমি গ্রামে বাস কর। খালুই চেন না?'

কুণ্ঠিতভাব বললাম, 'কথাটা শুনেছি মনে হচ্ছে।'

'আমার মনে হচ্ছে যে-জীবনের মধ্যে তুমি মাথা তুলেছ, তার সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই। তুমি অর্কিডের মত ফুটে আছ।' চিনুকাকু সেই শিশুর হাসি হাসতে লাগলেন।

অর্কিড কথাটি আমাকে আঘাত করেছিল। চিনুকাকু কথাটি বলে ওইরকম হাসি না হাসলে মনটা খারাপ হয়ে যেত। মা-ও অন্য উপমায় একই কথা বলেন আমার সম্পর্কে। বললাম, 'মাকে দেখাই গে মাছটা। মা-ও আমার মত অবাক হয়ে যাবেন।'

'হুঁ। ভাবিজিকে আমার উপহার। বোলো যেন। এবং খালুই।'

'এবং চা।'

বলে আমি প্রায় দৌড়ে গিয়ে বাগানে ঢুকলাম। খিড়কির দরজার কাছে মা দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুখটা একটু গম্ভীর। চাপা স্বরে বললেন, 'মানইজ্জত আর রাখলিনে বাবা! ঘোড়ার মত ছুটছিস—লোকে দেখলে কী বলবে খেয়াল আছে?'

'বয়ে গেল। এই দেখ কত্তো বড় পুঁটিমাছ ধরেছেন কাকু। তোমাকে প্রেজেন্ট করতে পাঠালেন।'

মায়ের মধ্যে কোনও ভাবান্তর ঘটল না। বললেন, 'রেখে দে কোথাও। এমন করে ছুটে আসছে যেন বাঘ শিকার করেছে।'

'বাঘ-ফাঘ বলছ কেন? অদ্ভুত তো!' চটে গিয়ে বললাম। 'চা করেছ?'

'টেবিলে আছে দ্যাখ গে!'

মায়ের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বললাম, 'আমাদের খালুই আছে?'

'কালুর মাকে বলগে।'

'আশ্চর্য।'

রাগ চেপে বাড়ি ঢুকলাম। কালুর মা কিন্তু পুঁটিমাছটা দেখে খুব খুশি হল। বলল, 'ঝিলের মাছের সুন্দর সোয়াদ। কালু কাজের ঠেলায় একদণ্ড সময় পায় না। নৈলে অ্যাদ্দিন মাছের পাহাড় করত।'

মাছের পাহাড় শুনে হেসে ফেললাম। বললাম, 'শিগগির একটা খালুই দাও।'

কালুর মা রান্নাঘরের পেছন দিক থেকে একটা ছোট্ট বাঁশের চুপড়ি এনে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, তাই তো! একেই খালুই বলে আমি জানতাম। কালু এটা নিয়েই ঝিলে মাছ ধরতে যেত দেখেছি। কতকিছু আমার মনে থাকে না ভাবলে নিজের ওপর রাগ হয়। কালুর মা পুঁটিমাছটা খালুইয়ে রেখে বলল, 'প্রেথম পয়ের মাছ ভাই রেশমি। খালুইয়ে থাউক।'

চায়ের ট্রে নিতে গিয়ে দেখি, আমার হাতের তালুতে সরু আঁশ। শুঁকে আঁশটে গন্ধ টের পেলাম। তক্ষুনি বাথরুমে গিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললাম।

মা খিড়কির দরজায় তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। বললাম, 'আমাকে ভূতে ধরবে ভেবে পাহারা দিচ্ছ তো? জোরে-জোরে দোয়া-দরুদ পড়ো। ভূতপেত্নী পালিয়ে যাবে।'

মা কোনও কথা বললেন না...

চিনুকাকু বললেন, 'ভাবিজি কী বললেন রেশমি?'

মিথ্যা করে বললাম, 'খুশি। তবে প্রথম পয়ের মাছ বলে খালুইয়ে রাখতে বললেন।'

'এবার প্রিমিটিভিটি থেকে খানিকটা দূরে সরা যাক। তুমি ওখানে ঘাসের ওপর সতরঞ্চিটা রেখে তার ওপর ট্রে রাখো। নৈলে পোকামাকড় খেতে হবে চায়ের সঙ্গে।'

'আর টোপ খায়নি?'

'প্রচণ্ড খাচ্ছে। ফাতনার অবস্থা দেখছ না? কিন্তু তিন-তিনটে খ্যাঁচ ব্যর্থ।' বলে আমার দিকে ঘুরলেন চিনুকাকু। 'আমার ধারণা তুমি ছিলে না বলেই...'

খ্যাঁচ মেরে আরেকটা পুঁটিমাছ তুললেন চিনুকাকু। তেমনি শিশুহাসি হেসে বললেন, 'তা হলে দেখ, ঠিক বলেছি কিনা। ঝিলের মাছগুলো তোমার পায়ের কাছে মাথা কুটে মরতে চায়।'

লজ্জায় কেঁপে উঠলাম। চায়ের কাপ-প্লেট চিনুকাকুর হাতে দিয়ে দেখলাম, বঁড়শিবেঁধা পুঁটিমাছটা

একটা ঝোপের ডগায় আটকে ছটফট করছে। সাবধানে ঝোপের ডগা থেকে সুতোটা ছাড়িয়ে দিলাম। বললাম, 'ছাড়িয়ে নিন।'

'উঁহু। তুমি ছাড়াও।'

'না, না। কেঁচো লেগে আছে।'

'রেশমি ভয়কে জয় কর।'

চাপা ভরাট কণ্ঠস্বর চিনুকাকুর। এমন কণ্ঠস্বর কখনও শুনিনি। মরিয়া হয়ে একটানে পুঁটিমাছটা ছাড়িয়ে নিলাম। মাছটার মুখের সবটাই উপড়ে বঁড়শিতে আটকে রইল। সেটা খালুইয়ে রেখে দেখলাম, চিনুকাকু কেমন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। অস্বস্তি হচ্ছিল। ঝিলের ওপর ঘন বাঁশবন। বিকেলের আলোয় কোমল দেখাচ্ছিল। একটা জলটুঙ্গি ঝোপঝাড়ে ঢাকা। বনচড়ুইয়ের ঝাঁক সবে সেখানে বসল। টুকরো টুকরো নিসর্গের ছবি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আমার চেতনা অস্বস্তিটা এড়িয়ে যেতে চাইছিল। একটু পরে চিনুকাকু বললেন, 'তুমি স্ট্রেঞ্জ ফিলিংসের কথা বলছিলে। হয়ত সেটাই। তোমাকে দেখে ভাবছিলাম, স্বপ্ন দেখছি কি না। কারণ জীবনে এ একটা ভারি নতুন রকমের অভিজ্ঞতা।'

আমি কোনও কথা বললাম না। চোখের কোনা দিয়ে দেখলাম, চিনুকাকু চা খাচ্ছেন। ছিপটা ঘাসের ওপর রাখা আছে। ওঁর দৃষ্টি এখনও আমার দিকে।

'তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন? হঠাৎ নিষ্প্রাণ পুতুল! কথা বল, রেশমি!'

'কী কথা বলব?'

'তোমার ফিলিংসের কথা।'

'আপনি আর ছিপ ফেলবেন না?'

'এবার তুমি ফেল বরং।'

'আমি কখনও ছিপ ফেলিনি।'

'জীবনে কখনও যা করোনি, মাঝে মাঝে করে দেখা দরকার, রেশমি! এস!'

'কেঁচো গাঁথতে পারব না। আপনি গেঁথে দিন।'

চিনুকাকু চায়ের কাপ রেখে সরু বঁড়শিতে কেঁচো গেঁথে দিলেন। ছিপটা হাতের মুঠোয় ধরতে মনে হল, সাংঘাতিক একটা কাজ করতে যাচ্ছি। শালুকপাতাগুলো এড়িয়ে ফাঁকা জায়গায় বঁড়শিটা ফেলা সত্যি কঠিন। চিনুকাকু হাসছিলেন। মাথায় জেদ চাপল। চারবারের বার বঁড়শিটা ঠিক জায়গায় ফেলতে পারলাম। একটা লাল গঙ্গাফড়িং ফাতনার ওপর উড়ে-উড়ে নাচতে থাকল। চিনুকাকু সকৌতুকে বললেন, 'কী অদ্ভুত পক্ষপাতিত্ব! গঙ্গাফড়িংটা তোমাকে নাচ দেখাতে এল, লক্ষ করছ? সবাই সৌন্দর্যকে ভালবাসে। বুঝতে পারছ তো?'

কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মনে একটা সংশয় ছায়া ফলল। চিনু সামন্ত তাঁর বন্ধুর মেয়েকে নিরিবিলি ঝিলের ধারে এ ধরনের কথা বলছেন, এটা কি কোনও সুযোগ নেওয়া? ওঁর আমি কতটুকু জানি? হঠাৎ আমি শক্ত হয়ে গেলাম। আস্তে বললাম, 'এসব কথা আমার ভাল লাগে না।'

'কীসব কথা?'

'সৌন্দর্য-টর্য।'

'অসাধারণ রেশমি! এই তো চাই।'

একটু অবাক হয়ে ঘুরলাম ওঁর দিকে। 'কী?'

'সাহস। স্পষ্টভাষিতা। নিজের পছন্দ-অপছন্দের কথা জোর গলায় বলা।'

হেসে ফেললাম। 'আপনি কি আমার সাহসের পরীক্ষা নিতে এসেছেন এখানে?'

'রেশমি! ফাতনা ডুবে গেছে।'

হকচকিয়ে ছিপটা জোরে তুলতেই বড়শি সমেত সুতো পেছন হিজলের ডালপালার ভেতর আটকে গেল। চিনুকাকু উঠে গিয়ে তাঁর ছড়ির ডগা দিয়ে অনেক চেষ্টার পর বড়শিটা ছাড়ালেন। বিরক্ত হয়ে ছিপটা ফেলে দিলাম ঘাসের ওপর। বললাম, 'আমি পারব না। আপনি ফেলুন। আমি দেখি।'

চিনুকাকু বললেন, 'ছোটখাটো ব্যাপারে মানুষের স্বভাব ধরা পড়ে। তোমার সাহস আর শক্তি আছ। ধৈর্য নেই। ধৈর্যের অভাব মানুষকে হঠকারী করে ফেলে।' বড়শিতে কেঁচো গেঁথে জলে ফেলার পর ফের আপনমনে বললেন, 'হঠকারিতা অনেক সময় মারাত্মক হয়ে ওঠে। আমার ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে।' ঝিলের জলে দিনশেষের উজ্জ্বল ধূসরতা। ওপরে বাঁশবনে পাখিদের চ্যাঁচামেচি কানে এল এতক্ষণে। ঝিমঝিম একটা আচ্ছন্নতা চারদিকে ঘিরে ধরেছে। চিনুকাকু কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন ফাতনার দিকে। ফাতনাটা নাচানাচি করছিল। লাল গঙ্গাফড়িংটা একটু তফাতে শালুকফুল ছুঁয়ে ছবি হয়েছে। জলের ওপর আঁচড় কেটে বেড়াচ্ছে জলমাকড়সা। হঠাৎ মনে হল, ঝিলের ধারে একটা সুন্দর বিকেল অকারণ ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। হিজল গাছটার দিকে ঘুরতেই আমার খোঁপায় টান পড়ল। চিনুকাকা বললেন, 'সর্বনাশ। রেশমি।' চমকটা সামলে নিলাম। বুঝলাম, বড়শিটা আমার খোঁপায় এসে বিঁধেছে। ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম। পারলাম না। তখন চিনুকাকু উঠে এসে ছাড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'কী কাণ্ড! জোর বেঁচে গেছ। ছি ছি! আমারই ভুল। তুমি বাঁদিকে আছ, খেয়াল ছিল না।'

খোঁপা ঠিকঠাক করে নিলাম। আমার শরীর কাঁপছিল। উরু ভাবি মনে হচ্ছিল। কেউ দেখে ফেলল কি?

'তুমি আমার ডাইনে থাক। লাগেনি তো?'

'নাহ্'।

চিনুকাকু হাসলেন। 'মাছের বদলে তোমাকে বিঁধিয়ে ফেলেছিলাম। ভারি অদ্ভুত ঘটনা। ভাগ্যিস তুমি সময়মত মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলে। একে বলে ইনসটিংক্ট। আত্মরক্ষার সহজাত বোধ।'

সরে ওঁর ডাইনে গেলাম। বললাম, 'আমি এমনি ঘুরেছিলাম।'

'উঁহু। অনেক সময় মানুষ জানে না সে কী করছে এবং কেন করছে।' চিনুকাকু আবার ছিপ ফেললেন। তারপর আমাকে ভীষণ চমকে দিয়ে বললেন, 'তোমার চুলে কেঁচোর টোপটাসুদ্ধ বড়শি আটকেছিল। না, না! ভয় পাওয়ার কিছু নেই। টোপটা খুলে যায়নি। বিশ্বাস কর।'

আমি ব্যস্তভাবে চুল খুলে ঝাড়তে শুরু করেছিলাম। চিনুকাকু হাসছিলেন। বললাম, 'কথাটা মনে করিয়ে দিলেন! আমার গা ঘিনঘিন করছে।'

'রেশমি! খোলাচুলে তোমাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে, জান?'

প্রায়-দৌড়ে গিয়ে বাগানে ঢুকলাম। খিড়কির দরজার কাছে মা তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে এভাবে যেতে দেখে বললেন, 'কী হয়েছে? অমন করে দৌড়ুচ্ছিস কেন?'

'কেঁচো।' বলে ওঁর পাশ কাটিয়ে বাড়ি ঢুকলাম। সোজা আমার ঘরে ঢুকে চিরুনি টানতে থাকলাম চুলে। আয়নায় আমার আবছা চেহারা দেখে চমকে উঠলাম! নিজের ভয় পাওয়া চেহারা কখনও দেখিনি। ঘরে আবছা আঁধার জমেছে। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে খুঁটিয়ে চুল পরীক্ষা করলাম। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে আবার খোঁপা বাঁধলাম বটে, কিন্তু গা ঘিনঘিন ভাবটা থেকে গেল। একবার ভাবলাম স্নান করে ফেলি। কিন্তু মায়ের 'সিজন চেঞ্জ' কথাটা মনে পড়ল।

বারান্দায় তখনই মাকে দেখতে পেলাম। মুখে বিস্ময় ছমছম করছে। বললেন, 'কী হয়েছে বলবি তো বাবা!'

'কিচ্ছু হয়নি। তুমি হইচই বাধিও না তো!'

'কেঁচো বললি। কিসের কেঁচো?'

মায়ের কথায় হাসি পেল। বললাম, 'বড়শির কেঁচো। আমার চুলে বড়শি আটকেছিল। এবার বুঝলে তো?'

মা বুঝতে পেরে চোখ বড় করে বললেন, 'হা খোদা! যদি চোখে বিঁধে যেত? তুই বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস রেশমি! চুপচাপ বসে থাক ঘরে। গান বাজা। ছোটলোকের মত যেখানে সেখানে বেগানা পুরুষ মানুষের সঙ্গে...'

মায়ের কথার ওপর বললাম, 'বাজে কথা বলো না। আব্বুকে বলব তুমি চিনুকাকুকে বেগানা পুরুষ মানুষ বলেছ।'

মা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আমি সোজা ঝিলের ধারে চলে গেলাম। দেখলাম, চিনুকাকু ছিপ রেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন। দৃষ্টি দূরের দিকে। ছড়িটা মুঠোয় ধরে মূর্তির মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে গেলে আমার পায়ের শব্দে ঘুরে বললেন, 'ভাবছিলাম তুমি রাগ করে চলে গেলে। আর আসবে না।'

একটু হেসে বললাম, 'চুল ঝাড়তে গিয়েছিলাম। আপনি আর মাছ ধরবেন না?'

'ইচ্ছে করছে না। তুমি চলে যাওয়ার পর হঠাৎ মনে হল, জীবনের একটা সুন্দর বিকেলকে এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। সেই স্ট্রেঞ্জ ফিলিংস সম্ভবত।'

বুঝতে পারছিলাম না কেন ওঁকে অমন নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছে? কথা বলছেন দূরের কণ্ঠস্বরে। স্তব্ধতা অসহ্য লাগছিল। একটু পরে বললাম, 'তা হলে আপনিই আমার ওপর রাগ করেছেন!'

'তোমার ওপর রাগ করা যায় না।' চিনুকাকু ঠোঁটের কোনায় হাসলেন। 'আসলে তুমি চলে যাওয়ার পর—ওই যে বলছিলাম, একটা স্ট্রেঞ্জ ফিলিংস... আবিষ্কার করলাম, জীবনে কতবার কত সুন্দর সময় এসেছে, সেগুলো পায়ের তলায় মাড়িয়ে গেছি। না—সে জন্য কোনও দুঃখ বা অনুতাপ করা ভুল। তখন আমি ছিলাম অন্য এক মানুষ। এখনকার আমি নই। কিন্তু এখন থেকে আমাকে সচেতন থাকতে হবে, যদি সুন্দর সময় আবার আসে, যতটা পারি উপভোগ করব। এখান থেকে চলে যাওয়ার পর অবশ্য কী ঘটবে আমি জানি না।'

কথাগুলো তত বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'আপনি এখান থেকে এবার কোথায় যাবেন?'

'আমার গ্রামে ফিরব। যেখান থেকে এসেছি।'

'সেটা কোথায়?'

'কনকপুর। চেন তুমি?'

' নাম শুনেছি।'

'তোমাদের ওই পিচের রাস্তা গেছে কনকপুরের ভেতর দিয়ে। আট-ন কিলোমিটার। কথাটা বলে চিনুকাকু সবুজ মাঠের দিকে ঘুরলেন। ঝিলের কালো জলে ছিপের সাদা ফাতনাটা স্থির হয়ে ভাসছে। লাল গঙ্গাফড়িংটা আবার তার ওপর নাচানাচি করছে। হঠাৎ মনে হল, একটা প্রতীক্ষিত সুন্দর বিকেল অকারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কী যেন ঘটবার কথা ছিল, ঘটল না। এই অনুভূতিটা ভারি অদ্ভুত। চায়ের ট্রে আর কাপ রাখা ছিল সতরঞ্চির ওপর। গুছিয়ে নিয়ে বললাম, 'আপনি আর চা খাবেন না কাকু?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে চিনুকাকু আপনমনে হেসে উঠলেন। আমার দিকে ঘুরে বললেন, 'কনকপুরের একটি ছেলে। রাজা। বুঝলে? ডাকনাম রাজা। আসল নাম হোসেন রেজা। আসাধারণ গুণী ছেলে। আর্টিস্ট। মান, ছবি আঁকে। আবার সাইনবোর্ড, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন এসবও লেখে। ওর বাবা ছিলেন দর্জি। রাজা কলেজে পড়ার সময় ওর বাবা মারা গেলেন। এমনিতেই রাজার পড়াশুনায় আগ্রহ ছিল না। আর্টিস্টের আবার ডিগ্রির কী দরকার? সে ছবি আঁকতে পারে। এটাই বড় একটা ডিগ্রি। কী বল?'

আমি তাকিয়ে ছিলাম ওঁর দিকে। কোনও জবাব দিলাম না।

'তো একটা দুঃখের ব্যাপার—রাজার মায়ের সঙ্গে রাজার বাবার ভাল বনিবনা ছিল না। রাজার ছেলেবেলায় শোচনীয় একটা ঘটনা ঘটেছিল। কনকপুর ব্লক অফিসের এক মুসলিম অফিসারের সঙ্গে রাজার মায়ের সম্পর্ক নিয়ে খুব বদনাম রটে যায়। রাজার বাবা ঝোঁকের বশে স্ত্রীকে তালাক দেন। রাজার মা সেই অফিসারের সঙ্গে চলে যান। তারপর...'

চমকে উঠে বললাম, 'সে কী। ছেলেকে ফেলে চলে গেলেন?'

চিনুকাকু দুঃখিত মুখে বললেন, 'মানুষের জীবনে এরকম ঘটনা ঘটেই থাকে। কখন কী ঘটবে বলা

যায় না। তবে তুমি প্রশ্ন তুলবে, প্রেম-ভালবাসা বড়, না বাৎসল্য বড়? আমার ধারণা, প্রেম-ভালবাসার মধ্যে একটা সাংঘাতিক হঠকারী শক্তি আছে।"

"ভদ্রমহিলা আর ছেলের খোঁজ নেননি?"

"জানি না। রাজাকে তার মায়ের সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করিনি কখনও! কিন্তু অদ্ভুত ছেলে রাজা, বুঝলে? সবসময় হাসিখুশি। চঞ্চল। একটু খেয়ালিও বটে। আমাদের জন্য পোস্টার লিখে দিত। সে জন্য পুলিশের পাল্লায় পড়ে খুব ভোগান্তি হয়েছিল। জেল থেকে ফিরে খোঁজ নিলাম। দেখলাম তেমনি হাসিখুশিতে কাটাচ্ছে। শহরে রীতিমত একটা স্টুডিও খুলেছে। কল্পনা স্টুডিও।

চমৎকার নাম। তাই না? তুমি তো ওই শহরের স্কুল কলেজে লেখাপড়া শিখেছ। কল্পনা স্টুডিও চোখে পড়েনি?'

আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল, যেন পালাতে পারলে বাঁচি। একটু পরে বললাম, 'নাহ্।'

'কেন? তোমাদের গার্লস কলেজে যাওয়ার পথেই পড়ে। সিনেমাহল আর হাসপাতালের মাঝামাঝি জায়গায়। অবশ্য ছোট্ট স্টুডিও। রাজা চমৎকার পোর্ট্রেট আঁকে, জান? তোমার পোর্ট্রেট পাঁচ মিনিটের মধ্যে এঁকে দেবে। আমার একটা পোর্ট্রেট এঁকেছিল। সঙ্গে থাকলে তোমাকে দেখাতাম।'

বুঝতে পারছিলাম না, হঠাৎ চিনুকাকু কেন এসব কথা বলছেন। বিকেলের আলোর রঙ এতক্ষণে ফিকে হয়ে উঠেছে। সতরঞ্চি আর চায়ের ট্রে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'এগুলো রেখে আসি।'

চিনুকাকু হাসলেন। 'তোমার কথা ভাবতে গিয়ে রাজার কথা মনে পড়ল। তোমাদের দু'জনকে পাশাপাশি দাঁড় করানো যায়। অসাধারণ মানাবে কিন্তু!'

দ্রুত ঘুরে পা বাড়িয়েছিলাম। চিনুকাকু ডাকলেন, 'রেশমি! রেশমি!'

আস্তে বললাম, 'এসব কথা আমার ভাল লাগে না।'

'ভাল লাগবে, যদি রাজাকে তুমি দেখ।' চিনুকাকু সেই শিশুহাসি হেসে বললেন, 'আমি ওকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে আসব। তোমার বাবা তোমার জন্য যেমনটি চাইছেন, রাজা ঠিক তেমনটি। আজই কথাটা তুলতে হবে কাজির কাছে।'

বাগানে ঢুকে দেখলাম, কালু আসছে। দাঁত বের করে বলল, 'বাবু মাছ ধরতে পারলেন, নাকি পারলেন না?'

'দেখ গে না।' বলে ওর পাশ কাটিয়ে গেলাম।

কালু একটু ভড়কে গিয়েছিল আমার কথার ঝাঁঝে। খিড়কির দরজার কাছে মা তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, 'কালু এসে গেছে। আর তুই যাসনে, বাবা! ওই নিরিবিলি জায়গায় সুনসান সন্ধ্যাবেলা মেয়েদের যেতে নেই।'

বলতে যাচ্ছিলাম, ভূতে ধরবে নাকি। বললাম না। হঠাৎ মনে হল, সত্যিই আমাকে ভূতে ধরেছে। আমি কিছু ভাবতে পারছি না। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে।..

তা হলে শরৎকালের সুন্দর ঝিলের ধারে একটা কিছু ঘটবে ভেবে দুরুদুরু বুকে প্রতীক্ষা করছিলাম, তা কি এই? কিংবদন্তির নায়কটি তাঁর দিকে থেকে আমার মনের কাঁটা রাজা নামে একজনের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। এখন ভাবতে অবাক লাগে, কেন সেদিন চিনুকাকুকে বলতে পারিনি কল্পনা স্টুডিওর রাজাকে আমি চিনি? কলেজের সরস্বতী পুজো আর ফাংশনে রাজা সুন্দর করে ব্যানার লিখে দিত। ডায়াস সাজিয়ে দিত। আমরা বলতাম রাজাদা। মেয়েদের সঙ্গে সহজে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল রাজাদার। অনেককে তুইতোকারি করে কথা বলত। ওর সঙ্গে প্রেম-ভালবাসা গড়ে তোলার কথা ভাবাই যেত না। আমার অবশ্য আড়ষ্টতা ছিল অনেক বেশি। দূরত্ব রেখে চলতাম। রাজাদা আমার কাছ থেকে তেমনি দূরত্ব রেখে চলত। আমার মধ্যে তেমন আকর্ষণীয় কিছু ছিল না হয়ত। আসলে কত মানুষের সঙ্গে কাজের সূত্রে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তা নিছক সাদামাঠা কেজো ধরনের সম্পর্ক। রাজাদাকে সেই দিক থেকেই দেখেছি। কখনও আমার সঙ্গে আলাদা করে ওর আলাপ-পরিচয় হয়নি। ও আমার নামটাও জানত কিনা সন্দেহ আছে। আমিও ওকে আলাদাভাবে লক্ষ করিনি।

তারপর হঠাৎ ঝিলের ধারে চিনুকাকু ওকে আমার সামনে আলাদা করে তুলে ধরলেন। আমি ভীষণ চমকে উঠেছিলাম। চিনুকাকু আচমকা নিজেকে সাধারণ মানুষে পরিণত করে রাজাদাকে মুহূর্তে অসাধারণ করে তুলেছিলেন। চমক সামলাতে সময় লেগেছিল। ঘরের ভেতর আবছা আঁধারে বসে এলোমেলো চিন্তার ভেতর বারবার রাজাদার চেহারা ভেসে আসছিল, স্রোতের জলে মাছের মত। খুঁটিয়ে দেখার আগে দূরে ভেসে যাচ্ছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, আমরা কত মানুষের সঙ্গে কাজের সূত্রের মিশি। অথচ তাদেরও যে একটা করে স্বতন্ত্র জীবন আছে, সেই জীবনে আছে শোচনীয় অনেক ঘটনা, বুঝতে পারি না। রাজাদার আড়ালে অমন একটা ঘটনা আছে, কল্পনাও করিনি। এ-ও কল্পনা করতে পারিনি যে একদিন অতর্কিতে কেউ আমার সঙ্গে ওর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে দিতে চাইবে।

বাইরে চিনুকাকুর ডাক শুনতে পেলাম। 'রেশমি! তুমি কোথায়?'

সেই সময় মসজিদের মাইক্রোফোনে সন্ধ্যার আজান ভেসে এল। আজান শুনলে মাথা ঢাকতে হয়, মায়ের নির্দেশ। এই এক বছর বাড়িতে চুপচাপ কাটিয়ে এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ঘোমটা টানতে গিয়ে টানলাম না। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলাম। ফ্যান চালিয়ে দিলাম এতক্ষণে। আমার শরীরের ওজন বেড়ে গেছে মনে হচ্ছিল। বারান্দায় গিয়ে দেখলাম, মা রান্নাঘরের বারান্দায় নামাজ পড়ছেন। কালু তার বড়শি আর টোপের ভাঁড় নিয়ে কোথায় রাখতে গেল। চিনুকাকু বারান্দায় উঠে বললেন, 'তুমি ভীষণ রেগে আছ, জানি। আপাতত রাগটা চাপা দিয়ে রাখো। কালুকে বলেছি। তোমার ঘরটা অন্যভাবে সাজাতে হবে। কী? সাজাবে না?'

বলে চিনুকাকু সোজা আমার ঘরে ঢুকলেন। সেই সময় মনে হল, এক হঠকারী আগন্তুক এসে আমার জীবনটাকেই যেন বদলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অথচ আমার কিছু করার নেই। চিনুকাকু বললেন, 'দেখে যাও রেশমি! খাটটা যেভাবে বলেছি, এদিকটায়। কেমন তো? ড্রেসিং টেবিলটা ওখানে। কৈ, কালু কোথায়?'

ভেতরে গিয়ে বললাম, 'কালু একা খাট সরাতে পারবে না।'

'তুমি-আমি হাত লাগাব।' চিনুকাকু হাসলেন। 'ভাবছ একটা ঠ্যাং অকেজো বলে আমি পৃথিবীতে ফালতু জিনিস হয়ে গেছি? আমার হাত দুটোই যথেষ্ট।'

কালু এসে আলাদিনের দৈত্যের মত বলল, 'কী করতে হবে বলুন।'

তিনজনে মিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরটা অন্যভাবে সাজানো হয়ে গেল। আমি নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মত শুধু হুকুম তামিল করছিলাম। চিনুকাকু পুবের জানালার কাছে চেয়ার টেনে বসে বললেন, 'এবার দেখ, কত সুন্দর মনে হচ্ছে ঘরখানা। কালু, তুমি ভাবিজিকে বল চা চাই। খুব মেহনত হয়ে গেছে। তুমিও এক কাপ চায়ের দাবি করবে যেন।'

কালু দাঁত বের করে বলল, 'আমি তো চা খাই না।'

'আজ খাবে। এটা তোমার ন্যায্য পাওনা।'

কালু হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। নতুন করে সাজানো আমার লেখাপড়ার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ঘরটা দেখলাম। আশ্চর্য নতুন মনে হল।

চিনুকাকু টেবিলে আমার ছোটবেলার ছবিটা দেখিয়ে বললেন, 'ছবির তুলনায় ফ্রেমটা খাটো। আরও বড় ফ্রেম হলে ছবিটা খুলবে। আর শোন, তোমাকে ফুলের বাগান করতে বলেছি। প্রত্যেকদিন নিজের বাগানের ফুল এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখবে। এছাড়া চাই কিছু ভাল বই। টেক্সটবুক সাজিয়ে রাখা আর ভাল দেখাচ্ছে না। ওগুলো কারও কাজে লাগতে পারে। খোঁজ নিয়ে তাকে দিও। কবিতা পড়তে তোমার ভাল লাগে না?'...

এভাবে চিনুকাকু আমার জীবনকে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। চুপচাপ শুনছিলাম। ক্রমশ মনে হচ্ছিল একটা নতুন ও ছিমছাম জীবন আমাকে উপহার দিচ্ছেন চিনুকাকু। আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে আবার স্বাভাবিক হতে পারলাম। একসময় বাইরে থেকে কালু বলল, 'রেশমি! বিবিজি তোমাকে ডাকছেন।'

মা রান্নাঘরের বারান্দায় গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কাছে গেলে চাপা স্বরে বললেন, 'এ কী মানুষ বাবা, বুঝি না। এতকাল বাড়িতে কত পর-মানুষ এসেছে। এমন গায়েপড়া মানুষ দেখিনি।'

'কেন? কী হয়েছে?'

মা চোখ কটমটিয়ে বললেন, 'হবে আবার কী? কালুর বউকে চেন না? পাড়ায়-পাড়ায় হলুস্থুলুস করে বেড়াবে। বেগানা হিন্দু মানুষ। দোস্তবন্ধু আছে তো আছে। দলিজঘরে থাকবে। তা নয়, একেবারে বাড়ির ভেতর জোয়ান মেয়ের ঘরে ঢুকে বসে থাকা। এ কী মানুষ, বাবা?'

'চা কোথায়?'

মা ডাইনিং টেবিলে সাজানো সেই ট্রে দেখিয়ে ঝাঁঝালো স্বরে শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে, 'ওই তো! বাঁদির হুকুম তামিল করে রেখেছি। তোর আব্বু আসুক, বলছি—কালই দোস্ত-বন্ধুকে নিয়ে যেখানে খুশি রেখে আসুক। আর একটা দিন থাকলে গাঁয়ে টি টি পড়ে যাবে। এ কি টাউন-শহর পেয়েছে? নাকি হিন্দুবাড়ি পেয়েছে?'

চায়ের ট্রে নিয়ে চলে এলাম। মায়ের সঙ্গে তর্ক করার মানে হয় না। তবে এটা ঠিকই যে, চিনুকাকু একটু বাড়াবাড়ি করছেন এবং আমাকেও মাঝেমাঝে বিব্রত করে ফেলছেন। আমি হিন্দু মেয়ে হলে কী হত জানি না। অনাত্মীয় পুরুষমানুষের সঙ্গে এভাবে মেলামেশার সুযোগ কখনও পাইনি। তাই একটা নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। আবার এ-ও ঠিক, জীবনেও কিছু কিছু অনাবিষ্কৃত দিকের পর্দা খুলে যাচ্ছে চোখের সামনে। হয়ত এতদিনে শক্তি আর সাহসকেও ছুঁতে পারছি। মাঝেমাঝে চিনুকাকুর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, 'প্রশ্ন কর রেশমি! প্রতিবাদ কর!'

হঠাৎ লক্ষ করলাম ট্রেতে একটা প্লেটে কিছু বিস্কুট আর চানাচুর! অত ক্ষোভ সত্ত্বেও মা তাঁর স্বামীর হঠকারী বন্ধুকে যেন কিছু মর্যাদাও দিচ্ছেন!

চিনুকাকু বললেন, 'বাঃ! চা খেতে খেতে গান শোনা যাক। রেশমি, রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড নিশ্চয় আছে?'

'আছে।'

'দেবব্রত বিশ্বাসের?'

'আছে।'

'তোমাকে এমন নির্জীব দেখাচ্ছে কেন?'

রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে দিলাম। 'আকাশভরা সূর্যতারা' গানটির সঙ্গে চিনুকাকু গলা মেলালেন। অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। চিনুকাকু গান গাইতে পারেন কল্পনাও করিনি।

লংপ্লেয়িং রেকর্ডটার প্রথম গানটা শেষ হতে না হতেই বিদ্যুৎ চলে গেল। চিনুকাকু বললেন, 'ওই যাঃ! আসলে আমার ভাল কিছু, মহৎ বা সুন্দর কিছু, সয় না।'

অন্ধকার বাড়িতে একটু হইচই শুরু হল। মা কালুর মাকে ডাকছিলেন এবং কালুর মা কালুকে। এ মাসে একটানা বিদ্যুৎ ছিল। তবে আমাদের গ্রামে বিদুৎ বড় খেয়ালি। বিশেষ করে গ্রীষ্মে বিদ্যুতের স্বভাব হয়ে উঠে হাড়জ্বালানী।

লোডশেডিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম ঘর থেকে। কালু একটা হেরিকেন জ্বেলে দিয়ে গেল। রান্নাঘরের বারান্দায় মা দ্রুত লম্প জ্বেলে নিয়েছেন। হেরিকেন নিয়ে ঘরে ঢুকে বললাম, 'এখনই কারেন্ট এসে যাবে। পুজোর মুখে লোডশেডিং বড় একটা হয় না।'

চিনুকাকু বললেন, 'একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি লক্ষ করেছি, জান রেশমি? গ্রামে একসময় বিদ্যুতের কথা ভাবা যেত না। অন্ধকার স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু বিদ্যুৎ পাওয়ার পর গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা অদ্ভুত অভ্যাস গড়ে উঠেছে। লোডশেডিং হলে একেবারে হইচই পড়ে যায়। তুমিও নিশ্চয় লক্ষ করেছ?'

একটু হেসে বললাম, 'রাতে লোডশেডিং হলে মা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যেন কী সাংঘাতিক সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, গ্রাম এবং শহরের মধ্যে লোডশেডিংয়ের প্রতিক্রিয়ায় তফাত আছে। শহরে এটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কিন্তু গ্রামে এখনও ধাতস্থ করতে পারেনি। আবার দেখ, অসংখ্য গ্রামে বিদ্যুৎ নেই—বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সেখানকার মানুষ অন্ধকাব বা গরম আবহাওয়া দিব্যি মেনে নিয়েছে। আমাদের ছেলেবেলাও তো বিদ্যুৎহীন গ্রাম কেটেছে। তবে আমার কথা যদি বল, আমার মধ্যে কোনও প্রকিক্রিয়া হয় না। তোমার?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে বললাম, 'আপনি গান গাইতে পারেন ভাবিনি।'

চিনুকাকু হাসতে হাসতে বললেন, 'গাইতে পারি না। গলা মেলাতে পারি। তুমি গান গাইতে পার ধরেই নিচ্ছি। কারণ তা না হলে তোমার রেকর্ডপ্লেয়ার থাকত না। এতগুলো রেকর্ড থাকত না। নাও, শোনাও একখানা। যে-কোনও গান।'

বিব্রত হয়ে বললাম, 'আমি গাইতে পারি না। শুনতে ভাল লাগে।'

চিনুকাকু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'নিজের জীবন সম্পর্কে তোমার একটা ঔদাসীন্য আমার চোখে পড়েছে। এটা ঠিক নয়। যে জীবন তুমি পেয়েছ, যতটা সম্ভব তাকে ভাল-ভাল কাজে লাগান উচিত। হ্যাঁ, আমি জানি মুসলিম মেয়েদের কিছু অসুবিধে আছে। সীমাবদ্ধতা আছে। তা ছাড়া তুমি গ্রামের মেয়ে। কিন্তু সময়টা অনেক বদলে গেছে না? আমার বেশ খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে। শেকল ছিঁড়ে বেরুনো কিছু মুসলিম মেয়েকে দেখেছি। তুমিও দেখে থাকবে, কারণ তুমি তোমার মায়ের মত ঘরবন্দী নও।'

প্ররোচনার ভঙ্গিতে চিনুকাকু কথা বলছিলেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ ফিরে এলে ওঁর বক্তৃতা থামল। রেকর্ড-প্লেয়ার চালিয়ে দিলাম। চিনুকাকু গানের সঙ্গে সঙ্গে গলা মেলালেন। আর ঠিক তখনই ঝিরঝিরে বৃষ্টি এসে গেল।....

সেই শরৎকালে দুটি দিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ স্মৃতি চেতনার কোণে ফ্রেমে বাঁধা ছবির মত রয়ে গেছে। কখনও কখনও ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকি। প্রথমে খানিকটা অস্পষ্টতা, তারপর ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাবি, আমার সমস্ত শক্তি ও সাহসের উৎস কি ওখানেই? আবার সমস্ত যন্ত্রণার উৎসও কি ওই দুটি দিনের স্মৃতি?

বাবা বলতেন, 'চিনু বিপ্লবী রাজনীতি করত বলে নয়, আসলে ও ওইরকম মানুষ। ইংরেজিতে যাকে অ্যাডভেঞ্চার বলে, ঠিক তাই। সংসারের সব সাজানোগোছানো জিনিসকে এলোমেলো করে বেড়ানো ওর স্বভাব।'

হয়ত তা-ই। আমাদের খান্দানি মুসলিম পরিবারে কিছু রীতিনীতি ছিল। চিনুকাকু যেন ইচ্ছে করেই সেগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছিলেন। হঠকারিতায় আমাকেও কিছু বিব্রত করছিলেন। সে-রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে চিনুকাকু বিকেলে ঝিলের ধারে আমাকে হঠাৎ যেভাবে বলেছিলেন, সেইভাবেই বলে উঠেছিলেন, 'কাজি! একটা ছেলে...রাজা। হোসেন রেজা নাম। সবাই বলে রাজা। অসাধারণ গুণী ছেলে। আর্টিস্ট। ঘটকালিটা আমিই করছি। বুঝলে? ছেলেটার সঙ্গে—' বলে মায়ের দিকে ঘুরেছিলেন। 'ভাবিজি। আপনিও শুনুন। রেশমির উপযুক্ত পাত্র। কোনও পিছুটান নেই রাজার। তো—'

বাবা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'তোমার মাথাখারাপ, চিনু?'

চিনুকাকু গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'কেন?'

'রাজা, মানে গফুর দর্জির ছেলে তো? তোমাদের কনকপুরের গফুর মিয়া।'

'তুমি চিনতে ওঁকে?'

'চিনতাম মানে? ওকালতি করে খাই। সারা জেলার মানুষজন মোটামুটি চিনি।'

'তুমি রাজাকে চেন?'

'খুব চিনি। বাউণ্ডুলে বাজেটাইপ ছেলে। ফ্র্যাংকলি বলছি, রাজার ফ্যামিলিহিস্ট্রিও জঘন্য। ওর মা—' বাবা শালীনতাবশে চুপ করেছিলেন।

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বাবার এ মুখ কখনও দেখিনি। চিনুকাকু চুপচাপ খাওয়ায় মন

দিয়েছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল, গত দুটি দিনের সমস্ত চাঞ্চল্য আর উদ্দীপনা অতর্কিতে একটা ভারি পাথরের তলায় চাপা পড়েছে।

একটু পরে বাবা তেমনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'ভাই চিনু! তুমি রাজনীতি করা মানুষ। আমরা গৃহস্থ সংসারী মানুষ। আমাদের অনেক হিসেব করে চলতে হয়।'

চিনুকাকু আস্তে বলেছিলেন, 'রাজা সম্পর্কে তোমার ধারণা ঠিক নয়।'

'কথাটা তুমি বুঝতে পারনি। আমার চাই একজন সাদাসিধে সংসারী জামাই।'

'ও।' বলে চিনুকাকু চুপ করে গিয়েছিলেন।

৪

সে-রাতে যতবার ঘুমের টান আসছিল, ততবারই বাবার কথাটা মনে পড়ছিল, 'আমার চাই একজন সাদাসিধে সংসারী জামাই', অমনি ঘুমের সুতো ছিঁড়ে যাচ্ছিল। বাবা যা চেয়েছিলেন আমি তাই হয়েছি। বাবা যা চাইবেন, আমাকে তা-ই হতে হবে। এটাই কি নিয়ম? কেন এই অদ্ভুত নিয়ম? আমার নিজের কোনও চাওয়া থাকতে নেই? যতদিন ছোট ছিলাম, ততদিন বিরাট এই অজানা এবং রহস্যময় পৃথিবীতে বাবার মত একজন বয়স্ক মানুষের সাহায্য দরকার ছিল। এখন আমি বড় হয়েছি। পৃথিবীটা অনেকখানি চেনা হয়ে গেছে। নিজেকে বাঁচানোর সাহস ও শক্তি পেয়েছি। বাবার মত একজন উদার মানুষের মুখে ওই কথাটা মানায় না। 'সাদাসিধে সংসারী জামাই' বললেই একটা ভারবাহী প্রাণীর চেহারা সামনে ভেসে ওঠে। হাসি পায়। অথচ ব্যাপারটা হাসির নয়, অস্বস্তিকর।

কিছুক্ষণ পরে মনে হয়েছিল, এই এতোলবেতোল ভাবনার ভেতর থেকে চিনুকাকু ষড়যন্ত্রসঙ্কুল চাপা স্বরে বারবার বলছেন, 'প্রশ্ন কর রেশমি! প্রতিবাদ কর।' কিন্তু আমি এখানেই এত অসহায় যে, বাবাকে বড়জোর প্রশ্ন করতে পারি। কিন্তু প্রতিবাদ করা অসম্ভব। বাবার মনে কষ্ট দেওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারি না।

সে এক যন্ত্রণার রাত। আমার একদিকে বাবা, অন্যদিকে চিনুকাকু। একদিকে সাজানো গোছানো সনাতন সংসার, অন্যদিকে বিপ্লবের ভাঙার ডাক। একদিকে সাদাসিধে সংসারী জামাই, অন্যদিকে যেন রাজাদা।

পরে মনে হয়েছিল, চিনুকাকু যদি আমার জীবনে হঠাৎ না এসে পড়তেন, ওসব কথা কখনও ভাবতাম না। অমন অস্থির হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতাম না, রেশমি, তুই কী করবি? একটা হঠকারী ঝড় এসে আমাকে নাড়া দিয়ে তছনছ করেছিল যেন। নতুন চোখে পৃথিবীকে অবাক হয়ে দেখছিলাম।...

শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কালুর মায়ের ডাকে জেগে উঠে দেখি, অনেক বেলা হয়ে গেছ! বেরিয়ে গিয়ে শুনলাম, চিনুকাকু বাবার সঙ্গে ভোরবেলায় চলে গেছেন। মন খারাপ হয়ে গেল। বাড়িটা অনেক বেশি চুপচাপ আর জনহীন মনে হল।

আবার সেই একঘেয়ে জীবন। শূন্যতার বোধটা আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। বাগানে গিয়ে ভাবতাম, চিনুকাকুর কথামত ফুলের বাগান করে ফেলতেই হবে। অথচ কী এক আলসেমি পেয়ে বসত। ঝিলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। কালুর মা বারবার এসে ডাকাডাকি করত। জিনপরী ভূতপেত্নীর ভয় দেখাত। রাগ করে ওকে ধমক দিতাম। বুড়ি আপনমনে গজগজ করতে করতে চলে যেত।

কদিন পরে পুজোর ছুটিতে আদালত বন্ধ হলে বাবা বাড়িতে ছিলেন। এই সময়টা বাবার অন্য চেহারা। কালুর সঙ্গে মাঠে ঘোরাঘুরি করেন এবেলা ওবেলা। সন্ধ্যায় দলিজঘরে গ্রামের মুরুব্বিরা এসে ভিড় করেন। অনের রাত পর্যন্ত ভিড়টা থাকে। ঝগড়াঝাঁটি এবং নানা সমস্যার মীমাংসা করে দিতে হয় উকিলসায়েবকে। রাত বাড়ছে দেখে মা আমাকে খেয়ে নিতে বলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই খাব না। মা রাগ করে বলেন, 'বাপসোহাগি মেয়ের বরাতে খুব কষ্ট আছে।'

এক রাতে খেতে বসে বাবা বললেন, 'মিরসায়েব এসেছিলেন। নূরপুরের ফজল মির। কথায় কথায় বললেন, একটা ভাল ছেলে আছে। প্রাইমারি টিচার। তবে প্রাইভেটে এম এ পাশ।'

মা আস্তে বললেন, 'জাতবংশের খোঁজ নিয়েছ?'

'হ্যাঁ। ফজল মিরেরই দূরসম্পর্কের ভাগ্নে। নূরপুরের মিরবংশ বড় খান্দান। পার্টিশনের পর পাকিস্তানে গিয়ে ওঁদের অনেকে উঁচুপোস্টে চাকরি করতেন। বাকি যাঁরা এপারে আছেন, তাঁরাও অবস্থাপন্ন। আশরাফি চলন।'

'গিয়ে দেখে এস বরং। আরও খোঁজখবর নিয়ে—'

'খোঁজখবর তো নিতেই হবে। দেখি।'

মা একটু হাসলেন। 'মেয়ে তো যে দেখবে, তারই পছন্দ হবে। হাত বাড়িয়েই আছে। কিন্তু জামাই পছন্দ না হলে আমি ওতে নেই। শুধু তোমার পছন্দে চলবে না বলে দিচ্ছি।'

বাবা মিটিমিটি হেসে বললেন, 'তোমার মেয়েরও পছন্দ হওয়া চাই। তাই না রেশমি?'

বললাম, 'এসব কথা আমার ভাল লাগে না।'

মা বললেন, 'ভাল লাগে না বললে কি চলে, বাবা? মেয়ে হয়ে দুনিয়ায় এসেছ। ঘরকন্না করতে হবে না? ঘরে আইবুড়ি মেয়ে থাকলে লোকের চোখ টাটায়। এখনই তো আড়ালে কত পাঁচকথা—কানে আসে। উকিলসায়েবের একটি মোটে মেয়ে। পাশ করা অমন দেখনসুরত মেয়ে। তার কেন বর জুটছে না তাই নিয়ে লোকের চোখে ঘুম নেই।'

বাবা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ওসবে কান দিতে নেই। আসল কথাটা হল, জমিজমা সম্পত্তির যা অবস্থা হয়েছে আজকাল, কবে না বেদখল হয়ে যায়। কালুর ওপর সব ছেড়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি না। সম্পত্তি রাখতে হলে আমাকে ওকালতি ছাড়তে হয়। কাজেই একজন খবরদারির মানুষ তো চাই। এই দেখ না, কবে থেকে বাড়ির দুটো ঘর দোতলা করার কথা ভাবছি। হচ্ছে না। নিজে উপস্থিত থেকে কাজ না করালে কোম্পানির মাল দরিয়ামে ডাল হয়ে যাবে।'

মা বললেন, 'আসল কথাটা মিরসায়েবকে বলেছ তো?'

'বলেছি। না বললেও লোক জেনে গেছে আমি কেমন জামাই চাই। মিরসায়েব বলছিলেন, ছেলের কোনও পিছুটান নেই। সৎভাইদের সঙ্গে বনিবনা হয় না। আলাদা থাকে। নিজের মা বেঁচে নেই। বাবা অসুস্থ। প্রথম পক্ষের ছেলেদের কাছে থাকেন।'

মা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'দেখ আবার, জামাইয়ের সঙ্গে বাড়তি বোঝা এসে না চাপে।'

বাবা শুকনো হেসে বললেন, 'কথাটা আমিও ভেবেছি। মিরসায়েবকে বলেছি। উনি বললেন, সম্পত্তির লোভে প্রথম পক্ষের ছেলেরা বাবাকে কতকটা কয়েদি করে রেখেছে। দ্বিতীয় পক্ষের ছেলের কাছ ঘেঁষতে দেয় না। দ্বিতীয় পক্ষের নামে মাত্র বিঘে দুই জমি লিখে দিয়েছিলেন। ছেলে সেই জমি ভোগদখল করে। প্যাঁচপয়জার বোঝে না।'

মা যেন একটু হতাশ হলেন। তা-ও বর্গাদারের নাম রেকর্ড হয়ে গেছে। মিরসায়েব বললেন, শান্ত নিরীহ ছেলে। বললেন, 'তা হলে তো মুশকিল।'

'মুশকিল কিসের? প্যাঁচপয়চার বোঝে না, শিখিয়ে দেব। ওটা কোনও ব্যাপারই নয়।'...

সে-রাতেই আবছাভাবে মনে হয়েছিল, আমার জীবন কেন্দ্র করে অনেকগুলো সাদামাঠা বৈষয়িক চক্রান্ত গড়ে তোলা হচ্ছে। একটি পরিবারের বিষয়সম্পত্তি আর ঘরকন্নার তলায় একটি মেয়েকে চাপা দেওয়া হবে, এ সব তারই আয়োজন। আশ্চর্য, এই বাড়িটা দোতলা হওয়ার সঙ্গেও আমার জীবনের সম্পর্ক যেন অচ্ছেদ্য। এই প্রথম মনে হল, কোনও গরিব পরিবারে যদি জন্মাতাম, কত সুখের হত। স্কুলজীবনে আমার এক সহপাঠিনী ছিল হেনা নামে। খুব গরিব পরিবারের মেয়ে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর সে চাকরির জন্য ছুটোছুটি করে অবশেষে ব্লক অফিসে একটা চাকরি জুটিয়েছে। ছোট ভাইবোনদের মানুষ করছে। হেনার জন্য আমার ঈর্ষা হচ্ছে এখন। অথচ হেনা বলত, 'তোর কী সুখের জীবন রেশমি। পয়সাওলা বাবা-মায়ের আদরখাওয়া একমাত্র মেয়ে। যা খুশি করতে পারবি। আর আমার বরাতটা দ্যাখ্, পায়ে পায়ে বাধা, অপমান, কষ্ট।' তখন বোকার মত মনে হত, সত্যিই আমি হেনা কেন, আরও কত মেয়ের চেয়ে সুখী।

এতদিনে বুঝতে পারছিলাম, আমার এ সুখের জন্য হয়ত অনেক বেশি মূল্য দিতে হবে। কে এক

অজানা পুরুষ উড়ে এসে জুড়ে বসবে আমার জীবনে। যদি সে আমার মনোমত না হয়? রহিমডাক্তারের মেয়ে বেবি আমার ছোটবেলার বন্ধু। বিয়ের পর চুপিচুপি আমাকে বলেছিল, 'আমার জীবনটা হয়ত ধ্বংস হয়ে যাবে, রেশমি! শ্বশুরবাড়িতে আমাকে কড়া পর্দায় থাকতে হয়। পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়তে হয়। তবে এটা ধরছি না, আমার স্বামীর খালি সন্দেহ, বাইরে ঘোরা লেখাপড়াজানা মেয়ে নিশ্চয় কারও সঙ্গে প্রেম করেছি। সবসময় ওই প্রশ্ন। আমার অ্যালবামের ছবিগুলো দেখবে আর খালি বলবে, এটা কে, ওটা কে। এর সঙ্গে তোমার ছবি কেন? আমি কোনও মানে বুঝি না রে। হয়ত পাগল হয়ে যাব।'

বেবির একটা বাচ্চা হয়েছে। এখন ওর স্বামীর সন্দেহবাতিকটা অনেক কমেছে। কিন্তু এখন ওকে সংসারে গাধার মত খাটতে হয়। বেবি বলছিল, 'শুনলে অবাক হবি রেশমি। আমাকে ধানসেদ্ধ পর্যন্ত করতে হয়। শাশুড়ির কথা, বাড়িতে চার-চারটে বউ থাকতে বাড়তি মেয়ে পোষার দরকার কী? একেবারে আনকালচার্ড ফ্যামিলি। অথচ বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। বিরাট দোতলা বাড়ি। মোটরসাইকেল হাঁকিয়ে বেড়ায়। আমি বুঝি না, আব্বা তাহলে কেন আমাকে লেখাপড়া শিখতে দিয়েছিলেন?'

বেবির ব্যাপারটা মাকে বলেছিলাম। মা তেতোমুখে বলেছিলেন, 'এ জন্যই তো আমি জাতবংশ খান্দানের কথা বলি। আশরাফ ঘরের আদব-কায়দা একরকম, আতরাফঘরের অন্যরকম। তোর আব্বা বারণ করেছিলেন ডাক্তারসায়েবকে। ওদের পয়সা থাকলে কী হবে? চাষাভুষো আতরাফ ঘর। একপুরুষে লেখাপড়াটা শিখেছে। ডাক্তারসায়েব কান করলে না। আজকাল আবার জাতবংশ আশরাফ-আতরাফ কী? ইসলামে এসব নেই। নেই বললেও তো দুনিয়ায় সবকিছু নেই হয়ে যায় না। কেতাব-কোরানে ভাল-ভাল কথা তো থাকবেই—আল্লার কালাম। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তো সব মেনে চলে না। দুনিয়াদারির অনেক ঝকমারি।'

একদিন বাবার কাছে জানতে চেয়েছিলাম আশরাফ-আতরাফ ব্যাপারটা কী।

বাবা বলেছিলেন, 'বাইরে থেকে এদেশে যেসব মুসলিম এসেছিলেন, তাঁদের বংশধররা আশরাফ। আর এদেশের যারা মুসলিম হয়েছিলেন, তারা আতরাফ। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল, দুনিয়ার অন্য কোনও দেশে এমন কোনও ভেদ নেই। তার মানে, হিন্দুদের উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের দেখাদেখি এদেশে মুসলিমরা এটা করেছে।' বাবা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'কোনও মুসলমানের পয়সাকড়ি হলে এবং লেখাপড়াটা শিখলেই নিজেকে আশরাফ ঘোষণা করে। নামের পাশে সৈয়দ, কাজি, খোন্দকার এসব বসিয়ে দেয়। কাজেই আশরাফ-আতরাফ ব্যাপারটায় তত কিছু ভিত্তি নেই। আট-নশো বছরের কথা। বাইরের মুসলিমরা এদেশের কনভার্টেড মুসলিমদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক নিশ্চয় করেছে। তবে একটা ব্যাপার আমি মানি। ফ্যামিলির কালচার। দেশভাগের পর শো-কল্ড আশরাফরা বেশির ভাগই পাকিস্তানে চলে যান। কিছু পরিবার নানা কারণে যাননি। এখন গরিব আশরাফরা আতরাফের ঘরে মেয়ে দিতে পারলে বাঁচেন। তাছাড়া এখন আর এ ব্যাপারটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না। ঘামানোর কারণও নেই। তবে ওই যে বললাম, ফ্যামিলি কালচার। এটা রহিমডাক্তার মানে না, কিন্তু আমি মানি। কেন মানি? আমার কিছু পয়সা আছে বলে। না থাকলে ডাক্তার মত বাধা হয়ে তোকে কোথাও ঝুলিয়ে দিতে পেরে ধন্য হতাম।'

বাবার স্পষ্টভাষিতা আমার ভাল লাগে। আমাদের কুসুমপুর গ্রামটা বেশ বড়। মুসলিমদের সংখ্যা বেশি। তাঁদের কয়েকটা পাড়া আছে। আমাদেরটা কাজিপাড়া। এটা নাকি আমাদের বংশের কারণে। তথাকথিত আশরাফদের আরও দুটো পাড়া আছে। মিরপাড়া আর মিয়াঁপাড়া। বাকিটা শেখপাড়া। চাষী-খেতমজুরদের বসতি সেখানে। কাজিপাড়া-মিয়াঁপাড়া মিরপাড়ার চেয়ে শেখপাড়ার লোকেদের অবস্থা এখন অনেক ভাল। এছাড়া আছে মোমিনপাড়া। সেখানে সুতি আর রেশমি কাপড়ের তাঁত চলে সারাক্ষণ। লোকে আড়ালে ওটাকে জোলাপাড়া বলে। শেখপাড়ার চেয়েও ওঁদের অবস্থা অনেক ভাল। বাবার কাছে শুনেছি, শেখপাড়া আর মোমিনপাড়ায় বহু গ্রামের আশরাফ পরিবার মেয়ে দিয়ে ধন্য হয়েছেন। মোমিনপাড়ার কাজেম আলির একটা সাদা রঙের মোটরগাড়ি পর্যন্ত আছে। শেখপাড়ায়

কারও কারও আছে ট্রাক, টেম্পো, ট্রাক্টর। মিয়াঁর ঈর্ষায় ফোঁসেন। অবস্থা এমনই ঘোরালো যে আশরাফ বাড়ির কত লোক বিড়ি বেঁধে সংসার চালান। বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত বিড়ি বাঁধে। তবু অনেকের এখনও খান্দানি গুমোর রয়ে গেছে।

আশরাফদের তিনটি পাড়া একেবারে ভাঙচুর আর ক্ষয়াটে। গাছপালা-ঝোপঝাড়ের ভেতর ধ্বংসস্তূপ ও পোড়ো ভিটে। নিরিবিলি শুনশান অবস্থা। এখানে-ওখানে মাটি বা ইটের বাড়ি একলা দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। একসময় নাকি এই তিনটে পাড়ার বসতি ঘন ছিল। দেশভাগের সময় অনেকে পাকিস্তান চলে যান। যাঁরা ছিলেন, তাঁরা খানাপিনা করেই ফতুর হয়ে গেছেন। হাসান খোন্দকার নাকি দামি কাশ্মীরি শাল বেচে পোলাও-কোর্মা খেয়েছিলেন। তাঁকে ছোটবেলায় দেখেছি। ভিক্ষে করে বেড়ালেন। কী করুণ অবস্থা! এই জরাজীর্ণ চালচিত্রের মধ্যে আমাদের ছোট্ট পরিবার দৈবাৎ পুরনো উজ্জ্বলতাসমেত টিকে থাকতে পেরেছে।

এখন বুঝতে পারি, ওই উজ্জ্বল টিকে থাকার সঙ্গে আমার জীবনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বাঁধতে চেয়েছিলেন বাবা। আমার একজন ভাই থাকলে বাবা এমনটা করতেন না। একেই কি তাহলে ভাগ্য বলে?...

বাবা যেদিন নুরপুর গেলেন, সেদিনই ডাকে চিঠি এল। লিখেছেন :

'স্নেহের রেশমি,

জীবনে মনে রাখার মত দুটো সুন্দর দিন তোমাদের বাড়িতে কাটিয়ে আসার পর এখন মনে হচ্ছে, সবটাই হয়ত স্বপ্ন। তোমাদের বাড়িটা সুন্দর, পরিবেশও সুন্দর। বাগান আর ঝিলটা তো অনবদ্য একটা ল্যান্ডস্কেপ। সেখানকার সবকিছুর সঙ্গে আশ্চর্যভাবে তুমিও মিশে আছ। ওই পটচিত্র থেকে তোমাকে আলাদা করে ভাবা যায় না। সম্ভবত কাজি আমার মত এই সত্যটা জেনেছে। তাই তোমাকে আমৃত্যু ওখানে বহাল রাখতে চায়। তাই থেকো। কিছুতেই নড়বে না। আসার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করিনি, সেটা ইচ্ছে করেই। আমার এই এক অভ্যাস। প্রিয় জিনিস ছেড়ে যখন চলে যেতেই হবে, তখন একটু নির্মম হওয়া ভাল। ভেবেছিলাম, ওই স্মৃতিটা মিথ্যা ধরে নিয়ে ভুলে থাকব। শেষ পর্যন্ত পারলাম না। হেরে গেলাম নিজের কাছে। তোমাকে এই চিঠিটা লিখতেই হল। আর কতদিন বেঁচে থাকব এই শরীর নিয়ে জানি না। যদি সুযোগ করতে পারো, একবেলার মত এস। বাবা-মাকে বলেই এস। ওঁরা আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না। কনকপুর বাসস্টপে নেমে সাইকেল রিকশো করে নেবে। আমার নাম বললেই দেখবে কেমন ম্যাজিকের মত কাজ হচ্ছে। মেহনতি মানুষরা আমার বন্ধু।

আমার ভাবিজিকে বোল, তাঁর রান্নার স্বাদ চিরদিনের জন্য মুখে রয়ে গেছে। তাঁকে হাজার সেলাম। তোমার বাবাকে বল, আমার আর কোনও অসুবিধে নেই। মুক্ত মানুষের মত ঘুরে বেড়াতে পারছি। তাঁকে ধন্যবাদ। তোমার জন্য রইল প্রচুর স্নেহাশিস। ইতি—

তোমার চিনুকাকু।

'পুনশ্চ তোমার ফুলবাগান করা কতদূর এগোল? হঠাৎ কখনও গিয়ে যেন দেখতে পাই নিজের তৈরি লাবণ্যের মধ্যে তুমি ফুলপরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছ।'

চিঠি পড়তে পড়তে আবেগে চোখে জল এসে গিয়েছিল। ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। চোখ মুছে পুবের জানালার কাছে বসলাম। বাগানটা যেন চমকে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। গাছপালা ঝোপঝাড় আর ঘাস ছুঁয়ে হালকা বাতাস বইছে। প্রকৃতিতে একটা শিহরন দেখতে পাচ্ছি। ঝিলের জলের ওপর উড়েউড়ে একটা মাছরাঙা পাখি ছোঁ দিচ্ছে। আমার মধ্যেই ওই সবকিছুর মত একটা ছটফটানি। সে কি ফুল ফোটানোর যন্ত্রণা?

মা এসে বললেন, 'কার চিঠি এল রে?'

রাগ করে বললাম, 'সব তাতে তোমার নাক গলানো চাই।'

'আহা! তোর মামুজির কোনও খবর এল নাকি—'

'নাহ্। চিনুকাকুর চিঠি।'

মা এগিয়ে এলেন কাছে। 'খবর ভাল তো? কৈ, পড় তো শুনি।'

ইনল্যান্ড লেটারটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'তুমি পড়। এই নাও।'

'তা হলে আমাকে চশমা আনতে হবে। তুই পড় না, বাবা!'

'তোমার রান্না খেয়ে চিনুকাকুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তোমাকে এক হাজার সেলাম। আর আমাকে বলেছেন ফুলের বাগান করতে। হ্যাঁ, আর আব্বুকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।'

এবার মা চটে গেলেন। 'কে জানে বাবা, কিছু বুঝি না। দোস্তবন্ধুকে চিঠি না লিখে সে-মানুষ তোকে কেন চিঠি লেখে। লোকে শোনে তো কী বলবে?'

প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মা!'

মা চুপচাপ বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। মায়ের এই একটা বাজে স্বভাব, আমার নামে চিঠি এলে তা পড়ে শোনাতে বলেন। আমি রাগ করলে মা অবশ্য আর নাক গলান না। কিন্তু ওই এক মন্তব্য, 'কে জানে বাবা, লোকে কেন তোকে এত চিঠি লেখে!' বাবার কানে তুলে দিলে বাবা হাসতে হাসতে বলেন, 'রেশমি তো তোমার মত ছোটবেলাতেই ঘরবন্দী হয়নি। ওর বন্ধু-বান্ধব আছে। চেনাজানা লোক আছে। তারা চিঠি লিখবে না?' মায়ের এক কথা. 'কে জানে বাবা, এত চিঠি লেখার দরকারটা কী?'

চিঠিটা টেবিলের ড্রয়ারে রেখে ভাবতে বসলাম, 'চিনুকাকুকে আমার চিঠি দেওয়া ঠিক হবে কি না। আমার খালি মনে হচ্ছিল, নিঃসংকোচ স্বভাবের মানুষ। হয়ত আবার হুট করে এসে পড়বেন। বাবা কিছু মনে করবেন না। কিন্তু মা বিরক্ত হবেন। হয়ত অবাঞ্ছিত কিছু ঘটে যাবে। চিনুকাকুকে আভাসে কি জানিয়ে দেব?

নাহ্। সে একটা বিচ্ছিবি ব্যাপার হবে। মা চিনুকাকুর চোখে ছোট হয়ে যাবেন। মাকে ছোট করা উচিত হবে না। এইসব এলোমেলো ভাবনার ফাঁকে মনে পড়ে গেল জ্যোৎস্না-আপার কথা। কলেজে আমার দু'বছরের সিনিয়র ছিলেন জ্যোৎস্না আপা (দিদি)। ওঁর আসল নাম জাহানারা বেগম। ডাকনাম জ্যোৎস্না। ওঁদের একটা নার্শারি আছে। সেটা শহরের বাইরে। সেখানেই ওঁদের বাড়ি। শহরে একটা দোকান করা আছে। জ্যোৎস্না-আপার এক ভাই মহফুজ দোকানে থাকে। আমাব পক্ষে বাগান করা কত সহজ, অথচ করছি না।

বেরিয়ে গিয়ে বললাম, 'মা! তুমি কোথায়?'

রান্নাঘরের ভেতর থেকে সাড়া এল, 'দোজখে!'

রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে বললাম, আর দোজখ থাকবে না। তোমার জন্য একটা বেহেশ্‌ত্‌ বানিয়ে দেব। শিগগির আমাকে খেতে দাও।'

মা তরকারির নুন চেখে উনুন থেকে পাত্রটি নামালেন। তারপর বেরিয়ে এসে বারান্দার ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে ডাইনিং টেবিলের একটা চেয়ারে বসলেন।

বললাম, 'ও মা! আমার কথা শুনছ না। আমি খাব।'

'গোসল করে আয়।'

'আজ করব না। করতে গেলে সাড়ে বারটার বাস মিস করব।'

মা চমকে উঠে বললেন, 'বাসে চেপে কোথায় যাবি?'

'জ্যোৎস্না আপার বাড়ি। জ্যোৎস্নাআপাকে মনে পড়ছে না তোমার?'

'বাড়াবাড়ি করিস না, বাবা। এখন আর একা-একা কোথাও যেতে নেই।'

'আমাকে ভূতে ধরবে না। খেতে দাও সাড়ে এগারটা বাজে।'

'খেতে হয়, খা। দিচ্ছি। কিন্তু একা বেরোস নে।'

রাগ করে বললাম, 'ঠিক আছে। না খেয়েই বেরুচ্ছি।'

বারান্দার ধাপে নামতেই মা আমাকে ধরলেন। 'অমন করে না। এখন তুমি বড় হয়েছ। শিক্ষিত হয়েছ। তোমার এমন করলে চলে, বাবা? আজ বাদে কাল ঘরে দামাঁদমিঁয়া (জামাইবাবু) আসবে। কুসমপুরের লোক কেমন, তা তো জান। কান ভারি করবে।'

মা অনর্গল এসব কথা বলছিলেন। আমার জেদ চেপে গেল। বললাম, 'হয় খেতে দাও, নয় তো আমাকে ছাড়।'

মা শ্বাস ফেলে মগের জলে হাত ধুতে ধুতে আপন মনে বললেন, 'কে জানে বাবা, কাকে পেটে ধরেছিলাম। মেয়ে, না আগুনের গোলা?'

কালুর মা ওধারে একটা ঘরের বারান্দা পরিষ্কার করছিল। কথাটা শুনতে পেয়ে বলল, 'বলতে নেই গো! ও কথা বলতে নেই। মরেহেজে ওই একটি মোটে সোনা। যা আব্দার করবে, তা-ই দিতে হবে।'

মা চোখ কটমটিয়ে বললেন, 'তুমি চুপ কর তো। যার জ্বালা, সে বোঝে!'

খেতে বসে হাসতে হাসতে বললাম, 'আচ্ছা মা! ওই যে জ্বালা-টালা বলছ, সেটা কিসের? ও মা! বল না। প্লি-ই-জ আম্মি!'

মা জবাব দিলেন না। গম্ভীর মুখে উঠোনে পেয়ারা গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। একরাশ কালো চুল খোঁপা ভেঙে হঠাৎ খসে পড়ল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য মাকে অবিশ্বাস্য সুন্দর দেখাল। তারপরই মনে পড়ে গেল, এমনি এলোচুলে আমাকে দেখে চিনুকাকু বলেছিলেন, খোলা চুলে আমাকে নাকি অনেক বেশি সুন্দর দেখায়। বিশ্বাস হয় না। বাইরে ঘোরার জন্য আমার গায়ের রঙে একটু রোদপোড়া ভাব আছে। কিন্তু মা ঘরবন্দী মেয়ে। গাছের ছায়ায় ঘাসের মধ্যে পড়ে থাকা সোনালি পাতার মত মায়ের রঙ। কালো চুলের মধ্যে হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল মায়ের লাবণ্য।

শাড়ি বদলাতে বারোটা বেজে গেল। মা তখনও পেয়ারাতলায় দাঁড়িয়ে। কাছে গিয়ে বললাম, 'অত ভাববার কিচ্ছু নেই। আমি পাঁচটার বাসে ফিরছি। যাব, কিছুক্ষণ থাকব জ্যোৎস্নাআপার কাছে। চলে আসব।'

মা হঠাৎ আমার বাঁহাতটা ধরে কড়ে আঙুলের ডগাটা একটু কামড়ে দিলেন। হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলাম। বরাবর মা এটা করেন। আমার সৌন্দর্যকে এঁটো করে দিলেন। অশরীরীরা এঁটো জিনিস পছন্দ করে না।..

শহরের বাসটার্মিনাস থেকে জ্যোৎস্নাআপার বাড়ি প্রায় এক কিমি দূরে। শহরটা চারদিকে বাড়ছে। শহরতলি বলা চলে এখন। তবে চাঁপাতলা নামটা থেকে গেছে। সাইকেলরিকশো করে পৌঁছুলাম। জ্যোৎস্নাআপাদের বাড়িটা দারুণ সুন্দর। গেটে ঝলমল করছে বুগানভিলিয়া। কেয়ারি করা ফুলের বাগান। বাড়ির পেছন দিকটায় কয়েক একর জমিতে নার্শারি। রিকশোওলাকে বললাম, 'একটু অপেক্ষা করো। আসছি।'

জ্যোৎস্না আপা দোতলার জানালা দিয়ে আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন। নেমে এসে বললেন, 'রেশমি! তুমি? সত্যি, না স্বপ্ন দেখছি?'

দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললাম, 'আপনি আছেন কি না জানতাম না। তাই রিকশো দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

'এক্ষুনি বিদায় করে এস। নাহ্ তোমার গিয়ে কাজ নেই। গোলাপকে পাঠাচ্ছি। তুমি এস।'

'বাঃ! ভাড়া দিতে হবে যে!'

জ্যোৎস্নাআপা আমার পিঠে কিল মারার ভঙ্গিতে বললেন, 'টাকার দেমাক দেখিও না। জানি তোমার অ্যাডভোকেট বাবার পকেটভর্তি টাকা। ও গোলাপ ম্যানেজ করবে। এস।'

জ্যোৎস্না আপা টানতে টানতে দোতলায় ওঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর আমাকে খাটে ঠেলে বসিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একবার মাত্র এ বাড়িতে এসেছিলাম জ্যোৎস্না আপার সঙ্গে। ঘরটা সুন্দর করে সাজান মনে হল। সেবার এসে কিন্তু এই বোধটাই ছিল না। জ্যোৎস্নাআপাদের বাড়িতে অনেক লোক। ওঁরা পাঁচ ভাই, চার বোন। বড় জ্যোৎস্নাআপা। মা অসুস্থ মানুষ। বাবা দিনমান ছেলেদের নিয়ে নার্শারির কাজে ব্যস্ত।

জ্যোৎস্নাআপা ফিরে এসে আমার পাশে বসে আবার দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'তোমাকে

প্রায়ই স্বপ্নে দেখি, জান? তুমি এখন কোথায় কার বাড়ি আলো করে বসে আছ বল শুনি। জেরাফৎ (নেমন্তন্ন) না হয় না-ই করলেন তোমার আব্বা। বল!'

'ওসব হয়নি আমার।'

'কী সব?'

'ওই বিয়ে-টিয়ে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। আমি ভাবছিলাম আপনিই শ্বশুরবাড়ি চলে গেছেন?'

জ্যোৎস্নাআপা হাসলেন। 'আমার মাথা খারাপ? স্কুলে মাস্টারি করছি। বি এড করেছিলাম। জুটে গেল। এখন তো পুজোর ছুটি। আচ্ছা, তোমার তো অনার্স ছিল। রেজাল্টও ভাল করেছিলে। এম এ পড়লে না কেন? তোমার আব্বা লিবারাল মাইন্ডেড মানুষ।'

'বংশের পিদিম। মা ঘিরে রেখেছেন।'

'নাহ্। এটা ঠিক হল না রেশমি! আমি একদিন গিয়ে তোমার মাকে বলব।'

'সে বলবেন'খন। কেন হঠাৎ চলে এলাম শুনুন। আমি গার্ডেনিং করতে চাই। আমাকে হেল্প করতে হবে।'

জ্যোৎস্নাআপা হেসে গড়িয়ে পড়লেন। 'ভাল লোকের হেল্প চাইছ। ফুলের মধ্যে জন্মেছি। কিন্তু আজও আমি ফুলটুল বুঝি না। তোমার হঠাৎ এ নেশা মাথায় চাপল কেন?'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আমার সময় কাটে না।'

'বই পড়। আমার মত বই পড়ে সময় কাটাও।' বলে জ্যোৎস্নাআপা উঠলেন। 'বড্ড ভ্যাপসা গরম পড়েছে। ঘেমেতেতে এসেছ। বস। শরবত করে আনি।'

'প্লিজ আপা! আমি কিছু খাব না। খেয়েই বাসে চেপেছি।'

আঙুল তুলে জ্যোৎস্নাআপা পুরুষালি ভঙ্গিতে বললেন, 'একদম চুপ। আমার পাল্লায় পড়েছ। যা-যা বলব, করতে হবে।"

'আপনার বোনেরা কোথায়? কী যেন নাম—'

'ফুলের নামে নাম। যুঁই, টগর, চামেলী।' জ্যোৎস্না হাসতে লাগলেন। 'তখন গোলাপ বললাম শুনলে তো?' আমার ছোট ভাই। ক্লাস টেনে পড়ে।'

'দোকানে যে থাকে, তার নাম কিন্তু মহফুজ!'

জ্যোৎস্না শাড়ি গুছিয়ে পরতে পরতে বললেন, 'মহফুজের নাম গাঁদা। লোকে গ্যাঁদা বলে ডাকে। তাই ও আগেভাগে জানিয়ে দেয়, আমার নাম মহফুজ। ওর ভীষণ সেন্স অব প্রেসটিজ জান তো? কী রকম স্মার্ট সেজে থাকে লক্ষ করেছ নিশ্চয়। সব সময় চোখে সানগ্লাস। বলি, গাঁদা! কানা হয়ে যাবি যে রে! আস্ত ভিলেন। নাক্কারমার্কা সিনেমা দেখে দেখে—'

জ্যোৎস্না বেরিয়ে গেলেন। টেবিলে ওঁর ছোটবেলার ছবিটা দেখছিলাম। ছবির সঙ্গে এখনকার চেহারার এতটুকু মিল নেই। রোগা মেয়ে ছিলেন। এখন মোটাসোটা হয়েছেন। আমার চেয়ে মাথায় একটু খাটো। গাব্দাগোব্দা পুতুল-পুতুল গড়ন। রঙটা একটু ময়লা। মুখের গড়ন মন্দ না। কিন্তু একটু পুরুষালি ভাব মিশে আছে যেন। কলেজে দেখতাম সব ব্যাপারে দাপট দেখিয়ে ঘুরছেন জ্যোৎস্নাআপা। বরাবর আবৃত্তি আর ডিবেটে ফার্স্ট হতেন।

ছোট্ট ট্রেতে সরবতের গেলাস সাজিয়ে আনলেন। বললেন, 'ফুলকলিরা খেয়েদেয়ে লাশের মত সার বেঁধে খাটে পড়ে আছে। দেখবে চল! সত্যি রেশমি, আমার বোনগুলোর মত জিনিস কোথাও পাবে না। খাওয়া আর ঘুম—বাস। পড়তে পড়তেও ঘুম। প্রতি বছর ফেল করছে। টগর ক্লাস সিক্সে দুবার ফেল করেছে। যুঁই নাইনে আটকে আছে তো আছেই। আর চামেলীর কথা কী বলব।'

জ্যোৎস্নাআপা সবসময় হাসিখুশি মেজাজের মেয়ে। হাসতে হাসতে আমার পাশে পা ঝুলিয়ে বসলেন। সরবত খেয়ে গেলাসটা টেবিলে ট্রের ওপর রাখলাম। বললাম, 'আমি কিন্তু সওয়াচারটের বাসে বাড়ি ফিরব। মাকে কথা দিয়ে এসেছি।'

জ্যোৎস্না আমার একটা হাত নিয়ে বললেন, 'খালাকে (মাসিমা) বলে আসেনি কোথায় যাচ্ছ?'

'বলে এসেছি আপনার কাছে যাচ্ছি।'

'ব্যস! তা হলে আর কোনও কথা নেই। চুপটি করে বস। গোলাপকে বলছি, সাইকেলে করে গিয়ে দুটো সিনেমার ম্যাটনি শো টিকিট আনবে। মোহন টকিজে একটা দারুণ হাসির ছবি এসেছে। একা যেতে ভাল লাগে না।'

'না আপা! মা ভাববেন। মাকে তো আপনি দেখেছেন। একটুতেই—'

পুরুষালি গলায় জ্যোৎস্না বললেন, 'চুপ। কোনও কথা না। আমি তোমাকে রেখে আসব।' বলে বারান্দায় গেলেন। ডাকলেন, 'গোলাপ! একবার শুনে যা তো ভাই।'

ব্যাপারটা লোভনীয়। কতদিন আর সিনেমা দেখা হয় না। কলেজজীবনের সেই দিনগুলো মনে পড়ছিল। কোনও-কোনও দিন জ্যোৎস্নাআপা একদঙ্গল মেয়েকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যেতেন। হুল্লোড় করে রেস্তোরাঁয় খাওয়া হত। ইন্টারভ্যালের সময় বেরিয়ে এসে কাড়াকাড়ি করে বাদাম খাওয়ায় আবেক আনন্দ। মোহনটকিজের দোতলার ব্যালকনি থেকে জ্যোৎস্নাআপা ইচ্ছে করেই নীচে বয়স্ক লোকেদের মাথায় বাদামের খোসা ফেলতেন। এ ধরনের ছোটখাটো দুষ্টুমিতে ওঁর তুলনা ছিল না। কোথায় চলে গেল সেই দিনগুলো। এখন সবাই কে কোথায় ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

জ্যোৎস্না ফিরে এসে বললেন, 'তোমার মনে আছে তো, মোহন টকিজের ম্যানেজার দুলালবাবুর সঙ্গে মামা পাতিয়েছিলাম? দুলালবাবু চাঁপাতলায় বাড়ি করেছেন। ভাল বই এলেই খবর পাঠান। যাওয়া হয় না। একা যেতে ইচ্ছে করে না আসলে।' চাপা শ্বাস ফেলে ফের বললেন, 'খালুআব্বা (মেসোমশাই) কেন এখনও গ্রামে পড়ে আছেন জানি না। বোলো না আব্বাকে, চাঁপাতলায় এখনও জমি পাওয়া যায়, এখানে একটা বাড়ি করুন। আমি জায়গা দেখে দেব।

তুমি গার্ডেনিং করবে বলছ। গ্রামে গার্ডেনিং করে কী হবে? ওসব গ্রামে মানায় না।'

একটু হেসে বললাম, 'মা কিছুতেই আসতে দেবেন না। শহরের হইহল্লায় থাকতে পারবেন না। তাছাড়া জমিজমা পুকুর এসব নিয়ে আব্বারও প্রব্লেম আছে।'

'আমার আব্বারও তো অনেক জমি-বাগান-পুকুর ছিল গ্রামে। আমার ছোটবেলায় আব্বা সব বেচে এখানে চলে এসেছিলেন। তখন এখানে জমি পানির দর। কেউ ভাবতে পারেনি টাউনের এতদূর পর্যন্ত এক্সটেনশন হবে। তবে দেখ, চাঁপাতলা কতকটা গ্রামের মতই চুপচাপ। যা কিছু হইহল্লা, হাইওয়ের ওদিকটায়। এক মিনিট। কাপড় পরে রেডি হয়ে থাকি। গোলাপের ফিরতে দেরি হবে না।'

দরজা ভেতর থেকে আটকে জ্যোৎস্না আমার সামনেই শাড়ি খুলে ফেললেন। ব্লাউজ আর শায়া বদলে একটা ক্রিমরঙের শাড়ি পরলেন। মুখ টিপে হেসে বললেন, 'কী বিচ্ছিরি ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে দেখছ? লোকে দেখে ভাববে প্রেগন্যান্ট—তৌবা, তৌবা! আবার আগের মত মুখখিস্তি করতে যাচ্ছি। আচ্ছা রেশমি, তোমার ফিগার কিন্তু তেমনি আছে। আমি বড্ড বেশি মুটিয়ে যাচ্ছি। কেন বল তো?'

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না চুল আঁচড়ালেন। কাঁধ অবধি ছাটা চুল। হালকা করে ক্রিম ঘষলেন। ভুরুর মধ্যিখানে একটা ছোট্ট লাল টিপ পরলেন। আয়নায় নিজেকে দেখে ভেংচি কেটে বললেন, 'সাজের ঘটা দেখ বাঁদরমুখীর!' তারপর জোরাল হাসি।

বললাম, 'আপনাকে দারুণ দেখাচ্ছে, আপা!'

'থাম। আমি দেখতে কেমন, সেটা আমিই জানি। ফোঁপর দালালি কোর না। এস, তোমাকে একটু সাজিয়ে দিই। চলে এস।'

'নাহ্। আমার সাজতে ভাল লাগে না।'

'খোদা তোমাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছেন, রেশমি! তুমি আর কী সাজবে? তবে তোমার চুলগুলো একটু অগোছাল হয়ে গেছে। মুখটা একটু—চলে এস।' বলে জ্যোৎস্না আলমারির লকার খুলে একটা সেন্টের শিশি বের করলেন। 'লুকিয়ে না রাখলে হাফিজ করে দিত এতদিনে। আমার এক মামাতো ভাই থাকে সউদি আরবের দামাম টাউনে। ওমাসে এসে দিয়ে গেল। তোমাকে দিয়ে উদ্বোধন করা যাক।'

আমি বাধা দেওয়ার আগেই সেন্ট স্প্রে করে আমার গলার নিচে থেকে বুক পর্যন্ত তীব্র সুগন্ধে

ভরিয়ে দিলেন জ্যোৎস্না। আমি বিব্রত আর অপ্রস্তুত। সেন্ট একেবারে মাখি না, তা নয়। ঈদের দুটো পরবে, কিংবা বাড়িতে কোনও মিলাদ হলে একটু সেন্ট মাখি। বললাম, 'আমার বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে, আপা!'

জ্যোৎস্না চোখ বড় করে বললেন, 'ও কী কথা? অস্বস্তি কিসের? তুমি আবার বড্ড গেঁয়ো হয়ে গেছ, রেশমি!'

একটু পরে অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে চুলটা ঠিকঠাক করে নিলাম। পাউডারের পাফটা আলতো হাতে মুখে ও গলায় বুলিয়ে নিলাম। জ্যোৎস্না ঘড়ি দেখে বললেন, 'সওয়া দুটো। গোলাপ এসে যাবে এখনই।'

বললাম, 'কিন্তু আমাদের গার্ডেনিংয়ের কী হবে?'

'সিনেমা দেখার পর গাঁদার কাছে যাব। ও তোমাকে হেল্প করতে পারবে। এসব ব্যাপারে গাঁদা এক্সপার্ট।'

হঠাৎ মনে হল, জ্যোৎস্নাআপাকে চিনুকাকুর কথাটা বলি। আসলে কলেজজীবনে আমাদের কাছে কিংবদন্তির নায়ক ছিলেন চিন্ময় সামন্ত। তাঁর সম্পর্কে কত অদ্ভুত গল্প শুনতাম। সেই মানুষ যে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন এবং শুধু তাই নয়, তিনি যে বাবার বন্ধু, এই ব্যাপারটা আমার কাছে গৌরবের। এই ঘটনা চেপে রাখা যায় না। বললাম, 'জানেন আপা? চিন্ময় সামন্ত আমাদের বাড়ি এসেছিলেন কিছুদিন আগে।'

জ্যোৎস্না জানালায় দাঁড়িয়ে গোলাপের প্রতীক্ষা করছিলেন সম্ভবত। না-ঘুরে বললেন, 'কে সে?'

'চিনু সামন্ত। ভুলে গেছেন ওঁর কথা?'

জ্যোৎস্না ঘুরে বললেন, 'চিনু সামন্ত! তোমাদের বাড়ি — সে কী! কাগজে পড়েছিলাম সে তো জেলে আছে। সাংঘাতিক লোক।'

'জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। পায়ে গুলি লেগেছিল। খুঁড়িয়ে হাঁটেন। আমাদের বাড়িতে দু দিন ছিলেন। আব্বার ছেলেবেলার বন্ধু।'

'সর্বনাশ! ওই খুনে ডাকাত—'

ওঁর কথার ওপর বললাম, 'বিপ্লবী নেতাকে খুনে ডাকাত বলছেন কেন আপা? কী অসাধারণ মানুষ, ভাবতে পারবেন না। আমরা যা শুনতাম, তা বাজে গপ্প।'

জ্যোৎস্না আমাকে পাত্তা দিলেন না। বললেন, 'খালুআব্বাকে বোল, ওসব লোককে যেন এড়িয়ে চলেন। আর, বিপ্লব-টিপ্লব একেবারে বোগাস ব্যাপার। খোদার দুনিয়া নিজের নিয়মে চলে। বুঝলে রেশমি? রাজনীতি-টিতি যারা করে, সবাই ধান্দাবাজ। সাধারণ মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার ব্যাপার। আমার এক চাচা রাজনীতি করতে গিয়ে খুন হয়ে গেলেন। রাজনীতি মানেই খুনোখুনি। এস, বরং গেটে গিয়ে দাঁড়াই।'...

চিনুকাকু সম্পর্কে জ্যোৎস্নাআপার ওইসব কথাবার্তা শুনে মনে-মনে চটে গিয়েছিলাম। কিন্তু জ্যোৎস্নাআপা এমন মেয়ে, ওঁর ওপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকা যায় না। সত্যিই খুব হাসির ছবি। জ্যোৎস্নাআপা আমাকে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে অস্থির। ইন্টারভ্যালের সময় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আগের মত আমরা বাদাম খেলাম। জ্যোৎস্নাআপা নীচে লোক বেছে-বেছে বাদামের খোসা ছুঁড়ে ফেলছিলেন।

সাড়ে পাঁচটায় ছবি শেষ হল। রিকশো করে দুজনে মহফুজের কাছে যাচ্ছিলাম। তখনও দিনের আলো আছে। জেলখানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাজাদার কথা মনে পড়ল। কিন্তু কল্পনা স্টুডিও পেছনে ফেলে এসেছি। একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আচ্ছা আপা, রাজাদার সঙ্গে দেখা হয় না আপনার?'

'হয় কী? প্রায়ই হয়। গাঁদার জিগরি দোস্ত্। কোনও কোনও রাত্তিরে ওর সঙ্গে আমাদের বাড়িতে চলে যায়। অদ্ভুত ছেলে!'

'অদ্ভুত কেন?'

'তুমি তো ওকে দেখেছ। তোমাকে কিছু মনে হয়নি?'

'নাহ্! আমার সঙ্গে আলাপ ছিল না।'

'আসলে তুমি গ্রামের মেয়ে তো। তাই আড়ষ্টতা কাটেনি। রাজা দারুণ। রাজা দারুণ মিশুকে ছেলে। তুমি যদি মিশতে ওর সঙ্গে, দেখতে প্রায়ই তোমাদের বাড়ি চলে যেত।'

একটু হেসে বললাম, 'সেজন্যই মিশিনি।'

জ্যোৎস্না আপা সিরিয়াস হয়ে বললেন, 'না—রাজা পরকে শিগগির আপন করে নিতে জানে। ওর জীবনে একটা ট্রাজিক ব্যাপার আছে—ঝোঁকের মুখে একদিন বলে ফেলেছিল। আমাকে তো জান! জেরায় জেরবার করে হাঁড়ির খবর বের করে নিতে জানি।'

'রাজাদার মায়ের ব্যাপার। তাই না?'

'তুমি শুনেছ? কেথায় শুনলে? কার কাছে?'

'কথায় কথায় আব্বা বলেছিলেন।'

'হ্যাঁ। কোনও কথা চাপা থাকে না। যেভাবে হোক, বেরিয়ে পড়ে। তবে জান? ছেলেটার জন্য আমার কষ্ট হয়। একা নিজের জোরে দাঁড়িয়ে আছে।' বলে জ্যোৎস্নাআপা হঠাৎ আমার দিকে কেমন চোখে তাকালেন। 'তুমি চিনু সামন্তর কথা বলছিলে। ওই লোকটার পাল্লায় পড়ে একসময় রাজার খুব ভোগান্তি হয়েছিল, জান? আমার যে-চাচা পলিটিক্স করতে গিয়ে খুন হলেন, তিনিই রাজাকে বাঁচিয়েছিলেন পুলিশের হয়রানি থেকে। তোমার আব্বাকে বোল, খবর্দার যেন ওই লোকটাকে পাত্তা না দেন।'

ওঁর কথার ভঙ্গিতে হাসি পেল। বললাম, 'চিনুকাকুর আর বিপ্লব করার ক্ষমতা নেই। পায়ে গুলি লেগে খোঁড়া হয়ে গেছেন।'

জ্যোৎস্নাআপা অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'তবু কিছু বিশ্বাস নেই।'

মহফুজের নার্শারির দোকানের সামনে রিকশো থামল। জ্যোৎস্নাআপা ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হাঁক ছাড়লেন পুরুষালি ভঙ্গিতে। 'গাঁদা! এই দ্যাখ্ তোর এক দামী খদ্দের নিয়ে এলাম অবেলায়।'

দোকানের সামনে অজস্র টবে গাছের চারা। কোনওটিতে জমকালো ফুল। দোকানের ভেতরটা দেখা যাচ্ছিল না। এইমাত্র আলো জ্বলে উঠল। কেউ বলল, 'উরে ব্বাস! জ্যোৎস্নাদি যে!'

জ্যোৎস্না প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অনেকদিন বাঁচবি রে। এইমাত্র তোর কথা বলতে বলতে বলতে আসছিলাম। দ্যাখ তো, একে চিনতে পারিস নাকি?'

আমার বুকের ভেতর একটা গরম ঢিল গড়িয়ে গেল। দেখামাত্র রাজাদাকে চিনতে পেরেছিলাম। সেই একই শান্ত মুখভঙ্গি, দূরের কিছু দেখার মত চাউনি, একমাথা এলোমেলো চুল। আস্তে বলল, 'চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু—'

জ্যোৎস্নাআপা চোখ কটমটিয়ে বললেন, 'কিন্তু কী রে হতচ্ছাড়া? নাম বল্।'

রাজাদা মাথা চুলকে বলল, 'নামটা কী যেন—বেশ সুন্দর নাম। হুঁ, গার্লস কলেজে দেখেছি।'

'খুব হয়েছে। তোর দ্বারা কিস্যু হবে না। এমন একটা মিষ্টি মেয়েকে যে একবার দেখবে, সে ভুলবে না। তুই একেবারে সৃষ্টিছাড়া জীব যে।' জ্যোৎস্নাআপা আমার কাঁধে হাত রেখে হাসলেন। 'রেশমি কিন্তু তোকে ঠিক চিনতে পেরেছে। তাই না রেশমি?'

রাজাদা একটু নড়ে উঠল। 'হ্যাঁ—রেশমি! বসুন, বসুন।' সে উঠে দাঁড়িয়ে যে চেয়ারে বসে ছিল, সেটা দেখিয়ে দিল।

জ্যোৎস্না আপাও হুকুম দিলেন, 'বস রেশমি!'

কিন্তু আমি ইতস্তত করছি দেখে আমার কাঁধ ঠেলে বসিয়ে দিলেন। নিজে একটা টুলে বসে বললেন, 'গাঁদা কোথায় রে?'

রাজাদা বলল, 'আমাকে বসিয়ে রেখে কোথায় গেল। এখনই এসে পড়বে।'

জ্যোৎস্নাআপা বিরক্ত মুখে বললেন, 'রেশমি ছটার বাস ফেল করবে। গেল কোথায় একটু দ্যাখ না ভাই!'

রাজাদা বলল, 'খড়ের গাদায় সূচ খোঁজা হবে জ্যোৎস্নাদি!'

'এই করে দোকান চালাবে। কোনও মানে হয়?' জ্যোৎস্নাআপা হঠাৎ ফিক করে হাসলেন। 'রেশমি ফুলবাগান করবে, বুঝলি রাজা?'

রাজাদা আমাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'বাঃ। ভালোই তো। কিন্তু উনি বাসে কোথায় যাবেন?'

'বাড়ি যেতে হবে না?'

'কোথায় সেটা?'

'ও ম্মা! তা হলে তুই যে এমন ভাব দেখালি, রেশমিকে ভীষণ চিনিস?'

'ওঁকে চিনতে পেরেছি। কিন্তু উনি কোথায় থাকেন জানি না।'

'যাক্। আর বেশি জেনে কাজ নেই।' জ্যোৎস্নাআপা চাপা স্বরে বললেন, 'জানিস রাজা? তোর একসময়কার বিপ্লব করা গুরু রেশমির আব্বার বন্ধু। ওদের বাড়ি গিয়েছিল।

'কে বলুন তো?'

'তোর কথায়-কথায় ন্যাকামি! চিনু সামন্ত।'

রাজাদা একটু হাসল। 'চিনুদার সঙ্গে দেখা হয়েছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন।'

জ্যোৎস্নাআপা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'খবর্দার রাজা! আর ওর ছায়া মাড়াবিনে। নিশ্চয় তোকে দিয়ে পোস্টার লেখাতে এসেছিল?'

'না জ্যোৎস্নাদি! চিনুদা আর আমি একই গ্রামের জানেন তো?'

'সর্বনাশ! বলিস কী রে?'

'কোনও সর্বনাশ নয়। গ্রামে আমার পৈতৃক বাড়িটাও আর নেই। চিনুদারটা অবশ্য আছে।' বলে রাজাদা আমার দিকে তাকাল। 'চিনুদা আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলেন কেন জানেন?'

জবাব দিতে যাচ্ছি, সেই সময় মহফুজ এসে গেল। আমাকে দেখে সে একটু অবাক হয়ে বলল, 'আপনি রেশমিদি না?'

জ্যোৎস্নাআপা বললেন, 'দিদি-টিদি পরে করিস! রেশমি কী বলছে শোন।'...

সেদিন সন্ধ্যায় বাস থেকে যখন নামলাম, আমার মনে একটা বিশাল উদ্দীপনা ছিল। সেই উদ্দীপনা নিজের জীবনটাকে আমূল বদলে দেওয়ার। অদ্ভুত একটি স্বাধীনতা ভূতের মত পেয়ে বসেছিল আমাকে। শুধু মনে হচ্ছিল, ইচ্ছে করলেই আমি কতকিছু করতে পারি। অথচ এতদিন করিনি। ইচ্ছে নামে কোনও ব্যাপারই আমার মধ্যে এতদিন ছিল না যেন।

বাসস্টপের ওখানে গ্রামের শেষ। একটুকরো ছোট্ট বাজার ঝলমল করছিল আলোয়। আশেপাশের গ্রাম থেকেও অনেক মানুষ সন্ধ্যার দিকে ওখানে আড্ডা দিতে আসে। কয়েক পা যেতেই হাসিমুখে কালুচাচাকে দেখলাম। 'বাঁচা গেল বাবা! বিবিজি অস্থির তুমি ফিরছ না দেখে।' সে সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'খুব ভাল খবর আছে গো! উকিলসায়েব নুরপুরে গিয়েছিলেন ছেলে দেখতে। দেখে পছন্দ হয়েছে। বড় পাশকরা ছেলে। দেখতে শুনতেও নাকি ভাল। ফটো এনেছেন। বুঝলে? ভারি সোন্দর ছেলে।'

চমকে উঠেছিলাম। হঠাৎ যেন সামনে পাঁচিল। বললাম, 'চুপ কর তো!'

কালু হাসতে লাগল। 'চুপ করলে চলে, আল্লার দোয়ায় আদ্দিনে তোমার একটা হিল্লে হচ্ছে। লোকের চোখে কাঁটা বিঁধছিল আদ্দিন। এবারে দ্যাখ্ তোরা—'

'তুমি থামবে!'

কালু বিব্রতভাবে চুপ করল।

বাড়ি ঢুকতেই মা ঝাঁপিয়ে এলেন। 'এত রাত করে বাইরে থাকে? তুই বড্ড ভাবনায় ফেলিস বাবা!

বললাম, 'কাল সেই জ্যোৎস্নাআপা আসবেন। সঙ্গে ওঁর ভাই এবং আরও একজন।'

'বেশ তো!'

বাবা বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। কলকাতার কাগজ এখানে পৌঁছুতে বিকেল গড়িয়ে যায়। কাছে গিয়ে বললাম, 'আব্বু! আমি গার্ডেনিং করব। এই দেখুন, একটা বই কিনেছি।'

বাবাও মায়ের মত আস্তে বললেন, 'বেশ তো।' বাবা মা দুজনকেই খুব শান্ত এবং কোমল মনে হল। আমার হিন্নে হওয়ার সম্ভাবনায়?...

৫

সে-রাতে খাওয়ার পর ঘরে এসে টেবিলল্যাম্পের আলোয় মহফুজের দেওয়া 'সচিত্র উদ্যান রচনা এবং পুষ্পসজ্জা' বইটা মন দিয়ে পড়ছি, বাইরে মায়ের সাড়া পেলাম। 'রেশমি! শুয়ে পড়েছিস নাকি?'

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কেন?'

'দরজা খোল্ না বাবা!'

'কোনও কথা থাকলে সকালে। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

মায়ের হাসি শোনা গেল। 'এখনই ঘুমোবার ছেলে তুমি?'

ছেলে কথাটা শুনে আমারও হাসি পেল। মায়ের ছেলেবেলা নিয়ে একবার হাসাহাসি করায় বাবা বলেছিলেন, বাংলায় ছেলে কথাটার মানে সন্তান। তাই আগের দিনে মেয়েদেরও ছেলে বলা হত। আমি বলেছিলাম, সে যখন হত, তখন হত। এখন শুনতে অদ্ভুত লাগে। বাবা স্বীকার করেছিলেন, তা অবশ্যই লাগে। যে-যুগের যা রীতি।

দরজা খুলে দিলাম। মা ঘরে ঢুকে খাটে পা ঝুলিয়ে বসলেন। তারপর বললেন, 'বড় আলোটা জ্বেলে দে।'

'কেন? ঝিলের ভূতগুলো ঘরে ঢুকবে বুঝি?'

'তকবার (তর্ক) করিস না বাবা। তোকে একটা জিনিস দেখাব।'

মায়ের হাতে কী একটা ছিল। 'দেখি' বলে হাত বাড়ালে কাপড়ের ভেতর চাপা দিলেন। শান্ত চাপা স্বরে বললেন, 'অমন করে না। আলো জ্বাল

'কী ওটা?'

'আঃ। আলোটা জ্বেলে দে আগে।'

জিনিসটা দেখার জন্য সুইচ টিপে দেয়াল বাতিটা জ্বেলে দিলাম। তখন মা লুকনো জিনিসটা হাসিমুখে আমার হাতে দিলেন। দেখি একটি পোস্টকার্ড সাইজ ফোটো। গাঁট্টাগোট্টা ভারিক্কি চেহারার এক যুবক। মুখে সামান্য দাড়িও আছে। ঠোঁটের কোণে হাসির একটু চেষ্টাও লক্ষ করলাম। অবাক হয়ে বললাম, 'এ কার ছবি?'

মা তেমনি হাসিমুখে বললেন, 'অত শিক্ষিত ছেলে। কিন্তু আজকালকার শিক্ষিত ছেলেদের মত বেলেল্লা নয়। খুব পরহেজগার (ধর্মপ্রাণ)। পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে। তোর আব্বুর তো খুবই পছন্দ। বললেন, যেমন মিষ্টি স্বভাব, তেমনি আদবকায়দা। চোখ তুলে কথা বলতে পারে না, এমন লাজুক ছেলে। বদ নসিব দ্যাখ্ নিজের মা বেঁচে নেই। বাবা থেকেও না-থাকা। নিজের চেষ্টায় এম এ পাশ করেছে—হলেই বা প্রাইভেটে। তোর আব্বু বলছিলেন, তোরও প্রাইভেটে এম এ দিতে অসুবিধে হবে না। চাকরি করার জন্য তো নয়, লোকে বলবে—হ্যাঁ, উকিল সায়েব এম এ বি এল। ওঁর মেয়ে-জামাই এম এ...'

ছবিটা একবার দেখে নিয়েই মায়ের পাশে বিছানায় ফেলে দিয়েছিলাম। মায়ের মুখের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে ছিলাম। তারপর চেয়ারে বসে আবার বইটার পাতায় চোখ রাখলাম।

মা বলল, 'কী রে? একটা কথা তো বলবি বাবা! অ রেশমি!'

'উঃ! কান ঝালাপালা করে দিলে। থামো তো?'

'কথা শোন! বিয়ে শাদি করতে হবে না—লোকের চোখের কাঁটা হয়েই থাকবি। লোকে পাঁচমুখে দশ কথা বলবে।' মা উঠে আমার পাশে এসে বইটার দিকে ঝুঁকে বললেন, কী বই অত মন দিয়ে পড়ছিস? ওগুলো রঙচঙে কী? আমার খালিচোখে বইকেতাব নজর হয় না। দাগড়া-দাগড়া লাল—এগুলো নকশা নাকি?'

মাঝে মাঝে মায়ের কথাবার্তা ভাবভঙ্গি জোকারের মত লাগে। হেসে ফেললাম, যদিও হাসবার মত মন নেই। বললাম, 'এগুলো বেহেশতের ফুল। মানুষ বেহেশ্‌ত্‌ থেকে চুরি করে এনেছে।'

মা জিভ কেটে বললেন, 'গোনাহ্‌, (পাপ) হবে। ও কথা বলে না। মানুষের সাধ্যি কী যে খোদার বাগানের ফুলে হাত দেয়?'

'আমি দেব। খোদার ওপর খোদকারি করব, দেখে নিও।'

মা একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'শহরবাজারে বেপর্দা ঘুরে তুই বড্ড বেলেল্লা হয়েছিস, রেশমি!'

বসে থেকেই মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'আম্মি! কাল সকালে কিন্তু জ্যোৎস্নাআপারা আসছেন। মনে আছে তো?'

মা চাপা শ্বাস ফেলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে টেবিলে রাখা আমার ফোটোর পাশে দাড়িওলা লোকটার ছবি দাঁড় করালেন। তারপর আপনমনে বললেন, 'সবই খোদার ইচ্ছা। দেখা যাক্‌।'

ব্যাপারটা দেখে বললাম, 'ওই ছবিটা তুমি তোমার ঘরে বাঁধিয়ে রেখে দিও।'

মা আমার কথায় কান করলেন না। আপনমনে বললেন, 'মিরসায়েব বলেছেন, জামাই শ্বশুর ঘরে থাকবে। তার আবার দাবিদাওয়া কিসের? তবে মাস্টারি ছাড়া ঠিক হবে না। উকিলসায়েব একখানা মোটরসাইকেল কিনে দেবেন। তাতে চেপে ইস্কুলে আসা-যাওয়া করবে।'

বইটা বন্ধ করে বললাম, 'এবার আমার ঘুম পাচ্ছে। শোব। তুমি বেরোও!'

মা পা বাড়িয়ে বললেন, 'হুঁ, ঘুমো।'

'ছবিটা পড়ে রইল।'

'থাউক।' বলে মা বেরিয়ে গেলেন।

দরজা বন্ধ করে দেয়ালবাতিটা নিভিয়ে দিলাম। তারপর টেবিলবাতির আলোয় ছবিটা তুলে ভেংচি কেটে আস্তে বললাম, 'মিয়াঁসায়েব! এ রেশমি তোমার জন্য জন্মায়নি।'

কথাটা বলেই হঠাৎ বুকটা ধড়াস করে উঠল। ছবিটা উপুড় করে টেবিলে রেখে চুপচাপ বসে রইলাম। আসন্ন বাস্তবতা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকেই পাল্টা ভেংচি কাটতে থাকল। আবিষ্কার করলাম, আমি কত অসহায়। কারণ বাবাকে আঘাত করার সাধ্য আমার নেই। তাঁকে অস্বীকারের কথা আমি ভাবতেও পারি না।

একটু পরে ড্রয়ার থেকে চিনুকাকুর চিঠিটা বের করে কয়েকবার পড়লাম। চিনুকাকু আমাকে একটা রুক্ষ নির্দয় বাস্তবতা থেকে একটা স্বপ্নের লাবণ্যে পৌঁছে দিলেন। প্যাড টেনে চিঠিটার জবাব লিখছিলাম।

'শ্রদ্ধেয় কাকু,

আজ সকালের ডাকে আপনার চিঠিটা পেয়ে ভাল লাগল। শুধু ভাল লাগল তা-ই নয়, নিজের অজ্ঞাতসারে কতকিছু অদলবদল ঘটে গেল, এখন রাত দশটায় সব বুঝতে পারছি। শুনলে হাসবেন হয়ত, আপনার চিঠিটা পড়েই শহরে ছুটে গেলাম। আমার চেনাজানা একটা নার্শারির সঙ্গে ব্যবস্থা করে এলাম। ডিটেলস এখন বলছি না। কিন্তু একটা আশ্চর্য ঘটনাও যে ঘটে গেল, আপনাকে ছাড়া কাকেও জানাতে পারছি না। আপনি যার কথা বলেছিলেন, সেই রাজাদা—তার সঙ্গে ঘটনাচক্রে আলাপ হয়ে গেল। আরও শুনুন, আগামীকাল সে আমাদের বাড়ি আসছে। বাবা ভড়কে যাবেন একটু। কিন্তু আসল কথাটা হল, আমি কিন্তু রাজাদাকে আসতে বলিনি। নিজেই আসতে চাইল যখন, কোন মুখে বারণ করব? তবে ভেবে দেখুন, আমার তুচ্ছ জীবনে একটা বিপ্লব ঘটতে চলেছে—তাই না? এবার অন্য একটা সাংঘাতিক খবর দিই। বাবা নুরপুরে অবশেষে আজই উপযুক্ত জামাই খুঁজে পেয়েছেন। খুব ধর্মপ্রাণ লোক এবং প্রাইমারি টিচার। মজার কথা, সেই ধর্মপ্রাণ শিক্ষক (মুখে ধর্মের চিহ্নরূপে সামান্য দাড়ি আছে) এখন উপুড় হয়ে আমার টেবিলে পড়ে আছে এবং মাথা কুটছে। বুঝলেন কিছু? যদি বোঝেন, শিগগির জানান, আমার কী করা উচিত। এ আমার জীবন-মরণ সমস্যা।...'

অনেক ভেবেও আর কী লেখা উচিত ঠিক করতে পারলাম না। সই করতে গিয়ে হাত কেঁপে উঠল। এসব আমি কী লিখছি? চোখে জল এল। তারপর কাঁপা-কাঁপা হাতে নাম সই করলাম।...

জ্যোৎস্নাআপা আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকবার এসেছেন। ওঁর বাবার সঙ্গে আমার বাবার পরিচয় আছে, সেই সূত্রে অবশ্য নয়। এসেছেন কিছুটা আমার টানে, কিছুটা নিজের স্বভাবে। হুল্লোড়বাজ মেয়ে জ্যোৎস্নাআপা। সহজেই অন্যের সঙ্গে ভাব জমাতে পটু। মা একমুখে ওঁর প্রশংসা করতেন। আবার অন্য মুখে আড়ালে একটু নিন্দা না করেও ছাড়তেন না। আসলে মায়ের মনে আদর্শ মুসলিম মেয়ের একটা ছবি আঁকা আছে। তার সঙ্গে না মিললে একটু ক্ষুব্ধ হন। তবে জ্যোৎস্নাআপা একবার এসেই মাকে জিতে নিয়েছিলেন। এর বড় একটা কারণ, জ্যোৎস্নাআপাকে দারুণ অভিনেত্রী বলা চলে। মায়ের ধর্মকথায় চমৎকার সায় দিতেন। এমন কী মায়ের পাশে নামাজ পড়তেও দাঁড়াতেন। কপট চোখ পাকিয়ে আমাকেও টানতেন। পরে চুপিচুপি বলতেন, 'যেখানে যেমন, সেখানে তেমন না চললে বাঁচা যায় না রেশমি। দুনিয়ায় কতরকম মানুষ আছে। কতরকম বাতিক তাদের।' বলে হেসে অস্থিরও হতেন। পরকে একমুহূর্তে আপন করে নিতে জ্যোৎস্নাআপার জুড়ি ছিল না।

এবার একটু ভাবনা ছিল রাজাদা ওঁর সঙ্গে আসছেন বলে। রাজাদা সম্পর্কে বাবার তেতো মন্তব্য শুনেছি। সম্ভবত বাবা উড়ো কথা শুনেই অমন খারাপ একটা ধারণা করেছেন। রাজাদার সঙ্গে সরাসরি পরিচয় থাকলে কখনও হয়ত অমন মন্তব্য করতেন না।

সেদিন সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নাআপাই হুল্লোড় তুলে বলেছিলেন, 'রাজাও আমাদের সঙ্গে যাবে। দারুণ জমবে তা হলে।' কী জমবে জানতাম না, কিন্তু এর পর আমিই বা কোন মুখে রাজাদাকে আসতে বারণ করি? পরে মনে হয়েছিল, রাজাদার সঙ্গে বাবার মুখোমুখি চেনাজানা হওয়ার এই সুযোগটা মন্দ নয়। এতকাল বাদে নিজের কাহিনী লিখতে বসে খোলাখুলি স্বীকার করছি, আমি তখনও রাজাদার প্রেমে পড়িনি। চিনুকাকু ওর কথা তুলে আমার মনের কোনার দিকে একটা অস্পষ্ট ছবি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। চিনুকাকুর প্রতি যেমন, তেমনি রাজাদার প্রতি কিছু মমতাজড়ান কৌতূহল ছিল শুধু। এর বেশি কিছু নয়। আমি তো সেরকম মেয়ে নই যে কথায় কথায় যার তার সঙ্গে প্রেমে ঝুলে যাব!

সকালে ইচ্ছে ছিল নিজেই ডাকঘরে চিনুকাকুর চিঠিটা পোস্ট করতে যাব। কিন্তু মায়ের মেজাজ খারাপ হতে পারে ভেবেই কালু চাচাকে চিঠিটা দিয়েছিলাম। চিঠিপত্তর হাতে নিতে সুযোগ পেলে কালু চাচার চেহারা বেশ স্মার্ট হয়ে ওঠে। যেন কোনও সম্মানজনক জিনিস বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এমন ভক্তিভাবও মুখে ফুটে ওঠে। সে মাঠে যাওয়ার সময় খামটা ফতুয়ার পকেটে যত্ন করে নিয়ে গেল।

দশটার বাসে জ্যোৎস্নাআপাদের আসার কথা। সময় কাটছিল না। বাগানে গিয়ে চিনুকাকুর দেখান জায়গাগুলো লক্ষ করছিলাম। মহফুজ বলেছিল, সার দিয়ে মাটি তৈরি করতে হবে। সে সব কিছু হাতেনাতে বুঝিয়ে দেবে। কিছু সার সে নিয়ে আসবে। কয়েকটা চারাও আনবে। কিন্তু বাগান করার চেয়ে অন্য একটা ইচ্ছা মাঝে মাঝে মনের ভেতর বড হয়ে উঠছিল। জ্যোৎস্নাআপাকে দিয়ে দাড়িওয়ালা প্রাথমিক শিক্ষকটিকে হেনস্থার ইচ্ছা। আমি তো জানিই, জ্যোৎস্নাআপা এসব ব্যাপারে দারুণ ওস্তাদ। একবার একটা লোক তাঁকে নাকি বিয়ে করতে চেয়েছিল। উনি সেই লোকটার একটা ছবি কৌশলে বাগিয়ে মুখে কালি মাখিয়ে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। কলেজে পড়ার সময় এই কীর্তির কথা জ্যোৎস্নাআপা বেশ রসিয়ে বলতেন। আমার বেলায় অবশ্য একটু সমস্যা আছে। ছবিটা বাবা নিয়ে এসেছেন এবং এ-ও জানি, ছবিটা মাকে দেখানোর জন্য আনেননি, এনেছেন আমাকে দেখাতে। কিন্তু মায়ের কথায় আঁচ করেছি, আসলে বাবারই খুব পছন্দ হয়েছে দাড়িওয়ালা শিক্ষকটিকে। আমি না করে দিলে বাবা হয়ত ক্ষুব্ধ হবেন। এখানে আমার একটা প্রচণ্ড দুর্বলতা থেকে গেছে। মায়ের কথায় আমি এক 'বাপ-সোহাগী মেয়ে!' সত্যিই যে তা-ই!

এদিন সকালে বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। গ্রামে থাকলে বাবা মসজিদে ভোরের নামাজ পড়ে এসে দলিজঘরে অফিসে বসার মত বসে থাকেন। গ্রামের প্রবীণ হিন্দু-মুসলিম মুরুব্বিগোছের লোকেরা

কাজে বা অকাজে ভিড় জমান। নাশতা খেতে দেরি হলে মা চটে গিয়ে বলেন, 'বাদশার দরবার কখন ভাঙবে দেখে এস তো কালুর মা।' বুড়ির পুরুষ মানুষের দরবারে ঢুকতে কোনও সংকোচ নেই। পর্দার ফাঁকে মুখ গলিয়ে বলে, 'দু'পহর বেলা হল—পেটে দানাপানি দেবেন না গো? অ বাপজান!' অমনি বাদশাহের দরবার ভেঙে যায়।

বাগানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। প্রতীক্ষা ব্যাপারটা যে কত কষ্টকর এই প্রথম অনুভব করছিলাম। দশটা বেজে গেছে। এখনও জ্যোৎস্নাআপারা এলেন না। যদি না আসেন, ভীষণ খারাপ লাগবে আমার। দিন কাটান অসহ্য হয়ে উঠবে। রাগ হচ্ছিল জ্যোৎস্নাআপার ওপর। অন্য কোনও হুল্লোড়ে মেতে গিয়ে হয়ত আমার কথা ভুলেই গেছেন। মনে মনে ওঁর ওপর যথেচ্ছ ঝাল ঝাড়ছি, এই সময় খিড়কির দরজায় বাবাকে দেখতে পেলাম। বললেন, 'কৈ রেশমি? তোর গেস্টরা কোথায়?

কথাটা শুনে ভারি ভাল লাগল। তাই বললাম, 'জ্যোৎস্নাআপার ব্যাপার। হয়ত অন্য কোথাও গিয়ে জুটেছেন।'

বাবা কব্জি তুলে ঘড়িতে সময় দেখে বললেন, 'এসে যাবে'খন। আমি একটু বেরুচ্ছি। ফিরতে রাত হয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে দেখা হবে না। জ্যোৎস্নাকে বলিস—'

'ও আব্বু!' আদুরে গলায় বললাম। 'আজ কোথাও না-ই বা গেলেন?'

বাবা একটু হেসে বললেন, 'তোর মামুজির বাড়ি যাচ্ছি!'

'সে কী! হঠাৎ মামুজির বাড়ি কেন আব্বু?'

'জরুরি কাজ। তুই জ্যোৎস্নাদের খাতিরযত্ন করিস। কালুকে বলা আছে, শিগগির মাঠ থেকে বাড়ি ফিরবে। আর জ্যোৎস্নাকে বলিস, শিগগির ওদের বাড়ি যাব। ওর আব্বা সব ডকুমেন্টস রেডি রাখেন যেন। কোর্ট খুললেই প্লেস করব। যেন কোনও চিন্তা না করেন চৌধুরি সাহেব।'...

রাজাদার সঙ্গে বাবার তা হলে দেখা হচ্ছে না ভেবে দমে গেলাম। বাবা চলে যাওয়ার একটু পরে মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আব্বু হঠাৎ মামুজির বাড়ি গেলেন কেন আম্মি?'

জবাবটা দিল কালুর মা। ফোকলা দাঁতে হেসে বলল, 'তোমার শাদি লাগাচ্ছেন যে উকিলসায়েব! কুটুমসোদরের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে হবে না? এত বড় একটা কাজ।'

আমার মাথার ভেতর একটা ঠাণ্ডা হিম ঢিল গড়িয়ে গেল। আমার রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার মামুজি যদি এতে নাক গলান, আমার কিছুই করার থাকবে না। পুলিশ অফিসার ছিলেন বলেও না, মামুজি খুব রাশভারি প্রকৃতির মানুষ। যা বলবেন, তা করা চাই। শুধু একটাই স্বস্তি যে উনি অনেকদিন থেকে অসুস্থ শুনেছি। মা গত মাসে একদিনের জন্য দেখতে গিয়েছিলেন। তখন উনি শয্যাশায়ী ছিলেন। এতদিনে যদি সুস্থ হয়ে ওঠেন?

মনে হল , আমাকে একটু একটু করে ঘিরে ফেলা হচ্ছে চারদিক থেকে। অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হয়ে উঠলাম। মা রান্নাঘরেব বারান্দা থেকে আমাকে লক্ষ করছিলেন। বললেন, 'তোর মেহমানরা কৈ রে?'

রাগ করে বললাম, 'আসবে না।'

তারপর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে দিলাম জোরে। একটু পরে টেবিলের দিকে ঘুরে দেখি, প্রাথমিক শিক্ষক ভদ্রলোকের ছবিটা নেই। সেটা উল্টো করে রাখা ছিল। আবার চমকে উঠলাম। ছবিটা তা হলে বাবা তাঁর শ্যালককে দেখাতে নিয়ে গেলেন!

কোনও-কোনও মুহূর্তে সঙ্গীতেও কোনও আশ্রয় থাকে না । এ তেমনি একটা সময়। রেকর্ডপ্লেয়ারটা বন্ধ করে ফ্যান চালিয়ে দিলাম। মাথাটা কেমন করছিল। খাটে চিত হয়ে শুয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে জ্যোৎস্নাআপার হইচই কানে এল। জানালা দিয়ে দেখলাম, উনি 'খা. মা. খালামা' স্লোগান হেঁকে সদলবলে সদর দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকেছেন। শিউলিগাছের ছায়ায় মহফুজ আর রাজাদা দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নাআপা রান্নাঘরের বারান্দায় উঠে মায়েব কদমবুসি (পদচুম্বন) করে হাঁক ছাড়লেন, 'হোয়্যার ইজ রেশমি?' তারপর উদ্দাম হাসি।

বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালাম। জ্যোৎস্না আমাকে দেখে বললেন, 'এ কি রেশমি! এখনও ঘুমোচ্ছিলে নাকি? চোখ ফুলে ঢোল!'

বললাম, 'এ ঘরে আসুন আপা! মহফুজ ভাইদের ডাকুন।'

জ্যোৎস্না ওদের দিকে ঘুরে উজ্জ্বল মুখে বললেন, 'খালামা! আপনাকে গাঁদার কথা বলেছিলাম। ওই সেই গাঁদা। আর ওই আর এক ভাই আমার। খোদার মেহেরবানিতে খালামা, আমার ভাইবোনেদের গুণে শেষ করতে পারবেন না। গাঁদা! কাম্ অন! খালামাকে কদমবুসি কর হতভাগারা! কোন খান্দানি ঘরের মেয়ে জানিস আমার খালামা? খানবাহাদুরের মেয়ে। বুঝেসুঝে চলবি।'

মা ঘোমটা একটু বাড়িয়ে দিলেন। মহফুজ আর রাজা মায়ের পা ছুঁতে গেল পালাক্রমে। মা বিব্রত হয়ে বললেন, 'থাক বাবা! থাক! খোদা তোমাদের হায়াত দরাজ (দীর্ঘায়ু) করুন।'

জ্যোৎস্না হাঁকলেন, 'গাঁদা! তোরা রেশমির ঘরে গিয়ে বোস। আমি খালামার সঙ্গে গল্প করি।'

রাজাদা এগিয়ে এল। মহফুজ বলল, 'ওই জিনিসগুলো ওখানে থাকবে?'

জ্যোৎস্না বললেন, 'থাক।' তারপর একটা সন্দেশের প্যাকেট বের করলেন। প্যাকেটটা টেবিলে রেখে একটা সন্দেশ বের করে মায়ের মুখে গুঁজে দিলেন। মা বিব্রতভাবে হাসছিলেন।

রাজাদা আমাকে বলল, 'এসে গেলাম তা হলে!'

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। আস্তে বললাম, 'ভেতরে গিয়ে বসুন। আসছি।'..

সেই সময়টা চিরকালের একটা ছবি হয়ে টাঙান আছে অবচেতনায়। তাই স্বপ্নে বারবার ফিরে আসে। সে ছিল আমার বাগান রচনার প্রথম দিন। স্বাধীনতার ভেতরকার তীব্র স্বাদ সমস্ত অনুভূতি দিয়ে জেনে নেওয়ার মুহূর্তগুলো সেদিনই নিয়তি আমাকে উপহার দিয়েছিল।

কালুচাচা চৌকো জায়গার চিহ্ন দিয়ে কোদালে মাটি কোপাচ্ছিল। মহফুজ আমাকে মাটি তৈরির প্রক্রিয়া বোঝাচ্ছিল। জ্যোৎস্নাআপা মায়ের কাছে জমিয়ে বসে আছেন রান্নাঘরে। রাজাদা গোড়াবাঁধান কাঞ্চনতলায় বসেছিল। হঠাৎ একসময় দেখি, সে ঝিলের ধারে হিজলগাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের একটা পাশে ঝলমলে রোদ পড়েছে। কালো একরাশ চুল অল্প বাতাসে এলোমেলো হচ্ছে। হঠাৎ মনে হল কোনও এক অলৌকিককে দেখছি। কিছুতেই সত্য বলে মনে হচ্ছিল না ওই দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনাটা। ইচ্ছে করছিল গিয়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি বাস্তব না মায়া? ঠিক ওখানে দাঁড়িয়েই তো একদিন চিনুকাকু হঠাৎ বলে উঠেছিলেন, 'একটা ছেলে—রাজা...' এক যে ছিল রাজা, এই রূপকথার গল্পের মত।

এইসব অনুভূতিকেই কি প্রেমে পড়ার লক্ষণ বলে? কে জানে বাবা! প্রেম-ট্রেম কখনও করিনি। জ্ঞানত আমি কিন্তু তখনও রাজাদার প্রেমে পড়িনি। শুধু এটুকু বলতে পারি, ঝিলের ধারে ওইরকম একটি দাঁড়িয়ে থাকা আমার কাছে একটি চমকের বেশি কিছু ছিল না। হঠাৎ কোথাও কোনও সৌন্দর্য চোখে পড়লে বিস্ময়-জড়ান মুগ্ধতা এসে যায়।

জ্যোৎস্নাআপা পা টিপে টিপে এসে আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। সেই মুগ্ধতার বোধটা তছনছ হয়ে গেল। কানের কাছে মুখ এনে চাপা স্বরে বললেন, 'অমন একটা সুখবর দিব্যি চেপে আছ। বলনি আমাকে?'

হাসবার চেষ্টা করে বললাম, 'কিসের সুখবর?'

জ্যোৎস্না আমাকে টানতে টানতে একটু তফাতে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'খালামার কাছে সব শুনলাম।' বলে চোখে ঝিলিক তুলে হাসলেন। 'এই তাহলে তোমার হঠাৎ করে গার্ডেনিংয়ে মেতে ওঠার রহস্য। ফুলের বনে ফুলপরীটি হয়ে বরকে বরণ করবে? দারুণ আইডিয়া তো!'

'ভ্যাট্! কী সব বলছেন বুঝি না আপা!'

'বোঝ না? কচি খুকীটি!'

'বিশ্বাস করুন, আমার এসব একেবারে ভাল লাগছে না।'

'কী সব?'

'বিয়ে-টিয়ে।'

জ্যোৎস্না আমার গাল টিপে আদর করে বললেন, 'সময়মত দারুণ ভাল লাগবে।'

'না আপা! এ বিয়েতে আমার মত নেই।'

জ্যোৎস্না আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'কেন? খালামা বললেন, হাইলি কোয়ালিফায়েড ছেলে। খালুআব্বার (মেসোমশাইয়ের) খুবই পছন্দ হয়েছে। খালুআব্বাকে তো ভাল জানি। লিবার‍্যাল মর্ডান মাইন্ডেড মানুষ। ওঁর যখন পছন্দ হয়েছে, তখন বুঝতে হবে—'

ওঁর কথায় বাধা দিয়ে বললাম, 'কোনও দাড়িওয়ালাকে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না।'

জ্যোৎস্না হেসে উঠলেন। 'ওটা কথা হল? আজকাল কী হিন্দু কী মুসলমান, সব ইয়ং ছেলেই দাড়ি রাখে। ওই দ্যাখো, মহফুজও রেখেছে।'

'আপনি বুঝবেন না আপা! আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।'

আমার কথার সুরে জ্যোৎস্না একটু অবাক হলেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'খালুআব্বা তোমার অমতে নিশ্চয় কিছু করবেন না—অন্তত ওঁর সম্পর্কে আমার যা ধারণা। তা তুমি ওঁকে আভাসে তোমার আপত্তির কথা জানালেই পার।'

জ্যোৎস্নাআপার একটি হাত ধরে আস্তে বললাম, 'আপনি আমাকে বাঁচান আপা!'

আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকার পর জ্যোৎস্না একটু হেসে চাপা স্বরে বললেন, 'তুমি কি অন্য কাউকে ভালবাস? লুকিও না রেশমি!'

জোরে মাথা নেড়ে বললাম, 'নাহ্। বিশ্বাস করুন—'

'রেশমি! নিশ্চয় তুমি লুকোচ্ছ!'

আমার চোখে জল এসে গেল। 'না না! সে-সব কিছু নয়। বিশ্বাস করুন আমাকে।'

জ্যোৎস্না ধমক দিলেন। 'কচি খুকীর মত কাঁদে না। অদ্ভুত মেয়ে তুমি। তোমাকে স্মার্ট ভাবতাম। দেখছি, তুমি একেবারে গেঁয়ো।' কথাটা বলে ঝিলের দিকে তাকালেন। 'রাজা ওখানে কী করছে? এস, আমরা ওর কাছে যাই। তোমাদের বাড়ির এদিকটা অসাধারণ কিন্তু। ওই ঝিলটা থাকায় বেশ একটা ছবির মত। পিকনিক করলে মন্দ হয় না। এস রেশমি!'

জ্যোৎস্না আমাকে টানতে টানতে ঝিলের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পেছন থেকে মহফুজ বলল, 'রেশমিদি! দেখে যান—'

জ্যোৎস্না ঘুরে চোখ পাকিয়ে বললেন, 'রেশমি কিচ্ছু দেখবে না। তুই কথা দিয়েছিস ওকে বাগান করে দিবি। তাই কর। তুই ওর বাগানের মালী।'

মহফুজ হাসল। 'যা মাটি, কোনও মালীর দরকার হবে না। আর এই কালুচাচা যা মাটি বোঝে ভাবা যায় না।'

বেড়ার আগড়টা দেখিয়ে জ্যোৎস্না বললেন, গাঁদা! এখানে বোগান ভিলিয়াটা বসাবি।'

নরম ঘাসের ওপর হঠাৎ এদিক থেকে ওদিকে নাচের ভঙ্গিতে ছোটাছুটি করে জ্যোৎস্না হিজলতলায় গেলেন। রাজাদা ব্যাপারটা দেখছিল। একটু হেসে বলল, 'একটা কথা বলব জ্যোৎস্নাদি?'

'তুই যা বলবি জানি!'

'তা হলে বলুন।'

'ওরে বাঁদর! আমাকে হিরোইন মানায় না। উঃ! হাঁপ ধরে গেছে। হ্যাঁ রে! আমি এত মুটিয়ে যাচ্ছি কেন বল্ তো?'

'ডায়েট কন্ট্রোল করুন।'

'তোর মাথা খারাপ? খাওয়া ছাড়া দুনিয়ায় আর কোনও সুখ নেই আমার। তোর থাকতে পারে। রেশমির থাকতে পারে।' জ্যোৎস্না ছায়ায় ধপাস করে বসলেন। 'রাজা! আরেকদিনের প্রোগ্রাম করা যাক। আমরা এখানে পিকনিক করব। ঝিলের পানিতে সাঁতার কাটব।'

বললাম, 'আপা। ঝিলে কিন্তু প্রচণ্ড জোঁক আছে।'

'থাক। আমার গায়ে প্রচুর রক্ত আছে।'

রাজাদা ঝিলের জলের দিকে একটু ঝুঁকে বলল, 'জলটা অসাধারণ কিন্তু!'

জ্যোৎস্না বললেন, 'মরেছে রে! বাঁদর এখানেও জল-জল করছে। খালামার কানে গেলে ভাববেন, নির্ঘাৎ একটা হিন্দু ছেলেকে ভাই সাজিয়ে এনেছি।'

রাজাদা বলল, 'সরি! অভ্যাস।'

বললাম, 'জানেন আপা? চিনুকাকু ঝিলে বড়শি ফেলে পুঁটিমাছ ধরেছিলেন।'

জ্যোৎস্না বললেন, 'মনে হচ্ছে লোকটা তোমাকে ভূতের মত পেয়ে বসেছে। সাবধান রেশমি!'

রাজাদা বলল, 'চিনুদা সম্পর্কে ধারণা একেবারে ভুল জ্যোৎস্নাদি! আপনি ওঁকে দ্যাখেননি তাই। দেখলে—'

ওর কথার ওপর জ্যোৎস্না পুরুষালি ভঙ্গিতে বললেন, 'বল্ বল্। দেখলেই প্রেমে পড়ে যাব।'

রাজাদা হাসতে হাসতে বলল, 'কিছু বলা যায় না।'

জ্যোৎস্না আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'বরের মুখে দাড়ি আছে বলে রেশমি বিয়ে করবে না। আমিও খোঁড়া ল্যাংড়ার প্রেমে পড়ব না। তোর চিনুদার ঠ্যাং ভাঙা বলছিলি না?'

রাজাদা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বরের মুখে দাড়ি মানে?'

আমি আড়ষ্টভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলাম। জ্যোৎস্নাআপা অস্থির হেসে চাপা স্বরে বললেন, 'খালুআব্বা জামাই খুঁজে বের করেছেন। এম এ ডিগ্রি আছে। কিন্তু মুখে দাড়ি। খালামা বলছিলেন, 'খুব নামাজ পড়ে। রেশমি হয় তো নামাজ পড়াটা ভাল মনে করে। কিন্তু দাড়ি চলবে না!'

রাজাদা বলল, 'দাড়ি রাখা তো আজকাল স্টাইল!'

'সেই তো বলছিলাম ওকে।'

বললাম, 'ভাল হবে না বলছি আপা! খালি আবোল-তাবোল কথাবার্তা আপনার!'

জ্যোৎস্নাআপার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। উনি আমার দুই হাঁটু বেড় দিয়ে ধরে আমাকে টেনে বসালেন। বললেন, 'রাজা! তুইও বস। একটু কনসাল্ট্ করা যাক। বস্ না রে বাঁদর!'

রাজাদা একটু তফাতে হিজলের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসল।

বললাম, 'আপা! ওসব কথা বললে আমি কিন্তু চলে যাব।'

জ্যোৎস্না আমাকে কাঁধ আঁকড়ে ধরে বললেন, 'যাবে কোথায়? ফাঁদে পড়ে গেছ। যদি বাঁচতে চাও, চুপ করে বস।'

রাজাদা সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, 'প্রব্লেমটা কী?'

'রেশমির আব্বা চান একটি চমৎকার ঘরজামাই। নুরপুর চিনিস তুই? আমি চিনি না।'

'চিনি। কেন?'

'যাঃ! বরের নামটা ভুলে গেলাম। খালামা বলছিলেন—কী যেন ... যাক গে। পরে আবার জেনে নেব। তো ভদ্রলোক প্রাইমারি টিচার। কিন্তু রেশমির এ বিয়েতে মত নেই।

আমি ওঠার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। জ্যোৎস্না আমাকে আরও আঁকড়ে ধরলেন।

রাজাদা একটু হাসল। 'এটা আর প্রব্লেম কী? স্ট্রেট্‌কাট বলে দিলেই তো হয়।'

জ্যোৎস্না ধমক দিলেন। 'তুই হাঁদা! রেশমি যদি ছেলে হত, হয়ত মুখের ওপর বলে দিত। কিন্তু মেয়ে—আফটার অল গ্রামের মেয়ে। এবং আরও প্রব্লেম হল মুসলিম মেয়ে।'

'কী আশ্চর্য! আপনিও তো মুসলিম মেয়ে।'

'ওরে বুদ্ধু! সবাই কি আমার মত? আমি তো আমার আব্বাকে দরকার হলে বকে দিতে পারি।'

রাজাদা হাসতে হাসতে বলল, 'তা আপনি পারেন বটে! ভাবা যায় না।'

জ্যোৎস্না গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রেশমি! এখনও ভেবে বল। পরে কিন্তু দোষ দিও না।'

আস্তে বললাম, 'কী?'

জ্যোৎস্না ফিক করে হাসলেন হঠাৎ। 'বিয়ে ভাঙা খুব ইজি ব্যাপার। নিজের বিয়েও বার দুই ইজিলি ভেঙেছি। জাস্ট্ দু'একটা চিঠি—ব্যস!'

রাজাদা বলল, 'চিঠি মানে?'

ষড়যন্ত্রসংকুল ভঙ্গিতে জ্যোৎস্না চাপা স্বরে বললেন, 'রেশমির হবু বরকে বেনামী চিঠি দেব। তুই একখানা এবং আমি একখানা। বুঝলি? চিঠিতে লিখব, রেশমি খুব বাজে মেয়ে। একডজন প্রেম করে ফেলেছে। এটসেটরা, এট্‌সেট্‌রা...'

রাজাদা বলল, 'এই জ্যোৎস্নাদি! এটা ঠিক নয়। অকারণ ওঁর নামে স্ক্যান্ডাল রটান আমার ভাল মনে হচ্ছে না।'

জ্যোৎস্না একটু ভেবে বললেন, 'হ্যাঁ। স্ক্যান্ডাল একবার রটলে পরে হয় তো রেশমির অবস্থা হবে আমারই মত।' কথাটা বলে ফিক করে হাসলেন। 'আমার কী হয়েছে, রেশমি জানে না। তুইও জানিস না। আমি এখন বিয়ে করতে চাইলেও হারামজাদাগুলো ওরে বাবা বলে পালিয়ে বাঁচবে। তবে অবশ্য রেশমি একেবারে ফুলপরী। আমার মত খেঁদিপেঁচি নয়। ওর বেলা হয়ত অতটা না হতেও পারে। দুনিয়ায় এমন লোকের অভাব নেই, যারা গায়ের জোরে মেয়েদের দখলে রাখতে পারলেই খুশি। প্রেম-ট্রেমের ধার ধারে না। বউ পাওয়াই যথেষ্ট : বউ প্রেম দিচ্ছে কি না-দিচ্ছে, গ্রাহ্য করে না। রাজা, তুই তো কুলসুমকে চিনিস।'

'কুসুমদি বলুন!'

'তোর শুধু হিন্দুয়ানি সবতাতেই।' জ্যোৎস্না আমাকে ছেড়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। 'কুলসুমের এখন একগাদা ছেলেমেয়ে। দেখলে চেনা যায় না। প্যাঁকাটি হয়ে গেছে। অথচ কী হাসিখুশি মেয়ে ছিল, বল রাজা!'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'সাড়ে বারটা বাজে প্রায়। দেখি, রান্না হল কি না।'

জ্যোৎস্না বললেন, 'সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি থাম!'

মহফুজ এসে বলল, 'এখানে কিসের মিটিং হচ্ছে?'

'তোর কাজ হয়ে গেল?'

'হ্যাঁঃ। কালুচাচা লোকটা এক্সপার্ট।' বলে সে রাজাদার দিকে ঘুরল। 'তুই ব্যাঙের মত তুম্বো হয়ে বসে আছিস কেন রে?'

রাজাদা মুখটিপে হাসল। 'জ্যোৎস্নাদি, আপনারা কেটে পড়ুন তো এখন। আমরা আড্ডা দিই।'

জ্যোৎস্না বললেন, 'সিগারেট খাবি তো? ইস্! আমাকে বড় লজ্জা! খাবি তো খা না।'

আমার কাঁধে হাত রেখে জ্যোৎস্নাআপা হাঁটতে থাকলেন। বাগানে ঢুকে বললেন, 'কিচ্ছু ভেব না তুমি! এ বিয়ে ভেঙে যাবে। কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখা উচিত, রেশমি! আমি কোনও পুরুষ মানুষের পরোয়া করি না। তোমার ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম। কারণ তুমি গ্রামে থাক। তোমাকে একসময় বিয়ে করতেই হবে এবং হয়ত দেখবে, 'তোমার বর তোমার মনের মত নয়। বিয়ে ব্যাপারটা জুয়া খেলার মত। হার-জিতের কোনও সিওরিটি নেই।'

আস্তে বললাম, 'ওসব কথা থাক, আপা! আমার ভাল লাগছে না।'

জ্যোৎস্নাআপা একটু হাসলেন। তারপর গুন গুন করে কী গান গাইতে গাইতে কাঞ্চনতলার বেদিতে বসলেন। 'একটু বসি এখানে। তুমিও বস।'..

মায়ের পছন্দ-অপছন্দ এবং আদব-কায়দা সম্পর্কে জ্যোৎস্নাআপার জ্ঞান টনটনে। মহফুজ আর রাজাদাকে আলাদা করে খাইয়ে দিলেন। তবে চোখে হেসে ওদের দলিজঘরে খাওয়ানোর কথা তুলেছিলেন। মা বললেন, 'তা কেন? এখানেই খাক ওরা। তোমার ভাইরা কি পরমানুষ? তোমার খালু আব্বার কত হিন্দু বন্ধু এখানে বসে খেয়ে যান। ঘরের ছেলে সব।'

আমার মা এক অদ্ভুত মেয়ে। কোনও কিছুতে কৌতূহল নেই। নৈলে কার কী নাম জানতে চাইতেন। আমি একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। রাজাদার নাম চিনুকাকুর মুখে মা শুনেছিলেন। জ্যোৎস্নাআপা ওর পরিচয় দিলে মায়ের কী প্রতিক্রিয়া হত কে জানে! কিন্তু জ্যোৎস্নাআপা সে প্রসঙ্গে গেলেন না। মাকে জোর করে স্নান করতে পাঠিয়ে ওদের খাইয়ে দিলেন। মনে হচ্ছিল, এ যেন জ্যোৎস্নাআপারই বাড়ি। মহফুজ একবার ঠাট্টা করে বলেছিল, 'ব্রিলিয়ান্ট রেঁধেছ আপা! বাড়িতে তো এমন রাঁধতে পার না!'

জ্যোৎস্না থাপ্পড় তুলে বলেছিলেন, 'চুপচাপ খেয়ে উঠে পড়।'

রাজাদা 'জ্যোৎস্নাদি' বলেই জ্যোৎস্নাআপার ইশারায় চুপ করে গিয়েছিল। কালুর মা উল্টোদিকের

বারান্দায় রোদে আটা নাড়াচাড়া করছিল। জ্যোৎস্নাআপা তাকে দেখিয়ে ফিস ফিস করে বলেছিলেন, 'তোকে হিন্দু ভাববে। কক্ষণো দিদি-টিদি করবি না। এটা টাউন নয়, পাড়াগাঁ। গাঁদা! সাবধান।'...

কিছুক্ষণ পরে জ্যোৎস্নাআপা, আমি আর মা খেতে বসলাম। জ্যোৎস্না বললেন, 'আচ্ছা খালামা, আপনি সারাজীবন রান্নাঘরেই কাটালেন। আপনার একঘেয়ে লাগে না?'

মা একটু হেসে বললেন, 'বিয়েশাদি হোক মা। তখন বুঝবে রান্নাঘরে কী আছে!'

'সে জন্য বিয়েশাদির দরকার নেই। বাড়িতে তো আমিই দু'বেলা দশ-বারজনের জন্য রাঁধি। এখন স্কুলের ছুটি। কিন্তু রাঁধি, আবার স্কুলও করি। মায়ের কথা তো জানেন।'

মা আমাকে বললেন, 'শুনছিস কথাগুলো? বুঝলে জ্যোৎস্না? রেশমির যে কী হবে, আমি ভেবে কুল পাই না। চিরকাল তো আমি বেঁচে থাকব না। সংসারে একটা কুটো ভেঙে দুটো করে না এই মেয়ে।'

জ্যোৎস্না বললেন, 'রেশমি মাইনে দিয়ে বাবুর্চি রাখবে। ভাববেন না!'

মা চুপচাপ খেতে থাকলেন। একটু পরে হঠাৎ বললেন. 'এই দ্যাখো জ্যোৎস্না! তুমি আমাকে খানা বেড়ে দিলে। কত ভাল লাগছে। সারাজীবন খানা বেড়ে কাটাচ্ছি। নিজের হাতে খানা বেড়ে খেতে ইচ্ছেই করে না। তো আমার মেয়ে একবারও বলবে না, আম্মা, তোমাকে আজ আমি খানা বেড়ে দিই। তুমি খাও!' মা চোখের কোনা মুছলেন।

অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। জ্যোৎস্না হাসি চেপে বললেন, 'রেশমি! সত্যি এ তোমার ভারি অন্যায়।'

বললাম, 'যা বাব্বা। খাওয়ার সময় হঠাৎ—'

জ্যোৎস্না বললেন, 'তুমি চুপ কর। খালামা, আপনি আমাব সঙ্গে চলুন। ক'দিন চুপচাপ রেস্ট নেবেন। আমি আপনাকে রেঁধে খাওয়াব। রোজ সিনেমা দেখাব। বেড়াতে বেরুব গঙ্গার ধারে। আজকাল কী সুন্দর সাজিয়েছে গঙ্গার ধারে পার্ক, রাস্তা!'

মায়ের মুখে হাসি ফুটল। 'না বাবা! গোলমাল ভিড় আমার একেবারে বরদাস্ত হয় না। গাঁয়ে পীরের খানকা শরিফে উরমের মেলা বসে। সেই কয়েকটা দিন কান ঝালাপালা হয়ে যায় মাইকের আওয়াজে। সারাদিন সারাটা রাত হইহল্লা। একবার রহিম ডাক্তারের বউ মানত দিতে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। উঃ! কানের পর্দা ফেটে যাবার দাখিল।'

আমার থালা খালি হয়ে গেছে দেখে জ্যোৎস্নাআপা বড় চামচ ভর্তি পোলাও দিতে এলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'প্লিজ আপা! আর না!'

মা বললেন, 'ওই খাওয়া! মুরগির দানা! এখন বড় হয়েছে বলে নয়। সেই এতটুকু থেকে ওইরকম। জোর করে গিলিয়ে তবে—'

জ্যোৎস্না পুরুষালি ভঙ্গিতে বললেন, 'রেশমি! রাগ করা হচ্ছে, তাই নয়?'

বললাম. 'ভ্যাট্! রাগ করব কেন?'

মা বললেন, 'ছেড়ে দাও মা! মেয়ের ওইরকম স্বভাব। গোঁ ধরলে কার সাধ্যি বশ মানায়?'..

নিজের ঘরে এসে জোরে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে বসলাম। রান্নাঘরের বারান্দার ফ্যানটা বড্ড গরম হাওয়া ছড়ায়। সত্যিই খুব অবাক হয়েছিলাম। কখনও ভাবতে পারিনি, মায়ের এ ধরনের কোন সাধ আছে। হয়ত সাধ নয়, অন্য ধরনের একটা ইচ্ছা। নিজের হাতে রেঁধে নিজে বেড়ে খেতে ভাল লাগে না, এই প্রথম জানলাম। একটু অনুতাপ হল। কেন মা এ কথাটা কোনওদিন মুখ ফুটে আমাকে বলেননি? আশ্চর্য, মানুষের কত তুচ্ছ ইচ্ছে বা সাধ আছে, ভাবা যায় না। অথচ আমি যদি সত্যি রান্নাঘরে মাকে সাহায্য করতে যাই, মা প্রচণ্ড আপত্তি করবেন। মুখে যা-ই বলুন, রান্নাঘরেই মায়ের জীবন। ওখানে না ঢুকলে যেন শান্তি নেই। বাবা একবার রাঁধুনি রাখার কথা তুলেছিলেন। মা আঁতকে উঠে বলেছিলেন, 'না, না। কারও হাতে খেতে রুচবে না আমার। আর, রাঁধুনি রাখলেই সব চুরি হয়ে যাবে।'

পুবের জানালার দিকে ঘুরেই দেখতে পেলাম রাজাদা বাগানে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। মহফুজ কাঞ্চনতলার বেদিতে বসে আছে। তার মুখেও সিগারেট।

আবার রাজাদাকে অলৌকিক মনে হল। বড় অদ্ভুত এই বোধ। মনে হচ্ছিল, অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা ঘটতে দেখছি। চিনুকাকুর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে বহু দূর থেকে, 'একটা ছেলে। রাজা...'

জ্যোৎস্নাআপার ইচ্ছে ছিল, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার বাসে ফিরবেন। কিন্তু মহফুজ আর রাজাদার তাড়ায় অনেক আগে বেরুতে হল ওঁকে। মায়ের পা ছুঁতেই জ্যোৎস্নাআপাকে দু'হাতে ধরে ওঠালেন। 'বেঁচে থাক মা!' যখন খুশি, চলে এস। ওদেরও নিয়ে এস। আপনজন কে কোথায় কোন মুলুকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কেউ তো আশে না। তোমরাই এখন আপন।' বলে একটু হাসলেন। 'রেশমির বিয়ে লাগিয়েছি। খোদার ফজলে সব ভালয়-ভালয় এগোলে এ মাসের হয় তো ও মাসে যাব না। খবর দেব। আগে থেকে এসে থাকবে। শোন জ্যোৎস্না! ভাইবোনদের সব্বাইকে নিয়ে আসবে।'

জ্যোৎস্নাআপা বললেন, 'ওঁরা কনে দেখতে আসবেন না?'

'আসবে। করে আসবে, জানায়নি। বলেছে খবর দেব। তোমার খালুআব্বা বলছিলেন, তার মানে হঠাৎ করে এসে হাজির হবে। তা যখন খুশি আসুক না। মেয়ে আমার কানা না, খোঁড়া না। এ মুলুকে দশটার একটা।'

'যদি খবর দিয়ে আসেন, আমি যেন খবর পাই খালামা! আমি কনে সাজাব কিন্তু।'

জ্যোৎস্না আমার গাল টিপে দিয়ে সদর দরজার দিকে এগোলেন। আমি বললাম, 'চলুন আপা! বাসে তুলে দিয়ে আসি।'

জ্যোৎস্নাআপার সামনে মা আপত্তি করতে পারবেন না জানতাম। রাস্তায় গিয়ে দেখলাম রাজাদা আর মহফুজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হল, শহরের ছেলে ওরা। গ্রাম ভাল লাগে না। তাই হয়ত শিগগির চলে যেতে চাইছে।

অতর্কিতে একটু অভিমান সুচের মত আমাকে বিঁধল। চিনুকাকু বলেছিলেন, আমি নাকি অবিশ্বাস্য সুন্দর। আমি কি রাজাদাকে আকর্ষণ করতে পারলাম না?

ভাবনাটা নির্লজ্জ। অথচ অপমানিতা মনে হচ্ছিল নিজেকে।

শহরের ছেলে আরও কত অবিশ্বাস্য সুন্দর মেয়েকে দেখেছে। হয়ত তেমন কোনও প্রেমিকাও আছে ওর। বোকার মত কেন ওর কথা ভাবছি?

'রেশমি, কথা বলছ না যে?' জ্যোৎস্নাআপা আমার একটা হাত নিলেন। 'মনে হচ্ছে, খুব ভাবনায় পড়ে গেছ।' চাপা স্বরে ফের বললেন, 'এ বিয়ে আমি ভেঙে দিচ্ছি। কিচ্ছু ভেব না।'

বললাম, 'ভ্যাট! আপনার খালি এক কথা। অন্য কিছু বলুন।'

ছোট্ট বাজারটা বিকেল থেকে লোকজনে ভরে ওঠে। চুপচাপ দু'জনে হাঁটছিলাম। পিচ-রাস্তায় মেহগনি গাছের তলায় রাজাদা ও মহফুজ দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নাআপা হঠাৎ বললেন, 'আচ্ছা রেশমি রাজাকে দেখে কী মনে হল তোমার?'

চমকে উঠলাম। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে কেন? আস্তে বললাম, 'কী মনে হবে?'

জ্যোৎস্নাআপা মিটিমিটি হেসে বললেন, 'খালুআব্বার কাছে কথাটা তুলব।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'না!'

'ও ম্মা! তুমি হিস্টিরিয়া রুগির মত—'

'আপা! কখনো আব্বার কাছে ওসব কথা বলবেন না।'

'কেন?'

'চিনুকাকু রাজাদার কথা তুলেছিলেন আব্বার কাছে।'

'বল কী! তারপর?'

'আব্বা রাজাদাকে পছন্দ করেন না। ও আপনার সঙ্গে এসেছিল জানতে পারলে আব্বা রাগ করবেন।'

জ্যোৎস্নাআপা শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কে জানে বাবা কী ব্যাপার। ঠিক আছে। তা হলে ও নিয়ে কথা তুলব না।'

পিচ-রাস্তায় পৌঁছে জ্যোৎস্নাআপা একটু তফাতে ব্রিজের কালভার্টে গিয়ে বসলেন। আমাকেও

টেনে পাশে বসালেন। রাজাদা এদিকে আসছিল। জ্যোৎস্না আঙুল তুলে বললেন, 'এদিকে কী? মেয়েদের কথা শুনতে দারুণ লাগে। না?'

রাজাদা হাসল। 'আমরা বলাবলি করছিলাম দু'জনে কিছু নিয়ে ঝগড়াঝাটি বেধেছে।'

'বাধলেও তোমার কিছু করার নেই। যেখানে ছিলে, সেখানেও যাও।'

রাজাদা মহফুজের কাছে চলে গেল। জ্যোৎস্না আমাব কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'এই তো একরত্তি মেয়ে। এর জন্য বাবা-মা অস্থির! আর আমার বাবাকে দ্যাখ! দিব্যি নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তা-ও তো খালুআব্বার মত অত শিক্ষিত নন। আসলে আমার ফাদার ভদ্রলোক কেমন জান? খোদা ভরসা-টাইপ।'

বললাম, 'কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম আপা! আব্বা বলে গেছেন, শিগগির আপনাদের ওখানে যাবেন। কী সব কাগজপত্র রেডি রাখতে বলেছেন। কোর্ট খুললেই—'

'হ্যাঁ, ওই এক রোগ আমার ফাদার ভদ্রলোকের। মামলা! এত বলেও পারি না।'

'আবার কবে আসছেন বলুন আপা? পিকনিক করবেন বলছিলেন!'

রাজাদা ডাকল, 'বাস আসছে জ্যোৎস্নাদি!'

জ্যোৎস্না উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সে আসা যাবে। তুমি শিগগির একদিন এস। কেমন?'

মেহগনিতলায় বাস স্টপ। বাসটা এসে দাঁড়াল। ভিড় গিজ গিজ করছে। জ্যোৎস্নাআপা ভিড় ঠেলে ঢুকে গেলেন। মহফুজ উঠে গেল। রাজাদা আমার দিকে ঘুরে আস্তে বলল, 'আবার দেখা হবে।'

বাসটা চলে গেলে হঠাৎ একলা—ভীষণ একলা লাগল নিজেকে। শূন্যদৃষ্টে চলন্ত বাসটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাঁকের মুখে গাছপালার আড়ালে মিলিয়ে গেলে পা বাড়ালাম।

বাড়ি ফিরলে মা বললেন, 'বাস পেল ওরা?'

'না পাওয়ার কী আছে?'

'সবতাতেই মেজাজ কেন দ্যাখাস বাবা? ওই তো দেখলি চৌধুরি সায়েবের মেয়েকে। টাউনের মেয়ে। তোর চেয়ে শিক্ষিত। তার আদব-কায়দা আর তোর—আবার অবেলায় বাগানে যাচ্ছিস? অ রেশমি!'

কাঞ্চনতলার বেদিতে বসে ঝিলের দিকে তাকালাম। অবিকল দেখলাম, রাজাদা দাঁড়িয়ে আছে হিজল গাছের তলায়। মনে প্রশ্ন করলাম, আবার দেখা হবে, এ কথার মানে কী রাজাদা?...

৬

একুশ বছর বয়সটাই এমন বোকামি আর আবেগে ভরা যে, কোনও-কোনও কথার আক্ষরিক মানের আড়ালে ভিন্ন কোনও মানে খুঁজে অস্থির হতাম। পরে মনে হয়েছিল, রাজাদার 'আবার দেখা হবে' কথাটার কোনও ভিন্ন মানে নেই। দেখা তো হতেই পারে। আমি ঘরবন্দী মেয়ে নই। তাছাড়া গার্ডেনিংয়ের ব্যাপারে মহফুজের দোকানে গেলে রাজাদার সঙ্গেও দেখা হওয়ার চান্স আছে, এই ভেবেই হয়ত রাজাদা কথাটা বলেছিল।

এখন বুঝতে পারি, আমার মধ্যে অনেক বেশি হঠকারিতা আর খেয়াল ছিল। তাই খানিকটা গোঁয়ার্তুমিও ছিল। থাকবে না কেন? মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের মেয়ে, বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। আদর খেয়ে-খেয়ে বড় হয়েছিলাম। তা ছাড়া সবাই বলত আমি রূপসী মেয়ে। চাপা একটা অহঙ্কার মনের আড়ালে থেকে গিয়েছিল। তারপর চিনুকাকুর মত এক কিংবদন্তির নায়ক আমার সেই অহঙ্কারকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

দীর্ঘ বার বছর পরে নিজের জীবনকাহিনী লিখতে বসে পিছু ফিরেছি। একুশ বছর বয়সের সেই শরৎকালের দিনরাত্রিগুলির ওপর খাপচা-খাপচা আলো পড়ে আছে। আলোকিত অংশগুলি এত স্পষ্ট যে বারবার অবাক হচ্ছি। শিউরে উঠছি। আবার হাসিও পাচ্ছে নিজের বোকামিগুলি দেখে।

চিনুকাকার কথায় নেমে পড়লাম ফুলবাগান করতে। কিন্তু সেই ফুলবাগান করার ব্যাপারটা হয়ে উঠল নেহাত একটা ছুতো। পড়ে গেলাম রাজাদার প্রেমে!

প্রেম? তা-ই তো। অথচ তখন বুঝতে পারিনি ওটা প্রেম। বড়াই করে ভাবতাম, যার তার সঙ্গে প্রেমে পড়ার মত মেয়ে আমি নই। প্রেম বলতে বুঝতাম সাংঘাতিক কোন ঘটনা। জীবনে একটা বড় রকমের অদল বদল ঘটে যাওয়া। আর আমার প্রেমিক সম্পর্কে কল্পনাটাও ছিল ভারি অদ্ভুত। তাকে ভাবতাম মায়ের কাছে শোনা গল্পের সেই উজ্জ্বল কোনও আকাশচারীর ফেরেশতা, যে হঠাৎ কোনও এক মুহূর্তে নিরিবিলি ঝিলের ধারে নেমে আসবে। সে-ই যেন স্বপ্নে দেখা দিত। কখনও সবুজ ট্রেন, কখনও ঘুমন্ত এক শিকারি।..

মামুজির বাড়ি থেকে ফিরতে বাবার দেরি হচ্ছিল সে-রাতে। বাবার বাড়ি ফিরতে দেরি হলে মা ছটফট করে বেড়াতেন। কালুকে বাসরাস্তায় পাঠিয়ে দিতেন। কালুর মাকে বাড়ি যেতে দিতেন না। মা বারবার আপনমনে বলতেন, 'দিনকাল খারাপ। রাতবিরেতে একা মানুষ—কে দোস্ত। কে দুশমন আজকাল চেনাই কঠিন।' কালুর মা-ও গম্ভীর মুখে সায় দিত। কিন্তু বাবার শক্তি আর সাহসের ওপর আমার ছিল অগাধ বিশ্বাস। বলতাম, 'খেয়েদেয়ে শুয়ে পড় তো আম্মি। আব্বু হয়ত এরাতে চেম্বারেই থাকবেন।' মা বলতেন, 'তুই খেয়ে নে বাবা!' বাবা না ফিরলে আমিও কিন্তু খাব না। মায়ের কথায় আমি 'বাপ-সোহাগী মেয়ে।' আমিও ভেতর ভেতর অস্থির থাকতাম।

সে-রাতে বাবা ফিরলেন রাত এগারোয়। বললেন, 'নবাবগঞ্জে বাসের কোনও সময়টময় নেই। এদিকে ভাইজানও ছাড়বেন না। ভাগ্যিস আমিনুলের ট্রাক গিয়েছিল ওখানে। নইলে থেকে যেতে হত।'

মা বললেন, 'ভাইজানের শরীর কেমন দেখলে?'

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, 'গভ্‌মেন্ট পুলিশে লোক নেয় শরীর-স্বাস্থ্য বুঝে। কোথায় অসুখ-বিসুখ? আগের মত তাগড়াই হয়েই আছেন। সামনে বছর হজে মক্কায় যাবেন, তার জন্য তৈরি হচ্ছেন। মুখে জমকালো দাড়ি, মাথায় টুপি। একেবারে খোদার বান্দা হয়ে গেছেন।'

মা একটু চটে গিয়ে বললেন, 'হবেন না তো তোমার মত কাফের সেজে থাকবেন?'

বাবা বললেন, 'রেশমির বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর আমিও ইনশাল্লা (আল্লার ইচ্ছায়) ভাইজানের সঙ্গে মক্কা যাব। দাড়ি রাখব। টুপি পরব। যাক গে, শোন। আমার পেটে তোমার বাপের বাড়ির মোরগ ডাকছে। রাতে কিছু খাব না। এতকাল পরে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে খুব খাতিরযত্ন পেলাম।'

বাবা জামা-কাপড় ছেড়ে বাথরুমে ঢুকলেন। মা আর আমি খেতে বসেছি, তখন রান্নাঘরের বারান্দায় এসে চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন, 'রেশমি, তোর গেস্টরা এসেছিল তো?'

বললাম, 'এসেছিল। কাল সকালে বাগানে গিয়ে দেখবেন কী হয়েছে।'

মা বললেন, 'চৌধুরীসায়েবের মেয়ে জ্যোৎস্নার এখনও বিয়ে হয়নি দেখে অবাক লাগছে। অত ভাল মেয়ে। তার ওপর মাস্টারি করে ইস্কুলে। বাবা-মায়ের চোখে কী করে যে ঘুম আসে—'

দ্রুত বললাম, 'বলে দেব জ্যোৎস্নাআপাকে। সামনে এক, পেছনে আরেক কথা।'

বাবা হেসে উঠলেন। মা বিব্রতভাবে বললেন, 'আহা, মেয়েটা অত ভাল বলেই তো বলছি।'

বললাম, 'আচ্ছা আম্মি! কোনও মেয়েকে দেখলেই তার শুধু বিয়ে-বিয়ে করে কেন অত অস্থির হও বল তো? মেয়েদের জীবনে আর কিছু থাকতে নেই?'

বাবা বললেন, 'রেশমি ঠিকই বলেছে। ভাইজানও বললেন, এত তাড়াহুড়োর কী আছে?'

মা অবাক হয়ে বললেন, 'ভাইজান তা-ই বললেন।'

বাবাকে হঠাৎ একটু গম্ভীর দেখলাম। বলেন, 'উনি যা বললেন, তা মোটামুটি ভালই। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'পরে বলব'খন। তোমরা খেয়ে নাও।'

মা বাবার দিকে চঞ্চল চোখে তাকিয়ে বললেন, 'নুরপুরে বিয়ে লাগাতে বারণ করলেন ভাইজান?'

বাবা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঠিক বারণ করেননি। তবে অন্য একটা প্রোপজাল দিলেন। ভেবে দেখতে বললেন। পরে বলব'খন।

মা আনমনে বললেন, 'ভাইজান যখন কোনও কথা বলেছেন, তখন ভেবেচিন্তেই বলেছেন। উনি তো কক্ষনো চাইবেন না যে ভাগ্নির খারাপ কিছু হোক। ভাল চেয়েই বলেছেন।'...

সে-রাতে মনে মনে একটু খুশি হয়েছিলাম। নুরপুরের আপদ বিদায়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জ্যোৎস্নাআপা আমার নামে স্ক্যান্ডাল করে চিঠি লিখলেও যদি লোকটা পিছিয়ে না যায়? গ্রাম্য লোকেদের আমি তো চিনি।

সকালে বাবা কোথায় বেরিয়েছিলেন। মা আমার ঘরে এলেন। মুখে বেশ খুশি-খুশি ভাব। খাটে পা ঝুলিয়ে বসে বললেন, 'কথাটা ভালই। বুঝলি রেশমি?'

'কোন কথাটা আম্মি?'

মা একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'আমারও যে মনে হয়নি, তা নয়। সেবার ভাবিজি (বৌদি) এলেন। তখন তুমি স্কুলে পড়তে। কথায় কথায় বলেছিলেন, রেশমিকে কবে আমি তুলে নিয়ে যাব দেখবেন। শুনে আমি হাসতে হাসতে বললাম, আপনি তুলে নিয়ে যাবেন কি আমিই আপনার সানুকে তুলে নিয়ে আসব। তো ভাবিজি ভাইজান দুজনেরই কথাটা খেয়াল আছে। এদিকে বেখেয়াল হয়ে বসে আছি। আর একটা বছর পরে সানু ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে আমিই আসবে। ভাইজান বলেছেন, আপন খান্দানের মেয়ে। আপন ঘরেই থাকবে। সানুকে তোমরা ডাক্তারখানা খুলে দিও। তোমার আব্বুও—'

কান করে মায়ের কথাগুলো শুনছিলাম। মানে বোঝার চেষ্টা করছিলাম। মায়ের কথা শেষ না হতেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'না!'

মা হাসতে হাসতে বললেন, 'না কী বাবা? কথাটা তো ভালই।'

কান্না এসে গিয়েছিল। বললাম, 'কক্ষনো ওসব কথা বলবে না। আব্বুকেও বারণ করে দিও।'

মা আমাকে টেনে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বোকা মেয়ের কথা শোন! এতে কাঁদবার কী আছে বল তো?'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'এ হয় না!'

'কী হয় না?'

'কথাটা ভাবতে তোমাদের খারাব লাগল না? তার চেয়ে আমার হাতে বিষ তুলে দাও—'

মা একটু রাগ করে বললেন, 'ইস্কুলে-কলেজে আর কেউ পড়ে না। পাশ করে না কেউ! তুই একা? আপন খান্দানে বিয়েশাদি হয় না? ধরতে গেলে তোর আব্বা আমার ফুফুত (পিসতুত) ভাই, তা জানিস? ইসলামে এমন বিয়ে-শাদি (সিদ্ধ) আছে।'

'আমাকে ইসলাম দেখিও না। ভারি তো সব খোদার বান্দা! ইসলামে অনেক কিছুই আছে। কতগুলো মানো তোমরা? খালি নিজের ইচ্ছেমত—' কাঁদছি টের পেয়ে থেমে গেলাম। চোখ মুছে ফের বললাম, 'আজই সানুভাইকে চিঠি লিখে জানাচ্ছি তোমরা কী চক্রান্ত করেছ।'

মা উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধভাবে বললেন, 'এইজন্য আমি বলতাম, বেপর্দা হয়ে লেখাপড়া শিখতে দিও না। তবে রেশমি, তোর কপালে একশো খোয়ার আছে—দেখে নিস। তখন পস্তে কূল পাবি না বলে দিচ্ছি।'

মা বেরিয়ে গেলে মনে হল, যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। সানু আমার মামাতো ভাই। কল্পনাও করিনি তার সঙ্গে বিয়ের কথা উঠতে পারে। আমার বিশ্বাস, সানুভাইও কথাটা শুনে ভীষণ চটে যাবে। মামাত-পিসতুত-খুড়তুত ভাই-বোনদের মধ্যে বিয়ে আমি দেখিনি এমন নয়। কিন্তু ব্যাপারটা এত সাধারণ যে তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। আমার জীবনে সেটার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ামাত্র চমকে উঠেছিলাম। অশালীন মনে হয়েছিল এই সম্পর্ক। শুধু তাই নয়, বাবার সম্পর্কে আমার যেসব সুন্দর সুন্দর ধারণা ছিল, অতর্কিতে সেগুলো চোট খেয়েছিল। অবাক লাগছিল ভাবতে, মামুজি এমন কথা তুলতেই পারেন; কিন্তু বাবা তার প্রতিবাদ তো করেনই নি, এমন কি কথাটা তাঁর ভালই মনে হয়েছে এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনাও করেছেন। তা হলে কি আমি নিজের বাবাকে এখনও সঠিক চিনতে পারিনি?

সারাটা দিন এক অস্থিরতা। মনের ভেতর চিনুকাকুর সেই কণ্ঠস্বর শুনছিলাম, 'প্রশ্ন কর, 'রেশমি! প্রতিবাদ কর!'

কিন্তু প্রতিবাদের আর কোনও সুযোগই পেলাম না। বাবার মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। মা-ও আশ্চর্যভাবে চুপ করে গেছেন। বাবা আগের মতই আমার সঙ্গে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছেন। বুঝতে পারছিলাম, মা আমার প্রতিক্রিয়াটা ওঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। হাসি পাচ্ছিল আমার, বিষ খাওয়ার কথা বলায় তা হলে চমৎকার কাজ হয়েছে।

এক বিকেলে শহর থেকে মহফুজ এল একটা বড় চটের থলেয় কয়েকটা গোলাপ, ডালিয়া আর চন্দ্রমল্লিকা নিয়ে। বাগানে গিয়ে সে অবাক হয়েছিল। বলল, 'রেশমিদি, আপনি কি সত্যি গার্ডেনিং করবেন?'

'কেন করব না?'

'সিডবেডটা আবার খুঁড়ে দিতে বলেছিলাম। কালুচাচা নেই?'

'তুমি আসবে জানলে বলে রাখতাম ওকে। এখন ও মাঠে আছে।'

মহফুজ বাগানের চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলল, 'এই কাটিংগুলো বড় টবে রাখতে হবে। আপনাদের গ্রামে কুমোর নেই?'

'আছে। তবে ফুলের টব তৈরি করে কি না জানি না।'

মহফুজ হাসল। 'অর্ডার দিলে করে দেবে। টবের মাটি কেমন করে তৈরি করতে হবে, যে বইটা দিয়েছি, ওতেই পাবেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আপনার গার্ডেনিং করার দিকে আগ্রহ নেই।'

একটু হেসে বললাম, 'তুমি আমার মনের কথা জেনে ফেলেছ দেখছি!'

মহফুজ সিরিয়াস হয়ে বলল, 'গার্ডেনিং কিন্তু সহজ কাজ নয়, রেশমিদি! টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স লেগে থাকতে হবে।'

'থাকব। তুমি বুঝিয়ে দাও। আসলে সেদিন জ্যোৎস্নাআপার পাল্লায় পড়ে এদিকে মন দিতে পারিনি।'

মহফুজ সিডবেডের মাটি পরীক্ষা করে বলল, 'বিউটিফুল! আপনাদের তো গরু আছে। গোবর সার পাবেন। বড় টবে গোবর সার মাখান মাটি দেবেন। কালুচাচাকে বলবেন, সরষের খৈল পচিয়ে রেখে দেবে। আর শুনুন, কিছু ইট লাগবে। কেয়ারি করে দুধারে রঙ্গনা পুঁতে দেবেন।' সে সেদিনকার লাগান বোগানভিলিয়া, কামিনী আর হাস্নুহানার চারাগুলো মন দিয়ে দেখে এল। 'আপনাদের মাটিটা বেশ ভাল।' বলে সে কাঞ্চনতলার বেদিতে বসল।

খিড়কির দরজায় মা একবার উঁকি মেরে গেলেন। দেখলাম। মায়ের যা স্বভাব!

মহফুজ হঠাৎ কাঁচুমাচু হেসে বলল, 'কিছু মনে না করলে সিগারেট খাব রেশমিদি!'

'খাও। আমি কি তোমার জ্যোৎস্নাআপা যে আমাকে লজ্জা করছ?'

মহফুজ সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'এই রে! ভুলে গিয়েছিলাম। জ্যোৎস্নাদি একটা চিঠি দিয়েছেন।' বলে সে বুকপকেট থেকে সাদা মুখআঁটা একটা খাম দিল।

ব্যস্তভাবে খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলাম। জ্যোৎস্নাআপা লিখেছেন :

'রেশমি,

তোমাদের বাড়ি থেকে ফিরে পরদিনই নুরপুরের সেই ভদ্রলোক গোলাম কাদেরকে একটা সাংঘাতিক বেনামী চিঠি লিখেছি। তোমার বারটা বাজিয়ে ছেড়েছি। রাগ কর না কিন্তু! তোমার কান্নাকাটি দেখেই কাজটা করতে হল! আর রাজাকে দিয়েও একটা চিঠি লিখিয়ে ডাকে দিয়েছি। রাজা আরও সাংঘাতিক কথা লিখেছে। রেশমি বেগমের দিকে হাত বাড়াবেন না, সাবধান! প্রথমে হাত, তারপর গলাও কাটা যেতে পারে। পুলিশের কাছে গিয়ে লাভ হবে না। গেলে আরও বিপদ হবে। এইসব কথাবার্তা লিখেছে রাজা। ও ভীষণ মজা পেয়েছে জান? মজা তো আমিও পেয়েছি। নিজের জীবনে এই খেলা খেলেছি। এবার তোমার জীবনে খেললাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ভুল করলাম না তো? বয়স বাড়ছে। জ্ঞানবুদ্ধি ঝরঝরে হচ্ছে দিনেদিনে। তাই ভাবছি, কী থেকে কী ঘটে যায় কে বলতে পারে? এবার রাজার কথা বলি। তোমার সম্পর্কে ওর মনোভাব জানার চেষ্টা করেছিলাম। একবার ঠাট্টা করে বলেওছিলাম, রেশমিকে তুই বিয়ে করবি? করিস তো বল, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। রাজা কী বলল জান? বলল, বিয়ে করতে হলে নিশ্চয় রেশমিকেই করা উচিত। কিন্তু

আমি বিয়ে-টিয়ে করবই না। আমার অনেক অ্যাম্বিশন আছে। আমি বুঝতে পেরেছি রেশমি, রাজাকে তুমি নতুন চোখে দেখেছ এবং তোমার ভাল লেগেছে। আমার চোখে কিছু এড়ায় না। আমি কিন্তু রাজার পেছনে লেগে থাকব। এসব কথা শুনে রাগ কর না। শিগগির একদিন এস। মোহন টকিজে আবার একটা ভাল বই এসেছে। মহফুজকে জানিয়ে দেবে, কবে আসছ। খালুআব্বা এলেন না তো? আব্বা ওঁর পথ তাকিয়ে আছেন। খালামাকে আমার হাজার সালাম জানিও। ইতি, জ্যোৎস্না।'

জ্যোৎস্নাআপার চিঠির প্রথম অংশটা পড়ার সময় খুব হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু রাজাদার কথায় এসে রাগ হল। কেন এসব কথা লিখলেন জ্যোৎস্নাআপা? কেনই বা রাজাদাকে ফোঁপরদালালি করে বিয়ের কথা বলতে গেলেন? একেই বলে সব শেয়ালের এক রা। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার, একটি মেয়ের জীবনে যেন বিয়ে ছাড়া আর কোনও চিন্তাভাবনা থাকতে নেই। বিয়ে হয়ে গেলেই যেন সবকিছুর সুরাহা হয়ে গেল! একটি ছেলে বড় হয়ে উঠলে তার জীবনে 'অ্যাম্বিশন' নামে রহস্যময় কিছু থাকবে এবং একটি মেয়ে বড় হয়ে উঠলে 'বিয়ে' নামে একটা গতানুগতিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না!

মহফুজকে বললাম, 'বস। আসছি।'

মহফুজ বলল, 'আমি কিন্তু চা-ফা খাই না। আর শুনুন, এখনই ফিরতে হবে। কাটিংগুলো এখানে রইল। লক্ষ রাখবেন।'...

ক'দিন পরে এক সকালে শুনলাম, দলিজঘরে বাবা কার সঙ্গে উত্তেজিত স্বরে কথা বলছেন। হঠাৎ কানে এল আমাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। দলিজঘরের এদিকের দরজায় ঘাপটি পেতে মা দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য। কালুর মাও তুম্বো মুখে শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে যেতে দেখে মা ভুরু কুঁচকে হাতের ইশারায় বারণ করলেন। থমকে দাঁড়ালাম।

বাবার কথা শুনতে পেলাম। 'একেবারে মিথ্যা। দেখুন মিরসায়েব, গ্রামে আমার অনেক শত্রু আছে। তারা সরাসরি কিছু করতে পারে না বলেই আড়াল থেকে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। আপনি জানেন, খোদার মেহেরবানিতে আমার কিছু ইনফ্লুয়েন্স আছে।'

হাসি চেপে সরে এলাম। জ্যোৎস্নাআপা এবং রাজাদার চিঠি পৌঁছে গেছে যথাস্থানে। নিজের ঘরে ফিরে রেকর্ডপ্লেয়ার চালিয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে গম্ভীর মুখে মা এলেন। বললেন, 'বাজনা থামা তো বাবা! এদিকে এক সাংঘাতিক কাণ্ড।'

আওয়াজ কমিয়ে বললাম, 'কে খুন হল, আম্মি?'

'সবসময় তামাশা ভাল লাগে না!' মা রুষ্টমুখে বললেন। 'দুশমন হারামিদের চোখ টাটাচ্ছে। তাই খালি ক্ষতি করার চেষ্টা!'

নিরীহ ভঙ্গিতে বললাম, 'কে কী ক্ষতি করেছে বল তো?'

মা খাটে পা ঝুলিয়ে বসলেন, অভ্যাস মত। তারপর মুখখানা যতটা সম্ভব বিকৃত করে বললেন, 'এ ঠিক ওই জাভেদ হারামির কাজ। তুই তো কথাটা জানিস না। ওই আতরাফের (নিম্নবর্ণীয়) বাচ্চার কী সাহস! দুটো পয়সা হয়েছে। টেম্পো কিনেছে। তারই জোরে সেবার তোর আব্বাকে বলেছিল, আপনার মেয়েকে আমার ঘরে দিন উকিলসায়েব। আমার ছেলেও গ্রাজুয়েট। তোর আব্বাকে বলেছিল, মুখে পয়জার মারতে পারোনি?'

'ঠিক বলেছিলে। কিন্তু সাংঘাতিক কাণ্ডটা কী?'

মা চাপা স্বরে বললেন, 'নুরপুরে চিঠি পাঠিয়েছে। তোর নামে হাজার কুচ্ছো করেছে। আবার শাসিয়েছে।' বাইরে বাবার সাড়া পেয়ে উত্তেজিতভাবে মা উঠে দাঁড়ালেন। গলা চড়িয়ে বললেন, 'পুলিশে দাও ছোটলোকের বাচ্চাকে।' তারপর ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন।

জানালায় উঁকি মেরে দেখলাম, বাবা বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে আছেন। মুখখানা জ্বলছে। মাকে দেখে বললেন, 'ভাইজানের কথা শুনে যা-ও বা দোনামনা করছিলাম, আর কোনও কথা নয়। ফজল মিরকে বললাম, আমার ওপর যদি ওঁদের বিশ্বাস থাকে, ভাল-ভাল লোকের কাছে আমার মেয়ে সম্পর্কে খবর নিন। নিয়ে তারপর যা ভাল বোঝেন করুন।'

'আরে ফজলমির তো ফালতু লোক নন। দুনিয়া চরিয়ে বেড়ান। উনি ভালই বুঝেছেন, এ আমার কোনও শত্রুর কাজ! রেশমিকে এতটুকু থেকে দেখেছেন। তার ওপব মামলা-মোকর্দমার দালালি ওঁর পেশা। টাউনেই পড়ে থাকেন একরকম। তো কথা হল, বেনামী চিঠির ব্যাপারটা আমাকে জানান দরকার বলেই এসেছিল। বললেন, গোলামমিয়া একটু ভড়কে গেছে। নিরীহ ছেলে—কোনও সাতে পাঁচে থাকে না। ভড়কে যাওয়া স্বাভাবিক। আমি বললাম, ওকে বলবেন, ওর কোনও ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। কাজি মোতাহার হোসেন বেঁচে থাকতে—যাক্ গে। আমাকে এক কাপ চা করে দাও জলদি। বেরুব।'

মা আস্তে বললেন, 'চা কেন? গোসল করে দুমুঠো খেয়েই বেরোও।'

নাহ্। একবার মাঠে ঘুরে আসি। কালু বলছিল, বিঘেপনের জমিতে পানির টান ধরেছে। পীরপুকুরে মহিউদ্দিনের পাম্প বসাতে হবে। একটা নিজের পাম্পিং মেসিন কেনা উচিত। মহিউদ্দিনের বড্ড গরজ।'

এইসব বৈষয়িক কথাবার্তা বলতে থাকলেন বাবা। কিন্তু ততক্ষণে আমার মুখের হাসি উবে গেছে। ঠিক যা ভেবেছিলাম, তাই হতে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নাআপার চিঠিতেও এমন একটা আভাস ছিল।

বাবা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে ঘর থেকে বেরিয়ে সেদিনকার মত বললাম, 'আম্মি! আমাকে খেতে দাও। জ্যোৎস্নাআপার বাড়ি যাব।'

এদিন মায়ের অন্য মূর্তি। শক্ত মুখে বললেন, 'না বাবা! আর কোথাও তোকে বেরুতে হবে না। মিছেমিছে লোকে এতবড় একটা কেলেঙ্কারি রটিয়েছে। বাইরে চলাফেরা দেখলে আরও একশোমুখে রটাবে।'

খাপ্পা হয়ে বললাম, 'আমি ওসব বুঝি না। আমি যাব।'

'ধিঙ্গিপনা করিসনে রেশমি! আজ বাদে কাল শাদির ইন্তেজাম (প্রস্তুতি)। খুব টোটো করে ইচ্ছে মত বেড়িয়েছ। আর নয়।'

'পার তো আমাকে আটকাও।' বলে ঘরে ঢুকে শাড়ি বদলাতে ব্যস্ত হলাম।

মা এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কর্কশ স্বরে বললেন, 'রেশমি! যদি যাস, ফিরে এসে আমার মরামুখ দেখবি।' তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। 'চিরটা কাল তুই আমাকে এমনি করে জ্বালাবি? আমি তোর কেউ না? আমার একটা কথার দাম নেই তোর কাছে? হায় খোদা! এ আমি কাকে পেটে ধরেছিলাম?'

আমি অপ্রস্তুত। কাপড় পরা ব্যস্ত হাত থেমে গেল।

মায়ের মধ্যে গ্রাম্য মেয়েলি প্রবণতাগুলো কখনও-কখনও লক্ষ করেছি। কিন্তু এ ধরনের অদ্ভুত বিস্ফোরণ কখনও দেখিনি। তাই আমাকে হার মানতে হল। তখনকার মত। আমাকে যেমন মা জড়িয়ে ধরেন, তেমনি করে মাকেও জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি থামাতে হল। তবু বললাম, 'ঠিক আছে। তোমার কথা মানছি। কিন্তু দেখবে, আব্বাকে বলে আমি ঠিকই জ্যোৎস্নাআপার বাড়ি যাব।'

মা চোখ মুছে আস্তে বললেন, 'তোর আব্বুও তোকে আর বাইরে যেতে দেবেন না।'

চমকে উঠে বললাম, 'তোমাকে বলেছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।' বলে মা আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

স্তম্ভিত হয়ে পুবের জানলার কাছে বসে রইলাম। ঝিলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, উজ্জ্বল রোদে হিজলগাছটা হু হু করে জ্বলছে। ওখানে কেউ নেই। দাউদাউ আগুনে সমস্ত সবুজ জ্বলেপুড়ে ছারখার হচ্ছে। অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠলাম।

সেদিনই প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম, যে স্বাধীনতার বড়াই করেছি এতকাল, তার চারদিকে একটা অদৃশ্য সীমারেখা ছিল। সেই সীমারেখা এবার স্পষ্ট হচ্ছে। আমার চারদিকে আস্তে আস্তে উঁচু হচ্ছে একটা কালো দেয়াল। বাইরে এতকালের পরিচিত পৃথিবীটা আমার কাছ থেকে যেন দূরে সরে যাচ্ছে। ক্রমশ সমস্ত স্মৃতি সমস্ত জীবন স্বপ্নের মত অলীক মনে হচ্ছে।

দুপুরে প্রথমে কালুর মা এসে সাধাসাধি করে গেল। তারপর মা এলেন। 'এমনি করে কষ্ট দিবি সবাইকে? গোসল করবি না? খাবি না?'

গোঁ ধরে শুয়ে রইলাম। মা কিছুক্ষণ আদর করলেন। তারপর রাগ করে চলে গেলেন।

কতক্ষণ পরে বাবার ডাক শুনে উঠে বসলাম। 'রেশমি! কী হয়েছে?'

'কিচ্ছু না। শরীর খারাপ।'

বাবা একটু হাসলেন। 'এতদিন ভাবতাম, আমার মেয়ে আমাকে বিশ্বাস করে।'

'কেন ওকথা বলছেন আব্বু?'

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর চাপা শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তোর চিনুকাকুর একটা চিঠি পেলাম আজ। আমার খুব অবাক লাগছে রেশমি! যে-কথাটা তুই আমাকে জানাতে পারতিস—আশ্চর্য, আমি বুঝতে পারছি না। কিছু। যাই হোক, পরে কথা হবে। খাবি আয়।'

কথাটা শুনে চিনুকাকুর ওপর চটে গিয়েছিলাম। অদ্ভুত মানুষ তো! তাঁকে চিঠি লিখলাম আমি, আর উনি তার জবাব দিলেন বাবাকে? বললাম, 'কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'তুই চাস আমি আর তোর আম্মি না খেয়ে থাকি?'

বাপ-সোহাগী মেয়ে আমি। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'চলুন।'...

সেদিনই বিকেলে বাগানে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন বাবা। কাঞ্চনতলার বেদিতে বসে বললেন, 'বস্ এখানে।'

বাবার হুকুম মেনে একটু তফাতে বসলাম। অস্বস্তি হচ্ছিল। জীবনের কোন এক চরম মুহূর্ত যেন আসন্ন। মুখ নামিয়ে বসে রইলাম। বাবা একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'আগে তুই আমাকে খুলে বল্, কেন তোর এ বিয়েতে মত নেই? লজ্জা করিস না মা! বাইরের একজন মানুষকে খোলাখুলি জানাতে পেরেছিস নিজের বাবাকে জানাতে যদি না পারিস, তা হলে বুঝব নুরপুরে ওরা যে উড়ো চিঠি পেয়েছে, তা মিথ্যা নয়। কোথাও কারও সঙ্গে তোর সম্পর্ক আছে।'

শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললাম, 'নাহ্'।

'লুকোস নে রেশমি! মুখ ফুটে বল্, তা হলে সেখানেই সম্পর্ক করব।'

জোরে মাথা নেড়ে বললাম, 'না, না! কারও সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।'

'তা হলে এবিয়েতে তোর অমত কেন?'

মুখ নামিয়ে শাড়ির পাড় ভাঁজ করছিলাম। বলার কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

'রেশমি! জীবন নিয়ে জুয়া খেলিস না। তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছি অন্য কোনও কারণে নয়, তোর জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের জন্য। তুই কি ভেবেছিলি তোকে চাকরি করার জন্য লেখাপড়া শিখতে দিয়েছিলাম? খোদার দয়ায় আমার মেয়েকে কারও দাসত্ব করে খেতে হবে না। আমার যেটুকু আছে, দেখাশোনা করে চললে হেসেখেলে জীবন কেটে যাবে।' বাবা বক্তৃতা থামিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আমার দিকে ঘুরে ফের বললেন, 'চিনু চির-বাউন্ডুলে। ওর মাথায় অদ্ভুত-অদ্ভুত আইডিয়া খেলে। ও নিজের জীবন নিয়ে জুয়ো খেলে বেড়াচ্ছে। দুনিয়াদারির কী বোঝে চিনু? খালি বড়-বড় কথা। দ্যাখ্ রেশমি, আমরা সংসারি মানুষ। আমাদের রাস্তাটাই একেবারে আলাদা। যাই হোক, কেন তোর অমত আমাকে খুলে বল্।'

'আমার এসব ভাল লাগে না।'

'কী সব?'

'বিয়ে-টিয়ে'

বাবা হাসলেন, 'ছেলেটিকে পছন্দ হচ্ছে না?'

ছেলে শুনে অদ্ভুত লাগল। একটা দাড়িওয়ালা লোককে বাবা ছেলে বলছেন! মুখ নামিয়ে অগত্যা বললাম, 'হ্যাঁ।'

বাবা জোরে হেসে উঠলেন। 'ছবি দেখেই অপছন্দ! দ্যাখ রেশমি, ছবিতে মানুষ ধরা পড়ে না। ছবি হচ্ছে ছবি। রক্তমাংসের মানুষের সঙ্গে তার কোনও মিল থাকে না। ওঁরা আগামীকাল তোকে দেখতে আসবেন। তুই এডুকেটেড মেয়ে। স্মার্টলি কথা বলবি গোলাম কাদেরের সঙ্গে। অত্যন্ত ভাল ছেলে। সংসারি বুদ্ধিতে পাকা। তা ছাড়া স্ট্রাগল করে অতখানি লেখাপড়া শিখেছে। তুই সামনাসামনি দেখে আর কথা বলে তারপর আমাকে বলিস। আমার উকিলের চোখ, রেশমি! সম্ভবত আমি ভুল করিনি।'

বাপসোহাগী মেয়ে আমি, চুপচাপ বসে রইলাম। চিনুকাকুর কণ্ঠস্বর দু'একবার ভেসে এল 'প্রশ্ন কর রেশমি, প্রতিবাদ কর।' কিন্তু আমি বোবা হয়ে গেলাম। বাবাব কথা থামল না। কিন্তু আমি কিছুই শুনছিলাম না।

সে রাতে বাবা-মায়ের কথা থেকে আঁচ করেছিলাম, কনে দেখার ব্যাপারটা পাড়ার কাকেও জানতে না দিয়েই সেরে নেওয়া হবে। দাড়িওয়ালা শিক্ষকটির নাকি ইচ্ছা, কনে যেন সাজগোজ না করে। আটপৌরে স্বাভাবিক চেহারায় সে কনে দেখতে চায়।

অনেক রাতঅব্দি জেগে নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করছিলাম। প্রচণ্ড স্মার্ট হয়ে চোখাচোখা কথাবার্তা বলব আর দাড়িওয়ালাকে নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়ব, এইসব প্ল্যান ভাঁজছিলাম। লোকটাকে যে ভাবেই হোক, রাগিয়ে দিতে হবে। মনে মনে তার সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সকালে হঠাৎ মনে হল, আমি যখন অবিশ্বাস্য সুন্দর, তখন আরও বেশি সুন্দর হয়ে লোকটার চোখ ঝলসে দিই না কেন? ব্যাপারটা আমি একটা মজার খেলা বলেই ধরে নিলাম।

দৃশ্যটা এখনও চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একটা নাটকের রঙ্গমঞ্চে গ্রিনরুম থেকে চোখ ঝলসানো রূপ নিয়ে এক ফুলপরির প্রবেশ!

মা পইপই করে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, ঢুকে যেন চাপা স্বরে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলি। আমার ইচ্ছে ছিল দু-হাত জোড় করে নমস্কার বলব। ওরা চটে যাবে। কিন্তু দলিজঘরে ঢুকেই দেখি, বাবাও বসে আছেন। তক্তাপোশের গদির ওপর ঝকঝকে বিছানায় তিনজন লোক। ফজলমিরকে আমি চিনি। দাড়িওয়ালা শিক্ষক ভদ্রলোককে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। তার পাশে একজন গুঁফো গাব্দাগোব্দা লোক। কয়েক জোড়া চোখ আমাকে গিলে খাচ্ছিল।

ফজলমির সহাস্যে বললেন, 'বস মা বস!'

বাবা বললেন, 'এঁদের সালাম দাও, রেশমি!' বাবার কণ্ঠস্বরে ঈষৎ অনুযোগ ছিল। মৃদুস্বরে সালাম আওড়ে একটা চেয়ারে বসলাম। মনে হল, আবার একটা চরম মুহূর্ত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফজলমির বললেন, 'বাবা গোলাম কাদের! বলতে গেলে আমাদের ঘরের মেয়ে। সেই ফ্রকপরা বয়স থেকে দেখছি। আমাদের জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। তুমিই বাতচিত কর।'

বর আমাকে অবাক করে বলল, 'আপনার নামে স্ক্যান্ডাল রটান হচ্ছে। কেন বলুন তো?'

এ তো দারুণ স্মার্ট লোক দেখছি! আমি কথা হারিয়ে ফেললাম। বাবা পাথরের মূর্তি হয়ে গেছেন মনে হল। গুঁফো লোকটি মুচকি হাসল। ফজলমির খিক খিক করে হেসে বললেন, 'দ্যাখ কাণ্ড! ও গোলাম, এসব কী জিজ্ঞেস করছ আমাদের মেয়েকে?'

বর একটু হেসে বলল, 'চাচাজি, সব ব্যাপারে আমি ফ্র্যাংকলি কথা বলতে অভ্যস্ত।' বলে সে বাবার দিকে তাকাল। 'কাইন্ডলি যদি কিছু না মনে করেন, আপনার অসাক্ষাতে আপনার মেয়ের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। আপনার আপত্তি নেই তো?'

বাবা বললেন, 'কোনও আপত্তি নেই। তোমাকে তো বলছি বাবা, আমার ফ্যামিলির কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ডটাই আলাদা। সেকেলে রীতিনীতির বালাই নেই। মেয়েকে আমি একালের রীতিনীতিতে মানুষ করেছি।'

বাবা উঠে দাঁড়ালে ফজলমির বললেন, 'হ্যাঁ। কালের হাওয়া মেনে চলতেই হবে। তার চেয়ে বড় কথা, যেখানে জিন্দেগি কাটাতে হবে, সেখানে দেখে শুনে পা ফেলাই উচিত।'

বর সিরিয়াস হয়ে বলল, 'চাচাজি, আপনারাও কাইন্ডলি একটু বাইরে যান।'

ফজলমির হাসলেন। 'খুব ভাল কথা! এস বাপ খয়েরুদ্দিন। ওরা কথাবার্তা বলুক। আলাপ-পরিচয় করুক। আমরা তো আসলে ফালতু লোক। কথায় বলে, মিয়া-বিবি রাজি তো কী করবে কাজি?'

গুঁফো খয়েরুদ্দিন, ফজলমির আর বাবা বাইরের দরজা দিয়ে বেরুলেন। ওদিকটায় একটা চত্বর

আছে। চত্বরে একটা প্রকাণ্ড নিমগাছ। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, তিনজনে নিমগাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

বর গম্ভীর চালে বলল, 'আপনার ছবি দেখেছি। আপনার আব্বা নিয়ে গিয়েছিলেন। তো ছবি দেখে মনে হয়েছিল, আপনি ভীষণ হাসিখুশি চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে। আপনি মুখ ভার করে আছেন কেন? ফ্র্যাংকলি কথা বলুন। আমি কী ধরনের মানুষ বুঝতেই পারছেন। আহা, কিছু বলুন!'

অগত্যা বললাম, 'কী বলব?'

'আপনার বলার কথা নেই?' বর রাশভারি চালে একটু হাসল। কেন—আপনার নামে স্ক্যান্ডাল রটার কথা বলেছি। এ বিষয়েই কিছু বলুন।'

লোকটি ভারি অদ্ভুত তো! মনে মনে চটে গিয়ে বললাম, 'যে-মেয়ের নামে স্ক্যান্ডাল রটে, তাকে বিয়ে করবেন কেন?'

বর মিটিমিটি হেসে বলল, 'কোনও মেয়ে যদি আপনার মত সুন্দরী হয়, অথচ কোনও পুরুষকে আকর্ষণ না করতে পারে, তা হলে বলব, তার সৌন্দর্য খাঁটি নয়, মেকি। আপনি নিশ্চয় কোনও পুরুষকে আকর্ষণ করতে পেরেছেন। তাই সে আপনার বিয়েতে বাধা দিতে চেয়েছে। কে সে?'

'জানি না।'

বর আবার গম্ভীর হল। 'দেখুন, খোদার মেহেরবানিতে আমি সেলফ-মেড ম্যান। আপনি শুনে থাকবেন, আমি স্ট্রাগল করে মাথা তুলেছি। আমার কাছে লাইফ মানেই স্ট্রাগল। এই বিয়ে করার ব্যাপারটাও একটা স্ট্রাগল। আপনাকে খুলেই বলছি, দু-দুটো উড়ো চিঠি পেয়ে একটু ভড়কে গিয়েছিলাম। পরে মনে হল, এতদিন সব স্ট্রাগলে জিতেছি—এটাও জিততে হবে এবং আমি জিতবই। কারণ খোদা এতদিন আমার সহায় থেকেছেন। এবারও থাকবেন। তবে খোদা নারাজ হলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু কেনই বা তিনি নারাজ হবেন? আমি তো নিজের জ্ঞাতসারে কোনও গোনাহ্ করিনি।'

কথাগুলো কান করে শুনছিলাম। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, লোকটিকে প্রথমে যতটা অদ্ভুত বা জোকার ভেবেছিলাম, সে তা নয়। কোথায় যেন চিনুকাকুর সঙ্গে একটুখানি মিলও আছে। 'সেলফ-মেড ম্যান' কথাটার পাশে 'খোদার মেহেরবানি' মিলে একটা বিশ্বাসমিশ্রিত শক্তি তার মুখটাকে যেন একটা লাবণ্য দিয়েছিল অথবা আমার দেখার ভুল। তবে স্বীকার করতেই হবে, মানুষকে আকর্ষণ করার মত একটা চরিত্র।

'কিন্তু তার আগে আমার জানা দরকার, এ বিয়েতে আপনার সম্মতি আছে কি না?'

চমকে উঠে তার দিকে তাকালাম। তারপর মুখ নামিয়ে বললাম, 'আমার সম্মতি আছে কি না জেনে কী হবে? আপনি তো স্ট্রাগল করে জিতে নেবেন বললেন!'

গোলাম কাদের একটু হেসে মাথা নাড়ল। 'কথাটা ওভাবে নেবেন না। আপনি শিক্ষিতা মুসলিম মেয়ে। আপনার জানা উচিত, ইসলামে নারী-পুরুষের সমান স্থান। অশিক্ষিত কাঠামোল্লাদের কথা ছেড়ে দিন। ওরাই ইসলামকে ডুবিয়েছে। ইসলামের শরিয়ত বলছে, বিয়েতে মেয়েদের সম্মতি চাই। আপনি ইজিন কাকে বলে জানেন? কথাটা আপনার জানা উচিত!'

'শুনেছি।'

'ইজিন মানে সম্মতি। বিয়ের সময় আগে মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, অমুকের পুত্র অমুক আপনাকে শাদির প্রস্তাব দিয়েছে, এতে আপনি কি ইজিন দিচ্ছেন? আপনি বলবেন, দিলাম। আপনাকে তিনবার জিজ্ঞাসা করবেন শাদির উকিল সাহেব। তাঁর সঙ্গে থাকবেন দুজন সাক্ষী। উকিল সাহেব তাঁদের বলবেন, আপনারা শুনলেন? সাক্ষীরা বলবেন, শুনলাম। এর পর উকিল সাহেব সাক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে শাদির মজলিশে যাবেন। সেখানে তিনি বলবেন, অমুকের কন্যা অমুককে অমুকের পুত্র অমুক শাদির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বিবি ইজিন দিয়েছেন। মৌলবিসাহেব বা ম্যারেজ রেজিস্ট্রার কাজিসায়েব সাক্ষীদের জিজ্ঞেস করবেন, আপনারা নিজের কানে শুনেছেন? সাক্ষীরা বলবেন, হ্যাঁ শুনেছি। তিনবার জিজ্ঞেস করা হবে। তারপর আমাকে বলা হবে, অমুকের কন্যা অমুককে আপনি যে শাদির প্রস্তাব দিয়েছিলন, তিনি তাতে ইজিন দিয়েছেন। আপনি কি ইজিন কবুল করছেন? কবুল মানে

মেনে নেওয়া—অ্যাকসেপ্ট্যান্স! আমি তিনবার প্রশ্নের জবাবে কবুল বললে তখন শাদি সিদ্ধ হবে। তা হলে দেখুন ইসলামে আপনার আমার দুজনেরই সম্মতি ছাড়া বিয়ে সিদ্ধ নয়।'

আমার হবু বর বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী সন্দেহ নেই। এই জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্র আওড়ে আমার দিকে তাকাল সে। মুখের হাসিতে কৌতুক ছিল। বলল, 'মেয়েদের অবশ্য ইজিন না দিয়ে উপায় থাকে না। আপনারও উপায় থাকবে না। তাই আগেভাগে জেনে নিতে চাইছি, আপনি এ বিয়েতে রাজি কিনা। তখন চাপে পড়ে মুখে ইজিন দেবেন, অথচ মনে মনে দেবেন না, এটা ঠিক নয়। আমি গায়ের জোরে আপনাকে বিয়ে করতে চাই না। এ-ও চাই না যে আপনি আপনার আব্বার চাপে পড়ে আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য হন।'

চুপ করে আছি দেখে সে বলল, 'দেখুন, এ কথাটাও ঠিক যে মাত্র কিছুক্ষণের আলাপে কোনও মানুষের কিছুই জানা যায় না। দুজনে রাজি হলাম হয়ত। কিন্তু তাতেই যে বিবাহিত জীবনে আমরা সুখী হব, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। সেজন্যই ইসলামে তালাকেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিয়ে ব্যাপারটা ইসলামে একটা চুক্তি।'

আর চুপ করে থাকলাম না। বললাম, 'কিন্তু চুক্তি ভাঙার অধিকার শুধু পুরুষদেরই। আপনি চুক্তি ভাঙতে পারবেন। আমার সে অধিকার নেই।'

আমার হবু বর রসিক লোক। মুচকি হেসে বলল, 'মেয়েরা ইচ্ছে করলে পুরুষদের লাইফ হেল করে দিতে পারে। তখন বেচারা তালাক না দিয়ে বাঁচবে না। এক্ষেত্রে আমি তো হব ঘরজামাই। যখন খুশি আমার ঘাড় ধরে রাস্তায় নামিয়ে দিলেই হল।'

হাসি পাচ্ছিল কথার ভঙ্গি দেখে। হাসি চেপে বললাম, 'আমার কথাটা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন!'

গোলাম কাদের তেমনি কৌতুকে চোখ বড় করে তাকিয়ে বলল, 'কী সর্বনাশ! রেশমি বেগম কি ইসলামকে চ্যালেঞ্জ করছেন?'

'চ্যালেঞ্জ নয়। বিয়ে যদি চুক্তি হয়, তা হলে চুক্তি ভাঙার অধিকার দুপক্ষেরই থাকা উচিত।'

'কারণ দেখিয়ে মেয়েদের তালাক চাওয়ার অধিকারও আছে।'

'পুরুষদের বেলায় কিছু কারণ না দেখিয়েই তালাক দেওয়ার অধিকার আছে।'

গোলাম কাদের হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি উকিলসায়েবের মেয়ে। একটা পয়েন্ট তুলেছেন বটে। তবে কি জানেন? খোদার দুনিয়ায় পুরুষেরা মেয়েদের গার্জেন। নেচার খোদারই ল। সেই ল আপনাদের মেরে রেখেছে। খোদার কুদরত (মহিমা) মানুষের বোঝা কঠিন। থাক্ গে, এসব ফিলসফিক্যাল ব্যাপার নিয়ে এখন আলোচনার সময় নেই। বি এ-তে আপনার অনার্সে কী সাবজেক্ট ছিল?'

'ফিলসফি।'

'বাঃ! আপনার সঙ্গে আমার দারুণ জমবে। আমরা একই পথের পথিক।'

গোলাম কাদেরকে আমার ভাল লেগে গেল।...

বাবার মুখে খবর পাওয়ার পর জ্যোৎস্নাআপা একদিন সকালে এসে পড়লেন। মায়ের কাছে কিছুক্ষণ হইহল্লোড় করে তারপর আমাব ঘরে এলেন। ভুরু কুঁচকে আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর চাপা স্বরে বললেন, 'আমি সত্যি বোকা বনে গেছি রেশমি! কী ব্যাপার খুলে বল তো?'

একটু হেসে বললাম, 'আপনাদের উড়ো চিঠি ফস্কে গেছে।'

'লোকটা আচ্ছা বেহায়া তো! বেহায়া আর গোঁয়ার।' জ্যোৎস্নাআপা বিকৃত মুখে বললেন। 'খালুআব্বার মুখে সব শুনে আমি তো অবাক। আবার তুমিও নাকি বিয়েতে মত দিয়েছ?'

'কী করব? আব্বাকে তো জানেন।'

জ্যোৎস্নাআপা একটু চুপ করে থাকার পর ফিসফিস করে বললেন, 'এদিকে আমি রাজার পেছনে লেগে থেকে-থেকে ওকে রাজি করিয়েছি। গোপনে দুজনে রেজেস্টি করে রাখবে। তারপর সময়মত খালুআব্বাকে ম্যানেজ করা যাবে— এই ছিল আমাদের প্ল্যান। এবার কী হবে বল তো?'

ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কথাগুলোর মানে খুঁজছিলাম।

জ্যোৎস্নাআপা বললেন, 'অমন চিঠি পেয়েও কেউ বেহায়ার মত মেয়ে দেখতে আসবে কল্পনা করা যায় না। লোকটার শরীরে রক্তমাংস নেই মনে হচ্ছে। একেবারে কসাই। আসলে তোমার মত সুন্দর মেয়ে দেখে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, বুঝলে?'

'আচ্ছা আপা! রাজাদার অ্যাম্বিশন-ট্যাম্বিশন—সে সবের কী হল?' আমার এ প্রশ্নে চাপা কৌতুক ছিল।

'কী হবে? প্ল্যান হয়েছিল রেজেস্ট্রি হয়ে থাকবে বিয়েটা। পরে গোপনে তুমি চলে যাবে ওর কাছে। খালুআব্বা থানা পুলিশ করতে যাওয়ার আগেই আমি ওঁকে জানিয়ে দিতাম। আফটার অল, একমাত্র মেয়ে। আর যাই করুন, অস্বীকার করতে তো পারতেন না। তা ছাড়া ফ্যামিলির মানইজ্জতের প্রশ্নও আছে। কিন্তু এদিকে তোমার বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে। তাই শুনে ছুটে এলাম।'

জ্যোৎস্নাআপা উঠে দাঁড়ালেন। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে বললেন, 'চল। তোমার বাগান দেখি।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'বাগান-টাগান কিচ্ছু হয়নি। মহফুজের দেওয়া ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকার চারাগুলো গোরুতে মুড়িয়ে খেয়েছে। বাগান করব না বিয়ে করব বলুন তো আপা?'

জ্যোৎস্নাআপা অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি তো অদ্ভুত মেয়ে! তখন মনে হচ্ছিল যেন ফুলের বাগান না করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এত হুইমিজিক্যাল হওয়া ভাল না, রেশমি! চল কথা আছে।'

আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন জ্যোৎস্নাআপা। কাঞ্চনতলার বেদীতে বসে বললাম, 'মহফুজকে বলবেন না যেন! ও ভীষণ চটে যাবে।'

জ্যোৎস্না সে-কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'তুমি যাবে যাবে করে পথ তাকিয়ে আছি। এদিকে এই কাণ্ড। তুমি যাওনি কেন?

'বিয়ের আগে আমার বাইরে যাওয়া মানা।'

'আজ আমার সঙ্গে চল। খালামাকে আমি ম্যানেজ করছি। সঙ্গে নিয়ে যাব, ফিরিয়ে দিয়ে যাব। উনি আপত্তি করবেন না।'

'আব্বু যদি দেখতে পান, রাগ করবেন।'

'আমরা কোর্ট এরিয়ার ওদিকে যাব না।' জ্যোৎস্না আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে এমন নার্ভাস দেখাচ্ছে কেন, রেশমি?'

'আজ থাক্ আপা! আরেকদিন যাব বরং।'

জ্যোৎস্না পুরুষালি ভঙ্গিতে ধমক দিলেন. 'কোনও কথা শুনব না। আজ আমি তোমাকে লুঠ করে নিতে এসেছি, তা জান?' বলে ফিক করে হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

এতকাল পরে বুঝতে পারি, আমার সেই একুশ বছর বয়সে নিয়তি একেকরকম চেহারায় আমাকে দেখা দিয়েছিল। কখনও চিনুকাকু, কখনও রাজাদা, কখনও সে জাহানারা বেগম। যতবার তার ফাঁদ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছিলাম ততবার নতুন নতুন ফাঁদ পেতে আমাকে আটকাতে চাইছিল সে। সেদিন জ্যোৎস্নাআপা মাকে খুব সহজেই ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে শহরে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাস থেকে নেমে সাইকেল রিকশোয় যেতে যেতে হঠাৎ বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। এ আমি কোথায় যাচ্ছি? কেন যাচ্ছি?

জ্যোৎস্নাআপা বলেছিলেন, 'সিনেমার অনেক দেরি আছে। ততক্ষণ আমার ঘরে আড্ডা দেওয়া যাবে। যাওয়ার পথে রাজার স্টুডিও হয়ে যাব।'

কল্পনা স্টুডিওর কাছে গিয়ে জ্যোৎস্না পুরুষালি গলায় হাঁকলেন, 'রোখকে, রোখকে।'

রিকশো থামল। জনাদুই লোক সাইনবোর্ডে রঙের ব্রাস ঘষছিল। জ্যোৎস্নাকে দেখে একজন ডাকল, 'রাজাবাবু! জোছনাদি আপনাকে ডাকছেন।'

স্টুডিওর ভেতর থেকে রাজাদা বেরিয়ে এসে ছোট্ট কাউন্টারে দাঁড়াল। গায়ে লাল পাঞ্জাবি। চোখ জ্বলে গেল আমার। সে একটু হেসে বলল, 'আরে! আসুন আসুন!'

জ্যোৎস্না ভেংচি কাটার ভঙ্গি করে বললেন, 'ডাকলেই যাবে রেশমি! এত শস্তা?'

রাজাদা বলল, 'জ্যোৎস্নাদি, আপনার একটা পোর্ট্রেট এঁকেছি দেখে যান।

'বলিস কী রে?'

'দেখে যান না।'

জ্যোৎস্না রিকশো থেকে নেমে বললেন, 'এস রেশমি! দেখি তো কী একেছে। যদি পেত্নী করে আঁকে, আজ ওকে ওর স্টুডিওতেই জবাই করব।'

স্টুডিওর ভেতরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালাম। ইজেলে একটা পোট্রেট। সদ্য আঁকা হয়েছে। হয়ত এখনও ফিনিশিং টাচ পড়েনি। কিন্তু পোট্রেটটা জ্যোৎস্না আপার নয়। অথচ খুব চেনা লাগছে।

জ্যোৎস্না খপ করে রাজাদার চুল খামচে ধরলেন। 'ওরে বাঁদর। এ কী করেছিস?'

রাজাদা চুল ছাড়িয়ে নিয়ে তুলি নিল। বলল, 'কেমন হয়েছে বলুন?'

জ্যোৎস্না আমার কাঁধ খামচে বললেন, 'রেশমি! চিনতে পারছ না ওটা কার ছবি?'

এতক্ষণে নিজেকে আবিষ্কার করলাম ছবিতে। রাজাদা বলল, 'রেশমি! প্লিজ একটু দাঁড়ান ওখানে। জাস্ট স্মৃতি থেকে আঁকা তো!' সে তুলিতে রঙ নিয়ে ছবির দিকে ঝুঁকল। তারপর আমার দিকে তাকাল। আমি পাথরের মূর্তি হয়ে গেলাম। তার দৃষ্টি বারবার আঘাত করছিল আমাকে।

জ্যোৎস্না একটা টুলে বসে বললেন, 'তা হলে দেখ রেশমি! কেমন স্টান্ট দিল রাজা। ওরে তুই ভাই সত্যি জিনিয়াস।'

রাজাদা বলল, 'স্বীকার করছেন?'

'করছি। তবে এ-ও ঠিক, রেশমির জলছবি তোর মনে সাঁটা ছিল বলেই না পারলি! একেই বলে প-এ র-ফলা এ-কার ম।' বলে জ্যোৎস্নাআপা দাপটে হাসতে থাকলেন। কিন্তু ওরে হতভাগা, এখন যে তোকে শুধু ছবি নিয়েই থাকতে হবে, তা জানিস?'

নুরপুরের গোলাম কাদেরের সঙ্গে আমার বিয়ের সাতদিন বাকি। সেই সময় অতর্কিতে জ্যোৎস্নাআপা এসে আমাকে প্রায় তুলে নিয়ে গিয়ে রাজাদার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। মনে পড়েছিল, বাবা আমাকে বাগানে ডেকে নিয়ে গিয়ে বারবার বলেছিলেন, যদি কারও সঙ্গে গোপন সম্পর্ক থাকে, খুলে বললে তার সঙ্গেই আমার বিয়ে দেবেন। তখন তো সত্যিই রাজাদার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তাই বাবাকে অকারণ একটা মিথ্যা বলতে বেধেছিল।

সেদিন রাজাদার স্টুডিও থেকে কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে যখন জ্যোৎস্নাআপার সঙ্গে চাঁপাতলায় ওঁদের বাড়িতে যাচ্ছি, তখন আমি স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন। অদ্ভুত সেই স্বপ্ন। আমার সামনে দুটি পুরুষ। হোসেন রেজা আর গোলাম কাদের। গোলাম কাদেরকে আমার ভাল লেগেছিল। রাজাদাকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। ভাল লাগা আর ভালবাসার মধ্যে হয় তো বিশাল দূরত্ব আছে। বাস্তব আর কল্পনার যে দূরত্ব। বারবার নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম, রেশমি তুই কী করবি?

ভেবেই পাচ্ছিলাম না আমি কী করব? প্রেমিকের সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া মেয়েদের গল্প জ্যোৎস্নাআপার কাছে অনেক শুনেছিলাম। কলেজ জীবনে আমার সহপাঠিনী নাজমা কলেজে আসার নাম করে বেরিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। সে নিয়ে কত রসালো আলোচনা শুনেছিলাম। আমার কাছে খুব অশালীন মনে হত এসব ঘটনা। নিজের জীবনে এমনটা কল্পনা করতেই শিউরে উঠতাম। এবার কি আমি তেমন কোনও ঘটনার মুখোমুখি পড়ে গেছি? বুঝতে পারছিলাম, এ তত সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্য অনেক সাহস আর শক্তি দরকার হয়। আমার কি তা আছে?...

৭

আস্‌সালামু আলায়কুম!

কেউ কাউকে এই ইসলামি সম্ভাষণ করলে এখনও ভীষণ চমকে উঠি। বুক ধড়াস করে ওঠে। কয়েক মুহূর্তের জন্য নিঃসাড় হয়ে যাই। পবিত্র কথাটির মানে, 'তোমার প্রতি ঈশ্বরের শান্তি বর্ষিত হোক।' অথচ কথাটি আমার চেতনার ওপর চাবুকের মত আছড়ে পড়ে।

একুশ বছর বয়সে শেষ শবতের এক বিকেলে আমার সামনে একটি চূড়ান্ত মুহূর্ত ঘোষিত হয়েছিল ওই পবিত্র সম্ভাষণে। বার বছর পরে পিছু ফিরে তাকালেই সেই বিস্ফোরক মুহূর্তটিকে অনুভব করি।

দিনটি ছিল শুক্রবার। বর আর বরযাত্রীরা জুম্মার নামাজের একটু আগে এসেছিল। বাড়ির বাইরের চত্বরে শহরের ডেকোরেটর সুদৃশ্য শাহি দরবার তৈরি করেছিল। মাইকে বাজছিল বিসমিল্লা খানের সানাইয়ের রেকর্ড। জুম্মার নামাজের জন্য কিছুক্ষণ বাজনা থেমেছিল। মসজিদে নামাজ সেরে এসে খানপিনা। তারপর বসেছিল শাদির মজলিস। সানাইয়ের বাজনা আবার শুরু হয়েছিল।

এখনও স্পষ্ট দেখতে পাই শাদির দুলহানবেশিনী নিজেকে। সাজান ঘরে মউ মউ সুগন্ধ। রহিম ডাক্তারের মেয়ে আমার বন্ধু বেবি, জ্যোৎস্নাআপা, আমার পিসতুত বোন রোজি, আরও একঝাঁক মেয়ে আমার দুপাশে ভিড় করে বসে আছে। বয়স্ক মহিলারা দাঁড়িয়ে আছেন। চাপা কথাবার্তা চলেছে। সবাই সবাইকে হাসিতামাসায় টিট করতে ব্যস্ত। জ্যোৎস্নাআপাদের নার্শারি থেকে টেম্পোভর্তি ফুল এনেছিল মহফুজ। আমার ঘরে সেই ফুলের সাজ। উঠোনে তক্তাপোশ পেতে চাঁদোয়া খাটিয়ে ছাঁদনাতলা তৈরি হয়েছে। সেখানেও থরেবিথরে ফুলের সাজ। বিয়ের অনুষ্ঠান সারা হলে বর ছাঁদনাতলায় এসে বসবে। বাইরের প্যান্ডেল থেকে সদর দরজা হয়ে লম্বা লাল নকশাদার গালিচা বিছান হয়েছে ছাঁদনাতলা অব্দি। বরকে কতভাবে জব্দ করা হবে, তাই নিয়ে সকাল থেকে মেয়েমহলে চাপা জল্পনা শুনেছিলাম। মাঝে মাঝে চমকে উঠছিলাম। স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবটা চিড় খাচ্ছিল। আমার দুইহাতে মেহেদির কারুকার্য। ঝলমলে সোনার গয়না, জড়োয়া হার, হীরের দুল, মুক্তো বসান নাকছাবিতে আমার শরীরও কারুকার্যময়। এসবই যেন আমার বাইরের জিনিস, ভেতরে আমি নগ্ন। ভিড়ের ভেতরে আমি একা। কোলাহলের ভেতরে আমি বোবা।

মামুজি আসেননি। বাড়ির কাউকেই আসতে দেননি। সেই নিয়ে মা অনেক কান্নাকাটির পর শান্ত হয়েছিলেন। এতক্ষণে একবার উঁকি মেরে আমাকে দেখে গেলেন।

একটা সময়ে হঠাৎ ঘরের সবাই চুপ করে গেল। বয়স্ক মহিলারা মাথায় ঘোমটা টেনে দরজার কাছ থেকে সরে দুধারে ঠাসাঠাসি দাঁড়িয়ে গেলেন। হঠাৎ মনে হল সময় থেমে গেছে। ঘন গভীর একটা স্তব্ধতা সকলের শ্বাসপ্রশ্বাস থামিয়ে দিয়েছে।

'আস্‌সালামু আলায়কুম!'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গম্ভীর সম্ভাষণ করলেন, শাদির উকিল মসজিদের ইমামসাহেব।

বেবি ফিসফিস করে আমাকে বলল, 'সালামের জবাব দাও।'

আমার গলায় যেন বোবা ধরেছে। শাদির উকিল চশমার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে আমাব দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর দুপাশে দুই সাক্ষী বেবির বাবা রহিম ডাক্তার আর একজন অচেনা লোক। আমার হয়ে জ্যোৎস্নাআপা তাঁর পুরুষালি গলায় সম্ভাষণের জবাব দিলেন, 'ওয়া আলাইকুম আস্‌সালাম!'

শাদির উকিল একটু কেশে গলা সাফ করে বললেন, 'মোকাম নুরপুরের মির ইব্রাহিম আলির পুত্র মির গোলাম কাদের মোকাম কুসুমপুরের কাজি মোতাহার হোসেনের কন্যা মুসাম্মাত রেশমি বেগমকে এগার হাজার এক টাকা দেনমোহর (স্ত্রীধন) কবুল করে নিকাহের ইজাব (প্রস্তাব) দিয়েছেন। আপনি কি ইজিন (সম্মতি) দিচ্ছেন?'

এ এক চূড়ান্ত মুহূর্ত। আমি বোবা হয়ে গেছি। চারদিক থেকে ফিসফিস শব্দ, 'বল, দিলাম... বল দিলাম.... বল, বল—' শনশন করে ঝড় বইছে আমার চারপাশে। আমার পিঠে কাব আঙুলের খোঁচা। তারপর অনেকগুলো হাত আমাকে যেন নড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি এক বিশাল পাথর!

শাদির উকিল এবার গলা চড়িয়ে বললেন, 'মোকাম নুরপুরের ইব্রাহিম আলির পুত্র মির গোলাম কাদের কুসুমপুরের কাজি মোতাহার হোসেনের কন্যা মুসাম্মাত রেশমি বেগমকে এগার হাজার এক টাকা দেনমোহর কবুল করে নিকাহের ইজাব দিয়েছেন। দুলহান কি ইজিন দিচ্ছেন?'

আবার সেই শনশন চাপা ঘূর্ণিঝড়। আবার চারদিক থেকে একটা বিশাল পাথরকে নড়ানোর চেষ্টা। বেবির মা ভিড় ঠেলে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'শরম কী বেটি? বল, ইজিন দিলাম। আল্লা নারাজ হবে না। বল! মুখ ফুটে বলতে হয় কথাটা। সাক্ষীরা শুনবেন। তবে না—'

শাদির সাক্ষী তাঁর স্বামী ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'এ কী হচ্ছে 'এ কী হচ্ছে? একি ছেলেখেলা? তওবা, তওবা! মুখে শয়তান ঢুকে বোবা করেছে নাকি? বেবি! কী হল রেশমির, দ্যাখ তো!'

শাদির উকিল দম টেনে আবার বললেন, 'মোকাম নূরপুরের মির ইব্রাহিম আলির ফরজন্দ (পুত্র) মির গোলাম কাদের—'

আমার বুকের ভেতর থেকে রক্তমাখা আর্তনাদ বেরিয়ে গেল, 'না?'

চাপা ঝড়টা চারদিক থেকে ফুঁসে এসে ধাক্কা দিল আমাকে, 'রেশমি! রেশমি! রেশমি!'

দুহাতে মুখ ঢেকে মাথা নেড়ে আর্তনাদ করলাম, না না না না!' তারপর মাথা ঘুরে উঠল। মনে হল, অতল পাতালে তলিয়ে যাচ্ছি।...

মা বলতেন, 'বাপসোহাগী মেয়ের কপালে অনেক খোয়ার আছে।'

কালুর মা ছড়া কেটে বলত, 'অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর/অতিবড় সুন্দরী না পায় বর।'

কালুর মা এখন বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে সে দেখত, তার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। এখনও আমি আইবুড়ি হয়ে আছি। ইজিন-না-দেওয়া মেয়েকে লোকেরা ভয় পায় বলেই কি? হয়ত অনেকে ভয় পায়। আবার অনেকে সম্পত্তির লোভে আনাচে-কানাচে উঁকি দিতে এসে আমার ঠাণ্ডাহিম পাষাণ মুখের দিকে তাকিয়ে কেটে পড়ে। কখনও পাড়ার কোনও প্রবীণ মহিলা এসে আলগা কথার ফাঁকে আসল কথাটা পাড়তে চায়। আমি তাকে সে সুযোগ দিই না। একদিন বেবি এসে তার এক দেওরের কথা পেড়েছিল। তাকে বলেছিলাম, 'বেবি আর কখনও এসব কথা নিয়ে আমার কাছে আসবে না।' সেই যে বেবি রাগ করে চলে গেছে, আর আসে না।

আমি কি কারও প্রতীক্ষায় আছি? কারও প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে কি আমি বুড়ি হয়ে যাব, কিন্তু সে আসবে না? স্তব্ধ নিশুতি রাতে নিজেকে এইসব প্রশ্ন করি। রেশমি, তুই কি কারও পথ তাকিয়ে আছিস?

আমি জানি, কেউ আমার কাছে আসার জন্য কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। বাকি জীবনের জন্য আমি সকলের কাছে, এমন কি নিজের কাছেও একটি পরিত্যক্ত জিনিসমাত্র। আমার শরীর একটা রঙিন খেলার পুতুলের মত বৈষয়িক আবর্জনা গাদায় গিয়ে পড়েছিল। রোদবৃষ্টিতে প্রকৃতির নির্দয় প্রহারে রঙ মুছে যাচ্ছে। রেখা ভাঙচুর হচ্ছে।

কালুচাচা এখনও শক্ত মানুষ। তার সঙ্গে মাঠে যাই। চাষবাস দেখাশোনা করি। পুকুরের মাছ নিয়ে মাছের ব্যাপারীদের সঙ্গে দরাদরি করি। বাবা তাঁর সম্পত্তির দেখাশোনার জন্য একজন লোক চেয়েছিলেন। অবশেষে আমিই সেই লোক হয়ে গেছি। রোদেবৃষ্টিতে শীতে প্রকৃতির প্রহারের পর প্রহারে জর্জরিত আমি এক পাষাণ-যক্ষিণী। একি বাবার প্রতি অভিমান? বুঝতে পারি না। মনে বলি, 'আব্বু আপনি খুশি হয়েছেন তো?'

সেই সাংঘাতিক ঘটনার পর বাবা আর বেশিদিন বাঁচেননি। বছর তিনেক পরে কোর্টে জেরা করতে করতে হঠাৎ পড়ে যান। আর ওঠেননি।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় দেখি, মা বাথরুম থেকে বেরুচ্ছে। পরনের কাপড় খসে যাচ্ছে। কয়েক পা এসেই পড়ে গেলেন। ডাক্তার এসে বললেন, পক্ষাঘাত। সেই থেকে মা শয্যাশায়িনী। কালুর মেয়ে কানিজা তাঁর দেখাশোনা করে। এতটুকু মেয়ে। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমতী। মায়ের জড়ানো কথাবার্তা আমি বুঝতে পারি না, কানিজা পারে। আমাকে দেখলে মা চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকেন শুধু। ভয় পেয়ে সরে আসি।...

বার বছর পরে গতকাল সকালে চিনুকাকু এসেছিলেন। প্রথমে দেখে চিনতেই পারিনি। সন্ন্যাসীদের মত চুল-গোঁফ-দাড়ি —সব শাদা। বললেন, 'কী রেশমি, চিনতে পারছ না?'

কণ্ঠস্বর শুনেই নিচু হয়ে পায়ে হাত দিলাম। দুকাঁধ ধরে টেনে তুলে চিনুকাকু বললেন, 'অবশ্য তোমাকেও চেনা যাচ্ছে না। এ কী চেহারা হয়েছে তোমার? একেবারে গ্রামকন্যা!'

আমার পাষাণ শরীরে বার বছর আগের সেই রোমাঞ্চ ছিল না। তাঁকে সোজা আমার ঘরে এনে বসালাম। পবের জানালা দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'কই, তুমি তো ফুলের বাগান করনি?'

একটু হেসে বললাম, 'নাহ্। সবাইকে হয়ত সবজিনিস সয় না—অথবা মানায় না।'

চিনুকাকু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমাদের গ্রামটাও একটু বদলেছে। চিনতে পারছিলাম না। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল আসার পথে। তাঁর কাছে সব শুনলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি কিছুই জানার সুযোগ পাইনি আসলে। বাউণ্ডুলে মানুষ। কোথায় কোথায় ঘুরছিলাম।'

'আপনি আমার চিঠির জবাব দেননি কেন কাকু?

'দিয়েছিলাম তো! তোমার বাবাকেও একই সঙ্গে চিঠি দিয়েছিলাম।'

'আমার চিঠিটা পাইনি। সম্ভবত বাবা—' বলে থেমে গেলাম।

'ভাবিজি অসুস্থ। চল, দেখি।'

'বসুন একটু। চা করে আনি।'

'খাচ্ছি। তোমাদের বাজারে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে চা খেলাম। কী নাম যেন—হবিবুর রহমান। রেশমের ব্যবসা আছে বললেন। কথার ওভারটোনে মনে হল তোমাদের ফ্যামিলি সম্পর্কে বিরূপ। তোমার বিয়ের ঘটনাটাও—' বলে চিনুকাকুর দৃষ্টি গেল দেয়ালে টাঙান ছবিটার দিকে। লাঠি ভর করে ছবিটার নীচে গিয়ে দাঁড়ালেন। 'তোমার পোর্ট্রেট দেখছি! কে আঁকল? আর্টিস্টের নাম কোথায়? শোন! অয়েলপেন্টিং পুরনো হলে স্পিরিট দিয়ে মুছে নিতে হয়। অস্পষ্ট হয়ে গেছে।'

চিনুকাকু ছবিটার দিকে নিষ্পলক তাকিয়েছিলেন। আস্তে বললাম, 'আমার না-হওয়া বিয়েতে উপহার পেয়েছিলাম।'

হঠাৎ চিনুকাকু তর্জনী বাড়িয়ে ছবির নীচের কোণটা ছুঁলেন। বললেন, 'রাজা।'

একদা ঝিলের ধারে হিজল গাছটার তলায় যে ভঙ্গিতে বলেছিলেন, সেই ভঙ্গি। সেই চাপা কণ্ঠস্বর! বার বছর আগের শরৎকালের সেই বিকেলটা এসে আছড়ে পড়ল আমার ওপর। তেমনি করে শুনতে পেলাম এক রূপকথার অলীক সূচনা. 'এক যে ছিল রাজা...'

শাদির দুলহান (কনে) ইজিন না দিলে বিয়ে অসিদ্ধ। নুরপুরের বরযাত্রীরা আমাকে লুঠ করে নিয়ে যেতে হামলা করেছিল। প্যান্ডেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আমাদের গাঁয়ের লোকেরা হঠাৎ রুখে দাঁড়ায়। পরে বেবি আমাকে সব বলেছিল। বর গোলাম কাদের আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ হাঙ্গামা বেধে যায়। প্যান্ডেলে আগুন না দিলে নাকি আমাদের গাঁয়ের লোকেরা চটে যেত না। তারা নুরপুরের লোকেদের তাড়া করেছিল। বেচারা গোলাম কাদের যে মোটরগাড়ি চেপে বিয়ে করতে এসেছিল, সেই গাড়িতেই কেটে পড়ে। বরযাত্রীরা এসেছিল দুটো বাসে চেপে। বেগতিক দেখে বাস নিয়ে ড্রাইভাররা পালিয়ে যায়। প্যান্ডেলের আগুন নিভিয়ে ফেলেছিল লোকেরা। কোর্টে মামলা উঠেছিল। বাবা অনেক টাকা দিয়ে কোর্টের মামলা মিটিয়ে নিয়েছিলেন।

কিন্তু এসব প্রকৃত ঘটনা নয়। প্রকৃত ঘটনা হল, জ্যোৎস্নাআপার ঘোষণা, 'খালুআব্বা, রেশমির পছন্দের বর আমি এনে দিচ্ছি। আপনি শুধু একবার বলুন—বলুন খালুআব্বা!'

জ্যোৎস্নাআপা নাকি কাঁদতে কাঁদতে বাবার পা ধরেছিলেন। বাবা বলেছিলেন, 'তোমার যা হয় কর মা! আমি কিছু জানি না।'

তারপর জ্যোৎস্নাআপা ছুটে যান। রাজাদাকে আনতে গিয়েছিলেন শহর থেকে।

এসব কথা পরে শুনেছিলাম। জ্ঞান হওয়ার পর উঠে বসেছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে-বাইরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। বেবি আর রোজি ছাড়া আমার ঘরে কেউ নেই। বাইরে চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, সারা বাড়ি এখন আনন্দের বদলে ঘৃণা ও নিন্দায় কদর্য হয়ে উঠেছে! কে কোথায় হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদছিল। এখনও জানি না, সে কে।

বেবি ফিসফিস করে বলেছিল, 'বাথরুমে যাবে?'

কেন একথা বলেছিল, জানি না। মাথা নেড়েছিলাম। গলা শুকনো কাঠ। আস্তে বলেছিলাম, 'পানি।'

রোজি এক গ্লাস জল এনে দিয়েছিল। জল খেয়ে জ্যোৎস্নাআপাকে খুঁজছিলাম।

বেবি বলেছিল, 'আপা টাউনে গেছেন তোমার নতুন বর আনতে।'

স্বপ্নাচ্ছন্ন আমি। কিছু বুঝতে পারছিলাম না। মাথা ঘুরছিল। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর শুয়ে পড়েছিলাম। তখনও কেউ হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদছিল। কে সে?

রাত নটার বাসে জ্যোৎস্নাআপা ফিরে এসে বলেছিলেন, 'রাজা এল না।'..

চিনুকাকু একটু হেসে বললেন, 'রাজা, তাহলে ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছিল দেখছি।'

ছবিটা খাটের তলায় একটা তোরঙ্গের ওপর রাখা ছিল এতকাল। ভুলে গিয়েছিলাম। কদিন আগে ঘর সাফ করার সময় আবিষ্কার করে চমকে উঠেছিলাম। হঠাৎ মনে হয়েছিল, একুশ বছর বয়সের রঙিন রেশমিকে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখি। প্রেম-ট্রেম নয়। ওটা একটা ছবি। কিন্তু শুধু ছবি নয়, আমার একটা অসাধারণ জয়ের স্মৃতি তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

চিনুকাকু পুবের জানালার কাছে চেয়ারে বসলে বললাম, 'হ্যাঁ পরিচয় হয়েছিল। তবে ছবিটা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন জ্যোৎস্নাদি। তাঁকে আপনি চেনেন না।'

তুমি বস, রেশমি!'

খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম।

'ভদ্রলোক বলছিলেন, তোমার বিয়ের সময় কীসব হাঙ্গামা হয়ে বিয়ে ভেঙে যায়।'

'হ্যাঁ। আমি ইজিন দিইনি।'

'ইজিন কী?'

'সম্মতি।' একুট হেসে বললাম, 'ইসলামধর্মে আছে, বিয়ের প্রস্তাব দেবে বর। কনে তাতে সম্মতি দেবে। নৈলে বিয়ে হবে না।'

চিনুকাকু অবাক হয়ে বললেন, 'বাঃ! এটা তো জানতাম না। তো তুমি সম্মতি দিলে না কেন?'

মুখ নামিয়ে আস্তে বললাম, 'জানি না কেন মুখ দিয়ে না বেরিয়ে গিয়েছিল।'

'তুমি তো ভারি অদ্ভুত মেয়ে।' চিনুকাকু হাসলেন। 'তা আগে বাবাকে বললেই পারতে। তাহলে খামোকা হাঙ্গামা হত না। তুমি আমাকে লিখেছিলে এ বিয়েতে মত নেই। তোমাকে লিখেছিলাম, বাবাকে খোলাখুলি জানিয়ে দাও। আর তোমার বাবাকেও লিখেছিলাম—'

'বাবা বলেছিলেন সে-কথা।'

'তা হলে?'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'সেই যে আপনি বলেছিলেন সর্বনাশী মহাকালীর কথা! বলেছিলেন, মেয়েদের মধ্যে সর্বনাশী মহাকালীও আছেন। হঠাৎ হয়ত ওমনি করে বেরিয়ে আসেন।'

চিনুকাকু খুব হাসলেন কথাটা শুনে। তাবপর বললেন, 'নাহ্। এটা কোনও কাজের কথা না। শুনলাম, তোমার ওপর লোকে খাপ্পা হয়ে আছে। হবিবুরসাহেব বলছিলেন, ভাল বংশের শিক্ষিতা মেয়ে। মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ায়। কখন কী বিপদ ঘটে যায় -'

বাধা দিয়ে বললাম, 'ওরা চেষ্টা করে দেখতে পারে। অনেক বিপদ এত বছর ধবে দেখছি।'

'আমার অবাক লাগছে রেশমি! সেই তুমি, আর এই তুমি—কত পার্থক্য!'

'আপনি বসুন আসছি!'

'এখন কিছু খাব না, রেশমি! তুমি ব্যস্ত হয়ো না। চল ভাবিজির কাছে যাই।'

চিনুকাকুকে মায়ের ঘবে নিয়ে গেলাম। কানিজা মায়ের পা মালিশ করছিল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল চিনুকাকুর দিকে। মায়েব কানের কাছে ঝুঁকে বললাম, 'আম্মি, দ্যাখ তো কে এসেছেন। চিনতে পারছ?'

মা চোখ বড় করে তাকালেন। বাঁদিকে পক্ষাঘাত। ডান হাতে কাপড় টেনে ঘোমটা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। চিনুকাকু কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'আদাব ভাবিজি।'

সুইচ টিপে আলো জেলে চিনুকাকুকে একটা চেয়ার টেনে বসতে দিলাম। মাকে বললাম, 'চিনতে পারছ না? সেই চিনুকাকু!'

মা ডানহাতটা নাড়তে নাড়তে গোঙানো কণ্ঠস্বরে কী বলার চেষ্টা করলেন। চোখের কোনা দিয়ে জল গড়িয়ে এল। চিনুকাকু দুঃখিত মুখে বললেন, 'আহা রে।'

কানিজাকে বললাম, 'আম্মি কী বলছেন রে?'

কানিজা ফিক করে হেসে বলল, 'তোমাকে খুব করে মারতে বলছে।'

মা গোঙা ধরা গলায় বিকট এবং চাপা কাঁদতে থাকলেন। চিনুকাকু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'কাঁদবেন না ভাবিজি। মনকে শক্ত করুন।'

একটু পরে মা শান্ত হয়ে আবার কিছু বললেন। কানিজা বলল, 'জানো বুবু? তোমার বিয়ের কথা বলছে। বলছে, এশমিবুবুর বিয়ে দাও।'

কানিজা রেশমি বলে না। বলে এশমি। ওর চুল টেনে দিয়ে বললাম, 'চুপ। খালি মিথ্যে কথা।'

চিনুকাকু বললেন, 'রেশমি, তোমার মায়ের চিকিৎসা কী হচ্ছে?'

বললাম, 'কলকাতায় আমার মামাত ভাই সানু ডাক্তার। খবর পেয়ে দেখতে এসেছিল। মাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কলকাতা। মা কিছুতেই গেলেন না। তাছাড়া মায়ের সঙ্গে আমাকেও যেতে হত। কিন্তু আমি গেলে এই যখের ধনের পাহারা দেবে কে?'

কথাটার মানে বুঝতে চিনুকাকু আমার দিকে তাকালেন। 'যখের ধন কেন?'

একটু হেসে বললাম, 'বাবা কী বলেছিলেন মনে নেই আপনার? সংসারী জামাই চাই। জামাই যখন ভাগ্যে নেই, তখন—'

চিনুকাকু আমার কথার ওপর বললেন, 'তোমার বাবাকে তুমি হয়ত ভুল বুঝেছ রেশমি!'

মা আবার গোঙানো গলায় কী বলতে চেষ্টা করছিলেন। মায়ের এই কথা বলার চেষ্টা আমার কাছে কষ্টকর। বললাম, 'আসুন কাকু।'

চিনুকাকু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এভাবে ভাবিজিকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখেছ! গ্রামাঞ্চলে ভাল ডাক্তার নেই। বরং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করালে পার।'

'তাই তো করাচ্ছি। আপনি আসুন।'....

মায়ের ঘরে গেলেই আমার দম আটকে যায়। মায়ের মুখোমুখি হলে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। বাবার মৃত্যু আর মায়ের এই অবস্থার জন্য তো আমিই দায়ী।

কিন্তু তার চেয়ে আরও বেশি দায়ী চিনুকাকু আর জ্যোৎস্নাআপা। জ্যোৎস্নাআপার সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই। সেই ঘটনার পর বাবা তাঁকে খুব অপমান করেছিলেন। শাসিয়েছিলেন। জ্যোৎস্নাআপা হয়ত সে জন্যও নয়, দুঃখ ও লজ্জায় আমার সংসর্গ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। বছর সাতেক আগে ওঁর একটা চিঠি পেয়েছিলাম দুর্গাপুর থেকে। ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর সঙ্গে ঘরকন্না করছেন। ছেলেপুলের মা হয়েছেন। চিঠিটার কোনও জবাব দিইনি।

দুপুরে খাওয়ার পর চিনুকাকু বললেন, 'আমি একবার বেরুব রেশমি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাবেন?'

'একবার বহরমপুর থেকে ঘুরে আসি। অনেক বছর যাওয়া হয়নি।'

'এত তাড়াহুড়োর কী আছে?' আজ বিশ্রাম করুন। আগামীকাল যাবেন বরং।'

চিনুকাকু গম্ভীর হয়ে বললেন নাহ্। কিছুক্ষণের জন্য যাব। বিকেলেই ফিরে আসব। আজকাল তো দেখলাম প্রচুর এক্সপ্রেস বাস হয়েছে। আগের মত সারাপথ প্যাসেঞ্জার তুলতে তুলতে যায় না।'

চিনুকাকু বেরিয়ে গেলেন। লক্ষ করলাম, আগের মতো এতটা খুঁড়িয়ে চলেন না। অবাক লাগল, যে মানুষকে একদিন বলতে শুনেছিলাম, 'ঝাঁঝরা শরীর', সেই মানুষ স্বাস্থ্য আর আয়ু ফিরে পেয়েছে। এদিকে আমি কী হয়ে গেছি! আমারই ভেতরটা আজ ঝাঁঝরা। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, দম আটকে যাচ্ছে। পিছনে মৃত্যুর পায়ের শব্দ শুনতে পাই। প্রকৃতির প্রহারে বিবর্ণ ক্ষয়াটে একটা পুতুলমাত্র।

কালুচাচা এসে বলল, 'পাম্প খারাপ হয়ে গেছে। মিস্তিরি লাগবে সারাতে। পঞ্চাশ টাকার ধাক্কা। তা-ও গরজ কত ছকা মিস্তিরির। বলে, কালকের আগে হবে না। ইদিকে ধানগুলান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরছে। কই গো, টাকা দাও।'

বললাম, 'খেয়ে নাও আগে। দিচ্ছি।'

'খাব কী? মেসিনের কাছে তোমার চাচিকে বসিয়ে রেখে এসেছি! সরে গেলেই মেসিন তুলে নিয়ে পালাবে কেউ। চোরডাকাতে দুনিয়া ভরে গেছে জান না?'

'আমার মেশিনে কেউ হাত দেবে না। তুমি খেয়ে নাও তো! আর কখন খাবে?'

অগত্যা কালুচাচা খেতে বসল।

একটু পরে বললাম, 'চিনুবাবুকে মনে পড়ে তোমার? সেই যে ঝিলে বড়শি ফেলে--'

কালুচাচা ঝটপট বলল, 'দেখা হয়েছে বাবুমশাইয়ের সঙ্গে। বাসের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তো চিনতেই পারিনি। আমাকে ডেকে বললেন, কালু না?'

কালুচাচা হাসতে লাগল। ফের বলল, 'একেবারে সাধু গো! ওই লোক কিনা গর্মেন মেরে বেড়াত। খোদার দুনিযায় কতরকম হয়।'

খাওয়া শেষ হলে ওকে টাকা দিলাম। যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে ফোকলা মুখে কালুচাচা হাসল।

'কী হল?'

'বাবুমশাই বললেন, আবার আসবেন। তা যদি ঝিলে মাছ ধরতে যান, ওই দ্যাখো বঁড়সি আছে। দিও। তবে ঝিলের পানি ছেঁচে কমিয়ে দিয়েছে। খোদা নারাজ। সারা আশ্বিন গেল, এক ছিটে বর্ষাল না।'

একুশ বছর বয়সের একটি বিকেল আবার আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার ঘরে গিয়ে পুবের জানালার পাশে বসে ঝিলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সেই হিজলগাছটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। আরও ডালপালা মেলে গাছটা নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। কতকাল ওখানে আর যাওয়া হয় না।

হঠাৎ মনে হল, গাছটা আমাকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে দেখছে। সরে এলাম জানালা থেকে।...

সন্ধ্যায় চিনুকাকু ফিরে এলেন। বললেন, 'শহরটাও বদলে গেছে। একেবারে চেনা যায় না। কতসব দোকানপাট বসেছে। খুঁজে-খুঁজে রাজার স্টুডিওতে গেলাম। প্রথমে চিনতে পারেনি। পরে চিনল। তো যেজন্য অনেক আশা নিয়ে গেলাম—'

চিনুকাকু থেমে গেলেন। বললাম, কী জন্য?'

চিনুকাকু করুণ হাসলেন। 'রাজা একটি হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছে। একটি বাচ্চা আছে। আসলে আমারই ভুল। সময় যত যাচ্ছে, তত সবকিছু অদলবদল হচ্ছে।'

কথাটা বুঝতে পেরে আমার মাথায় আগুন ধরে গেল। বললাম, 'আপনি চলে যান। এখনই চলে যান বলছি।'

চিনুকাকু হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

'আমার কথা বুঝতে পারছেন না? আপনাকে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলছি।'

'রেশমি! রেশমি! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

'আর একটা কথা নয়। বেরিয়ে যান।'

'আশ্চর্য!'

'চিনুকাকু! আর কখনও এ বাড়ি আসবেন না।' বলে দৌড়ে আমার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় ভেঙে পড়লাম। বার বছরের সমস্ত কান্না আমাকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে কালুচাচার বউ এসে দরজায় ধাক্কা দিল। 'রেশমি! রেশমি!'

কয়েকবার ডাকাডাকির পর দরজা খুলে বললাম, 'কী হয়েছে?'

কালুচাচার বউ বলল, 'চেঁচামেচির শব্দ শুনলাম, কিসের ঝগড়া গো?'

আস্তে বললাম, 'ও কিছু নয়।' তারপর আমার পোর্ট্রেটটা দেয়াল থেকে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নামিয়ে রান্নাঘরে নিয়ে গেলাম। জ্বলন্ত উনুনে চেপে ধরলাম।....